আল মাহমুদের
আত্মজৈবনিক রচনাসমগ্র

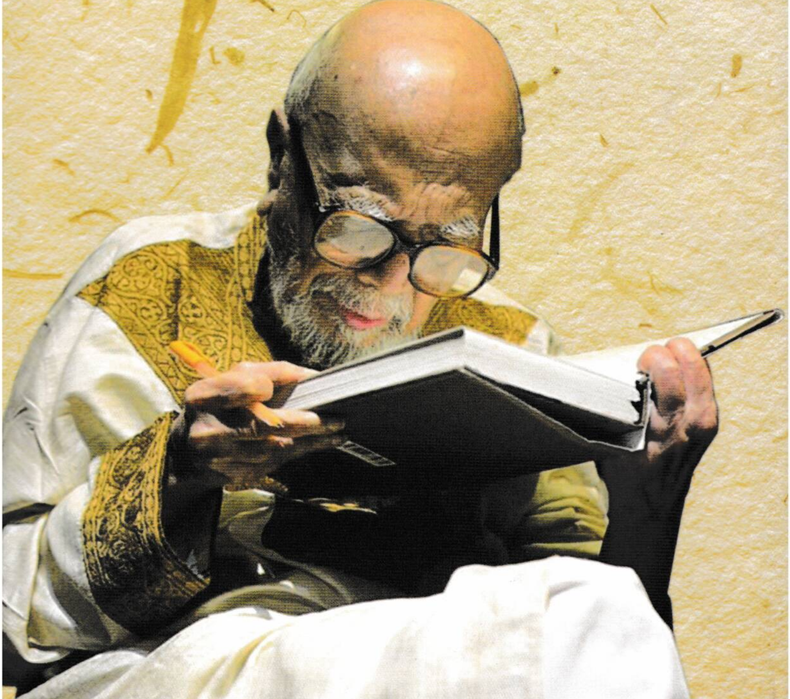

সূ চি প ত্র

যেভাবে বেড়ে উঠি	৯
যে পার ভুলিয়ে দাও	১৪৫
বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ	২৪৯
কবির সৃজন বেদনা	৪১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেভাবে বেড়ে উঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

কে জি মোস্তফা
গিয়াস কামাল চৌধুরী
মনিরুজ্জামান মনির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ও উত্তর কুমিল্লা দখলে আনারও প্রায় দুই শতাব্দী পর আমার পূর্বপুরুষগণ একটি ইসলাম প্রচারক দলের সাথে বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলে প্রবেশ করেন।

এই অঞ্চলে দক্ষিণ দিকে শাহ রাসতি, উত্তর-পূর্ব দিকে শাহ গেছু দারাজ ও নুর নগর-বরদাখাত অঞ্চলে কাইতলার মীর পরিবারের ব্যাপক প্রচার-প্রচেষ্টায় গ্রামের পর গ্রাম ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কাইতলার মীরদেরই একটি শাখায় আমার উদ্ভব।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এই পরিবারের এক সুদর্শন যুবক মীর মুনশি নোয়াব আলী পরিবারের অসম্মতিতে পিতৃপুরুষের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ও খানকার বাইরে এসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন এবং পড়াশোনা শেষ করে স্থানীয় আদালতে একটি চাকরি গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর তাঁর কর্মস্থল অর্থাৎ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন হওয়ায় মীর মুনশী নোয়াব আলী স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী জনাব মাক্কু মোল্লার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের গোড়াপত্তনকালে যে সকল প্রভাবশালী হিন্দু-মুসলমান সমগ্র সরাইল পরগণায় নিজেদের প্রতিভা-প্রতিপত্তিতে মানুষের কাছে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন মাক্কু মোল্লা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন ধনী, দাতা ও পরহেজগার ব্যবসায়ী। মাক্কু মোল্লার পূর্বপুরুষগণ বহিরাগত ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন স্থানীয় মুসলমান। সুলতানী আমলের প্রথম দিকে এই পরিবারটি সম্ভবত ইসলাম গ্রহণ করে। এ দেশের মাটিতে এই মোল্লাদের শিকড় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকায় এঁরা ছিলেন এলাকার মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং ধর্মীয় কারণে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

মুনশি নোয়াব আলীর জন্য এ ধরনের একটি শক্তিশালী পরিবারের আশ্রয় ও সহায়তা একান্ত দরকার থাকায় এই পরিবারে খানে দামান্দ হওয়ার সুযোগ তিনি আনন্দের সাথেই গ্রহণ করেন। যদিও এই বিয়ে প্রাচীন পিতৃপরিবারের সাথে তাঁর বিচ্ছিন্নতাকে চিরস্থায়ী করে দেয়। মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের ব্যবধানে থেকেও তিনি কাইতলার মীরবাড়ির সাথে, তাঁর পীর পিতৃপুরুষদের সাথে আর সম্পর্ক রাখতে পারেননি। শোনা যায়, মুনশি নোয়াব আলী তাঁর পিতার মৃত্যুশয্যায় পিতাকে শেষবারের মতো দেখার আশায় কাইতলার মীরবাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু অবাধ্য সন্তানের ওপর নারাজ পিতা মীর আবদুল গনি ইংরেজি শিক্ষিত পুত্রের হাতে এক চামচ পানিও গ্রহণের অসম্মতি জানিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

মুনশি নোয়াব আলী আর কাইতলায় ফিরে যাননি। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তিনি শ্বশুবাড়িতেই অবস্থান করেন। আর দয়ালু শ্বশুর কন্যা ও জামাতাকে তাঁর অন্যান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

পুত্রদের সমতুল্য মর্যাদা এবং বিপুল সম্পত্তির অংশ দিয়ে মোল্লাবাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেন।

এই হলো আমার প্রপিতামহ মুনশি নোয়াব আলীর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, মৌড়াইল মোল্লাবড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই বাড়িতেই ১১ জুলাই, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আমার জন্ম।

আমার আব্বার নাম মীর আবদুর রব ও মায়ের নাম রওশন আরা মীর। আমার বাপ-মা পরস্পর চাচাতো ভাই-বোন। আমার নানা আবদুর রাজ্জাক মীর ছিলেন এই ছোট শহরের একজন বিজ্ঞ ব্যবসায়ী। কাপড় ও জুতোর কারবারে অঢেল টাকা-পয়সার মালিক ছিলেন তিনি। তাঁর ছিল প্রচুর জমাজমি, দালান-কোঠাসহ বিশাল বাড়ি, গরু-বাছুর ও চাকর-চাকরানি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের আনন্দবাজার, জগৎবাজার প্রভৃতি এলাকায় অনেকগুলো দোকান ছিল আমার নানার। দেখতে ছিলেন ছোটখাট মানুষটি। অত্যন্ত ফর্সা গায়ের রং। স্বাস্থ্যবান। মুখম ল একটু গোলাকার হলেও দৃঢ়চেতা মানুষের মতো চিবুক। আমার স্মৃতির মধ্যে যতটা তাঁকে অঙ্কন করতে পারি তছার আয়ত এক জোড়া চোখ ছিল রক্তাভ। আফিমের নেশা ছিল তাঁর। অতিশয় ভোজনবিলাসি। রাগান্বিত হলে তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ছায়া পড়লেও রাগ ছিল চাপা। কিন্তু পুলকের প্রকাশ ছিল বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো। আনন্দ প্রকাশ করতেন রাজার মতো হেসে। হাসি শুরু করলে মনে হতো এই হাসি আর ফুরাবে না। শ্রোতাদের মুখে খুশির আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ত মুহূর্তে। তাঁর তিন স্ত্রীর মধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ মেজো নানির গর্ভে আমার মায়ের জন্ম।

আমার দাদা মীর আবদুল ওহাব ছিলেন কবি। জারিগান লিখতেন। আরবি-ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃতও জানতেন। নানার তুলনায় দাদা নিতান্তই গরিব। তাঁর জানা সবকটি ভাষার অসংখ্য বইপত্র স্তূপীকৃত হয়ে থাকত তাঁর ঘরে। লাঠিখেলা ও তরবারি চালনায় ওস্তাদ। পশু-পাখি ইত্যাদি পোষার অত্যন্ত শখ ছিল। লড়াইয়ের অনেকগুলো মোরগ-মুরগি পুষতেন। সরাইলের দেওয়ানের সাথে তাঁর মোরগগুলোর লড়াই হতো। কুকড়ো যুদ্ধের আসরে বাড়িতে জমায়েত অতিথিদের জন্য তিনি গরু জবাই করে ভোজ লাগিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, অতিথিপরায়ণ ও অপরিণামদর্শী। নানার মতো তাঁর আয়ের কোনো অফুরন্ত উৎস ছিল না। সামান্য জমিজমা থেকে তাঁর পরিবারের সম্বৎসরের আহার্যের সংস্থান হতো। তাছাড়া তিনি বাড়ির সামনেই যে হাইস্কুলটি ছিল তাতে শিক্ষকতা ও প্রধান কেরানির চাকরি করতেন। দেখতে ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। গায়ের রং ছিল ধবধবে ফর্সা। চোখ দুটি নানার মতো আয়ত না হলেও, বাজপাখির মতো উজ্জ্বল ও অনুসন্ধিৎসু। গান-বাজনা ভালোবাসতেন। পবিত্র কুরআন আবৃত্তির সময় মনে হতো এক অপার্থিব কণ্ঠসুষমার অধিকারী তিনি। আমাদের বাড়ির প্রাচীন মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন মাঝে-মধ্যে আযান দিতেন তখন চলতি পথিকও দাঁড়িয়ে তাঁর আযান শুনত। তিনিও তিনটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহ করেছিলেন। আমার আব্বা জন্মেছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে। আমার এই দাদির নাম ছিল হাসিনা বানু। তিনি ছিলেন সিলেট জেলার সায়েস্তাগঞ্জ অঞ্চলের এক জোতদারের কন্যা। দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা, রূপসি ও অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী মহিলা। মোল্লাবাড়ির স্বাভাবিক পর্দারীতির মধ্যেও তিনি ছিলেন কঠোর পর্দাবাদী ও পর্দানসিন নারী। বাড়িতে বেড়াতে আসা পুরুষ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও উদঘাটিত হতেন না। পাড়া প্রতিবেশিরা কদাচ তাঁকে দেখার সুযোগ পেত। নিচুস্বরে কথা বলতেন। পানের বাটা সর্বদা প্রস্তুত থাকত। অকালমৃত এক কন্যা সন্তান ছাড়া আমার বাপই ছিল তাঁর একমাত্র সন্তান। আমার বাপ-মাকে নিয়ে তিনি আমার দাদার সংসার থেকে আলাদ একটি বৃহদাকার ঘরে বাস করতেন। আমার শৈশব তাঁর উষ্ণ স্নেহের ক্রোড়ে অতিবাহিত হয়েছে। আমার অতি শৈশবের স্মৃতি বলে যদি কিছু থাকে তা হলো আমার দাদির সেই পবিত্র মুখাবয়ব। পান খাওয়া লাল দুটি সুন্দর ঠোঁট ও তাঁর মুখ নিঃসৃত অদ্ভুত সব রূপকথা। সিলেটে মুসলিম বীরদের আগমনকালের রোমাঞ্চকর কাহিনির ভাণ্ডারও যেন তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। পরতে পরতে তিনি মেলে দিতেন ধর্মীয় আত্মত্যাগের সেই ইতিহাস। দাবি করতেন সেই সব শহীদ ও গাজীদের রক্তের উত্তরাধিকার বইছে তার শরীরে। আমাদের বাড়ির কঠোর ধর্মীয় আবহাওয়াও তাঁকে ঠিকমতো পরিতৃপ্ত করতে পারত না। তিনি চাইতেন আরও পরিপূর্ণ পারিবারিক ব্যবস্থা। তাঁর এই আধ্যাত্মিক একাগ্রতাকে সকলেই সমীহ করে চলত। এমনকি আমার দাদাও স্ত্রীর এই ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করার সাহাস রাখতেন না। কোনো সাংসারিক সমস্যা সৃষ্টি হলে, দেখেছি, দাদা অত্যন্ত নম্রভাবে তাঁর নিজের ঘর থেকে দাদির ঘরে এসে তার খাটে বসতেন। আমি ও দাদা-দাদি ছাড়া অন্য কেউ তখন ঘরে থাকত না। আব্বা-আম্মা অন্য ঘরে চলে যেতেন। দাদার আগমন মুহূর্তে দাদি একটু উদাসিনতার ভাব দেখালেও পানের বাটাটি তাঁর সামনে এগিয়ে দিতে ভুলতেন না। দাদা খুব ধীরে সুস্থে বাটা থেকে একটি পান তুলতেন। তারপর ভূমিকা না করেই দাদির কাছে পারিবারক বা সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো সমস্যা তুলে ধরতেন। দাদি প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দাদার পান খাওয়া দেখতেন। নিস্পলক তাকিয়ে থাকতেন স্বামীর দিকে। মনে হতো দাদার অন্তস্থলের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। এই দৃষ্টিকে সম্ভবত দাদা অত্যন্ত মান্য করতেন। তিনিও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন স্ত্রীর দিকে, অকস্মাৎ দাদি মুখ ফিরিয়ে নিতেন জানালার দিকে। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে দাদার উত্থাপিত সমস্যাটির সম্ভবপর সমাধান কী হলে ভালো হতে পারে তার বয়ান শুরু করতেন। তাঁর বক্তব্য হতো সংক্ষিপ্ত। এতেই দেখতাম দাদা অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যেতেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর দাদি দরজার দিকে তাকিয়ে অস্পষ্টভাবে একটু হাসতেন। সেই হাসি ঠোঁটের ওপর কোনো রেখাকেই স্পর্শ করত না। আবার তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যে ফিরে এসে আমার দিকে ফিরে বলতেন, 'আও তো নাতি, তোমারে হারগিলার কিচ্ছা শোনাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সময় আমার দাদা ও নানা দুই সহোদর একই বাড়িতে আলাদা ভিটেয় বাস করতেন। আমার জন্মের আগেই নানা মোল্লাবাড়ি ছেড়ে আলাদা বাড়ি অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব দালান কোঠা ও পুকুর ইত্যাদি বানিয়ে সেখানে উঠে যান। নানার ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবারের কারণেও দুই ভাইয়ের একই বাড়িতে থাকা সম্ভব ছিল না। নানা যাবার সময় আমার মাকে তাঁর সাবেক ঘরবাড়ি ও পুকুরের অংশটি ভোগদখলের অধিকার দিয়ে যান। ফলে আমার দাদি দাদার সংসার ছেড়ে আমার মা-বাপকে নিয়ে মোল্লাবাড়ির সবচেয়ে উঁচু মজবুত ও কারুকার্যময় ঘরটিতে তাঁর ইচ্ছা ও মানসিক পরিতৃপ্তি নিয়ে বসবাসের সুযোগ পান।

আমার শৈশবের সমস্ত স্বপ্ন ও কল্পনাপ্রবণতাকে এই বিশাল ঘরটি অধিকার করে আছে। সম্ভবত এখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে এ ধরনের একটি বসতগৃহ কদাচ চোখে পড়ে। আমার নানা তাঁর প্রথম যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন ও সামর্থ্যকে মিলিয়ে এই বসতঘরটি নির্মাণ করেছিলেন। ছোটখাটো একটি পাহাড়ের চূড়ার মতো ঢেউ খেলানো টিনের চালাযুক্ত এই আটচালা নির্মাণ করতে শুনেছি আমার নানার একটি দালান নির্মাণের খরচের সমান অর্থ ব্যয় হয়েছিল। আমার মনে হয় নানা যখন ছয়কোঠাঅলা তাঁর নতুন বাড়ির বিশাল ইমারতে উঠে যান তখন নিশ্চয়ই এই ঘরটির জন্য তার হৃদয়ের কোথাও গোপন বেদনা লুকিয়ে ছিল। আমার মাকে তিনি বাড়িটি মৌখিকভাবে দান করে গেলেও কোনো দলিলপত্র করে দিয়ে যাননি। তখনকার দিনে অবশ্য মানুষের জবানের মূল্য লিখিত কাগজপত্রের চেয়ে মহার্ঘ্য বলে মনে করা হত। আর আমার মা ছিলেন নানার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বাসের পাত্রী। আজীবন পিতৃভক্তিতে অবিচল ছিলেন আমার মা। নানার সংসারের অন্ধিসন্ধি আমার মার নখদর্পণে ছিল। যদিও আমার মা স্বামী-শশুড়ি নিয়ে আলাদা অর্থাৎ আমার নানার পুরোনো বাড়িতে থাকতেন তবুও পিতার সংসারে সর্ববিষয়ে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

আমাদের বিশাল ঘরটি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে বসে আছে। সেই শৈশবে, গর্বও ছিল। বাড়ির আশপাশে, খেলার মাঠে, স্কুলের বারান্দায় কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, 'খোকু তুমি কোন বাড়ির?'

আমি 'মোল্লাবাড়ির' বলে এক কথায় তার জবাব না দিয়ে আঙুল তুলে সব ঘরবাড়ির ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের ঘরটির দিকে ইঙ্গিত করে দর্পভাবে জবাব দিতাম, 'ঐ যে উঁচু ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটাই তো আমাদের বাড়ি।'

লোকটা তখন হেসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলত, 'ও তুমি মোল্লাবাড়ির ছেলে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজবুত পাকা মেঝের সেগুন কাঠের থাম বা ঠুনির ওপর আমাদের ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে কাঠের ফ্রেমের ওপর ঢেউটিনের আচ্ছাদন। আচ্ছাদনের উর্ধ্বে চতুর্দিকে বাঁশ ও বেতের নকশা। নকশার ভেতর ছোট গোল গোল ঝকমকে কাঁচ বসানো। ঘরের উত্তর দিকে তিনটি বিশাল দরজা পার হয়ে বারান্দা। দরজার আধহাত ওপর দিকে বাঁশ ও বেতের নকশার কাজ ঘন ও সূক্ষ্ম। নকশার লতাপাতার গায়ে লাল, নীল ও সবুজ রঙের রেখা টানা। আমার আব্বা বলতেন, তাঁর সাত-আট বছর বয়সের সময় নাকি তাঁর 'ছোট চাচা' অর্থাৎ আমার নানা এই অদ্ভুত ঘরটি বেঁধেছিলেন। আমার ছেলেবেলার ঘরের নকশার কাজ অনেকটা জীর্ণ ও রঙের ছোপ বেশ ম্লান ও অনুজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। তবুও 'বাড়ি' বলতে এককালে বাংলাদেশের মানুষের মনে যে নস্টালজিয়া কামড় বসাত আমার মনে এখনও আমাদের ঘরটি তেমনি আবেগের অভিঘাত সৃষ্টি করে।

কয়েক জোড়া জালালি কবুতরের বাসা ছিল আমাদের ঘরের ঠুনিগুলোর মাথায়। ঠুনিগুলো যেখানে ওপরদিকে উঠে কাঠের আয়তকার ফ্রেমের সাথে মিশেছে সেখানে খড় ও সরু ডালপালা দিয়ে কবুতরগুলো তাদের বাসা বানিয়ে পরম সুখে বাস করত। আমাদের বাড়িতে জালালি কবুতর খাওয়া বারণ ছিল। কারণ, মনে করা হতো হযরত শাহজালাল ইয়েমেনীর (র.) সাথে নাকি এই কবুতর আমাদের দেশে আসে। সে কারণে হারাম না হলেও ইসলাম প্রচারক সেই মহান দরবেশের স্মৃতির প্রতি সম্মানবশত জালালি কবুতর কেউ খেত না। পাখিগুলো অবাধে বংশ বিস্তার করত ঘরের ভেতর।

আমার দাদি জোহরের নামাজ ও ঘরের কাজকর্ম শেষ করে ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকের দরজার কাছে শীতল পাটি বিছিয়ে দিতেন গরমকালে। আমি এর ওপর ইচ্ছামতো গড়াগড়ি দিতাম। কখনও নকশি কাঁথা সেলাই করতেন আমার দাদি আর আমি রঙবেরঙের সুতোগুলো নিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে তাঁর কাজ বাড়িয়ে দিতাম। কিংবা তাঁর পানের বাটার খোপগুলো খুলে ফেলে গন্ধের সুপোরি কিংবা মশলার গুঁড়ো মুখে পুরে চিবোতাম। কখনও দাদি তাঁর চিবানো পানের অংশ আমার মুখে পুরে দিলে আমি পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে হাসলে দাদি আমাকে জাপটে ধরে সেই হাসির ওপর চুমু খেয়ে আমাকে আদর করতেন।

আমার দাদির কোলে শুয়েই আমি বাংলাদেশের বিশাল বৈচিত্র্যময় আকাশের বিস্তারকে লক্ষ করি। ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকের দোরগোড়ায় বিছানো শীতলপাটিতে শুয়ে আকাশের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে দেখতাম কুণ্ডলি পাকানো শাদা-কালো মেঘের দঙ্গল ভেসে যাচ্ছে, কখনও উত্তরে আবার কখনও দক্ষিণে। বাতাসের দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আকাশের চেহারা যেত বদলে। মেঘকে কখনও মনে হতো অতিকায় অচেনা ফুলের তোড়ার মতো আবার কখনওবা একপাল হাতি। যেন দল বেঁধে হাতির পাল আকাশ থেকে নেমে আসতে চায় মাটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন আকাশের চেহারাটা থাকত আয়নার মতো পরিষ্কার। নীল রঙের বিশাল একটা বাসন যেন ঝলমলিয়ে উঠেছে। আমি একদৃষ্টিতে অন্তহীন নীলিমার দিকে তাকাতে তাকাতে আমার শৈশবের দৃষ্টিশক্তিকে ক্লান্ত করে ফেলতাম। তবুও আকাশের দিকেই তাকিয়ে থাকতাম। মনে হতো রহস্যময় এই নীলিমা।

কখনও দেখতাম মেঘের কোল ঘেঁষে শকুন উড়ছে। অসংখ্য শকুন। আমি মনে মনে পাখা ছড়িয়ে ভেসে বেড়ানো শকুনগুলোকে গোনার ব্যর্থ চেষ্টায় মেতে থাকতাম। পাখিগুলো বিশাল দুটো করে পাখা ছড়িয়ে স্থিরভাবে ভাসছে। এদের পাখা ঝাপটানো বড় একটা চোখে পড়ত না। কীভাবে ভেসে থাকত পাখিগুলো এ নিয়ে আমার উদ্বেগের সীমা ছিল না। বাল্যের এই স্মৃতি লিখতে গিয়ে আজ হঠাৎ কেন যেন মনে হলো কত বছর, কত যুগ ধরে আমি আমার মাথার ওপর যে একটা আকাশ আছে তা দেখিনি। মনে হলো বাইরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একবার দেখি, সত্যি সত্যি সেই শৈশবের আকাশটা আজও আছে কিনা। সেখানে কি আজও মেঘের দঙ্গল ভেসে বেড়ায়? পাখিরা ওড়ে তো সেখানে? নাকি স্মৃতির সে শকুনগুলো আমাকে আর নিঃসীম আকাশের দিকে তাকাতে না দেখে অতীতের মৃত আকাশটাকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর মতো অন্য কোনো গ্রহের ওপর স্বপ্নের চাঁদোয়া টাঙিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে?

আমার দাদির মৃত্যুর দিনটির কথা আমার আবছা ও অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। তিনি ঘরের সবচেয়ে প্রাচীন কারুকার্যময় একটা খাটে অসুস্থ হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর শিয়রে দাগকাটা ওষুধের শিশির ভেতর লাল রঙের ওষুধ। ভাঙা বেদানা। বেদানার ফিকে লাল দানাভরা একটা তশতরি। লোবান জ্বলছে। তাঁর বিছানার পাশে রেহেলে রাখা চামড়ার বঁধাই একখানা বড় সাইজের কুরআন শরীফ। একটু আগেও আমার আব্বা তেলাওয়াত করছিলেন। এইমাত্র উঠে গেলেন আবার ডাক্তারের কাছে। ধীরগতিতে নিঃশ্বাস পড়ছে দাদির। কম্বলে ঢাকা তাঁর বুক ওঠানামা করছে। দূরের আত্মীয়-স্বজন সবাই দাদিকে দেখে যার যার গ্রামেগঞ্জে ফিরে গেছেন। দাদির কী অসুখ ছিল তা আমার জানা ছিল না। তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। তাঁর জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি অতিকষ্টে চোখ মেললেও চোখে দেখতে পেতেন না। একটু যখন ভালো ছিলেন তখন হাতড়ে হাতড়ে আমাকে খুঁজতেন। মারা যাবার বছর দু'য়েক আগেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে দাদি ভেঙে পড়েছিলেন। সাধারণত সংসারের সব কাজই আমার দাদি নিজের হাতে করতে চাইতেন। আমার মাকে চাইতেন সংসারের কাজকর্ম থেকে যতটা সম্ভব রেহাই দিতে। আর আমার মা শাশুড়ির প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি চাইতেন দাদি তাঁর নাতি নিয়েই থাকুক, সংসারের ঝামেলা তিনিই পোহাবেন। তখনও আমার অন্যান্য ভাই-বোনেরা জন্মায়নি। উভয়ে উভয়ের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

আমি ও আমার মা পাশাপাশি বসে ছিলাম দাদির শিয়রে। মনে হচ্ছিল নিঃশ্বাস টানতে তার গলায় ও বুকের কোথাও কষ্ট হচ্ছে। আমার মা চামচ দিয়ে একটু একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানি দিচ্ছিলেন তাঁর মুখে। পানি অবশ্য সহজভাবেই নেমে যাচ্ছিলে গলায়। হঠাৎ কী হলো, আমার মা চামচ ফেলে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আর ঠিক তখনই আব্বা এসে ঢুকলেন। সাথে একজন ডাক্তার। ডাক্তার দ্রুত এগিয়ে এসে আমাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দাদির হাতটা আঙুল দিয়ে টিপে ধরলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাড়ি দেখলেন তিনি। তারপর হতাশা আর আফসোসের শব্দ করে হাতটা ছেড়ে দিলেন। কোনো ওষুধ দিলেন না। স্টেথিসকোপ বসালেন না বুকে। বরং আমাকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করে শিয়রের পাশের জায়গাটি থেকে একটু সরে দাঁড়ালেন। আব্বা ততোক্ষণে আবার বিছানায় উঠে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করেছেন। আমার মা এক চামচ পানি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'দাদির মুখে দাও।'

আমি চামচটা দাদির ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। পানির ঢোকটা দাদির গলা দিয়ে আস্তে নেমে গেল। আব্বা দাদির কানের কাছে মুখ এনে কলেমা পাঠ করতে লাগলেন। আমার মায়ের চিৎকার ও বিলাপের শব্দে তখন সারা বাড়ির মানুষ এসে আমাদের ঘরটা ভর্তি হয়ে গেল। দাদা এলেন সবার পরে। তিনি এসে দেখলেন আমার আব্বার সাথে কলেমা আবৃত্তি করতে গিয়ে অস্পষ্টভাবে দাদির ঠোঁট নড়ছে। দাদা হঠাৎ দাদির কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'বল আল্লাহু।'

আমি দাদির মুখের ওপর নিস্পলক তাকিয়ে থেকে বুঝলাম দাদি দাদার আদেশ পালন করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। আমার অন্যান্য দাদি-নানিরা তখন মুমূর্ষের শিয়রের পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সবাই আল্লাহর নাম নিচ্ছিল আর বিলাপ করছিল। দাদা আবার দাদির কানের কাছে মুখটা নামিয়ে আনলেন। অস্পষ্টভাবে, খুব নিচু স্বরে দাদা যেন দাদিকে কী বললেন। দাদা কি কোনো অপরাধের বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য ক্ষমা চাইলেন দাদির কাছে? অকস্মাৎ অস্বাভাবিকভাবে দাদি তাঁর নিভে যাওয়া চোখ দুটি মেললেন। আর বন্ধ হলো না চোখ দুটি। একটু বিস্ফারিত হয়ে থাকল। আর সবার অলক্ষ্যে দম ফুরিয়ে গেল দাদির।

বাড়িতে কান্না আর আহাজারির ঢেউ উঠল। আমার মা মেঝেতে লুটিয়ে কাঁদলেন। আব্বা কাঁদতে কাঁদতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। দাদির মৃত্যুতে কাঁদেনি শুধু দুটি প্রাণি। আমি আর দাদা। দু'জনের একজনকে দাদি ভালোবাসতেন। অন্যজনকে করতেন স্নেহ।

আমি কাঁদিনি কারণ শোকের কান্না কীভাবে কাঁদতে হয় তা আমার জানা ছিল না। বাড়িতে কেউ শাসন করলে বা মারধোর করলে আমি চিৎকার করে কাঁদতাম। এ ছিল জিদের রোদন। কেউ অবহেলা বা অবজ্ঞা করলেও কাঁদতাম, কারণ অপমানের জ্বালা যে অভিমান আমার মধ্যে গুমরে তুলত শিশুকালে তার উপশম ছিল কান্না। কিন্তু যে চিরকালের জন্য চলে যায় তার জন্য কাঁদতে কেন জানি আমি কোনোকালেও শিখিনি। আজও পারি না। আমার দাদাও কি তবে আমার মতোই শোকার্তের বিলাপ জানতেন না? নাকি আমিই পেয়েছি দাদার স্বভাব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদির মৃত্যুর সাথে সাথেই আমার শৈশবের অদৃশ্য খোলসটা, যা স্নেহ মায়ামমতার আধার, যা শিশুকে মানসিকভাবে বাড়তে দেয় না, তা অকস্মাৎ ফেটে গিয়ে কৈশোরের ঝলমলে প্রজাপতি হয়ে পৃথিবীর নিবিড় প্রকৃতির ওপর পাখা ঝাপটাতে লাগল। অকস্মাৎ মনে হলো দাদি না থাকাতে আমাদের বাড়ির কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো! সংসারের সব কাজকর্ম ঠিকমতোই চলছে। আব্বা সকালে তার প্রিয় হারমোনিয়ামটা নিয়ে আগের মতোই গলা সাধছেন, 'মনের হরিণ হারিয়ে গেছে এই মহুয়া বনে।' রেয়াজ শেষ করে যথারীতি স্নানাহার সেরে চলে যাচ্ছেন দোকানে। জগৎ বাজারে আমাদের একটা কাটা কাপড়ের দোকান ছিল। আর আমার আম্মা, দাদি না থাকলে যে সব সালুন রাঁধাকে আগে অসম্ভব বলে ভাবতেন তা রান্নাঘরে গানের কলি গুন গুন করতে করতে কত অনায়াসেই রেঁধে ফেলতে পারছেন। মায়ের সাথে রান্নাবান্নায় সাহায্য ও আমার ওপর খবরদারি করার জন্য দাদি থাকতেই আলেকজান বলে একটা কাজের মেয়েকে রাখা হয়েছিল। সম্ভবত তখন তার বয়স পনের ষোলর বেশি হবে না। তাকে বাড়ির বাইরে সহজে বেরুতে দেওয়া হতো না। বাড়ির সকলেই তাকে 'আলকি' বলে ডাকত। গায়ের রঙ শ্যামলা, ছিপছিপে একহারা গড়ন। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। তার বিয়ে হয়েছিল একটি খুব লম্বা-চওড়া কালো জোয়ান লোকের সাথে। লোকটা সম্ভবত আমাদের কারবারে কিংবা আমার নানার বিল বাঁওড়ের জমাজমিতে মুনিষ খাটত। কালেভদ্রে সে আমাদের বাড়িতে আলকিকে দেখতে আসত ও দু'এক দিন থাকত। বাড়িতে তার ঢোকার অনুমতি ছিল। এসেই সে অদ্ভুতভাবে প্রায় মাটিতে লুটিয়ে আমার মাকে কদমবুসি করত। আমার মা লোকটাকে 'জামাই' বলে ডাকতেন। কিন্তু আলকিকে দেখতাম যে সেই লোকটাকে মোটেই পাত্তা দেয় না। শুধু পালিয়ে বেড়ায়। দাদি মারা যাওয়ার পর আলকির স্বাধীনতা বেড়ে যায়, আমাকে নিয়ে সে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যেত। আর এই সুযোগে আমাদের বিশাল গ্রামটি আমি ইতস্তত ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেতাম। আমাদের বাড়ির পশ্চিম সীমা থেকে শুরু হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনের বিস্তৃত প্লাটফর্ম। যেখানে পশ্চিমদিকে আমাদের বাড়ি শেষ সেখান থেকেই শুরু আমার জন্য এক অচেনা জগৎ। রেলগাড়ির দ্রুত ধাবমান আসা-যাওয়া। বুক কাঁপানো হুইসেল। কয়লার কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি। পোড়া কয়লা লাইনের ওপর পড়ে থাকার এক অদ্ভুত ধাতব গন্ধ। আর স্টেশনের দক্ষিণ দিকের খোলা জায়গায় ভিড় করে দাঁড়ানো ঘোড়ার গাড়ি। গাড়োয়ানদের ঢাকাইয়া ভাষায় খদ্দের ডাকা। সব মিলিয়ে আমার মতো পিটপিটে চোখঅলা একটা খুদে মানুষের জন্য এক এলাহি কাণ্ড। আমি তখন কারো কোলে চেপে বেড়ানোর স্তর পার হয়ে এসেছি। আমি আলকির হাত ধরে আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের সরকারি ডাকবাংলোটা অবাক চোখে দেখতাম। যেতাম গাঁয়ের খ্রিস্টান মিশনের গির্জাটার বারান্দায়। আর আমাদের বাড়ির পূর্বদিকে এখন যেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়াজ মোহাম্মদ হাইস্কুল, একসময় স্কুলটার নাম ছিল 'জর্জ ফিফথ হাইস্কুল'। সামনে ছিল একটা বিরাট দিঘির মতো পুকুর। সে পুকুরের পাড়ে কিংবা স্কুলের বারান্দায় আলকি আমায় নিয়ে যেত। এখন অবশ্য পুকুরের অস্তিত্ব নেই। তার বদলে হয়েছে ফুটবল খেলার মাঠ। তখনকার পুকুরটা কিন্তু একটা সুন্দর সরোবর হয়ে আমার মনে আজও ঢেউ তোলে। আর যেতাম ঈসা মিয়ার দোকানে 'লজেনচুজ' কিনতে। আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তা ধরে একটু দক্ষিণে গেলেই একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ ছিল রাস্তার পশ্চিম পাড় ঘেঁষে। এই গাছে ছায়াচ্ছন্ন তলাটা ছিল পাড়ার আড্ডাবাজদের বিশ্রাম কেন্দ্র। এই তেঁতুলতলাটাই ছিল ঈসা মিয়ার আক্তার বিড়ি, আচার আর 'লজেনচুজ' বিক্রির দোকান। একটা ছোট কাঠের টেবিল পেতে ঈসা মিয়া তার পসরা সাজাত। আমি আলকির হাত ধরে সে দোকানে আচার, বিস্কুট কিংবা 'লজেন' কিনতে যেতাম। ঈসা মিয়া আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করত। বলত, 'মোল্লা সাহেবের কী চাই?' আমি পকেট থেকে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মস্তক আঁকা একটি তামার পয়সা বের করে দিলে ঈসা মিয়া কৃপণের মতো পয়সাটা বাক্সে রেখে গোটা আষ্টেক বড় লাল লজেন কাগজে মুড়ে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিত।

আমি যখন বাড়ির বাইরের পথঘাট, গাছপালা, রেলগাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি সবে চিনতে শুরু করেছি ঠিক তখুনি একটা অঘটনে আমার হঠাৎ কৈশোরে পা দেওয়া বিস্ময়ের জগৎটা বেদনার কালো ধোঁয়ায় বিষণ্ন হয়ে গেল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি আলকি পালিয়ে গেছে। প্রথমে ভাবা হলো, মেয়েটা আর কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই তার স্বামীর গ্রামে গেছে। যদিও মেয়েটি তার স্বামীর গ্রামের বাড়ি কোথায় তা চিনতই না। যখন তার স্বামী সম্ভবপর সব জায়গায় খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এসে জানাল তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তখন উদ্বেগ ও অনুতাপের একটি কালো রাত নেমে এলো আমাদের ঘরে। আব্বা সারারাত অনুযোগের মধ্যে রাখলেন আম্মাকে। আমার মা-ই যে আলকিকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা আর ঘরের বাইরে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে দুঃসাহসী করে তুলেছে এ কথা ব্যক্ত করতে আব্বা একটুও দ্বিধা করলেন না। আব্বার বকুনিতে আম্মা গুম মেরে শুয়ে থাকলেন। কোনো প্রতিবাদ করলেন না। আমার বাপ-মায়ের পালঙ্কের পাশেই একটা বড় জলচৌকিতে আমার শোয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে শুয়ে থেকে তাদের কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ আমি বিছানায় উঠে বসলাম। উঠে বসার শব্দে আমার বাপ-মা সভয়ে হুড়মুড় করে খাট ছেড়ে আমার পাশে এসে বসলেন। আমাদের ঘরের পিতলের বড় লণ্ঠনটা, যা ঘুমাবার সময় আলো কমিয়ে টেবিলের নিচে রাখা হত, তা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। সেই আলোতে আমার বাপ-মায়ের উদ্বেগাকুল মুখ উন্মুখভাবে এগিয়ে এল আমার দিকে।

'কী হয়েছে বাবা?'

বললেন আমার আম্মা।

'স্বপ্ন দেখেছিস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মাথায় হাত দিয়ে আব্বা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম, 'পানি খাব।' আম্মা তাড়াতাড়ি ঝাঁপের ওপাশ থেকে ঠিল্লা গড়িয়ে পানি এনে দিলেন। আমার আসলে কোনো তেষ্টা পায়নি। এক ঢোক পানি খেয়েই আমি গ্লাসটা নামিয়ে রাখলাম। আমার বাপ-মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। আম্মা বললেন, 'দেখিস আলকি আবার আসবে। আলকির কি কেউ আছে যে, সেখানে থাকবে। ঘুমো, দেখবি সকালেই আলকি হাজির।'

আমার ছেলেবেলার প্রতিটি সকালই আমি আলকির জন্য অপেক্ষা করেছি, আলকি আর আসেনি। আজও এই মধ্যবয়সে যেখানেই সকালে আমার ঘুম ভাঙুক আমি যেন কার অপেক্ষায়, অনেকক্ষণ বিছানার ওপর অলস হয়ে বসে থাকি। সে সকাল ঢাকা, কলকাতা, দিল্লি, আজমির, জেদ্দা, মক্কা, মদিনা কিংবা বাংলাদেশের মফস্বল অঞ্চলের কোনো অজ পাড়াগাঁয়– যেখানেই হোক না কেন আমার এই জন্ম-আলস্য বা অপেক্ষার যেন শেষ নেই। হয়তো আমি সেই কালো মেয়েটির জন্য সত্যি অপেক্ষা করি না। করি হয়তো অন্য কিছুর অপেক্ষা। কিন্তু অপেক্ষার সর্বনাশা অভ্যেস আমার মধ্যে বপন করে দিয়ে গেছে আলকি। ছিপছিপে কালো মেয়েটি। সদা হাস্যমুখ বিশাল বেণি দোলানো দুরন্ত যুবতি মেয়েটির মনে কে জানে কি সর্বনাশা দুঃখ বাসা বেঁধেছিল। যে বেদনা তাকে সমাজ, সংসার, স্বামী ও আমাকে মুহূর্তে তুচ্ছ করে ভাসিয়ে দিয়ে অজ্ঞাতবাসের অন্ধকারে চিরকালের মতো শিস দিতে দিতে টেনে নিয়ে গেল।

আলকি আর ফিরল না। তার বদলে এল নানা উড়ো খবর। কেউ এসে বলল, অমুক খেয়াঘাটে নদী পার হতে আলকির মতো কাউকে সে দেখেছে। না না আলকিই ছিল মেয়েটা। আপনারা খোঁজ নিন। আবার কেউ বলল, আখাউড়া স্টেশনে একটা কাপড়ের পুঁটলি হাতে সে আলকিকে নামতে দেখেছে। আপনাদের আলকিকে তো আমরা চিনি। আহা কি সুন্দর মেয়েটা, যেন একটা কোকিরের বাচ্চা। একবার একটা লোক এসে আব্বাকে খবর দিয়েছিল যে, সে আলকিকে নাকি সিলেট শহরের এক খারাপ পাড়ায় স্বচক্ষে দেখেছে। খেয়াঘাট, স্টেশন আর আশপাশে জেলাগুলোর বাজার, গঞ্জ ও গলিতে আলকিকে ফিরিয়ে আনতে লোক ছুটল। পাতি পাতি করে খোঁজা হলো আলকিকে। পাওয়া গেল হয়তো আলকির মতোই কাউকে—আলকিকে নয়। আমার বাপ-মা জলের মতো পয়সা খরচ করলেন। যে ইচ্ছে করে হারিয়ে যায় তাকে কে আর খুঁজে পাবে?

বাড়ির সবার স্মৃতি থেকে আলকির উপস্থিতি একখণ্ড অস্থায়ী কালোমেঘের মতো মিলিয়ে গেল। শুধু আমিই গেঁথে গেলাম একটি স্মৃতির সুদীর্ঘ কালো বল্লমে। এক অদৃশ্য হার্পুন যেন আমার সারা জীবনকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে মাংসে-মজ্জায় আমূল বিদ্ধ হয়ে থাকল। কোথায় হারিয়ে গেল আলকি?

আমার মা ছিলেন আমার কাছে প্রায় অচেনা, সুদূর এক গর্ভধারিণী ও স্তন্যদায়িনী। নিজের চর্চায় ও বিলাসে যত্নশীলা। তিনি সন্তানের চেয়ে স্বামীর প্রতিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায়সঙ্গতভাবে মনোযোগি ছিলেন বেশি। আমার পিতার প্রতি তাঁর প্রেম ছিল দু'কূল ছাপান। সদা সজ্জিতা, সুরুচিপূর্ণা এই মহিলা আমার মা এটা ভাবতেও 'আম্মা' বলে ডাকতে আমার অহঙ্কারের সীমা ছিল না। আমার মা আর দশজন মায়ের চেয়ে আলাদা এটাও সেই স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরে আমার বুককে সুগন্ধি বাতাসে ভরিয়ে রাখত। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, ভয় করতাম ও ভালোবাসাতম। তিনি ছিলেন আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমার পিতার জন্য সদা প্রস্তুত। তিনি দাদির মতো আমাকে গ্রাস তুলে খাইয়ে দিতেন না। বা আলকির মতো ঘাটলার শানের ওপর উলঙ্গদাঁড় করিয়ে গোসল করাতে করাতে বলতেন না, 'বাহ বাছুরটা তো বাড়ছে বেশ। হাডিডগুলো কেমন শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আয় সাবান মাখিয়ে দিই।' তারপর অকারণে হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরে পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। আর আমিও পানিতে ডুবে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে, ঢোক গিলে তাকে আঁচড়ে-কামড়ে আবার তার বুককেই নিবিড় করে জাপটে ধরতাম না।

আমি উঠোনের ধুলো-কাদায়, রোদ-বৃষ্টিতে খেলতে খেলতে হঠাৎ দৌড়ে এসে আমার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম না। মনে হতো পরীর মতো সেজেগুঁজে থাকা তার শরীরটা নোংরা হয়ে যাবে। তার পাটভাঙা জংলিপাড়ের সুন্দর শাড়িটা মলিন করে ফেলব আমি। আমি দূর থেকে তাঁকে দেখে সুখ পেতাম। মাঝে-মধ্যে তাঁর খুব কাছে গেলে তাঁকে শুধু অবাক হয়ে দেখতাম। তিনি তার সখীদের সাথে আমাদের বারান্দায় আড্ডায় বসলে আমি একটা বেড়াল ছানার মতো তাঁর পায়ের কাছে বসতাম। তার পায়ের নখের ওপর লুটিয়ে পড়া শাড়ির সোনালি পাড়টা সাবধানে সরিয়ে দেখতাম আলতাপরা সুন্দর পা দুটি। চীনা মেয়েদের মতো খুদে আর ধবধবে ফরসা। নখগুলো সমান করে কাটা। একটা সামান্য দাগ বা মলিনতা নেই। সে তুলনায় আমার হাতের আঙুলগুলোকে মনে হতো বড় বেশি নোংরা, অপরিষ্কার।

তা বলে আমার মা যে আমাকে কখনও চুম্বন করতেন না এমন নয়। আলকি আমাকে সুন্দর পোশাক-আশাকে সাজিয়ে চুল পরিপাটি করে দিলে আমার মা আমাকে আলকির কোল থেকে টেনে নিজের কোলে তুলে নিতেন। আর বার বার চুমু খেয়ে বলতেন, 'দেখ আমার বাপের মতো সেজেছে। এই দেখ, আমার বাপ আবদুর রাজ্জাক মীর।'

কিন্তু আমি জানতাম, বাড়ির সবাই বলতে আমি হয়েছি আমাদের দাদার মতো। মা হয়তো ভাবতেন, আমি তাঁর বাপের মতো হলাম না কেন? আমার অসুখ-বিসুখ হলে আমার মা অশান্ত উদ্বেগাকুল ও অস্থির হয়ে পড়তেন। তাড়াতাড়ি পাড়ার খ্রিস্টান মিশনের ডাক্তার শশাঙ্ক বাবুকে ডেকে আনার জন্য সে কি পীড়াপীড়ি আব্বাকে। যাকে বলে অপত্য স্নেহ তা আমার মায়ের মধ্যে গভীর গোপনে কাজ করত। এমনিতে তিনি থাকতেন দূরে। পটে আঁকা বিবির মতো। দাদির মৃত্যুর পর আলকির কাছে শুয়ে কিংবা তার শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমি আমার মায়ের প্রসাধনে পরিপাটি আতর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগুরুতে ম ম করা মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কাছে ভিড়তে গেলেই আলকি বলত, 'চল তোকে রেলগাড়ি দেখিয়ে আনি। হুস হুস, মমেনসিং, ঢাকা যেতে কতদিন।'

আলকি ছিল আমার ক্ষণস্থায়ী যাযাবরী ভগ্নি, ধাত্রী, সঙ্গিনী, আর শিক্ষয়িত্রী। আমাদের প্রাচীন মধ্যযুগীয় বাড়িটার চৌহদ্দির বাইরের পৃথিবী ও প্রকৃতির প্রধান অধ্যাপিকা। সে আমাকে শিখিয়েছিল ফড়িং আর ফুলপাখিদের নাম। গাঁয়ের ঘরে-ঘরে বারান্দায় সে আমাকে পৌঁছে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আমাদের পরিবারের বাইরেও অন্য ধরনের মানুষ আছে। বর্ষা-বাদলের দিনে কেয়ার ঝাড় থেকে কাঁটার ঘা অগ্রাহ্য করে সে আমাকে এ দেশের সবচেয়ে সুগন্ধি ফুল এনে দিত। বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে আসত বেতফল। বনবাদাড় ঘুরে কত বুনো ফুলের কষটে স্বাদের সাথে যে সে আমাকে লালাযুক্ত করে তুলেছিল, আর শিখিয়েছিল কত অখাদ্যের ভর্তায় নুন মাখাতে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

আলকি ছিল আমার কাছে এক পূর্ণ মানবীর প্রতিচ্ছবি। তার কোনো অতীত বা বন্ধন ছিল না। আর থাকলেও তা সে মানেনি। এ দেশের কোন গ্রামে সে জন্মেছিল তা আমার জানা ছিল না। তার বাপও বোধহয় সে খবর জানত না। আর জানলেও কোনোদিন পরখ করতে যাননি। আলকি ভালোবাসত না এমন একটা লোককে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির চাপে এবং পারিবারিক স্বার্থের কারণে আলকির এই অপ্রেমকে হজম করতে হয়েছিল। যার হিংস্র প্রতিশোধ সে নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে তার সামান্য সম্বলের পোঁটলাটি হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে। আর ফেরেনি।

তার অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে কোনোদিন আর বলেনি, 'কেমন আছেন খালাম্মা? খালু কই? আপনাদের ছেলেটা ভালো আছে তো? কই, কত বড় হয়েছে একটু দেখি।'

আলকি, তুই কি আজও বেঁচে আছিস? কী করে থাকবি, তুই যে বয়সে আমার অনেক বড় ছিলি। আমিই তো বড় হয়ে গেলাম। নাকি মরে গিয়ে অন্য এক অদৃশ্য জগতে উদিত হয়েছিস। সেখানে কেমন আছিস রে তুই? ঘুরে বেড়াতে পারিস, যেমন পৃথিবীতে বেড়াতি? সেখানে বৃষ্টি হয়? কেয়াফুল ফোটে তো সেখানে? যে প্রেমের জন্য তুই রাতের অন্ধকারে আমার ঘুমন্ত শরীরে সবুজ চাদরটা ঠিক করে হাঁটা শুরু করেছিলি সে ভালোবাসা কি পেয়েছিলি কোথাও?

হতভাগী, কুলটা ভগ্নি আমার! আমি তোর জন্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যেন তোকে তার প্রেমের কোনো বাগানে বসন্তের কোকিলের মতো প্রেমের মহিমা গেয়ে বেড়াবার সুযোগ দেন।

আর যদি বেঁচে থাকিস, আয় না বোন একবার, তোকে দেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহরম মাসের পহেলা তারিখ থেকেই আমাদের গাঁয়ে লাঠিখেলা ও কিরিচ চালনার ধুম পড়ে যেত। ঢাকের শব্দে মুখর হয়ে উঠত মাগরিবের নামাজের পরবর্তী সময়টা। আমার দাদা ছিলেন গাঁয়ের যুবকদের লাঠিখেলার ওস্তাদ। তিনি লাঠিখেলা, গদাযুদ্ধ, রামদা ও কিরিচ চালনা সবাইকে শেখাতেন। এ সময় আমাদের গাঁয়ের যুব সম্প্রদায় তাঁকে খুব মান্য করে ও তোয়াজ করে চলত। যেমন যুদ্ধে লড়াই শুরু হওয়ার আগে সেনাপতিকে সবাই ভয়ভক্তি ও তোয়াজ করে চলত, ব্যাপারটা অনেকটা সে রকম। আমার বাপ-চাচারা সবাই লাঠিখেলা জানতেন। গাঁয়ের সবচেয়ে তুখোড় লাঠিয়াল ছিলেন দক্ষিণপাড়ার আবদুস সালাম ও আবদুল খালেক নামের দুই ভাই। এঁরা ছিলেন সহোদর। অনেকটা যেন হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের প্রতীকী আবেগ সৃষ্টি করতেন এরা লাঠি, দা ও কিরিচের মহড়ায়। এঁরা দুই ভাই এমন আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লাঠিখেলার আসরটি জমিয়ে তুলতেন, মনে হতো ঢোলের শব্দও হায় হোসেন, হায় হাসান শব্দে কান্না শুরু করেছে।

মহরম মাসের শুরুতে আমাদের বাড়ির বিশাল উঠোনটিকে লেপেপুছে তকতকে করে তোলা হতো। সন্ধ্যার পর উঠোনের চারদিকে পেতে রাখা কয়েকটা টুলের ওপর জ্বালিয়ে দেয়া হতো হ্যাজাক। হ্যাজাকের আলোয় উঠোনটা ঝলমলিয়ে উঠত। নাগারচিরা উঠোনের একপাশে মাদুরের ওপর তাদের ঢোল নিয়েবসত। মহরমের লাঠি খেলায় খোল বা করতাল ব্যবহার করত না কেউ। খেলোয়াড়দের উদ্দীপনার জন্য ঢাকের প্রায় প্রাণ কাঁপানো লাফিয়ে ওঠার মতো শব্দটাই মাতিয়ে রাখত সবাইকে। ঢাক বাজিয়েদেরই আমাদের এলাকায় বলা হয় নাগারচি। মাগরিবের পরপরই এরা উঠোনে এসে ঢোলের বাড়ি দিয়ে, পান আর চায়ের বাটি নিয়ে শুরু করত কাড়াকাড়ি। আর মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে ঢাকের কাঠি ঘুরিয়ে এক ধরনের আওয়াজ তুলে খেলোয়াড়দের ডাকত। ঢোলের আওয়াজ আমাদের গাঁয়ের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত শোনা যেত। শব্দটা ছিল আমার বয়েসী ছেলেদের কানে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মায়াবি আহ্বানের মতো। সন্ধ্যা বেলাতেই রাতের আহার সেরে পিল পিল করে ছোট ছেলের দল আমাদের উঠোনের চারপাশে ভিড় জমিয়ে মাটিতে বসে পড়ত। বড়রা আসত আরও একটু দেরিতে। এশার নামাজের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে। সাধারণত মোল্লাবাড়িতে গাঁয়ের লোক হলেও সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রথাটা সম্ভবত প্রাচীনকাল থেকেই আসছিল। বাড়ির ছেলেদেরও সকলের সাথে অবাধে মিশতে দেওয়ার উদার রেওয়াজই ছিল না। তখনও পর্দা ছিল কড়াকড়ি। শুধু মহরমের সময়টায় বুঝতাম আবহাওয়াটা একটু শিথিল। যদিও মেয়েরা ঘরের প্রতিটি দরজা-জানালায় দেখতাম সাধ্যমতো পর্দা টানিয়ে দিয়েছে। কেউ উঠোনে নামত না। নিরাপদ দূরত্বে আব্রুর আড়ালে থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা জারিগান কিংবা লাঠিখেলা দেখত। টু শব্দ করত না কেউ। মনে হতো এ বাড়ির জেনানারা বুঝি পুরুষদের নির্বিচার আনাগোনা দেখে কোনো দূরদেশে নাইয়র গেছে।

রাত ন'টার দিকে একে একে লাঠিয়ালরা এসে জমা হতো। দাদা একটা চেয়ার নিয়ে বসতেন ঢুলীদের পাশে। প্রথমে পনের-ষোল বছরের কিশোররা তেল মাখানো চকচকে লাঠি নিয়ে উঠোনটাকে মধ্যে রেখে সমানভাগে ভাগ হয়ে দুই লাইনে দাঁড়িয়ে যেত। সবাই তাকিয়ে থাকত দাদার মুখের দিকে। দাদা ফারসি হুঁকোর নলটা মুখ থেকে সরিয়ে ঢাক বাদকদের ইশারা করতেন। আর অমনি ঢাকের আওয়াজ যেত পাল্টে। তরুণ লাঠিয়ালরা উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' তকবির হেঁকে হাঁটু উঁচু করে ঢোলের তালে তালে কদম ফেলে প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে চলত। লাঠি অবিশ্বাস্য দ্রুততায় প্রত্যেকের হাতে বন বন করে ঘুরতে থাকত। খেলোয়াড়দের চোখে-মুখে ফুঠে উঠত হিংস্রতার ভাব। কেউ পা ফেলার বা লাঠি ধরায় কোনো ভুলচুক করলে দাদা এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে তাকে দেখিয়ে দিতেন কীভাবে লাঠিটা পাকড়াও কিংবা কদম রাখতে হয়। চারদিকে মারহাবা আর সাবাস সাবাস শব্দে বাড়িটা মুখর হয়ে উঠত। সবচেয়ে আনন্দদায়ক খেলা ছিল কিরিচ। দুটি ইস্পাতের কিরিচ ছিল আমাদের বাড়িতে। ঢাকা যাদুঘরে রাখা কিরিচগুলোর মতো হুবহু। আর ছিল লোহার কড়া লাগানো দুটি চামড়ার কালো ঢাল। ঢালগুলোর ওপরে ইস্পাতের চাঁদ-তারা আঁকা ছিল। সবাই বলত, ঢালগুলো নাকি গন্ডারের চামড়ায় তৈরি। কিরিচ আর ঢাল, আমার মা বলতেন, আনা হয়েছিল আমার দাদির বাপের বাড়ি থেকে। অস্ত্রগুলো থাকত আমার দাদার বিরাট কাঠের সিন্ধুকে। শুধু মহরম মাসে এগুলো খোলা হত।

কিরিচ খেলায় পাকা ছিলেন আমার চাচা আবদুল হাই মীর ও দক্ষিণ হাটির আবদুল খালেক। আমার চাচা ছিলেন আমার আব্বার সৎ ভাই। এই খেলার মহড়াটি ছিল সত্যিকার যুদ্ধের মতো। দু'জন দু'হাতে অস্ত্র উঁচিয়ে বুকের কাছে ঢাল চেপে ধরে ঢোলের তালের সাথে পায়ের তাল মিলিয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যেতেন। হ্যাজাকের আলোয় ধারাল কিরিচগুলোর সূচাল মুখ ঝকমক করে উঠত। দর্শকরা উৎকণ্ঠায় দম বন্ধ করে রাখতেন। আমার চোখে পলক পড়ত না। একটা মোড়ায় চুপচাপ বসে থাকতাম। প্রথমে খেলোয়াড়রা পরস্পরের কাছে এগিয়ে নানা রকম কসরত দেখাতেন। অকস্মাৎ শুরু হতো আঘাত। ঢালের ওপর কিরিচ বেজে উঠত। অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটির শব্দ। ভয়ে, উৎকণ্ঠায় কেউ আর 'সাবাস' বলারও ফুরসত পেত না। যদিও এটা এদের দু'জনের কাছে আসলে ছিল খেলাই তবুও আমার কাছে মনে হতো সত্যিকার লড়াই।

সবচেয়ে মারাত্মক ও রোমাঞ্চকর খেলা ছিল রামদায়ের কসরত। এ খেলায় পারদর্শী ছিল সলিমুদ্দিন বলে কালো দশাসই এক জোয়ান। লোকটা ছিল আমার নানার আম বাগানের পাহারাদার। চোখ বড় বড় করে লোকটা বিশাল রামদা নিয়ে লাফিয়ে মাঠে নামত। তার প্রতিপক্ষ হয়ে নামত আবদুস সালাম। ভয়াবহ, আদিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিংস্র খেলা। প্রতিটি পদক্ষেপ হতো অত্যন্ত সতর্ক ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক সৈনিকের মতো। এই খেলার সময় আমার দাদা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেন। ধীর লয়ে ঢাকের কাঠি পড়ত। যোদ্ধাদের প্রতিটি মুভমেন্টের সময় তিনি চিৎকার করে উঠতেন, 'খবরদার সামালকে জওয়ান।'

খেলাটি ছিল আমার কাছে স্নায়ু অবশ করা খেলা। সলিমুদ্দিন যখন খেলায় ক্লান্ত হয়ে রামদাটা মাথার নিচে রেখে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ত তখন প্রতিপক্ষের অঙ্গভঙ্গি, পরাজিতের চতুর্দিকে দা ঘুরিয়ে বিজয়োল্লাস দেখে আমি অনেক সময় মুখ ফিরিয়ে নিতাম। ততোক্ষণে আবদুস সালামের বিশাল দাটা নেমে আসত সলিমুদ্দিনের পেটের ওপর। আস্তে করে দাটা পেটের চামড়ার ওপর ছুঁইয়ে মহড়া শেষ হত।

মহরম মাসটা আমার শিশু মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করত। বাড়ির মুরুব্বিরা আশুরার দিন পর্যন্ত দশ দিন রোজা রাখতেন। বিশেষ করে বাড়ির মেয়েরা বাড়িতে মর্সিয়া গাইয়েদের ডেকে এনে শোকগাথা শুনত সবাই। জারিগান শুনতে আসতেন কাউতলী, ভাদুগড় আর সিমরাইলকান্দি গ্রামের লোকেরা। সব গানই আমার দাদার লেখা। গানের ধুয়ার লাইনগুলো মানুষের মুখে মুখে ফিরত।

আমি সারাদিন ছোট লাঠি জোগাড় করে উঠোনে একা একা লাঠি খেলতাম। আমি এত ছোট ছিলাম যে, আমার লাঠি খেলার কোনো প্রতিপক্ষ জুটত না। কোনো সঙ্গী পেতাম না। আমার এক চাচা, নাম মীর আবদুল হাদী, আমার সমবয়স্ক হলেও দাদার কাছে লাঠিখেলা শিখেছিলেন বলে আমাকে পাত্তাই দিতেন না। তিনি অবশ্য খেলতেনও ভালো। আমি ছিলাম একদম আনাড়ি কিন্তু অদম্য উৎসাহে কম্পমান। তাই নিঃসঙ্গ একাকী কল্পিত প্রতিপক্ষের দিকে কিংবা বলা যায় এক অদৃশ্য এজিদের দিকে লাঠি ঘুরিয়ে হাঁটু উঁচিয়ে এগিয়ে যেতাম।

দাদা অবশ্য মাঝে মধ্যে পাষণ্ড এজিদের এই খুদে দুশমনটির মহড়া দেখতেন। কোনোদিন উঠোন পার হবার সময় আড়চোখে আমার কসরত দেখতেন আর মুচকি হেসে নিজের কাজে চলে যেতেন।

হঠাৎ একদিন দাদার স্বীকৃতি পাওয়া গেল। বাড়ির উঠোনে এক মহরমের রাতে আমার বাপ-চাচাদের একদফা খেলার পর ঢোলের বাড়ি একটু মিইয়ে এসেছে। সবই চা পানে ব্যস্ত। এমন সময় দাদা চিৎকার করে একটা মাঝারি সাইজের লাঠি আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'পাকড়াও জওয়ান'।

আমি ছোট ছেলেদের সামনে মোড়ায় পা তুলে বসেছিলাম। দাদার লাঠিটা আমার সামনে এসে পড়ল। আর দাদার হাতের ইশারায় ঢাকগুলো তাক তাক শব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল। উঠোনের অপরদিকে বিরাট একটা তেল চকচকে লাঠি হাতে আমার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দাদা। আমি মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করে মোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লাম লাঠিটার সামনে। লাঠিটা আমার দ্বিগুণ বড়। আমি 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর' বলে লাঠিটার গায়ে হাত দিলাম। আমার সাথে সাথে সারা উঠোনের দর্শক আর লাঠিয়ালরা 'আল্লাহু আকবার' বলে তকবীর তুলল। দাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততোক্ষণে তার চোখ বড় করে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে লাঠি ঘুরিয়ে তাঁর মাংসল উরুর পেশির বাহাদুর দেখিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন। প্রথমে একটু হতচকিতভাবে হলেও আমি লাঠি হাতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাদার লাঠি আমার দুই পায়ের ফাঁকের জমিন স্পর্শ করা মাত্রই আমি ঢোলের শেষ মাত্রার সাথে হাঁটু মিলিয়ে পা উঁচু করলাম। আপনা থেকেই হাতের লাঠিটা ঘুরে গেল। প্রথমে দৈর্ঘ্যের জন্য লাঠির মাথাটা মাটিতে ঢুকে গেলেও আমি মুহূর্তের মধ্যে হাত একটু উঁচুতে তুলে লাঠি ঘোরাতে লাগলাম। পা আপনা থেকেই ঢোলের তালে এগোতে লাগল। প্রতিপক্ষ এগোচ্ছে দেখে দাদা খুশিতে বাগবাগ হয়ে পিছুতে লাগলেন। দর্শকরা 'সাবাস সাবাস, মারহাবা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। মোল্লাবাড়ির প্রতিটি দরজা-জানালার পর্দা ফাঁক হয়ে গেল। আমার মা-চাচিরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মোল্লাবাড়ির সবচেয়ে খুদে লাঠিয়ালের কাণ্ড দেখার জন্য মুখ বাড়িয়ে দিলেন। আমার অন্য দাদিরা পুলকে ফেটে পড়লেন, মারহাবা মারহাবা। কাজীপাড়ার দরগাবাড়ির আমার ছোট দাদি বাংলা উর্দু মেশানো ঠাট্টার ভাষায় অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'দাদার পাছায় মার। বুজদিল ইয়াজিদকো হটাদো জোয়ান!'

ঢোলের আওয়াজে আমি তখন দীপ্ত, আগুয়ান। এক ধরনের প্রেরণা আমার রক্তে রক্তে সঞ্চারিত হচ্ছে। আমিও দাদার অনুকরণে আমার দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের মাঝামাঝি জায়গায় লাঠির ডগাটা মাটিতে ছোঁয়ালাম। দাদা দেখলেন যে আমার প্রাথমিক কসরত নির্ভুল। পা, হাঁটু ও উরুতের তালমাত্রা ঠিক। তবে উচ্চতায় একেবারে মাটির সাথে মিশে থাকায় লাঠিটা ঠিকমতো বাগে আনতে পারছি না। তার চোখে-মুখে খুশির ছটা আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম। কয়েকবার আগানো পিছানোর পর হঠাৎ মারের নিয়মে লাঠি ঘুরিয়ে দাদা উঠোনের মধ্যে চলে এলেন। আমি দাদার লাঠিবাজির রীতিনীতি প্রথম থেকেই দেখে রপ্ত করে ফেলেছিলাম। আমি জানি এখন দাদা আমাকে উঠোনের মধ্যে রেখে দ্রুতগতিতে চতুর্দিকে চক্কর দিয়ে মার লাগাবেন। আমিও মুহূর্তের মধ্যে খেলার কায়দা বদলে ফেলে আত্মরক্ষার কায়দায় লাঠিটার মাঝামাঝি জায়গায় একটু ফাঁক রেখে মাথার ওপর দুই হাতে চেপে বাগিয়ে ধরে প্রতিপক্ষের সাথে সাথে পাক খেতে লাগলাম। আমার মাথা বাঁচানোর ত্বরিত কৌশল দেখে উঠোনের পাকা লাঠিয়ালরাও হাসিতে গড়িয়ে পড়ে মারহাবা দিতে লাগল। ততোক্ষণে দাদা আমাকে মহা হম্বিতম্বি করে মার দিতে শুরু করেছেন। এমন হাবভাব দেখাচ্ছেন, মনে হচ্ছে তাঁর চোখজোড়া ভাটার মতো জ্বলছে। আমার পিঠে, কাঁধে তার ছোট ছোট আঘাত এসে পড়তে লাগল। আমি আমার সাধ্যমতো মার ফিরিয়ে দিতে লাগলাম। কিন্তু আমার হাতের লাঠিটাকে এমন ভারী মনে হচ্ছিল কায়দা জানা থাকলেও প্রত্যাঘাত বা পাল্টা বাড়ি মারতে পারছিলাম না। শেষে ঘামেভেজা আমার হাত থেকে লাঠিটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। আমিও পায়ের তাল ঠিক রাখতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেই আমার পড়ে যাওয়া, অমনি উঠোনের চারপাশ থেকে আট ন'জন পাকা লাঠিয়াল বাজপাখির মতো 'খবরদার' বলে চিৎকার করে তাদের লাঠি ঘুরিয়ে উঠোনে নেমে এলেন। লাঠিয়ালরা আমাকে ঘিরে তাদের দ্রুত ঘূর্ণায়মান শব্দ তুলে দাদাকে হঠিয়ে দিলেন। দাদা আমাকে ছেড়ে হাসতে হাসতে পিছিয়ে গেলেন। আমিও লাফিয়ে উঠে আমার মাটিতে লুটানো লাঠিটা তুলে নিলাম। খেলা শেষ হলো। সবাই ছুটে এসে আমাকে কোলে তুলে চুম্বন করতে লাগলেন। আমার বাপ-চাচারা আমার সাহস দেখে আনন্দে আটখানা। দর্শকদের কেউ কেউ আমার গাল টিপে দিয়ে মন্তব্য করল, দাদার মতোই হয়েছে। আবার কেউ বলল, দাদার তালিম। একদিন দেখ পাকা লাঠিবাজ হবে। অথচ বাল্যে আমার ক্ষীণ স্বাস্থ্য ও অল্প বয়সের কারণে ছোট দেখাত বলে অবজ্ঞায় কেউ আমাকে লাঠি ধরা শেখাতে চাইত না। পরবর্তীকালে অন্যান্য বিষয়ের মতো লাঠিখেলাও আমি নিজেই শিখেছিলাম।

৫

একবার নাইয়র বেড়াবার এক অভাবিত সুযেগ এসে হাজির হলো আমার জন্য। দাদির বাপের বাড়ির কাছে, সেই সিলেটের ভাটি এলাকায় প্রতি বছর যে মেলা বসত, হঠাৎ ঠিক হলো আমাদের কাপড়ের দোকানটি সেখানে যাবে। দাদির বাপের বাড়ির লোকেরা এ উপলক্ষে আমার মাকেও তাদের বাড়িতে নাইয়র নিতে চাইলেন। আমার মা যেতে রাজি হলেন। আমাদের দোকানের গোমস্তা ফিরোজ মিয়াকে আগেভাগেই মালপত্র নিয়ে নৌকায় তুলে দেওয়া হলো। আমরা রওয়ানা হব কয়েকদিন পর। আমার আনন্দের সীমা নেই। যেখানে একাকি আমার বাড়ির বাইরে যাওয়ার তখনও অনুমতি ছিল না সেখানে নৌকায় দূরদূরান্তে ভেসে বেড়ানোর সুযোগ। বেড়াতে যাবার জন্য অনেক নতুন জামা-জুতো দেওয়া হলো আমাকে। আমি খুশিতে একটা বাচ্চা চড়ুই পাখির মতো লাফিয়ে বেড়াতে লাগলাম।

নৌকায় উঠবার প্রতীপিক্ষত দিনটি এল। ঘোড়ার গাড়ি করে আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার সামনে খালের পাশে এসে নামলাম। এখানে অসংখ্য নৌকা মাস্তুলে পাল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জন্য কেরাই করা নৌকাটি বেশ বড় বজরার মতো। ছৈ ও নাওয়ের গোড়ায় পিতল আর লাল নীল রঙের ধাতুর কাজ করা।

আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে নৌকায় উঠলাম। আমি প্রথম। তারপর আমার বাপ-মা। শেষে আমার বাপের বন্ধু ফকির সাহেব। এই ফকির সাহেব ছিলেন আমার কাছে এক রহস্যজনক মানুষ। দেখতে বেঁটেখাটো। গায়ের রঙ তামাটে। পেশিবহুল শরীর অটুট স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। হাতে একটি চকচকে ছোট দা। আমাদের পূর্বাঞ্চলের পাহাড়-পর্বতের জুম চাষিরা যে ধরনের দা নিয়ে ঘোরাফেরা করে দাটা দেখতে সে রকম। ফকির সাহেব মাঝেমধ্যে বছরে দু'একবার মাত্র আমাদের বাড়িতে হাজির হতেন। আমার আব্বাকে সম্বোধন করতেন 'দোস্ত' বলে। আমার আব্বাও তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোস্ত ডাকতেন। উভয়ের মধ্যে ছিল গভীর প্রীতি। এই গভীর বন্ধুত্বের কোনো কারণ আমি পরবর্তীকালে অনেক চিন্তা করেও আবিষ্কার করতে পারিনি। এর কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। আমার আব্বা ছিলেন চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ অন্যরকম। দেখতে দীর্ঘকায়। গায়ের রঙ ফর্সা। কিন্তু নাক ও গণ্ডদেশ রক্তাভ। তার অবয়বের প্রতিটি তিল পর্যন্ত ছিল লাল। অনেকটা তুর্কি অশ্বারোহীদের মতো চেহারা। পোশাক-আশাকে অত্যন্ত রুচিশীল। গভীর সঙ্গীতপ্রীতি থাকলেও, মোটামুটি শরিয়তের সীমানা মেনে চলতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় ও রোজা রাখতেন। আলেমদের সম্মান করতেন। ফখরে-বাঙাল মওলানা তাজুল ইসলামের তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। আর নিজের শরীরে ইসলাম প্রচারক পীর পরিব্রাজকদের রক্ত বইছে বলে অত্যন্ত গর্বিত।

ফকির সাহেব ছিলেন উল্টোধারার মানুষ। তিনি পরনের খাটো ইজেরটি ছাড়া আর কিছু পরতেন না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সমস্ত ঋতুতে উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ থাকত। তিনি নামাজ রোজার ধার ধারতেন না। তবে সারারাত আল্লাহর নাম জিকির করতেন। রাত্রি জাগরণে তার চোখজোড়া রক্তবর্ণ ধারণ করে জ্বলত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অভিমানী। আমাদের বাড়িতে কেউ তাকে সামান্য অবজ্ঞা দেখালে তিনি তা বুঝতে পারতেন। আর তক্ষুণি রাগ করে চলে যেতেন। বহুদিন পর আবার হঠাৎ একদিন উদয় হতেন। চিশতিয়া তরীকার মস্তানদের মতো বাবা গরিব নেওয়াজের নামে হাঁক দিতে দিতে বাড়িতে এসে ঢুকতেন। তার প্রত্যাবর্তনে আব্বা অত্যন্ত খুশি হতেন। আম্মার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বলতেন, 'বড় রাতা মোরগটা জবাই দাও। আমার দোস্ত এসেছেন।'

আমরা নৌকায় ওঠার আগেই মালপত্র, বিছানা, রান্না করা খাবার, কয়েকটা মুরগি ও নাইয়া চুলা ইত্যাদি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সবাই নাওয়ের ভেতর পাতা শতরঞ্জিতে পা ছড়িয়ে বসা মাত্র নাও ভাসল। বদর বদর বলে মাঝিরা পাল খুলে দিল। পালে বাতাস ধরেছে। শহরের খালটা বেয়ে নৌকা এসে তিতাসে পড়ল। আমার চোখের সামনে আমার পরিচিত নিসর্গ দৃশ্যের পরিসীমাটি এক নিঃসীম নৈঃসর্গিক তরঙ্গায়িত ও সম্প্রসারিত হতে লাগল।

এ আমার জীবনের প্রথম নদী। নৌকা বাইচের সময় ছাড়া এ নদীর কাছে আসার আমার কোনো উপায় ছিল না। অথচ উপকথা ও এ অঞ্চলের অসংখ্য লোকগাথায় তিতাস তার স্বচ্ছ ঢেউ তুলে ক্রমাগত বয়ে গেছে। আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র কোয়ার্টার মাইল দূরে এক প্রবাহ। ঘুঘু পাখির চোখের মতো স্বচ্ছ এর পানি। স্রোত আছে কি নেই ঠিকমতো ঠাহর করা যায় না। ঢেউয়ের ভেতর হাত নামালে অকস্মাৎ বোঝা যায় অতলে অন্তরালবর্তী স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই নৈশব্দের নদীতে স্নান, পান ও সাঁতার কেটে বেড়ে উঠেছেন কত কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও লোকগায়ক।

বেলা তিনটার দিকে আমাদের নৌকাটি আশপাশর গ্রাম জনপদকে পেছনে অদৃশ্য করে এক বিলের মধ্য দিয়ে যেতে লাগল। দুপুরে আমার হাতের ভুনা মুরগির মাংস দিয়ে খেয়ে আমি ও আব্বা একটি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকির সাহেব মাঝিদের সাথে তামাক টানছিলেন। আম্মাও সামান্য খেয়ে নিয়ে, নৌকা ভ্রমণের অনভ্যাসের দরুন গা বমি বমি করছিল বলে আমার পাশে শুয়ে পড়েছিলেন।

এখন সবাই জেগে উঠে দেখি আমরা এক দিগন্ত বিস্তৃত জলপুষ্পের জগতে এসে পড়েছি। চারদিকে শাপলা ফুলের শাদা আর হলুদের ছোপ দেওয়া মায়াকানন। পাখির ঝাঁক ওড়াওড়ি করছে। শাদা বকের ঝাঁক আর সদ্যস্নাত পানকৌড়ির ঝিলিক মারা কালো শরীরের অবিরাম লুকোচুরি খেলা। হাজার হাজার বুনো হাঁসের ডুবসাঁতারের চড় চড় শব্দ।

আব্বা-আম্মার নিষেধ সত্ত্বেও আমি শালুক ফুলের বুনো জলজ গন্ধের টানে নৌকার দিকে ফকির সাহেবের পাশে এসে বসলাম। তিনি আমাকে ধরে থাকলেন। বললেন, 'সাবধান শাপলার দিকে হাত বাড়াবে না। জোঁক আছে। পোকামাকড় আছে।'

আমি ঠায় বসে ভাবি বাংলার এই রূপ-গন্ধময় দৃশ্যপট নিঃশ্বাসের সাথে টানতে টানতে আমার হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও মস্তিষ্কের স্মরণকোষে চিরকালের মতো জমা করে নিতে নিতে লাগলাম। আমাদের নৌকার চারপাশে ত্রস্ত কোড়া পাখিরা জোড়া বেঁধে বেঁধে অদ্ভুত শব্দ করে উড়ে পালাতে লাগল। আমার চোখের সামনে কাঁটাঅলা মাখনাফল, শাপলার পাকা বেট আর পানি ফলের দাম নৌকার তলায় পিষে যাচ্ছে। আমি করুণ লুব্ধ চোখে ফকির সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর তাঁর হাতের ধারাল দাটা বাড়িয়ে কয়েকটা মাখনা আর শাপলা ফল আমার জন্য তুললেন। এক ধরনের বুনো জলজ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আমার নৌকায়। নৌকাটা শাপলার দামের মধ্য দিয়ে ধীরে পানি কেটে যাচ্ছিল। মাঝেমধ্যে বুনো ধানের ঝোপ ভিঙিয়ে যেতে নাও আটকে যাচ্ছে। মাঝি দু'জন ঘামে ক্লান্তিতে পিঠ বাঁকা করে লগি ঠেলছিল। একবার বুনো ধানের একটা ঘন ঝোপ পেরুবার সময় ফকির সাহেব মাঝিদের সাবধানে নাও চালাতে বললেন। বললেন, 'এই যে ওই ঝাপটায় কোড়াপাখির বাসায় ডিম আছে। খবরদার বাসাটা যেন না ভাঙে।'

আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, ঝরা ধানের খড়াবিচালি দিয়ে নিখুঁত করে বানানো একটা বাসায় মানুষের চোখের মতো সুন্দর ডিম। আমি অবাক হয়ে ডিম দুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মুহূর্তের মধ্যে আমাদের নৌকা ঝোপটা পার হয়ে এল। আমরা বিল পার হয়ে আবার নদীতে এসে পড়লাম। নদীটা এখানে প্রস্থে বিশাল। কূলকিনারা দেখা যায় না। তবে নিস্তরঙ্গ। ঢেউয়ের মাতামাতি নেই। আমাদের নৌকার আশপাশে শুশুক ভেসে উঠে আবার মুহূর্তের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। আমি অবাক চোখে ফকির সাহেবের দিকে তাকালে তিনি আশ্বস্ত করে জানালেন যে আসলে এগুলো হচ্ছে গভীর নদীর নিরীহ মাছ। এরা মানুষকে কামড়ায় না বা নাওয়েরও কোনো ক্ষতি করে না। আমি চোখ বড় বড় করে শুশুকের খেলা দেখতে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্য ডোবার ঘণ্টাখানেক আগে আমরা নদীর মোহনাটি ছাড়িয়ে এক চরের ওপর নাও বাঁধলাম। আমাদের পাশে আরও একটি ডিঙি নৌকা বাঁধ। ক্লান্ত মাঝিরা বলল, 'এখানেই রাতটা কাটাতে হবে। সামনে হাওড়।' ফকির সাহেবও সম্মতি দিলেন। আমি জনমানবহীন শূন্যচরের ধু-ধু বালিতে আনন্দে লাফিয়ে পড়লাম।

পাশের ডিঙি নৌকাটি আমাদের মতোই একটি নাইয়রের নৌকা। আমরা যেদিকে যাব অর্থাৎ হাওড়ের দিক থেকে এসেছে। এখানে রাত কাটিয়ে সকালে চলে যাবে আমাদের উল্টো দিকে। উভয় নৌকার মাঝিরা পরস্পরের নৌকার গন্তব্য, সোয়ারি ও নিজেদের পরিচয় জানতে হাঁকডাক করল। তারপর এক শাদা দাড়িঅলা সৌম্য বৃদ্ধ আমার সমবয়স্ক একটি ছেলেকে চরের ওপর নামিয়ে দিয়ে আমার আব্বাকে সালাম জানাতে জানাতে আমাদের নৌকার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আব্বা তখন আছরের নামাজের জন্য নাওয়ের ছৈয়ের বাইরে এসে অজুর আয়োজন করছিলেন। ফকির সাহেব তখন মাঝিদের সাথে মুরগি জবাইয়ের তোড়জোড় করছেন। বুড়ো মানুষটা এগিয়ে গিয়ে আব্বার কাছে নিজের নামধান বলে হাত মিলালেন। আব্বা তাকে অত্যন্ত আদরের সাথে আমাদের নৌকায় বসতে বললেন। আমি অপর নৌকাটির ভেতরে তাকিয়ে দেখি আমার মায়ের মতো গয়না ভরা গা নিয়ে এক বৌ। ছেলেটি তখন অসঙ্কোচে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জন মুখোমুখি নিঃশব্দে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। যতদূর মনে পড়ে আমার মতোই শার্টপ্যান্ট আর গ্লাসকিডের কালো চকচকে নতুন জুতো ছিল পায়ে তারও। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তবে চোখ দুটি আমার চোখের চেয়েও সুন্দর আর গভীর কালো। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'বালি দিয়ে ঘর বানাবে?'

আমি বললাম, 'আমি মাটির ওপর নাম লিখতে পারি।'

'আমিও পারি। এস নাম লিখি আর ঘর বানাই। বানাবে?' বলল সে।

আমরা বালির ওপর খেলতে বসে গেলাম। চরটা বেশ বড়। একটা ধু-ধু মাঠের মতো। দূরে দূরে কাশবনের গাছের মতো লম্বা ঘাস। তবে সারাটা চরই ফাঁকা বালির টিবির মতো। মানুষজন বা গরুবাছুর নেই। নদীর পশ্চিম পাড়ে অবশ্য ঘরবাড়ি আর গ্রাম দেখা যাচ্ছে আবছা মতোন। তাও অনেক দূরে।

ঘরের নমুনায় আমি আর ছেলেটি অনেকগুলো বালির টিবি তৈরি করলাম। ছেলেটি তার হাতের আঙুল দিয়ে বালির ওপর লিখল, 'আবু বকর।' তার নাম। আমিও আমার নাম লিখলাম, পিয়ারু। ডাকনাম বাবু। আবু বকর বার বার আমার নামটা বানান করে পড়ল। আমিও বাড়িতে বাল্যশিক্ষা পড়েছিলাম বলে বানান করতে পারতাম।

আমরা কতক্ষণ বালির ওপর ঘরবাড়ি তৈরি আর নাম লেখালেখি করেছিলাম জানি না। অকস্মাৎ সূর্য ডুবে গিয়ে পশ্চিম আকাশটা রক্তবর্ণ ধারণ করল। একটা অদ্ভুত আভায় চরের বালিতে লেখা আমাদের নাম আর ঘরবাড়ির ওপর লালাভ হলুদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙ ছড়িয়ে পড়ে সুন্দর দেখাতে লাগল। আমরা খেলায় এত মত্ত ছিলাম যে, কখন জানি না আমার মা আমাদের নৌকা থেকে নেমে গিয়ে আবু বকরের মার সাথে আলাপ জমিয়ে চরের ওপর পায়চারি জুড়ে দিয়েছেন। দূর থেকে দু'জন আমাদের লেখা দেখে হাসাহাসি করছিলেন।

ঠিক তখনই আব্বা চরের ওপর দাঁড়িয়ে মাগরিবের আজান দিলেন। আল্লাহ ও রাসূলের নাম চরের ওপর দিয়ে ঈথারে কম্পন তুলে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। আবু বকরের মা এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে আবু বকরকেও সাথে নিয়ে তাদের নৌকায় তুললেন। আর আম্মা আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলে চলে গেলেন আমাদের নৌকায়।

চরের বালির ওপর শতরঞ্জি পেতে জামাত হলো। মাঝিদের মধ্যে কেউ কেউ জামাতে শামিল হলেন। ইমামতি করলেন সেই সৌম্য বৃদ্ধ—আবু বকরের নানা। ফকির সাহেব নাইয়া চুলায় মুরগির মাংস রাঁধতে ব্যস্ত। আমি আবু বকরদের নৌকায় এসে তার সাথে আমার গালগল্পে জমে গেলাম। একটু রাত হলে ফকির সাহেব আমাকে নিতে এলেন। কিন্তু আবু বকরের মা বললেন, 'ছেলেটি এই নৌকায় খাবে। পরে এসে নিয়ে যাবেন।'

আমি আবু বকরের সাথে রুই মাছের বিরান দিয়ে ভাত খেয়ে তাদের নৌকায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জাগলাম দেখি কোথায় সে নাও আর কোথায় আবু বকর? আমি আমার মায়ের কাছে শুয়ে আছি। সকালের বাতাসে নৌকাটি হাওরের সাথে পানিতে পাল তুলে তরতর করে ছুটছে। আমি চোখ কচলে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

৬

আমাদের শহরটিকে বলা হতো সঙ্গীতের শহর। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃভ্রমণে বেরুলে ঘরে ঘরে হারমোনিয়ামের শব্দের সাথে ছোট ছেলেমেয়েদের সরগম সাধার বিচিত্র কলরব কানে এসে বাজত। যদিও আমাদের বাড়িতে আমার বাপ ছাড়া আর কেউ সঙ্গীতের প্রতি তেমন উৎসাহী ছিলেন না। পরে অবশ্য আমার আব্বাও কী কারণে জানি না তাঁর মধ্যবয়সে পৌঁছে সঙ্গীতচর্চা ছেড়ে দেন। সম্ভবত অভাবে দারিদ্র্যে তাঁর পক্ষে আর গান-বাজনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিংবা হয়তো তাঁর মধ্যে মানসিক এমন কোনো বেদনা বা অনুশোচনা ছিল যার ফলে গান তাঁকে ত্যাগ করেছিল। আমাদের খাটের নিচে বহুদিন যাবত একটা তারহীন এস্রাজ পড়ে ছিল। আমি মাঝে মাঝে যন্ত্রটির ধুলো ঝেড়ে সাজিয়ে রাখতাম। কিন্তু আব্বা এস্রাজটির দিকে ফিরেও তাকাতেন না। ঘরের সুন্দর দামি হারমোনিয়ামটা বহুদিন আলমারির ওপর অযত্নে পড়ে থাকার পর একবার আব্বা এই প্রিয় জিনিসটি তাঁর এক মামাত ভাই মুকুন্দপুরের আবু সর্দারকে দিয়ে দেন। আমার জোতদার চাচা যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারমোনিয়ামটা নিয়ে যান তখন আমি ও আমার মা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে আব্বার কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলাম। এটুকু মনে আছে, আব্বা হারমোনিয়ামটার জন্য দুঃখ না করতে আমাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। আব্বা আমাকে বলেছিলেন, 'তিনি চান না আমি গান-বাজনা করি কিংবা সুরের প্রতি আমার কোনোরূপ আসক্তি জন্মাক।' হয়তো জীবনের নানা হতাশা ও ব্যবসায় ক্রমাগত অসাফল্য ও ব্যর্থতার পর তাঁর মধ্যে এমন ধারণা শিকড় গেড়ে বসেছিল, সুকুমার কলার প্রতি আসক্তি ও তার গায়কসুলভ নমনীয় মনের জন্যই তাঁর পক্ষে বড় সফল ব্যবসায়ী হওয়া হলো না। যখন তাঁর অন্যান্য ভাই ও পাড়া-প্রতিবেশীরা দিন দিন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে শনৈঃ শনৈঃ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে আমাদের গ্রামটির অধিকাংশ পরিবারই ছিল ব্যবসায়ী পরিবার। সারা শহরে এ গাঁয়ের লোকদের দোকানপাট ছড়িয়ে ছিল। দরিদ্র অর্থাৎ দিনমজুর ধরনের লোক বলতে গেলে গ্রামে কেউ ছিলই না। বেশ বর্ধিষ্ণু পাড়া ছিল আমাদের মৌড়াইল। সুখী, শক্তিশালী ও সংস্কৃতিবান।

আব্বা যখন গান গাইতেন, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গলা সাধতেন, তখনকার একটি ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। অকস্মাৎ শুনলাম উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতসাধক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ আমাদের শহরে এসেছেন। তিনি শহরের একটি সিনেমা হলে তাঁর অসাধারণ বাদ্যযন্ত্র সরোদ বাজাবেন। সারা শহরে তাঁকে একনজর দেখার ব্যাকুলতা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি আমার আব্বার কাছে প্রথম জানতে পারি ওস্তাদ খাঁ সাহেব আমাদের আদি বাড়ি নবীনগর থানার কাইতলার কাছেই শিবপুরে জন্মেছেন। তিনি যে একজন সাধারণ বাদক থেকে নিজ অধ্যবসায়ে উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছেন তা জেনে আমি সেই শিশু বয়সেও দারুণ উজ্জীবিত বোধ করেছিলাম। অবশ্য আব্বার কাছে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁয়ের রূপকথার মতো বিচিত্র জীবনকাহিনি শুনে আমি বায়না ধরলাম আমি ওস্তাদ খাঁ সাহেবকে দেখব।

আব্বা আমাকে প্রথমে খুব বোঝাতে চাইলেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এমন এক ধ্রুবপদকলা যা আমার মতো বাচ্চা ছেলে কিছুই বুঝতে পারবে না। তা ছাড়া হলে ভিড় হবে খুব, আমাকে নিয়ে বসার জায়গা পাওয়া মুশকিল হবে। আমি আব্বার কথা প্রায় মেনে নিয়েছিলাম বলা যায়। কিন্তু সন্ধ্যায় আব্বা যাবার সময় হঠাৎ তার কী মনে হলো, তিনি বললেন, 'চল তোমাকে নিয়ে যাই।'

আব্বার কথায় আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। আম্মা তাড়াতাড়ি আমাকে সিল্কের পাঞ্জাবি আর একটা শাদা সুন্দর ধোপদুরস্ত পাজামা পরিয়ে দিলেন। চুল আঁচড়ে টেরি কেটে দেওয়া হলো। খুদে ফুলবাবুটি।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, আমার বাল্যে বা কৈশোরে আমার কোনো পোশাক-পরিচ্ছদের অভাব ছিল না। জুতো-মোজার অভাব তো ছিলই না। কারণ আমাদের ছিল কাপড়ের দোকান আর আমার নানার ছিল পোশাক ও ফ্ল্যাক্সের জুতোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাট দোকান। আব্বা মাল কিনতে কলকাতায় গেলে সব সময় আমার ও মায়ের জন্যে লেটেস্ট ডিজাইনের জুতো-জামা এবং শাড়ি-ব্লাউজ নিয়ে আসতেন। কোনো সময়ই খালি হাতে ফিরতেন না। পরে অবশ্য বাকি জীবন আমি সেই কৈশোরের বাবুয়ানা স্বভাবটি ভুলতে পারিনি। আর আজকাল তো একটা ভালো শার্ট পরার পর্যন্ত সাধ্যে কুলোয় না।

আমরা যখন হলে গিয়ে পৌঁছলাম দেখি তেমন লোকারণ্যের মতো কিছু না জমলেও লোকজনেরও কমতি নেই। হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবক-যুবতিরাই বেশি। তবে সঙ্গীতরসিক মুসলমান পরিবারের ছেলেমেয়েরাও আছে। তাদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। আমি আব্বার সাথে হলের সামনে কয়েক সারি বেঞ্চ বাদ দিয়ে পেছনে বসলাম। আমাদের পাশে বসেছেন ক্রিশ্চান মিশনের এক ফাদার। আমার আব্বার বিশেষ বন্ধু। আমাদের পেছনের সারিতে বোরখা পরা দুই ভদ্র মহিলা। সারা হলে রঙ-বেরঙের অনেক মানুষ। সবারই চোখেমুখে অধীর অপেক্ষা কখন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এসে পৌঁছবেন। হলে নানারকম কথাবার্তা ও গুঞ্জন থাকলেও সমগ্র হলটিই মোটামুটি শান্ত, সুশৃঙ্খল। এটা হলো এ শহরটির একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। জানি না, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কখন, কীভাবে এ গুণ অর্জন করেছিল। আমার জীবনে আমি এ দেশের কত অনুষ্ঠানে যোগাদন করেছি। গেছি এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। অক্লান্তভাবে ভ্রমণ করেছি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কত মঞ্চে মাইকের সামনে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকার মতো নিরুপদ্রব দর্শক আমি কমই দেখেছি। মঞ্চের ক্রটি, মাইকের গোলযোগ কিংবা বক্তার একঘেয়েমি, একটি অনুষ্ঠানে সম্ভবপর যত অসুবিধাই ঘটুক না কেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষের মতো রিজনেবল, নির্বিকার সাংস্কৃতিক শ্রোতা খুব কমই পেয়েছি। কেউ যেন না ভাবেন নিজের শহরের গুণপনা জাহির করার জন্য আমি খানিকটা বাড়িয়ে বলছি। বরং নিজের শহর বলতে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকাকেই ভালোবাসি বেশি। যে শহর জন্ম দেয় কিন্তু জীবিকা দিতে পারে না, সে শহর থেকে জীবিকাদাত্রী শহরকেই মাতৃতুল্য আপন নগরী মনে করি আমি। আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মে শুধু কৈশোরের কালটাই যাপন করেছি। কিন্তু ঢাকা আমাকে দিয়েছে যৌবনের বিস্ময়, প্রেম, খ্যাতি ও কবিতা। দিয়েছে সাহিত্যিক ঈর্ষা ও অবাধে সর্বপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার এবং কথা বলার অধিকার। সর্বোপরি সারা বিশ্বের আধুনিক সাংস্কৃতিক প্রবাহের সাথে নিজের আবেগকে যোজিত করার এক অভাবিত সুযোগ। তবুও বলব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সাধারণ মানুষেরাও উত্তরাধিকার সূত্রে এমন এক ধরনের সাংস্কৃতির স্থৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে যা সহজলভ্য নয়। সম্ভবত এ শহরের নর-নারীরা এটা অর্জন করছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঙ্গীতকলার চর্চা সাধনার মধ্য দিয়ে। সঙ্গীতকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ এমন এক আধ্যাত্মিকতার বিকাশ বলে ধারণা করে দিয়েছে যে, এর গূঢ় রহস্যের সন্ধান করতে হলে যোগ্য লোকের দ্বারা গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অকপটে স্বীকার করি, আমি গবেষক নই। একজন বিস্মিত কবি মাত্র। আর কবিদের যা হয়, কিছুটা দায়িত্বহীন বটে।

মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখি মখমলের এক প্রমাণসাইজ বিছানার ওপর একজোড়া তবলাবাঁয়া ও কাপড়ে ঢাকা একটি বাদ্যযন্ত্র কারা যেন রেখে গেছে। আমি মনে মনে ধারণা করে নিলাম, ওই যন্ত্রটি সম্ভবত সরোদ হবে। তখনও সরোদ যন্ত্রটি চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আব্বার দিকে একবার তাকালাম, আব্বা আমার ব্যাকুল প্রতীক্ষার উত্তেজনা টের পেয়ে চোখের ইশারায় জানালেন, এক্ষুনি আসছেন তিনি।

একটু পরেই কে একজন হাত ধরে ধবধবে শাদা পোশাক পরা দরবেশের মতো এক বৃদ্ধকে মঞ্চে নিয়ে এলেন। হলের সমস্ত দর্শক তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি হলে ঢুকেই খুব স্পষ্ট উচ্চারণে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম বললেন। দর্শকগণ একবাক্যে তাঁর সালামের জবাব দিলে তিনি মঞ্চের ওপর মখমলের বিছানাটির ওপর বসলেন। আব্বা অনুচ্চকণ্ঠে আমাকে বললেন, 'দ্যাখো ইনিই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ।' আমি তাঁর প্রতি অপলক তাকিয়ে রইলাম। উইংসের অন্য পাশ থেকে আর একজন অশীতিপর বৃদ্ধ হাতজোড় করে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করতে গেলে তিনি সসঙ্কোচে লোকটির হাত ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আরে আরে করেন কী, আপনি আমাকে গোনাগার বানালেন।'

লোকটি কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত না করেই তাঁর পা ছুঁয়ে দিয়ে একটুও দ্বিধান্বিত না হয়ে তবলাবাঁয়া নিয়ে বসে পড়লেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কতক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে কী যেন বললেন। বৃদ্ধ লোকটি তাঁর দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে হেসে জবাবও দিলেন মনে হলো। তারপর একটি ছোট ঠুকনি হাতুড়ি দিয়ে তবলার গাঁট ঠিক করতে বসলেন। ততোক্ষণে খাঁ সাহেব শাদা কাপড়ের ভেতর থেকে তাঁর অপরূপ বাদ্যযন্ত্রটি বের করলেন। যন্ত্রটি মনে হলো আনকোরা নতুন। সকলের চোখের সামনে সেতারের স্বগোত্র তারযুক্ত পেট মোটা আরেক অতিকায় সেতার ঝলমলিয়ে উঠল। আব্বা আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'এই হলো সরোদ। দ্যাখ, এই যন্ত্রটি তিনিই আবিষ্কার করেছেন। তাঁর হাতেরই বানানো।' আমি অবাক হয়ে ওস্তাদের হাতে ঝকমকে বাদ্যযন্ত্রটির সাবধানী নড়াচড়া দেখতে লাগলাম।

অতিশয় নম্রহাতে তিনি যন্ত্রটির বইলা মুচড়ে বিন ঠিক করলেন। আর তবলাটিকে সাহায্যের জন্যে দু'একটা টুংটাং মিষ্টি শব্দ তুললেন। একবার যন্ত্রটি কোলের ওপর রেখে মাথার শাদা কিস্তি টুপিটা আঁট করে পরে দিয়ে দর্শকের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ, আমার ভাইবোনেরা, আমি মূর্খ লোক। আমি কিছুই শিখিনি, কিছুই জানি না। আপনারা আমাকে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন, কী বাজাব? আমি যে আল্লাহর নাম ছাড়া কিছুই জানি না। আমার আঙুল শুধু আল্লাহু আল্লাহু বাজিয়ে দিন কাটিয়ে দিয়েছে ভাইসব। ওস্তাদের কাছে এই একটা আওয়াজই শিখতে চাইলাম। আজও মনের মতো করে শিখতে পারলাম না। আপনাদের অনুমতি পেলে আল্লাহর নাম বাজিয়ে শোনাই।' সারাটা হল স্তব্ধ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকল। যেন প্রতিটি নিরুত্তর মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ আমার হৃৎপিণ্ডে আছড়ে পড়ছে।

হঠাৎ সরোদের তারের ওপর ওস্তাদের শুদ্ধ আঙুলগুলো বিদ্যুৎ ঝলকের মতো নেচে বেড়াতে লাগল। তবলায় ঠেকা দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে অশীতিপর বৃদ্ধটি। ওস্তাদ সেদিকে কিছুক্ষণ ফিরেও তাকালেন না। আপন মনে গভীর তন্ময়তার সাথে তার যন্ত্রটির ওপর আঙুল বুলিয়ে যেতে লাগলেন। যেন একটি সুরের মাকড়সা সমগ্র হলঘর, মানুষ ও আলোর ঝালরগুলোকে ঘিরে এক অদৃশ্য মায়াজালে বেঁধে ফেলতে চাইছে। সামান্য সময় মাত্র এ অবস্থাটি স্থায়ী হলো। তিনি তাঁর হাত সক্রিয় রেখেই তবলচির দিকে চোখ তুলে মৃদু হাসলেন। আর সাথে সাথে তবলা জোড়া এক অপার্থিব 'আল্লাহু' শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে ডগমগিয়ে উঠল। সারা হলে সরোদ নামের এই অসাধারণ পেট মোটা অতিকায় সেতারটি 'আল্লাহু' জিকিরের তুফান তুলে উথাল-পাতাল করতে লাগল।

আমি ওস্তাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। আমার সেই বাল্য বয়সেই কেন জানি মনে হয়েছিল আলাউদ্দিন খাঁ এই পৃথিবীর যেন কেউ নন। তাঁর নির্মীলিত চোখ, তাঁর বিদ্যুতের মতো আঙুলের গতি সারাজীবন যেন একটি বাজনাকেই, একটিমাত্র ঐকতানকেই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। সেই ঐকতান হলো 'আল্লাহু'। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী তাঁর খ্যাতির পেছনে ছিল তাঁর এই নিরহঙ্কার ব্যাকুল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি উপমহাদেশীয় সঙ্গীত স্রোতকে মন্দাকিনীর মতো সারা পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে বইয়ে দিতে পেরেছিলেন।

আজকাল তাঁর ওপর কত অসংখ্য আলোচনা-সমালোচনা, বইপত্র ও ম্যাগাজিন দেখি, কই কেউ তো তাঁর সেই আল্লাহু আল্লাহু মহিমা কিংবা তাঁর আধ্যাত্মিক দিকটি নিয়ে আলোকপাত করেন না?

৭

একদিন ফজরের নামাজের পর আব্বা মসজিদ থেকে ঘরে ফিরেই আম্মাকে বললেন, 'আগামীকাল শুক্রবার। ছেলেকে মসজিদে পাঠাতে হবে। ইমাম সাহেবের হুকুম। তুমি কাউকে দিয়ে বাজার থেকে রেহেল আর আরবি কায়দা কিনে আনাও।'

আম্মা আব্বাকে আশ্বস্ত করে জানালেন যে, আমাদের ঘরে আরবি বর্ণমালার বই আর একটি দামি রেহেল আগে থেকেই আছে। আমাকে পরদিন সকালে এ বাড়ির রীতি অনুযায়ী মসজিদে পাঠান হবে।

একটা সকাল আমার বেশ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। এমনিতেই প্রতিটি সকাল বেলা আমার বাপের কাছে বাংলা বাল্যশিক্ষা নিয়ে চেঁচামেচির শেষ নেই। তালব্য শ'র উচ্চারণ পদ্ধতিটি জিহ্বার কোন অংশ থেকে বিচ্ছুরিত হবে—এ পর্বটি সবে পার হয়ে এসেছি। আর ঠিক এ সময় কিনা আলিফ-বে নিয়ে আমার মসজিদের বিশালদেহী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমাম সাহেবের গাট্টা খেতে হবে! আমি মহাদুর্ভাবনায় পড়লাম। সেই সকালেই, আব্বার এই মহাদুনর্ভাবনাময় সংবাদ প্রচার মাত্র আমি ঘাটলায় গিয়ে মুখটা ধুয়ে ভাবলাম, একবার মসজিদে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসি কারা রোজ এত সকালে আরবি পড়তে আসে, কারা আমার সহপাঠী হবে।

এক পা এক পা করে যেই উঁকি মারা আর অমনি মেহরাবের ওপাশ থেকে এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর চুম্বকের মতো আমাকে আকর্ষণ করল, 'কে ওখানে?'

আমি বললাম, 'আমি হুজুর।' সিঁড়ি বেয়ে দরজায় উঠে দাঁড়ালাম। হুজুর এবার আমার অবয়ব দেখতে পেলেন, 'হুজুরের নাম কী?' আমি আমার নাম বললে হুজুরের হুকুম হলো, 'ভেতরে এস।'

আমি প্রমাদ গুনলাম। সর্বনাশ, আজ থেকেই আলিফ-বে শুরু হবে নাকি! মাথা চুলকে বললাম, 'আমার যে অজু নেই।'

'নেই নাকি! অজুটা ভাঙল কী করে? যাও যাও ঘাটলায় গিয়ে অজুটা সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এস।' জলদগম্ভীর স্বরে হুজুর হুকুম করলেন। আমি দেখলাম মহাবিপদ। শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে বললাম, 'আমি যে অজু করতে শিখিনি। তাছাড়া হাফ প্যান্ট পরে আছি।'

এবার মনে হলো দাওয়াই ধরেছে। হুজুর গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সাড়াশব্দ নেই, এবার আমার কেটে পড়ার পালা। কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ নির্বাক করে দিয়ে প্রায় ছয় ফুটের মতো লম্বা ইমাম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গাঢ় সবুজ রঙের পাগড়িটিতে তাঁকে আরও লম্বা, আরও দীর্ঘদেহী মনে হলো। আমি ভয় পেলাম। কিন্তু পালাব কোথায়? তিনি মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে একবার ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকালেন। অধিকাংশই ছাত্রী। আমার সমবয়সি আমারই ফুপু ও খালার দল। এত ছোট তবু সবাই মাথা ও মুখ কেউ শাড়ি, কেউ ওড়না দিয়ে ঢেকে নিয়েছে। প্রত্যেকের রেহেলে রাখা পবিত্র কুরআন শরীফ। আর হুজুর যেখানটায় বসেন সেখানে স্তূপীকৃত বেঢপ সাইজের একগাদা কিতাব।

হুজুর সোজা হেঁটে এসে আমার মাথায় হাত রাখলেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি আমার কান মলে দেবেন। কিন্তু তার বদলে শোনা গেল এক অপার্থিব মোলায়েম গলার আওয়াজ, 'আল্লাহর ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে চলে গেলে আল্লাহ যে নারাজ হবেন বাপ। চল তোমাকে পাজামা পরিয়ে অজু শিখিয়ে দিই।'

দিলটা একদম নরম হয়ে গেল। আমি মুখ তুলে ইমাম সাহেবের দিকে তাকালাম। মনে হলো এক দীর্ঘকায়, ফর্সা কাঁচাপাকা দাড়িঅলা ফেরেশতা দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে সুন্দর হাসি। চোখে সুরমা। পরনের কাপড়ে মেশকের সুরভি। আমি অভিভূত হয়ে বললাম, 'আপনি ঘাটলায় যান হুজুর। আমি ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে রেহেল নিয়ে আসি।' হুজুর হেসে বললেন, 'মাশাআল্লাহ।'

আমি ঘরে গিয়ে হাফপ্যান্ট পাল্টে পাজামা পরলাম। রেহেল ও কায়দা আম্মার আলমারিতেই ছিল, আমি রেহেল তুলে রওনা হবার সময় আব্বা-আম্মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। আম্মা বললেন, 'আরে, তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মসজিদে।'

আমি ছোট্ট করে জবাব দিয়ে লজ্জায় মাথা নুইয়ে দরজা পার হয়ে গেলাম।

মসজিদে ঢুকে মনে হলো আমি এমন শীতল আরামদায়ক কোনো বাড়ি বা ইমারতে কোনো দিন ঢুকিনি। কেমন একটা হিম, ভয় মিশ্রিত পুলক জাগল মনে। আমাকে অজু শিখিয়ে দিয়ে আমার কচি ভেজামুখ ইমাম সাহেব তার গায়ের হালকা চেকের চাদর দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিলেন। নাকে কানে পানি দিয়ে প্রক্ষালনের জন্যেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক মসজিদের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আমার আরাম বোধ হচ্ছিল। আমি মেহরাবের পাশে ইমাম সাহেবের গা ঘেঁষে বসলাম। হুজুর তাঁর ছাত্রছাত্রীদের আজকের মতো ছুটি দিয়ে আমাকে নিয়ে পড়লেন।

আমি রেহেল খুলবার আগে এদিক ওদিক মুখ ফিরিয়ে মসজিদের ভেতরভাগটা দেখে নিলাম। মেহরাবের কিনারাটা লতাপাতা আঁকা। মেহরাবের একটু ওপরে একটা বড় দেয়ালঘড়ি বসানো। ঘড়ির ভেতরে পেণ্ডুলামটা মৃদু শব্দ তুলে দুলছে। শব্দটা আমার কানে বেশ মধুর বলে মনে হলো। মনে হলো ঘড়িটা যেন আল্লাহর নামে তসবীহ জপছে। একবার গম্বুজের অভ্যন্তরভাগের দিকে দৃষ্টি পড়ল। আমি মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি একটা অতিকায় পদ্মফুল যেন ফুটে আছে। পদ্মফুলের ভেতর থেকে একটা শিকল নেমে এসেছে নিচের দিকে। শিকলের আংটায় বাহারে কাঁচের ঝাড়বাতি। ঝাড়বাতির কাঁচ থেকে রংধনুর রং বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমি মুগ্ধ হয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখছিলাম। আমার মুগ্ধতায় ইমাম সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

আমাদের বাড়ির এই প্রাচীন ক্ষুদ্রাকার মসজিদটিতে আমি যে আর কোনোদিন ঢুকিনি এমন নয়। বরং দুষ্টুমি করতে কিংবা কখনও আব্বার সাথে ওয়াজ শুনতে আমি মসজিদের ভেতর ঢুকেছি। কিন্তু কোনোদিন অজু করে রেহেল নিয়ে আল্লাহর ঘরে ঢুকিনি। কেমন একটা ঠাণ্ডা কিন্তু পবিত্র অনুভূতি যেন আমার ভেতর গুঞ্জরিত হচ্ছে। আজও যখন বহুদিন পরে বাড়ি যাই আর জামাত না পেয়ে একাকী মসজিদে ঢুকি, আমি নামাজ শেষে হাঁটু মুড়ে একাকি কিছুক্ষণ মসজিদে চুপচাপ বসে থাকি। ভাবি শৈশবের সেই অনুভূতিটি আবার বুঝি ফিরে পাব। এই বুঝি ইমাম সাহেব মেহরাবের লতাপাতা আঁকা জায়গাটা থেকে সুরা এখলাস পড়তে পড়তে বেরিয়ে এসে বললেন, ইন্না আতেনা পড়তে গিয়ে আমার 'কাওসার' শব্দটির উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না। আরও সুরেলা মিষ্টি করে পড়তে হবে।

আমি আজও নিঃশব্দে শূন্য মেহরাবের দিকে তাকিয়ে থাকি। শীতল হিম হিম পুলকমিশ্রিত ভীতির অদৃশ্য আঙুল আমাকে স্পর্শ করে বটে কিন্তু ইমাম সাহেবের দীর্ঘ শরীরের ছায়া আর দেখতে পাই না। তার সফেদ পোশাক থেকে মেশকের সুরভি ছড়িয়ে পড়ে না আমার গোলযোগ ভরা বুকের ভেতর।

আমি বিস্মিত চোখ তুলে তাঁর দিকে চাইলে তিনি হাসলেন। বিনয়নম্র হাসি। আমার মাথায় হাত রেখে কী যেন দোয়া পড়ে ফুঁ দিলেন সর্বাঙ্গে। তারপর রেহেলটা মেলে দিয়ে বললেন, 'আমার সাথে পড়ো, আউওজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম। বিসমিল্লাহ— ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনার হাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে আরবি বর্ণমালা শুরু করলাম।

পরের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে মসজিদে পাঠানো হবে। আগের দিনই মধু নাপিতকে ডাকিয়ে এনে মাথার চুল খাটো করে দেওয়া হলো। মধু নাপিত ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি। সপ্তাহে দু'দিন তিনি মোল্লাবাড়িতে হাজাম দিতে আসতেন। আমার বাপের সাথে বিশেষ বন্ধুত্ব থাকায় তিনি আমাদের বারান্দায় বেশিক্ষণ বসতেন। প্রায়ই কাজ সেরে 'চান' করে এসে বারান্দায় উঠতেন। আমার মা মাদুর পেতে খেতে দিতেন তাঁকে। তাঁর খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার ছিল না। মুরগি ও গরুর গোশত ছিল তাঁর প্রিয় খাদ্য। আর প্রায়ই আমাদের ঘরে এই দুটি সুখাদ্য সুলভ ছিল বলে তাঁর পক্ষপাত ছিল আমার মা-বাপের প্রতি। এমনকি তাঁর কামাবার বাক্সটি তিনি মাঝেমধ্যে আমার মায়ের জিম্মায়, আমাদের খাটের নিচে নির্দ্বিধায় রেখে চলে যেতেন। আমি তাঁকে মধুকাকা বলে ডাকতাম।

বাইরের দু'জন মানুষের প্রতি আমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। একজন এই মধুকাকা ও অজন্যজন ডা. শশাঙ্ক দাস হোমিওপ্যাথ। প্রথম জন নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও অপরজন আমাদের পাড়ার প্রটেস্ট্যান্ট মিশনের সদা হাস্যমুখ খ্রিস্টান ডাক্তার।

মায়ের মুখে শুনতাম অতি শিশুকালে আমার মাথায় নাকি এক ধরনের বিশ্রী ঘা হয়েছিল। ঘা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, কেউ আমার কাছে ভিড়তে কিংবা কোলে নিতে তেমন আগ্রহ দেখাত না। বার বার এ্যালোপ্যাথ দেখিয়েও যখন ফল পাওয়া গেল না তখন ডা. শশাঙ্ক বাবু ও মধুকাকা আমার চিকিৎসার ভার নিলেন। মধুকাকা পুঁজরক্ত উপেক্ষা করে নিয়মিত আমার মাথাটা কামিয়ে পরিষ্কার করে দিতেন। আর ডাক্তার বাবু দিতেন ওষুধ।

এ দুটি অমুসলমান পরিবারের সাথে আমার পরিবারের সুসম্পর্ক আজও নষ্ট হয়নি। মধুকাকা মারা গেলে তার ছেলেমেয়েরা অনেকে পরবর্তীকালে ভারতে চলে যায়। আর শশাঙ্ক বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেমেয়েরা খ্রিস্টান মিশনে স্থায়ী আবাস গড়ে নিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মধুকাকার একটি ছেলে, আমার সমবয়সীই হবে, একবার আমাদের বাড়ি এসেছিল। আমার বৃদ্ধা মায়ের কাছে বসে সে যখন তাদের উদ্বাস্তু পরিবার উচ্ছন্নে যাওয়ার কাহিনি বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, আমি সহ্য করতে না পেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। সে কী কান্না! দেশ ও পরিত্যক্ত ভিটেমাটির জন্য এ দুঃসহ কান্নাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

আনুষ্ঠানিকভাবে আমার মসজিদে যাবার আগের দিন দুপুরে মধুকাকাকে খবর দিয়ে আনা হলো। তিনি এসে বারান্দায় পিঁড়ি পেতে বসলেন। আম্মা তাঁর সামনে আমাকে হাজির করে বললেন, 'ছেঁটে একদম ছোট করে দিন তো মধুভাই। কাল হুজুরের কাছে সবক নিতে যাবে। কেমন গাড়োয়ানের মতো বাবরি রেখেছে। এক্কেবারে নখের সমান করে দেবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সবক যা নেবার তা তো আজ সকালেই নিয়েছিলাম। এখন দেখি মুশকিলটা আছান হয়নি। আমি করুণ চোখে মধুকাকার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে পিঁড়িতে বসলাম। মধুকাকা আমাকে ইশারায় আশ্বস্ত করলেন। শুরু হলো তাঁর কাঁচির একটানা ভীতিজনক কিচির মিচির। আমি মাথা নুইয়ে নিরূপায়ভাবে দেখলাম, আমার মাথায় কোঁকড়ানো কালো আগুনের শিখার মতো গুচ্ছ গুচ্ছ কেশরাশি আমারই পায়ের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে। এক সময় আমার মাথা ভর্তি ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল জন্মাত। মধুকাকার আস্কারায় তা বেশ তরঙ্গায়িত হয়ে বেড়ে উঠেছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত টেরি কাটতে বেশ মজা পেতাম। এখন মধুকাকার এই বিশ্বাসভঙ্গের হৃদয়বিদারক আচরণে বড়ই ব্যথা পেলাম। ক্ষীণকণ্ঠে একবার শুধু ডাকলাম, 'মধুকাকা'।

'এই চৌপ। একদম কথা বলবি না। মোল্লার বেটা কেরেস্তানের মতো চুল রেখে মসজিদে যাবি নাকি? কথা বললে চেঁচে কামিয়ে পালিশ করে দেব।'

মধুকাকা ধমকে উঠলেন। অগত্যা এই নির্মমতা সহ্য করতে হলো। আগে তার কাছে এ ধরনের আচরণ কখনও পাইনি। বরং আমার ব্যাপারে সবসময় নমনীয় দেখতাম। অন্যদের যখন তিনি সমান করে ছেঁটে ফেলতেন, তখনও আমার মাথার সামনের দিকের একগুচ্ছ চুল মানানসইভাবে উঁচু হয়ে থাকত। তিনিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিঁথি কেটে ঠিকমতো আঁচড়ে দিয়ে বলতেন, 'যা ওঠ। খবরদার রান্নাঘরের দিকে যাবি না। তোর মার সামনে পড়লে আবার 'বাটি' করতে পাঠাবে। পালা।'

এখন এই বিশ্বাসঘাতকতা! চুল কাটা হয়ে গেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললাম। মধুকাকা জল্লাদের মতো সব কেটে শেষ করে ফেলেছে। চেহারাটা কেমন আতাফল আতাফল লাগছে। এর ওপর টুপি চড়িয়ে মসজিদে ঢুকলে কেমন লাগবে ভেবে আমি আরও জোরে কেঁদে ফেললাম। আম্মা এসে হেসে সান্ত্বনা দিলেন, 'বেশ সুন্দর হয়েছে। এতদিন চুলের জন্য আমার বাপের কপালটাই দেখা যেত না। বাহ কতবড় সুন্দর চওড়া কপাল আমার জাদুর! যাও পুকুরে নেমে সাবান মেখে ভালো করে গোসল দিয়ে এস।'

আমি মনে মনে বললাম, 'নিকুচি করেছে বড় কপালের!' কিন্তু মুখ ফুটে আম্মাকে কি কিছু বলা যায়?

পরের দিন ফজরের নামাজের পর রেহেল হাতে নিয়ে মসজিদে গেলে ইমাম সাহেব প্রথমেই আমার মাথা থেকে টুপি উদোম করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এ কাণ্ড করেছে?'

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, 'মধুকাকা'।

'বেরহম।'

একটি মাত্র ছোট্ট শব্দ উচ্চারণ করলেন ইমাম সাহেব। অথচ ইমাম সাহেবের ভয়েই আমাকে এমন নির্মমভাবে ছেঁটে ছোট করে আল্লাহর ঘরে পাঠানো হলো। এখন তাঁর সহানুভূতিতে আমি ডুকরে কেঁদে ফেললাম। তিনি আমার মস্তকে টুপিটা বসিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে দিতে বললেন, 'মাত রো বেটা। ফির তুমহারা বাল কাটনেকা পহেলা মেরা ইজাযত লেনা পরে গা।'

৮

আমার একটি বোন জন্মাল। আমরা তখন নানাবাড়িতে। মাঝেমধ্যেই সপরিবারে আমার মা তার বাপের বাড়িতে এসে থাকতেন। থাকার সময়টাও বেশ দীর্ঘই হতো। অন্তত আড়াই মাসের আগে বাপের বাড়ি থেকে নড়তেন না। সম্ভবত মামুরাও চাইতেন আমার মায়ের বেড়ানোর সময়টা আরেকটু দীর্ঘ হোক। আমার আপন নানি না থাকাতে আমার মায়ের সহোদর ভাই-বোনদের প্রতি 'ডাক-দোহাই' দেবার উপযুক্ত মুরুব্বি আমার মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। সৎ মায়েরা তাদের নিজের ছেলেমেয়ে ও সংসার সামাল দিতেই ব্যস্ত থাকতেন। তা ছাড়া আমার নানাও সম্ভবত চাইতেন তাঁর এই মেয়েটি একটু বেশিদিন থাকুক তাঁর কাছে। আমার মা থাকলে নানার বিরাট সংসারে শৃঙ্খলা ফিরে আসত। ধান-পাট, গরু-বাছুর ও মানুষজনে ভর্তি বাড়িটা তকতকে ঝকঝকে হয়ে উঠত। নিকানো উঠোনে গোবর বা সামান্য খড় বিচালিও পড়ে থাকার জো ছিল না। বাড়ির কাজের মেয়েরা ও গরু-বাছুরের বছর-বাঁধা রাখালরা সব তটস্থ।

এদিকে আবার আমার সৎ নানিরা অর্থাৎ আমার মায়ের সৎ মায়েরাও এই প্রভাবশালী সতীন কন্যার উপস্থিতি ও দীর্ঘ অবস্থানটাকে খুব একটা খারাপ নজরে দেখতেন বলে আমার মনে হতো না। কারণ সৎমাদের ন্যায্য হিস্যার ব্যাপারে একমাত্র আমার মাই নানার সামনাসামনি হওয়ার সাহস রাখতেন। সংসারের আয় যেহেতু ছিল অফুরন্ত সে কারণে ব্যয়ও ছিল বেহিসাবি। বহু শরিকের ঘরে সব জিনিস ঠিকমতো বণ্টন হতো না বলে সকলেরই ছিল অসন্তোষ। আমার মা সেই অসন্তোষ নিরাময়ের ওষুধ জানতেন। তার আগমনের সাথে সাথে এ বাড়ির অপব্যয় কমত। গাইয়ের দুধ, গন্ধের তেল বা কাপড় কাচার সাবানের মতো সামান্য সামগ্রী নিয়ে পারস্পরিক ঝগড়া-ফ্যাসাদ বন্ধ হয়ে যেত। ভোজ্যদ্রব্যের রেকাবি চর্বচোষ্যসহ সব শরিকের ঘরে ঠিকমতো পৌঁছাত বলে সবাই মোটামুটি পরিতৃপ্ত থাকত।

আমার মা নানাবাড়িতে এলে নানার বাজারের বহরও যেত বেড়ে। বাপের পছন্দমতো রান্না মেয়ে অত্যন্ত যত্ন করে রাঁধতেন। রুইয়ের মাথা, সরভরা দুধের বাটি কিংবা মাংসের কোর্মার বাটিটা আলাদা করে আমার মা নানার জন্যে তুলে রাখতেন। আমার মামারা যিনি যে ঘরেরই হোন, খাওয়ার সময়টায় নানার সাথে তার দস্তারখানে বসার জন্য আমার মায়ের কাছে ঘুরঘুর করতেন। আমিও নানার সাথেই খেতাম।

বাপের বাড়িতে আমার মায়ের এই একাধিপত্যে কেউ যে একেবারেই অসন্তুষ্ট হতো না এমন নয়। যারা এই খবরদারিতে বিরক্ত হতো তারা সকলেই ছিল তার অতি আপনজন। বলা যায় সহোদরা বোনেরা। স্বামীর সাথে তারা দূরদেশে থাকতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সব সময় সন্দেহের চোখে দেখতেন আমার মা-বাবাকে। তারা ভাবতেন যেহেতু আমার মা দেশে আমার নানার চোখের সামনে সে কারণে আমার নানার স্নেহের সুযোগে তিনি তাঁর বিপুল সম্পত্তি লুটেপুটে খাচ্ছেন। আমার মা বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছেন খবর পেলেই তাঁরাও নানা ছুতোয় নানাবাড়ি এসে হাজির হতেন। সব সময়ই যে এরকমটা ঘটত সে কথা অবশ্য বলা যাবে না তবে অধিকাংশ সময় এটাই ঘটত। নানা বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতেন সে কারণে তিনি আমার সরল সাদাসিধা মাকেই সব সময় অধিক ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। পরবর্তীকালে আমার নানার মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল ঘরবাড়ি ও বিপুল অর্থবিত্ত যখন শরিকদের মধ্যে ছত্রখান হয়ে ছিটিয়ে পড়ে তখনও আমার মা তাঁর মরহুম পিতার বিশ্বাস ও ভালোবাসার মধ্যে মর্যাদা রক্ষার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টা তাঁকে আরও অসম্মান ও দারিদ্র্যই উপহার দিয়েছে শুধু। ভাঙন ও অবনমনের ঝোঁক তিনি ঠেকাতে পারেননি। মাঝখান থেকে আমার পিতার অর্থাৎ তাঁর স্বামীর সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। একজন উদ্যমি মানুষকে তিনি এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তায় ডুবিয়ে রেখেছেন। যার পরিণাম আমার পিতার ব্যবসা-বাণিজ্যে অসফলতা ও পরে দরবেশের মতো মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়ানো।

আমার নবজাতক বোনটির নাম রাখা হলো জাহান আরা। জাহান আরার আগমনে আমাদের নিজেদের তো বটেই আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও আনন্দের একটা হিল্লোল বয়ে গেল। অতিশয় ফর্সা কিন্তু সেমেটিকদের মতো কোমল গাত্রবর্ণ নিয়ে জন্মাল আমার এই সহোদরা। তার চোখ দুটি আবার ঈষৎ পিঙ্গল। কেশ ঘনকৃষ্ণ না হলেও সোনালিও ঠিক বলা যায় না, কেমন যেন একটু অস্পষ্ট আভাযুক্ত লাল।

সবাই বলাবলি করতে লাগল আমার এই বোন নাকি আমারই প্রাচীন পিতৃপুরুষদের অর্থাৎ মীর আবদুল গণিরই রক্তের ঐশ্বর্য ও শুভ লক্ষণসমূহ নিয়ে জন্মেছে। আমি আনন্দিত, আমাকে আর নিঃসঙ্গ থাকতে হবে না।

প্রকৃতপক্ষে মামারা তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল নানার ক্ষেত-খামারের মুনিমানুষদের খেটে খাওয়া ছোট ছেলেরা। এইসব ছেলেরা আমার মতো ছোট হলেও ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরের রাখাল। সারাদিন এরা নানার গরু-বাছুরের পাল নিয়ে মাঠে ও তিতাস পার হয়ে গিয়ে ঘাসভর্তি চরের ওপর চরাত। ওই বিল ও চর আমার নানা সরকারের কাছ থেকে নিলাম ডেকে নিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি নিজেই গরু-বাছুর চরাবার উপযোগী তৃণক্ষেত্রগুলোর একক অধিকার পেতেন, কদাচ আবার তাঁর প্রতিবেশী হিন্দু জমিদারদের সাথে সমঝোতা করে নিলাম ডাকতেন। সে অবস্থায় উভয় ডাককারির রাখালগণ চরে শুধু একটি বিশাল চাল খাটিয়ে গরু-বাছুরসহ সেখানেই অবস্থান করত।

নানাবাড়িতে বেড়াতে এলে এসব রাখাল বালকদের সাথে আমার অবাধ মেলামেশার সুযোগ হত। এ আমার সম্পূর্ণ অন্য অভিজ্ঞতা। আমার এসব খুদে বন্ধুরা হতো অত্যন্ত বিশ্বাসী সত্যবাদী। খালি গা পরনে লাল গামছা। হাতে বড় বড় খড়কেঅলা পাজনলাঠি। প্রত্যেকের স্বাস্থ্য সুঠাম। শরীরে তেল চকচকে কালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চামড়ার ভেতর সুডৌল পেশির দীপ্তি। এদের আমার বড় ভালো লাগত। এরা সারা দিনমান বিল-বাঁওড়ে, তৃণভূমিতে নানার প্রায় শতাধিক গাই-গরু চরিয়ে সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার আগে গোয়ালে ফিরিয়ে আনত। পশুর পাল যথাস্থানে বেঁধে যথারীতি দানাপানি দিয়ে নানার বৈঠকখানায় দালানের বিস্তৃত আঙিনায় বসে মজাসে গালগল্প করত। এদের বাপ চাচারাও ক্ষেতের নিড়ানি, দাওয়াকাটা ইত্যাদি শেষ করে এ সময় ফিরে এসে এদের সাথে মিলিত হত। এদের হাসিখুশি ভাব দেখে কখনও মনে হতো না এ মানুষগুলোর কোনো দুঃখ আছে।

আসলে এরাই এ দেশের ভূমিহীন চিরদুঃখী কিষাণদের বংশধর। সারাজীবন এরা পরের জমিতে জীবনপাত করে খেটে সারাদেশকে চিরকাল সোনালি শস্য উপহার দেয়। নিজেরা শুধু দু'বেলা ভাতের ওপর প্রভুর গৃহিণীরা সালুন হিসেবে যা ঢেলে দেয় তাতেই বস বস উদর পূর্তি করে সন্তুষ্ট থাকে।

ইসমাইল ছিল আমার নানাবাড়িতে বছরবাঁধা মুনি-মানুষের সর্দার। মেদহীন দীর্ঘকায় সৈনিকের মতো কালো শরীর। অত্যন্ত পরিশ্রমী, বিশ্বাসী ও স্বল্পবাক মানুষ। আমার নানার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল ইসমাইল ও এ বাড়িতে রাখাল হিসেবে কর্মরত তার ছোট ছোট দুটি ছেলে। তাছাড়া ছিল ধনো ও নিদান বলে আরও দু'জন লোক। এরা ছিল অত্যন্ত ভালোমানুষ। হাসিমুখে নানার খামারে সারাদিন খাটত। ইসমাইলের খবরদারি মানত ও সব ব্যাপারে থাকত প্রতিবাদহীন। এরা বৈঠকখানার বারান্দায় তামাক টানতে টানতে বিল-বাঁওড়ের বা দূর গ্রামাঞ্চলের এমন ধরনের সব গল্পগুজব করত যা শুনে আমি আমার পরিবেশের সাথে মিল নেই এমন একটি ভিন্ন ধরনের দুনিয়ার গন্ধ পেতাম। আমি অবাক হয়ে শুনতাম এদের গল্প। একটুও বানানো নয়। সবই এদের নিজেদের জীবনের চমকে ওঠা কোনো ঘটনা কিম্বা দুঃখ ও উপবাসের কাহিনি।

বাড়ির সকলের রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরা বারান্দায় বসে গল্পগুজব করত। সবার খাওয়া হয়ে গেলে রান্নাঘরে এদের ডাক পড়ত। সবাই যা খেত এদের জন্য সেসব মজার খাবার জুটত না। বরং এদের রান্না হতো আলাদা। তাজা মাছের বদলে শুঁটকির তরকারিই এদের জন্য বরাদ্দ থাকত বেশি। আর চিরকালীন মশুরের ডাল। মাঝেমধ্যে মাছও দেওয়া হত। উৎসবাদিতে মাংসও। তবে এদেরও দেখতাম ঝাল শুঁটকির ভর্তাতেই সন্তুষ্টি। জানি না হয়তো খর রৌদ্রতাপে খালি গায়ে সারাদিন খাটলে মানুষের রুচিও খানিকটা বদলে যায়। তা না হলে সাংঘাতিক ঝালযুক্ত সিদলের ভর্তা নিয়ে এদের এত কাড়াকাড়ি হতো কেন!

আমার মা নানাবাড়িতে বেড়াতে এলে ইসমাইল, তার ছেলেরা ও অন্যান্য খেতমজুররাও খুব খুশি হত। কারণ আমার মা এদের খাওয়ার সময়টায় রান্নার ঘরটা কাজের মেয়েদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের খাস কামরায় চলে যেতেন না। নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ইসমাইলের ছোট রাখাল ছেলে দুটিকে ভালোমন্দ এটা ওটা পাতে ঢেলে দিতেন। অন্যদের আরও ভাত আরও তরিতরকারি দিতে বলতেন। এতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতাম এরা আমার মার অত্যন্ত অনুগত হয়ে থাকত। হেন কাজ নেই যা আমার মা হুকুম করলে এদের অসাধ্য মনে হত। একবার দুর্ভিক্ষের সময় ইসমাইলের পরিবারের দুর্গতির কথা শুনে আমার মা রাতের অন্ধকারে এ বাড়ির জনপ্রাণিরও অগোচরে তার ছেলেদের মাথায় দুটি চালের বস্তা তুলে দিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'সাবধান কাউকে বলবি না। এরা খুব গরিব।'

এই মুনি-মানুষের দলটি রাতের খাওয়া খেয়েই দূরে কোনো গ্রামের দিকে চলে যেত। সম্ভবত এদের গ্রামটি ছিল শহরের পশ্চিম দিকে। নাম উলচাপাড়া। আবার ফিরত সূর্য ওঠার আগেই। ফিরে কেউ লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে মাঠে যেত, কেউ আবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুধাল গাইগুলোকে খইল ভুসি খাইয়ে, দুধ দুইয়ে কাইরা ভর্তি করে আমার মায়ের কাছে পাঠাত। মা শরিকদের মধ্যে বেটে দিতেন। ইসমাইলের ছেলেরা অন্যান্য গরু-বাছুর নিয়ে তিতাসের ওপারে চরাতে যেত।

এবার নানাবাড়িতে আমার ওপর কারো কোনো শাসনের বালাই ছিল না। কেউ খোঁজ-খবর করার তেমন নেই। আম্মা তো জাহান আরাকে নিয়ে অশৌচঘরে। আব্বা দোকানে, নিজেদের বাড়ি তালাবদ্ধ। যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার, দুষ্টুমি করার অবাধ সুযোগ। ইসমাইলের বড় ছেলে, যে আমার চেয়ে বছরখানেক বড়ই হবে, না লতু—লতিফ, তাকে ধরে বসলাম আমাকে বিলের পাড় অর্থাৎ তিতাসের পূর্বদিকে তৃণভূমিতে গরু চরাতে নিয়ে যেতে হবে। আমার অনুরোধে লতুর মন ভেজে না। আমার মায়ের ভয়ে সে ভীত। আমিও নাছোড়বান্দা। শেষে সে নদী পার হওয়ার বিপদের ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে চাইল। গরুর লেজ ধরে নদী পার হতে হয়। সাঁতার না জানলে মাঝনদীতে ডুবে মরার আশঙ্কা।

আমি যখন উৎফুল্ল হয়ে জানালাম 'আমি সাঁতারও জানি' তখন লতুর আর জবাব নেই। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো আমাকে নিয়ে যাবে। তবে এই কথা আমার মা-বাপ অথবা নানা-নানিরা কেউ জানবে না। বলতে হবে এমনি নদীর দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি ঘাড় কাত করে লতুর প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম।

একটা কলারঅলা হাফহাতা গেঞ্জি পরে নিলাম। জুতো খুলে ছুঁড়ে ফেললাম খাটের নিচে। উৎসাহে আর উদ্দীপনায় কাঁপছি। গরুর লেজ ধরে নদী পার হওয়ার রোমাঞ্চকর কাল্পনিক অবস্থা আমাকে মুহুর্মুহু নাড়া দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত গরুর পালের সাথে তিতাসের পাড়ে এসে হাজির। মালগুদামের ঘাটে গরুর লেজ ধরে তিতাসে নামলাম। আজ মনে নেই সময়টা শীতের শেষ না গ্রীষ্মের দিন ছিল। শুধু মনে আছে একটা বৃহদাকার লাল গাইয়ের লেজ ধরে নদী পার হয়ে যাচ্ছি। আমার দুই দিকে অনেকগুলো গরুর পাল সাঁতরে যাচ্ছে। কী যে ভালো লাগছিল আমার! মনে হচ্ছিল বাইরের দুনিয়ার কত কিছুই আমার অজানা।

আমরা তিতাসপাড়ের তৃণভূমিতে এসে উঠলাম। আমার পরনে ছিল লতুর গামছা, মাথায় প্যান্ট ও গেঞ্জি নিয়ার দিয়ে বাঁধা। কূলে পৌঁছে দেখি কোথায় গামছা? একদম দিগম্বর। নদী পার হবার সময় পানির ধাক্কায় গাইয়ের দাবড়ানিতে পরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনভ্যস্ত হাতে পরা গামছাটা ভেসে গেছে। আমি পাড়ে উঠেই মাথায় বাঁধা প্যান্ট খুলে পরে নিতে গেলাম। লতু আমাকে উলঙ্গ দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

আমি দিনের বেলায় রূপকথার এক অফুরন্ত তৃণপ্রান্তরে এসে হাজির হলাম। দূরে দূরে বিলের পাখপাখালি উড়ছে। গরুর পাল আদিম পরিতৃপ্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রান্তরের বিস্তৃত পটভূমিকায়। আশপাশের সমস্ত রাখাল বালকগণ লতুর সাথে এই নতুন রাখালকে দেখে ভিড় করে দাঁড়াল। সুবেশধারী রাখালটিও আত্মীয়ের মতো এদের মধ্যে মিশে গিয়ে আনন্দে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল।

৯

এবার নানাবাড়ি থেকে ফিরে এসেই আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হলো। একজন গৃহশিক্ষক এলেন, নাম শফিউদ্দিন আহমদ। লম্বা ছিপছিপে মানুষটি। জর্জ হাই স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। তাকে আমাদের মসজিদের পূর্বদিকের বৈঠকখানার ঘরটিতে থাকতেও দেওয়া হলো। তার সাথে আমাকেও। এ ব্যবস্থা আমার খুব অপছন্দ হলো। কিন্তু আমাকে যখন বোঝানো হলো আমি আর ছোট ছেলে নই, এখন থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম.ই. স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছি, তখন স্বভাবতই ছোট নই এই সান্ত্বনায় তুষ্ট হয়ে বারবাড়ির ঘরে গৃহশিক্ষকের সাথে থাকতে সম্মত হয়ে গেলাম। আর আমার শিক্ষকও প্রথমদিনই তার স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে আমাকে জয় করে নিলেন। প্রথম পরিচয়ের পর কদমবুসি করে মাথা তোলা মাত্রই তিনি আমার হাতে একটি পুরোনো ছবি ভর্তি বই দিয়ে বললেন, 'তুমি পড়তে পার?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'বানান করে পড়তে পারি।'

'বেশ বানান করে বল তো বইটার নাম কী?'

'ঠা-কু-র মা-র-ঝু-লি।'

আমি বানান করে পড়ে ফেললাম। মাস্টার খুশি হলেন। তার সাথে সাথে আমার আব্বা-আম্মাও খুশিতে হেসে ফেললেন। রাতে খাওয়ার পর আমার বাল্যশিক্ষা, ধারাপাত ও স্লেট পেনসিল নিয়ে আমি বৈটকখানায় থাকতে এলাম। আমার ছোট চৌকিটি মাস্টারের চৌকির পাশেই পেতে দেওয়া হয়েছে। মাস্টার সাহেব আমি ঘরে ঢোকা মাত্রই আমাকে বললেন, 'আজ আর লেখাপড়া নয়, আজ রাতে শুধু ঠাকুর মার ঝুলি। তোমার গল্পের বইটা দাও। আমি পড়ি আর তুমি শোন।'

আমি মহাখুশি হয়ে স্যারের কাছ থেকে উপহার পাওয়া বইটি তাঁর হাতে দিয়ে বাল্যশিক্ষার জঞ্জাল টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখলাম। শুরু হলো বাংলার আদি রূপকথার রাজত্বে প্রবেশ। একদেশে এক রাজা দিয়ে শুরু—অরুণ-বরুণ-কিরণমালা আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির গল্প। গদ্য পাঠে শফি স্যারের উচ্চারণ ছিল সুন্দর, স্পষ্ট। যে শব্দের অর্থ আমি বুঝব না বলে তার ধারণা হত, পড়ার সাথে সাথেই তিনি শব্দটির সঠিক অর্থ বলে দিতেন। বিশ্লেষণ করতেন ঘটনা। ব্যাপারটা আমার শৈশবের বোধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগতে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন যা পরবর্তীকালে আমার সাহিত্য জীবনে মুহূর্তে মুহূর্তে কাজে লাগে।

আমি আগেই লিখতে শিখেছিলাম। আমার অক্ষর হতো আঁকাবাঁকা। লাইন ঠিক থাকত না। অক্ষরের ওপর ঠিকমতো মাত্রা দিতে জানতাম না। শফি স্যার আমার অক্ষরের স্টাইল পাল্টে দিলেন। আজ যখন আমার হস্তাক্ষর দেখে কেউ প্রশংসা করে, যদিও আমার হাতের লেখা তেমন সুন্দর নয়, চকিতের জন্য শফি স্যারের মুখখানি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। লেখা অর্থাৎ হস্তাক্ষর আমার যেমনই হোক না মোটামুটি সোজাই চলে। এটাও আমার সেই গৃহশিক্ষকেরই অবদান। একজন মানুষের জীবনে তার বাল্যের শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবের যে কী প্রভাব তা আজ বেশ বুঝতে পারি।

কিছুদিন পর আমার স্কুলে ভর্তির সময় এল। আমার জন্য একটি খুদে ঘিয়ে রঙের আচকান বানানো হলো। কিনে আনা হলো গাঢ় খয়েরির রুমি টুপি। টুপির মধ্যভাগে আবার কালো চকচকে লোমের জুলফি। সবই কলকাতা থেকে দ্রুত আনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমি স্কুলে ভর্তি হতে চললাম। তার আগে বাড়ির সকল মুরব্বিকে কদমবুসি করে এলাম। আমাকে স্কুলে নিয়ে চললেন আব্বা আর শফি স্যার। আমরা হেঁটে শহর পার হয়ে স্কুলের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে ছোট একটা মাঠ। মাঠের দক্ষিণ দিকে একটা বিরাট বটগাছ। বটগাছের নিচে ছাত্রদের জটলা। টক-ঝাল-মিষ্টির টেবিলপাতা দোকান।

আমি চকিতে আমার বিচরণের নতুন পরিবেশটি দেখে নিচ্ছিলাম। পশ্চিমদিকে অন্নদা হাইস্কুল; স্কুলটির তখন খুব নামডাক ছিল। এই স্কুলটির সামনের রাস্তাটি উত্তর দিক থেকে এসে দক্ষিণে জেলখানার দিকে চলে গেছে। আমি একটু কেমন যেন ভয় পাচ্ছিলাম। ভীতিটা স্কুলে ভর্তি হতে আসার জন্য নয় বরং বাড়ি থেকে শহরের পথ হেঁটে এসে প্রায় দেড় মাইল দূরে এই এম.ই. স্কুল। আমাদের বাড়ির কেউ এতদূর হেঁটে এসে পড়াশোনা করে না। প্রাইমারি শিক্ষা হয় গ্রামের সমিতির স্কুলে ও খ্রিস্টান মিশনের স্কুলে। শুধু আমার বেলায়ই অন্য ব্যবস্থা। আমি ভয় পাচ্ছিলাম প্রতিদিন একাকি আসতে পারব কি না এই ভেবে। যা হোক ভর্তি হয়ে গেলাম। হেড মাস্টার আমাদের বাড়ির নাম শুনে খুব খুশি হলেন বলে মনে হলো। আমি তাকে কদমবুসি করলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। সম্ভবত নাম ছিল উপেন বাবু।

এই স্কুলে আমার আব্বার একজন বন্ধু ছিলেন সালাম মাস্টার। আমাদের পাশের গ্রাম পুনিয়টে বাড়ি। তিনিই আমার ভর্তির সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ভর্তির কাগজপত্র সব ঠিক হয়ে গেলে আমাকে ক্লাসে পৌঁছে দিলেন আব্বা, শফি স্যার আর সালাম মাস্টার। আমি ক্লাস টুতে ভর্তি হলাম। অবশ্য ভর্তির সময় আমার মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিলেন হেড মাস্টার। তিনি খুশি হয়েই আমাকে ক্লাস টুতে ভর্তির অনুমতি দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্কের ক্লাস চলছিল। একজন বেঁটেখাটো শিক্ষক তখন বোর্ডে আঁক কষছিলেন। আমরা দরজায় দাঁড়ালে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। সালাম স্যার এগিয়ে গিয়ে আমার পরিচয় দিলেন, আমার পরিচয় পেয়ে অঙ্কের স্যার হেসে বললেন, 'এতদিন বামুন কায়েতদের চরিয়েছি। এখন আবার মোল্লা এসে হাজির।'

তার কথায় আমার বাপসহ সকলেই হেসে ফেললেন। ক্লাসের ছেলেরাও। আমিও হাসলাম। এই স্যারের নাম ছিল ব্রজেন বিশ্বাস। তাঁর নামটি আমার চিরকাল মনে থাকার কারণ আমি যে বিষয়কে সবচেয়ে ভয় পেতাম, আজও পাই, সে বিষয়টি হলো অঙ্ক। আর ব্রজেন স্যার ছিলেন সেই ভয়াবহ সাবজেক্টেরই অতিশয় উদ্যমি শিক্ষক। এই একটি ব্যাপারে কেউ কোনোদিন তাকে নিরুদ্যম দেখেনি। তিনি বাংলাও পড়াতেন। তবে তাঁর সমস্ত আগ্রহ দেখতাম অঙ্কের ওপর ।

অঙ্কের প্রতি আমার অবহেলার জন্য আজ অবশ্য আমার আফসোসের সীমা নেই। তখন কি জানতাম কবিতা লিখতেও অঙ্কের দরকার হয়? অক্ষরবৃত্ত স্বরবৃত্ত কিম্বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দও অঙ্কবাহিত নিয়মে চলে? আজ অবশ্য আফসোস করে আর কোনো লাভ নেই কারণ বয়সের অঙ্ক এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি গিয়ে কাঁচা-পাকা চুল আর টাকপড়া মস্তকে অনুতাপের হাত বুলাচ্ছে।

আমি ব্রজেন স্যারকে কদমবুসি করে ক্লাসের সর্বশেষ বেঞ্চে কোনো রকমে অন্যদের ঠেলেঠুলে বসে পড়লাম। আব্বা চলে গেলেন। শফি স্যার আমাকে আশ্বাস দিলেন স্কুল শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুলের লাইব্রেরি ঘরে অপেক্ষা করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রথমদিন তেমন কোনো ঝামেলা হলো না। ব্রজেন স্যার শুধু একবার আমাকে পাঁচের নামতা মুখস্থ বলতে বললেন। আমি যথারীতি নামতা বলে গেলাম। আমার এই যৎসামান্য দক্ষতায় দেখলাম তিনি খুশি। সমস্ত ক্লাসের ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছেন। প্রথম বেঞ্চে বসা ফুটফুটে পোশাক পরা চারজন ফর্সা ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই মোল্লার দৌড় মসজিদের চেয়ে একটু বেশি হবে মনে হচ্ছে। ভটচার্য আর চক্কত্তিরা হুঁশিয়ার।'

তখন ব্রজেন স্যারের এ কথার অর্থ না বুঝে হেসেছিলাম, যদিও ফার্স্ট বেঞ্চের যাদের উদ্দেশ্যে বলা তারা কেউ হাসেনি বরং ছিল অতিশয় গম্ভীর ও শীতল। আজ অবশ্য জীবন ও জগতের ঘূর্ণিপাকে পড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিযোগিতার অস্ত্র কবিতার পুষ্পস্তবকের মধ্যে থেকেও বেরিয়ে আসছে দেখে, খানিকটা বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, সৃজনশীল সৌন্দর্য নির্মাণও অপ্রতিদ্বন্দ্বি নয়। নিঃসপত্ন নয়। শিল্পের আঙিনাই হলো প্রকৃত কালসাপের আস্তানা।

ব্রজেন স্যার অঙ্ক বুঝিয়ে তাঁর আসনে বসামাত্র একজন দপ্তরি খাতা নিয়ে এল। রোলকলের খাতা। খাতাটি সম্ভবত এতক্ষণ আমার ভর্তি সংক্রান্ত নাম ওঠানোর কাজে লাইব্রেরিতে কেরানির কছে ছিল। খাতা হাতে পেয়েই ব্রজেন স্যার নাম ডাকা শুরু করলেন। তখনও ক্রমিক নম্বর ধরে রোলকলের প্রচলন হয়নি। ছাত্রের পূর্ণ নাম ও উপাধি উচ্চারণ করে উপস্থিতি মার্ক করা হত। ক্লাসে পঁয়ত্রিশ জনের মতো ছাত্র থাকলেও মুসলমান ছেলে ছিলাম মাত্র দু'জন। আমি ও রহমতউল্লাহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাতায় সর্বশেষ নামটি ছিল আমার। আমার নামের কয়েকটি নাম আগে রহমতউল্লাহ। ব্রজেন বাবু খাতার নামগুলো ডাকতে ডাকতে রহমতউল্লাহর নাম ডাকলেন। আমি চমকে দেখলাম একটি শ্যামলা ছেলে 'প্রেজেন্ট স্যার' বলে উঠে দাঁড়িয়েছে। পোশাক আশাক একটু শ্রীহীন। আমার দিকে তাকাতে তাকাতে সে পাশের বেঞ্চে এতক্ষণ যেখানে বসে ছিল সেখানেই একটু জড়সড় হয়ে বসল। তার বসাটা এমন, যেন তার গায়ে অন্য কারো ঘেঁষাঘেঁষি হলে তাকে কেউ মারবে। আমি প্রথম চাওনিতেই তার অবস্থাটা আন্দাজ করলাম। ক্লাসে মুসলমান ছেলে বলতে আমার আগে মাত্র একজনই ছিল। সম্ভবত সে রহমতউল্লাহ। অধিকাংশই ব্রাহ্মণ সন্তান। পাঁচ-ছয় জন কায়স্থ আর সাহাও আছে।

অঙ্কের পিরিয়ড শেষ হলে ব্রজেন স্যার চলে গেলেন। ক্লাসে একটা গুঞ্জন। সকলেই আমাকে দেখছে। আমার পোশাক আশাকও এতদিন পরে মনে পড়ে বেশ দেখবার মতোই ছিল। শেরোয়ানি, রুমি টুপি আর পায়ে সুন্দর ছোট ফুলতোলা নাগরা। আমি এদিক-ওদিক মুখ ফিরিয়ে সবাইকে ভালো করে দেখে নিচ্ছিলাম। আমার দৃষ্টিটা বিশেসভাবে রহমতউল্লাহর ওপরই ঘুরেফিরে আসছিল। এমন সময় একটা মোচড়ানো কাগজের বল আমার বুকের ওপর এসে পড়ল। প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। পরে কাগজের মোড়কটা কুড়িয়ে এনে খুললাম। দেখি লেখা আছে, 'এই পেতনি শ্যাওড়া গাছে যা।' আমাকেই যে পেতনি বলে সম্বোধন করা হয়েছে এতে আমার কোনো সন্দেহ থাকল না। শুনলাম ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে সুবেশধারী দু'একজন 'টুপিঅলা পেতনি' শব্দটি উচ্চারণ করে হাসাহাসি করল। আমি বুঝতে পারলাম আমি খুব খারাপ জায়গায় এসে পড়েছি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এর মধ্যে ইংরেজি ক্লাস নেওয়ার জন্য হেড মাস্টার এসে ঢুকলেন। তিনি এসে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি ক্লাসের ছেলেদের দিকে ফিরে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'শোন ছেলেরা, এ-হলো মৌড়াইল মোল্লাবাড়ির ছেলে। বাদশা মোল্লার নাতি। এরা কিন্তু সাংঘাতিক লাঠিয়াল বাড়ির ছেলে। এর সাথে ঝগড়াঝাটি মারামারি করবে না।'

আমার নানাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাজারে সবাই বাদশা মোল্লা বলে ডাকত। বাদশা মোল্লা ছিল আমার নানার ডাকনাম। যদিও লাঠিয়াল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা এখন খুব খারাপ শোনায় কিন্তু তখন সেই পরিস্থিতিতে এই পরিচিতিটা খুব ভালো লেগেছিল আমার। হেড মাস্টার পড়িয়ে চলে গেলে ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে খুব ছিপছিপে একটি ছেলে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার নাম ভাস্কর। আমি ক্লাসের ক্যাপটেন।' আমিও উঠে দাঁড়িয়ে আমার নাম বললাম। ছেলেটি বলল, 'আমাদের স্কুলে টু ও থ্রি মিলিয়ে একটা ফুটবল টিম আছে, তুমি খেলবে?'

আমি বললাম, 'না আমি খেলতে পারি না।'

'তোমাদের গ্রামের লোকেরা তো ফুটবলে ওস্তাদ।' বলল ভাস্কর। আমি বললাম, 'আমার মামা-চাচারা সবাই ভালো প্লেয়ার। সবাই খেলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি খেল না কেন?'

'আমার পা ছোট। পায়ে ব্যথা লাগে। হেডও করতে পারি না। মাথায় লাগে।'

আমার কথায় ছেলেটি হাসল। বলল, 'ছুটির পর তোমার সাথে কথা বলব।'

তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খেলাধুলায় বিশেষ করে ফুটবলে আমাদের গাঁয়ের দলটিই ছিল মহকুমার সেরা দল। নাম মৌড়াইল স্পোর্টিং ক্লাব। অধিকাংশ খেলোয়ড়াই বেরুত আমাদের বাড়ি থেকে। বাকিরাও গাঁয়েরই লোক। মৌড়াইল ক্লাবে তখন সবচেয়ে বয়সে তরুণতম প্লেয়ার যিনি খেলতেন তিনি আমার মেজ মামা মহরাজ। পরে তিনি এদেশের একজন সেরা সেন্টার ফরোয়ার্ড হয়েছিলেন। খেলতেন ঢাকা ওয়ান্ডারার্সে।

ছুটির ঘণ্টা বাজলে সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। আমিও বেরুতে যাচ্ছিলাম দেখি ভাস্কর দাঁড়িয়ে আছে। হেসে বলল, 'ওরা তোমাকে পেতনি বলাতে রাগ করেছ?'

আমি বললাম 'হ্যাঁ।'

'ওরা ওরকমই। শুধু শুধু মুসলমান ছেলেদের সাথে লাগে।'

'আমাকে আর পেতনি বললে আমি হেড মাস্টারের কাছে নালিশ করে দেব।'

'নালিশ করেও ওদের সাথে পারবে না। ওরা সব বড় বড় লোকের ছেলে। যে তোমার ওপর কাগজ ছুঁড়েছিল তার নাম বিদ্যুৎ। দারোগার ছেলে। সমীর হলো ডাক্তার কুসুমবাবুর ভাইপো। আর পাশে যে শ্যামলা ছেলেটি বসে, কাশীনাথ। খুব ভালো ছেলে। পড়াশোনায়ও ভালো।' বলল ভাস্কর।

আমি বললাম, 'কেন পারব না। আমাকে গালাগালি দিলে আমিও গালাগালি দেব। আমাকে মারলে আমিও মারব। আমার চাচাও দারোগা জলপাইগুড়িতে।'

আমার কথায় ভাস্করকে মহাচিন্তিত মনে হলো। এদিকে কখন যে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে রহমতউল্লাহ এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। আমার জবাব শুনে রহমতউল্লাহ মহাখুশি। বলল, 'এতদিন আমাকে শুধু পেতনি বলত। এখন বুঝবে মজা। আমিও তোমার সাথে থাকব।'

আমি বললাম, 'তুমি কোন পাড়া থেকে আস?'

'মালগুদামের কাছ থেকে। আমাদের পাড়ার নাম জাল্লাহাটি।' বলল রহমত।

আমি বুঝলাম ছেলেটি মাইমল। জেলেপাড়ার।

ততোক্ষণে ভাস্কর কেটে পড়েছে। আমরা ক্লাসের বাইরে এসে দেখি শফি স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। আমি রহমতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে শফি স্যার বললেন, 'বেশ এখন থেকে তোমরা দু'জন একসাথে স্কুলে আসা-যাওয়া করবে।'

স্যারের কথায় রহমত বলল, 'আমি মোল্লাবাড়ি চিনি। আমার বাজান মোল্লাবাড়ির পুকুরে জাল ফেলতে যায়। একবার আমিও গিয়েছিলাম।'

রহমতের সহৃদয় ভাব দেখে আমার ওকে খুব ভালো লাগল। আমি বললাম, 'কাল তুমি আমাদের বাড়ি আসবে? কাল তো শনিবার হাফ স্কুল। ছুটির পর তোমাকে আমি নিয়ে আসব। আসবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আমরা রহমতকে সদাগর পাড়ার রাস্তার মোড়ে এসে ছাড়লাম।

পরের দিন আব্বা সকালে মেছোবাজার থেকে এক বিরাট রুইমাছ নিয়ে ফিরলেন। এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রহমতউল্লাহ কেরে?'

আমি বললাম, 'আমাদের ক্লাসে পড়ে আমার বন্ধু।'

'রহমতউল্লাহর আব্বা তোকে এই রুই মাছ দিয়েছে।'

আব্বার কথায় আম্মা ছুটে এসে বললেন, 'সে কী!'

আব্বা বললেন, 'আমি তো মাছটার দাম দেওয়ার জন্য লোকটাকে এত সাধলাম কিছুতেই নেবে না। বলে ছেলের দোস্তকে দিলাম। আপনি বাজারে না এলে আমিই মাছ নিয়ে আপনাদের বাড়ি যেতাম। আপনাদের পুকুরে তো আমরাই মাছ জিয়াই। অগত্যা নিয়ে এসেছি।'

আম্মা হেসে বললেন, 'ছেলেটিকে আজই নিয়ে আসিস তো দেখব।'

স্কুলে ভর্তি হয়েই আমি শেষ হয়ে গেলাম। যে পরিবেশে ও কৈশোরিক সারল্যের মধ্যে আমার বেড়ে ওঠার সুযোগ দৈবাৎ আমার ভাগ্য আমাকে দিয়েছিল বিদ্যালয় তা নস্যাৎ করে দিল। স্কুলেই প্রথম আমি সহপাঠীদের কাউকে কাউকে ঘৃণা করতে শিখলাম। নিজের সম্প্রদায় সম্বন্ধে বাল্যের অজ্ঞতার কারণে আমি ছিলাম উদাসীন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আমাকে নিজের অজ্ঞাতেই সাম্প্রদায়িক করে তুলল। স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনই বুঝলাম আমি মুসলমান এবং মুসলমান হওয়ার কারণে স্কুলের সংখ্যাগুরু সহপাঠীদের অবেহলা ও অবজ্ঞার পাত্র। আমি পড়াশোনাকে খানিকটা গুরুত্ব দিলেও আসলে দলাদলি, প্রতিবাদ ও প্রতিকারকেই সম্মানজনক ও শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। ফলে প্রায় প্রত্যহই মারামারি ও মাথা ফাটাফাটির ঘটনা ঘটতে লাগল। উক্ত এম.ই. স্কুলের সর্বশেষ শ্রেণি অর্থাৎ ক্লাস সিক্স-এ উঠে আমি একাডেমিক অর্থে একদম নষ্ট হয়ে গেলাম। আমি যে বছর ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠি ঠিক সেই বছরই বাহাদুর হোসেন খাঁ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণিতে উঠে এম.ই. স্কুল ছেড়ে কুমিল্লা শহরে চলে যান। এতদিন তিনি ছিলেন মুসলমান ছেলেদের নেতা। আমরা সবাই তাঁকে মান্য করে চলতাম। সেই বাল্য বয়সে তাঁর মতো দুরন্ত প্রকৃতির বালক আর একটিও ছিল না। সেই সময়ই তিনি সেতারে নিয়মিত তালিম নিচ্ছিলেন। শুনেছি লেখাপড়ায়ও তেমন মন্দ ছিলেন না। কিন্তু সম্ভবত আমার মতো একই কারণে তাঁরও লেখাপড়া তেমন এগোয়নি। স্কুল ছিল আমাদের জন্য এক বিষাক্ত পরিবেশ। হিন্দু ছেলেরা বাহাদুর হোসেন খাঁর নাম বিকৃত করে 'বাদুইরা' বলে ডাকত। পরবর্তীকালে তিনি যে উপমহাদেশের একজন অসাধারণ সরোদিয়া হতে পেরেছিলেন এর কারণ সম্ভবত তাঁর এক ধরনের জেদি মনোভাব যা প্রতিভাবান মানুষ মাত্রেরই থাকে। তাঁর স্কুল ছেড়ে যাওয়ার পর আমরা মুসলমান ছেলেরা যারা জোট বেঁধে স্কুলে আসা-যাওয়া করতাম তাদের কারোরই একাডেমিক অগ্রগতি তেমন না ঘটলেও পরবর্তী জীবনে কেউ কেরানির জীবনও বেছে নেননি। কেউ হয়েছেন সফল মাছের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবসায়ী, কেউ রেস্টুরেন্টের মালিক আবার কেউবা আমার মতো সামান্য কবি মাত্র। তবে যাকে দাসত্ব কিংবা নির্জীব জীবনের কলের পুতুল বলা যায় তেমন জীবন আমাদের বেছে নিতে হয়নি। আশ্চর্য, আজ এসব চিন্তা করলে কেমন যেন কাকতালীয় বলে মনে হয়।

১০

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন আমাদের এলাকার জন্য অকস্মাৎ ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে। বার্মা জাপানিদের অধিকারে। দলে দলে বাঙালিরা পার্বত্য পথে বার্মার শহরগুলো ছেড়ে স্বদেশের দিকে রওনা দিয়েছেন। যে কোনো সময় বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ওপর জাপানি হামলার ভয়ে দেশবাসী আতঙ্কগ্রস্ত। আখাউড়ার কাছে সিঙ্গারবিলে মিত্র-শক্তির বিশাল ঘাঁটি স্থাপন করা হলো। আমাদের এলাকার ওপর দিয়ে দেশ-বিদেশের সৈন্য চলাচল ও আহতদের এ্যাম্বুলেন্স রেলকারের আনাগোনা এমন পর্যায়ে উপনীত হলো, স্টেশন সংলগ্ন হওয়ায় আমাদের বাড়ির মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত দু'চোখের পাতা এক করতে পারত না।

কুমিল্লা ও নোয়াখালী থেকে অনেক স্কুল, কলেজ, আদালত ও সরকারি অফিস ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরিয়ে আনা হলো। আমাদের বিখ্যাত কাপড়ের দোকানটি ফেল মারল। কারণ পরিধেয় কাপড়ের অভাবে দোকানটি আর চালানো সম্ভব ছিল না। আব্বা দোকান বন্ধ করে দিয়ে বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস অফিসার পদে চাকরি নিয়ে ট্রেনিং নিতে চলে গেলেন। আমাদের শফি স্যারও কলেজ ছেড়ে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে পশ্চিম ভারতে চলে গেলেন। সব ব্যাপারই কেমন যেন একটু ওলটপালট হয়ে গেল।

আমার স্বাধীনতার কোনো সীমা নেই। স্কুলে ঠিকমতো গেলেও সবগুলো ক্লাস ঠিকমতো করি না। এর মধ্যে আমার এক নতুন বিষয়ের দিকে ঝোঁক পড়ল। নেশার মতো পেয়ে বসল রোমাঞ্চকর বই পড়ার অভ্যাস। আর ছুটিছাটার দিনে গুলতি দিয়ে পাখি শিকারের শখ। পক্ষি হত্যার এ নেশা আমাকে কেন পেয়ে বসেছিল তা এখন সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়তো সম্ভব নয়, তবে মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে উদাস হয়ে বিচরণের আমার যে স্বভাব রয়েছে সম্ভবত এর টানেই আমি গুলতি হাতে গাছ-গাছালি বিল-বাঁওড় ও নদীর তীর ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

এ সময়ের একটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে আজ দাগ কেটে বসে আছে। আমি প্রায়ই সৈন্যবাহী রেলগাড়ি দেখতে স্টেশনে যেতাম। একদিন একটি মিলিটারির গাড়ি এসে স্টেশনে থামল। আমি গুলতিটা পকেটে রেখে গোরা সৈন্যদের কম্পার্টমেন্টগুলো দেখে বেড়াতে লাগলাম। স্টেশনে অসংখ্য ছেলেপিলে বকশিশের লোভে গড়িটাকে ঘিরে ধরেছে।

এমন সময় একটি আঠার-উনিশ বছরের মেয়েকে দেখলাম বেশ সেজেগুঁজে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। সেও আর সবার মতো 'সাব বকশিশ' বলে ভিক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইছিল। গোরা সৈন্যরা তাকে দেখে দারুণ উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল। সবাই ইঙ্গিতে তাকে ডাকছে। মেয়েটিও বেহায়ার মতো হেসে হেসে এক কম্পার্টমেন্টের কাছ থেকে অন্য কম্পার্টমেন্টের কাছে যাচ্ছে। হাতে 'ভি' সিগারেট। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অসম্মানজনক মনে হওয়ায় আমি মেয়েটিকে হাতের ইশারায় ডাকলাম। প্রথম সে আমার ইঙ্গিতকে মোটেই পাত্তা দিল না। পরে কী ভেবে যেন আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'সোলজারদের গাড়ির কাছে কেন এসেছিস? ভাগ এখানে থেকে। এরা খারাপ মানুষ।'

মেয়েটি বলল, 'আমি এসেছি তাতে তোর কী?' আমি পকেট থেকে গুলতি বের করে বসলাম, 'পালা এখান থেকে। নইলে গুলি ছুঁড়ে তোর মাথা ভেঙে দেব আমি।'

'ইস। মার তো দেখি।'

এমন সময় হঠাৎ গাড়ি হুইসেল দিয়ে চলতে শুরু করেছে। মেয়েটি আমাকে রেখে গাড়ির দিকে 'সাব বকশিশ' বলে দৌড়াল। সে গাড়ির কাছে পৌছানো মাত্র দু'জন গোরা সৈন্য তাকে প্রায় ছোঁ মেরে পাঁজাকোলে করে গাড়িতে তুলে নিল। আমি অপমান ও অদৃশ্য আঘাতে রক্তাক্ত হলাম মাত্র। এই প্রথম বুঝলাম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কাছে সামাজিক ইজ্জতের কোনো মূল্য নেই।

বহুদিন পরে এই মেয়েটিকে আমি আবার দেখতে পেয়েছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মাঝামাঝি যে সেতুটি আছে সেখানে সারা গায়ে কাপড় জড়িয়ে ভিক্ষা করতে! তার শরীর ঘায়ে ভর্তি। দুষ্ট ক্ষত থেকে রস গড়িয়ে পড়ছিল। কিছুদিন পরেই সে কালরোগে রাস্তার ওপর মরে পড়ে ছিল। হতভাগীর এই পরিণামে আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।

স্কুলে দু'একটি পিরিয়ড কোনো রকমে কাটিয়েই পালাতে লাগলাম। প্রথমদিকে স্কুল পালিয়ে কোথায় সময় কাটাব এটা ছিল একটা দারুণ সমস্যা। আমি যে ঠিকমতো স্কুলে থাকি না এ কথা জানাজানি হলে রক্ষা থাকবে না—এ ভয় সব সময় তাড়া করত। প্রধান ভয় ছিল সালাম স্যারকে। যদিও ষষ্ঠ শ্রেণিতে তিনি আমাদের কোনো ক্লাস নেন না এটাই ছিল একমাত্র ভরসা। তবে মাঝেমধ্যে স্কুলের বারান্দায় কিম্বা লাইব্রেরি ঘরে তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি পড়াশোনার ব্যাপারে তাগাদা দিতেন এবং ঠিকমতো লেখাপড়া করার উপদেশ দিতেন।

স্কুল পালিয়ে সময় কাটাবার জায়গা হিসেবে লোকনাথ পার্কের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের বিশাল দুটি কড়ই গাছের তলাকে বেছে নিলাম আমরা। আমি, রহমতউল্লাহ, জবান, চান্দমিয়া আর আরিফ মিয়া বলে একটি দুর্দান্ত ছেলে একজোট হয়ে স্কুল পালানোর ব্যাপারে বেশ পাকা হয়ে উঠলাম। আমাদের আড্ডার একমাত্র বিষয় ছিল বালকসুলভ অ্যাডভেঞ্চারের গালগল্প। আমাদের একমাত্র পাঠ্যবিষয় ছিল দুঃসাহসিকতাপূর্ণ উপন্যাস, গোয়েন্দা গল্প ও ভ্রমণ কাহিনি। আর স্বপ্ন, বাড়ি থেকে দেশ-দেশান্তরে পাড়ি জমানো। আজ স্বীকার করি আমাদের স্বপ্ন-কল্পনা স্বাভাবিক ছিল না। আমরা ভাবতাম আমরা একদিন জগতের অশেষ উপকার করতে নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলিয়ে দেব। গোয়েন্দা গল্প উপন্যাস পড়ে ভাবতাম আমরা গোয়েন্দা হব। আবার কখনও মনে হতো এর চেয়ে বরং দয়ালু ডাকাত হওয়াই ভালো। ধনীদের ধন কেড়ে নিয়ে গরিব নিঃস্বদের বিলিয়ে দেওয়া যাবে। কখনও ভাবছি কোনো অগম্য পর্বত, সমুদ্র কিংবা মরুভূমিতে বেরিয়ে পড়লেই বুঝি মানবজীবনের সার্থকতার স্বাদ পাওয়া যাবে। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের বাইরে যা কিছু আমরা পড়তাম সবই আমাদের ভালো লাগত। শুধু স্কুলের বই পড়া ভালো লাগত না। কারণ স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে আমাদের জন্য কোনো স্বপ্ন ছিল না। স্কুল আমাদের শুধু মানুষ হওয়ার জন্য বেত মারত। কিন্তু 'মানুষ'-এর যে দৃষ্টান্ত সে সময় আমাদের সামনে ছিল তা আমাদের মনঃপুত ছিল না।

ক্লাসের সবচেয়ে নীরস গোমরামুখ ছেলেটি ছিল সবচেয়ে ভালো ছাত্র। সে হাসত না। দিনরাত তার একমাত্র কাজ ছিল উবু হয়ে অঙ্ক নিয়ে পড়ে থাকা। কিম্বা পড়া মুখস্থ করা। তাকে সবাই ভালোবাসাত। শিক্ষকগণ সকলেই ছিলেন তার প্রতিই যত্নবান। তাকে সবাই ঠেলত বেশি নম্বরের দিকে। পড়তে পড়তে তার চোখ দুটি ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। বড় হয়ে সে নিশ্চয়ই মানুষ হয়েছিল। আমরা কেউ জানি না সে কতবড় মানুষ হতে পেরেছিল। শুধু এটুকু আন্দাজ করি অনেক মানুষের ভিড়ে সে হারিয়ে গিয়েছে।

আমরা একই ক্লাসের আরও কয়েকজন হতভাগ্য ঠিকমতো মানুষ হতে পারিনি বলে সত্যিকার মানুষের ভিড়ে মিশে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিনি। মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের যেহেতু কোনো পরিকল্পনাই ছিল না, সে কারণে বখাটেরা যেভাবে বেড়ে ওঠে তেমনি আমরাও আমাদের ইচ্ছামতো গাছের মতো আকাশের দিকে মাথা তুলতে চেয়েছি। এতে যে খুব একটা খারাপ জীবন কাটিয়েছি এটাও ঠিক নয়। মানি আমাদের জীবনও নিরবচ্ছিন্ন সুখে কেটে যায়নি। তবে নিঃসীম দারিদ্র্যের মধ্যেও মোটামুটি স্বপ্নের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। যেসব শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাদের মানুষ করতে পারেননি বলে একদা অনুতপ্ত ছিলেন, কেন জানি মনে হয়, আমরা সেই গুরুজনদের চেয়ে মন্দ জীবন কাটাইনি। আজও যখন মাঝেমধ্যে কোনো শিক্ষকের সাথে কালেভদ্রে কিম্বা দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়, নত হয়ে কদমবুসি করে দাঁড়ালে তিনি মাথায় হাত রেখে যে কথা বলেন তাতে মনে হয় না একেবারে বয়ে গেছি।

গল্পের বই আমাকে স্বপ্ন ও কল্পনার রাজ্যে প্রবেশের যে চাবিকাঠি হাতে তুলে দিল তার নাম ভাষা। রোমাঞ্চকর কাহিনি কল্পনাকে ব্যক্ত করতে আমার তৎকালীন প্রিয় লেখকগণ আমাকে শেখালেন প্রতিটি শব্দের যেমন সম্ভবপর অর্থ আছে, তেমনি আছে এক এক জাতের অদ্ভুত গন্ধ। আমি যথেচ্ছ পড়াশোনার মধ্যে যেমন কল্পনার খোরাক পেতাম, তেমনি শব্দের অন্তর্গত সৌরভও টের পেতাম। আমার অজ্ঞাতেই আমি কিশোর বয়সেই বাংলাভাষায় লিখিত যে কোনো পুস্তকের অন্তর্বস্তুকে অধ্যয়নের দ্বারা অন্তত উপলব্ধি করতে পারতাম। কেউ কেউ বলেন, ভাষাই নাকি মানব সন্তানের ব্যক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়। যে উপায় ধীরে ধীরে অসচেতনভাবে আমার নামমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়ত্তে এল। এ শক্তি নিয়ে আমি কী করব ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে দিনরাত এর চর্চায় মেতে থাকলাম। শুধু বই আর বই। পড়ার টেবিল অপাঠ্য বইপত্রে ভরে গেল। খেলাধুলা বা সাধারণ আমোদ-আহ্লাদ পরিত্যক্ত হলো। যেখানে বই পাওয়া যায় সেসব বইয়ের দোকানে বা সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়া আর কোথাও যাতায়াত রইল না।

এর মধ্যে এসে গেল পরীক্ষা। পরীক্ষার সময়ও গল্পের বই পড়া বন্ধ রইল না। শুধু মাঝেমধ্যে পাঠ্য বইপত্রে অনিচ্ছায় চোখ বুলিয়ে যাওয়া। সামনে আতঙ্ক। সারা বছর এক পাতাও পড়িনি। ঠিকমতো ক্লাস করিনি। এখন নিরুপায়। সারা বছরের পরিশ্রম এক-দেড় মাসে উতরানো অসম্ভব জেনেও পরীক্ষা দেব স্থির করলাম। দারুণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পরীক্ষা শেষ হলো। ফল বেরুলে দেখা গেল পাসের তালিকায় নাম আছে যদিও সে নাম দীর্ঘ তালিকাটির বেশ একটু নিচের দিকে। এম.ই. স্কুল শেষ।

জর্জ হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। এবার স্কুল আমার বাড়ির লাগোয়া। পুরোনো বন্ধুরা কে কোথায় হারিয়ে গেল আর পাত্তা রইল না। আর নতুন স্কুল, নতুন বন্ধুত্বের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল বই। আমার আর কোনো বন্ধু রইল না। একা থাকতে একা ঘুরে বেড়াতে শিখলাম। এদিকে আবার পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অমনোযোগ আরও বাড়ল। কৈশোর যার প্রগলভতায় ভরা হঠাৎ বায়োসন্ধিতে এসে সে হয়ে গেল স্বল্পবাক। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একদা যে ছিল খুঁতখুঁতে স্বভাবের হঠাৎ সে সামনে যা খাদ্য হিসেবে দেওয়া হয় তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে খেয়ে চলে যায়। ভুল করে আম্মা ব্যঞ্জনের কোনো পদ পাতে ঢেলে না দিলে তা জিজ্ঞেস করে খাওয়ার সামান্যতম চেষ্টাও করি না।

'মাছের কিমা আর একটু নিবি?'

'সামান্য দিন। খাওয়া তো হয়েই গেছে।'

'শুধু কিমা দিয়েই তোর খাওয়া হয়ে গেল? সামনে যে এতগুলো তরিতরকারি রইল?'

'আমি আর কত খাব?'

আমার কথায় আম্মা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন, 'তোর কী হয়েছে? আমার রান্না তোর রোচে না কেন রে?'

'কী যে বলেন আম্মা! আপনার রাঁধা ছাড়া আমাদের ভাই-বোনদের কারো কোথাও পেট ভরে?'

'তাহলে সারাদিন যে এত কষ্ট করে এই দুর্দিনে এতগুলো সালুন রাঁধলাম, তুই তো শুধু সামনের বাটিটার কিমাটুকু দিয়েই খেয়ে উঠে গেলি। আসলে তোর হয়েছেটা কী?'

'কী আবার হবে। কিমাটা কি মজার, এটা দিয়েই সব ভাত খেয়ে নিলাম।'

বলে পালাতে চাইলাম।

আম্মা ফাঁকিটা ধরে ফেললেন, 'দাঁড়া, আমার সাথে মিথ্যা বলছিস। আমি বুঝি তোর খাওয়া দেখিনি। কিমার পেয়ালার বদলে তেতো শাকের বাটি থাকলে তুই তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে খেয়ে চলে যেতি। তোর মনোযোগ আজকাল খাওয়ার দিকে না। টেবিলের ওই অলুক্ষুণে বইগুলোর দিকে। এত পড়ে তোর আবার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো?'

আমি হাসলাম। আম্মাকে ভড়কে দেওয়ার জন্য বললাম, 'বোধহয় মাথাটা আমার সত্যিই খারাপই হয়ে গেছে। নইলে টাকি মাছের ঝাল ভর্তা এত মজা লাগে?'

'দেখ, আমাকে ভোলাবি না। আমি জানি তোর আর আগের মতো ঝাল-কোর্মার তারতম্য নই। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই। উরুতের ওপর বই রেখে খাওয়া শুরু করিস। বুকের ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়িস। তাও ক্লাসের বই না। যতসব বাজে বই! আমি বুঝি না ভেবেছিস? এসব পড়ে কী হবে? বাড়াবাড়ি করলে আমি তোর আব্বাকে চিঠি লিখে সব জানিয়ে দেব।'

বুঝলাম আমার আচার-আচরণে আম্মা তেমন স্বস্তি পাচ্ছেন না। আমি আম্মাকে আর ঘাঁটালাম না। যতদূর সম্ভব খাওয়ার সময় পঠিত রোমাঞ্চকর কাহিনির আমেজ মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ব্যঞ্জনের সবগুলো বাটিতেই চামচ ঢোকাতে লাগলাম। আগে পড়ার ঘরে বসেই 'বাজে বই' পড়তাম। এখন কোনো নির্জন জায়গা বা বৃক্ষছায়ায় গিয়ে গল্পের বই খুলে বসতে লাগলাম। আগে অন্ধকার রাতে কিম্বা কোনো নির্জন প্রান্তরে একাকি থাকতে জিনটিনের ভয় করত। এখন কবরস্থান বা কোনো শ্মশানঘাটেও যদি গল্পের বই পড়তে পড়তে রাত নেমে আসত আমার ভয় করত না।

বয়োসন্ধির এই অদ্ভুত অবস্থায়, যেখানে বাচালতা ও অস্থিরতার বদলে হাজির হয়েছে গাম্ভীর্য, আমাকে আমার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। আমার আচরণ আমার বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক ছিল না। সবাই যখন লাফ-ঝাঁপ ও খেলাধুলায় চারধারে আনন্দে ভেঙে পড়েছে, আমি তখন বই নিয়ে খেলার মাঠের একপাশে স্কুলের নির্জন বারান্দায় 'চাঁদের পাহাড়' বা মার্কোপলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে আমার পরিবেশের উচ্ছলতা থেকে অনেক দূরে। বই আমাকে তখন রোমান্টিক বা কাল্পনিক বর্ণনাভঙ্গির ছদ্মাবরণে পৃথিবীর মানচিত্রটি কেমন, কোথায় কী আছে, মানুষজন, ভাষা, পোশাক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রহস্যময় ভৌগোলিক বিবরণের উৎস খুলে দিচ্ছিল। আমার এই পরিবর্তন আমাদের পরিবারের কারো কাছেই স্বাভাবিক ছিল না। আমার আম্মা তো আমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেনই দূরে থেকে আব্বাও ভাবনার মধ্যে পড়ে গেলেন। আমার নিঃসঙ্গতা এমন নির্মমভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরল যে সমবয়স্কদের সাথে বিশ্রী একটা ব্যবধান রচিত হয়ে গেল। এরা আমাকে নিয়ে আড়ালে-আবডালে ঠাট্টামস্করা করতে লাগল। সবার অলক্ষ্যে আমার উপাধি হয়ে গেল 'কবি'। যদিও তখনও আমি কবিতার প্রতি কোনো ধারণার ধারে কাছেও যাইনি। পরিবেশ এর উন্মুক্ত আত্মীয়তা থেকে আমাকে চিরকালের জন্য নাকচ করে দিল। আজ মনে হয় আমার যারা তখনও বন্ধু হতে পারত তারা শুধু না বোঝার কারণে আমার লঘু অপরাধের জন্য আমাকে অত্যন্ত নির্মম গুরুদণ্ড দিল। বাকি জীবন আমি আর মানুষের বন্ধুত্ব অর্জন করিনি। করতে পারিওনি। চাইওনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এ সময় আমাকে সহানুভূতি জানাতে অত্যন্ত দৈবভাবে হাজির হলেন এক যুবতি। আমার এক ফুপাতো বোন। নাম সাদেকা। অসাধারণ রূপসী ও পরিচ্ছন্ন নারী।

আমার আব্বার একজন মাত্র সহোদরা বোন ছিলেন। যিনি একটিমাত্র সন্তান রেখে অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যাকে আমি কোনোদিন দেখিনি। এমনকি তাঁর নামটিও স্মরণে রাখিনি। শুধু মনে পড়ে বাড়িতে তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে আব্বা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে থাকতেন। তাঁকে সবাই ডাকত সাদুর মা বলে। তাঁর আঙ্গিক গঠন সৌন্দর্যের বর্ণনা আমি আমার মায়ের কাছে শুনতাম। আম্মা বলতেন, আমার সেই ফুপু নাকি ছিলেন হুবহু আমার আব্বার মতো। দীর্ঘাঙ্গী ও গৌরবর্ণা। অত্যন্ত তেজস্বী মহিলা ছিলেন। বাবুরখণ্ড বলে একটা জায়গায় তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কী কারণে বা কোন অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তা আমার জানা নেই। তবে এটুকু মনে আছে তাঁর সুন্দর সুপুরুষ স্বামী মাঝেমধ্যেই আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং খুব কান্নাকাটি করতেন। আমার মা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বাড়ির অন্য কেউ তাঁর প্রতি তেমন সহানুভূতি দেখাতে এগিয়ে আসত না। শুনেছি আমার ফুপা ফুফুর মৃত্যুর পর তার ফেলে যাওয়া একটি সন্তানের লালন পালনের জন্য আমার আরও এক ফুপুকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আমার আব্বার আরও এক সৎ বোনকে। কিন্তু আমাদের পরিবার এতে আর সম্মত হয়নি। পরে আমার ফুপা অন্যত্র বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন।

সাদেকা আমার সেই না-দেখা অকালমৃতা ফুপুর একমাত্র সন্তান। ইতিপূর্বে আমার এ বোন কালেভদ্রে আমাদের বাড়িতে আসতেন। এবার এলেন স্থায়ীভাবে বেশ কিছুদিন থাকবেন বলে। আম্মা সাদু বুবুকে পেয়ে খুব খুশি। তাঁর আসা অবধি সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সব কাজই তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ল। বুবু তা পারতেনও। সব সময় তাঁর সুন্দর মুখটিতে হাসিটি লেগে থাকত। আমার প্রতিই তাঁর আদর পড়ল বেশি। আমি কোথায় যাই, কী করি, কী পড়ি ও কখন ঘুমাই এসব নিয়েই তিনি এক উদ্বেগাকুল বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন। স্নেহ-মমতায় ভরিয়ে দিলেন আমাকে।

তিনি ছিলেন আমার থেকেও কমপক্ষে চার-পাঁচ বছরের বড়। পূর্ণ যুবতি ও অতিশয় সুরুচিসম্পন্না, সুবেশধারিণী।

এ সময়টায় আমার ওপর মানুষের অবজ্ঞা এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, আমি একটা মমতার আশ্রয় হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। যা মানুষ মায়ের কাছে পায় না, সমবয়স্ক না হলে অন্য কারো কাছেই দাবি করতে পারে না। হঠাৎ প্রায় আকস্মিকভাবে সাদু বুবু আমার জন্যে তা নিয়ে এলেন। তিনি এসেই আমার মৃদু সমালোচনা করতে লাগলেন। আমার পোশাক-পরিচ্ছদের অমনোযোগিতার নিন্দা করে নিয়মিত এসব ধুয়ে দিতে লাগলেন। আমার ইতস্তত ছড়ানো পুস্তকের স্তূপ সাজিয়ে-গুছিয়ে যেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে থাকা উচিত সেটা সেখানেই রাখলেন। বাড়িঘরে একটা শ্রী ফিরে এল। মোট কথা, তিনি আমাকে শাসন করতে শুরু করলেন।

সাদু বুবু আসাতে আমার থাকার জায়গাটি আবার বসতঘর থেকে মসজিদ সংলগ্ন বাইরের ঘরে পরিবর্তিত হলো। তখন আগের সেই ইমাম সাহেব ছিলেন না। যিনি নতুন ইমাম হিসেবে আমাদের মসজিদে নামাজে ইমামতি করতেন তিনি এখানে থাকতেন না। দূর কোনো গ্রাম থেকে এসে আবার প্রত্যহ সেখানে ফিরে যেতেন। আমি বারবাড়ির ঘরটাতে একদম একা থাকতাম। মাঝে মাঝে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আম্মাকে সাথে নিয়ে সাদু বুবু আমাকে দেখতে আসতেন। একদিনের একটি স্মরণীয় ঘটনা আজ খুব মনে পড়ছে। আমি অত্যন্ত নিবিষ্ট মনোযোগে একটা উপন্যাস পড়ছি। রাত প্রায় এগারটা হবে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঝিঁঝির শব্দে মুখরিত হচ্ছে আমার ঘরের পাশের অন্ধকার নিচু জমিটা। এমন সময় সাদু বুবু জানালায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'তুই এখনও পড়ছিস? তোর ঘুম পায় না?'

আমি বললাম, 'কে, বুবু?'

'খোল।'

আমি দরজা খুলে দিলাম।

বুবু ঘরে এসে আমার বিছানায় বসলেন।

আমি বললাম, 'এত রাতে বুবু তুমি একা এলে?'

'নারে। তোদের বাড়িতে দিনেই মেয়েরা একা চলে না আর রাতে আমি আসব একা! তোর মাও আসছে। তোর জন্য একটা খবর আছে।'

'কী খবর?'

আমি চমকে উঠলাম। বুবু মুখে শাড়ির পাড়টা তুলে হাসল, 'তোর মার কাছে শুনবি।'

'না, তুমিই বল। আমি এক্ষুনি শুনব। কোনো দুঃসংবাদ?'

'তোর জন্য অবশ্য কোনো দুঃসংবাদ নয়। আমার জন্য চিন্তার বিষয়।'

আমি বুবুর কথার হেঁয়ালি ধরতে না পেরে টেবিলের ওপর খোলা বইটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালাম। বুবু তখনও মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে। আমি ঔৎসুক্য চেপে রাখতে না পেরে বুবুর হাত ধরে ফেললাম, 'কী ব্যাপার সাদু বুবু? বল না কী খবর!'

বুবু আমার হাতের ওপর তার হাতটা রেখে আমার দিকে গম্ভীর স্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন। গলায় খুব মায়া মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি চলে গেলে তুই ঠিকমতো নাওয়া-খাওয়া করিস। স্কুলে যাস। লেখাপড়া না শিখলে কী করে খাবি? মামুর আগের অবস্থা তো আর নেই। তোদের ব্যবসা-বাণিজ্য, জমাজমি সবই তো গেছে। তুই মানুষ হতে না পারলে তোর মার দুঃখ ঘুচবে না।'

সাদু বুবুর এ ধরনের কথায় আমি আকাশ থেকে পড়লাম। অবাক হয়ে বললাম, 'চলে তুমি যাবে কেন? তোমাকে চলে যেতে দিচ্ছে কে? কোথায় যাবে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি বুঝি চিরদিন তোর কাছে থাকব? আমার বাড়িঘর নেই?' হাসলেন সাদু বুবু। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি তখনও ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম। বুবু আমার অবস্থা আন্দাজ করে ম্লান হাসলেন। আমি লণ্ঠনের আলোয় তার টানা দুটি চোখের কিনার উপচানো অশ্রু চিকচিক করতে দেখলাম। সাদু বুবু বললেন, 'আমি তোদের ছেড়ে এ সপ্তাহে বাবুরখণ্ড চলে যাচ্ছি। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আজ সকালে আব্বা এসেছিলেন নানাকে আর তোর মাকে খবর দিতে। দুপুরের গাড়িতে আশুগঞ্জ চলে গেছেন তোর বাপকে জানাতে। বুঝলি!'

আমি অবশ্য কিছুই বুঝলাম না। বুবু হেসে বললেন, 'আগামী মাসের বার তারিখে আকদ। তুইও যাবি।'

'তোমাকে ফুপা বিয়ে দিচ্ছে কেন, আব্বা তো বলেন, আব্বাই বিয়ে দেবেন।'

'সবাই মিলেই তো দিচ্ছে, হতভাগা! এত বই পড়েও তুই এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেলি।'

আজ মনে পড়ে আমি সত্যিই ছেলেমানুষই ছিলাম। হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেললাম, 'সাদু বুবু, আমিই তোমাকে বিয়ে করব। আমাদের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না।'

আমার কথায় সাদু বুবু হঠাৎ আমার হাতের ওপর থেকে তার হাতটা টেনে নিয়ে বজ্রাহতের মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর খিল খিল করে হেসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। আমিও আমার আকস্মিক দিশেহারা ব্যবহারে বেশ লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সাদু বুবুর হাসি আর থামে না। আমি দেখলাম মহাবিপদ, এক্ষুনি যদি আম্মা এসে হাজির হন তবে কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। আমি উবু হয়ে সাদু বুবুর পা ধরে কেঁদে ফেললাম। কী বলতে কী বলে ফেলেছি। 'বুবু, তুমি মাফ করে দাও।'

সাদু বুবু হাসি থামিয়ে আমাকে ঠেলেঠুলে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর ঠোঁটে একটা দুষ্টুমির হাসি খেলছে। আমি বললাম, 'আমাকে মাফ করে দাও বুবু।'

'আমি তোকে কোনোদিন মাফ করব না। কেন মাফ করব? আমাকে এত ভালোবাসিস যদি তবে আমার এত ছোট হয়ে জন্মালি কেন?'

আমি বার বার বলতে লাগলাম, 'আমাকে মাফ করে দাও বুবু, আমার বেয়াদপি হয়েছে। তুমি যাবে ভয়েই আমি দিশেহারা হয়ে একটা বাজে কথা বলে ফেলেছি।'

বুবু অনেকক্ষণ খিল খিল করে হাসলেন। হাসতে হাসতে তার চোখ পানিতে ভিজে গেল। তিনি শাড়ির খুঁট দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, 'তুই তো ঠিকই বলেছিস। তোর মনের কথা বলেছিস। আমি যদি জানতাম তোর মতো সরল আর সাহসি মামাতো ভাই একটা থাকবে তবে দুনিয়ায় আমি আরও পাঁচ-ছয় বছর পরে জন্মাতাম। চোখ মুছে ফেল, ওই যে মামি আসছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালা দিয়ে দেখলাম মসজিদের পাশ ঘেঁষে আলতো পা ফেলে আম্মা আসছেন। আমি নিজেকে সম্বরণ করে নিলাম।

সাদু বুবুর বিয়েতে আমার চাচা, আব্বা ও আমি বাবুরখণ্ড গিয়েছিলাম। আজ এতটুকু মনে আছে। এ বিয়েতে আমার বাপ-চাচারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। দাদারও দারুণ অসম্মতি ছিল। কসবার দিকে এক বড় গৃহস্থবাড়িতে সাদু বুবুর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের আসরে আমার বাপ-চাচারা উপস্থিত থাকলেও কী একটা খটকা ধরে বিয়ের ভোজে তারা অংশ নেননি। আমাকেও নিতে দেননি। শুধু বিয়ের সাজে সজ্জিতা সাদু বুবু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, 'তুই কিন্তু আমাকে দেখতে যাস। তুই গেলে বুঝব আমার একজন আত্মীয় আছে। অন্তত একজন ভাই তো আছে।'

আমি সাদু বুবুকে কথা দিলাম মাঝেমধ্যে তাঁর শ্বশুরবড়িতে তাকে দেখতে যাব। সাদু বুবু তাঁর মেহেদি পরা হাত দিয়ে শাড়ির খুঁট তুলে চোখ মুছে নিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। আমার বাপ তাঁর একমাত্র সহোদর বোনের সন্তান, আপন ভাগ্নিকে চিরকালের মতো ত্যাগ করে এলেন। কোনোদিন আর তাকে এক মুহূর্তের জন্য দেখতেও যাননি। আমিও কথা রাখতে পারিনি। বহুকাল যাবত আমি সাদু বুবুকে দেখতে যাইনি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক বিপাকে পড়ে দেশের সীমান্ত পার হওয়ার সময় ঘণ্টাখানেকের জন্য সাদু বুবুর শ্বশুরবাড়িতে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল। আমার পরিচয় পেয়ে সাদু বুবু দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সাদু বুবু উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার কাপড় পড়ে গেছে। তাঁর কোঁকড়ানো সুন্দর চুলে শাদার ছিট লেগেছে। হাত চেপে ধরে বললেন, 'তুই এসেছিস?'

আমি কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাদু বুবুর জোয়ান ছেলেরা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সালাম জানাল। এদের বাপ মারা গেছে বছরখানেক আগে। তাকে মাত্র একবার সেই বিয়ের আসরে দেখেছিলাম। সাদু বুবু যখন জানলেন আমি উঠোন থেকেই চলে যাচ্ছি, দাঁড়ানোরও সময় নেই তখন হু হু করে কেঁদে ফেললেন।

১২

সাদু বুবু চলে গেলে আমাদের বাড়িটা, আমার পরিবেশের শূন্যতা যেন আমাকে গ্রাস করে ফেলল। আর দুর্ভাগ্য নেমে এল চতুর্দিক থেকে। সারা উপমহাদেশে প্রবল গণআন্দোলন। স্বাধীনতার দাবিতে আমাদের বাড়ির মানুষও একটু নতুন রাজনৈতিক স্বপ্নে উত্তেজিত। ক্লাসের পড়াশোনা একদম ভালো লাগে না। এদিকে আবার আব্বা-আম্মার উপর্যুপরি গালমন্দের ঠেলায় গল্পের বই ইত্যাদি টেবিল-আলমারির তাক থেকে অপসারিত। ঠিক এ সময়টায় দেশব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামার মুখে দেশ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন আগে আমার নানা মীর আবদুর রাজ্জাক (বাদশা মোল্লা) ইন্তেকাল করেন। আমার মামারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনও এতবড় একটা সম্পত্তি অর্থাৎ নানার জায়গা-জমি-দোকানপাট ঠিকমতো চালাবার মতো সাবালকত্ব অর্জন করেননি। তাঁরা তখনও ভাবতেন, তাঁদের ধনবান পিতার অক্ষয় ভাণ্ডার যেমন ছিল তেমনি থাকবে। অথচ আমার নানার ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা জমি-জিরাতের আয় ধীরে ধীরে পতনোন্মুখ গতিতে নেমে আসছিল। আমার আজ ধারণা হয় আমার নানা যে অকস্মাৎ এক সন্ধ্যায় তাঁর বৈঠখানা ঘরে বর্গাচাষিদের আসরে ফারসি হুঁকো টানতে টানতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, এর কারণ হলো তাঁর ব্যবসায়ের এবং চাষবাসের ক্রমাগত পতনের দুশ্চিন্তা। নানার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। তাঁকে তার বিষয়-আশয়ের বিনাশ ও সন্তানদের পরিণাম দেখে যেতে হয়নি। একদিন অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। আর চোখ মেললেন না। এসব দুর্ভাগ্য দেখার জন্য রইলেন আমার হতভাগিনী মা। আর নানার সংসারের ডুবন্ত নায়ের হাল ধরতে গেলেন বোকার মতো উপযাচক হয়ে আমার বাপ।

এই আকস্মিক উত্থান-পতনে আমি আবার একটু অবকাশ অর্থাৎ ইচ্ছেমতো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। এ সময় হঠাৎ একদিন রাতে আমাদের বাড়িতে এলেন এক অদ্ভুত পোশাকের পাগলা দরবেশ। নাম নূর আলী ফকির। বেশ স্বাস্থ্যবান, শক্ত শরীর। গায়ের রঙ কালো, পরণে তালিমারা খাকি বুশ শার্ট ও খাকি রঙের ঢোলা প্যান্ট। বেঁটেখাটো। হাতে একটা বেশ ওজনদার তেল চকচকে লাঠি ও তামার মস্তবড় লোটা। পিঠে কালো মোটা পশমের কম্বল। মাথায় উঁচু খাকি কাপড়ের টুপি। তাঁর পোশাক-আশাক ও লটবহরের যে বৈচিত্র্য ছিল তাতে তাকে এমন আশ্চর্যভাবে মানিয়ে গিয়েছিল, মনে হতো না এক কিম্ভুতকিমাকার মানুষ। বরং তাঁর মুখখানি এমন শিশুর মতো সারল্যে আভাময় থাকত যে, প্রথম সাক্ষাতেই বড় আপনজন মনে হত। তিনি একটু গোঁজা হয়ে হাঁটতেন। পায়ে একজোড়া রাবারের কালো পাম্প স্যু রাখতেন। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা। তার ওপর আবার সর্ষের তেল মাখার বাতিক ছিল তাঁর। বয়স পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন হবে। দাড়িগোঁফ কামিয়ে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করতেন।

যেদিন বাজার থেকে অনেক রাত করে ফিরে আব্বা তাকে নিয়ে এলেন, সেই দিনই তাকে আমার ভালো লাগল, মনে হলো এক রহস্যময় মানুষ এসেছেন আমাদের বাড়িতে। আমি বাইরের ঘরে লেখাপড়া করছিলাম। এমন সময় আব্বা আমাকে খেতে ডাকলেন। আমি পুকুর থেকে হাত মুখ দিয়ে ঘরে ফিরে দেখি নূর আলী ফকির তাঁর বিশাল লাঠিটা দিয়ে ঘরের সেগুনকাঠের পালাগুলোর ওপর জোরে বাড়ি মারছেন আর কখনও আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) নাম আবার কখনও চিশতিয়া ও কাদেরিয়া তরিকার মাশায়েখগণের নাম উচ্চারণ করে কী যেন বলছেন।

আব্বা আমাকে কদমবুসি করতে বললে আমি তাঁকে কদমবুসি করতে গেলাম। তিনি আমাকে নত হতে দেখেই চিৎকার করে পিছনে হটে গেলেন, 'সব্বনাশ আমাকে মের ফেলতে চায়! এটা কী?'

আব্বা বললেন, 'বাবা, এটা আমার ছেলে। তোমার ভাই। একটু সালাম করতে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার ভাই? আরে আমার ভাই সাহেবকে তবে আমিই সেলাম করি।' বলে তিনি আমার কদম ছুঁয়ে সালাম করতে লাগলেন। আমি তো হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে নির্বাক ও ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আব্বা সজোরে ফকিরের হাত চেপে ধরে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা কি হলো বাবা! আমার ছেলে কী বেয়াদপি করল?'

'আরে কন কী আব্বা? উল্টো পথ ধরেছে। কিতাবের ভেতর হাঁটে। আমার মুরুব্বি আমি একশ বার সেলাম করি। লাখবার সেলাম করি।'

বললেন নূর আলী ফকির। আবার আমাকে কদবুসির চেষ্টা করলে আব্বা তাঁকে জোর করে ফেরালেন।

ব্যাপার দেখে আম্মারও হতচকিত অবস্থা। তিনি প্লেটে ভাত বেড়ে, রেকাবিতে সালুন সাজিয়ে দস্তরখানা পেতে বসেছিলেন। আব্বা তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'একেবারে মাস্ত হালাত।'

আমরা খেতে বসলাম। আম্মা প্রাত্যহিক অভ্যেসমতো আমার প্রতি সবকিছুই একটু বেশি দিতে লাগলেন। আম্মা বড় টুকরো দেখে শুকনো মাছের ভাজি আব্বা ও দরবেশ পাগলাকে একটা করে ঢেলে দিলেন। আর আমাকে দিলেন মছের ছোট দুটি টুকরো। যেই না দেওয়া আর অমনি নূর আলী পাগলার চেঁচামেচি শুরু—আমি খাব না। আমি এক্ষুনি চলে যাব।'

আব্বা তাকে পাকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? কী হলো?'

'খাব না। আমি কি আপনার সৎ ছেলে! আমাকে মাছ কম দিল! আর ওই যে ওখানে দুটি দিল?'

'না না বাবা, তোমাকে আরও দেব শান্তিমতো লোকমা তোল। ও তো তোমার ছোট, সে জন্য একটু বেশি দিলাম। তোমাকে বরং আর এক টুকরো দিই।' হাসতে হাসতে বললেন আম্মা। দরবেশকে আর এক টুকরো মাছ পাতে ঢেলে দিতে গেলেন। মাছের ভাজাটা পেয়ে নূর আলী মহাখুশি! পরিতৃপ্তির সাথে খেয়েদেয়ে মুখ মুছতে মুছতে আম্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমিই তো সবার ছোট। এখন থেকে আমাকেই সবকিছু বেশি দিতে হবে। বেশি আদর করতে হবে। আপনি তো আমার মা। মা না?'

আম্মা হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমার মা-ই।'

নূর আলী ফকিরকে আমাদের বাড়িতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হলো। অবশ্য তার থাকার কোনো সঠিক ব্যবস্থা ছিল না। সেটার প্রয়োজনও ছিল না। তিনি সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়ে রাতে ফিরে আসতেন। কখনও রাতে খাবার খেতেন, আবার কখনও অন্যকোথাও থেকে খেয়ে এসে মসজিদের বারান্দায় শুয়ে পড়তেন। শুয়ে পড়ার ঘটনা অবশ্য খুব কমই ঘটত। তিনি ছিলেন মূলত নিশাচর ধরনের দরবেশ। ঘণ্টাখানেক মাত্র ঘুমিয়েই জেগে উঠতেন। তার নামাজের কোনো সময় বা সীমা-সরহদ ছিল না। যখন ইচ্ছা, যেখানে খুশি নামাজ পড়তেন। অনেককক্ষণ পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকতেন। বাতাসের সাথে কথা বলতে চাইতেন। একদিন দেখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার থাকার ঘরের পাশের কুলগাছটার সাথে গভীর রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। হঠাৎ রাতে আমার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম। চাঁদনি রাত। জোছনার ঢল নেমেছে। মসজিদটাকে নিথর নিস্তব্ধ একটা পর্বতের মতো মনে হচ্ছে। এমন সময় দেখি কুলগাছটির নিচে লাঠিহাতে নূর আলী। গাছটার সাথে আপন মনে বাক্যালাপ করছেন, 'আপনি ক্যামনে সারাদিন কথাবার্তা না বলে দাঁড়িয়ে থাকেন? আপনার কষ্ট হয় না! আপনি শুধু বাতাস খেয়ে ক্যামনে বাঁচেন? আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে। এখন থেকে আমার সালামের জবাব দেবেন। ঠিক আছে, আওয়াজ করতে হবে না। শুধু ডাল নেড়ে জবাব দেবেন। আচ্ছা আপনার কাছে মাবউদ হিসাব চাইবে না! আমিও হিসাব টিসাব দিতে পারব না। আমি কী হিসাব দেব? মাটি বুঝি আল্লাহর কাছে হিসাব দেয়? আমি তো মাটিই। মাটি না আমি কন তো? আমারে আগুনে ফেলতে চাইলে আমি বলব, আমি তো আদমের বাচ্চা না, আমি গাছের ছাও। বরইগাছের বাচ্চা। গাছের তো হিসাব নেই মাবুদ। আমারে বেহেস্তের কুলগাছ বানিয়ে খাড়া করে দেন। আদমের মতো হাঁটাচলা চাই না। বন্ধ করে দেন। আমারে বন্ধ করে দেন।'

আমি ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে নূর আলীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'এই যে কুলগাছের বাচ্চা। এখানে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা হচ্ছে?'

'আরে আমার ভাই যে। আপনিও ঘুমান না?'

আমি বললাম, 'আমি তো ঘুমিয়েই ছিলাম। আপনার বকবকানিতে ঘুম ভেঙে গেল। আপনি কুলগাছের সাথে কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। গাছটা আসলে আমার খেশ। আমার ভাই। আমার সাথে কথা কয়।'

'কী কথা বলে গাছটা?'

'না বাতেনি জাহের করব না। আপনি গিয়ে ঘুমান। দেখতে পাচ্ছেন না আদমের পোলাপানেরা সারাদিন টাকা-পয়সা লেনদেন করে এখন পড়ে নাক ডাকছে। মসজিদ খালি, জমিন খালি। খালবিল সব খালি। শুধু গাছ আছে। আম কাঁঠাল কুল আর এই নূর আলী গাছ। সারা দুনিয়া এই রাতে মসজিদ হয়ে গেছে। আমি বাতেনি জাহের করব না। আদমের বাচ্চা হট যাও...।'

আমাকে ফেলে নূর আলী দরবেশ রাস্তার দিকে দৌড় মারল। আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গভীর রাতে নূর আলী রাস্তা পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে জোছনার শাদা পর্দার ভেতর হারিয়ে গেলেন। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমার কেন জানি মনে হলো নূর আলী দরবেশ সত্যিই বুঝি মানুষ নন। চলন্ত বৃক্ষ।

১৩

পরবর্তী জীবনে যখনই আমি প্রকৃতির সান্নিধ্যে একাকী দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি তখনই নূর আলীর কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে নূর আলী দরবেশ আল্লাহর ভয়ে গাছ হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে পারবেন না বলে নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটি বলে ঘোষণা করে কত কান্নাকাটি করতেন। শেষ পর্যন্ত মানুষের সাথে তিনি সম্পর্ক রাখতে চাইতেন না। হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ি আসাও ছেড়ে দিলেন। আব্বা নূর আলীকে শহরের অলিগলিতে মাঝেমধ্যে খুঁজতে যেতেন। শুনেছি দেখা হলেও আব্বাকে না চেনার ভান করতেন। আব্বা ফিরে এসে একরাতে আম্মাকে বললেন, 'নূর আলী, একদম মাস্তান হালাত। আমাকেও চেনে না। বলে, আপনি কোন গাছ? আপনি ফুল ফোটাতে পারেন?'

কিন্তু নূর আলী গভীর রাতে আমার কাছে আসতেন। তাঁর লাঠিটা দিয়ে রাত আড়াইটা-তিনটার দিকে আমার জানালায় আঘাত করে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলতেন, 'দুনিয়া এখন এই রাতে মসজিদ হয়ে গেছে। যারা গাছের সাথে এবাদত করতে চাও তারা জেগে ওঠো।'

আমি দরবেশের ডাকে জেগে উঠতাম। বলতেন, 'বড় শীত। ধুনি জ্বালাতে হবে।' প্রথম দিকে আমি জানতাম না ধুনি কী? পরে অবশ্য বুঝেছিলাম শীতে ঝরে পড়া শুকনো খড়কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে তাপ পোহানোর নাম হলো ধুনি করা।

একবার গভীর রাতে নূর আলী আমাকে ডেকে তুলে তাকে অনুসরণ করতে বললেন। প্রচণ্ড শীতের রাত। সেদিনও পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আকাশে। আমি আমার শোবার ঘরে তালা লাগিয়ে দরবেশের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। তার সারা গায়ে কম্বল জড়ানো। তিনি আমাকে নিয়ে এক জনহীন মাঠের ওপর দিয়ে চলতে লাগলেন। চলার সময় তিনি আমার সাথে একটিও কথা বললেন না। শুধু মাঝেমধ্যে আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার দিয়ে উঠতেন। বাড়ি থেকে মাইলটাক পথ পেরিয়ে গিয়ে আমরা তিতাসের পাড়ে শ্মশানঘাটে থামলাম। শ্মশানের পাশেই মুসলমানদের গোরস্তান। নূর আলী ফকির শ্মশানের চারপাশে পড়ে থাকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাকড়ি জোগাড় করে আমার সামনে জড়ো করে বললেন, ধুনি জ্বালান।'

আমার বেশ ভয় করছিল। আমি বললাম, 'এই কবরস্থানে আমার ভয় করছে। চলুন অন্য কোথাও গিয়ে ধুনি করি। এখানে জিন-টিন আছে।'

নূর আলী আমার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে হেসে ফেললেন! বললেন, 'এখানে আদম সন্তানের ডর আছে। এটা তো মরা মানুষের জায়গা। জেতা মানুষ ডরায় এখানে। আমাদের কী ডর, আমরা তো মানুষজিন্দেগী ছেড়ে দিয়েছি। আমরা দু'ভাই গাছ। গাছের কোনো জিনের ভয় নেই। ধুনি করুন, ধুনি করুন। আল্লাহু আকবার।'

সে রাতের পর নূর আলী দরবেশের সাথে দীর্ঘদিন আমার আর দেখা হয়নি। তিনি আমাদের বাড়িতেও আর আসা-যাওয়া করতেন না। তবে তার তামার লোটাটি আমাদের ঘরে আমার মায়ের জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন। আজও তা আমাদের ঘরে আছে।

নূর আলী ফকিরের শেষবারের মতো আমাদের পরিবারে আসার ঘটনাটি অত্যন্ত বিষাদময়। যখনই সেই নিরুপায় পরিস্থিতির কথা আমার মনে পড়ে, নিজেকে বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধী লাগে। ভাবি, আমি বা আমার পরিবারের মুরুব্বিরা যথাযথভাবে একজন পরিচিত মানুষের প্রতি, যিনি ছিলেন আমাদের অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী, অপরিচিত অনাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করেছি।

সেই রাতের পর নূর আলী ফকির হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। শুধু যে আমাদের বাড়ি আসাই তিনি বন্ধ করেছিলেন এমন নয়। সারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকাতেই তাঁকে আর কেউ খুঁজে পেত না। নূর আলীর কথা শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই ভুলে গেলাম।

দীর্ঘ বিস্মৃতির সময়টা প্রায় এক বছরের মতো হবে, আমরা তখন আমার নানার বাড়িতে উঠে এসেছি। অসুস্থ নূর আলীকে দু'জন বেহারা একটা পালকিতে করে আমার নানার বাড়ির উঠোনে এনে নামাল। গুটি বসন্তে তার সারা গা ভরে গেছে। তিনি পালকির ভেতর থেকে কাতরানির শব্দ করে আমাকে ডাকলেন, 'ভাই ভাই, আমাকে একটু বিশ্রাম দিন। আমার আম্মাকে বলুন, খালি গোয়াল ঘরটায় আমাকে একটু থাকতে দিতে।'

আমি দৌড়ে গিয়ে আম্মাকে নূর আলীর কথা বললাম। আম্মা তখন আমার মামা ও নানিদের সাথে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি বুঝলাম, বসন্তরোগ নিয়ে নূর আলীর আগমন সংবাদটি আগেই অন্দরে পৌছে গেছে। নূর আলীকে বাড়ির খালি গোয়াল ঘরটায় একটু আশ্রয় দেওয়ার জন্য আম্মার প্রস্তাব বাড়ির সকল শরিকরাই প্রত্যাখ্যান করল। সকলেরই এক কথা, নূর আলী সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি এই রোগীকে বিদায় কর।

আম্মা নূর আলীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেন না। নূর আলী তখনও পালকির ভেতর থেকে আম্মা গো, আম্মা গো বলে কাতরাচ্ছিলেন। আম্মা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'বল তো এখন আমি কী করি? তোর আব্বাও বাড়িতে নেই।'

আম্মার অসহায় অবস্থা আমি বুঝতে পারলাম। আমি বললাম, 'রোগীকে আমাদের নিজের বাড়িতে রাখা যায় না? সেখানে তো এখন আমরা কয়েক মাস থাকছি না।'

'সেখানে তো আরও বিপদ হবে। সারা গাঁয়ের লোক বাধা দেবে। তুই বরং বেহারাদের বল নূর আলী যেখানে ছিল সেখানেই নিয়ে যেতে।'

আম্মা কথা শেষ করে তাঁর নিজের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমার বুঝতে বাকি রইল না নূর আলীকে আশ্রয় দিতে না পেরে আম্মা কতটা দুঃখ পেলেন। ঘটনাটা তাঁর বিবেকে এতটা লেগেছিল, বেশ কিছুদিন তিনি বাপের বাড়ির মানুষের সাথে মন খুলে কথা পর্যন্ত বলতেন না।

যা হোক, অগত্যা আমি নূর আলীর পালকির দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাথা নুইয়ে, অসুস্থ নূর আলীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'নূর আলী ভাই। আমরা আপনাকে আশ্রয় দিতে পারলাম না। আমার মা আপনাকে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ির মানুষেরা কেউ রাজি হয় না। সবাই বসন্ত রোগকে ভয় পায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কথা শুনে নূর আলী আর একটা বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। আর একবারের জন্য বললেন না যে, তিনি এখানে থাকতে চান। এ অবস্থায় তিনি কোথায় যাবেন?

বেহারা নূর আলীকে গালমন্দ করে পালকিটা তুলে নিল। তারপর যে গাঁয়ে নূর আলী এই কালরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সেখানে চলে গেল। কিছুদিন পরই আমরা খবর পেলাম নূর আলী মারা গেছেন।

নূর আলীর মৃত্যুতে আমি, আব্বা ও আম্মা সকলেই শোক করলাম। তাঁর নামে মিসকিনদের খাওয়ানো হলো। নূর আলী কেন জানি না আমাদের বসতঘরের ঢেউটিনের বেড়ায় আড়কাঠের ফালির ভেতর একটা বাঁশের খুঁটি বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। খুঁটিটা আজও বাড়ি গেলে যথাস্থানেই দেখতে পাই। একদা আব্বাকে খুঁটিটার কথা জিজ্ঞেস করলে আব্বা বলতেন, 'দরবেশ মানুষ খুঁটিটা কোন মতলবে বসিয়ে গেছেন, কে জানে? থাক। হয়তো আমাদের কোনো মঙ্গলের জন্যই এটা পুঁতে গেছেন, থাক না।'

সেই থেকে খুঁটিটা আছে। আব্বার বিশ্বাসের কারণে খুঁটিটাকে কেউ আর স্থানচ্যুত করেনি। আমার পিতার মৃত্যুর কিছুদিন আগে দেশে দারুণ ঝড় হয়েছিল। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়। আব্বা তখন প্যারালাইসিসে শয্যাগত। আমি তখন ঢাকায় আমার মার কাছে শুনেছি ঝড় যখন সত্তর-আশি মাইল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে তখন ঘরের ভেতর যারা ছিলেন সবাই ভেবেছিলেন আমাদের শতাব্দীকালের পুরোনো ঘরটা বুঝি আর রাখা গেল না। কারণ ঘরটা ছিল গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে মাথা-উঁচু বসতঘর। তুফানের ধাক্কা সরাসরি এ ঘরটাকেই প্রথম আঘাত করে। সেদিনের তুফান দুর্দমনীয় হয়ে উঠলে আমার পঙ্গু পিতাকে এ ঘরে নেওয়ার জন্য আমার মা চাচারা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আব্বা শুধু শারীরিকভাবেই পঙ্গু ছিলেন না। প্যারালাইসিস তার জিভকেও অসাড় করে ফেলেছিল। তিনি কথা বলতে চেষ্টা করতেন বটে কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুত না।

আব্বাকে যখন সকলে ধরাধরি করে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন তখন তিনি ইঙ্গিতে অস্বীকৃতি জানাতে লাগলেন। কিন্তু তার ইঙ্গিত কেউ বুঝতে না পারার দরুন তাকে পাঁজাকোলে তুলে আমাদের পূর্বের ভিটেয় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলো। আব্বাকে প্রায় জোরজবরদস্তি করেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ আব্বা ঘরের একটা ঠুনিকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন। সবাই এবার আব্বার দৃঢ় অস্বীকৃতি বুঝে ফেলল। থমকে দাঁড়ালেন সবাই। আম্মা বললেন, 'থাক আর অন্য ঘরে নেওয়ার দরকার নেই। আল্লাহ যা কপালে রেখেছেন, তাই হবে। তোমরা আমার স্বামীকে তার খাটেই শুইয়ে দাও।'

আম্মার কথামতো আব্বাকে আবার তার খাটেই শুইয়ে দেওয়া হলো। আব্বা দারুণ স্বস্তিবোধ করলেন এবং বিছানায় কোনো রকমে উঠে বসে পশ্চিম দিকে সিজদা দিয়ে থাকলেন। ঝড় প্রবল থেকে প্রবলতর হলো। মড়মড় শব্দে গাছ, ডাল-পালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে পড়তে লাগল। আম্মা ও আব্বা ছাড়া সবাই অন্য ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া মাত্র আমাদের বাড়ির প্রায় সব শরিকের ঘরগুলোই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে যেতে লাগল। যারা আমাদের বড় ঘর ছেড়ে আত্মরক্ষার জন্য ছোট মজবুত ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, মুহূর্তের মধ্যে সব মিসমার হয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়াতে আর্তচিৎকার করে সবাই আমাদের ঘরের বারান্দায় এসে উঠলেন। বড় ঘরটা ছাড়া গ্রামে কারো বসতবাটি আর স্বস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। শুধু শতাব্দীকালের প্রাচীন নড়বড়ে আমাদের ঘরটাই এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তবে একটু কাত হয়ে। ঘূর্ণিপাকের ধাক্কায় একটু হেলে গিয়েছিল বটে তবে মারাত্মক কোনো ক্ষতি হয়নি। পরে অবশ্য আমরা কয়েকটি পালা বা ঠুনি বদল করে ঘরটাকে আবার সিধা করে দিই।

আমি তখন দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ করতাম। ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির খবর জানলাম। জানলাম আমাদের এলাকায় তুফানের ভাঙচুরটা একটু বেশি হয়েছে। পরের দিনই বাড়ি গেলাম। বাড়ি যাওয়ার পথে গ্রামের বেধড়ক ক্ষয়ক্ষতি দেখে ভাবলাম বুঝি আমাদের বড় ঘরটা নেই; কিন্তু একটু এগিয়ে ঘরটার চুড়ো দেখা যাওয়াতে আল্লাহকে এই দরিদ্র পরিবারের প্রতি অসীম করুণার জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। ঘরে প্রবেশ করেই দেখি, আব্বা অত্যন্ত আনন্দিত মনে তার খাটের ওপর বালিশে ধাক্কা রেখে বসে আছেন। আমাকে আসতে দেখে খুব খুশি হয়েছেন বুঝতে পারলাম। আব্বা যেহেতু তখনও কথা বলার সামর্থ্য অর্জন করেননি, আমি আম্মাকে ঘরটা কীভাবে বাঁচল জিজ্ঞেস করলাম। আম্মা জবাব দেবার আগেই আব্বা আঙুল তুলে ঘরের বেড়ার ওপর শক্ত করে বসানো নূর আলী দরবেশের বাঁশের খুঁটিটা দেখিয়ে দিলেন। আমি ও আম্মা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। তারপর কতক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে খুঁটিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

নূর আলী দরবেশ মারা যাওয়ার পর আমি আবার আমার নিঃসঙ্গতার মধ্যে ফিরে গেলাম। আবার বই। আবার পাড়ায় পাড়ায় লুক্কায়িত বই নামক এক রহস্যময় আনন্দের অনুসন্ধান করে বেড়ানো।

বই খুঁজতে খুঁজতে অদ্ভুত সব মানুষের সাথে আমার পরিচয় হতে লাগল। যেসব নর-নারীর সাথে আমার বই ও বন্ধুত্ব বিনিময় বেড়ে গেল তারা সকলেই ছিলেন আমার অসমবয়সী। কেউ স্কুল মাস্টার, কেউ কেরানি, কেউবা আবার কোনো বড় ব্যবসায়ী বা সরকারি কর্মচারীর মেদবহুল স্ত্রী। একজন বিধবার সাথে আমার পরিচয় হলো যার স্বামী স্বরাজ আন্দোলনে জেলে মারা গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর গ্রন্থের ভাণ্ডার আমাকে খুলে দিলেন। তাঁদের ঘরে ইউরোপীয় সাহিত্যের বিশাল কালেকশান ছিল। দুঃখের বিষয় আমি ইংরেজি ভাষা তখনও পড়তে জানতাম না বলে তাকভর্তি বিশাল আলমারির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম। ভদ্রমহিলা আমার অবস্থা বুঝে একদিন বললেন, 'তুমি আগে ঘরের বাংলা উপন্যাসগুলো পড়ে শেষ কর। তারপর তোমার জন্যে কলকাতা থেকে আরও বই আনিয়ে দেওয়া যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আমাকে একদিন তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজস্ব পড়ার আলমারির যে তাকটি দেখালেন, দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। যেসব বই সাধারণত আমার মতো বয়সের ছেলেদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, দেখলাম সেসব বই এখানে ঠাসা। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বই তো আছেই। আর আছে সে সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক বনফুল, তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের বই। আমি তখনও ডিকেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চারের গল্প নিয়ে মশগুল থাকতাম। সত্যিকার ফিকশনে তখনও হাত দিতে সাহস পাইনি। ভদ্র মহিলা সেই বিস্ময়কর পুলকের দরজা আমার জন্য একটু ফাঁক করে দিলেন। ভদ্রমহিলা ছিলেন হিন্দু বৈদ্য। তার সাথে পরিচয়ও হয়েছিল একটু রহস্যজনকভাবে।

অন্যান্য বদঅভ্যাসের মধ্যে আর একটি বদঅভ্যাস ছিল রাতে পড়াশোনা শেষ করে বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলেও ঘুম পেত না। জানালা খুলে শূন্য মসজিদটির দিকে চেয়ে থাকতাম। মাঝেমধ্যে কিছুতেই ঘুম না পেলে দরজায় তালা লাগিয়ে স্টেশনে এককাপ চা খেতে যেতাম। সপ্তাহর মধ্যে দু'একবার এ রকম ঘটতই। স্টেশন মাস্টার থেকে স্টেশনের পাহারাদার পুলিশ পর্যন্ত—যেহেতু সকলেরই আমি পরিচিত ছিলাম, সে কারণে গভীর রাতেও স্টেশনে ঘোরাফেরার জন্য আমাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করত না। তা ছাড়া স্টেশনের প্রায় সবকটি চায়ের দোকানই ছিল আমাদের গাঁয়ের লোকের। বরং চা খেতে গেলে সবাই আমাকে তাদের দোকানে ঢুকতে ডাকাডাকি করত।

একবার মসজিদের পাশের আমার ঘরটিতে তালা দিয়ে রাত একটার দিকে অনিদ্রার জ্বালায় বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম স্টেশন থেকে একটু ঘুরে আসি। আমি স্টেশনে গিয়ে দেখি, যদিও তখন কোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসার সময় এটা নয়, তবুও একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পৌঁছামাত্র ট্রেনটা হুইসেল দিয়ে ছেড়ে দিল। আমি একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এককাপ চা দিতে বলে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কোন ট্রেন?' দোকানি বলল, 'সন্ধ্যার চিটাগাং মেলটা চাটগাঁ থেকে আজ কী কারণে যেন পাঁচ ঘণ্টা লেটে এসেছে।'

এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত বলে আমি আর এদিকে নজর না দিয়ে চা খেতে গেলাম। চা খাওয়া শেষ হলে ভাবলাম স্টেশনের প্লাটফর্মের ভিতর দিয়েই বাড়ি চলে যাব। তখন ট্রেন থেকে নামা যত্রীরা পাতলা হয়ে এসেছে। সবাই যে যার পথে চলছে। মহিলার সাথে ফ্রক পরা তের-চৌদ্দ বছরের এক কিশোরী। এদের সামনে বিশাল এক চামড়ার স্যুটকেস রাখা। আমি কাছে ভিড়তে ভিড়তে একবার 'মোল্লাবাড়ি' শব্দটা শুনতে পেলাম। স্টেশন মাস্টার আমাদের বাড়ির নাম বলে ভদ্রমহিলাকে কী যেন বলছেন। আমি তার কাছে যাওয়া মাত্র তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আরে এই তো মোল্লাবাড়ির ছেলে। বাবা এদের একটু সাহায্য করতে হবে। রামরাইল বাড়ি। সন্ধ্যার ট্রেনে আসার কথা, এখন গাড়ি এত রাত করে এনে নামিয়েছে, গাড়িঘোড়া কিছু এতদূর এতরাতে যেতে চাচ্ছে না। এখন স্টেশনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লাটফর্মে দুষ্টলোকের মধ্যে মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় থাকবে? বাকি রাতটার জন্যে তোমার মাকে বলে একটু আশ্রয় দাও।'

আমি স্টেশন মাস্টারের দিকে তাকালাম, 'এত রাতে আমি এদের কোথায় নিয়ে যাব?'

'তোমার মার কাছে নিয়ে যাও। আমার কথা বলো। নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

বললেন স্টেশনমাস্টার। ভদ্রলোকের স্ত্রী প্রায়ই আমাদের বাড়ি যেতেন। আমার মায়ের সাথে ভাব। এই সুবাদেই তিনি বিপদগ্রস্ত মেয়ে দুটিকে আমাদের দিকে ঠেলেছেন। আমি কথা না বাড়িয়ে ভদ্রমহিলার দিকে ফিরে বললাম, 'চলুন।'

১৪

বিধবা ভদ্রমহিলা ও মেয়েটিকে নিয়ে আমি বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালাম। আম্মাকে ডাকতেই আম্মা উঠে দরজা খুলে দিলেন। আমি এঁদের অসুবিধার কথা বললে আম্মা বেশ একটু অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শেষে হেসে ফেললেন। দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে মেহমানদের বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

এঁরা ঘরের ভেতরে গেলেন। আমি তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। আম্মাকে এতরাতে এই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। আম্মার অসন্তুষ্টির কারণটা আমার অজানা ছিল না। ইতিপূর্বে এ ধরনের অতিথিপরায়ণতার জন্য আম্মাকে বেশ বড় রকমের খেসারত দিতে হয়েছিল। আজও আবার রাতের ট্রেনের যাত্রী নিয়ে হাজির হয়েছি দেখে তিনি কি অস্বস্তিবোধ না করে পারেন? কিন্তু আশ্চর্য, তিনি একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, এতরাতে আমি কেন স্টেশনে গিয়েছিলাম, এদের সাথেই বা কীভাবে পরিচয় হলো। যাহোক লজ্জিত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আম্মা ডাকলেন, 'তুই আবার বাইরে আছিস কেন, ভেতরে এসে আমাকে সাহায্য কর।'

আমি ভেতরে গেলাম। অতিথিরা তখন টুলের ওপর বসে অবাক হয়ে আমাদের ঘরের ভেতরটা দেখছে। আব্বার কাশি শোনা গেল। তিনি খাটের ওপর মশারির ভেতর ঘুমিয়ে। ভদ্রমহিলার সঙ্গি কিশোরীটি হাই তুলছে। ভদ্রমহিলা আম্মাকে বললেন, 'আমরা আপনাদের খুব অসুবিধায় ফেললাম। আপনি আমাদের জন্য একটুও ব্যস্ত হবেন না। আমরা বসেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব। একটু পরেই তো সকাল হয়ে যাবে। ভোর হলেই আমরা হাঁটা দেব। তবে এই স্যুটকেসটা আপনাদের বাড়িতে একদিন রাখতে হবে। পরে আমাদের লোক এসে নিয়ে যাবে। সকালে এটা নেওয়ার গাড়ি-ঘোড়া, মানুষজন হয়তো পাব না।'

আম্মা হাসলেন। বললেন, 'এ বাড়িতে যখন এসেই পড়েছেন তখন সুবিধা-অসনুবিধার কথা ভাবতে হবে না। আর বসেই বা রাত কাটাবেন না। এ বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেহমানদের থাকার জায়গার অভাব নেই। আমাদের পশ্চিম ভিটের ঘরটিতে থাকবেন। চৌকি বিছানো আছে। আমার ছেলে এক্ষুনি বিছানা পেতে দেবে।'

'আপনার ছেলেটি সত্যিই খুব ভালো। লাজুক। ওর ওপর রাগ করবেন না।'

ভদ্রমহিলার কথায় আম্মা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। হাত থেকে পশ্চিমের ঘরের চাবিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোষক বালিশ এসব নিয়ে গিয়ে চৌকিতে পেতে দিয়ে আয়। আমি দেখি ভাত তরকারি যা আছে এতে এদের চলবে কি না, না রাঁধতে হবে।'

'না না। এত রাতে আমরা কিছুই খাব না। আপনি অযথা কষ্ট করবেন না।'

ভদ্রমহিলা না না করে উঠলেন।

'আরে আপনি এমন করছেন কেন? বললাম তো ঘরে ভাত তরকারি আছে। জালায় জীয়ল মাছও আছে। শিং-মাগুরে আপত্তি নেই তো? আমি চট করে মাছ ভেজে দেব!'

আমার মায়ের কথায় এবার ভদ্রমহিলা লজ্জিত হয়ে মাথা নোয়ালেন। নরম গলায় বললেন, 'আপনারা সত্যি খুব ভালো মানুষ। আমি দেখুন বিধবা। মাছ মাংস পারতপক্ষে খাই না। আবার আহার-বিহারে তেমন কোনো শক্ত নিষেধ মানারও ধার ধারি না। আমার স্বামী ছিলেন স্বদেশী মানুষ, ধর্মাধর্মির ধার ধারতেন না। জেল খেটে মারা গেছেন। রামরাইলের কাছে আমাদের বাড়ি।'

'তাহলে তো বিপদ। আপনাকে তাহলে আমরা এতরাতে কী খেতে দিই? আপনার মেয়েটির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে কিছু খায়নি।'

'আমার মেয়ে নয়, বোন। হ্যাঁ দুপুরেও বেচারা বাড়ির গোলমালে কিছু খেতে পারেনি। ওকে যা দেন তাই খাবে। আর আমার জন্যও কোনো বিপদ নেই। ঠিক আছে আপনাদের হাঁড়িতে যা আছে নিয়ে আসুন, আমরা দু'বোন ভাগ করে খেয়ে নেব। আমার বোনটির নাম শোভা।' বললেন বিধবা ভদ্রমহিলা।

আম্মা শোভাদের নিয়েই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমি তোষক-চাদর ইত্যাদি নিয়ে পশ্চিমের ঘর খুলে দিলাম। ঘরের বড় পিতলের হারিকেনটা জ্বালিয়ে দিলাম। আম্মা এদের কী দিয়ে আপ্যায়ন করলেন তা না দেখেই ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি আমার বারবাড়ির ঘরে এসে সটান শুয়ে পড়লাম। আম্মার ওপর কতটা জুলুম হলো তা ভেবে অনুশোচনার সীমা রইল না। আমার মায়ের অসন্তুষ্টির যে কারণের কথা আগে উল্লেখ করেছি তা এখন মনে পড়ল, যদিও সব মানুষ একরকম নয় তবুও যেচে বিড়ম্বনা এনে মায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা যে কী রকম অবিবেচনার কাজ তা আমি এখন উপলব্ধি করতে লাগলাম। অবশ্য তিনি একবারমাত্র মুহূর্তের জন্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করা ছাড়া আমার ওপর আর বিরক্তি প্রকাশ পায়নি।

যেচে অতিথিপরায়ণতার যে খেসারতের কথা আগে উল্লেখিত হয়েছে এবার সে কাহিনিটা বলছি।

একবার এমনি গভীর রাতে স্টেশন থেকে ট্রেন ফেল করা এক বিপদগ্রস্ত দম্পতিকে আব্বা বাড়ি নিয়ে এসে খাইয়ে-দাইয়ে আদর করে আমাদের বড়ঘরটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে দেন। সৌজন্যবশত মেজবান দম্পত্তি অর্থাৎ আমার বাপ-মা অন্য ঘরে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেন। সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে দেখেন বড়ঘরের প্রধান দরজাটার হাওলাট খোলা। মেহমানদের পাত্তা নেই। পাত্তা নেই সিন্দুকের ওপর রাখা সে সময়কার দামি কয়েকটি জিনিসের। আব্বার হাতঘড়ি, কলম ইত্যাদি। আর আম্মার আলনায় রাখা শৌখিন কয়েকখানা শাড়ির। ভাগ্য ভালো যে, বহন করা মুশকিল এমন কোনো তৈজসপত্র খোয়া যায়নি। এরপর থেকেই রাতের অতিথিদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের বাড়িতে একটা সতর্কতা অবলম্বন করা হত। যদিও শেষ পর্যন্ত কোনো কার্যকর ফল দেয়নি এবং আজও শত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে আমাদের বাড়িতে মানুষ তা নিষ্ঠুরভাবে পালন করতে পারে না। আমার মনে হয় যাদের বাড়ি কোনো মফস্বল এলাকায় স্টেশনের লাগোয়া তারা নিজেকে যতই দৃঢ় করুক দিশেহারা বিপদগ্রস্ত মানুষের অসহায় মুখ দেখলে তারা তা বজায় রাখতে পারে না।

সকালে বেশ দেরি করে আমার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখি নটা বাজে। আমার ধারণা অতিথিরা ততক্ষণে চলে গেছে। তখন আমার একটা অভ্যেস ছিল ঘুম থেকে জেগেও আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানায় উঠে বসে থাকতাম। কেন জানি, খুব তাড়াহুড়ো করে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করার ব্যাপারে আমার জন্ম আলস্য। বিছানায় বালিশের ওপর ঠেস দিয়ে বসে হয় পত্র-পত্রিকা কিংবা গতরাতের অসমাপ্ত ফিকশন পড়তে আরাম লাগত। উঠতেই মন চাইত না। যখন বকাবকি করে আম্মা তাড়া দিয়ে লোক পাঠাতেন তখন অতি অনিচ্ছায় আলস্যের আরাম ত্যাগ করে ওঠা।

আজও এই মধ্য বয়সেও সকালের আজানের সাথে জেগে উঠতে এ আলসেমি আমাকে টানাটানি করে। তবে ইতিমধ্যে দুষ্ট প্ররোচনার সাথে লড়াই করার হিম্মতও আমাকে ঠেলে তুলে দেয়। জেগে দেখি, মোরগ বাক দিচ্ছে। পাখিরা কলরব করে উষার আভাসকে আল্লাহর প্রশংসামুখর করে তুলেছে। তখন মনে হয় অজু করে নামাজ পড়া ছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য নেই। এই পরিবর্তনের কথা ভাবলে নিজের প্রতি নিজেই বিস্মিত হয়ে থাকি।

আমি ঘরে ফিরে দেখি রাতের মেহমানরা যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। কথাবার্তায় বুঝলাম ভদ্রমহিলা আম্মার সাথে বেশ ভাব করে নিয়েছেন। তাদের নাশতা খাওয়া হয়ে গেছে। আমাকে দেখে আম্মা বললেন, 'এদের নিয়াজ পার্ক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়। এরা নাকি হেঁটেই যেতে পারবে। এদের স্যুটকেসটা থাকবে। পরে কাউকে পাঠিয়ে দেবে এটা নেওয়ার জন্য।'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। আম্মা বললেন, 'তাহলে তাড়াতাড়ি নাশতা সেরে নে।' আমি হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। এ ফাঁকে শোভা আর তার বোন অর্থাৎ বিধবা ভদ্রমহিলা আজ তার নামটা পর্যন্ত স্মরণ করতে পারছি না, আলমারিতে সাজানো আমার বইয়ের কালেকশন হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করেছেন। আম্মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'কী দেখছেন? এসব বাজে বই নিয়েই আমার ছেলে থাকে। ক্লাসের পড়াশোনায় মনোযোগ নেই, সারাদিন শুধু গল্পের বইয়ের পেছনে ঘোরে।'

আম্মার কথায় ভদ্রমহিলা খুব হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'তাই না কি! তবে তো খুব ভালো লক্ষণ। ওকে পড়তে বাধা দেবেন না। আমার কাছেও অনেক বই। আপনারা অনুমতি দিলে আমি একে আমার সংগ্রহ থেকে বই দেব। তা ছাড়া বই কোথায় আছে তার খোঁজ দেব। অনেক ভালো বই। এ অঞ্চলে এসব বই কারো কালেকশনে নেই। পাবে কোথায় যে থাকবে?'

আম্মা দেখলাম থ' মেরে গেলেন। এই প্রথম আমি আমার মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে বই পড়ার প্রশংসা করতে দেখলাম। আম্মা হয়তো ভাবলেন, একি কথা এ যে খাল কেটে কুমির আনার প্রস্তাব দিচ্ছে। শোভা মেয়েটা এতক্ষণ তন্ময় হয়ে আমার বই ও কাগজ-পত্র নাড়ছিল। এবার আড়চোখে আমার দিকে একবার তাকাল। আমি দেখলাম তার চোখ দুটিতে এক অচেনা বিস্ময়। আমি মুখ নামিয়ে ডিমের ওমলেট খেতে লাগলাম। আম্মা বললেন, 'স্কুলের লেখাপড়া যে একেবারে করতে চায় না।'

'এটা তবে ভালো কথা নয়।' বললেন ভদ্রমহিলা।

আম্মা বললেন, 'তাছাড়া সব ব্যাপারেই কেমন যেন উদাসীন। সংসারের তো তোয়াক্কাই করে না। খেলাধুলার ধার ধারে না। এ বয়সে ছেলেদের কত বায়না থাকে। কত জেদাজেদি থাকে। কোনোদিন ওর আব্বার কাছেও আব্দার করেনি যে আমাকে একটা সুন্দর জামা বানিয়ে দাও বা একজোড়া জুতো কিনে দাও। এমন অদ্ভুত ছেলে!'

'ভালো তো!' মন্তব্য করলেন ভদ্রমহিলা। আগ বাড়িয়ে বললেন, 'জ্ঞানে যারা তৃপ্তি পায় তাদের নাকি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বোধ থাকে না। এদের মগ্নতা ঈশ্বর ঢেকে দেন। আমার স্বামী বলতেন। তিনিও খুব বই পড়তেন। ছিলেন পরম বিরাগী– পড়তে পড়তে হয়ে গেলেন স্বদেশী– পরে কম্যুনিস্ট।'

'কী হয়ে গেলেন?'

আম্মা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন।

'না, কিছু না। আপনি বুঝতে পারবেন না বোন।'

আমার মায়ের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বললেন বিধবা। তাঁর চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। আমি দেখলাম তিনি আঁচলে চোখের পানি লুকিয়ে হাসলেন, 'আচ্ছা, আপনার ছেলেটিকে যদি আমরা আমাদের বাড়িতে একটা দিনের জন্য নিয়ে যাই আপনি কি রাজি হবেন? দেখুন, আমরা ছুঁৎমার্গে বিশ্বাস করি না। আপনাদের মতোই। পুজো-টুজো করি না। কাছিম-টাছিম খাই না। মোল্লাবাড়ির জাত মেরে দেব না। লোক দিয়ে আবার পাঠিয়ে দেব। রাজি?'

এমনভাবে মহিলা কথাগুলো তুললেন যে, আম্মা হেসে ফেলে চক্ষুলজ্জায় মুখ ফসকে বলতে বাধ্য হলেন, 'ঠিক আছে যাক। তবে এক দিনের বেশি রাখবেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫

আমি শোভাদের সাথে রওনা দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে নিয়াজ পার্ক পেরিয়ে এসে শোভা এ্যানডারসেন ব্রিজের ওপর একটু দাঁড়াল। নিচে তীব্র গতিতে কুরুলিয়া খাল দিয়ে তিতাসের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। শোভা স্রোতের দিকে থুথু ফেলল। আমিও দাঁড়ালাম। শোভার দিদি ততক্ষণে ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে গিয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাকে পাশে দাঁড়াতে দেখে শোভা প্রথম মুখ খুলল, 'আমি এ শহরেই পড়াশোনা করব।'

'ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়?'

'হ্যাঁ। এতদিন কুমিল্লায় পড়াশোনা করতাম। এবার নাইন-এ উঠেছি। এখানেই মেয়েদের স্কুলে ভর্তি হব।' বলল শোভা। বুঝলাম শোভাকে দেখতে ছোটখাটোটি মনে হলেও লেখাপড়ায় বেশ এগিয়ে আছে। আমি বললাম, 'কুমিল্লাতেই তো মেয়েদের স্কুলগুলোতে লেখাপড়া ভালো হয় বলে শুনেছি। কুমিল্লা থেকে চলে আসতে চাও কেন?'

'কী জানি! আমি পিসির কাছে থেকে পড়াশোনা করতাম, দিদির পছন্দ নয় আমি সেখানে থাকি। তাই নিয়ে এসেছেন। কান্দিরপাড় আমার পিসিদের বাড়ি।'

একটু উদাসভাবে বলল শোভা। আমি বললাম, 'আমার ফুপুর বাড়ি কুমিল্লায়। কান্দিরপাড়া চিনি। নজরুলের শ্বশুরবাড়ি।'

'ফুপু মানে তো পিসি, তাই না?'

আমি হাসলাম।

'কুমিল্লায় কোথায় ফুপুর বাড়ি?'

'সাতউড়া ভূঁইয়া বাড়ি। আমার ফুপা ভিক্টোরিয়া কলেজের হেডক্লার্ক। শামসুল হুদা ভূঁইয়া, গ্রাজুয়েট। এক সময় কবিতা লিখতেন। কুমিল্লা স্টেশন ছাড়িয়ে একটু পশ্চিম দিকে গিয়েই বিরাট দিঘিঅলা বাড়িটাই আমার ফুপুদের। কান্দিরপাড়ের কাছেই।'

আমার কথায় শোভা আরেকটু উদাসভাবে নিচের স্রোতের দিকে তাকাল। কালোবাউশ শিকারিদের নৌকাগুলো তখন স্থান বদল করছে। এ সময়টা হুইলের ছিপ দিয়ে রুই মাছের সমান বড় ঘনকৃষ্ণবর্ণ বাউশ মাছ ধরার মৌসুম। মাঝে মাঝে আব্বা তাঁর শখের ছিপ নিয়ে বাউশ ধরার জন্য এখানে আসেন। নাও ভাড়া করে নিয়ে আসতে হয়। কুরুলিয়ার কালোবাউশের মতো স্বাদযুক্ত মাছ বাংলাদেশের বিল বাঁওড়ে আর কোথাও জন্মায় কি না জানি না। হয়তো জন্মায় কিন্তু রুই কাতলের মতো বিরাট আকারের নিশ্চয়ই হয় না। কত তো নদী জলা-জলমহালে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এমন আর দেখিনি।

শোভা কতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে আপন মনেই বলল, 'আর কোনোদিন কুমিল্লা যাওয়া হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'কেন? দিদিকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে না হয় আবার চলে যেও। পিসির বাড়ি তো আর পরের বাড়ি নয়।'

'দিদি তো পর করেই দিয়ে এলেন। ঝগড়াঝাটি করে সবাইকে গালমন্দ দিয়ে আমাকে নিয়ে এলেন।'

'কী ব্যাপার! সেখানে কী হয়েছিল?'

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ততক্ষণে শোভার দিদি ওপার থেকে শোভাকে ডাকলেন। শোভা চলতে চলতে বলল, 'আমার পিসেমশায় রাজনীতি করেন। পার্টির মেম্বার। দিদি এ কারণে আমাকে সেখানে পাঠাতেই চাইতেন না। কত কাকুতি মিনতি করে সেখানে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। এবার দিদি গিয়ে দেখেন আমি পোস্টার লিখছি। হঠাৎ গিয়ে দেখে ফেলেন। তারপরই হুলুস্থুল কাণ্ড। কত কান্নাকাটি। কত গালমন্দ। দিদির ধারণা জামাইবাবুকে রাজনীতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিসেমশায়ই দায়ী। তার বৈধব্যের জন্য দিদি এদেরই সবসময় দোষারোপ করেন। এবার আমাকে দিয়ে পার্টির কাজ করাতে দেখে দিদির হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। আমি অবশ্য নিজের ইচ্ছাতেই এদের কাজ করে দিচ্ছিলাম। আমাকে কেউ বলেনি। আমি এদের আন্দোলনে বিশ্বাস করি।'

আমি তার কথার আগামাথা কিছুই বুঝলাম না। কারণ পার্টি, পলিটিকস, পোস্টার ইত্যাদি সম্বন্ধে তখনও আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তা ছাড়া শোভার কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা মুরুব্বিয়ানা, একটা বেশি জানার পাকামো ঝিলিক দিচ্ছিল। আমি এমনিতেই আবাল্য জ্ঞানের অহঙ্কারে দর্পি লোকদের এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত। আর সেই দর্প যদি হয় কোনো মেয়ের তবে তো দশ হাত তফাৎ থাকি। কিন্তু শোভাকে আমার ভালোই লাগছিল। কারণ শোভার অহংবোধের মধ্যেও কোথাও একটা দুঃখ কাজ করছিল। তাছাড়া শোভা অযাচিতভাবে আমাকে তার দুঃখের কাহিনি বর্ণনা করেছিল। অন্তত আমার মতো অনাত্মীয়কে তার হতাশার বিবরণ শোনাবার যোগ্য লোক ঠাওরে নিতে কোনো সঙ্কোচ করেনি। আমি বললাম, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভর্তি হলে তো তোমাকে শহরেই থাকতে হবে। রামরাইলের মতো দূর থেকে এসে কি ডেইলি স্কুল করতে পারবে?'

'শহরেই থাকব। শহরে আমাদের কোনো আত্মীয় নেই। তবে দিদির পরিচিত এক নার্স আছেন। হাসপাতালে কাজ করেন। অবশ্য কোন পাড়ায় থাকেন তা জানি না।'

কথা বলতে বলতে আমরা কুরুলিয়ার সেতুটি পার হয়ে এলাম। তখনকার সেতুটি বর্তমান সেতুটির মতো কংক্রিট নির্মিত না হলেও সেটাও ছিল লোহার ফ্রেম দ্বারা মজবুতভাবে তৈরি। পরবর্তীকালে কত চাঁদনি রাতে আমি আর শোভা শহর থেকে হাঁটতে হাঁটতে এই সেতুর ওপর নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। আমার সাথে শোভাকে দেখে আশপাশের গ্রামের লোকেরা ভেবেছে, মোল্লাবাড়িতে এমন বেপর্দা মেয়েটি কার? ভদ্রতার খাতিরে আমি শোভাকে কোনোদিন বলতে পারিনি, শোভা আমাদের এভাবে বেরুনো ঠিক নয়। কতদিন ভেবেছি আজ বলব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা হয়নি। তাছাড়া শোভা এমন একটি পরিবেশে মানুষ হয়েছিল, এ কথা বললে সে দুঃখ পেতই। আর দ্বিতীয় উপায় ছিল আমারই তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো। আজ স্বীকার করি আমার সে সাধ্য ছিল না। এর কারণ প্রেম কি না আমি জানি না। হয়তো প্রেম, কিম্বা হয়তো নতুন বইয়ের আকর্ষণই ছিল এর পেছনে। বইয়ের ভেতর অচেনা জগৎ। অচেনা এক অস্বীকারের, বিদ্রোহ ও নাস্তিক্যের জগৎ যে জগতের সাথে আমার পূর্বপুরুষের রক্তের ছিটা যেখানে যেখানে গেছে তাদের কারোরই কোনো সম্পর্ক ছিল না। শত শত বছর ধরে এই উপমহাদেশে তারা যা প্রচার করতেন ও নিজেদের লতাগুল্মসহ আমল করতেন তাতে আর যাই হোক কোনোরূপ নাস্তিকতাকেই আস্বাদন করতে হয়নি। শুধু আমি সেই হতভাগা যে কবিসুলভ ঔদাসীন্যে হাঁটতে হাঁটতে এক আগুনের গর্তের ভেতর পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়েছি।

আমরা শোভার দিদির সাথে এসে মিলিত হলে তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি শোভার সাথে কী নিয়ে আলাপ করছি। শোভা হেসে জবাব দিল, 'ও বলছিল নদীর স্রোত নাকি কারো জন্য অপেক্ষা করে না।'

এটা ছিল শোভার নির্জলা মিথ্যা ভাষণ। তার কথা শুনে দিদি বলল, 'ওমা তাই নাকি? তবে তো তুই একজন ভাবুক বন্ধু পেয়েছিস।'

'কিন্তু এই ভাববাদীর তো আমার চেয়ে তোমার প্রতিই টান বেশি মনে হচ্ছে। আমার বন্ধুত্ব ও চাইবে না বরং তোমার সাথেই বনবে ভালো। তোমার যেমন দেবদ্বিজে ভক্তি।'

বলল শোভা। আমি বুঝলাম শোভা কিশোরী নয়, আমার সবময়েসী হয়েও সমান বয়েসী নয়। তার এমন অসাধারণ কোনো অভিজ্ঞতা রয়েছে যা আমার নেই। সে জগৎকে দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেয়েছে। যা আমার নেই। এই প্রথম চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে আমি শোভার মুখখানির দিকে তাকালাম। শোভা দেখতে সুন্দর নয়। স্বাস্থ্যেও তেমন কোনো আকর্ষণ আছে বলে মনে হলো না। তবে চোখ দুটিতে একটা অসন্তুষ্টির দীপ্তিমান শিখা জ্বলছে। আমার হৃদয় অকারণে সেই বহ্নিতে তপ্ত হয়ে উঠল। আমি চোরা চোখে শোভাকে বার বার দেখতে লাগলাম। শোভার গায়ে একটা হলুদ রঙের ঢোলা গাউনের মতো ফ্রক ছিল। ঝুলটা হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে। গায়ের রঙ ফর্সা মনে হলেও আসলে কালো। তবে সম্ভবত শরীরের প্রতি অতিশয় যত্নশীলা হওয়াতেই গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল বলে ভ্রম হয়। গায়ে মোটা খদ্দরের আলোয়ান, পায়ে সাধারণ স্যান্ডেল। পা দুটি বেঢপ মেয়েদের পায়ের মতো নয়। গোড়ালি ফাটা। হাঁটাটা কেমন যেন একটু পুরুষালি।

আমি শোভার পাশাপাশি চলতে লাগলাম। শোভার টুকটাক কথাবার্তায় বুঝলাম শোভা আশপাশের গ্রাম জনপদগুলো সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভালো ধারণা রাখে। ভাদুগড়ের কাছে এসে বলল, 'এই পুকুরটার নাম ফাটাপুকুর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'তুমি তো এখানকার সবকিছু চেন দেখতে পাচ্ছি।'

'বারে চিনব না কেন। আমি এখানকার মেয়ে তো। এই ভাদুগড়ের গফুর মাস্টারের মেয়ে আমার সাথে পড়ত। নামটা এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। গফুর স্যার আমার শিক্ষক।' বলল শোভা।

আমি অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'গফুর মাস্টার তো আমার খালুজান হন। মেয়ের নাম পুতুল। আমার বোন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ পুতুল তোমার বোন?'

আমি মাথা নাড়লাম। শোভাদের বাড়িতে একদিন ছিলাম। মনে পড়ে পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ি ফিরে আসি। অপরিচিত পরিবেশে আমি কেন জানি সহজ হতে পারি না। আজকাল অবশ্য অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। তবুও সঙ্কোচ আমাকে ছাড়তে চায় না। এখনও মনে পড়ে শোভার দিদি যখন আমাকে ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাত খেতে দিয়েছিল, আমার সেকি বিব্রতকর অবস্থা। কাঁসার থালায় এর আগে কোনোদিন লোকমা ধরিনি। তখন শুধু আমাদের কেন আমাদের এলাকার কোনো মুসলিম পরিবারেই কাঁসার কোনো ব্যবহার ছিল না। যদিও নিষিদ্ধও ছিল না।

শোভার পরিবার অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমার অনভ্যাসের দরুন আমি কাঁসার বাসনে পরিতৃপ্তি নিয়ে আহার করতে পারিনি। পরবর্তীকালেও আমি কারো বাড়িতে কাঁসার থালায় খেতে দিলে ঠিকমতো পেটভরে ভাত খেতে পারিনি। এর কারণ আমি জানি না। হয়তো এর কারণ মানসিক। আবার অবচেতনে সাম্প্রদায়িকও হতে পারে। এ নিয়ে আমার কোনো তর্ক নেই। শুধু এই হয় যে কাঁসার থালায় খেতে দিলে আমার নাকে বাসি গন্ধ এসে লাগে। মনে হয় সবকিছু বুঝি এখনই বমি করে ফেলব। এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা।

শোভাদের বাড়ি থেকে দুটি বই আর একটি ছোট পাঠাগারের ঠিকানা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। পাঠাগারের নাম লালমোহন স্মৃতি পাঠাগার। আর বই দুটির একটির নাম ছিল 'ইতিহাসের ধারা'—দিয়েছিল শোভা। আর অন্যটির নাম, 'রাইকমল'—দিয়েছিলেন শোভার দিদি।

শোভা বলেছিল, 'ইতিহাসের ধারা' বইটি আমাকে শোভার উপহার। এটি আর তাকে ফেরত দিতে হবে না।

১৬

আমাদের শহরে যে এমন একটি ছোট্ট পাঠাগার থাকতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমি যেদিন প্রথম লালমোহন পাঠাগারে যাই সে দিনটির কথা আজও অস্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারি। এখন যেখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়টি আছে, সেখানে ছিল এক অ্যাডভোকেটের বাড়ি। ভদ্রলোক ছিলেন মার্কসবাদী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। কয়েকবার জেলও খেটেছিলেন। তবে তিনি কম্যুনিস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্টির সদস্য ছিলেন কি না আমার জানা ছিল না। তাঁর নামটাও আজ ভুলে গেছি। তাঁর সাথে পাঠাগারটির গভীর যোগসূত্র ছিল, তা আমি লক্ষ করতাম। যদিও তিনি পাঠাগারে খুব কমই যাতায়াত করতেন তবুও বুঝতে অসুবিধা হতো না পাঠাগারটির পেছনে তাঁর আদেশ-নিষেধ সক্রিয় আছে। পাঠাগারটি ছিল তাঁর বাড়ির লাগোয়া। বর্তমান মহিলা কলেজের উত্তর দিকে এখন যেখানে সরকারি মাতৃসদন—ঠিক এখানেই একটি অতিশয় ক্ষুদ্র কুটিরে মাত্র এক আলমসারি বই নিয়ে পাঠাগারটি এর আসর জমিয়েছিল। আলমারিটাও তেমন বড় নয়। একটা সাধারণ মাপের তিন-চার তাকের আলমারি। তাকগুলো বাঁধাই করা বইয়ে ঠাসা। সবই তৎকালীন বাছাই করা উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। পরে জেনেছিলাম যত বই এই আলমারিতে আছে তারও তিনগুণ বই পাঠক সাধারণের হাতে হাতে ঘোরে। তারপরও পাঠাগারের মনোনীত সদস্যদের পাঠতৃষ্ণা মেটাবার জন্য নিষিদ্ধ সাহিত্যের একটা গোপন উৎস কোথাও লুকানো আছে। আছে গোপন পাঠচক্র ও আলোচনা সভা। শহরের সাহিত্যপ্রেমিক নানা শ্রেণির নর-নারীর সাথে আছে এই পাঠাগারের আত্মীয়তা। শহরের বহু উদীয়মান লেখক ও সংগীত-প্রতিভার সাথে এই লালমোহন স্মৃতি পাঠাগারেই আমার আলাপ হয়—পরবর্তীকালে যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যদিও এই পাঠাগারটি পরিচালিত হতো এক গোপন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ ও সাম্যবাদ প্রচারেই এর পুস্তকসম্ভার সজ্জিত ছিল, তবুও এ কথা স্বীকার না করে পারি না, আমার জীবনের সত্যিকার শিক্ষা, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসায় স্বভাব এবং রুচি নির্মাণে এই গ্রন্থাগারটি যে ভূমিকা পালন করেছিল এর কোনো তুলনা হয় না। আজ যদিও অতীতের সেই পাঠাগারটির গোপন সকল উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক তৎপরতার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে আমার আদর্শগত অবস্থান, তবুও পাঠাগারটির পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ আর জ্ঞান বিতরণে এদের ঐকান্তিকতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরকাল অটুট থাকবে।

প্রথম যেদিন পাঠাগারে গেলাম, দিনটা ছিল খুব সম্ভবত রোববার, ছুটির দিন। আমি হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলাম। আমার পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি। পায়ে চটি। সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকে গেলাম। একজন লোক একটা ছোট টেবিল সামনে রেখে বসে আছেন। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে কিছু তেল মাখানো মুড়ি। পাশে একটা খোলা বই। টেবিলের বাঁ পাশে একটা টুলে দু'তিন জন মানুষ বসে ফিসফাস করছে। সকলেই যুবক। বিনা ভূমিকায় আমার আকস্মিক প্রবেশে সকলের মধ্যেই একটা নিঃশব্দ কৌতূহল। মুড়ি নিয়ে বসে থাকা ভদ্রলোক মুখ তুলে বললেন, 'কী চাই?'

'বইপত্র দেখতে এসেছি।'

'বস।' বললেন ভদ্রলোক। আমি বসলাম।

'কোত্থেকে এসেছ?'

'এই শহরেই আমাদের বাড়ি। মৌড়াইল, মোল্লাবাড়ি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, আমি শোভার ঠিকানা লেখা স্লিপটা তার হাতে দিলে তিনি পা থেকে আমার মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলেন। অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে অমায়িকভাবে হাসলেন। 'শোভার সাথে বুঝি খুব খাতির?'

তাঁর প্রশ্নে আমি একটু লজ্জিত হয়ে হাসলাম।

'শোভা তো খুব জাঁহাবাজ মেয়ে দেখতে পাচ্ছি। সোজাসুজি মোল্লাবাড়িতে গিয়ে হানা দিয়েছে।'

আমি ভদ্রলোকের কথার ইঙ্গিতটি ঠিকমতো ধরতে না পারলেও তার সাথে সাথে হাসলাম। বললাম, 'আমি আলমারির বইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখি।'

'নিশ্চয় দেখবে। কোন ধরনের বই তোমার পছন্দ বল, আমি তাকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার নাম কানু ঘোষ। আমাকে ইচ্ছে হলে কানুদা বলে ডাকতে পার। এরা সবাই ডাকে।'

তিনি টুলে বসে থাকা যুবকদের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারাও হাসল। আমি বললাম, 'কানুদা, আমি গল্প উপন্যাস পড়তে ভালোবাসি। ওই ধরনের বইয়ের খোঁজেই আমি এসেছি।'

কানুদা বললেন, 'বেশ রোমান্টিক স্বভাব তো তোমার। ভালো, কবিতা পড়তে ভালোবাস না?'

'রবীন্দ্রনাথ-নজরুল পড়ি।'

'ও ওই বেড়া এখনও পার হওনি? বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য এসব সিঁড়িতে এখনও বুঝি পা পড়েনি?'

বললেন কানু ঘোষ। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। সত্যি আমি তখনও এদের নাম শুনিনি। আমার অবাক হওয়া দেখে কানুদা হাসলেন, ঠিক আছে হবে। তুমি কার উপন্যাস পড়তে ভালোবাস বল।'

আমি বললাম, 'আমি তারাশঙ্করের 'রাইকমল' পড়েছি। তারাশঙ্করের বই থাকলে দিন।'

তিনি আমার কথায় খুশি হয়ে আলমারির দিকে ফিরলেন। হাতড়ে বের করলেন দুটি প্রমাণ সাইজের পুস্তক। বইটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও তোমার তারাশঙ্কর।' দেখলাম, গণদেবতা। আমি খুব খুশি হয়ে বইটি উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলাম। আমার কৌতূহলটা কানু ঘোষ আড়চোখে কতক্ষণ দেখে নিয়ে খুশি হয়ে বললেন, 'নাও মুড়ি খাও। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি পড়েছ?'

'না তো।' আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি তাঁর হাতের বইটি আমাকে দিলেন। আমি বইটি হতে নিয়ে একটু দেখে বললাম, 'দুটি বইই আমার দরকার।'

'বেশ নাও। তার আগে চার আনা পয়সা দিয়ে পাঠাগারের সদস্য হয়ে যাও।'

বললেন কানুদা।

আমি পকেট থেকে পয়সা বের করে দিলাম। কানুদা টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে আমার নাম লিখলেন। শেষে একটি রসিদ দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালমোহন পাঠাগারের সাথে বেশ ভালোভাবেই জড়িয়ে গেলাম আমি। জড়িয়ে গেলাম এদের রাজনৈতিক আদর্শের সাথেও। বুঝে হোক না বুঝে হোক আমি মার্কসীয় চিন্তা চেতনার ভেতর সমাজটাকে পাল্টে ফেলার একটা রঙিন স্বপ্নের দিকে ডানা মেলে দিলাম। না বুঝে বলছি, কারণ আমার তখন যে বয়স সে বয়সে আর যাই হোক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পরিপাক করার মতো হজমশক্তি থাকার কথাই নয়। তাছাড়া আজ মনে হচ্ছে নাস্তিক্য প্রচারের এমন একটা নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল, যা একবার কাউকে পেয়ে বসলে সহজে ছাড়ানো যায় না। আমি প্রায় উন্মত্তের মতো হয়ে গেলাম। যেখানে সেখানে ধর্ম নিয়ে তর্ক জুড়ে গায়ের জোরে জিততে চাইতাম। অথচ তর্কের পুঁজি যে যুক্তি তা আমার ঝুলিতে ছিল অপেক্ষাকৃত কম। আমার আচরণ একদম বদলে গেল। আগে যেসব কাজকে আমি গভীর গোনাহ্‌র মনে করতাম। এখন আর তা তেমন মন্দ রইল না। আমি তখন মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা 'ছোটদের রাজনীতি', 'ছোটদের অর্থনীতি', 'ইতিহাসের ধারা' ও ডারউইনের বিবর্তন বিষয়ক আজগুবি কেচ্ছাকাহিনি পড়ে বেশ পাক্কা হয়ে উঠেছি। আল্লাহর ভয় বুক খালি করে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। না, সম্ভবত এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। না, আল্লাহর ভয় হয়তো আমাকে একেবারেই পরিত্যাগ করে যায়নি। বরং অন্তরের অন্তস্থলে আমার ইসলাম প্রচারক পূর্ব-পুরুষদের দোয়ার বরকতে কোথাও সামান্য অবশিষ্ট ছিল। যার জন্য আবার আমার পক্ষে প্রত্যাবর্তনের একটি সোজা পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়া সম্ভব হয়েছে।

এ সময়কার একটি পারিবারিক ঘটনার বর্ণনা দিতে বড় সাধ জাগছে। একদিন দুপুরবেলা আমি আগেই খেয়ে-দেয়ে আব্বার খাটে দিবানিদ্রার চেষ্টা করছি। গ্রীষ্মের খর দুপুর। আব্বা মসজিদ থেকে ফিরলেন। আম্মাও খাবার দস্তরখান মেলে আব্বার জন্য বসে ছিলেন। খেতে খেতে দু'জনের কথোপকথন চলছে। আম্মা বলছেন, 'শেষ পর্যন্ত আপনার ছেলে হলো গিয়ে একটা নাস্তিক? মানুষ হওয়ার আমি আর কোনো আশা তো দেখতে পাচ্ছি না।'

আমি যে জেগে আছি সম্ভবত তা কেউ আন্দাজ করতে পারেননি।

আব্বা বললেন, 'কেন কী হয়েছে?'

'আপনার ছেলে আল্লাহ-রসুল মানে না।'

'কেন মানবে না?'

'কেন মানে না তা আমি কেমন করে বলব। পাড়ার ছেলেরা এসে নালিশ করে যায়। আপনাকে জানালাম। দিনরাত বাজে বই পড়ে এই হলো ফল।' আম্মার জবাব।

আব্বার আর কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। শুধু খাওয়ার শব্দ। আমি একবার চোখ মিটমিট করে অবস্থাটা দেখে নিলাম। আব্বার চেহারাটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। ভাবলাম নিশ্চয় খুব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তিনি রেগে গেলে যেমন লাল হয়ে যান। আমার বেশ ভয় লাগল।

আব্বা জবাব না দিয়ে খাওয়া শেষ করলেন। আমি তখনও কান পেতে আছি। আব্বা খাওয়ার বিছানায় বসেই ফারসি হুঁকোয় তামাক টানতে লাগলেন। বুঝতে পারছি আম্মার খাওয়া শেষ হয়নি। হঠাৎ আব্বা আম্মাকে সম্বোধন করে কথা শুরু করলেন, 'তোমার ধারণা ঠিক নয়।'

'আমার কোন ধারণাটা বেঠিক?'

'এই যে বললে, বই পড়ে ছেলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'পাড়ার লোকেরা, আমাদের আত্মীয়-স্বজনরাই বলছে।'

'তাদের এসব কথাবার্তা ঠিক নয়।'

আব্বা এবার বেশ জোর দিয়ে কথাটা বললেন। আমার ওপর আব্বার ভরসা দেখে আম্মা বোধহয় একটু স্বস্তিবোধ করলেন। আম্মা সম্ভবত চাইছিলেন আমার বিষয়টা আব্বাকে জানিয়ে একটু হালকা হতে। এখন আব্বার কথায় তার ভয়টা খানিকটা কাটল। তিনি খাওয়া শেষ করে বাসনকোশন তুলে রাখতে দাঁড়ালেন। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আব্বা বললেন, 'বসো। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।'

আম্মা বসতে গিয়ে বললেন, 'আমার দায়িত্ব আপনাকে আপনার ছেলের ব্যাপারে জানানো। আমি জানিয়ে দিয়েছি।'

আব্বা বেশ কিছুক্ষণ কথা না বলে তামাক টানতে লাগলেন। আমি তখন এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে চোখ মুদে খাটে শুয়ে আছি। একবার ভাবলাম উঠে চলে যাই। কারণ আমি চলে গেলে আব্বা হয়তো খাটে এসে একটু বিশ্রাম নিতে পারবেন। কিন্তু এ সময় উঠতে সাহসই হলো না।

আব্বা হুঁকোর নলটাকে গোল করে পেঁচিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'আমি আমার ছেলের ব্যাপারে তোমাকে আরও কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন।'

'ছেলে-মেয়েদের বাপ-মা সবটুকু মানুষ করতে পারে না। তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজের মতো মানুষ হয়। এতে আমাদের চেয়ে আল্লাহর হাত বেশি। আমরা শুধু লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে একটু সাহায্য করতে পারি মাত্র।'

আম্মা কিছু না বলে সম্ভবত আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ আমার বিছানা অর্থাৎ খাট থেকে শোয়া অবস্থায় তাঁকে দেখা যায় না।

'আর আমার বংশে আল্লা-রসুল মানে না এমন সন্তান কেন জন্মাবে। আমার ছেলেও এমন হবে না, হতে পারে না। আমি আমার ছেলের জন্য দোয়া করি।'

ফের আব্বার গলা। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তিনি কথা বলছেন। আম্মা এ অবস্থায় কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে আব্বাকে আবার একটু তামাক খাওয়ার লোভ দেখালেন, 'আপনাকে আরেক ছিলিম তামাক দিই, দেব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দাও।'

আম্মা উঠে গেলেন।

একটু পরেই কল্কে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিলেন।

আব্বা হুঁকোয় টান দিতে দিতে বললেন, 'আচ্ছা তোমার ছেলে কি তোমার সাথে কোনোদিন কোনো মিথ্যে কথা বলেছে?'

'না।'

'না বলে টাকা পয়সা তুলে নিয়েছে?'

'না। কোনোদিন নেয়নি।'

'তবে তোমার ভয়ের কিছু নেই। আমি তো দেখি খাওয়াপরা বাবুগিরির প্রতিও তেমন একটা আগ্রহ নেই। শুধু দিনরাত সাহিত্য পড়ে। পড়ুক না, এতে আর বয়ে যাবে না। তুমি অযথা চিন্তা ছেড়ে দাও।'

বলে আব্বা উঠে পড়লেন। আম্মা তাড়াতাড়ি এসে আমার পিঠে ঠেলা দিলেন, 'ওঠ তোর বাপ শোবে।'

আমি লাফিয়ে উঠে গেলাম। আমি তো সজাগই ছিলাম। এই সুযোগে বাইরে চলে এলাম। আসার সময় আমার বাপ-মাকে আড়চোখে একবার ভালো করে দেখে নিলাম। আম্মা তখন চাদর উঠিয়ে আব্বার জন্য ধবধবে নতুন চাদর পেতে বিছানা ঠিক করে দিচ্ছেন। আর আব্বা একদৃষ্টিতে আম্মাকে দেখছেন। কী গভীর প্রেমে সতেজ এদের পরস্পর-নির্ভরতা। আমার তখনই কেন জানি মনে হলো, আল্লাহ আছেন। চিরদিন থাকবেন। আমি কেন নাস্তিক হতে যাব?

আগেই বলেছি আমি তখন লালমোহন পাঠাগারের সাথে খুব ভালোভাবেই জড়িয়ে গেছি। এমনকি অসুখ-বিসুখে কানুদা কোনোদিন যদি পাঠাগার খুলতে অপারগ হন তবে আমাকে পাঠাগার খোলার চাবিসহ অনুমতি দিয়ে যান। শুধু পাঠাগার নয় আমি তখন এর অন্তরালবর্তী চক্রের সাথেও মেশামেশির পর্যায়ে পৌঁছেছি। এদের মূল আড্ডা ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন। সেখানেও আমার যাতায়াত। সেখানে অমৃতলাল বলে একজন রাজনৈতিক কর্মীর সাথে আমার হৃদ্যতা জমে উঠল। এখন তার উপাধি বা পদবিটাও আমার স্মরণ নেই। তবে তার পরিবারটির ত্যাগ স্বীকারের কথা আমি জানতাম। বার বার জেল-জুলুম-উৎপীড়নে এরা একেবারে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি সে আমলে ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এদের ব্যাপারে সরকার ছিল অত্যন্ত নির্মম। তবুও এরা কাজ করে যাচ্ছিল অতি সতর্কতার সাথে। যতটা না এদের আদর্শবাদ ও লিটারেচার পড়ে আকৃষ্ট ছিলাম তারও চেয়ে বেশি এদের সহনশীলতা, ত্যাগ ও অত্যাচারিতের সপক্ষে দাঁড়ানোর মতো মনোবল ও বীরত্ব আমাকে আকৃষ্ট করল। এরা মাঝেমধ্যে গভীর রাতে শহরের দেয়ালগুলোতে হাতে লেখা পোস্টার সাঁটত। পরের দিন সারা শহরে হইচই লেগে যেত। কর্তৃপক্ষও চুপচাপ বসে থাকত না। যে করেই হোক তারা এদের খুঁজে বের করে ফেলত। দেখা যেত বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে থেকে হঠাৎ দু'একজনকে পুলিশ ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে গেছে।

এ ধরনের বীরদের প্রতি স্বভাবতই আমার কিশোর মনে শ্রদ্ধাভক্তি বাড়তে লাগল। এমন হলো যে দু'একবার শুধুমাত্র বীরত্বের লোভে আমিও এদের সাথে গভীর রাতে পোস্টার সাঁটতে বেরিয়েছি। আরও একটা বিষয় ছিল। বিষয়টা হলো এতে শোভা খুব খুশি হত। জানি না, কেন আমি শোভাকে খুশি করতে চাইতাম।

শোভা তখন হাসপাতালের কোয়ার্টারে তার দিদির এক বান্ধবীর বাসায় থাকে। হাসপাতালের দক্ষিণ পাশে গার্লস স্কুলে পড়ে। সময়ে-অসময়ে সে আমাদের বাড়িতে আসত। আমি অবশ্য একদম পছন্দ করতাম না তার এই গায়ে পড়ে আসা-যাওয়া। তার সাথে আমার এমনিতেই সপ্তাহে একদিন রোববার পাঠাগারের পথে দেখা হয়ে যেত। সে হাসপাতালের গেটে বিকেল পাঁচটায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। আমি গেলেই রাস্তা থেকে আমায় নার্স কোয়ার্টারে নিয়ে যেত। সেখানে অকারণে ঘরের মুরব্বিরা আমাকে তোয়াজ করত। চা বানিয়ে দুটি সন্দেশ কিংবা এক প্লেট ছানামুখিসহ এগিয়ে দিত খেতে। শোভা আমাদের বাড়িতে গেলে আম্মা অবশ্য তাকে খুব আদর করতেন। আম্মার আচারের বৈয়ামগুলো শোভা একাই খেয়ে সাবাড় করত। খেতও নির্লজ্জের মতো। তার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ বাছ-বিচার ছিল না। গরুর গোশতো রান্না হলে শোভা কীভাবে যেন এসে হাজির হত। খেয়ে হাত মুছতে মুছতে বলত, মাসি যা গরুর মাংস আমার পেটে গেছে কোনো বামুনের সাধ্য নেই আমাকে আর হিন্দু বানায়। আমি জন্মজন্মান্তরের জন্য মুসলমান হয়ে গেছি। এ্যাঁ মা আমার এখন কী হবে?'

শোভার কথায় আম্মা না হেসে পারতেন না। বলতেন, 'এই বাঁদর মেয়ে চুপ কর। পাশের ঘরের বউরা শুনলে হাসবে।'

১৮

একদিন বিকেলের দিকে পাঠাগারের বই ঘাঁটছি দেখে কানুদা আমাকে বললেন, 'তোমার সাথে আমার একটু কথা আছে। আমার সাথে আসবে?'

আমি বললাম, 'চলুন। কোথায়?'

'আমার পেছনে এসো।'

আমি তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি আমাকে নিয়ে লোকনাথ ট্যাঙ্কের ঘাটলায় এসে থামলেন। বললেন, 'এখানে একটু বসা যাক।'

আমি তাঁর পাশে বসলাম। কানুদা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। আমিও তাঁর বক্তব্যের জন্য অপেক্ষা করছি। পার্কে লোকজন ঘোরাফেরা করছে। টেনিস কোর্টে ডা. হীরালালের সাথে কে একজন ভদ্রলোক টেনিস খেলছেন। ডা. হীরালাল শহরের বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন তখন। আমাদের পরিবারের সবাইকে চেনেন। বলতে গেলে তিনি ছিলেন আমাদের পারিবারিক চিকিৎসকও। আমাকে ঘাটলায় কানুদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে বসে থাকতে দেখে তিনি দু'বার ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখলেন। তারপর আবার খেলায় মনোনিবেশ করলেন।

'আজ রাতে আমি তোমাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই।'

বললেন কানুদা। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কথা বললাম না। কানুদা আবার কতক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকলেন। তারপর বেশ ধীরেসুস্থে প্রস্তাবটা পাড়লেন, 'আচ্ছা তোমাদের বাড়িতে আজ রাতে একজন কমরেডকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে? মাত্র একটা রাতের জন্য?'

আমি বুঝতে পারলাম না এটা কী ধরনের প্রস্তাব! আর এর জন্য এত রাখঢাকেরই বা কী আছে? শুধু আন্দাজ করলাম, এ কাজে বিপদ আছে। তা না হলে এটুকু কাজের জন্য এতদূর ডেকে আনার ছিল না। সম্ভবত কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক কর্মী। পেছনে হুলিয়া ঝুলছে। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমি ত্বরিত আমার জবাব কী হবে ঠিক করে ফেললাম। একটু লজ্জিতভাবে বললাম, 'কানুদা একজন লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। এটা আমি পারব। কিন্তু থাকতে দেব কোথায়?'

'কেন তুমি কোথায় থাক?'

'আমি যেখানে থাকি সেখানে অন্য কারো থাকার সুবিধে নেই। তা ছাড়া সেটা হলো মসজিদের ইমাম সাহেবের ঘর। যদিও তিনি থাকেন না। তবুও এ ঘরে বাইরের লোককে অনুমতি ছাড়া থাকতে দেওয়া যায় না।'

'তবে তো মুশকিল হলো।'

গম্ভীর হয়ে কানুদা বললেন। আমি তার এই অসন্তুষ্টিকে পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'আমাদের বাড়িতে তার খাওয়া হয়ে গেলে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন। আপনি চান তো আমি তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসব।'

'বুঝলাম কিন্তু শেলটারটা পাবে কোথায়?'

'কেন শোভাকে বলুন না। সে যেখানে থাকে সে বাসায় একটা লোক একটা রাত অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া সরকারি বাসা, কেউ সন্দেহও করবে না। ঘরও আছে বাড়তি।'

আমার কথায় কানুদা আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি অবশ্য বললাম এই ভেবে যে এ ধরনের একটা রোমাঞ্চকর দায়িত্ব পেয়ে শোভা সম্ভবত খুশিতে ডগমগ করবে। কিন্তু কানুদা এতে তেমন প্রীত হলেন না। বললেন, 'ঠিক আছে খাওয়ার ব্যবস্থা তুমি কর। থাকাটা আমি দেখব।'

কানুদা শোভাকে বিপদগ্রস্ত করতে চান না এটা বুঝে আমি আর কথা বাড়ালাম না। লোকটা কীভাবে আমাদের বাড়িতে পৌঁছুবে তার খুঁটিনাটি আমাকে জানিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। আমি ঘাটলায় চুপচাপ কতক্ষণ বসে থাকলাম।

এতক্ষণে টেনিস খেলা শেষ করে ডা. হীরালাল আমার দিকে এগিয়ে এলেন। ঘাটলায় এসে আমার বিপরীত দিকে শান বাঁধানো পৈঠায় বসতে বসতে বললেন, 'এই যে মোল্লাবাড়ির ছেলে, এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কানুদার পরিচয় দিলে তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ। রাজনীতির সংস্রব থেকে এ বয়সে একটু দূরে থাকাই ভালো। তোমার বাবা-মা কেমন আছেন?'

'ভালোই আছেন।'

'আচ্ছা চলি।'

ডাক্তার বাবু উঠে গেলে আমার মনে একটু ভয় ধরে গেল। আমি আমার অজ্ঞাতে এক অজানা বিপদের দিকে এগোচ্ছি না তো!

ফেরার পথে ভাবলাম, শোভাকে বিষয়টা জানিয়ে গেলে মন্দ হয় না। হাসপাতালের গেটে এসে দেখি সন্ধ্যা রাতের আবছা আঁধারে পরিচিত ছায়ামূর্তিটি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে কাছে এগোতে দেখে অভিমান ভরে বলল, 'না এলেই তো পারতে।'

বললাম, 'কানুদা আটকে রেখেছিল। কে একজন কমরেডকে নাকি আজ রাতে খানা খাওয়াতে হবে।'

'কোন কমরেডকে?'

'নাম তো জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'এটা তো ঠিক হয়নি। এ দায়িত্ব নিতে গেলে কেন?'

'কানুদা বললেন। আর একজনকে খাওয়াতে বললে আমি কীভাবে বলি যে পারব না। তিনি তো রাতে থাকার জন্য শেলটারও দিতে বলেছিলেন। আমি রাজি হইনি।'

শোভা দেখলাম একটু হকচকিয়ে গেল, 'সব্বানাশ, এটা তো ঠিক নয়। শেলটার দাওনি বেশ করেছ! সব্বানাশ!'

আমি অবশ্য শোভাদের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করার যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা একদম চেপে গেলাম। শোভা যে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল, এটা বুঝতে পেরে মনে মনে দারুণ লজ্জিতও হলাম।

আমি বললাম, 'আমি যাই। ভদ্রলোক রাত সাড়ে আটায় আমাদের মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন। ঘরে কী রান্না হয়েছে তাও জানি না। রাতে সম্ভবত শাক শুঁটকি ছাড়া কিছুই থাকবে না। আম্মাকে বলে দেখি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

'থাক কোনো কিছুর দরকার নেই। যা আছে তাই খাবে।'

শোভা আমার হাত ধরে টান দিল। আমি বললাম, 'এখন তোমাদের বাসায় গেলে কী করে হবে? লোকটা তো খুঁজবে।'

শোভা বলল, 'রাত সাড়ে আটটার অনেক দেরি। বাসায় চা খাবে চলো।'

শোভা একপ্রকার টেনে-হিঁচড়ে তাদের বাসায় নিয়ে গেল। চা খাওয়া হয়ে গেলে শোভা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ কাজ করতে গেলে কেন?'

'কী কাজ?'

'ঐসব পালিয়ে বেড়ানো বিপ্লবীদের খাওয়া-থাকার দায়িত্ব নেওয়ার কাজ?'

'তুমি তো এদের ভালোবাস!' আমি হেসে জবাব দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চুপ করো। ভালোবাসাবাসির তুমি কিছু বোঝ না। আর কোনোদিন এ কাজ করবে না, বল করবে না। করবে?'

আমি হেসে ফেললাম, 'আজ তো অন্তত দায়িত্বটা পালন করতে হবে। আজ ছেড়ে দাও।'

'না, আমি একলা তোমাকে ছেড়ে দেব না। আমিও যাব। দেখব কমরেডটি কে? ভয় নেই, আমি কারো সামনে যাব না। মাসিমার কাছে বসে থাকব।'

শোভা নাছোড়বান্দা। অগত্যা আমি ও শোভা দরজার শিকল তুলে দিয়ে রাস্তায় এসে নামলাম। ফিরতে রাত হবে। এ কথা অবশ্য শোভা তার বাসার লোকদের জানিয়ে দিয়ে এসেছে।

এশার নামাজের পর লোকটি এল। জামাতের লোকজন তখন মসজিদ ছেড়ে যায়নি। আমি মসজিদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের, কিম্বা তার বেশিও হতে পারে, বয়সের এক যুবক এসে আমার সামনে দাঁড়াল, 'আমার নাম সুনীল।'

'আসুন।'

আমি তাকে নিয়ে আমার বাইরের থাকার ঘরে ঢুকে পড়লাম। ততক্ষণে মসজিদ ফাঁকা হয়ে গেছে। আলো নিভিয়ে মসজিদের দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, 'সুনীল বাবু, আমাদের ঘরে আজ পুঁইশাক আর শাদা ভাতা ছাড়া কিছুই রান্না হয়নি। আমি আমার মাকে ঠিক সময় জানাতে পারলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হতো। আমি তা পারিনি। আপনাকে এ দিয়েই খেতে হবে।'

ভদ্রলোক অমায়িকভাবে হাসলেন। আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওতেই হবে। আমার একটু ডাল ভাত হলেই হয়।'

'আমরা আবার ডাল ভাত নিয়মিত খাই না। মাঝেমধ্যে রাঁধা হলেও কেউ খেতে চায় না। বাসি হয়। আর আমার আম্মাও মুশরির ডাল ঠিকমতো রাঁধতে জানেন না। আপনাকে, কমরেড, শুধু পুঁইশাক আর চিংড়ি মাছ দিয়েই ভাত খেতে হবে।'

আমার সরলতায় কমরেড সুনীল মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, 'তোমাদের ঘরে যা রাঁধা রয়েছে, তাই নিয়ে এসো, খাব। তার আগে এসো তোমার সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করা যাক। তুমি নাকি খুব পড়াশোনা কর?'

আমি বুঝলাম সুনীল বাবু আমার সাথে রাজনৈতিক আলাপ জুড়ে দিতে চান। ইতোমধ্যেই এ ধরনের বিপ্লবীদের চালচলন ও কথাবার্তা সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হয়ে গেছে। শুধু শোভাকেই বুঝতে পারছি না। কেমন যেন অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে তার মামুলি কিন্তু রহস্যময়ী মুখখানি আনত হয়ে আছে।

সুনীল বাবু দেখতে বেশ গাট্টাগোট্টা স্বাস্থ্যবান মানুষ। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি খদ্দরের। চোখে পুরু কাঁচের মোটা ফ্রেমের চশমা। পায়ে চটি। মুখখানিতে একটা সদাহাস্যরত সহনশীলতার ছাপ। চোখ দেখলেই উঁচুস্তরের শিক্ষা-দীক্ষা ও বুদ্ধির দীপ্তি ধরা পড়ে। গায়ের রঙ শ্যামলা। কালোই বলা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তার কথার আগ্রহাতিশয্যকে এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'আগে খেয়ে নিন। এলাকাটা আপনার জন্য তেমন নিরাপদ নয়। স্টেশনের কাছে বলে নানা রকম লোক আসে। তাছাড়া আমার এক নানা আজিজুল হক মোল্লা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বলে এ বাড়িতে সবসময় মানুষের ভিড় লেগে থাকে। আপনাকে খেয়েই রওনা হতে হবে।'

তাকে আর কিছু বলতে না দিয়েই আমি বেরিয়ে এলাম। সবই শোভার শেখানো বুলি। শোভা তখন আমার মায়ের কাছে বসে কার যেন বিশাল টিউমার অপারেশনের গপপো মারছে। অর্থাৎ হাসপাতালের আজগুবি গল্প ফেঁদে আমার মাকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে।

১৯

সুনীল বাবু পুঁইশাকের তরকারি দিয়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভাত খেতে বসলেন। আমি তাঁর পাশে বসে তাঁর খাওয়া দেখতে লাগলাম। ঘরে সে রাতে সালুনের অভাব থাকায় আম্মা একটি ডিম ভাজি করে ভাতের ওপর বিছিয়ে দিয়েছেন। পাতে দুটি তেলে ভাজা শুকনো মরিচ। আম্মা দুধও বাটি ভর্তি করে দিয়েছেন। খাবার এনে টেবিলে রাখলে সুনীল বাবু বললেন, 'এ তো দেখি রাজভোগ।'

তাঁর কথায় আমি খুব লজ্জা পেলাম। বললাম, 'আজ সত্যি আমাদের ঘরে অতিথির পাতে দেওয়ার মতো তেমন কিছু নেই। আপনাকে এসব খেতে দিতে আম্মা খুব শরম পেয়েছেন।'

'আরে না না। তোমার মার লজ্জা পেতে হবে না। আমরা আমাদের নিজের বাড়িতেও এর বেশি কিছু জোটাতে পারি না।'

সুনীল বাবুর কথায় আমি মাথা নুইয়ে থাকলাম। তিনি খাওয়া শেষ করলেন। আমি জানি, শোভা বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। হয়তো বা কপাটের ফাঁক দিয়ে কমরেড সুনীলের খাওয়াদাওয়া দেখছে।

সুনীল বাবু আমার মায়ের রাঁধা পুঁইশাকের তরকারিটা খুব পছন্দ করলেন। বললেন, 'মুসলমান মেয়েদের রান্নাটাই আলাদা। আমার ধারণা ছিল বড় বড় অভিজাত মুসলিম বাড়িতে মাংস-পোলাওই ভালো রাঁধে। এখন দেখতে পাচ্ছি শাক-সবজিও তারা অপূর্ব রাঁধে।'

আমি হাসলাম, 'আপনি তো কমরেড খুব ভোজনরসিক বলে মনে হচ্ছে। আর একদিন এসে আমাদের বাড়িতে গোশত-পোলাও খেয়ে যাবেন। আমাকে একটু আগে খবর দিলে আমি আমার মাকে বলে সব ঠিক করে রাখব।'

'যদি ধরা পড়ে না যাই নিশ্চয়ই আসব। বাড়িটা যখন চেনা হয়ে গেছে তখন মাঝেমধ্যেই তোমাকে জ্বালাতে আসব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন সুনীল বাবু। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই কপাট ঠেলে শোভা এসে ঘরে ঢুকল। সুনীল বাবুর কথার রেশ ধরে বলল, 'না আপনারা এখানে এ বাড়িতে আর কোনোদিন আসবেন না। এরা খুব সরল সাদাসিধে পরিবার। খুব গরিব। আপনাদের আদর্শের সাথে এদের কোনো যোগ নেই।'

শোভার আকস্মিক আগমনে সুনীল বাবু প্রথমে বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেও মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিলেন।

'এ কে?'

আমি শোভার পরিচয় দিতে গেলে শোভা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম শোভা। আপনাদের আন্দোলনকে সমর্থন করি। কুমিল্লা থেকে এসেছি। এখন এখানে সরোজিনী স্কুলে পড়ি। মাহমুদ আমার বন্ধু। এর মাকে আমি মাসি ডাকি।'

শোভার কথায় বুঝলাম তার সাথে কমরেড সুনীলের আগে থেকে চেনাশোনা নেই। তিনি তখন খাওয়া শেষ করে ফেলেছেন। হাতমুখ ধুতে বাইরে যেতে উদ্যোগ করলে আমি বললাম, 'প্লেটেই হাত ধুয়ে ফেলুন।'

একটু ইতস্তত করে কমরেড সুনীল বাসনেই হাত ধুয়ে ফেললেন। একটু অনভ্যস্ত বলে পানি গড়িয়ে পড়ল টেবিলে। সম্ভবত এর আগে তিনি খাওয়ার বাসনে হাত ধোননি। আঁচিয়ে অভ্যেস। পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে তিনি মুখ মুছে শোভার দিকে তাকালেন। শোভা বলল, 'আমি আপনার নাম জানি। কুমিল্লায় থাকতে শুনেছিলাম আপনার নামে হুলিয়া আছে।'

আশ্চর্য, কমরেড সুনীল শোভাকে আর কোনো প্রশ্ন না করেই উঠে দাঁড়ালেন, 'আচ্ছা। আসি।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'দাঁড়ান আমি আপনাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'দরকার হবে না। আমি একাই যেতে পারব।' বললেন সুনীল বাবু। শোভা বলল, 'ইনি একাই যেতে পারবেন।'

আমি বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুনীল বাবু বললেন, 'তোমার মাকে আমার আদাব বলে দাও।'

সুনীল বাবু অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের বাইরে পা দেওয়া মাত্রই শোভা কপাট ভেজিয়ে দিল। গায়ে পড়ে শোভার ফোঁপর দালালি আমার অসহ্য বোধ হলো। আমি বেশ উষ্ণ কণ্ঠে বললাম, 'মেহমানকে এভাবে অপমান করে তাড়াবার কী দরকার ছিল? এখন আমি কানু ঘোষের কাছে মুখ দেখাব কী করে?'

'বেশ করেছি, আমার কাজের জন্য আমিই খেসারত দেব। তোমার আর মুখ লুকাতে হবে না। যারা বিপদ জেনেও একে এখানে পাঠিয়েছে তাদেরই তো মুখ লুকানো উচিত।'

শোভার কথায় আমি একটু ভড়কে গেলাম। বললাম, 'শোভা একজনকে চারটে ভাত খেতে দেওয়াতে আমাদের কী ক্ষতি হতে পারে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাল পুলিশ এসে তোমাদের বাড়ি সার্চ করতে পারে। তোমাকে, তোমার বাপ-মাকে, তোমরা কখনও নামই শোননি এমন সব অচেনা বিপ্লবীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। আরও কী করতে পারে শুনবে?'

শোভার কথায় আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে তার চিন্তিত মুখখানির দিকে চেয়ে রইলাম। শোভা বলল, 'চলি তাহলে।'

'দাঁড়াও। বাসনকোনশনগুলো আম্মাকে দিয়ে আসি। তোমাকে এগিয়ে দেব।'

শোভা দাঁড়াল। আমি তাড়াতাড়ি বাসনকোশনগুলো গুটিয়ে নিয়ে অন্দরে চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি শোভা আমার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বড় রাস্তার ওপর একাকী দাঁড়িয়ে আছে। আমি পকেট থেকে একটা টিপতালা বের করে দুয়ারে লাগিয়ে দিলাম। শোভার কাছে এগিয়ে যেতেই শোভা চলা শুরু করল। আমি তার পাশাপাশি এসে বললাম, 'শোভা, তোমার কথায় ভয় লাগছে। এমন কিছু ঘটলে তো আব্বা-আম্মা খুব কষ্ট পাবেন।'

আমার কথায় শোভা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমি বললাম, 'কী হলো? দাঁড়ালে কেন?'

'আজ পূর্ণিমা।'

'তাতে কী?'

আমি ধাবমান মেঘের ফাঁক থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসা সোনার থালার মতো চাঁদের দিকে তাকালাম। জোছনায় ঝলমল করছে আকাশটা। একটু আগের অন্ধকার গুমোট সন্ধ্যাটা হঠাৎ যেন উধাও হয়ে গিয়ে আমাদের শহরটাকে এক মায়াবি আলোর ওড়নায় ঢেকে ফেলেছে। আমি মুগ্ধ হয়ে শোভার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জীবনে এই প্রথম মনে হলো, শোভার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমি আর আগে কোথাও দেখিনি। অথচ শোভাকে অর্থাৎ তার চেহারাটিকে সদাসর্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে গেলে তাকে কতই না সাদামাটা লাগে। এখন এক দীপ্ত ভঙ্গিতে মুহূর্তের মধ্যে তার কৈশোরের খোলসকে ফাটিয়ে সে এক সদ্যোত্থিত তরঙ্গের মতো চাঁদের দিকে ফুলে উঠতে চাইছে।

'চল নিয়াজ পার্ক থেকে বেড়িয়ে আসি। যাবে?'

আমি বললাম, 'এত রাতে পার্কে?'

'কই রাত? সবে তো সন্ধ্যা।'

'না, চল তোমাকে বাসায় রেখে আসি।'

'না, আমি এখন বাসায় যাব না। বাসা মানে তো হাসপাতালের লাশকাটা ঘরের পাশে ওষুধ আর ফিনাইলের গন্ধে একটা কামরায় শুয়ে পড়া। আজ যাব না সেখানে। আজ পার্কে যাব। এ্যান্ডরসন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকব। তোমার মন না চাইলে যেও না। ঘরে গিয়ে সুবোধ ছেলের মতো শুয়ে থাক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোভা আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিয়াজ পার্কের দিকে চলতে শুরু করল। অগত্যা আমিও শোভার পেছন পেছনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁটতে লাগলাম। শোভা দ্রুত চলছে দেখে আমি বললাম, 'আস্তে চল। তোমার পেছন পেছনে দৌড়াব না কি!'

শোভা হাঁটার গতি একটু মন্থর করে খিল খিল করে হেসে ফেলল। ততক্ষণে আমি তার পাশাপাশি পৌঁছে গেলাম। বললাম, 'তোমার কি পাগলামি পেয়েছে?'

'চাঁদে পেয়েছে।'

'ঠিক আছে ধীরে হাঁট। আমি তো তোমার সাথে যাচ্ছি।'

'না গেলে বয়েই গেল। আমি কারো তোয়াক্কা করি না।'

'আহা, থাম, এতরাতে লোকে দেখলে কী বলবে?'

'কী আর বলবে, বলবে মোল্লাবাড়ির ছেলেটা বদের হাড্ডি। কায়স্থের মেয়ে নিয়ে রাতবিরেতে—হি-হি—।'

শোভা খিলখিলিয়ে হাসল।

আমার খুব রাগ হলো। আমি হঠাৎ পথের ওপর দাঁড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে তোমার যেখানে খুশি যাও। আমি আর যাব না।'

আমার কথায় রাগের আভাস পেয়ে শোভাও থামল। এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলল, 'কেন যাবে না। একলা পেয়ে আমাকে কেউ যদি ধরে নিয়ে যায়।'

'তাতে আমার কী? নিয়ে যাক না!'

'তোমার কিচ্ছু না! সত্যি বলছ আমাকে কেউ নিয়ে গেলে তোমার কিচ্ছু না?'

শোভার কথায় আমি যেন হঠাৎ পাথরের মতো স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে গেলাম। মনে হলো, কে যেন আমাকে অকস্মাৎ হাজার হাজার ভোলটের বিদ্যুতের চাবুক মেরে আমার শরীর থেকে কিশোর বয়সের সবুজ পিরহানটিকে ছাই করে উড়িয়ে দিল। আমি শোভার কথার কোনো জবাব দিতে না পেরে অধোমুখ হয়ে জোছনা প্লাবিত রাজপথে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার হাত ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শোভা বলল, 'চলো ঘরেই ফিরে যাই। আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দাও।'

'আমার ওপর রাগ করলে?'

'রাগ করলে তো ঠিক ওখানে গিয়ে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতাম। বাড়ি ফেরার কথা বলতাম না।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে শহরের দিকে হাঁটা দিলাম। শোভা আমার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোমার হাতটা বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন?'

একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে কেন জানি মনে হলো আজ নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করি। যেই ভাবা অমনি তাক থেকে অগ্নিবীণা নামিয়ে বিদ্রোহী পড়তে শুরু করলাম। কবির এই একটি রচনা কৈশোরে আমার মনেও দারুণ উন্মাদনা সৃষ্টি করত। উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতাম কবিতাটি। শরীর শব্দের অভিঘাতে ঋজু ও শক্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠত। স্নায়ুতন্ত্রীতে মনে হতো লাভার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অবশ্য নজরুলের গান চিরকালই আমাদের পরিবারের সকলেরই প্রিয়। আব্বা তো গাইতেনই। আমিও একাকী ঘরের দরজা বন্ধ করে গলা সাধতাম। আমার গলা জন্মাবধি খারাপ। বলা যায় জগতের সবচাইতে নিকৃষ্ট কণ্ঠস্বর। তবুও গাইতাম এবং কেউ গাইলে সব ছেড়েছুঁড়ে শুনতে যেতাম।

সেদিন যখন খুব জোরেশোরে বিদ্রোহী আবৃত্তি করছি, এমন সময়, খুব সম্ভবত আমার আবৃত্তি শুনে বড় রাস্তা থেকে আমার এক খ্রিস্টান বন্ধু শিশির সিংহ ঘরে এসে ঢুকল। হেসে বলল, 'কী কাণ্ড তুমি কি কবি হয়ে গেলে নাকি?'

আমিও হেসে জবাব দিলাম, 'এখনও হইনি। তবে ভবিষ্যতে একদিন হব।'

'গরম রক্তের কবি না ঠাণ্ডা রক্তের?'

'ঠাণ্ডা রক্তের আবার কবি হয় নাকি?'

'হয়। চলো আমার বাসায়। ঠাণ্ডা রক্তের এক কবির একটি বই তোমাকে আজ উপহার দেব।'

আমি বললাম, 'কবিটির নামটা তো আগে শুনি?'

'জীবনানন্দ দাশ।'

'এর নাম কোথাও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'বোধহয় শোননি।'

'তাহলে তো বইটা দরকার।'

আমি শিশিরের সাথে শিশিরদের বাসার দিকে রওনা দিলাম। শিশিরদের বাড়ি নিয়াজ পার্কের উত্তর দিকে। এক সময় শিশিররা আমাদের গাঁয়েই দক্ষিণ হাটিতে থাকত। গাঁয়েরই ছেলে। মুসলমান অধ্যুষিত পাড়ায় একটি মাত্র খ্রিস্টান বাড়ি ছিল গাঁয়ের খ্রিস্টান মিশনের বাইরে। সবাই এদের পরিবারবর্গকে আপনজনের মতো ভালোবাসত। আমার সাথে ছিল আরও একটি সম্পর্ক। আমি জন্মেছিলাম যে দাইমার হাতে তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। আমার দাইমাই ছিলেন শিশিরের নানি। বুড়ির কথা আমার এখনও মনে আছে। খুবই অমায়িক ছিলেন ভদ্রমহিলা। যতটুকু শুনেছি আমার বয়েসী সব ছেলেমেয়েরাই, যারা একটু সম্ভ্রান্ত বংশের, তাদের সকলেরই নাড়ি কেটেছিলেন এই দাইমা।

আমি শিশিরের সাথে তাদের বাড়িতে গেলে সে জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' বইটি আমাকে উপহার দিল। বইটির চেহারা অত্যন্ত অলংকারহীন। বলা যায় শ্রীহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সস্তা খাকি রঙের মোটা কাগজে ছাপা। দেখলে মোটেই একিন হয় না যে এটি একটি আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। আমি বইটিকে হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে উল্টেপাল্টে দেখতে এবং পড়তে লাগলাম। প্রথম কবিতাটিই আমাকে কামড়ে ধরল। অদ্ভুত এক রচনাভঙ্গি। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই বইয়ের সবগুলো কবিতা পড়া শেষ। এক নতুন উত্তেজনায় কাঁপছি, যেন এক অনাস্বাদিত লবণ চেখে জিভ আমার লোভে সিক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরে ফিরে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাগুলো আবার পড়ে নিলাম। তৃপ্তি মেটে না, আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়া, আবার পড়া। আশ মিটতে চায় না। হঠাৎ মনে হলো এ ধরনের বক্তব্য আমারও আছে, আমিও লিখতে পারি। আনন্দে সারা শরীর কেঁপে উঠল। কাগজ কলম বের করে টেবিলে উবু হয়ে লিখতে শুরু করলাম। শুরু হলো অন্য এক জীবন। অন্য এক অন্তহীন অভিজ্ঞতা।

২০

কীভাবে যেন একটা ঘোরের মধ্যে কয়েক লাইন লিখে ফেললাম। দ্রুতহাতে শব্দ কেটে নতুন শব্দ যোগ করে খাড়া হয়ে গেল আমার কবিতার খসড়া। আনন্দে নিজের বুকের ভেতরটা যেন হট্টগোলে মেতে রইল। বার বার নিজের লেখা লাইনগুলো পড়তে লাগলাম। যতবার পড়ি ততবারই ব্যবহৃত শব্দের বদলে আরও অর্থবহ নতুন শব্দ নিজের অজান্তেই আমাকে প্ররোচনা দেয়। হঠাৎ মনে হলো শব্দের বুঝি অদ্ভুত গন্ধ আছে, যা কেবল কবিরাই টের পায়। আমার মধ্যেও সেই অলৌকিক ঘ্রাণশক্তি অনুভব করে আমি মেতে উঠলাম। মনে হলো আমি অসংখ্য শব্দের প্রকৃত এবং অন্তর্নিহিত অর্থ জানি। জানি কোন শব্দের ভেতর আমার ধারণানুযায়ী কতটা প্রচলিত অর্থ ধরানো যায়। আর কতটা অতিরিক্ত অর্থ শব্দের সাহিত্যিক বাঁধন থেকে উপচে পড়ে। সেই উপচে পড়া শব্দার্থই যে কবিতার আত্মা তা আমি আমার সেই কৈশোর ও যৌবনের বয়োসন্ধিতেই কীভাবে যেন ধরতে পেরেছিলাম, আর ধরতে পেরেছিলাম ছন্দবদ্ধ বাক্য যদি উপযুক্ত অর্থ প্রকাশ নাও করে তবুও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ কারণেই প্রথম কাব্য রচনার সেই কম্পমান ক্ষণগুলোতে বাক্যের গঠন প্রকৃতির যৌক্তিকতা ও শব্দের সঠিক অর্থ কোনো কিছুই স্থির থাকল না। সবকিছুই এলোমেলো হয়ে ব্যাকরণ বহির্ভূত এক ভাষাপ্রেমিকের আবির্ভাব হলো—যে কেবল বকবক করে কথা বলতে চায়। জানে অগণিত শব্দ কিন্তু যে শব্দ দিয়ে যেখানে কথা বলা উচিত সেখানে তা না বসিয়ে এমন উল্টোপাল্টা শব্দ বসিয়ে কথা বলে যে শ্রোতারা না বুঝেও মুগ্ধ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

আমার প্রথম কবিতার প্রথম শ্রোতা হলো আমার এক চাচাত বোন। নাম হানু। তার ভালো নাম হানুম না খানম ছিল এখন ঠিক মনে পড়ছে না। আমার যে চাচা আমার শৈশবকালে জলপাইগুড়িতে পুলিশ অফিসার ছিলেন হানু ছিল তারই একমাত্র মেয়ে। চাচার আর অন্য কোনো সন্তানাদি না থাকায় আমার এই বোনটি ছিল তাদের নয়নের মণি। আমার এই চাচার নাম ছিল আবদুল হাই মীর। চাচাদের মধ্যে তিনি ছিলেন আমার আব্বার খুব অনুগত। দাদার দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র সন্তান। আমাদের গাঁয়ের লাগোয়া পুনিয়াউট গ্রামের এক বিখ্যাত খাঁ পরিবারে আমার দাদা দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। আমি কোনোদিন আমার এই দাদিকে দেখিনি। আমার জন্মের আগেই তিনি লোকান্তরিত হন। শুনেছি খান বংশ থেকে আগত আমার এই সৎ দাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারা গেলে আমার নিজের দাদি অর্থাৎ বড় দাদিই চাচাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেন। লেখাপড়াও শেখান তিনি।

একবার আমার এই চাচা হিমালয় অঞ্চলে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী থাকেন। রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেড়ে গেলে বাড়িতে খবর পাঠানো হয়। চিঠি কিম্বা টেলিগ্রাম পেয়ে আমার দাদি অত্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করলে আমার আব্বাকে বাধ্য হয়ে জলপাইগুড়ি রওনা হতে হয়। আব্বা যখন সেখানে গিয়ে পৌছান চাচার অবস্থা তখন আশঙ্কাজনক। কিন্তু আব্বাকে দেখে সেই বিদেশ বিভুঁইয়ে চাচার ভেতর সাহস আর প্রাণশক্তি জেগে ওঠে। তিনি দ্রুত সেরে উঠতে থাকেন। এ অবস্থায় আব্বা তাকে সেখান থেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেই যে এলেন, চাচা আর কোনোদিন তার সাবেক চাকরিতে ফিরে যাননি।

আমি যখনকার কথা বলছি তখন চাচা ছিলেন থানা এগ্রিকালচার অফিসার। তার পোস্টিং ছিল কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানায়। তিনি দাউদকান্দি বাজারে না থেকে চাচি ও হানুকে নিয়ে উক্ত থানায় সবচয়ে উন্নত গ্রাম জগৎপুরে থাকতেন। একটি সুন্দর বাড়ি ভাড়া নিয়ে চাচা থাকতেন। বাড়িতেই ছিল তাঁর অফিস ও সারের গুদাম। মাঝেমধ্যে ছুটিছাটায় চাচা দেশের বাড়িতে চাচিকে আর হানুকে রেখে যেতেন। এমনি এক ছুটিতে চাচি আর হানু তখন বাড়িতে।

হানুর ছিল আমার মতো পড়াশোনার অভ্যেস। যা হাতের কাছে পেত তা-ই পড়ত। গল্প-উপন্যাস-কবিতা কোনো ব্যাপারেই তার কোনো অরুচি ছিল না। হানু ছিল বয়সে আমার সামান্য ছোট। পড়াশোনায় খুবই তেজীয়ান ছাত্রী। মাথা ছিল ছেলেদের মতোই উদ্ভাবনাময়। আর আমার বিবেচনায় আমাদের পরিবারে আমার এই বোনটি ছিল প্রজাপতির মতো সুখী। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হওয়ায় সযত্নে লালিত। প্রতিটি দাবি কিম্বা বায়না তার অপূর্ণ থাকত না। চাচার ছোট্ট সংসারে টানাটানি কাকে বলে তা এরা জানত না। যখনই বাড়িতে আসত আমার কেন জানি মনে হতো এরা তো অচেনা। হানুকে মনে হতো এক সুদূর বিদেশিনী। অথচ এদের সাথে যে আমার অচ্ছেদ্য রক্তের বন্ধন রয়েছে কী এক রহস্যজনক কারণে যেন তা সবসময় মনে থাকত না। এমন নয় যে আমার এ বোনটি আমাকে এড়িয়ে চলত। বরং একটু কথা বলার সুযোগ কিম্বা আমার পড়ার ঘরে খানিকক্ষণ ঘুর ঘুর করার সুযোগ পেলে হানু বর্তে যেত। তবু হানু ছিল আমার কাছে প্রকৃতপক্ষে বহিরাগত। যদিও আমরা দু'জন ভাইবোনের মধ্যে একটা বিষয়ে আশ্চর্য মিল ছিল। সেটা হলো অনুভূতি ও সাহিত্যিক রসবোধের মিল। আমিও যেমন কোনো একটা করুণ উপন্যাস পড়তে গিয়ে চোখ শুকনো রাখতে পারতাম না, তেমনি আমার এই বোনটিও ট্র্যাজিক কোনো কিছু পড়তে গেলেই কেঁদে ভাসিয়ে দিত। আমার এখনও মনে পড়ে তখনকার দিনে আমি যেসব গল্প লিখেছিলাম এর প্রায় সবগুলোই লেখা হওয়া মাত্র হানুকে পড়তে দিতাম। সেসব গল্পের কোনো চরিত্রের কোনোরূপ করুণ পরিণতি থাকলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হানু দারুণভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত। বলত, 'আহা মেয়েটার এত কষ্ট। আমার কষ্ট হয়। এমন যে কেন হয়?'

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হানু কখনও বলত না, চরিত্রটা একটু বদলে দাও ভাইয়া। কিম্বা মেয়েটার সাথে ছেলেটাকে মিলিয়ে সুখী করে দিলেই তো হয়। এখানেই ছিল হানুর সাহিত্য সাহিত্যিকের প্রতি সম্মানবোধ। সে ভাবত যা রচিত হয়েছে তা অমোঘ। এর আর রদবদল সম্ভব নয়। এ রচনা নিয়তি নির্ধারিত।

সে সময় হানুর মতো একজন অনুগত পাঠিকা আমার একান্ত কাম্য ছিল। যে শুধু সমর্থন করে, বিস্মিত হয়, আর সর্বাবস্থায় প্রশংসা করে। কবিকে কোনো উপদেশ খয়রাত না করে অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হানু দেখতে কালো। আমার চাচার রঙ আর দেহসৌষ্ঠব পেয়েছিল হানু। অথচ হানুর মা, আমার চাচি ছিলেন অসাধারণ ফর্সা। চেহারায় সেমেটিক ধরনের গোলাপি আভা বিচ্ছুরিত হত। মায়ের এমন সুন্দর গায়ের রঙটা হানু পেল না। অবশ্য হানু তার চিকন কালো গাত্রবর্ণ আর অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ছিল। মুখে সব সময় একটা পরিতৃপ্তির হাসি লেগে থাকত। পরবর্তীকালে সংসার-জীবনে যখন আমার বোনটিকে বিষাদের উত্তুঙ্গ নোনা সমুদ্রে সাঁতার কাটতে হয়েছে তখনও দেখেছি তার সেই অপার্থিব মধুর হাসিটি কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। চোখ তুলে কুশল জানতে চেয়ে বলেছে, 'কেমন আছ ভাইয়া? ভাবী কেমন! ছেলেমেয়েরা আমাদের কথা মনে রেখেছে তো? এ বছর তোমার নতুন বই কী বেরুল? এত করে বলি বড় একটা উপন্যাস লেখ। তোমার আবার মালমশলার অভাব নাকি। আমাদের পরিবারেই তো কত গল্প-কাহিনির বীজ লুকিয়ে আছে। আছে না?'

আমি আমার প্রথম লেখা কবিতাটি হানুকে পড়ে শোনালাম! হানু তো কবিতা শুনে প্রথম থ মেরে হাসি মুখে বসে রইল। শেষে রচনটি আদৌ আমারই লেখা কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল।

'আমাকে বোকা বানানো হচ্ছে। এটা আগে কোথাও পড়েছি।'

আমি বললাম, 'না কোথাও পড়নি। কারণ আজই সকালে হঠাৎ লিখে ফেলেছি।'

হানু হাত বাড়িয়ে আমার কয়েক লাইনের ছোট্ট কবিতাটি নিয়ে পর পর দু'বার পড়ল। তারপর হঠাৎ লেখাটি নিয়ে দৌড়ে চলে গেল রান্নাঘরে। যেখানে আমার চাচি রাঁধছে। হানুর ব্যবহারে আমি একটু লজ্জিত বোধ করলাম। আমি আর চাচাদের উঠোনে দাঁড়িয়ে না থেকে চলে এলাম মসজিদের পাশে আমার পড়ার ঘরে।

একটু পরেই হানু এসে হাজির। হাতে কাগজের টুকরোটা।

আমি বললাম, 'চাচি কী বললেন?'

'আম্মা বললেন, খুব সুন্দর হয়েছে। তবে কবিদের কপালে নাকি খুব দুঃখ থাকে। সত্যি কবিদের খুব দুঃখ থাকে নাকি ভাইয়া?'

'কী জানি। হয়তো থাকে। আমি দেখো শেষ পর্যন্ত কবিতাই লিখব।' বললাম আমি। হানু একটু বিষণ্ন হলো। বলল, 'কবিতা লিখলে যদি দুঃখকষ্টের কপাল হয়, তবে আর লিখে কী লাভ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কবিতা পড়তে ভালো লাগে বলেই লিখব।'

'আমারও খুব ভালো লাগে।'

খুশি হয়ে বলল হানু। আমি বললাম, 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়েছ?'

'না তো!'

'তবে এই বইটি নিয়ে যাও।'

আমি জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' বইটি হানুকে দিলাম। হানু বইটি নিয়ে চলে গেলে আমার খাতা খুলে আরও একটি কবিতা লিখতে শুরু করে দিলাম।

কিছুদিনের মধ্যে আমার কবিতার খাতায় চার-পাঁচটি কবিতা লেখা হয়ে গেল। আমার সমগ্র মনোযোগ এখন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা পড়া ও শহরের যেখানে যার কাছে কবিতার বই পাওয়া যায় সেটাই সংগ্রহ করার দিকে ঝুঁকে পড়ল। কবিতার নেশা আমাকে এমন পেয়ে বসল যে আজকাল শোভার সাথেও দেখা সাক্ষাতের উৎসাহ কমে গেল। এমনও দিন পার হতে লাগল যে একবারের জন্যেও শোভাদের বাসায় যাওয়া হতো না। শোভা প্রথমে বিষয়টাকে তেমন আমল দিল না। আমার কবিতার খাতা দেখে সে হেসে আর বাঁচে না। ঠাট্টা করে বলে, বাবা এ তো দেখি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। আবার কখনও বলে, 'কী কবি কালিদাসের খবর কী?'

শোভার খোঁচাখুঁচিগুলো নীরবে সহ্য করে যেতে লাগলাম। আর আড়ালে-আবডালে কাব্যচর্চা চলল। আমি বুঝলাম আমার কবি হওয়ার বাসনায় শোভা দারুণভাবে হতাশ। একদিন মুখ ফুটে বলেই ফেলল, 'তোমার কী হয়েছে বল তো?'

'কেন কী আবার হবে!'

'সারাদিন কবিতার বই আর কবিতার খাতা নিয়ে পড়ে থাক। আমার কথাও তোমার মনে থাকে না। সারাদিনের মধ্যে একবারও কি আসতে পার না!'

'তুমি তো আসছ। দেখছ তো কবিতা লেখার চেষ্টা করছি।'

'কবিতা দিয়ে কী হবে?'

'আমি কবি হতে চাই।' আমি বেশ একটু আত্মপ্রত্যয় নিয়ে জবাব দিলাম।

শোভা আমার জবাব শুনে ভ্রূ কুঁচকাল। তার কালো চেহারায় রক্তের ছিটা। সে ক্রুদ্ধ বিষয়ী মানুষের মতো আমাকে উপদেশ দিল, 'কবিতা লিখলে ভাত জুটবে কোত্থেকে? তোমাদের সংসারের অবস্থা দেখতে পাও না? মাসি প্রায়ই তোমাদের সংসারের অভাবের কথা বলেন। তোমাদেরও দোকানপাট ব্যবসা-বাণিজ্য সব গেছে। এখন তো তুমিই এদের একমাত্র ভরসা। আর লেখাপড়া ফেলে রেখে তুমি কিসব ছাইপাশ নিয়ে মেতে আছ।'

শোভার কথায় আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। বুঝলাম আমার প্রসঙ্গ নিয়ে শোভা আজকাল আমার মায়ের সাথেও আলাপ করে। আমি কথা বলছি না দেখে শোভা বলল, 'চুপ করো আছ কেন। কিছু বল?'

'কী বলব, আমার সংসার সমাজের দরকার নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কথায় শোভা খুব দুঃখ পেল। পড়ার ঘরে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে শেষে অনুমতি না নিয়েই চলে গেল। মূলত এভাবেই শোভার সাথে আমার ভাঙন। যদিও একদিনে তা হয়নি ভবিষ্যতের আরও ঘাত-প্রতিঘাত ও অবজ্ঞা শোভাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। তবুও এ কথা আজ কী করে অস্বীকার করি আমার কবিতাই আমার প্রথম কিশোরী সঙ্গিনীকে বিবেকহীনভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কবিতার সাথে এই অসম যুদ্ধে যদিও শোভার মতো এক সামান্য কিশোরী পরাজয় স্বীকারে একদা বাধ্য হয়েছিল তবু এ কথাও আমি স্বীকার করি, সেও কবিতাকে সহজে ছেড়ে দেয়নি। তার আর্ত চোখ দুটি দিয়ে সেও কবিতাকে আমার উদ্ভাবিত বহু উপমা ও প্রতিতুলনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছিল

ভোলো না কেন ভুলতে পারো যদি
চাঁদের সাথে হাঁটার রাতগুলি,
নিয়াজ মাঠে শিশির লাগা ঘাস
পকেটে কার ঠাণ্ডা অঙ্গুলি
ঢুকিয়ে হেসে বলতে অভ্যাস
বকুল ডালে হাসতো বুলবুলি।

এ সময় কার কাছে যেন শুনলাম আমাদের শহরে ঢাকার একজন উদীয়মান তরুণ কবি এসেছেন। নাম মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। খবরটা পেয়েই আমি ছুটলাম তাঁর সাথে দেখা করতে। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কবিতা সে সময়কার সব পত্রপত্রিকায় তখন নিয়মিত প্রকাশিত হত। সনেট ফর্মের তার সব কবিতাই তখন আমার পড়া ছিল। শুনেছিলাম তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। বাড়ি তালশহরের নাওঘাট গ্রামে। ঢাকায় থেকে পড়াশোনা করেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় আমার কবিতার খাতাটি সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

সময়টা আমার ঠিক মনে নেই। সম্ভবত সময়টা ছিল বিকেল। তিনি মৌলভীপাড়ায় তাঁর এক আত্মীয় বাড়িতে উঠেছিলেন। তঁকে গিয়ে বাড়িতেই পাওয়া গেল। প্রথম আলাপেই অন্তরঙ্গতার আভাস পেলাম। এ-কথা সে-কথার পর তিনি আমার খাতাটি দেখলেন। বেশ আগ্রহ সহকারে প্রায় সবগুলো কবিতাই পড়লেন। বললেন, 'ভালো'। তবে আঠার মাত্রার পয়ার লিখতে গিয়ে ছন্দে একটু গোলমাল করে ফেলেছি। তিনি আমার খাতায় আমার নিজের রচনার ওপরই পর্ব ভাগ করে ৮+৬+৪ = ১৮ এর চালটি বুঝিয়ে দিলেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকলাম। কবিতাও যে অঙ্কবাহিত নিয়মে চলে এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি ছিলাম অঙ্কের গাধা। এখানেও অঙ্কের দৌরাত্ম্য দেখে আমার সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। পরবর্তী জীবনে আমি কখনও কোনো অবস্থাতেই কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর এই ঋণের কথা ভুলিনি। যেখানেই কথা উঠেছে দরাজ গলায় তাঁর নাম বলেছি। ছন্দের এই সামান্য সূত্রের ইঙ্গিত যদি তিনি আমাকে তখন ধরিয়ে না দিতেন তবে কে জানে হয়তো ভুল পথে ব্যর্থ শব্দ গেঁথে আমার প্রাণশক্তি একদিন ব্যর্থতায় নিঃশেষ হয়ে যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুকাল পরে যখন শেখানো নিয়মে আমি আরও কিছু কবিতা লিখে ফেলতে পারলাম, মনে হলো নিয়মটা কোনো বাধা নয়। বরং নিয়মের মধ্যেই বাক্যের তেজ ও স্বতঃস্ফূর্তি লুকিয়ে আছে। কবি হলেন সেই তেজোদ্দীপ্ত বাক্যেরই শুশ্রূষাকারী। সব তরুণ কবিই যখন লেখা শুরু করেন তখন ভাবেন ছন্দ আবার কী? তাল-মিল-মাত্রা আবার কী? কিন্তু যখন কবির প্রাথমিক উদ্দীপনা বা আবেগ একটু মিইয়ে আসে, যদি তিনি সত্যিই কবি হন, ফিরে আসেন সেই প্রাচীন নিয়মে যাকে আমরা ছন্দ বলি। শব্দ তরঙ্গের উত্থান-পতনের সাথে দুলতে দুলতে শেষ পর্যন্ত পেয়ে যান শব্দের সাথে লাফিয়ে ওঠা অন্য শব্দের সম্ভবপর মিল। এই মিলের ধ্বনি বা অনুরণন যখন কবির হৃদয় ও কর্ণকুহরে সম্মিলিতভাবে বেজে ওঠে তখন তার মনে হয় তিনি বুঝি দৈব শক্তির অধিকারী।

কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ আমাকে ছন্দের সাধারণ নিয়মটা ধরিয়ে দিলে আমার কান যেন হঠাৎ খরগোশের কানের মতো সতর্ক হয়ে গেল, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের রহস্যও আমি নিজের চেষ্টায় আয়ত্তে আনতে সক্ষম হলাম। ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্রকে আমার কাছে অতঃপর আর কোনো হৃদয়হীন বিষয় বলে মনে হলো না। ফলে পরবর্তী জীবনে এর যৎসামান্য চর্চা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। রসকষহীন বিষয় বলে মনে হয়নি।

বিশুদ্ধ পর্যায়ে লেখা পরবর্তী কবিতার খাতা নিয়ে আমি আবারও মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর সাথে দেখা করতে তাঁদের তালশহরের গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছি। তিনি উৎসাহ নিয়ে আমার খাতাটি দেখেছেন। বয়সে তিনি আমার সমবয়স্ক হলেও লেখাপড়ায় যেহেতু অনেক দূর এগিয়ে ছিলেন, এগিয়ে ছিলেন সাহিত্য কৃতিত্বে, সে কারণে আমি সব সময় তাঁকে অগ্রজের সম্মান দিয়ে এসেছি। আজও দিই।

এ সময় আমার জীবনের প্রধান ঘটনা হলো ভাষা আন্দোলন যা আমার জীবনের স্বাভাবিক গতিধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। ১৯৫২ সালের ভাষা বিদ্রোহ ও রক্তপাত হঠাৎ সারাদেশে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো ছড়িয়ে পড়লে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও এর স্পর্শ লাগে। সারাটা শহর যেন মুহূর্তের মধ্যে কেঁপে ওঠে। ছাত্র ও শিল্পীরা মিছিল করে রাস্তায় নেমে আসে। আমরা কয়েকজন ছাত্র স্টেশনে ঢাকার খবরের জন্য অধীর অপেক্ষায় কাল কাটাতে থাকি। সে সময় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে দু'জনের নাম খুব মনে পড়ে। একজন তাজুল ইসলাম ও অন্যজন মুহম্মদ মুসা। আমরা তখন নিয়াজ মোহাম্মদ হাইস্কুলের ছাত্র। এই আন্দোলনের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভাষা আন্দোলন কমিটিতে তাজুলের যোগদান ছিল অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক ঘটনা। আমার এই বন্ধুটি জন্মসূত্রে বাঙালি নয়, বিহারী। বিহার প্রদেশেরই কোন অঞ্চলে যেন আদি বাড়ি। কিন্তু এরা প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই প্রবাসী। এদের ছিল লেপ-তোষকের ব্যবসা। দক্ষ ধুনকর পরিবার, অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। সততা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায়নিষ্ঠা ও আদব-কায়দার জন্য এরা সারা শহরের মানুষের প্রিয়পাত্র ছিল। যদিও এদের মাতৃভাষা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান মূলত উর্দুতেই চলত তবুও বাংলাভাষা শেখার জন্য এদের ব্যাকুলতার শেষ ছিল না। তাজুল এই পরিবারের একমাত্র ছেলে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উর্দুর বদলে বাংলাকে তারা পড়াশোনার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ক্লাসে সে বাংলায় আমার ও মুসার সমকক্ষ নম্বর পেত। কখনও আমাদের ছাড়িয়ে যেতেও দেখেছি। বাংলাভাষার আধুনিক লেখকদের প্রতি ছিল তাজুলের অগাধ শ্রদ্ধা।

বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনকারী ঢাকার ছাত্র-মিছিলের ওপর গুলি চলার ঘটনাটি যখন সারা দেশকে উত্তপ্ত করে তুলল তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও এর জের বইতে লাগল। আমি, তাজুল ও মুসা শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একপ্রকার নেতৃত্বের স্থানে অধিষ্ঠিত। গান-বাজনা বা কবিতার আসর আমাদের ছাড়া কেউ চিন্তাও করতে পারত না। যদিও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মতো জায়গায়, যা এককালে উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, সেখানে আমাদের মতো পুচকে ছোকড়াদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাই ছিল না, তবও কেন জানি আমরা মনে করতাম এ শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নাক গলাবার মতো অধিকার আমাদের আছে।

আমাদের অন্য সঙ্গীটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। মুহম্মদ মুসা আমাদের গ্রামেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। তাদের বাড়ির নাম মুন্সীবাড়ি। মুসার দাদা জনাব আবদুল কাদির মুন্সী শহরের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সমাজসেবক ছিলেন। মুসার পিতা জনাব আবু ইউসুফ ও চাচা আবুল কাশেম উভয়েই ছিলেন আমার বাপের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সুহৃদ। সে সূত্রে মুহম্মদ মুসা আমার আত্মীয়ের মতো। তা ছাড়া মুসা লালমোহন স্মৃতি পাঠাগারের একজন নিয়মিত পাঠক হওয়ায় আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

আমি, তাজুল ও মুসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাষা আন্দোলন কমিটির ডাকে সর্বান্তকরণে আন্দোলনে যোগ দিলাম। যেখানে-সেখানে ঢাকার কেন্দ্রীয় আন্দোলনকে সহায়তা অর্থাৎ অর্থ সংগ্রহ করার জন্য বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলাম।

ভাষা আন্দোলন কমিটির যে লিফলেট ছাপার জন্য প্রেসে গেল এর শিরোনামের ওপর ছাপার জন্য মুহম্মদ মুসা আমার খাতা থেকে লাগিয়ে দিল আমার চার লাইন কবিতা। যদিও এই দীর্ঘকাল পরে এক কিশোর কবির চার লাইন কবিতার কী অর্থ ছিল, কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোই বা কী, তা একদম বিস্মৃত হয়েছি। তবুও এই চারটি লাইন আমার জীবনে যে দুঃখ বহন করে এনেছিল তার কোনো তুলনা নেই। যা হোক সে কথায় আরও পরে আসছি। তার আগে আমার বন্ধুদের কথা একটু বলে নিই।

তাজুল, মুসা ও আমি কেন্দ্রীয় ভাষা কমিটির জন্য চাঁদা সংগ্রহে মেতে উঠলাম। আমাদের চাঁদা তোলার প্রধান ক্ষেত্র হলো ধাবমান মেল ট্রেন। আমর আহারের সময়টা বাদে বলতে গেলে স্টেশনেই কাটাতে লাগলাম। কী উত্তেজনা, কী দেশ ও ভাষাপ্রেম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখাউড়া জংশন ও ভৈরব জংশনের দিকে যেসব মেল ট্রেন যাতায়াত করত আমরা তাতে নির্দ্বিধায় বিনা টিকিটে উঠে পড়তাম। তারপর দাঁতের মাজন ও তানসেন বড়ির ক্যানভাসারদের কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শুরু হতো রাজনৈতিক বক্তৃতা। বলতাম বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না পেলে বাঙালি মুসলমানগণ যে একটা দাসের জাতিতে পরিণত হবে তার সপক্ষে নানা যুক্তি। আমাদের বক্তৃতা ও যুক্তি শুনে বিশেষ করে আমাদের কিশোর বয়সের উত্তেজনা দেখে ট্রেনের সব যাত্রীই কিছু না কিছু পয়সা আমাদের টিনের বাক্সে ফেলে দিতে লাগল।

এ সময়ের একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমরা চাঁদা তুলতে তুলতে সকালের ট্রেনে আখাউড়া জংশনে এসে হাজির। কারো কোনো টিকিট নেই। জামার ওপর ভাষা আন্দোলনকারীদের কালো ব্যাজ। এতেই টিকিটের কাজ চলছে, চেকার টিকিট চায় না। আমরা সকালের ট্রেনে আখাউড়া এসে আবার দশটার ফিরতি ট্রেনেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে যেতাম। একদিন হলো কী, ফিরতি ট্রেন আর আসে না। ফেনীর দিকে কোথায় যেন রেল লাইনে গোলযোগ থাকায় আমরা আটকা পড়ে গেলাম। ট্রেন আর আসে না। এদিকে দুপুর গড়িয়ে গিয়ে বেলা সাড়ে তিনটা বেজে গেছে। ভুখের জ্বালায় তিন বন্ধুই কাতর। ভাষা কমিটির চাঁদার টিন ভর্তি পয়সা ছাড়া কারো কাছে কোনো পয়সা-কড়ি নেই। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল। কে যেন একবন্ধু যুক্তি দিল আমরা যখন আন্দোলনের জন্যই পয়সা সংগ্রহ করছি তখন আমাদের খাওয়ার জন্য চাঁদার বাক্স থেকে পাঁচটি টাকা নিলে কী এমন অন্যায় হবে? খিদের চোটে যুক্তিটা আমার কাছেও ফ্যালনা মনে হলো না। চাঁদার বাক্সটা আমার হাতেই তখন। আমি বাক্সের ঢাকানাটা একবার খুললাম। ঝকঝকে সিকি আধুলিতে প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। দুশ টাকার কম হবে না। এখান থেকে মাত্র পাঁচটি টাকা তুলে নিলে কী এমন অন্যায় হবে। আমি তাজুলকে বললাম, 'চলো এখান থকে কয়েকটা টাকা ভেঙে হোটেলে গিয়ে পোটে দানাপানি দিয়ে আসি।'

তাজুল বলল, 'না। এ টাকা আমাদের নয়। এর থেকে একটি পয়সাও ভাঙা চলবে না। আমি খাব না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমরা বরং এখান থেকে পাঁচটি টাকা ধার নিয়ে খাই। বাড়ি ফিরে সবাই মিলে পূরণ করে দেব।'

'এটা অবশ্য চলতে পারে।' তাজুল সম্মতি দিলে আমরা আনন্দে তাজুলের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। কিন্তু আমাদের উল্লাস মুহূর্তের মধ্যে পানি হয়ে গেল যখন শুনলাম আমাদের নিরুদ্দেশ ট্রেনটির আসার ঘণ্টা বাজছে।

আমাদের হোটেলে যাওয়া আর হলো না। সারাদিনের উপোস পেট নিয়ে আমরা ট্রেনের দিকে দৌড়লাম। একটু পরেই গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। সাংঘাতিক ভিড় আর ঠেলাঠেলি। আমরা আর একই কামরায় তিন জন একসাথে উঠতে পারলাম না। যে যেখানে সুযোগ পেলাম উঠে পড়লাম। ধাক্কাধাক্কিতে তাজুল ও মুসা কোন কামরায় কীভাবে উঠল তার হদিস পেলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আর তালাশ নেওয়ার সময় নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আমি পুলিশের এক রিজার্ভ করা কামরায় ঢুকে পড়েছি। কামরায় অন্তত পঁচিশ ত্রিশজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। একটুও জায়গা নেই। সবার দৃষ্টি অনধিকার প্রবেশকারী আগন্তুকের দিকে। আমি মুহূর্তমাত্র একটু হতভম্ব হয়ে থাকলাম। পরমুহূর্তেই কাউকে কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলাম, 'এদেশের পুলিশ ভাইয়েরা, আজ আমাদের মহাদুর্দিনের সময় আমি আপনাদের সামনে দুটি কথা বলার জন্য উঠেছি। বাংলাভাষার সপক্ষে দুটি কথা। আমি একজন ছাত্র। স্বৈরাচারী সরকারের গুলিতে রাজধানী শহরে ছাত্রদের রক্ত ঝরছে। আপনাদের পাঠানো হচ্ছে সেখানে আপনাদেরই ভাই-বোন, সন্তান সন্ততি, আত্মীয়স্বজনদের ওপর গুলি চালাতে। আপনারা কি বাঙালি নন? আপনাদের মুখের ভাষা কি বাংলা নয়?'

একটা প্রচণ্ড আবেগে আমার বক্তব্যের উৎসমুখ খুলে গেল। আরও কত কী বলেছিলাম, আজ এতদিন পরে আর স্মরণ করতে পারছি না। শুধু এটুকু মনে আছে, আমার বক্তৃতায় গাড়ির কামরায় পুলিশ আরোহীরা আমার চাঁদার বাক্সটি তাদের সাধ্যমতো দানে পূর্ণ করে দিয়েছিল। বাক্সে আর ধরছে না দেখে উপচে পড়া মুদ্রায় আমার জামা ও প্যান্টের পকেট ভর্তি করে দিয়েছিল। একজন হাত ধরে তার পাশে বসিয়ে তার ঝুড়ি থেকে একটি রক্তবর্ণ আপেল আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'খাও তো ভাই এটা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ঢাকায় গিয়ে আমরা আর ছেলেদের ওপর গুলি চালাব না।' আমি লোকটার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে হাসিমুখে আপেলটায় কামড় বসিয়ে দিলাম।

AMARBOI.COM

২২

ভাষা আন্দোলন কমিটির একটি লিফলেটে আমার চার লাইন কবিতা যেদিন ছাপা হয়ে মুহম্মদ মুসার কাছে আসে ঠিক সেদিন আমাদের বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। লিফলেটগুলো তখনও বিলি হয়নি। ছাপা ও বিতরণের দায়িত্ব সম্ভবত মুসাকেই দেওয়া হয়েছিল, আমার ঠিক মনে নেই। শুধু মনে আছে লিফলেটগুলো যে প্রেসে ছাপা হচ্ছিল আমরা সারাটা সকাল সেখানে কাটিয়ে বাড়ি ফিরছি। আমি আমাদের বাড়ির গেটে এসে পৌছা মাত্রই পুতুল নামে আমার এক বোন, যে ছিল একদা শোভার সহপাঠিনী, শিক্ষক ও সাংবাদিক গফুর মাস্টারের মেয়ে—কোথা থেকে যেন দৌড়ে এসে বলল, 'পালাও। তোমাদের ঘরবাড়ি পুলিশ সার্চ করছে। তোমাকে খুঁজছে। বইপত্র সব তছনছ করে কী যেন খুঁজছে।'

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। যেন একটা বাজপড়া মানুষ। পরক্ষণে সম্বিৎ ঠিক হয়ে গেল। আমি পুতুলকে একটু ঠেলে সরিয়ে অন্দরের দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু পুতুল বাধা হয়ে দাঁড়াল, না, যাবে না। বাহাদুরি? খালুর অবস্থা জান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না? একশ তিন ডিগ্রি জ্বর এখন। খালা মাথায় পানির ধারা দিচ্ছে। তোমাকে এ অবস্থায় ধরে নিয়ে গেলে খালু হার্টফেল করবে। পালাও।'

পুতুল আব্বার অসুখের কথা বলে আমাকে একদম নরম করে দিল। আমি বললাম, 'পুতুল তুমি কী বলছ, এখন আমি কোথায় পালাব?'

পুতুল ততক্ষণে ঠেলতে ঠেলতে আমাকে রাস্তায় তুলে দিয়েছে, 'কেন তোমার বিপ্লবী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যাও। তারা অন্তত আজকের দিনটা তোমাকে আড়াল করে রাখুক। পরে দেখা যাবে। খালাকে বলব আমি তোমাকে পথ থেকে ভাগিয়ে দিয়েছি।'

আমি পুতুলকে পেছনে রেখে পূর্বদিকের কলেজের মাঠ পেরিয়ে তিতাসপাড়ের শ্মশানঘাটের দিকে হাঁটা দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের বাড়িতে হানা না দিয়ে পুলিশ আমাদের বাড়িতেই কেন প্রথম সার্চ শুরু করেছে? পরে অবশ্য জেনেছিলাম প্রেস থেকে লিফলেটের কপি আইবির লোকদের হস্তগত হলে তারা লিফলেটের মাথায় আমার নামসহ চার লাইন কবিতা দেখতে পায়। লিফলেটটিতে যেহেতু অন্য কারো নামধাম ছিল না—ছিল শুধু ভাষা আন্দোলন কমিটি শব্দটি, সে কারণে এই আন্দোলনে কারা কারা জড়িত আছে এই তথ্য বের করার জন্য তারা আমাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে। যেহেতু চার পঙ্‌ক্তি কবিতা রচয়িতার নাম সেখানে আছে সে সূত্র ধরেই তারা সার্চ শুরু করেছে। যদি বাকি লিফলেট উদ্ধার করা যায়।

আমি হাঁটতে হাঁটতে মামাদের বাড়ি পেরিয়ে সিমরাইলকান্দি গাঁয়ের মধ্য দিয়ে তিতাসের পাড়ে এসে হাজির হলাম। সামনেই শ্মশানঘাট। ঠিক দুপুরবেলা। খিদের চোটে চিতার মতো পেট জ্বলছে। এখন কোথায় যাই, আগে চারটে ভাত খাওয়া দরকার। আমি শ্মশানের ঘাটলার ওপর এসে দাঁড়ালাম। এখানে রোদ বড় কড়া। ভেবেছিলাম সিঁড়িতে একা বসব। কিন্তু প্রকৃতি ও পেটের দাহ আমাকে এক সাথে অস্থির করে তুলেছে। একবার ভাবলাম শোভার কাছে যাই। কিন্তু এই ভরদুপুরে হাসপাতালের দিকে গেলে আমি অনেকেরই চোখে পড়ব। এমনকি পুলিশের চোখেও পড়তে পারি। শহরে আমাকে প্রায় সবাই চেনে। তা ছাড়া শোভাকেই বা কেন আমি এ বিপদে জড়াতে যাব। এতক্ষণে হয়তো সারা শহরেই আমাদের বাড়িতে পুলিশের সার্চের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। ছোট মফস্বল শহর। কিছু একটা ঘটলেই মানুষের মুখে ঢি ঢি পড়ে যায়। শোভাও কি আর বিষয়টা না জেনেছে! আমি শোভাদের ওখানে না যাওয়াই স্থির করলাম।

আমি ঘাটলায় দাঁড়িয়ে এসব সাত-পাঁচ ভাবছি। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন, 'এই মড়ার ঘাটে কী চাও বাবা তুমি?' বলে একজন দাড়িঅলা মধ্যবয়স্ক লোক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। পরনে হালকা চকলেট রঙের ময়লা খাটো ধুতি। ডান বাহুতে একটা লোহার বালা পরা। খালি গা। চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড়; রক্তবর্ণ। আমি একটু ভয় পেয়ে বললাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী চাইব, কিছু চাই না। এমনি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি। আমার বাড়ি ওই পশ্চিমের গাঁয়ে—মৌড়াইল।'

'তুমি নিশ্চয়ই কিছু চাও। এ সময় তো কেউ এদিকে আসে না। তবে লাশ আসে। লাশের তো আসার কোনো সময় টময় নেই।'

লোকটার কথায় আমি ভয় পেলাম। একবার মুখ ঘুরিয়ে চতুর্দিকটা দেখে নিলাম। আমার সামনে নদী আর পেছনে ধু-ধু মাঠ। দু'পাশে দুটি মড়া পোড়াবার বাঁধানো চিতার বেদী। আমি বললাম, 'কে আপনি? আপনাকে তো আগে এখানে দেখিনি।'

'তুমি আগেও এখানে এসেছ তাহলে! আমি এ শ্মশানের ডোম। কই, তোমাকে তো বাপু আগে কোনোদিন দেখিনি এখানে। রাতে যারা আসে তারা তো তোমার বয়েসী কেউ নয়। সব বড় লোক, নেশা ভাঙ খেতে আসে। সারারাত কী সব করে। আমি দেখি আর হাসি। আমাকেও একটু আধটু খেতে দেয়। তুমি বাপু আবার কখন এলে!'

'আমি নূর আলী ফকিরের সাথে মাঝেমধ্যে রাতে এখানে আসতাম। নূর আলী ফকিরকে চিনতেন? মারা গেছে।'

আমি নূর আলীর নাম উচ্চারণের সাথে সাথেই লোকটার চেহারা পাল্টে গেল। বলল, 'নূর আলী বাবা! তুমি নূর আলী ফকির বাবার সাগরেদ?'

'সাগরেদ নই, নূর আলী আমার ভাই।'

আমার কথা শুনে লোকটা এক অদ্ভুত নমনীয় ভঙ্গিতে হাত জোড় করে নূর আলীর উদ্দেশে নমস্কার করল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ফকির বাবার সাগরেদ। আপনি তার ভাই?'

'সহোদর নই। নূর আলী আমার মাকে মা ডাকত।'

'তাহলে তো আপনি আমারও ভাই। আপনার সাথে কেন আগে দেখা হয়নি। ফকির বাবা তো মাঝেমধ্যে শেষরাতের দিকে এখানে আসতেন। আহা দেবতার মতো মানুষটা বসন্তরোগে মরে গেল।'

'আমিও শেষরাতের দিকেই মাঝেমধ্যে তার সাথে এখানে এসেছি।' বললাম আমি। লোকটা বলল, 'আসুন আমার ঘরে একটু বসবেন।'

লোকটা হঠাৎ আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করতে থাকায় আমি একটু বিব্রতবোধ করছিলাম। আমি তার পেছনে পেছনে ডোমদের থাকার জন্য ছোট মন্দিরের মতো শ্মশানে যে আস্তানা আছে সেখানে গেলাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সামান্য পরিসরের কুঠরি। একটা সুন্দর সেলাই করা কাঁথা মোটা কম্বলের ওপর পাতা। একটি মাঝবয়েসী মহিলা কুঠরির ভেতর গাঁজার কলকে পরিষ্কার করছে। আমাকে দেখে মুখ তুলে তাকাল। মনে হলো এই অসময়ে আমার মতো এক নির্বোধ অতিথিকে দেখে একটু যেন অবাক হয়েছে। ডোম আমার সাথে মহিলাটির পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার ডোমনী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সালাম-আদাব কিছুই না বলে মহিলার মুখের দিকে তাকালাম। বয়েস পঁয়ত্রিশের কম হবে না। শক্ত সামর্থ্য শরীর। পরনে একটা খয়েরি রঙের শাড়ি। হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর। চোখের নিচে কালিপড়া। একটানা বহুকাল রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। ঘরে পা ছড়িয়ে একটা ত্রিশূলের ওপর ঠেস দিয়ে বসে কাজ করছিল। আমাকে দেখে দ্রুত পা গুটিয়ে নিল। লাল চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

'নূর আলী ফকির বাবার ভাই।'

মহিলার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই ডোম আমার পরিচয় দিল। চোখ থেকে জিজ্ঞাসার ভাবটা মুহূর্তে সরে গেল। ডোমনীর চেহারায় একটা আশ্চর্য স্নেহ মমতামাখা হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। বুঝলাম নূর আলীর সাথে সম্ভবত এদের গভীর নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। যে নূর আলী আল্লাহর ভয়ে এক রাতে গাছ হয়ে যেতে চেয়েছিল। আমার হঠাৎ কেন জানি নূর আলীর কথা মনে ওঠাপড়া করতে লাগল। ডোমনি আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ বলে, 'দাদার কি সিদ্ধি চলে?'

আমি 'সিদ্ধি'র আসল অর্থ তখনও জানতাম না।

ডোমনি শূন্য গাঁজার কল্কেটি হাতের কলিতে কায়দা করে তুলে ধরে সিদ্ধির অর্থ যে গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস আছে কি না জিজ্ঞেস করা হচ্ছে বুঝিয়ে দিল।

আমি মাথা নত করে বললাম, 'না।'

'আমারও চলে না।' ডোমনি হাসল।

'এ অসময়ে কী মনে করে শ্মশানে?'

আমি বললাম, 'এমনি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। এখন তো খাওয়ার সময়। বাড়ি গিয়ে গোছল দিয়ে খাব। খুব খিদে পেয়েছে। আজ তাহলে আসি।'

ডোমনি কিছু বলার আগেই ডোম হা হা করে উঠল, 'এই দুপুর রোদে নূর আলী বাবার ভাইকে আমরা না খাইয়ে ছেড়ে দেব?'

আমি বললাম, 'আজ আমার মন ভালো নেই। আরেকদিন এসে আপনাদের অতিথি হব।'

আমি যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম। ডোমনি আমার দিকে একটু আড়চোখে তাকিয়ে ডোমের উদ্দেশে বলল, 'দাদা বোধহয় চাঁড়ালের হাতে খাবে না।'

ডোমনির কথা শুনে আমি চলে যাওয়া ক্ষান্ত দিলাম। বিনা দ্বিধায় বারান্দায় বসে পড়লাম। বললাম, 'ঠিক আছে আমাকে খেতে দাও। আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমি জাত-বেজাত মানি না।'

আমি একটু আবেগাকুল হয়ে পরমাত্মীয়ের মতো এদের তুমি বলে সম্বোধন করলাম। আমার আচরণে এরা একটু অবাক হলেও দারুণ খুশি হলো। ডোম বলল, 'আমি বলছিলাম না নূর আলীর ভাই হলে আমাদেরও ভাই?'

ডোমনি বলল, 'চান করে খেলে গতরটা ঠাণ্ডা হতো না? আমি জল তুলে দিই দাদাকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডোমনির প্রস্তাবটি আমার মনমতোই হলো। আমি বললাম, 'পানি আর তুলে আনতে হবে না। আমি বরং নদী থকে একটা ডুবি দিয়েই আসি।'

ডোমনি কুঠরির ভেতর থেকে আমার জন্য একটা লম্বা ধরনের গামছা বের করে এনে হাতে দিল। আমি গামছা নিয়ে নদীর দিকে রওনা দিলাম।

আমি কলাপাতার বাসনে খেতে বসে আমার শ্মশানে পালিয়ে আসার সব ঘটনা এদর কাছে খুলে বললাম। আমার কথা শুনে এরা তো একেবারে হাঁ হয়ে গেল। ডোম বললা, 'তুমি সাঙ্ঘাতিক মানুষ তো ভাই। পুলিশ খুঁজছে?'

ডোমনি তার কথায় বাধা দিয়ে গলায় বেশ একটু মমতা মিশিয়ে বলল, 'কে আবার সাঙ্ঘাতিক মানুষ? এ তো একেবারে কচি ডাবের মতো নরম মানুষ। পুলিশ খুঁজছে তো কী হয়েছে! আমরা আছি না, আমরাই একে চিরদিন লুকিয়ে রাখব। কী বলো দাদা?'

আমি মুখ তুলে ডোমনির দিকে তাকালাম। কলাপাতার বাসনে পড়ে রইল মাগুর মাছের মাথা আর ঘন ঝোলের সর। আমি দেখলাম, ডোমনি দিদি তিতাস নদীর মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। কাঁচের মতো পানির ভেতর দিয়ে যেমন তিতাস তলের বালি-শেওলা দেখা যায়, তেমনি তারও হৃদয়ের ভেতর স্নেহ-মমতা ও মাতৃত্বের একটি উপত্যকা দেখা যাচ্ছে।

২৩

AMARBOI.COM

আমি বাকি দিনটা শ্মশানে কাটিয়ে দিলাম। ডোম গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকল। বিকেল বেলাটা এদের সাথে তেমন কথাবার্তাই হলো না। ডোমের চোখে আবেশের ঢুলুনি। আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। আমি সন্ধ্যাবাতি লাগার সাথে সাথে ডোমনিকে বললাম, 'দিদি আমি এখন বাড়ি যাব। বাড়ি গিয়ে সকালের খবরটা নিয়ে আসি। আব্বার শরীরটাও খারাপ। এখন ফিরতে হয়।'

ডোমনি বলল, 'গিয়ে আবার পুলিশের হাতে পড়বে না তো!'

'পুলিশ কি আর সারাদিন বসে আছে?'

'তাহলে যাও। বিপদ দেখলে ফিরে এস। আমরা তোমাকে ঠিক লুকিয়ে রাখব। যতদিন খুশি থাকবে।' বলল ডোমনি।

আমি এদের কাছে বিদায় নিয়ে মাঠ পেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। ততক্ষণে রাত বেশ গাঢ় হয়ে নেমেছে। আমি নিজের বাড়িতেই চোরের মতো প্রবেশ করতে গেলাম। আমাদের উঠোনে এসে কতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সারাটা উঠোনে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। দু'একটা পাতা ঝরার অস্পষ্ট শব্দ। আর কুনো ব্যাঙগুলোর উঠোন পার হয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরের দাওয়ায় লাফিয়ে ওঠার মৃদু থপ থপ আওয়াজ। বাতাসের মধ্যে অতি হালকা ওষুধের গন্ধ। আমার সমস্ত সাহস সহসা ভেঙে পড়ল। ভাবলাম, আম্মাকে কী করে মুখ দেখাব? অসুস্থ আব্বার বিছানার পাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াবই বা কীভাবে? আমার জন্যই এদের এমন দুর্গতি। নাহ, আমার সাহসে কুলোচ্ছে না। আমি ঘরের দুয়ারটায় হাত দিয়েও আবার উঠোনে নেমে এলাম। মনে মনে কে যেন আমাকে প্ররোচনা দিয়ে শক্ত করে তুলল। আমার মা-বাপের দুঃখের দিন ঘোচানোর একটা ব্যবস্থা না করে আমি ঘরে ফিরব না, আমি স্থির করলাম। আমি উঠোনে পেরিয়ে বাড়ির ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটা স্টেশনের প্লাটফর্মের দিকে গেছে সেটা ধরে হাঁটতে লাগলাম। আজ ভাবি কী ছেলেমানুষই না ছিলাম আমি। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এক শিশুর মতো।

আমি প্লাটফর্মটা পেরিয়ে স্টেশনের ভেতর দিয়ে একটা চায়ের দোকানে এসে বসলাম। এ দোকানটা চায়ের দোকানগুলোর একেবারে শেষ মাথায়। বলা যায় একটু দূরে, একটু নিরিবিলি জায়গায়। আমি পরিচিত লোকজন থেকে একটু আড়াল থাকতে চাইছিলাম। কিন্তু দোকানে ঢুকে দেখতে পেলাম, আমার বয়েসী একজন তরুণের সাথে আমার পরিচিত এক ব্যক্তি বসে আছে। লোকটি হলো আমার এককালের গুলতি শিকারি বন্ধু বাবরুর মামু। ভদ্রলোকের নাম এখন এই মুহূর্তে ভুলে গেলেও তার সাথেই জীবনের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আমি কোনোদিন ভুলিনি। এরা সাধারণত আমাদের স্টেশনেই ঘোরাফেরা করত। নানান জিনিসের ফ্লাইং বিজনেস ছিল এদের পেশা। মালের জন্য এরা কখনও আগরতলা আবার কখনও কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করত। তখনও পাসপোর্ট ভিসার প্রচলন হয়নি। আসলে যে এরা ছিল সীমান্ত চোরাকারবারী, তা আমি তখনও জানতে পারিনি।

ভদ্রলোক আমাকে দেখে বললেন, 'এই যে ভাগ্নে কেমন আছ? তোমার মুখখানা এমন বেজার কেন? চা খাবে?'

আমিও ভদ্রতার খাতিরে তার পাশে বসতে গিয়ে বললাম, 'মামু কেমন আছেন? আপনি খাওয়ান তো এক কাপ খাই। আমার মনটা ভালো নেই মামা। আমি একটু মুশকিলে আছি।'

'কী ব্যাপার মামা! তোমার আবার কী মুশকিল বাধল?'

'পুলিশ খুঁজছে। লুকিয়ে ঘোরাফেরা করতে হচ্ছে। বাড়ি যেতে পারছি না।'

আমার কথা শুনে বাবরুর মামু আকাশ থেকে পড়ল। দারুণ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার পেছনে পুলিশ। কেন?'

আমি মামুকে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা খুলে বললে তিনি আমার দিশেহারা অবস্থাটাকে আমল না দিয়ে সবকিছু হেসেই উড়িয়ে দিলেন, 'পাগল! এর জন্য এমন নার্ভাস?'

আমি বললাম, 'এখন কী করব মামু?'

'দু-চারটে দিন একটু পালিয়ে বেড়াতে হবে। পরে দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। এ তো রাজনৈতিক মামলা। এতে কারো কিছু হয় না। আমরা তো এর চেয়ে মারাত্মক পরোয়ানা নাকের ডগায় নিয়ে ঘুরে বেড়াই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে মামু তার সঙ্গী তরুণের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসল। তরুণটিও অর্থপূর্ণ হাসিতে মুখ তুলে আমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিপাত করল। আমিও বোকার মতো হাসলাম। হঠাৎ কী মনে পড়ায় মামু বলল, 'আমাদের সাথে যাবে?'

'কোথায়?'

'কলকাতায়। চল আমরা আজ রাতেই রওনা দিচ্ছি।'

'আমার কাছে তো এতদূর বেড়াবার টাকা পয়সা নেই। তাছাড়া বাড়িতে না জানিয়ে কীভাবে যাব, খুঁজবে না?'

'আহা! তোমাকে তো কয়েকদিন লুকিয়ে থাকতেই হবে। বাড়িতে তো থাকতে পারবে না। গাড়িভাড়া আর খাওয়া খরচ না হয় আমিই দেব। তুমি আমার ভাগ্নের বন্ধু। আমাকে মামু ডাক। তোমাদের বাড়ির কাছে স্টেশনে ঘোরাফেরা করি, ব্যবসা করি। তোমার বাপ-চাচাদের তো চিনি। বিপদ কেটে গেলে না হয় টাকাটা শোধ দিও। যাবে?' বলল মামু।

আমি বললাম, 'যাব।'

'তাহলে ভাগ্নে আমাদের ব্যবসার কথা তো জান, আমরা দেশবিদেশ থেকে লুকিয়ে-চুকিয়ে মাল এনে ঢাকা চিটাগাং বিক্রি করি। তোমাকেও আমাদের কাজে একটু সাহায্য করতে হবে। আমি তখন কলকাতা যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেছি। এখন আর ফেরা যায় না। ভাবনা-চিন্তারও ফুরসত নেই। আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমি রাজি।'

আমার সম্মতি পেয়ে মামু পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ খুললেন। আমার হাতে তিন টাকার মতো খুচরো পয়সা দিয়ে বললেন, 'পাশের হোটেল থেকে চারটে ভাত খেয়ে নাও। রাত দশটায় নারায়ণগঞ্জের গাড়ি। আমরা নারায়ণগঞ্জ হয়ে গোয়ালন্দ যাব। সেখান থেকে শিয়ালদা।'

আমি বললাম, 'কলকাতার যাত্রীরা তো বাহাদুরাবাদের পথে যায় শুনেছি। আমরা আবার নারায়ণগঞ্জ কেন?'

'সেটা আমাদের পথ নয়। আমরা নারায়ণগঞ্জ হয়ে যাব। এ পথে কোনো রিস্ক নেই। তোমাকে কোনোকিছু ভাবতে হবে না ভাগ্নে, তুমি তাড়াতাড়ি চারটে খেয়ে এসো।'

আমি অগত্যা আর কথা বাড়ালাম না। সোজা গিয়ে হোটেলে ঢুকলাম।

নারায়ণগঞ্জ এসে আমরা অবশিষ্ট রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। এই আমার প্রথম নারায়ণগঞ্জ আসা। ভোরবেলায় এরা দারুণ ধাক্কাধাক্কির ভেতর স্টিমারের টিকিট কিনল। সম্ভবত এরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আসার সময় রেলের টিকিট নেয়নি। পথে কোনো চেকার আমাদের কাছে টিকিট চায়ওনি। এখানে প্লাটফর্ম থেকে বাইরে না যাওয়ায় এখানেও কোনো চেকিং হলো না। আমি একটু আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। এই বুঝি চেকার এসে টিকিট চাইবে কিন্তু চেকার আশপাশ দিয়ে ঘুরে গেল। টিকিট দেখতে চাইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টিমারের টিকিটগুলো হাতে নিয়েই মামু ও সঙ্গী তরুণটি আমাকে নিয়ে তাড়াহুড়া করে নারায়ণগঞ্জ বাজারের দিকে ছুটতে লাগল। মামু বলল, 'একটু পা চালিয়ে চল তো ভাগ্নে বাজার থেকে কয়েকটি মাল কিনতে হবে।'

আমি এদের সাথে এক মনোহারি দোকান থেকে অন্য মনোহারি দোকানে ছোটাছুটি করতে লাগলাম। এর মধ্যেই এরা এদের মালপত্র টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে দ্রুত আমাকে নিয়ে স্টিমারে ফিরে এল। আমরা স্টিমারের ডেকের ওপর বড় চাদর বিছিয়ে বসলাম। দেখলাম, মামুকে স্টিমারের খালাসি থেকে শুরু করে সবাই চেনে। সবাই আমাদের খাতির করতে লাগল। বুঝলাম, মামু এ-লাইনে একজন কেউকেটা লোক। আমিও হাসি। আমার কাছে পৃথিবীটাই অন্য চেহারা নিয়ে হাসছে। বাইরের দুনিয়ায় নতুন অভিজ্ঞতায় আমি রোমাঞ্চিত। হঠাৎ মামু প্রস্তাব দিল, 'চলো ভাগ্নে একহাত ব্রিজ হয়ে যাক।'

তার টিনের বাক্স থেকে মামু 'গ্রেট মোগল' নামের নতুন দামি তাসের প্যাকেট বের করে ভাজাতে লাগল।

আমি বললাম, 'মামু আমি তো ব্রিজ খেলা জানি না। তবে টুয়েন্টি নাইন জানি, ব্রে-ও শিখেছিলাম।'

'যে ব্রে জানে তার আবার ব্রিজ খেলতে আটকায় নাকি? ঠিক আছে। আজ টুয়েন্টি নাইনই হোক। বেশ উত্তেজক খেলা, সময় কাটবে।'

বলে মামু তাস বাটতে লাগল। আমরা ছিলাম তিন জন। মামা আমাদের পাশে বিছানা পেতে বৌ-বাচ্চাসহ বসে থাকা এক যাত্রী পরিবার থেকে এক অবাঙালি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোককে খেলতে আহ্বান জানালে তিনি এসে আমার পার্টনার হলেন। কতক্ষণের মধ্যে খেলা দারুণ জমে উঠল। মামু শেষতক হারতে লাগল। আমার পার্টনার চৌকস খেলোয়াড়। পুকার খেলার পাকা জুয়াড়িদের মতো তার তাসের হিসাব। আমিও ঠিকমতো তাল দিতে লাগলাম। স্টিমারের চলা বা নদীর দৃশ্যের দিকে তাকাবার অবসর বা উপায় নেই। এদিকে সময় দ্রুত কেটে যেতে লাগল। পথের আর কোনো ঘটনা আমার স্মৃতির সঞ্চয়ে আমি এখন হাতড়ে পাচ্ছি না। শুধু মনে আছে তারপাশা বলে একটা স্টিমারঘাটে জাহাজ থামলে মামু এক ঝুড়ি পাকা কালোজাম কিনেছিল। সাথে লাল লঙ্কাগুঁড়ো আর লবণ। আমরা পেট ভরে জাম খেয়েছিলাম। এমন মজাদার কালোজাম, যা ছিল মেয়েদের চোখের মতো আর্দ্র, ড্যাবড্যাবে আর বিশাল, ঘন কৃষ্ণবর্ণ, আমি আর চোখে দেখিনি।

আমি কখন এসে গোয়ালন্দ নামলাম, আমার ঠিক মনে নেই। মনে আছে গোয়ালন্দ পৌঁছে আমরা তিন জনই খুব ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মামু বলল, 'চলো আমরা আগে চারটে ভাত খেয়ে নিই।'

আমরা হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। স্টিমারঘাট থেকে নেমে ছাপড়ার ভাতের দোকান। আমরা যেতে যেতে দেখলাম অদূরে রেলওয়ে স্টেশনে শিয়ালদা যাওয়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ে ঠাসাঠাসি। আমাদের হাঁটা পথের ওপরই ভাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানের ছোকড়ারা আমাদের ছেঁকে ধরল, 'আসুন সাব, পদ্মার সবচেয়ে তাজা ইলিশ আছে এই হোটেলে। আমাদেরটায় ঢুকে পড়ুন।'

তারপর হাত ধরে টানাটানি। মামু একবার ধমক দিলেন। পরে ছেলেটার আগ্রহাতিশয্য দেখে আমরা এর হোটেলেই এসে ঢুকলাম। দেখলাম হোটেল মালিক পাঞ্জাবি। আমাদের দেখে চোস্ত উর্দুতে আপ্যায়ন করল, 'তশরিফ ফরমাইয়ে। বহুত আচ্ছা হিলিশ'—

মামু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মাওড়ার হাতে পদ্মার ইলিশভাজা খেতে হবে আমাদের এমন রিজিক ভাগ্নে। নিশ্চয় কপালে দুঃখ আছে।'

আমরা তিনজনই একযোগে হেসে উঠলাম। আমাদের অকস্মাৎ এমন হেসে ওঠা দেখে হোটেল মালিক ভদ্রলোক একটু বোকা বনে গেলেও আমরা যে তাকে নিয়েই হাসিঠাট্টা করছি মুহূর্তেই বুঝে ফেলল। সেও আদরের সাথে হেসে বলল, 'পহলে তা তশরিফ রাখিয়ে ভাইজান ফের দেখলে না, মেরা মছলি কিরানকা মরতবা।'

আমরা আশ্বস্ত হয়ে টুলের ওপর বসে পড়লাম। আমরা ছিলাম ভয়ানক ক্ষুধার্ত। হোটেলঅলা যখন প্লেটে সধুম শাদা ভাতের ওপর বিরাটকায় ইলিশের পেটের ভাজা করা অংশের সাথে ছোট বাটিভরা ইলিশের গরম তেল পরিবেশন করল তখন বুঝলাম ইলিশ রান্নাটা বিক্রমপুরের মেয়েদেরই একচেটিয়া কোনো ব্যাপার নয়। আন্তরিকতা ও চর্চা থাকলে বাঙালির ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বি পাঞ্জাবিরাও পারে। ইলিশের স্বাদ জাতবেজাত মানে না। আমরা আমাদের সাধ্যেরও অতিরিক্ত কয়েক লোকমা বেশি আহার করলাম। খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেল। মামু বললেন, 'এ গাড়িতে এখন আর যাওয়া হবে না ভাগ্নে। টায়ার্ড। একটু বিশ্রাম নিয়ে দু-তিন ঘণ্টা পরের গাড়িতেই যাব। কী বল?'

আমিও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। যদিও কলকাতা মহানগরীতে পা দেবার জন্য আমার আর তর সইছিল না, তবুও তার কথায় বিশ্রাম নেওয়াই ঠিক হলো।

২৪

আমরা একটু বিশ্রাম নিতে গিয়ে গোয়ালন্দ স্টিমারঘাটে আস্ত একটা দিনই নষ্ট করলাম। হোটেলে মালপত্র রেখে দিয়ে নদীর পাড়, স্টেশন ও জাহাজঘাটায় উদ্দেশ্যহীন মানুষের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। মামু ও মামুর অপর সঙ্গীটির কথাবার্তায় বুঝলাম আমি একটি খুদে স্মাগলার চক্রের পাল্লায় পড়েছি। এদের সাথই আমাকে কলকাতায় যেতে হবে এবং এদের কথামতো কাজ করতে হবে। এদের ফেলে রেখে নিজের ইচ্ছেমতো বাড়ি ফেরারও উপায় নেই। এদের চালচলনের বিরোধিতা করলে বরং বিপদ আছে। আমি, মামুর বিরাগভাজন যাতে না হতে হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে তার সাথে প্রতিটি বিষয়ে সম্মতিসূচক ব্যবহার করতে লাগলাম। আমার সম্মতিতে মামু দেখলাম খুব খুশি। একবার তো আমাকে উদ্দেশ্য করে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ সঙ্গীটিকে বলেই ফেলল, 'এই ছোকড়া একদিন আমাদের লাইনে রাজা হয়ে যাবে।'

তার কথায় আমার তখনকার কৈশোরিক ভাবনায় কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি, এ কথা অবশ্য বলা যাবে না। আমি বরং এদের কথায় একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে খুশিই হলাম।

আমরা শিয়ালদা পৌছলাম পরদিন দুপুরে। রাতটা উন্মুক্ত আকাশের নিচে জাহাজঘাটের জেটিতে কাটিয়েছিলাম মনে আছে। সকালের গাড়িতে ঝুড়ি ঝুড়ি শাক-সবজির ভিড়ের মধ্যে আমরা রওনা হয়ে দুপুরের দিকে সম্ভবত শিয়ালদা এসে নেমেছিলাম। বিরাট জংশন স্টেশন শিয়ালদায় পরবর্তী জীবনে বহুবার আসার সুযোগ হয়েছে। বিচিত্র মানুষের আনাগোনা ও ওঠানামায় সদা চঞ্চল এই রেলস্টেশন এখন যেমন লাগে তখন কিন্তু তারচেয়েও বিপুল বিস্ময় নিয়ে ভাটি বাংলার এক কিশোরের চোখে ধরা দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, এই স্টেশনটাই বুজি অর্ধেক কলকাতা শহর। স্টেশনে নেমে এক বিস্ময় বিমূঢ় শিশুর মতো আমি চতুর্দিকটা দেখতে লাগলাম। মানুষ ও মালপত্র ওঠানামার এক বিরাট হট্টগোল। ফেরিঅলাদের ছোটাছুটি। মুহুর্মুহু ট্রেনের হুইসেল। মোট নিয়ে কুলিদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে রাজকীয় চলাফেরা। বিনা টিকিটের যাত্রীদের জামার কলার ধরে অপমানজনকভাবে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যচ্ছে রেল-পুলিশ। এই দৃশ্যটি আমার কিশোর মনে সবচেয়ে ধাক্কা দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যাদের টিকিট নেই তাদের শাস্তি অবশ্যই দেওয়াটা উচিত তবে এ ধরনের অপমান যেন পুলিশদের একটু বাড়াবাড়ি। আমার নিজের বাড়িও রেল-লাইন এবং স্টেশন সংলগ্ন। আমি এ দৃশ্য অর্থাৎ বিনা টিকিটের যাত্রীদের দেখে মোটামুটি অভ্যস্ত। কিন্তু এ ধরনের অপমানকর দৃশ্যের অবতারণা আমাদের দেশে তখনও হতো না, এখনও হয় না।

আমার অবশ্য বেশিক্ষণ এ দৃশ্য দেখার সুযোগ হলো না। মামু তাড়াতাড়ি তাকে অনুসরণ করে জোর কদমে এগিয়ে যেতে বলল। আমরা স্টেশনের বাইরে এসে একটা ট্রামলাইনের পাশে দাঁড়ালাম। এখানেও মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। অল্প পরই অদ্ভুত ধাতব শব্দ করে ট্রাম চলাফেরা করছে। জীবনে এই প্রথম ট্রাম দেখলাম। ওপরে তার বাঁধা বিদ্যুতের হঠাৎ হঠাৎ ঝলকানি তুলে ট্রাম এসে থামল। আমি খুশিতে রোমাঞ্চিত হয়ে মামুর দিকে ফিরলাম। মামু ইঙ্গিতে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে বললেন। আমি ভিড় ঠেলে লাফিয়ে ট্রামে উঠে গেলাম। বসার জায়গাও পেলাম। মামু বসল আমার পাশে। আমার আনন্দ দেখে মামু বলল, 'এটা হলো কলকাতার শহর বুঝলে ভাগ্নে, এর কোনো কূল-কিনারা নেই। লোকে বলে না, যদি পড়ে কহর, তবু ছেড়ো না শহর! এটা হলো সেই শহর।'

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মামু আমরা কোথায় গিয়ে নামব?'

'আর কোথায় এই রাক্ষুসির পেটের ভেতর। ঘাবড়ে যেয়ো না ভাগ্নে। আগে তো গিয়ে ধরমতলার মোড়ে নামি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ধরমতলার মোড় কাকে বলে কিছুই তখনও চিনি না। শুধু বুঝলাম ভয় আর আনন্দ পর্যায়ক্রমে বুকের ভেতর লাফাচ্ছে। ট্রামের ভেতর থেকে চলন্ত ছবির মতো দেখছি এই বিশাল মহানগরীকে। মনে পড়ল। আমি যত বই পড়েছি তা হোক রহস্যকাহিনি বা উপন্যাস কিম্বা কবিতা—এর বেশির ভাগই চার্ণকের কলকাতাকে ঘিরে। বাংলাভাষার সব মহৎ লেখকই এককালে এই নগরীতেই বাস করতেন। এখনও করেন। আমার পড়া রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজ, প্রহেলিকা সিরিজ সবই তো এখান থেকেই প্রকাশিত। বইয়ের গায়ে প্রকাশকের যে ঠিকানা থাকত ঝামাপুকুর লেন, ভাবলাম কোথায় সে ঝামাপুকুর লেনের দেব সাহিত্যকুটির? আমি কি যেতে পারব সেখানে? ফেলে আসা সেসব বইয়ের নতুন এন্টিক কাগজের মিষ্টি গন্ধ যেন নাকে এসে লাগল। আমি অনেকটা স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বাইরের চলন্ত ইমারতগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হলো এ শহর তো নতুন নয়। এ শহরটাকেই তো বাংলাভাষার আধুনিক লেখকরা আমার মনের ভেতর স্বপ্নের ইট দিয়ে একটু একটু করে গড়ে তুলেছেন। আজ মনে হচ্ছে, আমার এই হঠাৎ কারো কাছে কিছু না বলে দু'জন চোরাকারবীর সাথে কলকাতায় পালিয়ে আসার পেছনেও হয়তো অবচেতনে জমা হয়ে ছিল কোনো সাহিত্যবাসনা। শুধু পুলিশের ভয় নয়।

আমরা কোলিন স্ট্রিটের একটা মেসে এসে উঠলাম। মেসটা মূলত বাংলাদেশের, দেশ ভাগের পরও যারা এখনও কলকাতার মায়া কাটিয়ে ঢাকায় পাড়ি জমায়নি এটা হলো তাদের আখড়া। দেখলাম মেসে খাট চৌকির কোনো বালাই নেই। মেঝেয় ঢালাও সারি সারি বিছানা পাতা।

এখানে এই কোলিন স্ট্রিটের হলুদ বাড়িটাতে আকস্মিকভাবে আমার এক পরিচিত জনের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তার নাম লুৎফর রহমান। তার বাড়ি আমাদের সরাইল থানার শাহবাজপুর গ্রামে। তিনি একসময় আমাদের বাড়িতে আমার দাদার ঘরে গৃহশিক্ষক ছিলেন। আমাকেও খুব ভালোবাসতেন। সাহিত্যের প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা এবং চর্চা ছিল। গল্প লিখতেন। তিনি এখানে এভাবে আমার উপস্থিতি দেখে চমকে গেলেন। সম্ভবত মামুদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা থাকায় উদ্বিগ্নও হলেন। আমি কেন হঠাৎ এ সময় এদের সাথে কলকাতায় এসেছি তিনি জানতে চাইলেন।

আমি বললাম, 'কলকাতা শহর দেখতে এসেছি।'

'তোমার আম্মা জানেন?'

'না।'

'অর্থাৎ না বলে পালিয়ে এসেছ?'

আমি তাঁর কথার আর কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকলাম। তিনিও আমাকে আর ঘাঁটালেন না। বরং আমি যাতে ভালোয় ভালোয় কলকাতায় কয়েকটা দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যাই সেদিকে সচেষ্ট হলেন। সম্ভবত তিনি আমাদের বাড়িতেও চিঠি লিখে থাকবেন। মামুকেও আমার ব্যাপারে তিনি সতর্ক করেছিলেন কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না আমার জানা নেই। তবে মামু দেখলাম আমাকে বেশ সমীহ করে কথাবার্তা বলছেন। তার ব্যবসা ইত্যাদি ব্যাপারে আমার সাথে আর কোনো কথাবার্তা নেই। তার সঙ্গীটিকে নিয়ে তিনি সকালেই বেরিয়ে যান শ্যামবাজারের দিকে আর ফেরেন রাতে শোবার সময়। কীসব মালপত্র কিনে এনে টাকা-পয়সার হিসাব মেলান। আমি চুপচাপ বসে থাকি লুৎফর রহমানের জন্যে। তিনি তাঁর কাজ থেকে ফিরে এলে তাঁর সাথে ওয়েলেসলির দিকে বেড়াতে যাই। তখন ওয়েলেসলি স্ট্রিটে রাস্তার দু'পাশে দুটি সিনেমা হল ছিল। একটার নাম ম্যাজিস্টিক ও অপরটা ক্রাউন সিনেমা। হল দুটোর সামনে বিরাট রঙিন বোর্ডে বিশাল আকর্ষণীয় পোস্টার। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আর রাস্তা দিয়ে দেখি সুন্দর স্মার্ট পোশাকে আমার বয়েসি ছেলেমেয়েরা খুব দ্রুততার সাথে হেঁটে যাচ্ছে। মহানগরীর দ্রুতগতি যেন এরা প্রতিটি পদক্ষেপে বয়ে বেড়াচ্ছে। আমার মনে কোথায় যেন একটু বেদনা অনুভব করি। ব্যর্থতার বেদনা।

আমি লুৎফর রহমানের সাথে মালাবার রেস্টুরেন্টে বসে চা খাই। আর কলকাতা শহরের লোক চলাচলের বৈচিত্র্যময় দ্রুতগতির দিকে তাকিয়ে থাকি। তাঁর সময়-সুযোগমতো তিনি আমাকে নিয়ে যান আলিপুর চিড়িয়াখানায়, গড়ের মাঠে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে। যে হোটেলে চাকরি করতেন সেই হোটেল গ্র্যান্ডের গল্প বলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর গল্প শুনি। একবার তিনি রবীন মজুমদারের মদ খেয়ে মারামারি গল্প আমাকে বলেছিলেন। খুব নাকি মদ খেয়েছিলেন রবীন মজুমদার। আর সঙ্গীদের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছিলেন। গল্পটা শুনে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। কারণ রবীনবাবু তখন চলচ্চিত্রের খুব উঁচু মানের শিল্পী। তার তখনকার প্রতিটি ছবি আমি দেখেছিলাম। আমার বুক জুড়ে তার প্রতি একটা শ্রদ্ধার আসন ছিল। লুৎফর রহমানের কথায় তা মুহূর্তের জন্য একটু টলে গেল। কিম্বা বলা যায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিয়ে আমার মনে যে স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব ছিল তা কেটে গিয়ে যা বাস্তব তাই উদঘাটিত হলো। পরবর্তী জীবনে, কবি বললে, উঁচুদরের কোনো গায়ক কিম্বা বাজিয়ের কথা বললে আমার সামনে একটা সাধারণ মানুষের ছবিই ভেসে উঠত। কোনো ফেরেশতার ছবি নয়। আজও কেউ কোনো কবির অপার্থিব প্রতিভার ইঙ্গিত দিলে আমার সামনে একজন পরিশ্রমী মানুষের ইমেজই খাড়া হয়। কোনো অলৌকিক কিছু ভাবি না।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, লুৎফর রহমান তখন ছিলেন একটা হোটেলের সাধারণ কর্মচারী। তাঁর মনটা ছিল এক গবেষকের যিনি মানুষের ক্ষুদ্রতা ও দেবত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর সঙ্গ তখন এবং পরবর্তী জীবনে ঢাকায় সংবাদপত্রে তাঁর সহকর্মী হিসেবে আমাকে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছিল। সে সময় তিনি তাঁর কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে গল্প লিখতেন। তাঁর একটি গল্প তখন কলকাতার এককালের খ্যাতনামা গল্পকার মিহির আচার্যের একটি আধুনিক গল্প সংকলনেও স্থান পেয়েছিল। বইটির নাম ছিল 'কাদামাটি'। জীবনের নানা সংঘাত ও পেশার ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে লুৎফর রহমানের মতো নিষ্ঠাবান লেখকও আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগোতে পারেননি। তাঁর এই পরাজয়ের দৃষ্টান্ত যখন আমার ভাবনায় আলোড়িত হয় তখন ভাবি প্রতিভার সাফল্য আসলে ব্যাপারটি কী? এটা কি নিয়ত পরিশ্রম না দৈবের কোনো সহায়তা? লুৎফর রহমান তো ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। তিনি হেরে গেলেন কেন? তাঁর চেয়ে অনেক কম পরিশ্রমী ও কম প্রতিভাবান মানুষ যা পারলেন লুৎফর রহমান কেন তা পারেননি? সম্ভবত এ রহস্যের কোনো সত্যিকার জবাব আমাদের জানা নেই।

আমি দিন দশেক পরেই কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। দেখলাম সবই স্বাভাবিক। আমি যে ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম তা রফা হয়ে গেছে। যে লিফলেটে আমার কবিতা ছাপার জন্য আমার এই ভোগান্তি, মুসার বুদ্ধিতে তাও কেটে গেছে। লিফলেটের যে অংশে আমার কবিতা ছিল মুসা বুদ্দি করে সেই অংশটি লিফলেট থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে বিলি করায় আমার ওপর দিয়ে ঝড়-ঝাপটার বেগটা কমে গেল। তাছাড়া আমাদের বাড়ি থেকেও কর্তৃপক্ষের সাথে আমার নির্বুদ্ধিতার সাফাই গাওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়।

আমি ফিরেই শুনি আমার বোন হানুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আমার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সাথে। আমাদের গ্রামেই তাদের বাস। আমি খুশি হলাম এই ভেবে যে আমাদের বোনটি এখন থেকে আমাদের গাঁয়েই থাকবে। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে হানুর বিয়ে হয়ে গেল। হানুর শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর আমার চাচা-চাচি আমাকে খুব টানতে লাগলেন। আমি তখনও কলকাতার আমেজ ঠিকমতো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পড়াশোনা গোল্লায় গেছে। স্কুলেও যাই না। ঘরে আমাদের খুব অভাব। ঠিক এ সময় চাচা-চাচি আমাকে তাদের সঙ্গে করে দাউদকান্দি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আব্বা কোনো আপত্তি না তুললেও আম্মা অসম্মত হলেন। কিন্তু আমার চাচা-চাচির ব্যাকুলতার কাছে আমার দুঃখী আর অহঙ্কারি মা দাঁড়াতে পারলেন না। ঠিক হলো আমি আমার চাচা-চাচির সাথে জগৎপুর সাধনা হাইস্কুলে এসে ভর্তি হব। আবার পড়াশোনা শুরু করব ঠিকমতো।

২৫

একদিন আমার চিরচেনা পড়ার ঘরটিতে তালা দিয়ে আমার সমস্ত বইপত্র, সংগ্রহ ইত্যাদি একটা বিশাল ট্রাংকে গুছিয়ে নিয়ে চাচা-চাচির সাথে তাদের কর্মক্ষেত্রে রওনা হব ঠিক হলো। ট্রেনে কুমিল্লা হয়ে দাউদকান্দি যাবার সুবিধা থাকলেও, চাচা কেন জানি তার ঘরের সমস্ত তৈজসপত্রসহ নৌকায় যাওয়াই স্থির করলেন। যদিও এই দীর্ঘ পথ নৌকায় যাওয়া খুবই বিরক্তিকর তবুও আমি চাচির পোষা হাঁস-মুরগি ও মেয়েলি লোয়াজিমার কথা ভেবে চুপ করেই থাকলাম। আমার আন্দাজ, চাচির আসবাবপত্রগুলোর জন্যই চাচাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নৌকায় যেতে হচ্ছে। চাচি আমার বিষাদমাখা চেহারা দেখে আমাকে উৎসাহিত করার কোনো কসুরই বাদ রাখলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার বার আমাকে ডেকে নিয়ে বুঝাতে লাগলেন, 'যাওয়ার সময় মুখ গোমরা করে আছিস কেন? দেখিস নৌকোয় নাইওর যেতে কী মজা! নদীর পাড়ে পাড়ে কত গ্রাম, কত বাজার আর ঘাট। কত রকম মানুষ। আর ডিঙিতে যেতে যা মজা না, তুই তো কবি, তোর খুব ভালো লাগবে। খুব বেশি তো না, শুধু একটা দিন আর রাত আমরা নাওয়ের ভেতর থাকব। তুই সেখানে ইচ্ছা করলে কবিতাও লিখতে পারবি। তোর চাচা তোদের পরিবারের যা আজগুবি গল্প বলে না, সেসব শুনলে তুইও আমার মতো ভিরমি খাবি।'

চাচা আমার পাশেই খাটের ওপর বেডরোল বাঁধছিলেন। চাচির কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসছিলেনও। চাচির শেষ বাক্যটা চাচাকে উসকাবার জন্যই বলা।

চাচা জবাব দিলেন, 'কেন, আমি আমার বংশ নিয়ে মিছে কেচছা করি নাকি?'

'ওমা আমি তাই বললাম নাকি, সয়ফুল মুল্লুক আর বদিউজ্জামাল পরীর পুঁথির মতো তোমাদের কেচ্ছাও সাচ্চা।'

'তুমি আবার বংশের মর্যাদা কী বুঝবে! তোমরা তো ছোটলোক। রাধিকা আবার কোনো শরাফতঅলা মানুষের গাঁ নাকি? নমশুদ্রের রক্ত পাঠানদের সাথে মেশায় গায়ের লাল রংটা পেয়েছে।'

চাচির বাপের বাড়ি ছিল রাধিকা গাঁয়ে। চাচার মোটা খোঁচাটা সম্ভবত চাচির গায়ে লাগল। চাচি একটু চিকন সুরে হেসে বললেন, 'আমার রংটাই আমার খান্দানের পরিচয়। কালো রঙ কিন্তু কোনো বড় খান্দানে দেখিনি। শুধু তোমার মধ্যেই দেখলাম।'

এবার চাচা বেশ জব্দ হলেন। হেরে গিয়ে হেসে ফেললেন জোরে, 'হযরত বেলালের (রা.) চামড়া কিন্তু কালো ছিল, সেটা জান?'

'জানব না কেন, তবে তোমার চেয়ে কালো ছিল বলে শুনিনি। তুমি তো ভেতরে-বাইরে কালো। আমার কপালে মেহগনির পোড়া লাকড়ি।'

চাচির কথা ফুরালে উভয়েই হো হো করে হেসে ফেললেন। আমিও এদের খুনসুটি শুনে মুরুব্বিদের ঠাট্টামস্করায় থাকতে নেই বলে আমার পড়ার ঘরের বাইরে চলে এলাম।

মসজিদের কাছে যেতেই আমার পড়ার ঘরের তালাটা খুব বড় হয়ে চোখে পড়ল। মনটা যেন একদম দমে গেল। কত স্মৃতি এই ঘরটার সাথে জড়িত। অশৈশব এ ঘরটাকেই আমি আমার আবাস ও বিশ্রামস্থল বলে জানি। কেন মনে হলো যেন আর কোনোদিন এই ছোট্ট কামরাটিতে আমি ফিরব না। সারাদিন ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে কিম্বা রাতের গভীরে ইচ্ছামতো পায়চারি করে তালাটা খুলে বিছানায় লুটিয়ে পড়ব না। শোভা আসবে না আর বন্ধুরা আসবে না। সবই তো চুকে বুকে গেছে।

বাকি জীবন সত্যি আমি এ ঘরে ফিরে আসার সুযোগ পাইনি। আমি বিভুঁইয়ে থাকার সময় কোনো এক ঝড়ের ঋতুতে ঘরটি পড়ে গিয়েছিল বলে শুনেছি। পরে শরিকদের মধ্যে কাঠ ও টিনগুলো ভাগ হয়ে গিয়ে শুধু শূন্য ভিটেটি পড়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজও তেমনি আছে। বাড়ি গেলে আজও শূন্য ভিটাটির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। একবার আমার ছোট ভাইয়ের ছ-সাত বছরের মেয়েটা আমাকে বাড়িতে এসে মসজিদের সামনে শূন্য ভিটেয় একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখানে তুমি কি খোঁজো বড় কাকু? পয়সা হারিয়ে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ মা, আমি যখন তোমার মতো ছোট ছিলাম তখন আমার বাপ আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছিল। এখানে খুব সুন্দর একটা ঘর ছিল কিনা! প্রথম এক ইমাম সাহেব থাকতেন আমার সাথে। তারপর তিনি চলে গেলে আমি একা একা এ ঘরটায় থাকতাম বলে এক পরী আসত আকাশ থেকে নেমে। কালো পরী। সে আমাকে তার নাম লেখা একটা সোনার দিনার দিয়েছিল। আমি তখন খুব বোকা ছিলাম মা, একদিন খেলতে খেলতে পরীর দেওয়া সোনার টাকাটা কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম। তাই বাড়ি এলে এই পুরোনো খেলার জায়গাটায় আমি আজও সেই সোনার মোহরটা খুঁজি। কী জানি, আবার পেয়ে যাই যদি।'

'দূর, বোকা! হারানো সোনা কেউ আবার ফিরে পায় বুঝি? তুমি খুব বোকা কিন্তু, বড় কাকু। এমন দামি জিনিসটা হারিয়ে ফেললে। আমাকে দিয়ে দিলেই পারতে। আমি ঠিক গয়না বানিয়ে গায়ে পরতাম। আর হারাত না।'

ছোট মেয়েটির আক্ষেপ শুনে আমি বলেছিলাম, 'তুমি তো তখন ছিলে না মা। তোমার তখনও আসার সময় হয়নি। নইলে পরীর টাকাটা এমনি হারায়! আমি তো তোমাকেই দিয়ে দিতাম। তুমি গয়না গড়িয়ে গায়ে পরে পরীর মতো ঘুরে বেড়াতে।'

আমার কথা শুনে মেয়েটা চোখ তুলে ইতিউতি ভাঙা ভিটেয় পরীর টাকা খুঁজে বেড়ায়। আমি হাসতে পারি না। কারণ আমিও তখন অন্য এক স্মৃতির ভিটেয় এক হারানো পরীর সোনার দিনার খুঁজে বেড়াই। এখানে এক জায়গায় আমরা দু'জনই একবয়েসী। সমান শিশু।

আমরা নৌকায় করে জগৎপুর এসে পৌঁছলাম। চাচি তার হাঁস-মুরগির পালসহ হেন জিনিস নেই যা সঙ্গে করে নিয়ে আসেননি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাড়ি প্রায় খালি করে এসেছেন। তার আটঘাট দেখলে মনে হয় যেন চিরজনমের মতো চলে এসেছেন নিজের সংসার আর ঘরদোর ছেড়ে। আমরা এখানে এসে সারাদিন চাচির জিনিসপত্র গোছালাম। আমার চাচি তালগাছের ছোবড়া দিয়ে টুপি বানাতে জানতেন। তাঁর হাতের টুপি অনেক দামে বাজারে বিক্রি হত। সেই টুপি বানানোর অনেকগুলো ধাতুর ছাঁচও চাচি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। এখানে যে বাড়িতে এসে উঠেছি এটা এ গাঁয়ের এক সম্ভ্রান্ত সচ্ছল লোকের বাড়ি। বাড়ি নয় ঠিক বাড়ির বাইরের একটা অংশে কৃষি অফিস ও অফিসারের জন্য দুটি মজবুত ঘর। একটাতে অফিস অন্যটাতে আমাদের বাসা। আর বাড়িটার সর্বত্র ইতস্তত আমগাছ ছড়ানো। এত আমগাছ আমি একই সাথে একটা গ্রামে দেখিনি। পরিবেশটা আমার কাছে খুব ভালো লাগল। সত্যিকার গ্রাম আমি যেন এই প্রথম দেখলাম। যদিও আমি মফস্বল শহরেরই লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও সাব-ডিভিশন শহরগুলোকে তো কেউ আর শহরের মর্যাদা দেয় না। মফস্বল শহরগুলোও আসলে তো একটা সুবিধাপ্রাপ্ত বড়সড় গ্রামই। জগৎপুর এসে বুঝলাম বাংলাদেশের অকপট গ্রামজীবন ও গ্রাম সভ্যতার হাজার হাজার বছরের অতীত উপাদান, আদান-প্রদান ও মানুষের পারস্পরিক সমবন্ধ সূত্রগুলো আদতে কীরকম ছিল। মানুষ যে এমন সরল ও পরস্পর নির্ভরশীল হতে পারে তা যেন এ গাঁয়ে না এলে কোনোদিন জানতামই না। আমি এখানেই প্রথম এমন অনেক গুল্মলতা, ঔষধি, ফুল, পাখি ও পতঙ্গের নাম জেনেছিলাম যা বাকি জীবন ভুলতে পারিনি। জেনেছিলাম প্রতিটি গাছ ও লতাপাতার গায়ের প্রাকৃতিক গন্ধ কেমন। প্রজাপতিদের জন্মগুটি থেকে এদের বিবর্তন ও উড়ালের পদ্ধতি দেখেছিলাম। তিলফুলের ক্ষেতে মৌমাছিদের ঝাঁক নেমে এলে আমি এদের মধুলুটের বাজারে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতাম। দেখতাম বাবুইয়ের বাসা বাতাসে দোল খাচ্ছে। গ্রীষ্মের দুপুরে নিদাঘ নির্জনে ঘুঘুর ডাক শুনে ভাবতাম আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কোনো উপত্যকায় বাস করতে এসেছি। চিনেছিলাম পাখির ডিমের কোনটার কী রঙ। আর দেখেছিলাম নৌকার ভেতর যাযাবর ভাসমান গ্রাম। বেদে-বেদেনীদের জীবন। এই এলাকাটাকেই বলা হতো গোখরো সাপের এলাকা। জগতের সবচেয়ে বিষাক্ত সাপের হিস হিস চলাফেরা, ফণা তুলে দাঁড়ানোর দুঃসাহসি ভঙ্গি চাক্ষুষ দেখার যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, তা এখানে প্রথম সঞ্চয়ের সুযোগ হয়। এ পোষা সাপের খেলা নয়। সাক্ষাৎ মৃত্যুর এক অনিশ্চিত বিদ্যুৎগতি যেন। রাতে পড়ার টেবিলের নিচে পা রেখে লেখাপড়া করতে দিতেন না চাচা-চাচি। সাপে কামড়াবে বলে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাপে কাটা মৃত্যুর যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল তা আজও ভুলিনি। বর্ষাকালে যখন বন্যার পানিতে সারা ভাটি অঞ্চল ডুবে যেত, নৌকো ছাড়া এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়া-আসা অসম্ভব হত, তখনই সাপের উৎপাতে সারা গাঁয়ে হাঁস-মুরগি পালা এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। সোলার আগুন ছাড়া বৌ-ঝিরা এঘর-ওঘর করতেও সাহসি হতো না।

আর শুনেছিলাম সাপের লোকগাথা। মনসার ভাসান। পয়ারবন্ধে মানুষের ভাষা যে এমন মহিমামণ্ডিত হতে পারে তা সম্ভবত এ অঞ্চলে কিছুদিন বসবাস করার সুযোগ না পেলে কোনোদিন জানতামই না। কী মানবিক বাকচাঞ্চল্য ছিল সেসব পুঁথিতে। আর অসাধারণ বিদ্রোহ। মৃত্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে সাধারণ মানুষ—দাঁড়াচ্ছে বেদদেবীর অর্থহীন অর্চনার বিরুদ্ধে। প্রেমের মূল্য দিতে গিয়ে মৃত্যুর পরিণামকে কেমন অবহেলা—কখনও বীরত্বের সাথে আবার কখনও বা বিষণ্নচিত্তে মেনে নিচ্ছে। জগৎ যেখানে বৈরী সেখানে প্রেমের মহিমা গাইতে অপরাজিত বাঙালি নারীরা উপকথার খোলস ফাটিয়ে তরবারি মতো হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এসবই আমি শিখেছিলাম এখানে। কাহিনি আর বাস্তবের লোক বসতিতে খানিকটা মিল খুঁজে পেয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমাহীন নদী আর বিল-হাওড়ের এই একাধিপত্যের মধ্যে আমি মানুষের আহার্য সন্ধানের পদ্ধতিগুলো শিখে নিয়েছিলাম। নৌকা বাইতে, দাঁড় টানতে শিখেছিলাম। শিখেছিলাম নানা ধরনের জাল ছড়াতে। বড়শি বাইতে। কুচ বা চল দিয়ে ধাবমান মাছ গেঁথে ফেলতে। ডালা শিকারিদের নৌকায় সারারাত ঘুরে-ফিরে সকালে প্রকাণ্ড রুই-কাতলা নিয়ে ঘরে ফিরতে।

আমি চিরকালের আমিষভোজী হলেও জগৎপুরে আমার সাথীরা আমাকে শিখিয়েছিল উদ্ভিদ আহারের মজা। কত রকমের শাক যে চিনেছিলাম আমি। আমার চাচির হাতের ঘিয়েভাজা শাক রান্না ছিল জগতের সুখাদ্যগুলোর অন্যতম। কত রকম শাক তুলে আনতাম আমি। গিমেই, হেলঞ্চা, পুঁই, পাট, কাটাখুদরী, আমখুদরী, মটর, খেশারি, ধতুরা, খাটাই, ঢেঁকি আরও কত যে বিচিত্র শাকপাতার নাম জানতাম আর গাছ চিনতাম আমি। বুঝি সত্যি এদেশে উদ্ভিদ খাদ্যের কোনো ইয়ত্তা নেই। আঁশহীন মাছ মিশিয়ে শাক রাঁধতেন আমার চাচি। আমি তার সব রকম রান্নার যোগান দিতাম।

চাচির বাহারি রান্নার যোগান দিতে আমারও উৎসাহের অন্ত ছিল না। ডোলা ঝুড়ি নিয়ে বাজার করতে আমি চলে যেতাম মাইল মাইল পথ হেঁটে গ্রাম্য হাট-বাজারে। আদিম সে সব বাজার। রাতে বিশাল কেরোসিনের শিখা কিম্বা কুপি জ্বালিয়ে হাটগুলোতে বিকিকিনি হত। কত রকম গ্রাম্য পসরা বসত সেখানে। লাঙ্গলের ফাল থেকে শুরু করে পাখি ধরার খাঁচা, মাছ ধরার নানারকম পলো, আইডা, ছিপ, বড়শি, জাল সবই পাওয়া যেত সেখানে। কিষাণ জীবনের ছোটখাটো লোয়াজিমা। আর পোড়ামটির হাঁড়িকুড়ি।

এ এলাকার সবচেয়ে বড় হাট বাতাকান্দি বাজার। জগৎপুর থেকে বেশ দূরে। প্রায় মাইল তিন-চার হবে। মাঝেমধ্যে আমাকে পাঠানো হতো সেখানে। হাটের দিনে অন্যান্য গ্রামবাসীর সাথে আমিও যেতাম হাটে। পথে সর্ষে ফুলের ক্ষেতের পাশ দিয়ে কত কলাই শাকের কোমল ঝোপ মাড়িয়ে যেতে হত। সর্ষে ফুলের হলুদ রঙটা এমনভাবে চোখের মধ্যে ঢুকে যেত মনে হতো বুঝি দুনিয়াটাতেই হলুদের মেলা বসেছে। তরমুজ আর ফুটির জমির পাশ দিয়ে যেতে দেখতাম কচি ফলগুলো মাটির ওপর রোদে পুড়ে আর শিশিরে ভিজে কেমন তরতাজা রঙ ধরেছে। কে যেন খড় বিছিয়ে ফলগুলোকে মাটির কীট থেকে বাঁচাবার জন্যে সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখে গেছে। আবার কোথাও কোথাও কুলকাঁটা দিয়ে ঘেরা। সারাটা পথ আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে বাতাকান্দি বাজারে গিয়ে দাঁড়াতাম। মনটা যেন সুগন্ধিময়তায় ভরে যেত আর সেখানে উড়ত কল্পনার রঙ-বেরঙের প্রজাপতি।

এখানে এসেই স্কুলে ভর্তি হতে পারলাম না। বছরেরও অর্ধেক চলে গেছে। ঠিক হলো কয়েক মাস পরেই বছরের প্রথম থেকে স্কুলে ভর্তি হব। এই সময়টায় চাচা সকাল-সন্ধ্যায় আমার পড়াশোনা দেখবেন। ভর্তি না হলেও আমি স্কুলে যাব। ক্লাসে বসব। হেডমাস্টার ছিলেন আমার চাচার তাস খেলার বন্ধু। তিনিই এ পরামর্শ দিলেন। সেভাবেই চলল। আমি স্বার্থপরের মতো বাড়ির কথা, আব্বা-আম্মার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদম ভুলে গেলাম। চাচি আমার আম্মার দুঃখী মুখটাকে আমার স্মরণরেখার ওপর থেকে আস্তে আস্তে মুছে ফেলতে লাগলেন। একদিন কীভাবে যেন চাচি বললেন, 'হানুর জন্যে তোর খুব টান, না-রে?'

'বোনের জন্য ভাইদের টান থাকে না বুঝি? আমি কী করব বল।'

'আমি কি আগে জানতাম তোর বাপ-মার কাছ থেকে তোকে এমনভাবে নিয়ে আসতে পারব। আর তুই আমাদের ঘরে এমন শান্ত হয়ে থাকবি।'

আমি চাচির এসব কথার কোনো জবাব দিতাম না। হাত বাড়িয়ে চাচির বাড়িয়ে দেওয়া চায়ের কাপটি নিলাম। আমাকে মাথা নিচু আর নির্বাক দেখে চাচি আবার শুরু করল, 'আমার যদি আরও একটা মেয়ে থাকত, কতই না ভালো হত।'

আমি হেসে জবাব দিলাম, 'তাতেই বা কী হতো ওটাকেও তো হানুর মতোই বিদেয় করে আসতে হত।'

'না-রে বিদেয় করতে হতো না। আর একটা থাকলে তোর সাথে বিয়ে দিতাম।'

আমি হেসে বললাম, 'না থাকাতে দেখছি ভালোই হয়েছে, চাচা-চাচির সোহাগটা আমি একাই লুটছি।'

'কত সোহাগ। আমাদের কী আছে তোকে সোহাগ দেব। আমরা কত গরিব।'

আমি চাচিকে আমার কাপে আর একটু চিনি দিতে বলে প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইলাম। কিন্তু চাচি প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে এমন এক জায়গায় আমাকে নিয়ে গেলেন যেখানে পুত্রবতী হওয়ার গৌরব-বঞ্চিতা এক মা ও ভিন্ন অহঙ্কারী মায়ের কষ্টের সন্তান মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়।

'তুই আমাদের ফেলে পালিয়ে যাবি না তো?'

'কোথায় পালাব?'

'তোর আবার ঠিকঠিকানা আছে? একবার তো কলকাতা পালিয়ে গেলি।'

বললেন চাচি। আমি প্রসঙ্গটাকে আবারও হালকা করার জন্য হাসলাম, 'আপনার আচারের বৈয়ামগুলো তাহলে আমাকে দিয়ে দিন। পালাব না।'

'তোকে তো আমাদের যা আছে সবই দেব। অবশ্য আমাদের কিই বা আছে? জমি জিরাত তো কিছু নেই।'

'হানুকে দেবেন না কিছু?'

'হানুকে তো যা দেবার দিয়েছি। ভালো ঘরে বিয়েও দিয়েছি। তোদের রক্তের মধ্যেই। ওদের তো আছেও প্রচুর। আমরা আর কী দেব!'

আমি জানতাম বিয়ের সময় চাচা হানুকে গয়নাগাটি মালসামান কম দেননি। একমাত্র সন্তানের জন্যে যেটুকু করা সম্ভব আমার চাচা-চাচি তা করেছেন। আমি বললাম, 'চাচি আমি কিছুই চাই না। আমি শুধু আপনার আচারের বৈয়ামগুলো ও আমসত্ত্বগুলো চাই। ওগুলো আমাকে উইল করে লিখে দিয়ে যাবেন। এতেই আমি খুশি থাকব। আমার কথা শুনে চাচি বললেন, 'দাঁড়াও তোমাকে আমসত্ত্ব খাওয়াচ্ছি। মেয়েদের মতো চুষে চুষে তুমি আমার সবগুলো টোপা ভরা আচার খেয়েছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর রান্নার খন্তা তুলে মারার ভঙ্গি করলেন। আমি রান্নাঘর থেকে হাসতে হাসতে উঠোনে নেমে গেলাম।

২৬

বছরটা গ্রামে গ্রামে ঘুরে, নদীতে নৌকা বেয়ে, মাছ ধরে আর গ্রাম্য হাট-বাজারে আসা-যাওয়া করে কীভাবে যে পার হয়ে গেল টেরই পেলাম না। পরের বছর সাধনা হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। আগে ভর্তি না হলেও স্কুলে যাতায়াত ছিল। এবার পুরোপুরি ছাত্র হয়ে গেলাম। পড়াশোনাতেও খুব মনোযোগ দিলাম। নতুন বন্ধু জুটল শহীদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। এরা দু'জনই আমরা যে বাড়িতে থাকতাম এর পাশের বাড়ির ছেলে। এরা আমার কবিতার খাতাটি নিয়ে খুব টানাটানি করত। উৎসাহও দিত খুব। এদের বাড়িতেই কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' নামে খায়রুল আনাম খাঁ সম্পাদিত একটি পত্রিকা নিয়মিত আসত। এর ছোটদের পাতাটি ছিল এদের খুব প্রিয়। ছোটদের পৃষ্ঠাটি সম্পাদনা করতেন 'ভাইজান' খোন্দকার নূরুল ইসলাম। আমরা কাগজটি আসার জন্য বলতে গেলে অধীর অপেক্ষায় বসে থাকতাম। মনে আছে এ সময়টায় 'মোহম্মদী'ই ছিল আমার একমাত্র পাঠ্য বিষয়। এ গাঁয়ে আর কোথাও কোনো পত্রিকা আসত না। বাইরের দুনিয়ার সাথে এখানকার মানুষের কোনো যোগাযোগই ছিল না। তবুও এই গ্রামটিকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। ভালো লেগেছিল এর শান্ত-সমাহিত জীবনের জন্যে। বাইরে থেকে দেখলে কিম্বা ভাবলে মনে হয় একটানা একঘেয়েমির মধ্যে বুঝি জীবন বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি দেখেছি গ্রামে বসবাসের মধ্যে কোথাও যেন একটা প্রাত্যহিক বৈচিত্র্যও আছে, যা মানুষকে সতেজ রাখে।

একদিন স্কুলের ছুটির দিন আমি বাড়ির বাইরে একটা আমগাছের নিচে টুল পেতে বসে মাঠের শোভা দেখছিলাম। মাইলের পর মাইল তিলফুলের শাদা সমারোহ। আর ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছির নাচানাচি। ফুলের শাদা চোঙের মতো খোলসের ভেতর মৌমাছিগুলো দ্রুততার সাথে ঢুকছে আবার চোখের পলক ফেলার আগেই বেরিয়ে আসছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মৌমাছি পাকড়াও করার জন্য জমিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। যেই মৌমাছিটা ফুলের চোঙের ভেতর ঢোকে অমনি অদ্ভুত কায়দায় ফুলটা চেপে ধরে ছেলেমেয়েরা। মৌমাছিটা ছুঁচের মতো বড় হুলটা বের করে দেয় হাতের মধ্যে ফুটিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু শত্রুর হাতের নাগাল পায় না। এই সুযোগে মৌমাছি শিকারি গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত সাবধানী হাতে সতর্ক মনোযোগের সাথে হাতের লম্বা নখ দিয়ে মৌমাছির একমাত্র আত্মরক্ষার অস্ত্রটি টেনে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর সুতো বাঁধে মৌমাছির পায়ে। মাছিটা উড়তে থাকে কিন্তু পালাতে পারে না। অর্থহীন আনন্দের জন্য এক নিষ্ঠুর খেলা। অবশ্য মাঝেমধ্যে এর জন্য শিকারিদের খেসারতও দিতে হচ্ছে। হুলটা তুলবার সময় মাঝেমধ্যেই হুলটা নখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার হয়ে মাংসে ঢুকে যায়। তখুনি শুরু হয় চিৎকার। আহা উহু। তবুও কেন যে এই মৌমাছি নিয়ে খেলার শখ গ্রাম্য ছেলে-মেয়েদের!

আমি এই খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ আমার পেছন থেকে কে যেন কথা কয়ে উঠল, 'আমাকে একটা মধুপোকা ধরে দেবেন। আমি সুতো বেঁধে উড়াব।'

আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম একটি মেয়ে। নাম রাফিয়া। বয়েস চৌদ্দ-পনেরোর মতো হবে। মুখে লাজুক হাসি। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

আমি বললাম, 'আমি তো মৌমাছি ধরার কায়দা জানি না কীভাবে ধরব?'

'পারবেন তো। ক্ষেতে নেমে ওদের সাথে চুপ চুপ করে এনে এনে আমাকে দিন না, বলল মেয়েটি।

অগত্যা আমি জমিতে নামলাম। বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করতাম মেয়েটি আমার সাথে আলাপ করার জন্য ব্যাকুল। ঘাটলায় বা অন্য কোথাও দেখা হয়ে গেলে হাসে। কোনো উপলক্ষ না থাকায় কথা বলতে পারে না। ওদের বাড়িটা ছিল আমাদের থেকে দুটো বাড়ি পার হয়ে। মেয়েটি ছিল জন্ম রাখাল। কয়েকটি গাই-গরুই এদের সম্বল। খুব গরিব যে তা পোশাকে-আশাকেই বোঝা যায়। তবে স্বাস্থ্যে, মুখের হাসিতে অদ্ভুত একটা সতেজ ভাব। আমার খুব ভালো লাগল।

আমি তিলের জমির মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। একটা ঝাঁঝালো স্বস্তিকর গন্ধ। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। আমি একটা মৌমাছিকে অনুসরণ করে একটু একটু এগোলাম। মৌমাছিটা যেই একটা ফুলের মধ্যে ঢুকল অমনি আঙুল দিয়ে ফুলটা চেপে ধরলাম। বোঁটা খসে গিয়ে মৌমাছিসহ ফুলটা এখন আমার হাতে। হুলটা মৌমাছিটার লেজের দিকে দ্রুত বেরিয়ে এসেছে। হুলের ডগায় তীব্র বিশেষ তরল শ্বেতবিন্দু। ঘাসের ডগায় জমে থাকা সূক্ষ্ম এক ফোঁটা শিশিরের মতো। আমি নখ দিয়ে হুলটা তুলতে যাওয়া মাত্র নখের ফাঁক দিয়ে আমূল বসে গেল আঙুলের মাথায়। একটা ঝনঝনে ব্যথা মুহূর্তেই ঝিলিক দিয়ে উঠল। অনভ্যস্ত হাত সরিয়ে নিতে গিয়েও সরাতে পারলাম না। উল্টো বরং আঙুলে বিদ্ধ হুলটা মৌমাছিটাকে ফুলসহ হাত থেকে ফেলে দিলে সে দ্রুত উড়ে পালিয়ে গেল। হুলটা লেগে আছে আমার বাঁ হাতের আঙুলে। রাফিয়া দৌড়ে এসে হাত ধরল, হুল ফুটিয়েছে? সর্বনাশ, এখন কী হবে, হায় আল্লাহ! এখন আমি কী করি?'

আমি বললাম, 'খুব ব্যথা করছে। হুলটা তুলে ফেলা দরকার।'

আমার কথা বলার সাথে সাথে রাফিয়া আমার আঙুল থেকে হুলটা নখ দিয়ে তুলে ফেলল। হুলটা তখনও নড়ছে। হুলের গোড়ার দিকে মৌমাছির শরীরের ছিন্ন হলদেটে মাংস লেগে আছে। রাফিয়া হুলটা একটা তিলগাছের পাতার ওপর সেঁটে দিয়ে আমার আঙুলটা হাত দিয়ে ঘষতে লাগল। দারুণ ব্যথায় ফুলে উঠেছে পাটগাছের মোটা গোড়ার মতো। সারা শরীর চনবন করছে। আমি বললাম, 'ছাড়ো, ঘরে গিয়ে ওষুধ লাগাই। চাচির কাছে নিশ্চয়ই কোনো ওষুধ আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার জন্যই আপনার বিপদটা হলো। আমাদের বাড়িতে আসুন আমি তেল মেজে দিই। এক্ষুনি সেরে যাবে। আপনার চাচির কাছে গেলে তো আমাকে বকবে। বরং আমাদের ঘরে আসুন না। আসবেন?'

'চলো।'

আমি রাফিয়াদের ভাঙা ডেরাটার দিকে পা বাড়ালাম। এদের ঘরে এসে দেখি ঘরে কেউ নেই। শূন্য একটা ঘর। ঘরটার চতুর্দিকে রিক্ততার চিহ্ন। হাঁড়িকুড়ির সাথে চাটাইয়ের বিছানা। তবে যত্ন করে লেপাপোছা। আমি চাটাইয়ে বসলাম। রাফিয়া বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া আমার তর্জনিটাকে হাতের তালু দিয়ে ঘষছে। আমি বললাম, 'আমার মাথা ঘুরাচ্ছে। আমার বোধহয় জ্বর এসে যাবে।'

রাফিয়া এবার কেঁদে ফেলল, 'আমি কেন যে আপনাকে হারামজাদা মধুপোকাটাকে ধরে দিতে বললাম। এখন আমি কী করি!'

বলেই রাফিয়া একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। উবু হয়ে আমার আহত আঙুলটাকে ওর মুখের ভেতর নিয়ে চুষতে শুরু করল। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এই কী হচ্ছে? এতে কী হবে?'

'ব্যথা কমবে।'

আমি বোকার মতো বসে থাকলাম। অবশ্য রাফিয়ার মুখগহ্বরের উষ্ণতায় ফুলে ওঠা আঙুলটায় একটু উপশম লাগছিল। হঠাৎ রাফিয়ার কী যেন একটা কিছু মনে পড়ায় সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল। বলল, 'দাঁড়ান ব্যথার ওষুধের কথা মনে পড়েছে। জংলা থেকে এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

রাফিয়া আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাদের ঘরটার পেছন দিকে জংলা মতোন ঝোঁপ-ঝাড়ের দিকে দৌড়াল। আর দ্রুত ফিরে এল হাতে কিছু গাছ-গাছড়া নিয়ে। আমি বললাম, 'এ দিয়ে কী হবে?'

'ব্যথার ওষুধ।' বেটে এক্ষুনি লাগিয়ে দেব। দেখবেন ব্যথা সেরে যাবে।'

'ছাই হবে।'

আমি তখন তীব্র ব্যথায় চনবন করছি। আমি বললাম, 'আমি চাচির কাছে যাই। দেখি ব্যথার কোনো মলম আছে কি না।'

আমি চাটাই ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। রাফিয়ার বিব্রত মুখটাকে আরও ভীতত্রস্ত দেখাল। আমি বললাম, 'আমি চাচিকে বলব না যে তোমার জন্য মধুপোকা ধরতে গিয়েছিলাম।'

আমার কথায় রাফিয়ার চেহারাটা একটু মোলায়েম হলো। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। রাতে আমার খুব জ্বর এল। চাচি মাথায় পানির ধারা দিলেন। জ্বর আর থামে না। জ্বরের মধ্যেই হাসফাঁস করে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জাগলাম একটু বেলা করে। চোখ মেলতেই চাচি বলল, 'মৌমাছি ধরতে গিয়েছিলি কেন? ওটা কি তোর বয়েসি ছেলেদের খেলা?'

'কে বলেছে আমি মৌমাছি ধরতে গিয়েছি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি সব জানি। খুব ভোরে রাফিয়া এসেছিল। তোর জ্বরের কথা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। এ মেয়ের সাথে তোর আবার কখন চেনা হলো রে?'

আমি বললাম, 'চেনা-জানা কিছু না চাচি। আমি মেয়েটিকে একটা মৌমাছি ধরে দিতে গিয়ে হুল বিঁধিয়েছি। ওর আসলে কোনো দোষই নেই। বেচারা অযথা ভয় পাচ্ছে, নিজেকে দোষী ভেবে আকুল।'

'এত বড় ধাড়ি মেয়ে মৌমাছির পায়ে সুতো বেঁধে খেলতে চায়। আর তুই গেলি ওর হুকুম তামিল করতে, এখন জ্বরে ভোগ।'

আমি বললাম, 'রাফিয়া কখন এসেছিল চাচি?'

'খুব ভোরে। রোজই তো আসে। আমরা ওদের গাইয়ের দুধ রোজই রাখি। মেয়েটা খুব খাটতে পারে। নিজে গরু-বাছুরগুলো মাঠে চরায়। ঘরে আনে। আর নিজেই গাইগুলোর দুধ দোয়। স্বাস্থ্যটা কেমন নিটোল দেখেছিস? আমি ওকে খুব আদর করি। খুব সকালে এসে আমার জিওল মাছগুলো কুটে দিয়ে যায়। তুই আর তোর চাচা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাস।'

আমি এখন বুঝলাম মৌমাছি ধরার কথা রাফিয়া কেন চাচিকে বলব বলে ভয়ে কাতর ছিল।

দু-দিন পর আমার জ্বর ছাড়ল। আমি বিছানা ছেড়েই রাফিয়াদের বাড়ি গেলাম। রাফিয়া তখন তার একটা গাইয়ের দুধ দুইছিল। আমাকে দেখে বেশ লজ্জা পেল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আমি দুইতে শিখব। আমাকে শেখাও।'

'গাইয়ের লাথি খেতে হবে, পারবেন?'

'পারব।'

আমার আগ্রহ দেখে রাফিয়া গাইটার ওলান ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আসুন। আঙুলে এই বাটি থেকে একটু সর্ষের তেল লাগান। এইভাবে হাঁটু রেখে বসুন। দেখবেন দুধের কাইরাটা যেন আবার উল্টে ফেলবেন না।'

আমি রাফিয়ার কথায়, ওর নির্দেশ মান্য করে গাইটার ওলানের কাছে বসলাম। হাতে একটু সর্ষের তেল লাগিয়ে নিলাম। তারপর বিসমিল্লাহ বলে বানে টান দিলাম। দুধ নেমে এল কাইরার ভেতর। আমার কী যে আনন্দ হলো কী আর বলব। আমি প্রথম গাই দুইতে শিখছি। আমার আনন্দ ও আনাড়িপনা দেখে রাফিয় হেসে আর বাঁচে না। আমি বললাম, 'আমি প্রতিদিন আমাদের দুধটা দুইয়ে নিয়ে যাব।'

'এত ফজরে আপনি উঠতেই পারবেন না। পারবেন?'

'কেন পারব না, খুব পারব।'

'দেখা যাবে।'

বলল রাফিয়া। ধীরে ধীরে রাফিয়া হয়ে উঠল আমার পশুপালনের শিক্ষয়িত্রী। আমার এক সম্পূর্ণ অচেনা জগতের ভগ্নি। আমি দেখলাম মেয়েটির পরিশ্রম। গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগির প্রতি গভীর ভালোবাসা। এদের অসুখ-বিসুখে রাফিয়াই চিকিৎসা করত। গাভিগুলোর পায়ে খুরের রোগ হলে রাফিয়াকে দেখতাম কী গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোযোগের সাথে সে অবোধ প্রাণির যত্ন নিচ্ছে। খুব পরিষ্কার করে ফিনাইল কিম্বা রোগ নিরাময়ের ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে। রাফিয়ার কাছে শিখেও ছিলাম গাই গরুর মেজাজ ও তাদের অব্যক্ত কথা কীভাবে বুঝতে হয়। রাফিয়া আকাশের অবস্থা দেখে বাতাসের গন্ধ শুঁকে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারত কখন বৃষ্টি হবে। ধান পাকার আর কত দেরি। মাষকলাই কখন গরুকে না খাওয়ালেই নয়। আরও কত কী। সে ছিল প্রাকৃতিক চিকিৎসক। পাতার রস আর শিকড়-বাকড় দিয়ে মানুষের আর পশুর চিকিৎসা করত। আর ছিল অল্পে তুষ্ট। নিজের নিঃসীম দারিদ্র্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অভিযোগ কাকে বলে জানে না রাফিয়া। সব সময় হাসত। হাসিটাই ছিল আমার এই রাখালিনী শিক্ষয়িত্রীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তার অদৃশ্য চাবিকাঠি। আমি ওকে আমার সহোদরার মর্যাদা দিলাম। অসংকোচে মিশতাম ওর সাথে। যখন তখন গিয়ে ওদের ঘরে বসতাম। কয়েক দিনের মধ্যে ওদের ঘরেই একটা খারাপ বিদ্যাও আয়ত্ত হলো। সেটা হলো ধূমপান। তামাক খেতে শিখলাম ওদের ঘরে। ও গেলেই হুঁকোটা এগিয়ে দিত। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলেও পরে ঠিকমতো রপ্ত হয়ে গেল।

২৭

সম্ভবত মানুষের সুখ বা দুঃখের সময়টা একটানা নিস্তরঙ্গভাবে বয় না। এতে কালের এলোমেলো বাতাস এসে নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় তোলপাড়ের সৃষ্টি করে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাকে বলে তা যেমন আমার জীবনে আমি দেখিনি, তেমনি অন্তহীন দুঃখের মধ্যেও আমার জীবন কাটেনি। মানুষের রক্তচক্ষু ও আঘাত দেবার নির্মমতা যেমন আমার রচনায় আমি সাধ্যমতো উত্থাপন করতে পেরেছি, তেমনি অযাচিতভাবে দয়া ও আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত দেখে অভিভূত হয়ে গেছি। কত অশ্রুসজল চোখের অচেনা ভাষা যে আমাকে পড়তে হয়েছে, পার হয়ে আসতে হয়েছে দীর্ঘশ্বাসের কত অদৃশ্য ভূমিকম্প তা ভাবলে নিজের কাছেই নিজেকে বড় পাষাণ হৃদয়ের আত্মসর্বস্ব অস্তিবাদী বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি ক্ষমা পাব তো আমি? একজন মানুষ হিসেবে আমি যে পরিণামের দিকে যাচ্ছি, যেখানে মৃত্যু খুলে দেবে অন্য এক রহস্যময় জগতের দরোজা। সেখানে আমার অক্ষমতার আঘাতে আহত প্রতিকারপ্রার্থীরা কী প্রতিশোধ নেবে? অন্তত তারা কী এটুকুও মানবে না, আমি তাদের ভালোবাসতাম? পৃথিবীতে সাধারণ সামাজিক নিয়মে তারা ছিল এক কবি-হৃদয়ের সাধ্যের সীমানার বাইরের নিষিদ্ধ ফল। যা নয়নভরে দেখে নামমাত্র আয়ুষ্কালকে অতিক্রম করে যেতে হয়। হাত বাড়ানো যায় না। আস্বাদন করা যায় না।

জগৎপুরে আমার দিনগুলো আপাতদৃষ্টিতে নিস্তরঙ্গ মনে হলেও আমার মাংস ও মজ্জায় অন্য এক সোনালি ঢেউ বইতে শুরু করেছিল। কৈশোরের শেষ প্রান্তে এসে পুরুষের রক্তে যে হিল্লোল বইতে থাকে আমি হলাম সেই শিহরণের বিদ্যুৎকেন্দ্র। বাল্যে আমি ছিলাম আমার মায়ের মতো গৌরবর্ণ। অকস্মাৎ আমার গাত্রবর্ণ গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যত্নহীন তামার পাত্রের মতো কালশিটে হয়ে গেল। চোখ দুটি হলো অতিরিক্ত উজ্জ্বল ও পিঙ্গল। গায়ের রঙ ফর্সা থাকায় এতকাল পিঙ্গল অক্ষির তেজটা সহজে কেউ বুঝতে পারত না। তাছাড়া আমার বংশধারায় প্রায় সকলের চোখই ঈষৎ পিঙ্গল; ভ্রমরকৃষ্ণ চোখের অধিকারী কেউ নন। এখন গায়ের রঙটা এই গাঢ় সবুজের তল্লাটে এসে অকস্মাৎ রোদে পুড়ে তাম্রবর্ণ ধারণ করায় দুটি অক্ষিগোলকের ধূসরতা বাজের চোখের মতো জ্বলে উঠল। বেজির লেজের মতো হালকা সোনালি গোঁফের রেখা দেখা দিল। মাথায় ঘন রুক্ষ চুলের ওপর টেরি টানলে বেয়াদপের মতো কুঁকড়ে যেতে লাগল। মোটকথা আমি অনুভব না করলেও আমি বদলে যাচ্ছিলাম।

এক বছরের মধ্যেই আমার এই খোলস ছাড়াটা আর কারো চোখে না পড়লেও আমার চাচির চোখ এড়াল না। সম্ভবত আমার মা কাছে থাকলে আমার মায়ের চোখে পড়ত। চাচি আমাকে চোখে চোখে রাখতে শুরু করলেন। স্কুলের পর আমি একটু বাড়ির বাইরে গেলেই চাচির দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। তিনি ভাবতেন অচেনা জায়গায় অনাত্মীয় পরিবেশে আমি বুজি বখে যাচ্ছি। নাওয়া-খাওয়া ঠিক নেই। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াই। নিম্নবিত্ত মানুষ, যেমন জেলে-জোলা, কিষাণ—তাঁতী, কামার-কুমার, প্রায় সকল শ্রেণির সমবয়েসী স্কুলের সহপাঠীরাই আমাকে তাদের ঘরে টেনে নিয়ে যেত। দাওয়াত করে খাওয়াত। রাতে আসতে দিত না। ছুটিছাটার দিন প্রায়ই বাড়ি থাকতাম না। ছেলেরা এসে চাচার কাছে বলে আমাকে দূর দূর গ্রামে নিয়ে যেতে লাগল। কোরান খতমের দাওয়াত থেকে শুরু করে খৎনার দাওয়াত পর্যন্ত যে কোনো অছিলায় আমার গরিব বন্ধুরা আমাকে তাদের গ্রামে, বাড়ির ভেতরে এমনকি প্রধান ঘরের ঝাঁপের ওপাশে যেখানে তাদের মা-বোনেরা পর্দা করে দাঁড়ায়, সেখানেও টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সংকোচে আমি কেমন ছোট হয়ে থাকতাম। কিন্তু ঝাঁপের ওপাশে গিয়ে তাদের মা-চাচিকে কদমবুসি না করে পারতাম না। আশপাশের সমস্ত গ্রামে আমার জন্য আড়াল উঠে গেল। সবাই আমার নাম জানত কিংবা নাম ধরে ডাকত। কেউ। আবার সম্মান করে বলত কবি। যদিও আমার কবিতা তখনও একটি মাত্র বাঁধাই করা খাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

গাঁয়ে গাঁয়ে দাওয়াত খেয়ে আমি প্রকৃত ঝাল খাওয়ার সাথে পরিচিত হলাম। বালিঝুরি মরিচ। প্রথম প্রথম লোকমাই গিলতে পারতাম না। মাথা ঝিম ঝিম করে উঠত। মনে হতো বুঝি কানে তালা লেগে গেছে। এদের বাড়িতে এরা যেসব বংশানুক্রমিক কাঁচের অতিকায় গেলাসে পানি খায়, যা যুগ যুগ ধরে এরা অতি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করে এসেছে, অতিথি আপ্যায়নে এগিয়ে দিয়েছে, আমি ঝালমুখে সেই গেলাস থেকে ঢক ঢক করে পানি খেয়ে ব্রহ্মতালু ঠাণ্ডা করতাম। গেলাস হতো কোয়ার্টার ইঞ্চি পুরো নিরেট কাঁচের। এমন ভারী যে পানি ভরা থাকলে বাঁহাতে তোলা যেত না। সহায়তার জন্য ভাত মাখানো ডান হাতটার একটু ঠেকনা লাগত। গেলাসগুলোর কোনোটা আবার রঙিনও হত। হালকা নীল রঙের। বেদের মেয়েরা এককালে গ্রামে গ্রামে তা গৃহস্থের ঘরে ফেরি করে বেচত। আজকাল আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন গেলাস হয় না কেন? বাংলাদেশের জল-যাযাবরীরা কি তবে তাদের চিরকালের নাইয়া সংসার ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছে?

একদিনের একটি ঘটনায় চাচি আমার বাউণ্ডুলেপনার বিরুদ্ধে চাচার কাছে বড় রকমের আপত্তি তুললেন। ঘটনাটা ঘটল শীতের রাতে কাউকে না বলে বেশ কয়েক মাইল দূরের এক গ্রামে যাত্রা দেখতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় পড়ে।

আমি রাতের খাওয়ার পর চাচার অফিস ঘরে শুয়েছিলাম। ঘুম আসছিল না। বাইরে পূর্ণিমা। এমন সময় কে যেন ফিসফিস করে আমার দরজায় নাড়া দিল।

আমি বললাম, 'কে বাইরে?'

'আমি শহীদুল্লাহ।'

আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম, 'কী ব্যাপার শহীদ, এত রাতে?'

'যাত্রাগান দেখতে যাবে নাকি?'

'কোথায়?'

'গৌরীপুরের কাছে।'

'এই শীতের রাতে এতদূর?'

'*চন্দ্রহাস* পালা। দারুণ।' বলল শহীদুল্লাহ।

আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী। অগত্যা আমি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম আমগাছটার নিচে আরও কয়েকটা ছায়ামূর্তি। বুঝলাম বেশ আটঘাট বেঁধেই আমার বন্ধুরা আমাকে নিতে এসেছে। একটু দূরে ঘাটলায় শহীদের কোষা নাওটা বাঁধা। আমি বললাম, 'চাচা-চাচিকে কিছু না বলে গেলে সকালে খুঁজবে না?'

'খোঁখুঁজির আগেই আমরা ফিরে আসব। আমরা তো কেউই বাড়িতে জানিয়ে যাচ্ছি না।'

'যদি ফজরের আগে না ফিরতে পারি?'

'তাহলে একসাথে সাতজন নিখোঁজ। সারাগাঁয়ে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে। শুধু একা তোমার জন্য তোমার চাচিই কাঁদবে না, সারা গাঁ বিলাপ করবে। ততোক্ষণে আমরা এসে ঘাটে ভিড়ব।'

শহীদের কথার ধরন দেখে আমি হেসে ফেললাম, আমার সাথে সাথে ছায়ামূর্তিরাও হাসল। বললাম, 'দাঁড়াও কোটটা পরে দরজায় তালা দিয়ে আসি।'

আমার সম্মতি পেয়ে ছায়ামূর্তিরা নৌকার দিকে হাঁটা দিল। শহীদ দাঁড়াল আমাকে নিয়ে যেতে। আমি আমার একমাত্র শীতের সম্বল গরম কোটটি গায়ে চড়িয়ে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে এলে শহীদ তাদের মাছ শিকারের পাঁচ ব্যাটারির টর্চ লাইটটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'তুমি লাইটটা নিয়ে নৌকার সামনের পাটাতনে বসবে। আমরা বাকি ক'জন দৌড়ের নাওয়ের মতো বৈঠা মেরে চালিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'জোছনা রাতে টর্চ দিয়ে কী হবে?'

'লাগবে। অনেক গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে যেতে হবে, সাপ-খোপ আছে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যুৎগতিতে সলংগা কোষা নৌকাটা চলতে লাগল। নাওটা কোষা হলেও বেশ লম্বা। প্রায় দৌড়ের নৌকার কাছাকাছি কিংবা তার সগোত্র। শহীদরা বর্ষায় হাটবাজারের কাজে এ নাও ব্যবহার করে। আমি নৌকার অগ্রভাগের ত্রিভুজ আকৃতির শেষ পাটাতনে বসে আরাম করে বিড়ি টানছি।

নৌকাটা একটা গ্রামের ঠিক মাঝামাঝি প্রবাহিত খালে এসে পড়ল। খাল না বলে নালাই বলা উচিত। কারণ সরু খালটার দুই তীর থেকে ঝোপ-জঙ্গল, গাছ-গাছড়ার ডালপালা এসে খালটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। আকাশে থালার মতো ভরাট চাঁদ থাকলেও তা তখন মেঘের আড়ালে। গ্রামটাকে দূর থেকেই বড় বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছিল। যেন একটা অতিকায় প্রেত হাঁটু ভেঙে উবুড় হয়ে সিজদায় পড়ে আছে। আর তার সারা শরীরে জোনাকিরা নেচে বেড়াচ্ছে। এখানকার নদীনালা সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা থাকলেও এখন কোনো কিছু ঠাহর করতে পারছি না। খালটার প্রবেশমুখে নৌকার মাথাটা ঢোকা মাত্রই শহীদ বলল, 'টর্চ জ্বেলে রাখ।'

আমি টর্চ টিপলাম। আলোর তীর গিয়ে লাফিয়ে পড়ল ডালপালায় ঢাকা খালের ভেতর।

'আলো নিভাবে না। সাবধান, পানখি নৌকায় লাফিয়ে পড়তে পারে।'

শহীদের কথায় আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। পানখি মানে স্ত্রী-গোখরা। সবাই এক দম-বন্ধ করা আতঙ্কের মধ্যে খালটার ভেতর দিয়ে চলছিলাম। ঠিক এ সময়ই বিপদটা এল সম্পূর্ণ অভাবনীয় দিক থেকে। হঠাৎ আমার মনে হলো কে যেন আমার পিঠের দিকে আমার কোটটা চেপে ধরে আমাকে শূন্যে তুলে নিতে চাইছে। পর মুহূর্তেই মনে হলো আমার পিঠে চেপে ধরা অদৃশ্য হাতটা আমাকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছে। আর সাথে সাথে একটা বুকফাঠা চিৎকার করে আমাদের নৌকার কে যেন একজন খালের পানিতে লাফিয়ে পড়ল। তাকে রেখেই নৌকা কয়েক গজ এগিয়ে গেলেও শহীদ কায়দা করে বৈঠা উলটো মেরে নাওয়ের গতি থামিয়ে দিল। তারপর দ্রুতহাতে বৈঠা ফেলে দিয়ে আমার কাছ থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে পেছন ফিরে খালের ভেতর আলো জ্বালাল। দেখলাম আমাদের একজন সঙ্গী খালের পানিতে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে শূন্যে ঝুলে আছে। তার গলা ও মুখ বেয়ে নামছে টাটকা লাল রক্তের ধারা। সে কীভাবে ঝুলে আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ শহীদ আলো ফেলল, আমি ভয়ে চোখ মুদে ফেলাম। মুহূর্তের মধ্যে যে দৃশ্য দেখেছিলাম তা হলো এই, আমাদের সঙ্গী ছেলেটির কানের ভেতর একটি বিশাল বোয়ালমারা বড়শি গেঁথে আছে। বড়শির দড়ির মতো মোটা সুতো বাঁধা আছে একটি বরাক বাঁশের ধনুকের মতো মোটা ফালির সাথে।

ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের মুহূর্তের বিলম্ব হলো না। রাঘব বোয়াল শিকারের বড়শিতে আমাদের সঙ্গি বিঁধে গেছে। বড়শিটা প্রথম আমার পিঠেই লেগেছিল কিন্তু নৌকার দ্রুতগতির কারণে সম্ভবত তা মাংসে না ঢুকে কোটের ওপর সেলাইয়ে বিঁধে যায় এবং চলতি নৌকার টানে কোটের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে লাফিয়ে উঠে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের ছেলেটির কানে আটকে যায় এবং তাকে বিশাল বোয়াল মাছের মতো শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে।

সাধারণত এসব ঝোপ জঙ্গলপূর্ণ নালাতেই বোয়াল শিকারিরা রাতে তাদের বড়শি বসিয়ে যায়। উগোল মাছের বড় টোপ গেঁথে পানি থেকে এক দেড় হাত ওপর ঝুলিয়ে রাখে। ক্ষুধার্ত মাছটা যখন এই টোপ দেখতে পায় তখন রাক্ষসের মতো ঝাঁপ দিয়ে টোপটা আস্ত গিলে ফেলে। আর অমনি বড়শিতে বিঁধে ঝুলে থাকে শূন্যে, বেশি নড়াচড়া করতে পারে না কারণ পানি থেকে মাথাটা অনেক ওপরে বড়শিতে বিঁধে থাকে।

আমাদের বন্ধুটির হলো সেই বড়শি বেঁধা বোয়ালের দশা। শহীদ তাড়াতাড়ি তার পকেটের ধারালো চাকু দিয়ে বড়শির গুণটা কেটে ফেলল। আর অন্য হাতে ছেলেটির দেহটাকে আস্তে করে নৌকায় নামিয়ে আনল। ছেলেটি তখন জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। শহীদ চোখের পলকে কান থেকে বড়শিটা বের করে আনল। আর ক্ষতস্থান বেঁধে দিল একটি লাল গামছা দিয়ে। আমরা দেহের রক্ত মুছিয়ে দিয়ে আহতের মাথায় অঞ্জলিভরা পানি দিতে লাগলাম। কোথায় যে পালাল আমাদের যাত্রা দেখার শখ। আমরা সোজা নৌকার মুখ ঘুরিয়ে আমাদের গাঁয়ের দিকে রওনা দিলাম।

২৮

AMARBOI.COM

গাঁয়ে ফিরে আহত ছেলেটির চিকিৎসার যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এই নিশা অভিযানের সমস্ত দায়-দায়িত্ব ও দোষারোপ চাপল শহীদ ও আমার ঘাড়ে। আমার দুঃসাহস দেখে চাচি খুব নারাজ হলেন। পরীক্ষার পর যেন আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় এ ব্যাপারে চাচি চাচাকে রাজি করালেন। চাচির ভয় ছিল এই পরিবেশে আমি যদি মানুষ হওয়ার বদলে বখাটে হয়ে যাই তবে এর জন্য আমার বাপ-মা ও আত্মীয়স্বজন চাচিকেই দুষবে। চাচি আমার সাথে কথা বলা যথাসম্ভব কমিয়ে দিলেন। খুব জরুরি কাজ না হলে তিনি আমাকে আর হাট-বাজারে পাঠাতেন না। এই পরিবেশে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। আমি চাচিকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা তো করতামই, তা ছাড়া সব সময় ভাবতাম আমার চাচির কোনো ছেলে নেই। আমিই তার পুত্রের অভাব পূরণ করতে এসেছি।

কিন্তু সব কিছু কেমন যেন পাল্টে গেল। চাচি যে আমার ওপর বিশ্বাস হারালেন সে বিশ্বাস আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। যা হোক, এই অবিশ্বাস ও অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, চাচার বদলির চিঠি এসে হাজির। চাচাকে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে বদলি করা হয়েছে। এই আকস্মিক বদলিতে চাচা তেমন অপ্রসন্ন না হলেও চাচি খুব রাগ করলেন। চাচাকে বললেন তদবির করে এই বদলি ফেরাতে। চাচা এতে অসম্মত। চাচা জানালেন তিনি চেষ্টা-তদবির করে বদলি ফেরাতে যাবেন না। কারণ তিনি বদলির চাকরি করেন। তার কাছে সীতাকুণ্ড যা জগৎপুরও তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাচি এখানে তাঁর অজ্ঞাতেই এক সংসার পেতে বসেছিলেন। হাঁস-মুরগি, ছাগল-গরু নিয়ে এক আদিম সংসার। যা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শত শরিকের মধ্যে সম্ভব হয়নি এতদিন। তাছাড়া যৌথ জীবনের জন্য যে পবিত্র গ্রাম্যতা দরকার আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাড়িতে তা ছিল না। আমাদের পরিবাটা ছিল তৎকালীন নাগরিক স্বাচ্ছ্যন্দ সম্বন্ধে বেশ একটু ওয়াকিবহাল। সবাই আদিকাল থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের শহর-বন্দরগুলোর সাথে ব্যবসাসূত্রে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। সে কারণে বাড়ির আবহাওয়া ও পরিবেশটি ছিল নাগরিক পরিবেশের মতো। খাওয়া-দাওয়া বসবাস ও পোশাক-আশাকে সবাই ছিলেন আধুনিক বহুদর্শী ও বহু ভ্রমণে অভিজ্ঞ।

আমার চাচির মধ্যে ছিল এক বিশুদ্ধ গ্রাম্যতা। তিনি যৌথজীবন ভালোবাসতেন। হাঁস-মুরগি পালন ভালোবাসতেন। গ্রাম্য বিচার-সালিশীর গুণগান গাইতেন। সম্ভবত আমাদের বাড়িটা তার কাছে ভালো লাগত না। আমাদের বাড়িটা ছিল এক সম্পূর্ণ বিপরীত। যেন অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে আমাদের বাড়িটাই শুধু একবিন্দু শহর। যেখানে জমিজমা ও ফসলের আলোচনার বদলে বাজারের হালচাল নিয়ে বেশি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হত। চা-পাট ও চামড়ার দামের উত্থান-পতন দিয়ে তর্ক হত। ঝোল গুড় রফতানি ও বিলেতি কাপড় আমদানির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে এরা সদা সতর্ক থাকতেন। এরা কেউ সাধারণ আদার ব্যাপারি ছিলেন না বলে সকলেই জাহাজের খবর রাখতেন। এমনকি মেয়েরাও। কিন্তু আমার চাচি ছিলেন এসবের বাইরে। একটু দলছাড়া কেমন যেন একটু গ্রাম্যও। যদিও আমার চাচির মতো রূপসি নারী আমার মা ছাড়া আমাদের বাড়িতে আর কেউই ছিলেন না। উভয়েই বিলাসি ছিলেন। তবে এঁদের বিলাসিতার মধ্যে ছিল একটা আশ্চর্য ধরনের পার্থক্য।

চাচার বদলির খবরে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিছুদিনের জন্য চাচির সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টি থেকে দূরে থাকতে পারব। এতেই আমার আনন্দ। চাচার বদলির চিঠি পাওয়ার পরদিন আমি চাচিকে বললাম, 'আমি বাড়ি চলে যাই তা হলে?'

'এখনই বাড়ি যাবি কিরে, আমাদের সাথে সীতাকুণ্ড যাবি না?'

'না চাচি। আমি বাড়ি গিয়েই ঠিকমতো লেখাপড়া করব আর আপনাকে কষ্ট দিতে সীতাকুণ্ড যাব না।'

আমার কথায় চাচির চেহারা কালো হয়ে গেল। আমাকে কী যেন বলতে চাইলেন বলতে পারলেন না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। হতে পারে অবচেতনে আমার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা ছিল যা আমার চেহারায় ভেসে উঠেছিল। চাচি আহত হয়েছেন দেখে আমি বিব্রতবোধ করলাম। চাচি বললেন, 'গেলে কি আর ফিরবি?'

আমি কথার জবাব দিতে চাইলাম না। চাচি নিজে থেকেই বললেন, 'আমি জানি তুই আর আমাদের কাছে আসতে চাইবি না, তোর মাও দেবে না। শুধু আমার ভাশুরের কাছে আমি যে কথা দিয়েছিলাম তা মিথ্যা হয়ে যাবে।'

'আব্বাকে কী কথা দিয়েছিলেন চাচি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোকে লেখাপড়া শেখাবার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম।' বললেন চাচি।

আমি বললাম, 'আমি তো আমাদের বাড়িতে লেখাপড়া ঠিকমতোই করছিলাম। কেন আমার আব্বা-আম্মা আমাকে আপনার ওপর চাপিয়ে দিলেন তা আমি বুঝি না চাচি।'

'চাপিয়ে দেননি। আমি নিজেই তোকে নিয়ে এসেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আমার ছেলে নেই। তুই হবি আমার ছেলে। কিন্তু তোকে এনে বুঝলাম তুই কারো ছেলে নোস। হতেও পারবি না। মায়ের কাছে সন্তানের যে আনুগত্য থাকে তোর মধ্যে তা নেই। আমার আগে ধারণাই ছিল না তুই কী ধরনের ছেলে। তোর মা হয়তো মনে মনে ভাবে তুই তার অনুগত সন্তান। আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু আমি দেখেছি তোর কোনো মাতৃঋণ নেই। মায়ের জন্য সন্তানের যে টান থাকে যে কৃতজ্ঞতা আর মমতা থাকে তোর মধ্যে তা নেই। আমি তোর নিন্দা করছি না। করতে চাইও না। শুধু তোর যা নেই তা তোকে বলছি। তোর কোনো পিছুটান নেই। যাকে বলে স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা আড়াল হলে যা থাকে না। সাবধান তুই যাকে বিয়ে করবি তাকে ফেলে যেন দীর্ঘদিনের জন্য কোথাও থাকিস না। তাহলে তুই বউকেও ভুলে যাবি।'

বললেন চাচি। তার চোখ-মুখ বেশ উত্তেজিত। আমি বললাম, 'চাচি আপনি কি আমাকে অভিশাপ দিলেন!'

'না আমি তোকে সব সময় দোয়া করি। মনে হয় একদিন তুই খুব বড় হবি। কবি হবি। আমার কথাগুলো মনে রাখিস।'

আমি বিস্মিত হয়ে চাচির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর ভয়াবহ আশীর্বাদ আমার শরীরে যেন স্নেহ পদার্থের মতো গলতে শুরু করল।

AMARBOI.COM

২৯

কিছুদিন পরই চাচার অনুমতি নিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম। কথা হলো পরের মাসে আমি সীতাকুণ্ড গিয়ে দশম শ্রেণিতে ভর্তি হব। অনিচ্ছায় চাচি আমাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। চাচি হয়তো ভেবেছিলাম আমি বাড়ি এসে চাচির সাথে আমার যে বেমিল সৃষ্টি হয়েছে এ নিয়ে কথাবার্তা তুলব। কিন্তু আমি চাচির মাতৃহৃদয়ের কথা জানতাম। জানতাম আমার প্রতি তাঁর গভীর বাৎসল্যের কথা। চাচির একটা কথা সারা জীবন আমাকে খুব দুঃখ দিয়েছে। আমি জানি না আমার প্রতি তার এই উক্তি অভিশাপ না নির্মম সত্য। সত্য হলেও এ ধরনের কথা আমার প্রতি চাচির ব্যক্ত করা উচিত হয়নি। কারণ যার যা নেই সেই অভাববোধের কথা তার জানা থাকা উচিত নয়। চাচি আমার অভাবের কথা আমাকে জানিয়ে দিয়ে আমাকে দুঃখ দিয়েছিলেন। একটি সন্দেহ চিরকাল আমাকে তাড়া করেছে। সেই সন্দেহটি হলো—আমার কি তবে যা কিছু আপন বলে মনে হয়, সবই গভীর আন্তরিকতাহীন? আমার মাতৃঋণ নেই? আমার বন্ধুরা কি ঋণ সম্পর্কের কারণেই বন্ধু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব প্রশ্ন মনে জাগলেই শোভার চেহারাটা আমার মনে স্পষ্ট ভেসে উঠত। আমি শোভার সাথে যে আচরণ করেছি তা কি তবে এই কারণে যে তার সাথে আমার পরিচয় একটা আকস্মিক সম্পর্ক মাত্র? তা না হলে আমি কীভাবে শোভাকে ভুলে গেলাম? এ ধরনের সন্দেহ সারা জীবন আমাকে ঘুণপোকার মতো একটু একটু করে কেটেছে।

আমি বাড়ি এসে আমার পুরোনো জীবনে ফিরে যেতে চাইলাম। চাইলাম আবার বইয়ের জগতে ফিরে যেতে। আবার পাঠাগারে পাঠাগারে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু হলো না। কী যেন নেই। শোভা যে আমার যাওয়ার পর আগরতলায় চলে গেছে সেটা আমি জানতাম। এ কারণে আমার মানসিক একটা প্রস্তুতি ছিল। তবু শোভা হাসপাতালের যে বাড়িটাতে থাকত একদিন সেখানে গিয়েছিলাম। দেখি দরজায় পিতলের সেই চিরচেনা তালাটি লাগানো। যা শোভা সদাসর্বদা ব্যবহার করত। সেদিকে গেলেই আমাকে বলত 'দাঁড়াও, তালাটা লাগিয়ে নিই।' আমি ফিরে দেখতাম তালাটা শোভা যত্ন করে লাগাচ্ছে। তালাটা তেমনি আছে দেখে হঠাৎ শোভার কথা বড় মনে পড়ল। ভাবলাম শোভাকে একটা চিঠি লিখব। শোভার আগরতলার ঠিকানা তার প্রতিবেশীদের কাছেই পাওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শোভাকে কোনো চিঠিই লেখা সম্ভব হয়নি। কেন জানি লিখতে ইচ্ছে বা সাহসে কুলোয়নি।

ঠিক এ সময় আমার এক ফুপু আমাকে বললেন, 'যাবি আমার সাথে?'

ফুপু তেলিয়াপাড়া চা বাগানের পাশেই একটা বাংলোয় থাকতেন। ফুপা ছিলেন সিঅ্যান্ডবির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। আমার এই ফুপুর নাম সুফিয়া। শ্যামবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। তিনি ছিলেন আমার সমবয়স্কা ও পুতুল খেলার সাথী। আমার প্রতি গভীর মমতাবোধ ছিল তাঁর ও তাঁর স্বামীর। যেহেতু আমি বাড়িতে থাকতাম না সে কারণে বহুকাল যাবত এঁদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতো না। এবার বাড়ি এসে আমাদের পারিবারিক দুর্দশা ও আমার 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থা দেখে আমার প্রতি তাঁর সম্ভবত দয়া হলো। আমি বললাম, 'তেলিয়াপাড়া গিয়ে কী করব?'

'তুই আবার কী করবি। আমাদের সাথে কয়েকদিন থাকবি। চা বাগান দেখবি আর কবিতা লিখবি। মনটা ভালো থাকবে। পরে না হয় সীতাকুণ্ড চলে যাবি।'

আমি রাজি হয়ে গেলাম। বেশ কিছুকাল যাবতই আমার মধ্যে একটা যাযাবরবৃত্তি জেগে উঠেছিল। কেউ কোথাও নিয়ে যেতে চাইলেই আমি রাজি হয়ে যেতাম। আমার তেলিয়াপাড়া যাওয়ার ব্যাপারে সুফিয়া ফুপু আব্বা-আম্মাকে কীভাবে যেন রাজি করিয়ে ফেললেন।

তেলিয়াপাড়া, মনতলা এসব এলাকা আমার একেবারে অপরিচিত না হলেও আমি এসব স্টেশনে আগে কোনোদিন নামিনি। ট্রেনে আসা-যাওয়ার সময় কতবার যে এসব স্টেশনে নামতে ইচ্ছে হয়েছে। ইচ্ছে হয়েছে একটু নেমে ধানখেতের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াই। হঠাৎ সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি খুব খুশি হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যেদিন তেলিয়াপাড়া এসে নামলাম, যতদূর স্মরণ করতে পারি, সেদিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। আকাশ ছিল ভারী পুরু স্তরের কালোমেঘে ঢাকা। সকালবেলাটাকেই সন্ধ্যাবেলা বলে মনে হচ্ছিল। আমরা স্টেশনে মালপত্র নামাতেই ভিজে চুপসে গেলাম। আমার ফুপার বাংলো থেকে মহাদেব নামের একজন কুলি এসেছিল আমাদের মালপত্র নামাতে। লোকটার বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্নর কম হবে না। তবে স্বাস্থ্য ছিল খুবই মজবুত। আমাদের বিছানাপত্র বৃষ্টিতে আধভেজা অবস্থায় স্টেশনের বারান্দায় রাখা হলো। স্টেশনেমাস্টার ছিলেন আমার ফুপা আহাদ সাহেবের অত্যন্ত পরিচিত। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাদের সকলকে তাঁর কামরায় নিয়ে গেলেন। চা দিলেন সকলকে, আমার পরিচয় পেয়ে হাসলেন, 'কবি আর কুলিদের জন্য জায়গাটা বেশ চমৎকার।'

আমি বুঝলাম ভদ্রলোকের কথার মধ্যে খোঁচার আভাস থাকলেও এ হলো বিশুদ্ধ ঠাট্টা। পরে বুঝেছিলাম তেলিয়াপাড়া চা বাগান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হলেও বাঙালিদের জন্য এখানকার জীবন বড় কষ্টদায়ক এবং একঘেয়ে। এখানে বাঙালিদের সামাজিক আদান-প্রদান সীমাবদ্ধ।

আমি হেসে বললাম, 'কবিদের কাজও কুলিদের মতোই। উভয়েই চায়, খারাপ জিনিস থেকে বেছে যা কিছু কচি ও কোমল তা আলাদা করে ফেলতে। কুলিরা কচিপাতা বাছে, আর আমরা কোমল শব্দ বাছি।'

জানি না আমার এই জবাবের মধ্যে কী ছিল। দেখলাম, আমার ফুপা আমার দিকে প্রীতি ভরে তাকালেন। স্টেশন মাস্টার হেসে বললেন, 'আপনি তো আহাদ সাহেব খুদে দার্শনিককে সঙ্গে নিয়ে চা-বাগানের জঙ্গলে এসেছেন।'

আমাকে সিঅ্যান্ডবির ডাকবাংলোয় থাকতে দেওয়া হলো। আর ফুপা-ফুপু থাকলেন পাশের একটি তরজার ব্যারাকে। ব্যারাকটাও খুব সাজানো-গোছানো সুন্দর।

যেদিন প্রথম এলাম, এসেই ডাকবাংলোয় ক্লান্ত হয়ে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে খেয়েদেয়েই এসেছিলাম সকালে এবং সবাই ছিলাম ক্লান্ত শ্রান্ত। ফুপুর আর রান্না করার মুড ছিল না। বলেছিলেন, 'তোমরা একটু বিশ্রাম নাও। বিকেলের চায়ের সাথে মুরগির রোস্ট করে খাওয়াব।'

ঘুম ভাঙাল এক কুলি-কামিন। মেয়েটির বয়স বিশ বাইশ বছর হবে। আমাকে বেকুফের মতো গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'বাবু উঠ। নাশতা রেডি।' আমি বিছানায় উঠে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কে?'

মেয়েটি হাসল। অদ্ভুত সুন্দর হাসি। বলল, 'হামি সর্দারের বেটার বউ। মেরা নাম কাহানী।'

আমি আবার মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখলাম। পরনে শাদা থান। কানে কোনো গয়নার বালাই নেই। অটুট স্বাস্থ্য। মুখে হাসি লেগেই আছে। আমি বললাম, 'তোমার স্বামী নেই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না বাবু। মোটর অ্যাকসিডেন্টে মরিয়া গেছে। আমার একটা লাড়কা আছে। আমি আমার শ্বশুরের সাথে থাকি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসায় কাম করি। আগে বাগানে কাম করতাম।'

৩০

এক অদ্ভুত ও অচেনা পরিবেশে এসে পড়েছি আমি। কেউ সঙ্গী নেই। একা ঘুরে বেড়াই। স্টেশন পার হয়ে মাঝে মধ্যে পূর্বদিকে গভীর চা বাগানে ঢুকে পড়ি। দেখি পিঠে চায়ের খালি ঝুড়ি নিয়ে বাগানের কুলি-কামিনরা হেঁটে আসছে। সারাদিনের পাতা তোলার ক্লান্তিতে চোখ-মুখ কেমন যেন ভারি ভারি। কেউ কোনো কথা বলে না। ফিরেও তাকায় না পথচারীদের দিকে। সকলেই সারাদিনের জমানো পাতার হিসাব দিয়ে ঘরে ফিরছে। আমি মুলক রাজ আনন্দের 'দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি'র কথা স্মরণ করি। এদের মধ্যে খুঁজি সেসব চরিত্র। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এরা যেন কোনো চরিত্রই নয়। নিষ্প্রাণ ছায়ার মতো এরা নড়াচড়া করে। আর সারাদিন কাজ করে যায়। এদের আমার একটুও ভালো লাগে না। এরা যেন সমগ্র মানবসমাজ ও সভ্যতার বাইরে। বাগানের বাইরেও মানুষের একটা সমাজ আছে এ সম্বন্ধে এরা যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিংবা অজ্ঞ থাকতে চায়। আমি গায়ে পড়ে এদের সাথে মিশতে চেষ্টা করে দেখেছি। এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে চেয়েছি। নিষ্প্রাণ হাসিতে এরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এদের আমার ভালো লাগেনি।

মাঝেমধ্যে বাগানের আশপাশের অঞ্চলে সন্ধ্যার পর উন্মুক্ত মাঠে কুপি জ্বালিয়ে এদের জন্য হাট বসে। এরা সপ্তাহের বাজার—নুন-মরিচ, ডাল-তেল কিনতে আসে। আমি এ ধরনের হাটে অপ্রয়োজনে গিয়ে বসে থাকি। আমার কাছে যা ভালো লাগে তা হলো আদিম প্রায় অন্ধকার বিপণিতে মানুষের লেনদেন। কখনও কাহানীকে দেখি তার ছেলেটির হাত ধরে বাজারে এসেছে। আমাকে দেখে হাসে। ভারী মিষ্টি হাসি মেয়েটির। বলে, 'বাবু জংলি বরই খাবে?'

আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাই। সে শোনে না। জোর করে আমার হাতে বুনো কুল গুঁজে দেয়, 'আরে খালো। বহুত মজাদার।'

অগত্যা আমি তার দেওয়া কুলগুলো একটা একটা করে মুখে পুরতে থাকি। টকের আভাস থাকলেও পাকাগুলো বেশ মিষ্টি। আর অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ। আমি কাহানীর ছেলেকে বাজার থেকে গরম ছোলা ভাজা কিনে দিই। ছেলেটিও বেশ হাসি-খুশি।

দুপুরে খাওয়ার পর আমি যখন বিছানায় গড়াই ঠিক তখনই মহাদেব এসে আমার খাটের পাশে মেঝেয় আরাম করে বসে। চা-বাগানের গল্প আর কুলি-কামিনদের থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেয়। আমি বুঝলাম, বাগানের বাবুদের চেয়ে কুলিদের প্রতিই মহাদেব বিরূপ বেশি। একদিন সে অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে এক প্রস্তাব দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসল। বলল, 'বাবু আমার নাতিটাকে একটু হরফ চিনিয়ে দিন। আপনি তো সারাদিন বাংলোয় শুয়েই কাটান। শেখাবেন?'

আমি সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলাম। আমার সম্মতি পেয়ে মহাদেবের সে কী খুশি! সে লাফিয়ে উঠল, 'আমি বউটারে বলে আসি।'

একটু পরেই কাহানী ছেলের হাত ধরে এসে হাজির। খুশিতে ডগমগ করছে। তার ছেলের হাতে বাংলা বর্ণমালার একটা বই। আর সে নিয়ে এসেছে এক গেলাস দুধ।

আমি বললাম, 'আমি তোমার ছেলেকে বাংলা বর্ণমালা শিখিয়ে দেব। তবে খুব ভোরে উঠতে হবে। উঠেই ছেলেকে আমার এখানে পাঠিয়ে দেবে।'

কাহানী ঘাড় নেড়ে তক্ষুনি রাজি। আমার খুদে ছাত্রটিও হাসছে। আমি ছেলেটিকে কাছে টেনে এনে মাথায় হাত দিয়ে আদর করলাম। এখন আমার ঠিক মনে নেই আমার ছাত্রটির কী নাম ছিল। তবে ছেলেটি ছিল খুবই চটপটে আর সুন্দর। আমার সোহাগ পেয়ে হঠাৎ বলে বসল, 'বাবু কাল বাগানে গান হবে, মার সাথে আমি যাব।'

আমি বললাম, 'বাগানে কী গান হবে?'

কাহানী বাধা দিয়ে বলল, 'আরে রেখে দিন ও কথা। বাগানে পরব হবে, নাচ-গান হবে, কুলিদের জংলপালা হবে। সারারাত চলবে। ও বলছে মাতালদের সেই আড্ডাখানায় আমি একে নিয়ে যাই।'

আমি বললাম, 'কখন হবে?'

'আগামী রাতে।'

আমি বললাম, 'আমি যাব।'

কাহানী আড়চোখে আমার দিকে তাকাল।

'আমাকে যেতে দেবে না?'

'বাবুরা কুলিদের নাচ দেখতে যায় না।'

'আমি যদি যাই?'

'সারারাত থাকতে হবে। খুব বেহায়াপনা হয়। আপকা আচ্ছা নেই লাগেগা। মাৎ যাইয়ে। কিউ যানে মাংতা?'

কাহানী গম্ভীর হয়ে বলল।

আমি বললাম, 'আমি তো চা বাগানের কাণ্ডকীর্তি দেখতেই এসেছি। আমার আবার রাত-বিরেত কী? মহাদেবকে বল আমাকে নিয়ে যেতে।'

'বাবা এসবে যায় না।'

'তবে আমি একাই যাব। কোন বাগানে হবে?' বললাম আমি।

কাহানী আমার দিকে আড়চোখে আবার একটু দেখল। কোনো জবাব না দিয়ে দুধের খালি গেলাসটা আমার কাছ থেকে নিঃশব্দে প্রায় কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমি ভাবলাম, যাক। আগামীকাল স্টেশনে গেলেই জানা যাবে কোন বাগানে পরবের নাচ-গান হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কাহানীর ছেলেটিকে বাংলোর মেঝেয় বসিয়ে বর্ণমালা শেখাতে লাগলাম। ছেলেটির উচ্চারণ খুব সুন্দর। অতি উৎসাহে সে অ আ পড়তে লাগল। পরের দিন যথারীতি আমি বাগানে পরব দেখতে যাওয়ার কথা ভুলেই গেলাম। তা ছাড়া দুর্গম পার্বত্য পথ দিয়ে একা একা যেতে হবে ভেবে আমার তেমন উৎসাহও ছিল না। আমি রাতের খাওয়া সেরে বাংলোয় শুয়ে পড়েছিলাম। বাতি নেভানো ছিল। তবে ঘরের ভেতরটা খুব অন্ধকার ছিল না। জানালায় পূর্ণিমার রক্তশূন্য ফ্যাকাসে নিরুত্তাপ চাঁদের আলো। বিছানায় বালিশে ঠিকরে পড়ছে ঠাণ্ডা আভা। আমি নিঃশব্দে জানালার ভেতর দিয়ে আকাশের নিরুদ্দেশ শূন্যতার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এমন সুন্দর রাতে আমাকে কেন জানি উদ্ভট সব চিন্তা এসে খামচে ধরে। চাঁদনি রাত। এমন চাঁদনি রাতে আমার কেন জানি মনে হলো জোছনার ভেতর এখন যদি বৃষ্টি নামত কতই না ভালো হত। বাইরে বুনো পোকা-মাকড় ও ঝিল্লির শব্দ একটানা বেজে যাচ্ছে। জানালা থেকে দেখা যায় পেঁচাদের ওড়াওড়ি।

এমন সময় জানালায় কাহানীর মুখটা জেগে উঠল, 'পরব দেখাতে গেলে নিকাল আইয়ে, বাবু।'

আমি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম, 'তুই ঘরে আসবি? দুয়ার খুলে দেব?'

'নেহি। বাবু, আপ পিরহান লেকে বাইরে আসুন।' বলল কাহানী।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমাকে তুই বাগানে পরব দেখতে নিয়ে যাবি? তোর ছেলে কোথায়?'

'লেড়কা ঘুমিয়ে আছে, বাবু। ও সারারাত জেগে কাটাতে পারবে না। আপনি যান তো জলদি চলিয়ে।'

আমি কাহানীর কথায় তাড়াতাড়ি উঠে পাজামা পরে নিলাম। দুয়ার ভেজিয়ে বাইরে এসে দেখি কাহানী বেশ সেজেগুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। শাদা থানের বদলে উত্তর প্রদেশের স্টাইলে কুচি দিয়ে ছাপা শাড়ি পরেছে। তবে কুলি মেয়েদের মতোই আঁটসাঁট করে পেঁচানো। শাড়ির নিচের ঘের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছায়নি। বিরাট করে খোঁপা বেঁধেছে। মাথা থেকে কমদামি গন্ধের তেলের কড়া খুশবাই বেরুচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর শ্বশুর জানে?'

'হাঁ, বলে এসেছি। বাবাই বলল তোমাকে পরব দেখিয়ে আনতে। যাবে তো তাড়াতাড়ি চলো, বাবু। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে কাহানীর পিছু নিলাম। মেয়েটা হাঁটতে পারে বটে। বিচিত্র তার হাঁটার ভঙ্গি—যেন একটা চিতল হরিণী দ্রুত কোনো উঁচু গিরিশৃঙ্গ থেকে নেমে আসছে। আমরা স্টেশন পার হয়ে সোজাসুজি না গিয়ে তেলিয়াপাড়া স্টেশনকে ডানে রেখে রেল লাইনের গা ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে যে পায়ে চলার পথ গেছে, সেটা ধরে হাঁটতে লাগলাম। কাহানী আমার গা ঘেঁষে হাঁটছে। আমি বরং ওর সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে বলা যায় দৌড়াচ্ছি। ওর গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ লাগছে আমার নাকে। কেউ কোনো কথা বলছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে কতক্ষণ চলার পর প্রায় আড়াই মাইল পথ পেরিয়ে এলাম বলে আন্দাজ হলো। আমি বললাম, 'কাহানী আমাকে তুই কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?'

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে ফেলল। তারপর কোমরে হাত রেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'জাহান্নামে। এসে গেছি। আর বেশি দূর নয়।'

আমি বললাম, 'তাহলে একটু জিরিয়ে নিই। আর দৌড়াতে পারছি না।'

আমার কথায় কাহানী থপ করে মাটিতে বসে পড়ল। চাঁদের আলোয় বাগান ঝলমল করছে। চায়ের গাছগুলো এদিকে মানুষের মাথার মতো সুন্দর করে ছাঁটা। কাহানী তার কোমর থেকে বিড়ি বের করে ধরাল, আমাকে সাধল, 'জাহান্নামে এসে গেছি বাবু। একটু পরেই রসিক নাগরের গান শুনতে পাবে।'

তার খিলখিল হাসি আর থামে না। আমি বললাম, 'কাহানী এসব কী হচ্ছে?'

'একটু ফুর্তি লুটে নিচ্ছি বাবু।'

'আগে জানলে তোর সাথে আসতাম না।'

'আমি কি খেয়ে ফেলব নাকি তোমাকে। চলো, তোমাকে আজ দারু খাইয়ে নাচাব। দারু পিওগে, বাবু?'

আবার খিলখিল করে হাসল কাহানী। আমাকে হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল, 'চলো।'

আমি তার পেছন পেছন যেতে লাগলাম। একটু পরেই পাহাড়ের ওপাশ থেকে আলো ও মানুষের জটলা দেখতে পেলাম। বেশির ভাগই কুলি-কামিন। মঞ্চে পালা এখনও শুরু হয়নি। তবে মঞ্চটি সাজিয়েছে বেশ। যারা মাটিতে বসে আছে তাদের সকলেই কুলি। বাঙালি কেউ নেই, হঠাৎ কাহানীকে নিয়ে আমি সেখানে পৌঁছুলে সবাই অবাক হয়ে আমাদের দেখতে লাগল। আমি অপরিচিত পরিবেশে এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম।

৩১

বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ আমাদের দিকে এগিয়ে এল। নিজেদের অদ্ভুত ভাষায় কাহানীর কুশল জানতে চাইল। আমি বুঝলাম এরা কাহানীর খুব পরিচিত। সম্ভবত এরা আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কাহানী আমার দিকে ফিরে এদের কী সব বুঝতে লাগল। একটা ফাজিল মেয়ে আমাকে দেখিয়ে কী একটা কথা বলাতে সবাই দেখি হাসিতে প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ার অবস্থা। বুঝলাম সবাই মাতাল। দেশি মদের গন্ধে চারপাশটা কেমন যেন ভুর ভুর করছে। চারদিকে মদ্যপানের একটা যৌথ উৎসব চলছে। এক বৃদ্ধ কুলি দম্পতি আমাদের পায়ের কাছেই মদের ভাড় নিয়ে বসে পড়েছে। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কাহানী বলল, 'দাঁড়াও বাবু। আমি তোমার জন্য কলঘর থেকে একটা টুল যোগাড় করে আনি।'

কাহানী কুলিদের ভিড়ের মধ্যে আমাকে রেখে মাঠের পাশের চায়ের পাতা শুকানোর একটা হলঘরের দিকে হাঁটা দিল। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কুলি মেয়ে, এই মেয়েটাই একটু আগে কাহানীর সাথে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল, বলল, 'বাবু মেরা সাথ যাবে?'

আমি হেসে বললাম, 'কোথায় জাহান্নামে?'

মেয়েটা আমার কথা শুনে কাহানীর মতোই খিলখিল করে হেসে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে একদিকে হেলে পড়ল। হাসির সাথে বাতাসে ছড়িয়ে গেল মদের গন্ধ। অন্য সময় হলে আমি নাকে রুমাল চেপে ধরতাম। কিন্তু এখানে এ পরিবেশে ব্যাপারটা বেমানান হবে ভেবে আমি পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটি তার হাসির গমক কমিয়ে, যদিও তখনও তার বুক থরথর করছিল পুলকের কাঁপনে, বলল, 'নজদিক। মেরা ঝুপড়ি মে চল। হিয়া বহুত আচ্ছা মাল আছে, বহুত কড়া। যাওগে?'

আমি হেসে বললাম, 'আমি মালটাল খাই না। আমি তোদের পরব দেখতে এসেছি। তোদের নাচ-গান দেখব।'

'মাল খাবে না তো কীসের পরব দেখবে? ইয়ে পরব তো পিনেকা।'

'তোদের পরব তোরা খা, আমি কাহানী না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়ব না। ও এসে আমাকে খুঁজবে না?'

মেয়েটা আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। শেষে বেয়াদবের মতো এতগুলো মেয়ে-পুরুষের সামনে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। মেয়েটির এ ধরনের আচরণের আকস্মিকতায় আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম। লজ্জায় কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সে তখন হাসছে, 'তোমার কাহানী আর আসবে না, বাবু। ও তো দারু লেকে জঙ্গল মে মৌজ করণে কো গিয়া। লওটেগা নেহি। তুমি এ্যায়সা এক রেন্ডিকা প্যার ম্যাংতা বাবু? মেরা সাথ চল।'

বলে আমার বাহু কোমর ধরে আকর্ষণ করল। আমি দেখলাম, এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি। এদিকে মঞ্চের চারপাশের সমস্ত কুলি-কামিনরা মেয়েটির কাণ্ড দেখে মুচকি হাসছে। কে যেন আমার পাশ থেকে মন্তব্য করল, 'আরে যাও না বাবু একটু। লেড়কি এত করে বলছে। যাও যাও।'

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, আমার পায়ের কাছে মাটিতে বসে মদ খাচ্ছিল যে বুড়োবুড়ি তারাই আমাকে মেয়েটির সাথে যেতে প্ররোচনা দিচ্ছে। আমি বললাম, 'আমি তো মদ খাই না, আমি কোথায় যাব?'

'পানি না পিও তো চায়ে পিওগে। বহুত খুশবাইঅলা চা। চল।'

বলল মেয়েটি। এতক্ষণ সে আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, অসাধারণ গায়ের জোর ও সুঠাম হাত-পা মেয়েটির। গায়ের রং কাহানীর চেয়েও প্রগাঢ় কালো। বিশাল খোঁপা। খাটো লাল ব্লাউজের ওপর খাটো করে লালপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ি পরা। বয়সে আমার চেয়ে প্রায় পাঁচ-ছয় বছরের বড় হবে। পায়ের গিরাতেও রুপোর খাড়ু পরেছে। অগত্যা আমি বললাম, 'ছাড় আমাকে। যাব তোর সাথে। হাত ছেড়ে দে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সম্মতি পেয়ে সে মুহূর্তে আমাকে ছেড়ে দিয়ে হাসল, 'নারাজ না হও, বাবু।'

আমি বললাম, 'চল।'

মেয়েটি আমার আগে চলল। আমি তার পেছনে। আমি একবার এদিক-ওদিক ফিরে কাহানীকে খুঁজলাম। কোথায় কাহানী? ততক্ষণে মঞ্চে এক করুণ গায়ক খঞ্জনি বাজিয়ে গান শুরু করে দিয়েছে, 'হায়রে পিতলের কলসি তরে লইয়া যামু যমুনায়...'

আমরা একটা টিলার নিচে সমতলভূমিতে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই কুলিদের পাড়া। এক জায়গায় দেখলাম স্তূপীকৃত হয়ে চার-পাঁচটা শুয়োর শুয়ে আছে। এক সারি ছাপড়ার ঘরের পাশে একটা টিনের উঁচু ভিটের ঘর। মেয়েটি আমাকে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'হামরা মকান।'

আমি বললাম, 'দাঁড়া। আমাকে তুই এখানে কেন এনেছিস। এখানে তো কোনো লোকজন নেই।'

'নেই তো কেয়া হুয়া। আমি তো আছি। ভয় লাগে বাবু? চায় নেহি পিওগে?'

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সন্দেহ দেখে মেয়েটি আবার খিলখিল করে হাসল। বুঝলাম ও এখন সম্পূর্ণ মাতাল এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। ওর হাত থেকে বাঁচতে হলে এখনই পালাতে হবে। আমি জঙ্গলের ভেতরে দৌড় মেরে পালাবার মতলব করলাম। আমি বুঝলাম মেয়েটির পা টলছে এবং ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না। সারা পথ একরকম আমার কাঁধে ভর দিয়েই এসেছে। আমার ধারণা হলো এখন ওকে জোরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া যাবে। যদিও রাক্ষসীটা আমার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বা এবং গায়ে-গতরে শক্তিশালী, তবুও ভাবলাম ধাক্কা মেরে এখনই ওকে ফেলে দিয়ে পালাই। আমি একটু ভদ্রতার ভান করে গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম, 'এই তোর নাম কীরে, তোর নামটাই তো জানি না।'

আমার হঠাৎ গলে যাওয়া দেখে মেয়েটা সম্ভবত অবাক হলো। একটু দ্বিধান্বিত গলায় জবাব দিল, 'মেরি নাম কাজলী, বাবু।'

তার জবাবে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'বেশ সুন্দর নাম তো। কিন্তু তার আগেই টিলাটার ওপাশ থেকে বাজপাখির চিৎকারের মতো কাহানীর গলা বেজে উঠল, 'কাজলী—রেণ্ডি—'

তারপর মুহূর্তের মধ্যে কাহানী সমতলে নেমেই কাজলীর খোঁপার মুঠি ধরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। আকস্মিক আক্রমণে কাজলী মাটিতে পড়ে গেলেও মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে সে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। মাটিতে গড়ানো অবস্থাতেই সে কাহানীর কোমরে পেঁচানো শাড়ির বাঁধন ধরে এমন টান দিল যে শাড়ি খুলে গিয়ে সে সম্পূর্ণ বেআব্রু হয়ে গেল। কাহানীও একই কাণ্ড করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নেংটো করে ফেলেছে। দুই বাঘিনীর লড়াইয়ের মধ্যে আমি কী করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। চাঁদটা তখন শাদা একখণ্ড মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ বাঁধভাঙা জোছনার ঢল নামিয়ে দিয়েছে। মেয়ে দুটির লুটোপুটির শব্দে শুয়োরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদাটা সচকিত হয়ে উঠল। একসাথে শুয়োরগুলো ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করে আড়মোড়া ভাঙল।

আমি দেখলাম কাহানী হালকা-পাতলা হলেও বেশ তেজীয়ান আওরৎ। কাজলীকে সে কাবু করে মাটিতে চেপে ধরেছে। দু'জনই খামচাখামচিতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কাজলী বেকায়দায় থেকেও কাহানীকে খিস্তি করে যাচ্ছে। কাহানীর সাথে তার শ্বশুর মহাদেবকে জড়িয়ে কীসের কথা বলছে আর কাহানী চেপে ধরছে ওর কণ্ঠনালি। বেকায়দায় থেকে কাজলীর আর শব্দ বেরুচ্ছে না দেখে আমি প্রমাদ গুনলাম, 'এই কাহানী, ছেড়ে দে ওকে।'

'চৌপ বাবু, তুমি একদম কথা বলবে না। আমি রেন্ডিটাকে আজ খুন করে ফেলব।'

অগত্যা আমি গিয়ে কাহানীকে চুল ধরে টেনে ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলাম। ছাড়া পেয়ে কাজলী মাটি থেকে লাফিয়ে উঠেই তার ঘরের দিকে দৌড়াল। কাহানী বলল, 'কেন ওকে ছাড়ালে। ও তো এখন ঘর থেকে দা এনে আমাদের কাটবে।'

আমি দেখলাম, কাহানী হাঁপাচ্ছে। বললাম, 'চল, দৌড়ে পালাই। আমার পরব দেখার সাধ মিটেছে।'

'চল।'

মাটিতে লুটানো শাড়িটা হাতে নিয়ে কাহানী দৌড়াতে শুরু করল। আমিও পেছনে ছুটলাম। জীবনের এই একটি মুহূর্তের কথা আমি কোনোদিন ভুলিনি। যখনই এই ঘটনাটা আমার মনে উদয় হয়, তখনই ওই দৃশ্যই আমার চোখে ভেসে ওঠে। পূর্ণিমার রাত। চাঁদের বেপরোয়া আলোর জোয়ারে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে আমি এক নগ্ন নারীর পেছনে সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়াচ্ছি। আশঙ্কা করছি আমার পেছনে আসছে দা হাতে এক মাতাল কুলি-কামিন। ভাবলে আজও হাসি পায়।

পরের দিন সকালে নাশতা করার পর সুফিয়া ফুপু আমাকে ব্যারাকে ডেকে পাঠালেন। আমি দ্বিধান্বিত চিত্তে তার সামনে হাজির হলাম। তিনি এক কাপ চা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'কাল রাতে কোথায় ছিলি?'

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে চুপ করে থাকলাম।

আমাকে নীরব দেখে সুফিয়া ফুপু আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি তার এই চাউনিতে অস্বস্তিতে ভরে গেলাম।

'আমার কাছে কোনো কিছু লুকোবি না। তোর ফুপা তোর ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছেন। তুই কুলি মেয়েটার সাথে রাতে কোথায় বেরিয়েছিলি? আমার কাছে জানিয়ে গেলে আমি কি না করতাম?'

বেশ আস্তে আস্তে বলল সুফিয়া ফুপু। আমি বললাম, 'কোথায় গিয়েছিলাম, কার সাথে গিয়েছিলাম, এসব কথা আমি তোমাকে বলব না ফুপু। তবে এটুকু বলতে পারি যে আমি কোনো অন্যায় কাজ করিনি। অবশ্য এটা মানি, আমার কৌতূহল তোমাদের মর্যাদাকে খাটো করেছে। রাতে যাওয়ার আগে আমার একবার ভাবা উচিত ছিল। যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক, আমি আর এখানে থাকছি না। আজ রাতের গাড়িতেই সীতাকুণ্ডে চাচির কাছে চলে যাব। বাড়ি থেকে চিঠি পেয়েছি আমার বই আর বিছানাপত্র সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাচি বাড়ি এসেছিলেন, নিয়ে গেছে। চাচা নিজে চিঠিটা লিখেছেন। চিঠিতে সীতাকুণ্ডের বাসার ঠিকানা আছে। আমি রাতেই রওনা হব। তুমি চিন্তা করো না, আমি যাওয়ার আগে আমার আচরণের জন্য ফুপার কাছে মাফ চাইব।'

'তুই কেন মাফ চাইতে যাবি? খবদ্দার কারো কাছে কাছে মাফ চাইতে যাবি না। সীতাকুণ্ড যেতে চাস চলে যা। আমি তোকে এনেছিলাম তোর মনটা ভালো থাকবে বলে। ভেবেছিলাম নিরিবিলি জায়গায় কবিতা লিখবি। এখন দেখছি আমার পক্ষ থেকে তোকে দুঃখ দেওয়া হলো।' বললেন ফুপু।

আমি বললাম, 'সেকি, দুঃখ পেলাম কোথায়? বরং চা-বাগানের কথা চিরকাল মনে থাকবে।'

সুফিয়া ফুপু হাসলেন, 'ভালো লেগে থাকলে আবার আসিস। তোর ফুপা খুশিই হবে। তোর জন্য সে আসলে মনে মনে খুব গর্ববোধ করে।'

আমি হেসে বললাম, 'আমি জানি ফুপু।'

৩২

খুব ভোরে সীতাকুণ্ড স্টেশনে এসে নামলাম। গাড়ি এ স্টেশনে আধঘণ্টা দাঁড়ায়। আমার স্যুটকেসটা ছাড়া আমার সাথে আর কোনো ঝামেলা নেই। ভাবলাম স্টেশনের প্লাটফর্মের সীমানার কাছাকাছিই যখন চাচা বাসা নিয়েছেন তখন খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধা হবে না। স্টেশনে হাতমুখ ধুয়ে নাশতা-পানি সেরেই আস্তে ধীরে বাসাটা খুঁজে বের করা যাবে।

আমি স্যুটকেস নিয়ে একটি পানির কলের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ঢাকা থেকে আগত ফার্স্টক্লাসের যাত্রীরা এখানে ব্রেকফাস্টের জন্য নামে। সীতাকুণ্ডে তখন ট্রেন যাত্রীদের জন্য ব্রেকফাস্টের খুব ভালো ব্যবস্থা ছিল। সবাই দাড়ি কামিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পাটভাঙা পোশাক পরে কামরা থেকে চায়ের জন্য নেমে আসত। ফোলা ফোলা চোখ আর চকচকে চেহারা থাকত সবার। প্লাটফর্মের চায়ের দোকানের ট্রলিগুলোকে ঘিরে দাঁড়াত সবাই। তখন এক কাপ চা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে কী যে ভালো লাগত। পূর্বদিকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চুড়োয় শিবমন্দিরটার গায়ে তখন সকালের আলো লেগে একটা মনোরম সাজানো ছবির মতো মনে হতো। মনে হতো সামনের পাহাড়ের সারির পেছনে বুঝি অন্য একটা জগৎ আছে। পরবর্তীকালে এই স্টেশনটার সাথে আমার কত স্মৃতিই না জড়িত হয়েছে। আজও ট্রেনে পথে আসা-যাওার সময় জানালায় মুখ বাড়িয়ে ফ্লাটফর্মটা দেখি, দেখি ভেতরকার বসার সিটগুলো তেমনি আছে কি না! এমন কাউকে পাই কি না, যাকে একদা চিনতাম। না কাউকে চিনি না। কেউ ফ্লাটফর্ম থেকে বলে ওঠে না, আরে মাহমুদ তুই এতদিন পর কোত্থেকে এলি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোদের স্কুল তো সেই কবে খুলেছে। নেমে আয়, তোকে নিয়ে আজই বাড়বকুণ্ডে ডুব দিতে যাব। না, কেউ ডাকে না। পরিচিত কোনো কণ্ঠস্বর আমার জন্য অপেক্ষা করে না।

আমি স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। নীল রুমালটা খুলে মুখ মুছে নিলাম ভালো করে। শেষে চায়ের ট্রলির কাছে এগিয়ে গিয়ে এক কাপ চা, দুটি মাখন-রুটি ও দুটি ডিম তুলে নিলাম পিরিচে।

আমি চা খেয়ে পয়সা মিটিয়ে দেবার সময়ই গাড়ি সিটি বাজিয়ে নড়ে উঠল। চাটগাঁর যাত্রীরা দ্রুত গাড়ির কামরার দিকে ছুটছে। গাড়িটা প্লাটফর্ম থেকে সরে গেলে দেখলাম প্লাটফর্মটা একেবারে খালি। এদিক-সেদিক তাকিয়ে নতুন জায়গাটা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি দক্ষিণ দিক থেকে চাচা তার মর্নিং ওয়াকের ছড়িটা হাতে নিয়ে আমার দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছেন। একটু নিকটবর্তী হলেই আমি তাকে সালাম বললাম। আমার আকস্মিক উপস্থিতিতে তিনি একটু অবাক হলেন বলে মনে হলো। সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'তুই বাড়ি থেকে এলি?'

আমি বললাম, 'না, তেলিয়াপাড়া থেকে।'

'ভালোই করেছিস চলে এসে। তোর চাচির কলজের ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে। আমি ফজরের নামাজ পড়ে গরম পানি বোতলে ভরে টেবিলে রেখে এসেছি। সারারাত চিৎকার করে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। জেগেই আবার হাঁসফাঁস করবে। তুই বাসায় গিয়ে একটু বস। দরকার হলে গরম বোতলে সেঁক দিবি।'

'বাসাটা কোন দিকে?'

'ঐ তো ফ্লাটফর্মের ওপাশে বড় গুদামটার পেছনে একটা ছোট ঘর। ওটাতেই আমরা থাকি। গুদামটা আমাদের। আর সামনের ঘরটা অফিস। চল আমিই তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

চাচা আবার ফিরতে চাইলেন। আমি বললাম, 'আপনি বেড়িয়ে আসুন। আমি ঠিক চিনে যেতে পারব।'

চাচা বললেন, 'বলবি মিন্টুবাবুদের বাড়ি, সবাই দেখিয়ে দেবে। বাজারে এদের আফিমের দোকান আছে। ধনী মানুষ, সবাই চেনে।'

আমি বললাম, 'কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। আমি ঠিক চাচির কাছে গিয়ে হাজির হব। আপনি হেঁটে বেড়িয়ে আসুন।'

চাচা চলে গেলে আমি প্লাটফর্ম পার হয়ে এলাম।

মিন্টুবাবুদের বাড়িটা খুঁজে বের করতে আমার তেমন বেগ পেতে হলো না। সীতাকুণ্ড বাজার থেকে পূর্বদিকে যে রাস্তাটা চন্দ্রনাথ পাহাড়ের দিকে চলে গেছে সে রাস্তার পাশেই বাড়িটা। পায়ে হাঁটা পথ ও রেল লাইনের ক্রসিংয়ের পাশে চল্লিশ গজের মধ্যে বাংলো টাইপের একটা বাড়ি। দেখতে ছবির মতো সুন্দর। বাড়ির লাগোয়া সারের গুদাম। গুদামের পাশে কৃষি অফিসের কর্মকর্তার দুচালা বাসস্থান। আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই বাড়ির ভেতর চাচির কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিঃশব্দে প্রবেশ করলেও চাচি চোখ তুলে তাকালেন। তার চেহারা বেদনায় নীল। আমি ডাকলাম, 'চাচি।'

চাচির মুখে ব্যথাকাতর হাসি ছড়িয়ে পড়ল, 'বাড়ি থেকে এলি?'

'না, তেলিয়াপাড়া থেকে।'

'আমি ভাবলাম, তুই সুফিয়ার কাছে আরও কয়েকদিন থাকবি।' চাচি পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন।

আমি বললাম, 'ফুপু তো আরও কয়েকটা দিন থাকতেই বলেছিলেন। আমার ভালো লাগল না তো?'

'এখানে তোর ভালো লাগবে তো?'

'কী জানি।'

'কালই স্কুলে ভর্তি হয়ে যা। পড়ালেখায় মেতে থাকলে দিন কেটে যাবে। কারো সঙ্গে মাখামাখির দরকার কী।'

চাচির কথার শেষ বাক্যটি আমার কানে ঠেকল। আমি বুঝলাম আমার ব্যাপারে চাচির ভীতি এখনও যায়নি। আমি কিছু না বলে গরম পানির বোতলটা টেবিল থেকে নামিয়ে আনলাম। সারা ঘরে ওষুধের কটু গন্ধ ভাসছে। ঘরে জিনিসপত্র ঠিকমতো গোছানো নয়। অথচ চাচির কাছে অগোছালো ঘরবাড়ি, সংসার এককালে কতই না অসহ্য লাগত! আমি জুতো খুলে খাটের ওপর উঠে বসলাম। চাচির ব্যথাটা দেহের কোথায় তা বহুদিন থেকে আমার জানা। তার নিজের সন্তানের চেয়েও এককালে আমি তার বেশি সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই জানতাম, তার ব্যথাটা বুকের কোনদিকে। আমি আস্তে করে বোতলটা সেখানে ছোঁয়ালাম। চাচির দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে গালের তিলটা ভিজিয়ে দিল। আমি বললাম, 'আরাম লাগছে?'

চাচি আমার কথার জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি বললাম, 'ভয় কী, চাচি, আমি তো এসে গেছি। আমিই এখন থেকে কাছে থাকব।'

চাচি চোখ মুদে শুয়ে থাকলেন। আমি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে চুলগুলো বিলি করে দিলাম। এ সময় ঘরে এসে ঢুকলেন এক অপরিচিতা মহিলা। পরনে শাদা থান। শরীরে কোনো গয়নাগাটির বালাই নেই। গলায় খুব সূক্ষ্ম দানার কাঠের মালা। বৈষ্ণবরা যে ধরনের মালা পরে ঠিক সে রকম। বয়স পঁচিশের কম হবে না। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। মাথায় ঘোমটা না থাকায় সিঁথি উন্মুক্ত। ঘরে পা দিয়েই বললেন, 'তুমি বুঝি এর ভাশুরের ছেলে?'

আমি বললাম, 'জি।'

'কখন এসেছ?'

'এই তো একটু আগে। সকালের গাড়িতে।'

'এখন কেমন আছে, ব্যথা কমেনি?'

আমি অতি ধীরে চাচির বুকের তলা থেকে বোতলটা আলগা করে সরিয়ে এনে বললাম, 'চাচি তো সজাগই আছেন। মনে হয় এখন ব্যথাটা নেই। আপনি কে, আপনাকে তো চিনলাম না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রমহিলা কিছু বলার আগেই চাচি চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, 'কে বিশি? আয় বিছানায় উঠে বোস।'

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে চাচির মাথায় হাত রাখলে চাচি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বিশি তোকে এর কথা বলেছিলাম, এই আমার ছেলে। স্কুলের পড়াশোনায় মন নেই, ঘর-সংসার, আত্মীয়-স্বজন কারো প্রতি কোনো টান নেই। শুধু বাজে বই পড়ে আর কী যেন লেখে।'

বিশি হাসল, 'যার এত দুর্নাম, মাসি, তার চেহারাখানা কিন্তু ভারী চাঁদপনা। তুমি যা ধারণা দিয়েছিলে না মাসি তাতে তো আমি ভেবেছিলাম মহা ধড়িবাজ ষণ্ডা প্রকৃতির এক ছেলে আসছে তোমার। এ তো দেখি একটা কচি খোকা গো!'

চাচি হাসলেন, 'কয়েকদিন চেনাজানা হোক সবই টের পাবি।'

চাচির কথায় আমি নিজেই হেসে ফেললাম। মুখ তুলে বিশিকে বললাম, 'চাচি বুঝি আমাকে মহা ধড়িবাজ বলেছেন?'

'শুধু ধড়িবাজ, বলেছে তোমার মতো নিষ্ঠুর ছেলে জগৎ-জননীদের কেউ আজও নাকি পেটে ধরেনি। আমি তো তোমাকে এ ঘরের ভেতর দেখে মনে মনে তথাগতের নাম জপছিলাম।'

আমি তার মুখে তথাগতের নাম উল্লেখে বুঝলাম এরা বৌদ্ধ। আমি বললাম, 'বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিধবারা কি হিন্দুদের মতোই কাপড়চোপড় পরে?'

আমার কথায় বিশি ফিক করে হেসে চাচির দিকে তাকাল, 'ও মা, মাসি, তোমার ছেলে যে আমাকে হিন্দু বিধবা ঠাওরে নিয়েছে গো। এখন আমি কী করি!'

আমি বললাম, 'আপনাকে তো হিন্দু বিধবার মতোই লাগছে।'

আমার কথার জবাবে চাচি এবার বিশির পরিচয় দিয়ে বললেন, 'এর নাম বিশাখা। এ পাড়ারই মেয়ে। এর স্বামী উদাসীন হয়ে একে ফেলে উধাও হয়েছে। আমাদের বাসার দক্ষিণ দিকে একটা বিশাল দিঘি আছে। দিঘিটার পাশের গাঁয়ে এদের বাড়ি। এখন বাপের বাড়িতে বাপ-মায়ের সাথে থাকে। বাপ-মা খুব গরিব বলে বিশি মানুষের বাড়িতে কাজকাম করে নিজের পেট চালায়। তোর চাচা একে আমাদের বাসায় স্থায়ী কাজকর্মের জন্য নিয়ে এসেছে। সারাদিন আমার সাথে থেকে সন্ধ্যায় রাতের খাবার নিয়ে গাঁয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায়। ও না থাকলে আমাকে এসে পেতিস না। কবরে থাকতাম।'

আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বিশাখার দিকে তাকালাম। বিশাখাও সপ্রতিভভাবে হেসে বলল, 'দেখ ভাই, তুমি আমার থেকে চার-পাঁচ বছরের ছোটই হবে। আমায় দিদি বলে না ডাকলে আমি ভাবব কাজের মেয়ে বলে আমাকে অবহেলা করলে।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি আপনাকে বিশি দিদি বলে ডাকব।'

'এখানে বড় বোনদের কেউ আপনি বলে না। তুমি আমাকে বরং বিশিদি বলতে পার, তুমি বলেও ডাকতে পার, আপনি বলতে হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পরিচয়েই বিশাখাকে আমার খুব পছন্দ হলো, তার সপ্রতিভ চালচলন ও মার্জিত কথাবার্তায়। আপনজনের মতো আচরণ করে সে আমাকে আত্মীয় করে নিল। পরে জেনেছিলাম, বিশাখার মার্জিত আচরণের পেছনে ছিল এর শিক্ষা ও নিজের ধর্মের প্রতি অবিচল বিশ্বাস। সে স্থানীয় বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তার পিতা তাকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেন। লোকটা সীতাকুণ্ড বাজারে তরিতরকারির ব্যবসা করত। পরে কী কারণে যেন লোকটা তার ব্যবসা গুটিয়ে বিশাখাকে ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আমরা এ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করে বিশাখাকে দুঃখ দিতে চাইতাম না। চাচির নিষেধ ছিল। তবে একদিন বিশিদি নিজেই তার স্বামীর কথা বলেছিল। বলেছিল লোকটা তাকে প্রথমদিন থেকেই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেনি। বিশিদির সন্দেহ ছিল তার স্বামীর চট্টগ্রাম শহরে অন্য একটা বউ আছে। কিংবা কক্সবাজারে কোথাও। তার বাপ টাকার লোভে একটা অচেনা ফটকাবাজির হাতে তাকে তুলে দিয়েছিল।

আমি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, 'বিশিদি তুমি তো তোমার স্বামীকে ইচ্ছে করলে খুঁজে বের করতে পার।'

'পারি। কিন্তু যে আসতে চায় না, আমাকেও নিতে চায় না, তাকে সেধে কী লাভ হবে?'

আমি তার কথার কোনো জবাব দিচ্ছি না দেখে হঠাৎ হেসে বলল, 'ভালোবাসায় বেঁধে রাখতে না পারলে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা যায় বুঝি?'

AMARBOI.COM

৩৩

আমি সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। এখানে এসে যে বিষয়ের সাথে আমার বিচ্ছেদ ঘটল, তা হলো বই। এখানে স্কুলের বইপত্র ছাড়া অন্য কোনো বই, যথা— গল্প, উপন্যাস বা কাব্যগ্রন্থ কিছুই তার জোগাড় করা সম্ভব হতো না। শুধু 'কোহিনূর' বলে একটি সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রিকা একজন দশম শ্রেণির ছাত্র মাঝেমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে আসতেন। তিনি 'কোহিনূর'-এ কবিতাও লিখতেন। তার কাছে সাহিত্যের খবরাখবর কিছু পেতাম। ভদ্রলোকের নাম ম ন মোস্তফা। বর্তমানে সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। সঙ্গীতের ওপর তার একটি গ্রন্থ 'আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে' শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। আমি সে সময় তার সান্নিধ্য কামনা করতাম। কিন্তু তিনি ছিলেন খুব ব্যস্ত লোক। তাছাড়া কয়েক মাস পরই ম. ন. মোস্তফা সীতাকুণ্ড ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন। সম্ভবত উচ্চশিক্ষার জন্য সীতাকুণ্ডে তিনি আর ছিলেন না। আমি একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম।

আমি একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। স্কুলে বা ক্লাসে আমি কোনো বন্ধু পেলাম না। কিংবা বলা যায় আমি চাইতাম না বলেই কেউ আমার বন্ধু হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এই নৈঃসঙ্গকে অধিকার করল সীতাকুণ্ডের প্রাকৃতির সৌন্দর্য। ছুটির দিন শম্ভুনাথ পাহাড় বা চন্দ্রনাথ পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতাম। আবার সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতাম বাসায়। চাচি আমার এই একাকিত্ব খুব পছন্দ করতেন।

সীতাকুণ্ডে এসে আমার নিঃসঙ্গতাকে আমি ঠিকমতো উপলব্ধি করলাম। এখানে বই পুস্তকের কোনো ভাণ্ডার না থাকায়, আর থাকলেও সেই সন্ধান আমার অজানা থাকায় আমি একাকী এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। স্কুলের পর আমার অফুরন্ত অবসর আমি কীভাবে কাটাব তা যেন ভেবেই কূলকিনারা পাচ্ছি না। ছুটির দিন স্কুলের বারান্দায় খানিকক্ষণ ফুটবল খেলা দেখে সময় কাটাবার একটা ব্যবস্থা থাকলেও আবাল্য খেলাধুলার প্রতি অনীহা আমাকে একঘরে করে রাখল।

আমার এই অবস্থা দেখে বিশিদি মাঝেমধ্যে আমার পড়ার ঘরে এসে বসতেন। নানা গল্প করে নিজে নিজেই হাসতেন। তার হাসিটা ছিল ভারী সুন্দর। তার দাঁতগুলো অসমান হলেও কেন জানি মুখমণ্ডলে অপূর্ব লাবণ্য ঝিলিক দিয়ে উঠত। আমি অল্পদিনের মধ্যেই বিশিদির অনুগত হয়ে পড়লাম। আমাদের বাসার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে বিশিদির রাত হয়ে গেলে আমি তাকে এগিয়ে দিয়ে আসতাম। আমি দিঘিটার পাড় ধরে তাদের গ্রাম পর্যন্ত গিয়ে তারপর একা ফিরে আসতাম। চাঁদনি রাত হলে বিশিদি বাড়ি ফেরার সময় নিরিবিলি দিঘির পাড়টায় একটু বসতেন। বিশিদি ছিলেন দুঃখী মানুষ। তার দুঃখকে তিনি হাসি দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমার বয়স কম হলেও নানা রকম বই ইত্যাদি পড়ে মানুষের আনন্দ-বেদনা সম্বন্ধে আমার বোধ ছিল একজন যুবকের মতোই। সন্দেহ নেই আমি মনের দিক দিয়ে নিজেকে বিবেকসম্পন্ন বলেই ভাবতে শিখেছিলাম। যদিও বিশিদি আমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষই মনে করত। বয়স ও শারীরিক দিক দিয়ে আমি তা ছিলামও কিন্তু মনটা যথার্থ লেখাপড়ার শব্দ পেয়ে অর্থাৎ সাহিত্য আস্বাদনের সুযোগ পেয়ে খানিকটা ইঁচড়ে পাকা হয়ে গিয়েছিল।

এক রাতে দিঘিটার পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি বিশিদিকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'বিশিদি তোমার স্বামীর কাছে যেতে তোমার ইচ্ছে হয় না?'

'এ্যাই ফাজলামো কথা বলবি না।' বিশিদি এতদিনে আমাকে সম্বোধনের ব্যাপারে তুমি খেতে তুইতে নেমে এসেছে। আমি বললাম, 'এটা বুঝি ফাজলামো হলো?'

'তোর ওসব ভাবতে হবে না। তুই ছেলেমানুষ।' বলল বিশিদি। আমি বললাম, 'আমি ছেলেমানুষ হলেও তোমার মনের কথা সব বুঝতে পারি।'

'তাই নাকি রে!' বিশিদি আমার দিকে খানিকক্ষণ অপলকভাবে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, 'বল আমার মনের কথা কী?'

আমি বললাম, 'বলব?'

'বল।'

'তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাও।' বললাম আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশিদি আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'চল বাড়ি যাই।'

আমরা হাঁটতে লাগলাম।

'তুই ঠিকই বলেছিস। লোকটা যদি আমাকে নিত আমি ঠিকই যেতাম। সতীনের সেবা করেও ওর পায়ের তলায় পড়ে থাকতাম। কিন্তু আমাদের সমাজে আজকাল ওসব হয় না। তোদের মুসলমান ঘরে যেমন দু'জন মেয়েমানুষ এক স্বামীর ঘরে সুখে দিন কাটায় আমাদের হিন্দুর ঘরে তা উঠে গেছে।'

আমি বললাম, 'তোমরা তো হিন্দু নও বৌদ্ধ।'

'ওই হলো। এ দেশের হিন্দুতে, বৌদ্ধতে কোনো পার্থক্য নেই।'

বিশিদির সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা চাচির নজর এড়াল না। তার সদা সতর্কতার দরুন এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে আমি চিরকালের জন্য সীতাকুণ্ডের পাট চুকিয়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হলাম। যে নির্বাসন থেকে আমি আর বাকি জীবন না আমার বাপ-মা, না আমার চাচা-চাচির কাছে ফিরে যেতে পেরেছি। এদের সাথে আমার আর সাক্ষাৎ বা সৌহার্দ্য হয়নি—এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাকে বলে মুরব্বি বা অভিভাবকদের আশ্রয়ে থাকা, তা চিরকালের মতো আমি ত্যাগ করে এলাম।

ঘটনাটা ঘটেছিল হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে ফিরে। আমি বাড়িতে পা দিয়েই বুঝলাম আবহাওয়াটা থমথমে। বিশিদি নেই। চাচি উঠোন ঝাড় দিচ্ছেন। রান্নাঘরের দুয়ারে শিকল তোলা। আমার একটু খটকা লাগল। চাচির শারীরিক অবস্থা তেমন নয় যে তিনি বিছানা থেকে নেমে উঠোন ঝাড় দিতে পারেন। আমি বললাম, 'আপনি এসব কী করছেন? বিশিদি কই?'

'বিশি আর আসবে না। তাকে আমার আর দরকার নেই। তোর চাচা পাওনা মিটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছে।' খুব বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বললেন চাচি।

আমি বললাম, 'কেন কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে এর কৈফিয়ত আমি তোকে দেব না—তোর যদি বিশিকে ছাড়া দিন না কাটে, তুইও যেতে পারিস। আমি আর তোর খবরদারি করতে পারছি না। আমি তোর চাচাকে বলেছি, যেখানকার আপদ সেখানে পাঠিয়ে দিতে।'

চাচির নিষ্ঠুর জবাবে আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না। আমি ছিলাম ক্ষুধার্ত। কিন্তু চাচির মুখে আচমকা খবরদারি শব্দটা শুনে আমার রাগ হলো। আমিও বেয়াদপের মতো বলে বসলাম, 'বিশিদিকে কেন বিদায় করা হয়েছে, আপনি না বললে আমি তার কাছে থেকেই তা জেনে আসব।'

আমার কথায় চাচিও স্তম্ভিত হয়ে হাতের ঝাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'কী বললি বেয়াদব?'

আমি তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে আমার পড়ার ঘরে ঢুকলাম। বইপত্র বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। বেরিয়েই দেখি রেলওয়ে গুদামটির কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশিদি দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে মুচকি হাসছেন। আমি এগিয়ে যেতেই বললেন, 'আমি তোর জন্যই এখনও বাড়ি যাইনি। তোদের চাকরিটা একটু আগে ছেড়ে এলাম কিনা, তাই পথে দাঁড়িয়ে তোর অপেক্ষা করছিলাম।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'তোর চাচি বলল, আমি নাকি তোর মাথা খাচ্ছি। আমি অসৎ, বেঈমান।'

কথাগুলো বলে বিশিদি হাসল। এমন হৃদয়বিদারক বিষণ্ন হাসির সাথে এর আগে আমার কোনো পরিচয়ই ছিল না। আমি বললাম, 'তুমি কী জবাব দিলে?'

'এর আর কী জবাব হয় বল? তোর চাচাও বলল তিনি আর আমার মুখদর্শন করতে চান না। কাজের টাকাটা গুনে নিয়ে চলে যেতে বললেন। চলে এলাম। তোর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বাকি ছিল। সেটাও যখন হলো, এখন ঘরে যাই।'

বলল বিশিদি। আমি বললাম, 'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই।'

'দরকার নেই। তুই ঘরে যা। আমি নিজেই ফিরতে পারব।'

আমি বললাম, 'বিশিদি আমিও আর এখানে থাকব না। কাল সকালেই বাড়ি চলে যাব।'

'কেন? তোর আবার কী হলো। তুই চলে যাবি কেন?' অবাক হয়ে বলল বিশিদি।

'এখানে আমারও আর ভালো লাগে না।'

আমার কথায় বিশিদি স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আমি আবার বললাম, 'চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না, এখন বাড়ি ফিরব না। চলো, শম্ভুনাথ পাহাড়ের দিকে হেঁটে বেড়িয়ে আসি।'

বিশিদি আমার হাত ধরে টান দিল। আমি আর কথা না বলে তার সাথে হাঁটতে লাগলাম। তখন সন্ধ্যা নামার আর তেমন দেরি নেই। সূর্য পশ্চিম আকাশের শেষ সীমায় গাছপালার ওপর নেমে এসেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ধর্মশালার গেটে চলে এলাম। বিশিদি বলল, 'চল ধর্মশালার পুকুরের ঘাটলায় বসে কথা বলি।'

আমরা ঘাটলায় এসে সিঁড়িতে বসলাম। বিশিদি এই প্রথম আমার গা ঘেঁষে নিবিড় হয়ে বসল। ধর্মশালাটা আজ জনশূন্য। তীর্থের দিনগুলো ছাড়া ধর্মশালার বাড়িগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকে। এমনকি কোনো কোনো দরজায় তালাও থাকে না অথচ আশ্রয়কেন্দ্রটা বেশ সুন্দর। সামনে ছোট পুকুর। আমরা পুকুরটার সান বাঁধানো ঘাটলায় বসেই কথা বলছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে ধর্মশালার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সেদিন কোনো মানুষের আনাগোনাই আমাদের নজরে পড়েনি। কেউ যদি ঘরের ভেতর থেকেও থাকে আমরা সেদিকে তাকাইনি।

বিশিদি বলল, 'তুই চলে গেলে তোর চাচা খুব দুঃখ পাবে।'

আমি বললাম, 'আমি না গেলে তাকে আরও বেশি দুঃখ পেতে হবে। তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়াটা ওদের অন্যায় হয়েছে। এ অন্যায় আমি মানব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন মানবি না? ওরা ভাবে, আমি তোর ক্ষতি করছি। ছেলেমানুষ পেয়ে তোকে খারাপ করে দিচ্ছি। ওরা তোর আপনজন। তোর ভালোমন্দ দেখা ওদের কর্তব্য।'

'আমি কখনও ভালো ছেলে ছিলাম না। আমি বখে গেছি জেনেই চাচি আমাকে নিয়ে এসেছেন। আমি মেয়েদের ভালোবাসি। মেয়েদের সাথে মিশি। মেয়েদের বন্ধুত্ব কামনা করি। এটা আমার অভ্যেস। আজ পর্যন্ত আমি খারাপ কাজ তেমন কিছু করিনি।' আমি বললাম।

বিশিদি হাসল, 'আমাকে তোর কেমন লাগে?'

আমি জবাব না দিয়ে বিশিদির দিকে একবার চোখ তুলে চোখ নামিয়ে নিলাম। বিশিদি সত্যিই সুন্দরী। চেহারাখানা শিশিরভেজা শাদা তরমুজের মতো তরতাজা। মনে হয় এই মুখমণ্ডলের কোথাও বুঝি মলিনতা বা গ্লানির কোনো স্পর্শ নেই।

'আমি তোকে ভালোবাসি। তোর চাচি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। মেয়েরা চোখ দেখলেই ভেতরের খবর টের পেয়ে যায়। আমার ভেতরে তোর জন্যে যে ভালোবাসা জন্মেছে তা তোর চাচির চোখ এড়ায়নি। আমাকে না তাড়ালে সত্যিই আমি তোকে বিপদে ফেলে দিতাম। আমারও বিপদ হতো তোরও সর্বনাশের বাকি থাকত না। হাজার হোক আমরা পুরুষ আর নারী তো।' বলল বিশিদি।

তার কথাগুলো আমার ভালো লাগে না। কেমন যেন লজ্জা পেলাম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, 'আমি তোমার থেকে কত ছোট হব বিশিদি। তুমি এসব কথা বানিয়ে বলছ। তুমি আমার কোনো ক্ষতি করতে পার না।'

'খুব পারি। এখনই পারি।'

বলেই বিশিদি আমাকে ঝড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আমার ঠোঁটে একটি চুমু খা। খা না।'

বিশিদির এই আচমকা ব্যবহারে আমি একেবারে হতচকিত ও ভীত হয়ে গেলাম। ত্রস্তভাবে ধর্মশালার দিকে একবার অসহায়ের মতো তাকালাম। না, চারদিকে মানুষজনের কোনো সাড়া শব্দ নেই। শুধু দূরবর্তী চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নির্জন চূড়াটা নির্জন চরাচরের নিস্তব্ধ সাক্ষী হয়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। আমি হতাশকণ্ঠে বললাম, 'বিশিদি এসব কী হচ্ছে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এক্ষুনি কেউ দেখে ফেলবে। আমাকে ছেড়ে দাও।'

'আমাকে চুমু খা। খা না একটা চুমু।'

অদ্ভুত কাকুতি মেশানো স্বরে বলতে লাগল বিশিদি। আরও জোরে জড়িয়ে ধরল আমাকে। যেন তার বুকের ভিতর পিষে ফেলবে আমাকে। তার গলা আর বুক ঘামে ভিজে যাচ্ছে। আমি আর বাধা দিতে পারছিলাম না। কত শক্তি ধরে বিশিদি! এবার সে নিজেই আমাকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। ঠোঁটে, মুখে, বুকে। আমি ভয় পেয়ে শেষপর্যন্ত দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ধাক্কা মারলাম। বিশিদি ঘাটলার ওপর ছিটকে পড়ে গেল। আবার উঠে এসে কোনো অনাসৃষ্টি কাণ্ড করে এই ভয়ে আমি দ্রুত ঘাটলাটা এক লাফে পেরিয়ে এলাম। না বিশিদি আর উঠে এল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি খুব ভয় পেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার পথ ধরে বাসার দিকে ছুটতে লাগলাম।

কেন জানি সারারাত আমার আর বাসায় ফিরতে সাহস হলো না। পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে আমি রাতটা কাটাবার জন্য স্টেশনের প্লাটফর্মের একটা সিটে এসে শুয়ে পড়লাম। ফজরের আজানের সময় আমার ঘুম ভেঙে গেলে আমি বাসার দিকে হাঁটা দিলাম। বাসায় এসে দেখি এখনও কেউ জাগেনি। আমার ঘরের একটা অতিরিক্ত চাবি আমার কাছেই আছে। আরেকটা চাবি থাকে চাচির কাছে। আমার অনুপস্থিতিতে এ ঘরটা খোলার দরকার হলে চাচি সেই চাবি দিয়ে ঘরটা খোলেন।

আমি তালা খুলে ঘরে পা দিয়েই অবাক হয়ে গেলাম। আমার বিছানা ও বই গুছিয়ে সুন্দর করে বাঁধা। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে বিদেয় করার সব ব্যবস্থাই আমার অভিভাবকগণ প্রস্তুত করে রেখেছেন। আমি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে বিছানাটা তুলে নিলাম। বইপত্রের ব্যাপারে আমার আর কোনো আগ্রহই ছিল না। আমি শুধু বিছানাটা নিয়েই স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগলাম। কারণ ঢাকাগামী মেল ট্রেনটা তখন আউটার সিগন্যালের কাছে সিটি দিচ্ছে। যে ট্রেন আমাকে আত্মীয়তা ও মানুষের প্রতি নির্ভরতার শেষ স্টেশন থেকে চিরকালের জন্য তুলে নিয়ে নিরুদ্দেশের দিকে পাড়ি জমাল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে পারো ভুলিয়ে দাও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী দাদা
মীর আবদুল ওহাব-এর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাটের চারদিকে আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের ভিড় সরিয়ে ডাক্তার এসে রোগীর পায়ের কাছে দাঁড়ালেন। তার গলায় ঝোলানো স্টেথিসকোপ। হাতে একটা মোটা বাঁধাই করা বই। ডাক্তারি বই-ই হবে। তিনি প্রথম পালংকের পাশে দাঁড়ানো রোগীর আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ পুত্র-কন্যা, এদের প্রায় সকলেই ডাক্তারের চেনা, এক নজর দেখলেন। স্টেথিসকোপ কানে লাগিয়ে বুকটা পরীক্ষা করলেন। হাতের কবজিতে হাত দিয়ে নাড়িও পরীক্ষা করলেন। তারপর চুপচাপ রোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল তিনি রোগটার কোনো হদিস পাননি। রোগীর গলা দিয়ে ঘর ঘর শব্দ বেরুচ্ছিল। কষ বেয়ে কি একটা হলদেটে তরল কিছু বেরিয়ে আসছিল। ডাক্তার এক দৃষ্টিতে রোগীর মুখাবয়ব এবং সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনো প্রেসক্রিপশনের প্যাড বের করছেন না দেখে ততোক্ষণে সকলেই ডাক্তারের বিব্রত মুখের ওপর ফুটে ওঠা দুশ্চিন্তার অক্ষর থেকে যেন একটা ভাষা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। ডাক্তার যে এ রোগীর কোনো সুরাহা দিতে পারবেন না এটা যেন মুহূর্তেই সকলে বুঝে নিয়েছে।

রোগীর বড় মেয়ে জাহানারা, যে এতক্ষণ অচেতন পিতার পাশে খাটের ওপর বসেছিল, সে রোগীর মাথায় হাত বুলিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আব্বা, ডাক্তার কাকা এসেছেন। একবার একটু চোখ মেলে দেখুন।'

রোগীর মধ্যে এর কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। গলা দিয়ে আগের মতোই ঘর ঘর শব্দ বেরুচ্ছে। দেহটা সটান। গোলাপ ফুল আঁকা বালিশের ওপর কষ বেয়ে হলদেটে লালা গড়িয়ে পড়ছে। খারাপ গন্ধ উঠে সে ভয়ে সম্ভবত ঘরে কেউ আগেই এককাঠি লোবান জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই সকালে সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা ডাক্তার নন্দলালের ভালোই লাগছে। সাধারণত তার পরিচিত মুসলমান পরিবারে সকাল-সন্ধ্যায় ধূপধুনো জ্বালাতে তিনি কমই দেখেছেন। শেখেদের তো আর সন্ধ্যা আহ্নিক বা পূজো পার্বণের কোনো ব্যাপার নেই। ধূপধুনো জ্বালিয়ে সুগন্ধ ছড়ানোরও কোনো দরকার হয় না। তবে কেউ কেউ পাঁচবার হাত-মুখ ধুয়ে ওজু করে যেখানে-সেখানে মাদুর বিছিয়ে পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়িয়ে যায়। এই একটা সুবিধা এদের। প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের কোনো কড়াকড়ি নেই।

লোবানের হালকা সুগন্ধি ধোঁয়ায় ডাক্তার নন্দলালের ফোলা ঘুমকাতুর চোখ দু'টিতে একটু আরাম ছড়িয়ে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে মোল্লাবাড়ির এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের বাজার এলাকার প্রায় অর্ধেক দোকানপাট যার করতলগত সেই বাদশা মোল্লার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর শুনে ডাক্তার নন্দলাল তার সকালের আরামের ঘুমটা মাটি করেই উঠে এসেছেন। অনিচ্ছায় এসেছেন একথা অবশ্য বলা যাবে না। তিনি এ পরিবারের বলা যায় প্রাত্যহিক পারিবারিক চিকিৎসক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া মোল্লা সাহেবই তাকে এ শহরে পেশাগতভাবে দাঁড়ানোর ঠাঁই করে দিয়েছেন, তার পসারে সাহায্য করেছেন। তিনি যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে দু'তলা কোঠাবাড়ি বানিয়ে একচ্ছত্রভাবে এতদঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের একডাকের চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এর পেছনে আছে এই মোল্লাবাড়ি। এই বাদশা মোল্লা। এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাকে কাকাবাবু বলে সম্মান করে।

লোবানের গন্ধটা যত মধুরই হোক, ডাক্তারের মনে হলো এটা যেন মৃত্যুর গন্ধ। পেঁচিয়ে নিঃশ্বাসের সাথে মস্তিষ্কে পৌছে তার ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে। তিনি আবার রোগীর নাড়ি ধরতে ঝুঁকে পড়লেন। আবার পরিবেশটা থমথমে, উৎকর্ণ হয়ে রইল।

'কখন থেকে এ রকম হলো?' তিনি জাহানারার দিকে মুখ তুললেন, 'আগে আমাকে খবর দিতে পারতে।'

'কাল রাতে খাওয়ার পর আমাদের বার বাড়ির বারান্দায় সিকান্দার চাচার সাথে হুঁকো নিয়ে বসেছিলেন। ওই তো সিকান্দার চাচা, তাকে জিজ্ঞেস করুন।'

জাহানারার ইঙ্গিতে ডাক্তার দরজার দিকে দেখলেন। এ বাড়ির ভাগচাষি সিকান্দার আলী। কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথায় ময়লা কিস্তি টুপি। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর কম হবে না। খাটের পাশে কাকে যেন ঠেলে তুলে দিয়ে রোগীর পাশে একটা টুলের ওপর বসল।

ফার্সি হুঁকোর নলটা আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আর বসতে ভালো লাগছে নারে সিকান্দার। মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে। বলতে বলতেই মাদুরে নেতিয়ে পড়লেন। আমি তাকিয়া বালিশটায় ঠেস রেখে বসতে বলতে গিয়ে দেখি তিনি বমির মতো শব্দ করে ছটফট করছেন। আমি চিৎকার করে সবাইকে ডাকলাম। অন্দর থেকে সবাই এসে তাকে ধরাধরি করে ছোট বুবাইয়ের এই খাটে এনে শুইয়ে দিল। আমি ভাবলাম হয়ত রাতে খানাটা বেশি হয়ে যাওয়াতে তার বমি ভাব হয়েছে। রাতে ভালো ঘুম হলে সেরে যাবে। আমি বাড়ি চলে গেলাম।'

সিকান্দার ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলে ডাক্তার মুখ তুলে ছোট বিবিকে খুঁজলেন। ছোট বিবি খাটের মাথার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার মুখখানি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছিল না। মেহগনি কাঠের পালঙ্কের কারুকার্যময় শিথানে নিজের দেহকে যতটা সম্ভব আড়াল করে বসেছিলেন। তিনি পর্দানশীন নারী। সাধারণত এ বাড়ির মুনি-মানুষ ছাড়া তিনি কোনো বহিরাগত ব্যক্তি বা পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের সামনে উদঘাটিত হন না। এমনকি ডাক্তার নন্দলালের মতো পারিবারিক চিকিৎসকের সামনেও না। ডাক্তার তার কথা শুনতে চান বুঝতে পেরে ছোট বিবি মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'গত রাতে তিনি খুব বেশি যে কিছু খেয়েছিলেন তা নয়। দু'টুকরো রুই মাছ, আর যা খান তাই। আপনি তো জানেন।'

'জানি বলেই তো জিজ্ঞেস করছি, ওই বড়ি কটা গিলেছিলেন?'

'সব সময়ই দু'বড়ির বেশি নেন না। কালও দু'টো বড়ি নিতে দেখলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিই আফিমের কৌটো থেকে দু'টো বড়ি দিয়েছিলাম ডাক্তার বাবু। বেশি খাবেন কোত্থেকে, আফিমের কৌটো তো থাকে আমার কাছে। তবে তার নিজের জামবাটি ভরা সরদুধ খেয়েও আরও খানিকটা খেতে চাইলে আমি আরও খানিকটা দুধ এনে দিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'দুধটুকু এক চুমুকে খেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, বারবাড়িতে ফার্সি হুঁকোটা পাঠিয়ে দিও। ইসমাইলকে বল ভালো করে তামাক সেজে কয়েকটা টিক্কা জ্বালিয়ে যেন দেয়। ইসমাইল হুঁকো রেখে ফেরার সাথে সাথেই তো এই ঘটনা।' আফিম যে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ছোট বিবি তা অস্বীকার করলেন, 'রাতে তো এ পরিমাণ আফিমই তিনি রোজ নেন।'

ছোট বিবির কথায় কি একটা মনে হতেই ডাক্তার তার হাতের বইটার পাতা দ্রুত উল্টিয়ে একটা পাতায় দৃষ্টি স্থির করলেন। তার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। তিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রোগীর মুখের দিকে তাকালেন। ঘর ঘর শব্দ বুক থেকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। শব্দটা এখন বেশ জোরাল। তবে একটু আগে কষ বেয়ে যে লালা বেরিয়ে আসছিল তা এখন শুকিয়ে আছে। এর বদলে মুখটা হা হয়ে আছে। মনে হয় নাকের বদলে মুখ দিয়ে রোগীর নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে। আর ঠোঁটের ওপর জমে আছে সাদা রঙের অভুক্ত খাদ্যের টুকরো। সম্ভবত তা মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের করার ফলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঠোঁটে লেগে আছে। জাহানারা একটা গামছা দিয়ে রোগীর মুখটা মুছিয়ে দিল।

ডাক্তার হঠাৎ কি মনে হতেই রোগীর পায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতের বইটার শক্ত পুটের দিকটা দিয়ে রোগীর পায়ের পাতা জুড়ে একটা আঘাত করলেন। দেহটা কঠিন কোনো জিনিসের মতো আপাদমস্তক নড়ে উঠল। যেন একটা অতিকায় কাঠের পুতুল নড়ছে। ডাক্তারের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই একটা শব্দ ছিটকে বেরিয়ে গেল, 'আহ্ হা।'

এই একটু আওয়াজেই দর্শনার্থীদের মধ্যে কয়েকজন ডুকরে উঠলেন। ডাক্তার রোগীর বড় মেয়ে জহানারার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি একটু বারান্দায় এস তো মা।'

জাহানারা দ্রুত খাট থেকে নেমে ডাক্তারের পিছু পিছু বারান্দায় আসতেই ডাক্তার নন্দলাল দাঁড়ালেন।

'তোমার আত্মীয়-স্বজন, ময়মনসিংহের বোন-ভগ্নিপতিকে টেলিগ্রাম পাঠাও। আর তোমার জামাইকে বল তোমার বাপের দোকানের ক্যাশের চাবি, এ বাড়ির সিন্দুকের চাবি, কাগজপত্র এনে তোমার কাছে রাখতে। তোমার ভাইয়েরা তো নাবালক। তোমার বাপের বিপুল অর্থবিত্ত, জমিজিরাত, দোকানপাট যাতে সাতভূতে লুটে না খায় সেটা দেখতে হলে তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। তোমার জামাই ভালো মানুষ হলে কি হবে, তার পক্ষে জ্ঞাতিশত্রুদের ঠেকানো মুশকিল হবে। আমি মনে করি, তুমি হয়ত বা ঠিকমতো ঠেকনা দিতে চাইলে এসব থাকতেও পারে। অন্তত বাজে লোকের হাতে পড়বে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এসব কি বলছেন ডাক্তার কাকা? আমার আব্বা...?'

ডাক্তার যেন রোগটা এতোক্ষণে ধরতে পেরেছেন।

'আব্বার কি হলো ডাক্তার কাকা?'

এখন আর উৎকণ্ঠা নেই, জাহানারা রোগটার নাম জানতে চায়।

'তোমার আব্বার সন্ন্যাস রোগ হয়েছে। এ রোগে মস্তকের ভেতরের শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে গিয়ে দেহ পঙ্গু হয়ে যায়। এটা আফিমের নেশার জন্যই হয়েছে এটা আমি বলব না। তবে তোমার বাপের সবসময় মাথায় রক্ত উঠে থাকত বলে আমি কয়েকদিন আগেও তাকে সাবধান করেছিলাম। আফিমের মাত্রা আরও কমিয়ে আনতে বলেছিলাম। আর ভোজনের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। জানতাম এসব তিনি শুনবেন না। আসলে মা তোমার আব্বার আয়ু ফুরিয়ে গেছে। এখন সবকিছু ঈশ্বরের হাতে। তুমি আর তোমার স্বামী তার সয়সম্পত্তি একটু আগলে রাখার চেষ্টা কর। তোমাকে যখন পরিবারের মধ্যেই তিনি বিয়ে দিয়ে গেছেন তখন তোমার নাবালক ভাইদের দেখার দায়িত্বও তোমাকেই নিতে হবে। আমি আসি।'

জাহানারাকে একরকম নির্বাক করে দিয়েই যেন ডাক্তার সিঁড়িতে নেমে তার সাইকেলটায় হাত দিলেন।

জাহানারাও দ্রুত নেমে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাকাবাবু সিন্দুকের চাবি তো বড় আম্মার কাছে থাকে। তিনি এখন তার বাপের বাড়িতে। এখন বোধহয় খবর পেয়েছেন। ক্যাশ টাকা আর পরিবারের গয়নাগাটি ওই সিন্দুকে।' জাহানারা হ্যান্ডেলে হাত রেখে কথা বলছে, 'আপনি তো জানেন আমার বড় আম্মা নিঃসন্তান। আব্বার সাথে তার বনিবনা হয়নি কোনোদিন। এ জন্যই নিঃসন্তান। কিন্তু টাকা-পয়সা, দলিল-দস্তাবেজের ব্যাপারে তিনি আব্বার বিশ্বস্ত ছিলেন বলে আব্বা সিন্দুকের চাবি তার কাছেই রাখতেন। আমার মা মরার পর চাবি আমাকে রাখতে দিতেন। আমার বিয়ের পর এখন বড় আম্মা রাখেন।'

'চাবিটা তুমি যে করেই হোক তার কাছ থেকে নিয়ে নেবে।'

'কি করে নেব কাকা, তিনি যদি না দেন?'

'চাবিটা তোমার হাতে রাখবে। এর বেশি এখন আমার আর কিছু বলা ঠিক হবে না। তুমি সিকান্দারের সাহায্য নাও। ও তো তোমাদের সামনের মাঠের জমিগুলো চাষ করে। আচ্ছা, তোমাদের এই বাড়ির সামনের ওই মাঠে কি পরিমাণ জমি আছে?'

জাহানারা এ ব্যাপারে কিছু জানে না। সে কিছু বলার আগেই পেছন থেকে কে যেন বলল, 'দেড় দ্রোন।'

জাহানারা ও ডাক্তারবাবু মুখ ফিরিয়ে দেখল বাড়ির গরু-বাছুরের রাখাল ইসমাইল দাঁড়িয়ে আছে। সে মাঠেরও কাজ করে। উঠোনে ধানের মলন দেয়। শোলা ও পাট শুকায়। মোল্লা সাহেবের খাস নকর। ডাক্তার জানেন লোকটা মোল্লা সাহেবের খুব বিশ্বস্ত।

'দেড় দ্রোন তো অনেক জমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জি বাবু, এত জমি এ তল্লাটে কৃষ্ণনগরের জমিদার বিহারী বাবুদেরও নেই। আমি এক সময় বাবুদের গাঙের পাড়ের জমি চষেছি বলে জানি।' ইসমাইল হাত কচলে হাসল, 'আমি এ বাড়ির জমিজমা সম্বন্ধেও জানি বাবু, বাড়ির বৌ-ঝিদের চেয়ে বেশি জানি। এরা কোত্থেকে জানবেন? এরা তো আর হুজুরের ক্ষেতে হাল দেন না। তিতাসের পুব পাড়ের দত্তখোলায় আমার মালিকের একশ' কানি বোরো জমি আছে। উলচা পাড়ায় আছে বিশ কানি। এ গাঁয়ের ভেতরে যে আম বাগানটা এদের আছে তার লাগোয়া মাঠে আছে দশ কানি।'

ডাক্তার বাবু সাইকেলটা বারান্দার সিঁড়ি থেকে বারবাড়ির উঠোনে ঠেলে নামিয়ে আনতে গিয়ে জাহানারার দিকে তাকালেন, 'ধানী জমির এক রাজত্ব রেখে যাচ্ছেন তোমার আব্বা। বুঝেশুনে ধরে রাখতে পারলে বাজারের দোকানপাট গুঁটিয়ে ফেললেও চলবে। যখন তোমার ভাইয়েরা সকলেই ছোট। তোমার ছোট মায়ের ঘরে তোমার কয় ভাই যেন আছে?'

'দুইজন। একজন বারো, একজনের মাত্র দশ।'

'তোমার নিজের ভাই তো তিনজন। বড় জনের বয়স কত?'

'শওকতের বোধহয় এখন বাইশ। সবাই পিঠেপিঠি। সাফফাতের বিশ। আর সারোয়ারের আঠারো। আমি তো এদের সকলেরই বড় ডাক্তার কাকা, আমার ছাব্বিশ। আর ছোটটার, ময়মনসিংহে যার বিয়ে দিয়েছি, সেই আনুর বোধহয় চলছে চব্বিশ।'

জাহানারা নিজের ভাইবোনের কথা বলে একটু বোধহয় হাসতে চাইল। এর মধ্যেই রোগীর ঘর থেকে সম্মিলিত বিলাপের সুর ভেসে আসাতেই সে থতমত খেয়ে গেল।

'তোমার আব্বা বোধহয় বিদায় নিলেন। আমি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে তার এই কষ্টের হাত থেকে মুক্তির প্রার্থনাই করছিলাম। যাও মা, সবাইকে নিয়ে তার শেষের আয়োজন কর। আর আমার উপদেশগুলো মনে রেখ।'

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই জাহানারা ছুটে ভেতরে চলে গেল।

লাশ দাফনের একদিন পর মোল্লাবাড়ির কনিষ্ঠা কন্যা আনোয়ারা স্বামী-পুত্রসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে বিলাপ করতে করতে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল। সাথে তার শিক্ষক স্বামী। বোনকে দেখে জাহানারা দ্রুত বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে এলে দু'বোন কোলাকুলি করার মতো একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। দু'বোনকে জড়াজড়ি করে বিলাপ করতে দেখে আনোয়ারার স্বামী একটু ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল, 'আহা আনু এটা কি বিলাপের সময়? তোমাকে আগেই এতো বুঝিয়ে আনলাম যে, বাড়ি গিয়ে বিলাপ করবে না। আমার শ্বশুর আল্লাহর ইচ্ছায় ইন্তেকাল করেছেন। হায়াত-মউত তো আল্লাহর হাতে। কে জানে কার কিভাবে কখন মরণ হয়। আমার শ্বশুর সোজা-সরল মানুষ ছিলেন। তার ছেলেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ এখনও তার ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি, দোকানপাট, নগদ টাকাকড়ি বুঝে নেয়ার মতো উপযুক্ত হয়নি। এতোদিন তো তোমার আপনজন যারা আমার শ্বশুরের কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছে তারাই দু'হাতে লুটেপুটে খেয়েছে। তুমি দূরে ছিলে বলে দেখতে আসনি। এখন আল্লাহর মর্জি তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এখন কেন এই বিপুল সম্পত্তি দশভূতে লুটে খাবে? এখন নিজেরটা বুঝে নেয়ার সময় এসেছে। তোমার কি এখন বিলাপ করা সাজে?'

ছোট বোনের জামাইয়ের 'কাছাকাছি থাকার সুযোগ' কথাটা কানে যেতেই জাহানারার কান্না থেমে গিয়েছিল। সে মুহূর্তের মধ্যেই ধরে নিল তাকে উদ্দেশ্য করেই আনুর স্বামী এসব কথা বলছে। জাহানারা বোনের হাত নিজের গলা থেকে আস্তে করে খুলে নিয়ে বলল, 'আয় ঘরে আয়।'

আনুর জামাই বুঝতে পারল তার শ্লেষটা আনুর অগ্রজার কানে ঠিকমতোই সে তুলে দিয়েছে। মুখে অবশ্য বলল, 'আরে এই তো বুজান, দেখেন তো আপনাকে কদমবুসী করতেও ভুলে গেছি। ভুলব না, এমন একটা দুঃসংবাদ পেয়ে আমার আর আপনার বোনের কি মাথা ঠিক আছে?'

আনুর জামাই নুয়ে জাহানারার পা ছুঁতে গেলে জাহানারা একপা পিছিয়ে গেল, 'থাক, থাক। আজকাল ওসব কেউ করে না। তোমরা এখনও উঠোনেই কেন দাঁড়িয়ে রইলে? চল, আগে ঘরে গিয়ে তো ঠাণ্ডা হও। পরে সব শুনবে। যা করতে হয় করবে।'

'আমরা কিছু করতে আসিনি বু'জান। আপনি আর দুলাভাই থাকতে আমাদের কি করার আছে? এখন তো আপনারাই এ বাড়ির মুরুব্বী, মালিক।'

'বারে আমি মালিক হব কেন? আমার বাপ আমাকে এ শহরেই বিয়ে দিয়ে গেছেন বলে আমি বিপদে-আপদে তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে পারি। কিন্তু আমার বোন তা পারে না। পারে না বলে কি তোমাদের দায়িত্ব কম? আমার এতিম ভাইবোনদের জন্য আমি যেমন, তোমরাও তেমনি মুরুব্বি।'

'সেটা তো ঠিকই।'

একটু হাসতে চেষ্টা করল আনুর জামাই।

জাহানারা বলল, 'আগে ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে কিছু খেয়ে বিশ্রাম নাও। খিদেয় ছেলেমেয়েগুলোর মুখ শুকিয়ে আছে।'

'ঘরের কথা যখন বললেন বুজান তখন আগেই একটা দাবি জানিয়ে রাখি।'

জাহানারা হেসে বলল, 'বল না তোমার কি দাবি?'

'আমাদের মাঝের কোঠায় থাকতে দেবেন। বোঝেন তো আমি মাস্টার মানুষ। আলো-বাতাস জিয়াদা থাকলে আজাদ পত্রিকাটা ঠিকমতো পড়তে পারি।'

এ কথায় জাহানারা খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকল। ওই মাঝের কামরাটিতে স্বামী-পুত্র নিয়ে গত কয়েক মাস জাহানারা বাপের বাড়িতে আছে। জাহানারা বাপের বাড়িতে স্থায়ী বাসিন্দা নয়। পাশের গ্রামেই তার নিজের বাড়ি অর্থাৎ শ্বশুরের ভিটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামী যেহেতু তার বাপের কায়কারবারেই সহযোগিতা করে, সে কারণে মাঝে-মধ্যে তার আব্বাই জামাতার সাথে কায়কারবারের ব্যাপারে একান্তে পরামর্শের জন্য ডেকে আনেন। সাথে জাহানারাও ছেলেমেয়েসহ বাপের বাড়িতে এসে ওঠে। বাপের পছন্দের খাওয়া-পরার ব্যাপারে বাড়ির জ্যেষ্ঠা কন্যাই বেশি আগ্রহী থাকে। মেয়ে একবার কিছুদিনের জন্য এলেও বাপ তাকে সহজে ছাড়তে চান না। এ কারণেই জাহানারা একবার এলে দীর্ঘদিন এখানেই থাকে। আর থাকে বাপের কামরার পাশে মধ্যের কামরাটিতে। ছ'কোঠার এই বিশাল একতলা ইমারতটিই বৃটিশ আমলে এ শহরের ধনী মুসলমানদের দালান-কোঠার মধ্যে চোখে পড়ার মতো প্রকাণ্ড বসতবাটি। এ রকম বাড়ি এ গাঁয়ে আর একটি মাত্র আছে। সেটা হলো গাঁয়ের গির্জার পাদরি ফাদার জোনসের একই রকম ছ'কোঠারই একটি বাসস্থান। বাড়ি দু'টি দেখলে যে কেউ মনে করবে সম্ভবত বাড়ির মালিকেরা যুক্তি-পরামর্শ করে বাড়ি দু'টি নির্মাণ করেছেন। এ রকম অনেকেই ভাবে। কারণ, বাদশা মোল্লার সাথে পাদরি মহাশয়ের বন্ধুত্বের কথা এতদঞ্চলে সবাই জানে।

এখন আনুর জামাই জাহানারার কাছে বাড়ির ওই মাঝের কামরাটিই দাবি করায় আনু একটু বিব্রতবোধ করলেও চক্ষুলজ্জায় বিমূঢ়ের মতো রাজি হয়ে গেল।

'ঠিক আছে তোমরা মাঝের ঘরটিতেই থাকবে। তবে এখন অন্য একটা ঘরে লটবহর রেখে খেয়ে বিশ্রাম নাও। আমি এই অবসরে তোমাদের জন্য কামরাটা খালি করে দেব। এখন ঘরে চল। আয় আনু।'

বোনের হাত ধরে জাহানারা বারান্দায় উঠল।

AMARBOI.COM

২

এখনও মোল্লা সাহেবের ক্যাশ, দলিল দস্তাবেজ ও গয়নাপত্র বা সোনাদানার সিন্দুকে কেউ হাত দেয়নি। সিন্দুকের চাবি যার কাছে তিনি মোল্লা সাহেবের বড় বিবি। তিনি মোল্লা সাহেবের মরণমুহূর্তে পাশের গাঁয়ে নিজের বাপের বাড়িতে ছিলেন। আর তার সুস্থ সবল ষাট-উর্ধ্ব বয়সের স্বামীর মৃত্যু ছিল এমনি আকস্মিক যে খবর পেয়ে তিনি কতক্ষণ হতভম্বের মতো লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পরে যখন বুঝতে পারেন তিনি এমন এক দুঃসংবাদ শুনছেন যা একটু অভাবনীয় হলেও তার বাকি জীবনের জন্য মোটেই অনুতাপজনক হবে না। তখন তিনি শোকেই হোক কিংবা প্রতি, হিংসার মনোগত জটিল অনুভূতির কারণেই হোক, অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ধরাধরি করে তাকে একটা খাটে শুইয়ে মুখে পানির ঝাপটা মারতেই তার জ্ঞান ফিরে আসে। তাকে তার ভাইয়েরা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেন। যদিও তার বাপের বাড়ি থেকে নিজের বাড়ির দূরত্ব একটি মাঝারি পুকুর মাত্র। মৌড়াইল গাঁয়ের স্টেশন পাড়ার পুব দিকটায় বড় বিবির বাপের বাড়ি। আরও পুবদিকে জর্জ ফিফথ হাইস্কুল। স্কুলের সামনে পুকুরটা। পুকুরের পূর্বদিকে বাদশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোল্লার নতুন বাড়ি। এককালে নতুন বাড়ির বাসিন্দারাও ওই পশ্চিমের পুরনো বাড়ি অর্থাৎ আদি মুল্লা বাড়ি থেকেই এদিকে এসেছে। এরা মূলত সামন্ত স্বভাবের প্রাচীন মুসলিম জোতদারদেরই বংশ। এরা এককালের ভূমি নির্ভর মোগল-পাঠানদের দেয়া সনদের বলে ভূসম্পত্তির সুবিধাভোগী শ্রেণির পরিবার। বৃটিশ আমলের দু'শো বছরের মধ্যে দেড়শো বছর এরা কেবল জোতজমি ধরে রাখার চেষ্টায় জীবনপাত করেছে। কেউ বৃটিশদের কোনো চাকরি গ্রহণ কিংবা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হিন্দু অভিজাতদের মতো ধনেজনে বেড়ে ওঠার সুযোগ নেয়নি। নেয়নি অবশ্য ধর্মীয় কারণে। মোগল বা পাঠান আমলে এরা ধর্মের ধার যে তেমন ধারত তেমন মনে হয় না। কিন্তু বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এরা নিজেদের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মতো ইসলামকেও আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেছে। বৃটিশ আমলের শেষদিকে উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে এরা ইংরেজি শিক্ষার সুবিধাগুলো উপলব্ধি করার সাথে সাথেই বিপুল প্রতিযোগিতার সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রতিযোগিরা সকলেই ছিল হিন্দু জমিদার জোতদারদের সন্তান এবং বৃটিশদের মনোরঞ্জনে স্বাভাবিকভাবে অগ্রবর্তী সমগ্র বর্ণ হিন্দু যুবসমাজ। এদের সাথে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ধনী মুসলমান জোত-জমির মালিকেরা সোজাসুজি ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য, শহরে-গঞ্জে কাপড়, কৃষিদ্রব্য, চামড়ার জিনিসপত্র, ধানচাল ও পাটের ব্যবসার দিকে হাত বাড়ায়। পুঁজি সংগ্রহের উপায় ছিল বিপুল ভূসম্পত্তির কিয়দংশ হাতছাড়া করে নগদ টাকা। এর মধ্যে যে কৃতিত্ব নিজেদের ভাগ্যে কুলোয়নি অর্থাৎ ইংরেজি স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা লাভের সুযোগ, সে সুযোগটা যাতে নিজেদের ছেলেমেয়েরা আয়ত্তে আনতে পারে সে চেষ্টাও এরা আন্তরিকভাবেই শুরু করে। টাকা ও বিপুল জমির মালিক বাপেরা নিজের প্রায় নিরক্ষর কম শিক্ষিত কন্যার জন্যও ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম জামাই কিনতে প্রতিযোগিতায় নামে। ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গজিয়ে ওঠার এক ধরনের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়। এই ভিত্তিরই প্রথম স্তরের মানুষ ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই মোল্লাদের লতাগুল্ম।

আজ কুলখানি। লাশ দাফনের চারদিন পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ও শহরের আশপাশের মাতব্বর শ্রেণির কয়েকজন লোক, স্থানীয় খ্রিস্টান মিশনের পাদরি, বাজারের বড় আড়তদার শ্রেণির কয়েকজন, মরহুম মোল্লা সাহেবের বৈঠকখানায় জমায়েত হয়েছে। ডাক্তার নন্দলালও আছেন। এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ির মানুষই উদ্যোগি হয়ে ডেকে এনেছে। এনেছে জাহানারার স্বামী তৈমুর মোল্লা। মোল্লা সাহেবের চল্লিশার জিয়াফতের আগেই, আজকে কুলখানির দিনেই যাতে মরহুমের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ টাকা-পয়সা ও সোনাদানার কথা তার উত্তরাধিকারীরা জানতে পারে, এ নিয়ে পরে যাতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনো সন্দেহ ও ঝগড়ার সৃষ্টি না হয়, সে কারণেই আজকের এই ব্যবস্থা। চাবি বড় বিবির কাছে থাকলেও লোহার সিন্দুকটা আছে জাহানারার ঘরে। মূলত এ ঘরেই চিরকাল ক্যাশের সিন্দুকটা থাকে। যে ঘরে এখন জাহানারার ছোটবোন আনোয়ারা তার স্বামী আমজাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও ছেলেপিলে নিয়ে উঠেছে। জাহানারা এ ঘরটা ছেড়ে চলে গেছে একবারে পশ্চিমের কোঠায়। এ ঘরে সাধারণত কাঁচের জিনিসপত্রের দু'টি বড় আলমারি ও অতি প্রাচীনকালের একটি কারুকার্যময় পালঙ্ক পড়ে থাকে। মেয়ে মেহমান কেউ এলে থাকেন। পালঙ্কটা চীনা ছুঁতোর দিয়ে এ পরিবারের কোনো আদিপুরুষ কেউ বানিয়েছিলেন। খুব জমকাল খাট বলে কেউ এ খাটে এসে শোয় না। অগত্যা জাহানারাকে এ খাটে এসেই বিছানা পাড়তে হয়েছে। তার দশ বছরের ছেলে মাহমুদকে নিয়ে এ ঘরেই এখন তার আলনা, স্যুটকেস ও অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র মাঝের ঘর থেকে এখানে এনে সাজিয়েছে। সিজিল করে সবকিছু গুছিয়ে রাখার একটা যাদু আছে। জাহানারা সেটা জানে। গোছানো মাত্রই প্রায় পরিত্যক্ত কামরাটা যেন ঝলমলিয়ে উঠেছে। জাহানারা কামরাটা গুছিয়ে তোলার পর আনুর স্বামী একবার পায়চারি করতে করতে এ ঘরে এসে ঢুকেই চমকে গেল। যেন সে ইতিপূর্বে এ ঘরে আর কখনও আসেনি।

'এ ঘরে তো আমরাই থাকতে পারতাম। আপনাকে অযথা কষ্ট দিলাম।'

'না কষ্ট কি, তোমার তো আবার পত্রিকা পড়তে হয়।' জাহানারা মৃদু হাসার ভঙ্গী করল। 'ও ঘরে একটু আলো-বাতাস বেশিই পাবে। তোমরা তো মাত্র ক'দিনের জন্য। আমরা তো বলতে গেলে এ বাড়ির সারা বছরের বাসিন্দা। দু'দিনের জন্য মাঝের ঘরটা আনুকে ছেড়ে দিয়ে আমার ভালোই লাগছে। তুমিও আজাদ পত্রিকাটা ঠিকমতোই পড়তে পারবে।'

আনুর জামাই আমজাদ ঘরটার পরিচ্ছন্নতা ও আসবাবের গোছগাছ দেখে কেমন যেন একটু দমে গেল, 'এ ঘরেও আলো-বাতাস মন্দ নয় বু'জান। এখন মনে হচ্ছে আপনাকে মাঝের ঘরটা ছেড়ে দিতে বলাটা আমার বেয়াদবি হয়েছে। আমাকে মাফ করে দিন। আপনি যদি চান আমরা এখানেই থাকব। আপনি আগের মতো মাঝের কামরায়ই গিয়ে থাকুন। এতে দুলাভাইয়ের সুবিধা হবে। আমার কথার জন্য এখন খুব লজ্জা পাচ্ছি।'

এ কথার সহসা কোনো জবাব দিল না জাহানারা। তার মুখ ও ললাট কঠিন হয়ে উঠল। সে তখন ঘরের আলমারি দু'টোর কাঁচের পাল্লা ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করছিল। এ সময় বাচ্চা কোলে আনু এসে ঢুকল কামরায়। স্বামীর কথাগুলো তার কানে গেছে। সে বুঝতে পারল পরিত্যক্ত এই পশ্চিম সাইডের কামরার হঠাৎ জলুস দেখে তার স্বার্থপর স্বামীটি নির্লজ্জের মতো বুবুর কাছে এ কামরাটাই এখন দাবি করছে। সে সোজাসুজি আমজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কি বলছ?'

'না বলছিলাম কি, মাঝের ঘরটা থেকে বু'জান আর দুলাভাইকে এ ঘরে আসতে বলা আমার ঠিক হয়নি। আমরা এ ঘরটা নিলেও অসুবিধা হতো না। দেখ না এ ঘরেও কেমন আলো-বাতাস। আর কেমন সাফ-সুতরো লাগছে। খাটটাও বেশ বড়। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বেশ পা মেলে শোয়া যেত। আমার খুব বেয়াদবি হয়েছে আনু, আমি বু'জানের কাছে মাফ চাইতে এসেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা আগের মতোই মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল মাত্র। তার ললাটরেখায় রাগ ও অস্বস্তি ফুটে বেরুচ্ছে, 'তোমরা যে কয়দিন আছ মাঝের ঘরেই থাকবে। আজ আব্বার কুলখানি। এখন দোয়া হবে। হাফিজ সাহেব কোরআনখানি শেষ করেছেন। তুমি গিয়ে মাগফেরাতের দোয়ায় শরীক হও।'

এতোক্ষণ জাহানারা বোনের জামাইয়ের মুখের দিকে তাকায়নি। এখন সোজাসুজি মুখ তুলে দেখল, 'আর শোন, তোমার দুলাভাই এ বাড়িতে মাঝে মধ্যে রাতে থাকলেও, নিজের বাড়িতেই থাকে। তার নিজের বাড়িটা খালি ফেলে শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকার মানুষ সে নয়। আমার বাপের টানে আমি এখানে পড়ে থাকি বলে, তাছাড়া বাজারের হিসাবপত্র ও কায়কারবার নিয়ে আব্বার সাথে নিত্য পরামর্শ করতে হয় বলে সে কোনো কোনো রাতে এ বাড়িতে থেকে যায়। তৈমুর এ বাড়ির ঘরজামাই নয়। তুমি তোমার দেখার অসুবিধের কথা বলাতে আমি মাঝের ঘরটা ছেড়ে এসেছি। এখন দেখছি এ ঘরটা দেখেও তোমার ভালো লাগছে। কিন্তু আমি আর জিনিসপত্র টানাটানি করতে পারব না। তোমার বউ যদি পারে করুক।'

বোনের বিরক্ত কণ্ঠস্বরে আনু সহোদরার চাপা ক্রোধটা আন্দাজ করতে পারল।

'না আমি জিনিসপত্র টানাটানি করতে পারব না।' বেশ রাগত দৃষ্টিতেই স্বামীর লোভী বেহায়া মুখের দিকে মুখ তুলল আনু, 'তোমার মাঝের ঘর পেয়েও সাধ না মিটলে বুবুর জিনিসপত্র ও ঘরে তুমিই নিয়ে যাও। আব্বার কুলখানির দোয়ায় শামিল না হয়ে কে তোমাকে অন্দরে পায়চারি করে বেড়াতে বলেছে? একটুও লজ্জা লাগছে না তোমার?'

'আহা রাগ করছ কেন? আমি কি এ ঘরটাও চাইতে এলাম নাকি? বললাম এ ঘরটাও মাঝের কামরার মতোই ভালো। বু'জানকে ও ঘর থেকে সরিয়ে আমার অপরাধ হয়েছে। আমি মাফ চাই।'

'যাক তোমার আর মাফ চাইতে হবে না। বারবাড়ির ঘরে গিয়ে আমার বাপের জন্য মাগফিরাতের দোয়া মাঙো। আমি ঘরবাড়ি ভাগাভাগি করতে বা পাওনা আদায় করতে এ বাড়িতে আসিনি। এসেছি আমার বাপের মরার খবর পেয়ে। যার টাকায় তুমি বিদ্যার জাহাজ হয়েছে।'

'আহা তুই ওকে ওভাবে বলছিস কেন?' বোনের প্রতিবাদে এখন হঠাৎই জাহানারার রাগটা পড়ে গেল, 'ওতো আর এ ঘরে আসার কথা বলেনি। বলেছে এ ঘরটাও ভালো।'

'ওকি বলেছে আমি তা শুনেছি বুবু। ওর কোনো কিছুতেই পরিতৃপ্তি নেই।'

বলেই আনু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে জাহানারা হাসল, 'ওর ওপর রাগ করো না আমজাদ। জানই তো ও একটু রগচটা। ঠিক আছে তোমার যখন এ ঘরটা পছন্দ তখন না হয় কাল থেকে আমিই আবার মাঝের কামরায় জিনিসপত্র নিয়ে যাব। এখন গিয়ে সবার সাথে মাগফিরাতের দোয়ায় শামিল হও। তোমার জন্য হয়তো সবাই অপেক্ষা করছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখুন বু'জান আপনার বোনের ব্যবহারটা! আমি কি ঘরবাড়ি ভাগাভাগি করতে এসেছি নাকি, আপনি বলুন? আপনার কাছে আবদার করে মাঝের কামরাটা চেয়েছিলাম। আমি তো আমার বেয়াদবির জন্য মাফ চেয়েছি। চাইনি বলুন?'

'আহা এতে মাফ চাওয়ার কি হলো? আমি তো খুশি হয়েই ও ঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। এখন অন্তত একটা দিন পার হতে দাও। আজ বাইরের মেহমানরা উঠোনে বসে আছে সিন্দুকের ভেতরে টাকাকড়ি, গয়নাপত্র কি আছে তা সবার সামনে খুলবে বলে। বড় আম্মার কথাতেই সবাইকে ডেকে আনা হয়েছে। যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহ না থাকে। ভাগাভাগি যদি হয় তাহলে তোমাদের যা পাওনা তা তোমরা নিয়ে যাবে।'

জাহানারার এ কথায় আমজাদের চেহারায় এক ধরনের প্রফুল্লতার অভিব্যক্তি ছড়িয়ে গেল।

'দেখুন তো বু'জান আপনার বোন এই সহজ বিষয়টা বুঝতে না পেরে আমার ওপর সহসা চটে গেল। আমি কি ভাগাভাগির কথা তুলেছি নাকি? আনুকে বুঝিয়েছি ভাগ হলে আনুরটা আনু যেন বুঝে নেয়। আমি তাহলে বারবাড়ির দিকে যাই বু'জান। সেখানে শুনলাম এক ইংরেজ সাহেব পর্যন্ত এসে হাজির।'

'হ্যাঁ, আমার বাপের বন্ধু মিস্টার জোনস। আমাদের পাদরি চাচা। আনু তো ওর মিশন স্কুল থেকেই মাইনর পাস করেছিল। দেখ ওকে যেন সালাম দিও। আমরা পাদরি চাচাকে কদমবুসি করি। তোমার বিয়ের সময় তিনি নিউজিল্যান্ডে তার দেশের বাড়ি বছরখানেকের জন্য গিয়েছিলেন। তোমার সাথে জানাশোনা হয়নি। খুব ভালো আর দরদমন্দ মানুষ।'

আমজাদকে মুরুব্বি সম্বন্ধে সতর্ক করল জাহানারা। জাহানারা জানে আমজাদ ইংরেজি শিক্ষিত এবং কলেজের শিক্ষক বলে একটু নাক উঁচু ভাব আছে। শেষে না আমন্ত্রিত এ বাড়ির কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীকে আনুর জামাই যথাযথ সম্মান না দিয়ে সমালোচনার পাত্র হয়।

'তাহলে তো ওর সাথে খাতির করা দরকার। রাজার জাত তো চেনা পরিচয় থাকলে আখেরে ভালো একটা জায়গায় চাকরিও জুটে যেতে পারে।'

আমজাদ হাত কচলে হাসল, 'তাহলে ওদিকেই যাই বু'জান।'

জাহানারা হেসে সম্মতিসূচক মুখভঙ্গী করল। বোনের জামাই বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই তার চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল। সে জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে বিরক্তিভরে বাইরে থুথু ফেলল।

কোরআনখানির পর দোয়ার মাহফিল ভেঙে গেলে বারবাড়ি থেকে অন্দরে খবর এল অঞ্চলের মুরুব্বীরা অন্দরে আসছেন। জাহানারা ছুটে গিয়ে তার বড় আম্মার কামরায় ঢুকল। জাহানারাকে দেখেই বড় আম্মা বললেন, 'এই নে চাবি। সিন্দুকের মালামাল আর টাকাকড়ি গয়নাপত্রের হিসাব হয়ে গেলে চাবিটা তোর কাছেই থাকবে। আমি আর এসব দায়দায়িত্ব বহন করব না। আর সিন্দুকে সোনাদানা যা আছে সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোদের। তোর মার। আমার অলংকার আমি আগে থেকেই নিজের কাছে রেখেছিলাম। ছোটবিবির গয়নাও ছোট বিবি নিজের ঘরেই তুলে রেখেছে। সিন্দুকে দলিলপত্র ও নগদ টাকা ছাড়া আর সবকিছুই তোদের। সিন্দুকটা খোলার সময় তুই সামনে থেকে সব বুঝে নিবি। সিন্দুক খুলবে ডাক্তার বাবু নিজের হাতে। সিকান্দারও থাকবে।'

'আপনি থাকবেন না সামনে?'

'আমি বাড়ি ভর্তি মানুষের সামনে কি করে যাই? সেখানে কৃষ্ণনগরের জমিদার বিহারী বাবু থাকবেন। এসব মানুষ কোনোদিন এক লহমার জন্যও মোল্লাবাড়ির বউবিনদের দেখেনি। আমি যাব না। তুই, তোর জামাই, তোর ভাইবোন আর তোর সৎমায়েরা থাকবি।'

'ছোট আম্মা?'

'সেও সম্ভবত যাবে না। তবে বোরখা পরে জানালায় দাঁড়াতে পারে।

জাহানারা বড় আম্মার হাত থেকে চাবিটা নিল। চাবি হাতে নিয়ে আড়চোখে বড় আম্মার মুখভঙ্গি লক্ষ্য করল। কঠিন নাক উঁচু ভাব। জাহানারা সবসময় বড় আম্মাকে সমীহ করে চলে। তিনি অল্প কথা বলেন। তার মা জীবিত থাকতে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি জাহানারার আম্মাকে শান্তিতে থাকতে দেননি। কারণ জাহানারার আম্মা ছিলেন অসাধারণ রূপসি। সাধারণ গরিব ঘরের মেয়ে। রূপ দেখেই তার আব্বা তার আম্মাকে নিকাহ করেন। আম্মা ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালিনী অনুভূতিপ্রবণ মহিলা। যেমন রূপবতী তেমনি পিতার ওপর গভীর প্রভাবশালিনী। তার কথাতেই আব্বা উঠবস করতেন। তিনিই মৌড়াইলের পুরনো বাড়ি ছেড়ে এই তেরবিঘা জমির ওপর নতুন বাড়ি বানিয়েছিলেন। দালানকোঠা, গোয়াল, গোলাঘর, পুকুর সবই আম্মার পরিকল্পনা এবং পরামর্শ অনুযায়ী আব্বা তৈরি করেছিলেন। এ জন্য আম্মা ছিলেন সতীনের দু'চোখের বিষ। তাছাড়া বড় আম্মা নিঃসন্তান থাকায় তার নিজের মায়ের প্রতি বড় আম্মার আত্মীয়-স্বজনের আক্রশের সীমা ছিল না। হঠাৎই জাহানারার আম্মা উলাওঠায় মারা যান। তিনি তিন ছেলে ও দুই কন্যা রেখে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলে আব্বা তৃতীয় বিয়ে করেন ছোটবিবিকে। তিনিও গরিব ঘরের উচ্চ বংশের মেয়ে। তবে জাহানারার আম্মার মতো প্রতিপত্তি বিস্তার করে এ বাড়িতে চরাট করে বেড়াবার মতো মনের জোর বা সাহস তার ছিল না। বড় আম্মা তাকেও দেখতে পারেন না। তবে জাহানারার আব্বা তৃতীয়বার বিয়ে করলে বড় আম্মা হঠাৎ কেন যেন জাহানারার মরহুম আম্মার জন্য আফসোস করতে থাকেন। বলেন, এমন সতীন আর তার কপালে জুটবে না। যেমন রূপ ছিল, তেমনি ছিল সবার সাথে দিলখোলা ব্যবহার। অর্থবিত্ত, সোনাদানার প্রতি লোভ ছিল না। কাবিনে লেখা দশকানি জমিও কোনোদিন খুঁটি পুঁতে আলাদা করে দিতে বলেনি। বড় আম্মার ভাইয়েরা এ বাড়িতে পা রাখলে জাহানারার আম্মাই তাদের আপন ভাইয়ের মতো আদরযত্ন করত। তারা জাহানারার আম্মার কোনো ত্রুটি খুঁজে না পেলেও মনে মনে হিংসা করত। কিন্তু বাহ্যত তাদের বড়বোনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সুন্দরি সতীনের সদয়-সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার তাদেরও মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করত। তারা জাহানারার আম্মার প্রশংসা করে না বেড়ালেও যত্রতত্র তার নিন্দা করত না। নিন্দা করত না কারণ নিন্দা করার প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছু ছিল না বলে। তাছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী, গাঁয়ের গরিব বৌঝিরা তার দয়ামায়ার কথা সবসময়ই বলাবলি করত। আম্মার মৃত্যুর পর বড় আম্মা তার গুণের কথা বলতে থাকেন এবং তার কথা উঠলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

জাহানারার মনে হয় তার বড় আম্মার চেহারাটা ঠিক যেন রানি ভিক্টোরিয়ার মতো। রূপোর টাকায় মুকুটপরা মহারানির যে ছবি আছে সে আদলটা যেন বড় আম্মার মুখে কেউ হুবহু বসিয়ে দিয়েছে। যদিও এটা মহারানি ভিক্টোরিয়ার যুগ নয়। এখন রূপোর টাকায় মহারানির মুখ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তার বদলে এ্যামপারার জর্জ সিক্সথ এসে জুড়ে বসেছেন। তবুও পঞ্চম জর্জ ও রানি ভিক্টোরিয়ার মুখ আঁকা রূপোর মুদ্রা জাহানারা তার আম্মার পুরনো জিনিসপত্র রাখার চন্দন কাঠের বাক্সে অনেক দেখেছে। বড় আম্মার মুখটাকেও তার ওই ভিক্টোরিয়ার মুখের মতোই লাগে।

চাবি হাতে জাহানারা আড়চোখে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে বড় আম্মা হেসে বললেন, 'আমার দিকে হা করে কি দেখছিস। ওদিকে যে লোকজন এক্ষুনি বারান্দায় এসে উঠল বলে?'

'না কিছু না।'

'তৈমুর এখনও দোকান পাট বন্ধ করে ফেরেনি?'

'এতোক্ষণে নিশ্চয় এসে গেছে। আমি তো আর ওদিকে যাইনি।'

জাহানারা পা বাড়াতে চাইলে বড় আম্মা ডাকলেন, 'শোন।'

জাহানারা থমকে দাঁড়াল, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

'ইসমাইলকে বলবি মেহমানদের ঠিকমতো খাইয়ে দিতে।'

জাহানারা বারান্দার দিকে দ্রুত ছুটে গেল।

৩

ডাক্তার নন্দলাল আগত অতিথিদের নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মাঝের কামরার প্রবেশ-দরোজার কালো পর্দাটা একটু দুলে উঠল। জাহানারা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আসুন ডাক্তার চাচা। এ ঘরে কুর্সি দেওয়া হয়েছে।'

'তোমার সকল ভাই-বোনদের হাজির থাকতে বলেছিলাম।'

'আমরা ভাই-বোনরা সকলেই এখানে আছি।'

'জেনানারা কেউ থাকতে চাইলে থাকতে পারেন।'

মোল্লা সাহেবের দুই বিবির কথা ইঙ্গিতে বলতে চাইলেন ডাক্তার নন্দলাল।

'আমার বড় আম্মা সবার সামনে বেরুবেন না। তবে তিনি পাশের কামরায় হাজির আছেন। আর ছোট আম্মা কিড়কিতে দাঁড়িয়েছেন। বড় আম্মা আপনার হাতে সিন্দুকের চাবি দিতে বললেন। এই নিন সিন্দুকের চাবি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা সসংকোচে চাবিসহ হাতটা বাড়াল। দুধের মতো ফর্সা হাত। প্রায় আট গাছা সোনার বাতানা ঝলমলিয়ে উঠেছে। প্রবাল বসানো টকটকে সোনার আংটি একটা মাঝের আঙুলে। পরিচ্ছন্ন করে কাটা ঈষৎ রক্তাভ নখ।

জাহানারার স্বামী কপাটের এপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাত বাড়িয়ে দ্রুত চাবির গোছাটা নিয়ে ডাক্তার বাবুকে এগিয়ে দিল, 'এই নিন চাচা।'

ডাক্তার নন্দলাল চাবির গোছা হাতে নিয়ে বললেন, 'ফাদার জোনস, আপনি এদের নিয়ে আগে ভেতরে যান।'

জোনস বিহারি বাবুর দিকে তাকালেন।

বিহারি বাবু বললেন, 'চলুন আমরা সবাই তো আছি। মোল্লা সাহেবের সাথে সারাজীবন বিলবাওর নিয়ে কত মামলা-মোকদ্দমা করলাম, কত ঝগড়াঝাটি। আজ এ বাড়িতে পা দিয়েই মনে হচ্ছে সবই মিথ্যে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বি আজ তো সবই ফেলে রেখে শূন্য হাতেই বিদায় নিলেন। ভগবান তার মঙ্গল করুন। চল তো তৈমুর, কোথায় যেতে হবে।'

'আসুন চৌধুরী মশায়, এ ঘরেই তার সিন্দুক।'

তৈমুর দরজার পর্দা উঁচু করে ভেতরে যাওয়ার পথ করে দিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের গুটিকয়েক গণ্যমান্য লোক মোল্লাবাড়ির অন্দরে প্রবেশ করলেন। ঘরটা বিশাল। পশ্চিম দিকের দেয়াল গেঁষে মেহগনির পালঙ্ক পাতা। কারুকার্যময় হাশিয়া। বাহুগুলোতেও ময়ূরের প্রতীক। খাটে ধবধবে বিছানা পাতা। বেতের সেন্টার টেবিলের ওপর রূপোর ফুলদানিতে বাড়ির বাগানের কিছু তাজা ফুল ও পাতা জাহানারা সাজিয়ে রেখেছে। বিশাল কাঠের আলনার ওপর দিকে দেয়ালে দুই জোড়া হরিণের শিং। তারও ওপরে সোনালি ফ্রেমে বাঁধাই করা সম্রাট পঞ্চম জর্জের পোট্রেট। আর পূর্বদিকের দেয়াল জুড়ে মাথাসমান উঁচু লোহার অতিকায় সিন্দুক।

তৈমুর অতিথিদের বসতে ইঙ্গিত করলে সকলেই চেয়ারগুলোতে আসন নিলেন। ডাক্তার নন্দলাল বললেন, 'আপনারা অনুমতি দিলে আমি সিন্দুকটা খুলি।'

'আরে ডাক্তারবাবু এতে আমাদের পারিমিশনের কি আছে! আমরা তো সবাই মোল্লা সাহেবের বন্ধু, এখানে হাজির আছি। প্লিজ ওপেন ইট!'

বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা মেঝেয় মোড়া পেতে বসেছিল। ডাক্তারবাবুকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়াল। জানালায় মুখ বাড়িয়ে আছেন ছোট বিবি ও আনোয়ারা। আমজাদ সিন্দুকের ডালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে যাতে লোহার ঢাকনা সরানোমাত্রই ভেতরের সবকিছু তার নজরে আসে। জাহানারা তার স্বামী তৈমুরের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তারবাবু সিন্দুকের ডালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরানো মাত্রই ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। শব্দটাই জানান দিল তালা খুলে গেছে। ডাক্তারবাবু ডালা ধরে টানলেন কিন্তু এই অতিকায় লোহার ঘরের কপাট তার মোলায়েম আকর্ষণে একটুও ফাঁক হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈমুর এগিয়ে এসে বলল, 'একটু জোরে টানতে হবে ডাক্তার কাকা। নিরেট লোহার তৈরি কপাট। বিলেতে অর্ডার দিয়ে আমার শ্বশুর সিন্দুকটা বানিয়েছিলেন। ভয়ানক ভারী আর মজবুত। আপনারা ইযাযত দিলে আমি ডালাটা সবার সামনে ধরতে পারি। সাধারণত দরকারে আমার শ্বশুর আমাকেই সিন্দুকটা খুলতে বলতেন। আমি এটা খোলার কায়দা জানি।'

'তাহলে তুমিই ডাক্তারবাবুকে সাহায্য কর।'

বললেন কৃষ্ণনগরের জমিদার বিহারি বাবু।

তৈমুর ডালা ধরে একটা হেঁচকা টান দিতেই লোহার পাল্লাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল। অনেকগুলো খোপে ভর্তি বৃটিশ সিন্দুক। ভেতরটা ঝকমক করছে। পাল্লার বিপরীত দিকে ইউনিয়ন জ্যাক আঁকা। আর প্রতিটি খোপের ডালায় বৃটিশ মুকুটের তাম্রখচিত মনোগ্রাম। প্রধান খোপ বা কম্পার্টমেন্টটা বেশ বড়। সম্ভবত এর ভেতরেই আছে জুয়েলারি।

তৈমুর বলল, 'এই বড় চাবিটা হলো বড় খোপের।

তৈমুর চাবি ঘোরাল। ডাক্তারবাবু ডালা টানলেন। খোলা মাত্রই মূল্যবান হিরে-জহরত বসানো জড়োয়ার জেল্লায় দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। জাহানারা এগিয়ে এসে একটু কাত হয়ে ভেতরটা দেখতে চাইলে তৈমুর সরে দাঁড়িয়ে তাকে জায়গা করে দিল।

'এ সবই ডাক্তার কাকা আমার মায়ের।' জাহানারা মুহূর্তের জন্য একবার উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল, আমি জানতাম না, একটু আগে আমার বড় আম্মা বললেন, 'এগুলো নাকি কেবল আমার মরহুম আম্মাই পাবে। কেবল তার ছেলেমেয়েরাই এর দাবি করতে পারবে। আমার সৎ মায়েরা বা সৎ ভাইদের মধ্যে এর বণ্টন হবে না। বড় আম্মা বললেন তার নিজের অলংকারপত্র তার নিজের হেফাজতেই আছে। আমার ছোট আম্মাও তারগুলো তার কাছেই রেখেছেন।'

জাহানারার কথায় কোনো সংকোচ নেই। সে নিজেদের প্রাপ্যটা আগেই পরিষ্কার করে নিল।

জাহানারার কথা শুনে আমজাদ এক রকম হুমড়ি খেয়েই সিন্দুকের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে গয়নার পরিমাণটা আন্দাজ করতে চাইল, 'এর ভেতর কাগজপত্র যেন কি আছে?'

ডাক্তারবাবু এবার নিজেই হাত বাড়িয়ে ভেতর থেকে লাল মলাটের একটা খেরোখাতা বের করে আনলেন। খাতার ওপর হলদেটে একটা কাগজ সাঁটা। কাগজে লেখা আছে : শ্রীমান আমজাদ আলীর পড়ার খরচের সম্বাৎসরিক হিসাব। আমজাদও খাতাটা দেখে একটু স্তম্ভিত ও দিশেহারা ভাব দেখাল। কিন্তু মুখে কিছু না বলে তৈমুরের দিকে তাকালে তৈমুর সহসাই বলে বসল, 'শুনুন দুলামিয়া, ভাববেন না ও খাতাটা আমি লিখে রেখেছি। এটা আমার স্বশুর নিজেই লিখতেন। বলতেন, বিয়ের সময় নাকি কথা হয়েছিল আপনাকে পড়ার খরচ বাবদ প্রতিমাসে আড়াই শ' করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা কলকাতায় আপনার হোস্টেলের ঠিকানায় পাঠানো হবে। কিন্তু প্রতি মাসেই আপনি চিঠি লিখে যে বাড়তি টাকা চাইতেন সেটার হিসাব আমার শ্বশুর স্বয়ংই রাখতেন। আমাকে রাখতে বলতেন না। মানি অর্ডারও পোস্ট অফিসে গিয়ে নিজেই করতেন। আমরা জানি না আপনাকে মোট পড়ার খরচ বাবদ কত টাকা পাঠানো হয়েছে। সম্ভবত এটা সেই হিসাবের খাতা।'

তৈমুরের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা টের পেয়ে আমজাদ একেবারে চুপসে গেল। বিহারী বাবু বললেন, 'এ খাতাটা ডাক্তার বাবু আপনিই রাখুন, কারণ এ নিয়ে পরে ফ্যাসাদ হবে। মোল্লা সাহেবের ছোট মেয়ের জামাই যদি প্রাপ্যের অধিক অর্থ নিয়ে থাকেন তবে সেটাও বণ্টনের সময় বণ্টনকারীদের বিবেচনা করে দেখতে হবে বৈকি।'

এ কথায় আমজাদ একেবারে লা জওয়াব। আনু জাহানারার পাশে এসে মাথায় কাপড় দিয়ে এতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আমজাদ নিজেই খাতাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছে দেখে সে মুখ খুলল, 'বুবু, তোমাদের জামাইকে বল সিন্দুকের কাছ থেকে সরে আসতে। এটা আমাদের পারিবারিক বিষয়, এ দেশের মুরুব্বিরা সবাই এখানে আছেন। তারাই সয়সম্পত্তির ব্যাপারে ইনসাফ করবেন।'

আনুর কথায় আমজাদ নিঃশব্দে সিন্দুকের কাছ থেকে সরে এল, 'না না, আমি তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে গেলাম কখন? শহরের মুরুব্বিরা এখানে আছেন বলেই তো আমি এখানে এলাম।' বলে আমজাদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে কেউ থাকতে আহ্বান করল না।

জাহানারা এভাবে আমজাদের পালিয়ে যাওয়ার কারণটা আন্দাজ করলেও বোনকে বলল, 'ওকে কেন ওভাবে কথা বললি? ও থাকলে কার কি অসুবিধে ছিল? এখন কি না কি ভেবে বসে!'

'ভাবুক, সবকিছুতেই ওর থাকা আমি পছন্দ করি না বুবু। ও কেন ভাবে তোমরা আমাকে ঠকাচ্ছ?'

জাহানারা ফিসফিস করে বোনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'কাজটা বোধহয় ভালো হলো না। এ নিয়ে পরে তোকে খোটা শুনতে হবে, দেখিস।'

'কি খোটা দেবে তোমাদের জামাই? দেখলে না ওর নামের হিসাবের খাতাটা দেখেই ঘাবড়ে গেল? লেখাপড়ার নামে ও কি আমার আব্বাকে কম জ্বালিয়েছে? ওর ধারণা, ওসবের হিসাব বুঝি কেউ জানে না, কিন্তু আমরা তো জানি বুবু, আব্বা ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন, নিজে কষ্ট করে বড় হয়েছিলেন। একটা পাইও বিনা হিসাবে কাউকে দিলে তা লিখে রাখা তার অভ্যেস ছিল। খাতা দেখে সে পালিয়েছে। পালাক, টাকা টাকা করে আর বাপের বাড়ির হিস্যা আদায়ের জন্য ও আমাকে আব্বার ইন্তেকালের কয়েক বছর আগ থেকেই জ্বালিয়ে এসেছে। ঝাঁটা মারি অমন শিক্ষিত জামাইয়ের কপালে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা বোনের মুখের ওপর হাত চেপে ধরে বলল, 'থাম তো আনু, তোর কি হয়েছে?'

আনু চুপ করে মাথা নুইয়ে ফেলল।

ততোক্ষণে সিন্দুকের সবগুলো খোপের জিনিসপত্র, দলিল দস্তাবেজ ও টাকা-কড়ি ডাক্তার নন্দলালের নির্দেশে তৈমুর বের করে এনে সকলের সামনে একটা শ্বেতপাথরের টেবিলে সাজিয়ে রাখছে।

ডাক্তার বাবু বললেন, 'আর কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না বিহারি দা। তবে মোল্লা সাহেবের লেনদেনের মোটামুটি একটা ধারণা সিকান্দার রাখে। যদি মোল্লা সাহেবের কাছে কারো কোনো পাওনা থাকে কিংবা তিনি কারো কিছু ধেরে থাকেন সেটা শহরে ঢ্যাড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলেই হবে।'

'ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ডাক্তার কাকা, কেউ এখন পর্যন্ত কোনো দাবি নিয়ে আসেনি।'

এ ব্যাপারে মুরুব্বিদের নিশ্চিন্ত করল তৈমুর।

বিহারি বাবু কি ভেবে যেন বললেন, 'একটা কথা পরে ভুলে যাব বলে আগেই আপনাদের কাছে প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। আমি মোল্লা সাহেবের কাছ থেকে গত দাওয়া কাটার সময় এক হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম। নগদ টাকার খুবই দরকার হওয়ায় আমি ধারটা চেয়েছিলাম। তিনি খুশি মনেই দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো তাগাদাও দেননি। এখনই ঋণটা স্বীকার না করলে অধর্ম হবে ভেবে বিষয়টা আপনাদের জানালাম।'

জমিদার বাবুর কথায় কেউ কোনো শব্দ করল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রায় সকল মানুষই জানত, শহরের এই দুই বিত্তবান ব্যক্তির মধ্যে কোনো সুসম্পর্ক কোনোকালেই ছিল না। সবসময় এদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা লেগেই থাকত। এখন বোঝা গেল বাহ্যত এদের মধ্যে একটা রেষারেষি সবসময় লেগে থাকলেও বিপদে-আপদে এরা পরস্পরের সাহায্য ও লেনদেনে মোটেই কুণ্ঠিত ছিলেন না।

তৈমুর হঠাৎ নিচের দিকের একটা খোপে চাবি লাগিয়ে ডাক্তার নন্দলালের দিকে চোখ তুলে হাসল, 'এতে ক্যাশ টাকা রয়েছে ডাক্তার কাকা।' বলেই সে চাবি ঘোরাল, 'বের করব?'

ডাক্তার বাবু মাথা নেড়ে ইঙ্গিত দিতেই তৈমুর ভেতর থেকে ধাতুর কয়েনের বিশাল দু'টি থলে প্রথম টেনে বের করল, 'এ দুটোতে কেবল রূপোর টাকা রয়েছে। দুটোতে মোট হাজার পাঁচেক হবে।'

'তুমি তো তাহলে টাকা-কড়ির ব্যাপারে সবই জানো দেখছি?'

বললেন ফাদার জোনস।

'জি ফাদার, আমি টাকা-পয়সা যা আমার শ্বশুর নগদ রাখতেন তা জানি। কারণ নগদের গোণাগুণতি তিনি আমার হাত দিয়েই করাতেন। রাখতামও আমিই।'

তৈমুর স্বীকার করল নগদ অর্থের ব্যাপারটা তার অজানা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নোটের তাড়া তো দেখছি না?'

প্রশ্ন করলেন জমিদার বিহারি লাল চৌধুরী।

'তাও আছে, বের করব?'

'হ্যাঁ, সবই দেখাও। আমরা তো দেখতেই এসেছি।'

ডাক্তারের কথায় তৈমুর ভেতরে হাত দিল।

'এই এখানে বিশ হাজার টাকা, সবই একশ' টাকার কারেন্সি নোট।'

তৈমুর কাগজে মোড়ানো একশ' টাকার নোটের পাঁচটি বান্ডিল বের করে সামনে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। জমিদার বাবু অবাক হয়ে বান্ডিলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ তো অনেক টাকা ডাক্তার বাবু। এতো টাকা সম্ভবত এতদঞ্চলের কোনো ব্যবসায়ী কিংবা জোতদার-জমিদারের নেই। মোল্লা সাহেব এতো টাকা কোত্থেকে যে নগদ পেলেন তা আমার ভাবনায় আসছে না।'

তিনি একটু হাসার চেষ্টা করলেন। তার চোখে-মুখে একটু ঈর্ষাকাতরতার ছাপ স্পষ্টতই ফুটে উঠল। ফাদার জোনস ব্যাপারটা আন্দাজ করে বললেন, 'আমি জানি মোল্লা এ টাকা কোত্থেকে পেলেন এবং কেন সিন্দুকে জমা রেখেছেন।'

'আমিও জানি।'

পেছন থেকে কথা বলল সিকান্দার। মোল্লা সাহেবের খেত-খামারের ভাগচাষি, মরহুমের সর্বসময়ের সঙ্গী।

'এ টাকা গত আড়াই বছরে মোল্লা পাটের ব্যবসায়ে নারাণগঞ্জের পাটের বৃটিশ আড়তদারদের থেকে লাভ করেছেন। কয়েকদিন আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি এবারের মওসুমে লাখপতি বনে যাবেন। এখন নাকি তার গুদামে নিজের ও অন্যের কাছ থেকে কেনা দু'হাজার মণ কাঁচাপাট মজুদ আছে। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন, আমার ফ্রেন্ডের বাসনা পূরণ হলো না। আমি খুবই দুঃখিত।'

ফাদার জোনস বন্ধুর জন্য আক্ষেপ প্রকাশের সাথে সাথে মোল্লা সাহেবের জমা টাকার উৎসের আসল হদিস দিলেন। এতে জমিদার বিহারি বাবুর চোখে সহসা এক ধরনের লোভের আলো খেলে গেল।

'নারায়ণগঞ্জের চটের মিলের সাহেবদের সাথে আপনিই তো মোল্লার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যতদূর জানি সাহেব সুবেরা এদিকে এলে তো মিশনে আপনার অতিথি হয়েই থাকেন।' ইঙ্গিতময় হাসি হাসলেন জমিদার বাবু, 'আমাদের দিকেও একটু নজর দেবেন ফাদার। জমিদারির ওপর তো একালে আর ভরসা রাখা যাচ্ছে না।'

বিহারি বাবুর কথায় মৃদু হাসলেন ফাদার জোনস, 'আপনারা তো প্রজার ওপর জুলুমটিই ভালো বোঝেন চৌধুরী বাবু, ব্যবসায় আপনাদের কাজ নয়। মোল্লা সাহেবও বড় জমিদার ছিলেন। তিনি জমির ওপর ভরসা ছেড়ে আমার কথায় পাটের ব্যবসা ধরলেন আর লাল হয়ে গেলেন। বাঙালিদের এমন ব্যবসাবুদ্ধি আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। তিনি যেমন দিতে জানতেন, তেমনি নিতেও জানতেন। আমাদের গির্জার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য জমিটা তিনি এ কথায় দিয়ে দিলেন।' বিস্মিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল ফাদারের মুখে, 'আমরা সাহেব হই আর নেটিভ খ্রিস্টান, এই উদারতার কথা আমরা কোনোদিন ভুলব না। তিনি নেই, তার ছেলেমেয়েরা যাতে দাঁড়াতে পারে সেটা আমরা লক্ষ রাখব। এটা আমার প্রমিজ।'

৪

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে বাদশা মোল্লার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটা হিসাব হলো। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা মোল্লা সাহেবের বন্ধু বা প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন তারাও তার বিপুল বিত্তের পরিমাণটা প্রথমে আন্দাজ করতে পারেননি। এখন সকলেই বিস্মিত। মোল্লা প্রথম জীবনে যে খুব সচ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন তার সুহৃদ কিংবা বিপরীতরা তা স্বীকার করেন না। প্রথম জীবনে তিনি কিছু জোত-জমির মালিক ছিলেন বটে, কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র খুব একটা প্রশংসনীয় ছিল এটা কেউ স্বীকার করে না। শোনা যায় যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি আফিমের নেশায় আসক্ত ছিলেন এবং বাজারের খারাপ পাড়ায়ও তার যাতায়াত ছিল। তবে তার পরিবার ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল ধর্মীয় পরিবার। অতি প্রাচীনকালে নাকি এ পরিবার ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এতদঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। সুলতানি আমলের গোড়ার দিকে সম্ভবত এরা পাঠান সুলতানদের সৈনিকবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু নিজেরা পাঠান ছিলেন না। এরা মধ্যপ্রাচ্য কিংবা পারস্যের অতি দরিদ্র যাযাবর শ্রেণির আলেম সমাজেরই উত্তরাধিকারি হবেন। এরা মহাদেশগুলোতে ইসলামের দিগবিজয়ী বাহিনীর পশ্চাৎ অনুসরণকারী হাফেজ ও ক্বারীর বংশ। যার যেখানে খুশি এরা ছুটে বেড়াত দেশ-দেশান্তরে। খেলাফতের পতনের পর এরা মুসলিম রাজ-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার আশায় হিন্দুস্তানেও প্রবেশ করে এবং বাংলার ভাটি অঞ্চলের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে নওমুসলিমদের কাছে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের পবিত্র কুরআন-হাদিস শিক্ষাদান এবং শরিয়তের আদব-লেহাজ শিক্ষা দেয়ার জন্য ধীরে ধীরে দু'এক ঘর করে থেকে যেতে থাকে। হিন্দুস্তানে মুসলিম বাদশাহ ও আঞ্চলিক আমীর-ওমরা ও নবাবদের পতনের পর এরাই ধর্ম হিসেবে ইসলামের খেদমতে নিজেদের বিলিয়ে দেয়। এরা ইংরেজি শিক্ষার ঘোর বিরোধি ছিল। এদের দৃঢ় আশা ছিল হিন্দুস্তানে মুসলিমরা পুনর্বার অচিরেই তাদের হৃত রাজ্য ও গৌরব পুনরুদ্ধার করবে। কিন্তু তাদের সে বাসনা নানা কারণেই ফলবতী হয়নি। তবে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলিম অভিজাতদের, বিশেষ করে কৃষিনির্ভর জোত-জমির মালিকদের পেছনে ফেলে এগুতে থাকলে এদের টনক নড়ে। পরে দেখা যায়, ওই আলেম-ওলামাদের সন্তানরাই মাদরাসা শিক্ষার সীমা পেরিয়েও ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। ততোদিন দেড় শতাব্দী পার হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদশা মোল্লার পরিবারও তেমনি একটি পরিবার। বৃটিশ শাসনের প্রতি হঠাৎ এদের মানসিক আনুগত্য বাড়ার ফলে পরিবারের ভেতর ইসলামি শরিয়তের বাঁধন স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা শিথিল হতে থাকে। মোল্লা সাহেব ছিলেন সেই শিথিলতা যুগেরই সন্তান। প্রথম জীবনে কঠোর নৈতিকতার শাসন তিনি মানেননি কিংবা বলা যায় মানতে পারেননি। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সবচেয়ে প্রশস্ত সড়ক ও বাজার—আনন্দবাজারের এক মুসলিম কাপড় ব্যবসায়ীর গোমস্তা হিসেবে জীবন শুরু করেন। বাজারই ছিল তার প্রথম যৌবনের ধ্যানজ্ঞান। বাজারেই তিনি দিবানিশি থাকতেন এবং তার শত্রুদের ধারণা বাজারের খারাপ পাড়ায়ও তার যাতায়াত ছিল। সম্ভবত সেখান থেকেই আফিমের নেশা ও অর্থের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আসক্তি লাভ করেন।

নিজের অপরিসীম অধ্যাবসায় এবং সৌভাগ্যের ফলেই বাদশা মোল্লা পরবর্তী জীবনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের একজন ধনী ও মান্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। যে দোকানে তিনি একদা একজন সামান্য দোকান কর্মচারী ছিলেন, সেই দোকানের মালিকের মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা দোকানটি বিক্রি করে দিতে চাইলে বাদশা মোল্লা নিজের সামান্য জমিজমা বন্ধক রেখে দোকানটা কিনে নেন। এরপর থেকেই শুরু হয় তার সৌভাগ্যের সূচনা। ভাগ্যের সুফল ফলতে শুরু করলেই অন্যান্য মুসলমান সচ্ছল ব্যক্তির মতো তাকে মাটির নেশায় পেয়ে বসে। তিনি জমি কিনতে শুরু করেন। তিতাস নদীর এপার-ওপার যত ধানি জমি, খিলখেত, চারণভূমি ও চর কেনাবেচা হতো, সবই তিনি ধীরে ধীরে কিনে নিতে লাগলেন। তাছাড়া ছিল সরকারি নিলাম ও বন্দোবস্তের ডাক। ঐসব ডাকে পুনিয়টের খাঁদের, কৃষ্ণনগরের জমিদার পরিবারের লোকদের, বংশী মাস্টারের মতো ঘোষপাড়ার বড় জোতদারদের তিনি কলা দেখিয়ে একে একে সরকারের মাইল মাইল বিস্তৃত খাস জমি ও পশুচারণ ভূমিগুলো কিনে নিতে থাকেন। তার পূর্বপুরুষেরা যাযাবর আলেম শ্রেণির মানুষ হলেও, তাদের রক্তে যে সামন্তবাদের আদব-লেহাজ-লোভ ও গৌরব ছিল, বাদশা মোল্লার স্বভাবের মধ্যেও তা সংগুপ্ত ছিল। তার মাটির ক্ষুধা ছিল অপরিসীম। অল্পকালের মধ্যে তার জোতজমির পরিমাণ তাকে স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের প্রায় সমকক্ষ করে তুলল। শত্রুতা ও ঈর্ষা বৃদ্ধি পেল। শুরু হলো জোতজমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা। এসব করার জন্য ক্ষুরধার বুদ্ধি আর লোকবল দরকার। বাদশা মোল্লার লোকবল অর্থাৎ লাঠিয়ালের অভাব হলো না। কারণ, স্থানীয় মুসলমান চাষি ও ভূমিহীনরা এতকাল হিন্দু জমিদার জোতদারদের শোষণ-পেষণে জর্জরিত ছিল। তারা সকলেই বাদশা মোল্লার পক্ষে এসে দাঁড়াল। মৌড়াইল গাঁয়ের লাঠিয়ালদের ভয়ে সারা শহর তখন কম্পমান। আঞ্চলিক বিবাদ-বিসম্বাদের ফয়সালার জন্য শহরের বা এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির মতো বাদশা মোল্লাকেও এখন আর না ডাকলে চলে না। অল্পকালের মধ্যেই মোল্লা সাহেবের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সুবিচার ও ইনসাফের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শক্তি ও সুবিচার তাকে ক্রমাগত ওপরের দিকে ঠেলতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যে বিদ্যা ও বুদ্ধির জোরে হিন্দু জমিদাররা বাদশা মোল্লাকে তাদের শ্রেণিভুক্ত করতে অসম্মতি জানাতে থাকে সেটা হলো শাসক শ্রেণির সাথে তাদের সম্পর্ক এবং ইংরেজি শিক্ষার বাহাদুরি। লাঠি ও অর্থের জোর থাকলেও মোল্লা সাহেবের পরিবারে ইংরেজি শিক্ষিত কোনো সদস্য ছিল না। এ অভাব পূরণের লক্ষ্যে তিনি মেয়েদের জন্য ইংরেজি শিক্ষিত ছেলে খুঁজতে থাকেন। এতে তিনি যে খুব একটা সফল হয়েছিলেন তা মনে হয় না। তবুও তিনি যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি তা তার বন্ধুরা সবাই জানত। ইংরেজি না জানার ফলে হিন্দু জমিদারদের মতো শাসক শ্রেণির সাথে দহরম মহরমের জন্য কলকাতা, দিল্লি কিংবা ভারতের অন্য কোথাও বিচরণ তার সম্ভব ছিল না। কলকাতায় নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি কোনো বাড়ি নির্মাণ করেননি। তিনি জানতেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বি হিন্দু জমিদারদের ছেলেরা কলকাতায় শিক্ষাদীক্ষার নামে কেবল লাম্পট্য করে বেড়ায়। তার ছেলেদের জন্য এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল জীবন তিনি পছন্দ করতে পারেননি। অবশ্য তার ছেলেরাও ছিল তার পড়ন্ত বয়সের সন্তান। তার মেয়েরাই ছিল তার প্রথম যৌবনের সন্তান। মেয়েদের তিনি ইংরেজি শিক্ষা না দিতে পারলেও মূর্খ রাখেননি। সকলেই প্রথাগত শিক্ষায় অল্পবেশি শিক্ষিত। মেয়েরা স্থানীয় মিশনারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সকলেই স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোতে পাঁচ-ছয় বছর পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিল। তবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মোল্লা সাহেব উপযুক্ত পাত্র দেখে তাদের বিয়ে দিয়ে দেন। তার অন্য জামাতারা সকলেই ইংরেজি শিক্ষিত। তবে বড় মেয়ে জাহানারাকে তিনি বিয়ে দেন নিজের ভাইয়ের বেটা তৈমুরের সাথে। তৈমুরের লেখাপড়ার দৌড় প্রবেশিকা পর্যন্ত হলেও তার অন্যান্য গুণ মোল্লা সাহেবকে আকর্ষণ করে। সে চাচার ব্যবসায়-বাণিজ্যে কিশোর বয়স থেকে সাহায্য করে এসেছে এবং মোল্লা সাহেবের খুবই বিশ্বস্ত। মোল্লা সাহেবের দোকানদারির চেয়ে জমিজমার দিকেই প্রথম জীবনে লক্ষ্য ছিল বেশি। কিন্তু তৈমুর তার কাপড় ও জুতার ব্যবসাকে এমনভাবে জাঁকিয়ে তোলে যে, নগদ টাকায় সিন্দুক ভরে যায়। তাছাড়া জাহানারা ও আনোয়ারার এক জ্যেষ্ঠা বোনকে তিনি স্থানীয় একজন ইংরেজি শিক্ষিত ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে ঠকেছেন। ঠকেছেন অবশ্য ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে। শ্বশুরের খরচে ছেলেটি বিলেতে পড়তে গিয়েছিল। মোল্লা সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোয়ারা তখন সন্তানসম্ভবা। সন্তান প্রসবকালে নবজাতকসহ মনোয়ারা ইন্তেকাল করে। কিন্তু মানবতার খাতিরে মোল্লা প্রবাসী জামাতার পড়ার খরচসহ প্রবাসকালীন যাবতীয় ব্যয় চালিয়ে যান। ছেলেটি উচ্চশিক্ষা শেষ করে এসে শ্বশুরের কাছে তার অন্য যে কোনো একটি মেয়েকে গ্রহণ করতে চায় কিন্তু মোল্লা সাহেব কি ভেবে যেন শেষ পর্যন্ত অসম্মত হন। উচ্চশিক্ষিত জামাইটি মুক্তি পেয়ে অন্যত্র বিয়ে করে।

এর মধ্যে নিজের এবং পরিবারের ইংরেজি শিক্ষার অভাবে শাসক শ্রেণির সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তোলা তিনি একান্ত দরকার মনে করেও করতে পারেননি, তা পূরণ করার এক মুল্যবান সুযোগ জুটে যায়। স্থানীয় খ্রিস্টান মিশনের প্রোটেস্ট্যান্ট ফাদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মি. জোনস পাকা গির্জা, মিশন স্কুলের পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণের প্রয়োজনে একখণ্ড উপযুক্ত জমির জন্য বাদশাহ মোল্লার শরণাপন্ন হলে তিনি এককথায় ফাদারকে প্রায় পাঁচ বিঘার মতো জমি বিনামূল্যে দান করে দেন। এতে মি. জোনস একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং মোল্লা সাহেবের সাথে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। ফাদারও চেষ্টা করতে থাকেন কিভাবে এই প্রভাবশালী মুসলিম ভূস্বামীকে তার আওতার মধ্যে সাহায্য-সহায়তা করতে পারেন। মওসুমের সময় নারায়ণগঞ্জের চটকলের মালিকরা আশুগঞ্জের দালালদের সাহায্যে পাট কেনার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এলে খ্রিস্টান মিশনে অবস্থান করত। ফাদার এ সুযোগ গ্রহণ করে বাদশাহ মোল্লাকে কাঁচা পাটের ব্যবসার দিকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ইংরেজ চটকল-মালিকদের কাছ থেকে আগাম বিপুল অর্থ মোল্লাকে নগদ হাতে ধরিয়ে দিয়ে পাটের ব্যবসায়ে নামিয়ে দেন। মোল্লার মাটির মোহ ছুটে গিয়ে এক অকল্পনীয় ব্যবসায়িক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সবচেয়ে ধনী, শাসক শ্রেণির সবচেয়ে অনুগত এবং এলাকাবাসী মুসলমানদের কাছে একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

রাতে মাঝের ঘরটায় আনু তার ছেলেমেয় ও স্বামীসহ শুয়েছে। বাড়িটা এখন একটু নিস্তব্ধ। রাত এগারটা। একটু আগে বাড়ির মুনিমানুষ ও কাজের মেয়েরা যাদের রাতেরবেলায় অন্দরে থাকার অনুমতি নেই, যাদের বাড়ি আশপাশেরই কোনো গাঁয়ে কিংবা মৌড়াইল গাঁয়েরই পশ্চিমদিকের পাড়া-বস্তিতে, তারা সকলেই রাতের খাওয়া খেয়ে কিংবা পুটলিতে বেঁধে গেটেরই বাইরে চলে গেছে। ফলে বাড়িটা এখন নিঃশব্দ। তবে মোল্লাদের এই নতুন বাড়িটা খোলা মাঠের মধ্যে হওয়ায় শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। দলবেঁধে ডাকছে শেয়ালগুলো। দু'একবার সম্মিলিত হুক্কাহুয়ার পরই বাড়ির কুকুরগুলো জবাবে মহাচেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। এ বাড়িতে শখ করে কেউ কুত্তা পোষেনি। এমনিতেই কোত্থেকে যেন এসে জুটেছে। থাকে অন্দরের বারান্দায়। বিশাল বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে পর্যন্ত কুকুরের দাপানি ও ছোটাছুটির শব্দ শুনে আমজাদ আনুকে ডাকল, 'এই শুনছ?'

'শুনছি। বাড়িতে ডাকাত পড়েনি আমি জানি। শেয়াল ডাকল কুত্তাও ভোঁকে।'

'গয়নাগাটির কিছু অংশ তুমি পাবে না?'

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় না হলেও এ মুহূর্তে আমজাদ যে এ প্রশ্ন করবে আনু তা আন্দাজ করতে পারেনি।

'আমি ভেবেছিলাম শেয়াল আর কুত্তার ডাকে বুঝি তোমার ঘুম ছুটে গেছে। তুমি তো আসলে আমার মরা মায়ের জড়োয়া গয়নাগুলোর ডাকে ঘুমোতে পারছ না।' আনু স্বামীর দিকে পেছন দিয়ে পাশ ফিরল, 'এখন ঘুমোও। আমার আত্মীয়-স্বজন অবিবেচক নন। আমার প্রাপ্যটা আমি পাব। তবে তোমার অতিরিক্ত টাকা নেয়ার বিষয়টা ভাগের সময় উঠবে। তুমি, আল্লাই জানেন কি পরিমাণ নিয়েছ?'

'এখন টাকার কথা রাখ, এদিকে একটু ফেরো না। মুখ ঘুরিয়ে নিলে কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুর বাহুমূল আকর্ষণ করে আমজাদ জবাব দিল। তার গলা একটু কামনা-কাতর।

আনু পাশ ফিরতেই আমজাদ তাকে বুকের বেতর টেনে আনল, 'গয়নার একটা ভাগ তোমার চাই। যেভাবেই হোক আদায় করবে।'

'আদায়ের প্রশ্ন আসে কেন? আমার মায়ের জেওর আমি এমনিতেই কিছু পাব। যদিও আমার বিয়ের সময় আমার আম্মা বিশ ভরির ওপর সোনাদানায় আমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সবই তো আমার আছে। না পেলে আফসোস কেন?'

আমজাদ সহসা থমকে গেল, 'এসব কি বলছ আনু? মায়ের স্মৃতিচিহ্ন তোমার কাছে কিছু থাকবে না?'

'দেখ, আনু স্বামীর লোভী কণ্ঠস্বরের আভাস পেয়েই ঠেলে সরিয়ে দিল, 'তুমি এ পর্যন্ত যা নিয়েছ এর কিছুরই আভাস আমাকে দাওনি। কলকাতায় তুমি পড়তে গিয়েছিলে। সেখানে তোমাকে প্রতিমাসে আড়াইশো করে নিয়মিত আব্বা পাঠাতেন। অনেক রাজাগজার ছেলেও মাসে আড়াইশো টাকা পড়ার খরচ পায় না। তারপরও তুমি কেন আব্বার কাছ থেকে টাকা চেয়ে পাঠাতে? নাকি সেখানেও একটা মাগ করে রেখেছ?'

'বাজে বকো না। আমি রাজার ছেলে না হই, আমি যাদের সাথে লেখাপড়া করেছি তারা তো সবাই নবাব-জমিদারের ছেলে। সবাই জানে, আমার শ্বশুর ভাটি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী। তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে বুঝলে?'

'তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কত নিয়েছ এর হিসাব যদি না রেখে থাক, এখন হিসাব হবে। বেশি নিয়ে থাকলে বাটোয়ারার সময় শোধ দিয়ে নিতে হবে।'

আনুর কথায় আমজাদ কতক্ষণ চুপ করে থাকল। সে আর স্ত্রীর দেহের দিকে এগুবার স্ফূর্তি পেল না।

'আমার কিছু টাকা বেশি নেয়ার জন্য তোমার প্রাপ্য থেকে ওটা বাদ যাবে কেন? তোমার বড়বোন আর ভগ্নিপতি যে বছর বছর এ বাড়িতে পড়ে খায়। তোমার বোন কখন কিভাবে কাছে থাকার সুযোগে লুটে নিচ্ছে এটাও তো দেখতে হবে। ফয়সালা করতে হলে সবকিছুই ফয়সালা হওয়া উচিত। এর ওপর এখন এ দেশের মুরুব্বিরা তোমার ধড়িবাজ বোন জামাইয়ের ওপরই সবকিছুর ভার দিয়ে গেলেন। বললেন নগদ টাকাকড়ি ও স্থাবর এখন বন্টন হবে না। কেবল অস্থাবর যা কিছু আছে সেটা বন্টন হবে। এর মধ্যে যদি আমার শাশুড়ির সোনাদানার ভাগও তুমি না পাও, তাহলে আমরা কি কলা চুষব?'

'মায়ের জেওরের অংশ বুবু আমাকে দেবে।'

আনু আবার পাশ ফিরে শোয়ার চেষ্টা করলে আমজাদ তাকে টেনে রাখল, 'মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন?'

'কি বলবে বল?'

'জেওরের অংশ দেবে মানে কি? আমার অতিরিক্ত নেয়ার বিষয়টা আবার উঠবে না তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুবু বলেছেন দুলাভাই তা তুলতে দেবেন না আমি বুবুকে বলেছিলাম।'

'বলেছিলে? চমৎকার মেয়ে তুমি, তোমাকে তো আমি এটাই বোঝাতে চাইছিলাম। তোমার বোনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি ওই অপয়া খেরো খাতাটা গায়েব করে দিতে পারতে তাহলে যে কি ভালো হতো না আনু! কেউ বলতে পারত না আমি ভাগের চেয়েও বেশি নিয়েছি।'

আনুকে সবলে নিজের বুকের মধ্যে আকর্ষণ করল আমজাদ, 'নিজের স্বার্থের ব্যাপারে যার সাথে যে ব্যবহার করা দরকার তা তোমাকে করতে হবে আনু। নইলে পরে আফসোস করে মরতে হবে।'

আনু স্বামীকে হাত দিয়ে যথাসম্ভব ঠেলে ঠেকিয়ে একটু অভিমানভরা কণ্ঠে বলল, 'এখন অত আদর করছ কি আমার বাপের বাড়ির সম্পত্তির জন্য? শোন, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। এ শহরের গণ্যমান্য লোকেরা আমার নাবালক আপন ও সৎভাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে দোকানপাট, জমিজমা ও নগদ টাকাকড়ি ভাগ-বাটোয়ারায় নিষেধ করেছেন। নগদ টাকা ভাগ হয়ে গেলে তৈমুর ভাই দোকান-পাট আর পাটের ব্যবসায় এই মুহূর্তে চালাতে পারবেন না। তিনি যাতে সবকিছু ধরে রাখতে পারেন, অন্তত আমার ভায়েরা মাথা তুলে না দাঁড়ান পর্যন্ত, সেদিকটা তোমার-আমার বিবেচনা করতে হবে। অধৈর্য হয়ো না। সবই আমি পাব। বিষয় ভাগ হলো না বলে গয়নার ভাগ আমি বুবুর কাছে চেয়েছি। এ ব্যাপারে বুবুকে রাজি করিয়েছি তোমার অতিরিক্ত নেয়ার খাতাটার কথা যেন তৈমুর ভাই এবং বুবু না তোলেন। আমার বোন বিষয়টা চেপে রাখতে তৈমুর ভাইকে রাজি করিয়েছেন। তুমি খালি হাতে এ বাড়ি থেকে যাচ্ছ না।'

'খুবই বুদ্ধিমতির মতো কাজ করেছ।'

আমজাদের গলায় নিরুদ্বিগ্ন খুশির শব্দ।

'এখন তাহলে বল তুমি কি পরিমাণ অর্থ আব্বার কাছ থেকে নিয়েছিলে? বুবুর জামাই হয়ত বুবুর চাপে বিষয়টা তুলবেন না। তবে নন্দ কাকা আর সিকান্দার চাচার তো অজানা থাকবে না।'

আনু এখন ভয় পাচ্ছে যে তার স্বামী হয় এমন বিপুল অর্থ পিতার কাছ থেকে একটু একটু আদায় করে নিয়েছে, যে টাকার হিসাব হলে এখন তার মূল প্রাপ্য নিয়েই অংশীদাররা প্রশ্ন তুলবে।

'বুবুকে বল ওসব এখন একদম চাপা দিয়ে দিতে। তিনি তো তোমার আপন বোন, তিনি ঠিকই পারবেন। আর ওসব ডাক্তার-ফাক্তার আর ভাগচাষির জানাজানিতে কচু হবে। যা নিয়েছি, নিয়েছি। আমার শ্বশুর পড়ার বাবদ অতিরিক্ত দিয়েছে। ওসব এখন ধামাচাপা দিতে হবে। কত নিয়েছি আমি কি মনে করে রেখেছি নাকি যে আমাকে পরিমাণটা জিজ্ঞেস করছ?'

'আমি জানি তুমি বিপুল অর্থ নিয়েছ। কি কথা বলে আব্বাকে বাধ্য করেছিলে তা আল্লাহই জানেন আর তুমি জান।'

আনু আবার পাশ ফিরল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের ঘরের অর্থাৎ পশ্চিমের কামরায় জাহানারা তৈমুর প্রাচীন খাটে নতুন তোষক পেতে বিছানা সাজালেও রাত এগারোটা পর্যন্ত বালিশে কেউ মাথা রাখতে পারেনি। একটু আগে বাজারের দোকানপাট বন্ধ করে ক্যাশ মিলিয়ে তৈমুর ফিরেছে। টাকার থলে পাশের ঘরের সিন্দুকে রেখে আসবে এখন সে উপায় নেই। আনোয়ারা 'ছোট জামাইকে নিয়ে ও ঘরে থাকায় তৈমুর টাকার থলেটা জাহানারার হাতে দিয়ে বলল, 'থাক, ডাকাডাকির দরকার নেই। ক্যাশটা তোমার কাছেই কোথাও সামলে রাখ। এ ঘরের আলমারিতে তালা নেই, আলমারিতে টাকাকড়ি রাখাও বোধহয় ঠিক হবে না। খাটের শিথানেই বালিশের নিচে রেখে দাও। টাকার থলেটা স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তৈমুর পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে লাগল, 'মাহমুদ এ ঘরে শোবে না?'

'তোমার ছেলে এ ঘরে আমাদের সাথে থাকতে চায় না। বলে, আমি আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকব। রাতের খাবার খেয়ে আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।'

'ও বাড়িতে একা থাকতে ওর ভয় লাগবে না।'

'আমিও তো ও কথাই ওকে বললাম। বলে ভয় কিসের, আমার বিছানায় গিয়ে আমি শোব। সব সময় থাকি না? কই ভয় তো লাগে না।'

'আর অমনি ওকে যেতে দিলে?'

'আর ভয়ের কিছু দেখি না, তোমার ছেলে যেন একটু কেমন ধরনের এতটুকু বয়স থেকেই তো আমাদের বিছানায় থাকতে চায় না। বলে, আমি অন্য ঘরে শোব। তোমার ছেলের মধ্যে ভয়ডর নেই। সারারাত বাতি জ্বেলে ঠাকুরমার ঝুলি পড়বে, বোঝ না?'

'বুজি, তবুও একটা খালি বাড়িতে ওকে থাকতে পাঠানো বোধহয় ঠিক হয়নি। আর গল্পের বই পড়ার যে নেশায় পেয়েছে এতে না আবার স্কুলের পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকে।'

তৈমুর পাঞ্জাবিটা খুলে আলনায় রাখল।

জাহানারা ততোক্ষণে টাকার থলেটা পালঙ্কের শিথানের তোষক তুলে সামলাতে ব্যস্ত।

'বলে তো এবার ফার্স্ট হবে। উবুড় হয়ে সারা বিকেল আমাদের পুকুর পাড়ের সিঁড়ির ওপর ওসব পড়ছিল বলে ধমক দিয়েছিলাম। হেসে বলল, পড়ি তাতে কি? পড়তে নাকি ওর খুব ভালো লাগে। স্কুলের পড়ার ফাঁকি হচ্ছে বলায় তোমার ছেলে হেসে বলল, এবার আমিই ক্লাসে ফার্স্ট হব, দেখে নিও। আমি আর কি বলব?'

তৈমুর আর কোনো কথা বলল না।

জাহানারা বলল, 'ভাত কি এখানেই বেড়ে আনব, না পাকের ঘরে যাবে?'

'যাও। হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে তৈমুর দুয়ার ভেজিয়ে ঘাটলার দিকে চলল।

খাওয়ার পর দু'জনই খাটে এসে শুয়ে পড়ল। গায়ে লেপ তুলতে তুলতে তৈমুর বলল, 'চাচা যে ব্যবসা-বাণিজ্য এভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন তা যদি আগে জানতাম তাহলে এ পরিবারের হাল ধরার দায়িত্বটা আমি নিতাম না। অথচ দেখ তার কায়কারবারে আমি আমার ছোটবেলা থেকে খাটছি।' তৈমুর লেপের একটা অংশ সযত্নে স্ত্রীর গায়ের ওপর তুলে দিল, 'আমি আমার সাধ্যমতো তার জানা-অজানা সবকিছু রক্ষার চেষ্টা করব, কিন্তু এটা তোমার জানা উচিত আমাদের আপনজনই বলবে তৈমুর রাজার ভাণ্ডার লুটে খাচ্ছে।'

'বলুক। তা বলে আমার নাবালক ভাইবোনদের তো আমি দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে নিজের সুখ-সাচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারি না।' জাহানারা স্বামীর দিকে পাশ ফিরল, 'কেউ এর মধ্যেই কিছু বলেছে?'

'এখনও বলেনি। তবে বলার আলামত টের পাচ্ছি।'

'কীভাবে?'

'আমজাদ মিয়া চৌধুরী মশায়কে বলেছে বুবুর জামাই এত বড় ব্যবসা-বাণিজ্য সামাল দিতে পারবে না। আপনাদের উচিত ছিল বাজারের দোকানপাট গুটিয়ে পাটের কারবারটার ভারই তাকে দেয়া। আর জমিজমা শরিকদের মধ্যে আজ হোক কাল হোক ভাগ-বাটোয়ারা করতেই হবে। ফসলি সম্পত্তি ভাগ না করা নাকি সুবিচারের কাজ হয়নি। যার যার পাওনা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়াই নাকি ভালো ছিল। আনুর নাকি খুবই টাকার দরকার ছিল অথচ ঘরবাড়ি, মাঠ, গরুবাছুর কিছুই এখন ভাগ না হলে আনু কোন সান্ত্বনায় বাড়ি ফিরবে?'

'আনু কখনও এ কথা বলেনি। আজ বিকেলেও আনু বলেছে জমিজমা বণ্টন না হওয়াতে সে খুশি। সে তোমার ওপর ভরসা করে। বলল তৈমুর ভাইয়ের হাতে তার পাওনা ছেড়ে যেতে তার একটুও আপত্তি নেই। সে খুশি মনেই ময়মনসিংহ ফিরে যাচ্ছে।'

জাহানারা স্বামীর মাথার চুল বিলি করতে করতে বোনের সাফাই গাইল।

তৈমুর অন্ধকারেই একটু হাসল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে ডালপালায় আচ্ছন্ন টুকরো চাঁদের আলো এসে পড়েছে জাহানারার বুকের ওপর। কিন্তু মুখের ওপর প্রাচীন কুলগাছটার ছায়া এসে পড়ায় মুখটা অন্ধকার।

'বিপদ তোমার বোন বা ভগ্নিপতির হবে না। বিপদ বাঁধাবে তোমার মায়েরা। তোমার ভগ্নিপতি একটু লোভী হলেও তোমার অন্য ভাইবোনদের একেবারে ভাসিয়ে দিতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু দলিলের ওপর টেরচা সই দিতে পারে কেবল তোমার সৎ মায়েরা।'

'তাই যদি ভাবো তাহলে সব ধরে রাখার বৃথা চেষ্টা নিয়ে তুমি দোষি সাজতে গেলে কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি তো নিজের থেকে এ দায়িত্ব নিইনি। সকলে চাপিয়ে দিয়েছে। আমি জানি, এর পরিণাম তোমার-আমার জন্য ভালো হবে না। অংশীদাররা আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট থাকবে। সবাই ভাববে আমি লুটপাট করছি। কিন্তু আমি এ অবস্থায় কি করতে পারতাম?' জাহানারার দিকে ফিরল তৈমুর, 'শেষ পর্যন্ত তোমার আব্বার এই রাজ্যপাট কারো পক্ষেই ধরে রাখা সম্ভব নয়। আমি শুধু এই ভেবেই নিয়েছি যদি খসতে খসতেও কয়েক বছর কেটে যায়, তবে হয়ত তোমার নিজের ভাইয়েরা অন্তত সাবালক হয়ে উঠবে। যদিও এরাই তোমাকে একদিন সব কিছুর জন্য চোর বলে সাব্যস্ত করবে। কারণ তুমি এদের সহোদর বোন আর আমার ওপর দশজন হাল ধরার কঠিন দায়িত্বটা চাপিয়ে গেলেন।'

'আমার ভাইয়েরা তোমাকে চোর বলবে কেন?'

'প্রকাশ্যে হয়ত বলবে না, আড়ালে আবডালে বলবে।'

'আমার ভাইয়েরা যথার্থ মানুষ হলে এ কথা কোনোদিন বলবে না। আমাকে আব্বা বাড়িতে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন জান না? কেবল এদিনের জন্যই। আব্বা আগেই আন্দাজ করেছলেন তার হঠাৎ মৃত্যু হবে। কেউ কিছু বলবে এ জন্য তো আর তুমি এদের গাঙে ভাসিয়ে দিতে পার না।'

জাহানারা আবেগজড়িত গলায় বলল, 'আর এসব ছেড়েছুঁড়ে তুমি যাবেই বা কোথায়? তুমি নিজের জন্য তো এখনও কিছুই করোনি।'

'এখানেই আমার শ্বশুরের একটু চালাকি ছিল। তিনি আমাকে আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ দেননি। আমি একটা আলাদা দোকান করার কথা একবার সাহস করে তাকে বলেছিলাম। কথাটা শুনে তিনি যেন কেমন চমকে উঠেছিলেন। আমার এখনও মনে আছে। অনেকদিন আগের কথা অবশ্য, তোমার সাথে বিয়ের কিছুদিন পরই আমি জামসেদপুর টাটা কোম্পানিতে একটা চাকরি জোগাড় করেছিলাম। আমার কলকাতার এক মাড়োয়ারি বন্ধু কারবারে আমার সততা দেখে আর আমার পারিবারিক পরিস্থিতি জেনে দয়াপরবশ হয়ে আমাকে চাকরিটা পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি তার কাছ থেকে থানকাপড় কিনতাম। প্রায়ই হাজার পাঁচেক টাকা বাকি পড়ত। বেশি লাভের আশায় আমি তোমাদের দোকানের জন্য ওই বাড়তি মালটা আনতাম, কিন্তু নিজে এর কোনো লাভ বা ফায়দা নিতাম না। আমার শ্বশুর যেদিন জানলেন সেদিন তাকে খুব খুশি দেখেছিলাম। তার মেজাজ খোশ দেখে আমি আমার নিজের জন্য একটা আলাদা দোকানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তিনি চমকে গেলেন। যেন তার ওপর বাজ পড়েছে।'

'আব্বা কি বললেন?'

জাহানারা এ অবস্থায় তার ভয়কাতর ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে পারল না।

তৈমুর একটু অনুচ্চশব্দে হাসার ভঙ্গি করল, 'বললেন তোমার আলাদা দোকান করতে হবে না। জানুকে আমি নিজেই একটা দোকান, ওই জগৎবাজারের কাটা কাপড়ের দোকানটা লিখে দেব। আর উপযুক্ত পুঁজি দেব যাতে তুমি নেড়েচেড়ে খেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার। তবে এখন তোমাকে কায়কারবারে পাক্কা হয়ে উঠতে হবে। আমি যখন বুঝব যে তুমি পারবে, তখন সব ব্যবস্থা হবে।' তৈমুর আবার হাসল, 'আমার শ্বশুর আমার আত্মনির্ভরশীর হওয়ার ইচ্ছেটা আন্দাজ করে ভয় পেয়েছিলেন।'

'আব্বার হয়ত তোমার জন্য অন্য কোনো ইচ্ছে ছিল। হয়ত হায়াতের অভাবে তা করে যেতে পারলেন না। তুমি তো জান তোমাকে আব্বা কতটা ভালোবাসতেন, বিশ্বাস করতেন।'

'সবই করতেন, তবে তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। আর ব্যবসায়ে নিজের লাভের স্বার্থ ছাড়া কিছু থাকে না জানু। তোমার আব্বারও ছিল না।'

'অকৃতজ্ঞ হয়ো না মাহমুদের আব্বা।'

জাহানারা স্বামীর মুখের কাছ থেকে নিজের বদনটা সরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে গেলে তৈমুর বলল, 'রাগ করছ কেন? আমি তোমাকে দুঃখ দেয়ার জন্য আমার চাচার গিবত গাইছি না। আমি কি জানি না তিনি আমাকে কতটা আপন ভাবতেন আর বিশ্বাস করতেন? তবুও তিনি যে পাক্কা ব্যবসায়ী ছিলেন এটা আমার চেয়ে কে বেশি জানে? ব্যবসা বিষয়ে তার কোনো আপনপর বোধ ছিল না। টাকা খাটিয়ে কতটা লাভ-লোকসান হবে তা তিনি আগেই খতিয়ে দেখতেন। এখানে কে মেয়ের জামায় আর কে ভাতিজা তা তার বিবেচনা পেত না। দেখলে না আমজাদ মিয়ার বাড়তি নেয়ার বিষয়টা তিনি কেমন নিজের হাতে হিসাব রেখেছেন। ওই হিসাবটা দশজন জানলে তোমার বোনের পাওনা কিন্তু বিশেষ কিছু থাকবে না।'

'ও কথা তুমি বলো না।'

জাহানারা লেপের ভেতর স্বামীর হাত চেপে ধরল।

'আমি ওসব তোমার খাতিরে না হয় তুললাম না। কিন্তু তোমার বড় মা আর ছোট জননী যদি বিষয়টা আন্দাজ করে থাকেন তবে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হবে। তারা কেউ আমার ওপর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার দিয়ে যাওয়াটা পছন্দ করেননি। তোমার ছোট মা শুনেছি ডাক্তার কাকাকে নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে আপত্তি করেছেন।'

'তার আপত্তিটা কি?'

'তার কথা হলো, জানুর জামাই দোকানপাট আর পাটের আড়ত দেখুক, কিন্তু ধানি জমির ছয়আনা অংশ তিনি পাবেন। জমিটা কেন এজমালি রাখা হলো? তিনি চান জমি-জিরাত ভাগ হয়ে যাক। এ বাড়ির দালানকোঠা, গোলা-গোয়াল-গরু আলাদা করে দেয়া হোক। তিনি তার নাবালকদের নিয়ে ভিন্ন পাকঘরে রাঁধবেন। এতে আবার তোমার বোন জামাই আমজাদ মিয়াও নাকি শামিল আছে। সেও চায় জমি-জিরাত বণ্টন হোক। এ অবস্থায় কতদিন শরিকদের তুমি ঠেকিয়ে রাখবে? মাঝখান থেকে সমস্ত দুর্নাম আমার ঘাড়ে চাপবে। আমার তো দেখছি একূল ওকূল দু'কূলই যাবে।'

তৈমুর গা থেকে লেপটা সরিয়ে বলল, 'পাছিনা ছুটেছে।'

'লেপ সরালে তো আবার একটু পরেই শীত লাগবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আবহাওয়াটা সবদিক দিয়েই আমার অসহ্য লাগছে জানু।'

'কূলের কথা কি জানি বললে?'

'বলছিলাম তোমাদের সয়সম্পত্তি রাখতে গিয়ে নিজের বোধহয় কিছুই থাকবে না। সকলের সন্দেহ—শোবা নিয়ে যখন এ বাড়ি থেকে বেরুব তখন যেন নিজের কিছুই থাকবে না। না দোকান, না পুঁজি। এ জন্য বলছিলাম তোমার বাপ পাক্কা ব্যবসায়ী ছিলেন। ঘরেও তিনি হিসাব ঠিক রেখেছেন। গত এক যুগ ধরে তোমাদের দোকানে গোমস্তাগিরি করছি তিরিশ টাকা মাইনেয়। এর আর কোনো বেশ কম হলো না। এখন রাজ্যের দায়িত্ব আমার ওপর অথচ মাইনে বাড়াবার লোক কবরে গিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়েছে।'

'তুমি নিজেই আরও কুড়ি টাকা মাইনা বাড়িয়ে নাও না। তুমি যখন সবই দেখাশোনা করছ তখন নিজের বুঝটা বুঝবে না কেন? এতে কে আর কি বলবে?' স্বামীকে আদর-সোহাগে যতটা পারে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে দু'বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল জাহানারা, 'আমি না হয় আম্মাকে বলব তোমাদের জামাই এখন তো শুধু দোকান নয় আমাদের সবকিছু দেখছে তার তো আর তিরিশ টাকা বেতনে পোষায় না। আমি তাকে আর কুড়ি টাকা বেশি নিতে বলেছি। আশা করি বড় আম্মা এতে অমত করবে না। আমি ছোটজনকেও বলতে পারি, যদি তুমি বল।'

'আমাকে হাসির পাত্র করো না।' স্ত্রীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল তৈমুর, 'এখন দশজনের অনুমতি ছাড়া আমি আর তা পারি না। এক হয় যদি যে তিনজন মুরুব্বি আমার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন তারা বিষয়টি বিবেচনা করেন।'

'আমি তাহলে ফাদার চাচাকে বলি। তিনি তোমাকে খুব পছন্দ করেন। আমি তাকে বললে তিনি অন্যদের সাথে পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা করবেন। তোমার দাবি তো ন্যায্য।'

জাহানারা গভীর নির্ভরতায় স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে থাকল। তৈমুর বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি মাহমুদের মা, কথাটা হলো আমি যখন তোমাদের পরিবারের অভিভাবকত্ব নিয়েছি তখন তোমার আর এ বাড়িতে বসবাস করা ঠিক হচ্ছে না। এতে অবশ্য তোমার নিজের ভাইদের একটু অসুবিধা হবে। তবে তারা তো এখন আর শিশু নেই, নিজের ভালোমন্দ বোঝার বয়স সকলেরই হয়েছে। তুমি না থাকলে অবশ্য তাদের পড়াশোনার তেমন তাগাদা থাকবে না। তোমার থাকাতেও যে খুব একটা আছে তা তো দেখি না। একজন সারাদিন গান-বাজনা-সিনেমা আর হুইলের ছিপ-বড়শি নিয়ে সারা এলাকার দিঘি, পুকুর আর নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যজন-ফুটবল নিয়ে মাতোয়ারা। কেউ ঠিকমতো স্কুলে যায় বলে মনে হয় না। মাসে মাসে স্কুলের বেতন আর গৃহশিক্ষকের বেতন দিচ্ছি। এ অবস্থায় তুমি আমাদের নিজেদের বাড়ি ফিরে গেলে তারা যে কেউ পানিতে পড়ে যাবে এমন মনে হয় না। বরং তুমি এ বাড়িতে না থাকলে আমরা লুটেপুটে খাচ্ছি বলে যে রটনা আড়ালে-আবডালে চলছে তা খানিকটা কমবে। আর আমার ভিটে-বাড়িটাও আবাদ থাকবে, উঠোনে ঘাস গজিয়ে যাবে না। তুমি কি বল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কি বলব? তুমি ভালো মনে করলে কালই নিজের বাড়ি চলে যাব। তুমি ভাব বাপের বাড়ি পড়ে থাকতে আমার সুখ লাগে?'

নিজের খোঁপাভাঙা বিপুল কেশরাশি স্বামীর মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে জবাব দিল জাহানারা।

'তাহলে বাড়িই চলে যাই চল।'

'কালই চলে যাব।'

'কালই যেতে আমি বলছি না, যখন তোমার বোন ও ভগ্নিপতি এখানে আছেন। আর তাছাড়া চল্লিশার পর জেয়াফতের ব্যবস্থা সামাল না দিয়ে তোমার চলে যাওয়াটা কেউ ভালো চোখে দেখবে না। জেয়াফত আমাদের পুরো গ্রামটাকেই দাওয়াত দিতে হবে। এ ব্যাপারে কার্পণ্য করলে তোমার নিন্দে হবে। বলবে বাপের শেষ কাজটাও গাঁয়ের মেয়েটা আর জামাই ভালো করে করল না। অথচ ডাক্তার কাকা আমাকে বলেছেন, জেয়াফত-নেমন্তন্নে তেমন আড়ম্বর না করতে।'

'তা বলে চার-পাঁচটা ষাঁড়ও জবাই দেবে না।'

'শুধু ষাঁড়ের গোস্তেই তো জেয়াফত হবে না, মণ মণ চাল, মশলা, লাকড়ি আর ঢাকা থেকে বাবুর্চি আনাতে হবে। অনেক টাকার ধাক্কা। এদিকে মওসুম যাচ্ছে, আরও কিছু পাট কেনা দরকার। চাহিদা অনুযায়ী এবার আরও হাজার মণ পাট কিনতে না পারলে নারায়ণগঞ্জের সায়েবরা অন্য আড়তদারের কাছে ছুটবে। সিন্দুকের টাকা দেখে তা তোমাদের ধারণা আমার হাতে অনেক টাকা। তোমার বাপের নতুন আড়তদারির ব্যবসার জন্য এ টাকা কিছুই না জানবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তৈমুর। যেন শ্বশুরের লেনদেনের বিপুলত্ব দেখে এখন সে ভীত। এত টাকা সে কোথায় পাবে?

'চৌধুরী কাকা যে বললেন তার কাছে কিছু পাওনা আছে। বিপদের সময় তার কাছে পাওনাটা চাইতে পার না?'

জাহানারাও প্রকৃতপক্ষে তার বাপের কায়কারবার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখে না। সে ছেলেমানুষের মতো পথ বাতলাতে একটু চেষ্টা করল মাত্র।

তৈমুর হাসল, 'এ সামান্য টাকায় কি হবে? তিনি অবশ্য টাকাটা তার দহলজে গিয়ে আনতে বলেছেন। ওতে কিছু হবে না।'

'তাহলে আমার মায়ের গয়না বাটোয়ারা করতে চাইছ কেন? ওখানে তো শতভরি সোনার জড়োয়া আছে। ওগুলো রেখে টাকা পাওয়া যায় না?'

'তা অবশ্য যায়। কিন্তু তোমার ভগ্নিপতি যে ওসবের ওপর ওঁৎ পেতে আছে।'

'থাকুক। আমার মায়ের জেয়র এই মুহূর্তে ব্যবসার কাজে লাগলে ওসব এখন ভাগের দরকার নেই। আমি আমার বোনকে বুঝিয়ে বললে সে মানবে।'

তোমার বোন মানবে, কিন্তু ভগ্নিপতি তোমার বোনের সাথে মহা অশান্তি সৃষ্টি করবে। আর ব্যবসাটা যেহেতু তোমাদের একার নয়, সকলেই এর লাভালাভের হিস্যা পাবে, সে কারণে আমি কি করে কেবল আমার শাশুড়ির অলঙ্কার বন্ধক রাখার প্রস্তাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিই? আমজাদ মিয়া কথা তুলবে না। এমন যদি হতো তোমার সৎ মায়ের জেওরও ওর সাথে বন্ধক দিয়ে টাকা আনার কথা হতো তাহলে এতে আপত্তির কিছু হতো না। ব্যবসায়ের লাভালাভ সকলের কিন্তু পুঁজির একটা বড় অংশ যদি তোমার মায়ের গয়নার বন্ধকি পুঁজি থেকে আসে তাহলে ছোট জামাইয়ের আপত্তি হবে না কেন? আমারও এতে আপত্তি আছে।'

স্ত্রীর দিক থেকে পাশ ফিরল তৈমুর। তার দু'চোখের পাতা বুঁজে আসছে।

'আমি তাহলে আমার সৎ মায়েদের বলি। তাদের কাছে যদি নগদ কিছু পুঁজি থাকে তাহলে পাট কেনার জন্য তোমাকে দিক। তাদের তো সোনাদানা বাক্‌সে পড়ে আছে। এখন ব্যবসায় খাটালে এতে যদি লাভ পায় তবে তোমাকে দেবে না কেন?'

তৈমুর কোনো জবাব দিল না। জাহানারা বুঝল, স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে। সে লেপ সরিয়ে নিজেও পাশ ফিরল। তারও পাছিনায় বুক ভিজে গেছে।

৬

মৌড়াইল মহল্লার সবচেয়ে প্রাচীন ভিটে-বাড়ির ওপর সবচেয়ে উঁচু আটচালা ঢেউটিনের ঘরটাই তৈমুরদের। প্রায় একবিঘা জমির ওপর বিশাল উঠোনসহ বাড়িটার চৌহদ্দিতে নানারকম গাছ। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল, বেল আর একটা বিশাল নিম। ছোট একটা লেবু গাছও আছে। আর আছে নানা লতানো গাছ। যেমন পেস্তা আলুর লতায় ছেয়ে আছে একটা ডেওয়া গাছের শীর্ষ থেকে শিকড় পর্যন্ত। উঠোনে গোটা কয়েক আন্ডা বাইগনের গাছ যত্ন করে লাগান আছে। চারপাশে তারের বেড়া। দুটি বাইগনের পাতাকে জোড়া দিয়ে টুনটুনির বাসা ঝুলছে। দোয়েলের বাসার সুবিধের জন্য কে যেন একটা ফুটো কলসি কাত করে বসিয়ে দিয়েছে বেলগাছের এক শক্ত শাখা-সন্ধিতে।

এখন ভোরবেলা। গাছে পাখিদের জন্য পেতে দেওয়া কলসির পেটে একটা স্ত্রী দোয়েল লেজ উঁচিয়ে এদিক-সেদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কিন্তু শীতের সকালে কুয়াশার পর্দা গাঢ় হওয়ায় পাখিটা উড়াল দেয়ার মেজাজ পাচ্ছে না। দোয়েলটা একবার একটা শিস দিয়েই পালক খেলালে মেতে গেল। সম্ভবত পাখিটার পালক শিশিরে ভিজে ভার হয়ে থাকায় সে সকালের রোদের অপেক্ষায় ডানা দু'টিতে চঞ্চু বুলিয়ে মাঘের শীতের প্রচণ্ডতা অনুভব করতে চাইছে। কিন্তু কুয়াশা ঢাকা বাড়ির নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করতেই যেন হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে বাইগন পাতার বাসা থেকে টুনটুনিটা। একখণ্ড পেঁজা তুলোর মতো উড়তে উড়তে সে পেস্তা আলুর লম্বা লতার ওপর আড় হয়ে বসে টুই টুই করে ডেকে যেতে লাগল। টুনটুনিটা যেন পাখি নয়, প্রকৃতির একবিন্দু উড়ন্ত প্রাণস্পন্দনের মতো ভোরের ঘুমন্ত বাড়িটাকে মাতিয়ে তোলার খুদে সংগীত যন্ত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুনটুনির ডাকে ঘরের ভেতর মাহমুদের ঘুম ভেঙে গেল। সে গা থেকে লেপ সরিয়ে উঠে বসল। ঘরের টিনের বেড়ার ওপর অংশে বাঁশ-বেতের সূক্ষ্ম কারুকাজ। মাঝে-মধ্যে গোল লাল-নীল আয়না লাগান। একসময় বেতের কাজের ওপর হয়ত লাল-নীল রং মিনে করা ছিল, এখন রং চটে গিয়ে এক ধরনের প্রাচীনতার আভাস মাত্র লেগে আছে। এরই ফাঁকফোকর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতরের কারুকার্যময় প্রাচীন আসবাবপত্রে। সেগুন কাঠের একটা ছোট খাট পাতা আছে অন্য একটা প্রধান পালঙ্কের পাশে। এটাই মাহমুদের শয্যা। প্রধান পালঙ্কে থাকেন তার আব্বা-আম্মা। জাহানারা ও তৈমুর। আড়াই তিন হাত দূরেই মাহমুদ শোয়। পাশে একটা কিতাব রাখার সেগুন কাঠের তাক। তাকের ওপর পিতলের চেরাগদান ও আগর-লোবান জ্বালাবার শতছিদ্রযুক্ত চিনেমাটির গলুই উচা নৌকা। মাহমুদের মাথার ওপরও একটা বিশাল তাক। সে তাকেও চামড়ার বড় বড় মলাট ঢাকা কিতাব। সবই আরবি-ফার্সি কাব্যগ্রন্থ। সাদী, রুমী, হাফিজ ও ফেরদৌসির কাব্যগ্রন্থই বেশি। তবে অন্ধকার যুগ ও ইসলামি যুগের আরব কবিরাও আছেন। সাবা মোয়াল্লাকা, ইমরাউল কায়েস থেকে লবিদ পর্যন্ত। এক শতাব্দী আগে এ বাড়ির প্রাচীনেরা এসব পড়তেন। মাহমুদের দাদা ছিলেন এসব বইয়ের সর্বশেষ রসগ্রাহী পাঠক। তারপর এ বাড়ির অন্য কেউ এসব বই নেড়েচেড়ে দেখেননি। আর এখন তো এসব বইয়ের ভাসা বোঝার মতো মানুষই এ বাড়িতে কেউ নেই।

খুদে পাখিটার টুই টুই ডাকের তীক্ষ্ণতা ক্রমাগত বাড়ছে। মাহমুদ বিছানায় বসে পাখিটার ডাক কতোক্ষণ শুনে জানালার একটা পাট খুলতেই পাখিটা বেগুন পাতার বাসার ওপর এসে টেরচা হয়ে বসল। মাহমুদ পাখিটাকে দেখেই বুঝল পাখিটা ডিম পাড়বে। কিন্তু শিশিরে সবকিছু সিক্তা থাকায় পাখিটা সুবিধে করতে পারছে না। এর ওপর পাখিটাকে দেখে মাহমুদের কেন জানি মনে হলো টুনটুনিটা ক্ষুধার্ত। সকালবেলা ডিম ছাড়ার ধকল পুশিয়ে সে আর পোকা-মাকড় ধরার শক্তি পাবে না বলেই সম্ভবত তার পুরুষ-সঙ্গীকে ডাকছে, যাতে কাছাকাছি থেকে স্ত্রী পাখিটাকে একটু সাহায্য করে। কিন্তু পুরুষটির কোনো পাত্তাই নেই। প্রাণি ও পাখ-পাখালির জগতে পুরুষদের স্বভাব সম্ভবত একই রকম। একটু দায়িত্বজ্ঞানহীন বটে।

এ বাড়ির আঙিনায় যত পাখি, প্রজাপতি, পতঙ্গ ওড়াওড়ি করে সবগুলোকে মাহমুদ চেনে। এ বাড়ির প্রতিটি গাছের প্রতি তার মায়া মহব্বত। আর আছে গৃহপালিত একটা ছাগী। পাকঘরের পাশে একটা ছোট কুঁড়ে আছে। মেঝেটা পাকা। ও ঘরে কোহিনূর অর্থাৎ মাহমুদদের ছাগিটা থাকে। মোরগ-মুরগির খোয়াড়ও একটা আছে। দশ-এগারোটা মুরগি আর কয়েকটা হাঁস পালে জাহানারা। লালন-পালনটা অবশ্য নিয়মিতভাবে জাহানারা করতে পারে না। করে মাহমুদ। জাহানারা তো বলতে গেলে সারা বছরই মাহমুদের নানাবাড়িতে থাকে। প্রয়োজনে আম্মাকে থাকতে হয় ও বাড়িতে। এতোদিন ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে নানারও আব্বা-আম্মাকে কাছে রাখা দরকার ছিল। সম্বৎসর থাকতেনও তারা ওখানে। সারা বছরই মাহমুদ ও মাহমুদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্মাকে নানাবাড়ি থেকে সকাল-সন্ধ্যা এসে এ বাড়িটার দেখাশোনা করতে হয়েছে। মাহমুদ সকালে এসে খোয়াড় খুলে মোরগ-মুরগিকে খুদকুড়া খাইয়ে, হাঁসগুলোকে পুকুরে নামিয়ে দিয়ে ছাগিটাকে নিয়ে জর্জ স্কুলের মাঠে বা পুকুরের পাড়ে খুটা দিয়ে তবে স্কুলে যায়। সন্ধ্যায় আবার সব গুটিয়ে এনে রেখে যেতে হয় খোয়াড়ে যার যার জায়গায়। তখন চোরের উপদ্রব ছিল না। বাড়িটা খালিই পড়ে থাকত। মাহমুদকেও থাকতে হতো আব্বা-আম্মার সাথে। যদিও ও বাড়িতে থাকতে একটুও ভালো লাগে না মাহমুদের। মাঠের মধ্যে মস্ত খামারবাড়ির মতো নানার বিশাল বাড়িটায় ঘুরে ফিরে তেমন সুখ পায় না মাহমুদ। কারণ এখানে প্রকৃতির মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই। বিশাল ছ'কোঠাঅলা বাড়ির সামনে কেবল মাঠের মতো উঠোন। তার পাশে দিঘির মতো বিশাল এক পুকুর। পুকুর পাড়ে কাঁঠাল আর ফুল গাছের সারি। আর বিশাল বিশাল গোয়াল। শতাধিক গাই গরু। বাড়িটার বাতাসের মধ্যেই যেন কেমন খামারের গন্ধ। চারদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে আসছে শস্যের বাতাস। ধান, পাট, গরু, মাছ ও দুধের গন্ধ ছাড়া মাহমুদ নানাবাড়িতে কোনো গন্ধ খুঁজে পায় না। ও বাড়িতে মানুষ কেবল টাকা আর বৃহস্পতিবারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশাল হাটের কথা চিন্তা করে। শুকানো পাট আর রোদে পিরামিডের মতো ছড়িয়ে রাখা ভেজা শোলার গন্ধ ছাড়া আর কোনো গন্ধ পায় না মাহমুদ তার মামুদের বাড়িতে। ও বাড়িতে সারাদিন কাটাতে ভালো লাগে না মাহমুদের। যদিও তার মামুরা দু'একজন ছাড়া সকলেই তার সমবয়স্কই বলা যায়। যারা রয়েছে বড় তারা সকলেই তার আপন মামু। সৎ মামুদের দু'জনই তার একই বয়সের হলেও তারা তার সাথে মেলামেশা করতে আগ্রহি হয় না। মাহমুদও পারতপক্ষে মামুদের এড়িয়ে চলতেই ভালোবাসে। এটা কোনো হিংসা থেকে সৃষ্টি হয়নি। হয়েছে এক ধরনের সম্ভ্রববোধ থেকে। মামুরা মনে করে তারা এক বয়সি হলেও একটু তালেবর। কারণ তারা মাহমুদের ওপরের ক্লাসে পড়ে। তাও আবার জর্জ হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে। আর মাহমুদ পড়ে গাঁয়ের অবৈতনিক মিশনারি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে। ফাদার জোনসের পরিচালিত স্কুলে। যেখানে একদা এ বাড়ির পর্দানশীন মেয়েরা, মাহমুদের আম্মা একটা পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে এসেছে।

মামুবাড়ির পরিবেশটা মাহমুদের মনঃপুত নয়। যদিও তার আম্মা ও বাড়িতে বেশ মানিয়ে যান। তার খবরদারিতেই এখনও সব চলে। যেমন তার নানা জীবিত থাকতেও তার মাই ছিল মূলত মোল্লা সাহেবের নয়া বাড়ির কর্ত্রী।

মাহমুদের ভালো লাগে ও বাড়ির খাদ্য। ভোজ। মাছের মুড়ো, ঘন দুধ, দুধের সর, রাজ্যের মাছ, মাংস ও তরকারিতে বাড়িটার ভেতর দিককার বারান্দার দস্তরখানা যেন উপচে পড়ে। নানা জীবিত থাকতে মাহমুদের আম্মা মাহমুদকে হররোজ নানার সাথে খেতে বসাত। সেখানে অবশ্য মাহমুদের সমবয়স্ক অন্যান্য মামুদের টেনেও আনা যেত না। কারণ তারা ভয়ে বাপের কাছে ভিড়ত না। না ভেড়ার কারণও অবশ্য মারাত্মক রকম প্রত্যহই একটা না একটা উপস্থিত থাকত। কারো বাড়ির ফল চুরি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুল কামাই, গাঁয়ের সম্মানিত মুরুব্বিকে জিন সেজে ভয় দেখান। কিংবা দালানের ছাদে উঠে লাফালাফি করে সকলের ঘুমের আরামের বারোটা বাজানো ইত্যাদি। তারা তাদের আব্বার সাথে পাতপেড়ে খাওয়া থেকে এক রকম বঞ্চিতই থাকত। তবুও কখনও কখনও মাহমুদের আম্মা হাতের কাছে তাদের কাউকে পেলে জোর করে বাপের পাশে সাহস করে বসিয়ে দিত। এতে অবশ্য আরও খারাপই হতো। এতে ওই মামুটা ভয়ে লোকমা তুলতেই পারত না। শুধু বড়বোন অর্থাৎ জাহানারার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে নানার খাওয়া সেরে ওঠা পর্যন্ত সে বসে থাকত। এই অস্বস্তির মধ্যে কে কাকে ডেকে আনে? পরে আম্মাও নানার দস্তরখানে তাদের ডেকে আনত না। ওসব রুচিকর খাদ্যের স্বাদ নানার পাতের পাশে বসে মাহমুদই একাকি ভোগ করত। মাঝে-মধ্যে মাছের আস্ত মুড়োটা নানা নিজেই তুলে দিতেন মাহমুদের পাতে।

নানাকে খুব ভালোবাসলেও খাওয়ার সময় ছাড়া তার কাছাকাছি হওয়া সম্ভব ছিল না মাহমুদের। নানা ছিলেন ভাবগম্ভীর মানুষ, তার ওপর আফিমখোর। চোখ দু'টি সব সময় ভাটার মতো জ্বলত। দেখলেই কেন জানি মনে হতো কাউকে মেরে ফেলার ফন্দি আঁটছেন। কিংবা এ দুনিয়ায় যা কিছু ভালো জিনিস আছে নানা বুঝি এক্ষুনি কিনে ফেলতে চান। নানাকে মাহমুদের ভালোলাগার একটা বড় কারণ নানা তার আম্মাকে যতটা ভালোবাসতেন ততোটা ভালো বোধহয় তিনি কাউকেই জীবনে বাসেননি। তার অন্য ছেলেমেয়েরাও তাকে ভয়ে এড়িয়ে চলত। তাদের মুখের দিকেও পারতপক্ষে তিনি তাকিয়ে দেখতেন না। কেবল মাহমুদের আম্মা এলেই তিনি বাড়িতে 'আমার মা' এসেছে বলে খুশি হয়ে ইসমাইলকে ছিলুম লাগিয়ে দিতে বলে ফার্সি হুঁকোয় ক্রমাগত টান মেরে যেতেন। আর কদমবুসিরত মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতেন, 'এসেছিস যখন, মাস দু'য়েক থেকে যা মা। আমার কত কি খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু কাকে বলি? তোর মা মরে যাওয়ার পর আমি আর কাউকে রাঁধতে বলিনি মা?'

মেয়ে চমকে উঠে বাপের হাত ধরে ফিস ফিস করে বলেছে, 'আস্তে বলুন আব্বা। আমার অন্য মায়েরা শুনতে পেলে মনে আঘাত পাবে। তাছাড়া আপনি আমার এই মায়েদের রাঁধতে বললেই পারেন? তারা তো কেউ আর ফ্যালনা নন! দু'জনই এ অঞ্চলে সেরা রাঁধুনি। এসেছেনও বড় বড় ঘর থেকে। আর আপনি আমার হতভাগিনী মায়ের ওপর অভিমান করে পছন্দের ব্যাঞ্জন না খেয়ে অভিমান করে শুয়ে থাকেন?'

'তুই কয়েক মাস থেকে রেঁধে আমাকে খাইয়ে যা মা। কখন মরে যাই কে জানে?'

কথা বলার সময় নানাকে তখন খুব অসহায় দরিদ্র মনে হতো মাহমুদের। মনে হতো, নানা লক্ষ লক্ষ টাকার ওপর ঘুমিয়েও কত কাঙাল! এভাবে মাসের পর মাস জাহানারাকে বাপের বাড়ি পড়ে থাকতে হয়েছে। লোকে তখনও বদনাম গেয়েছে, এখনও গায় যে, মোল্লা সাহেবের গাঁয়ের মেয়েটা লুটেপুটে খাচ্ছে। অথচ নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে আম্মা মাহমুদদের ছোট দরিদ্র সংসারেই সবচেয়ে বেশি সুখি। শাক শুঁটকিতেই মাহমুদের আব্বা-আম্মা বেশি পরিতৃপ্তির সাথে জীবন কাটাতে পছন্দ করে এসেছে। পারেনি কেবল বাপের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে। এখন নানা মরে গেলেও আব্বা-আম্মার মুক্তি নেই। কেন নেই, এই ক্ষোভ ছোট হলেও মাহমুদের মধ্যে কাজ করে। কারণ সে জানে, গাঁয়ের লোকেরা মনে করে তার আম্মা নানাবাড়ি থেকে ধন-সম্পদ হাতাচ্ছে। মাহমুদের মামুদের অবুঝ পেয়ে তার আব্বাও নিজের আখের গোছাচ্ছে। এসব ফিসফাস মাহমুদেরও কানে যায়। তার সোজা সরল বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে এসব দুর্নামে তার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও সে চুপ করেই থাকে। তবে গতকালই প্রথম সে তার মাকে বলেছে, 'আমি রাতে আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকব।'

মা একাকি ভয় পাওয়ার প্রসঙ্গ তুললেও মাহমুদ পাত্তা দেয়নি। আমি ভয় পাই না। নিজের খাটে নিজের বালিশে যেখানে রোজ শুই, সেখানে ভয় পাব কেন? মাহ্মুদ অবশ্য এমনিতেই একটু নির্ভীক। এই নির্ভীকতা বেড়েছে দেশিয় খ্রিস্টান ও নিউজিল্যান্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের দু'য়েকটি সাদা ছেলেমেয়ের সাথে লেখাপড়া করে। তাছাড়া আছে মাহমুদের বই পড়ার বাতিক। যারা বই পড়ে তারা আল্লাহকে ছাড়া আর কোনো কিছুতেই ভয় পায় না। মাহমুদ দেখেছে খ্রিস্টান পাড়ার প্রায় সকল ছেলেমেয়েই কেউ খেলাধূলা, কেউ সেলাই, কেউ বাগান নিয়ে মেতে থাকে। কেবল মুসলমান ছেলেমেয়েরাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কিছু করে না। আলসেমি করে কাটায়। মাহমুদকে ফাদার জোনস ডেকে বলেছেন, 'শুনলাম তুমি ক্লাসের পড়াশোনা ছাড়াও কিছু করতে চাও? খুব খুশির কথা, তোমার আম্মাও আমার ছাত্রী ছিল। তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি, তুমি রাজ্যের যত রূপকথা-উপকথা আছে খুঁজে খুঁজে পড়বে। নানা জাতির নানা রূপকথা উপকথা আছে, খুব সুন্দর আর বিচিত্র। এই একটা কাজের মতো কাজ তোমাকে দিলাম। সফল হলে জগতে তোমার অনেক নামধামও হতে পারে।

সেই থেকে মাহমুদের বই পড়া শুরু। বই পেতে অবশ্য তেমন ছুটোছুটি করতে হয় না। মিশনে যেমন ছোটদের বইয়ের বিশাল ভাণ্ডার আছে, তেমনি তখনকার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার গড়ার চল ছিল বলে বইপত্রের কোনো অভাব ছিল না।

ফাদার জোনস যে মাহমুদকে এমনিতেই বই পড়ার কাজ দিয়েছে তা নয়। মাহমুদকে গির্জার সামনের বারান্দায় ছুটির দিনে গল্পের বই হাতে বসে থাকতে ফাদার জোনস মাঝে মধ্যে দেখেছেন। ছেলেটির বই পড়ার আগ্রহ তার চোখে লাগায় তিনি মাহমুদের জন্য বাড়তি কাজের এই পরামর্শ দিয়েছেন। এরপর থেকে বই পড়া নিয়ে মাহমুদ স্বাধীন। যদিও আব্বা-আম্মার এখনও সন্দেহ যায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ ঘরের বাইরে এসে মুরগির খোঁয়াড়টা খুলে দিয়ে খোয়াড়ের ওপর শিকেয় ঝুলিয়ে রাখা টোপা থেকে এক মুঠ খুদকুড়ো নিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে দিলে মোরগ-মুরগিরা কক কক শব্দে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক পা এগিয়ে গিয়ে মাহমুদ হাঁসগুলোকেও ছেড়ে দিল। হাঁসগুলোকে অবশ্য তোলা খাদ্য খাওয়াতে হয় না। ছাড়া পেলেই ওরা দল বেঁধে পুকুরের দিকে ছোটে। কাছেই এ বাড়ির প্রাচীন শরিকানা দিঘিতুল্য এক শান-বাঁধানো পুকুর। ঘাটটা কতকালে পুরনো কে জানে? পাতলা লাল ইটের তৈরি সিঁড়ি। নিচে অনেকদূর পর্যন্ত নেমে গেছে। আজও গোসলের সময় মেয়েদের গয়না কখনও কখনও অসবাধানে হারিয়ে গেলে হারানো অলংকার ডুব দিয়ে দিয়ে তুলে আনতে গিয়ে অনেকে অনেক জিনিস খুঁজে পায়। হারানো সোনাটা খুঁজতে গিয়ে হয়ত কারো হাতে উঠে আসে কয়েকশ' বছর আগে হারানো পূর্বপুরুষের অন্য কারো শেওলাপড়া কানের দুল, মাকড়ি, বালা কিংবা সুলতানি আমলের কোনো কালো হয়ে যাওয়া সোনার টাকা। একটু ঘষতেই বেরিয়ে পড়ে আরবি কিংবা ফারসি হরফ। কষ্ট করে কেউ পাঠোদ্ধার করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখে, এটা তো সেই সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আশরফি, একদা যিনি সোনারগাঁয়ের তখতে বসে দিল্লিকে বুড়ো আঙুল দেখাতেন! আশ্চর্য, অতীতের এই পুকুর আর ঘাটলাটা এখনও আছে। যদিও ঘাটলাটা খোয়া উঠে অনেকখানি ভেঙেচুরে গেছে। তবুও তো এখনও এই প্রাচীন পুকুর ব্যবহার্য আছে। যদিও মাহমুদ জানে পুকুরের পানি গত এক যুগের মধ্যে কয়েকবার সেঁচে ফেলে দিতে হয়েছে। কারণ এর পানি সহজেই শেওলা পড়ে সবুজ হয়ে যায়, এক ধরনের সর পড়ে থাকে পানির ওপর। পুকুরটা যে এখনও ব্যবহার্য আছে এ ব্যাপারে মামুদের আব্বা বলেন, পারিবারিক পুকুর বলেই এটি সচল আছে। দিঘি হলে শুকিয়ে চর পড়ে যেত। তাছাড়া তার পূর্বপুরুষরা নিশ্চয়ই পুকুরটার বার বার সংস্কার ও পানি শুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তা না হলে ওই সময়কার কোনো তালাব তো এখনও টিকে নেই। ভাদুগড়ের কাটা পুকুরটাও লোকে বলে অতি প্রাচীন। কিন্তু ওটা মানুষের নিত্যদিনের কাজকর্মে ব্যবহার্য না থাকায় কিংবা জনপদ থেকে একটু দূরে থাকায় এখন ওর ভেতরের দিক থেকে এক ফাটল এসে পাড় পর্যন্ত মাঝামাঝি দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। হয়ত কোনো ভূমিকম্পের সময় ঘটনাটা ঘটেছে। লোকে এখন নাম দিয়েছে ফাটা পুকুর। কে জানে, কোন অতীতে কে পুকুরটা খুড়িয়েছিল? সে তুলনায় মোল্লাবাড়ির তালাবটা এখনও সচল। সিঁড়ি বেয়ে একটু নামলেই আর থৈ পাওয়া যায় না। মাঝখানটা নাকি পাতালের মতো গভীর। শত বছরের প্রাচীন মাছ নাকি এখনও সেই অতলে ঘুরে বেড়ায়। জ্বিন, সিন্দুক আর ডেক-ডেকচি জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে বাড়ির প্রাচীনরা দেখেন বলে ভয় দেখানো হয়। মাহমুদ জানে, ওসব হলো বাড়ির বুড়িদের গালগল্প মাত্র। সাঁতার না জানা এ বাড়ির শিশুরা যাতে ভাঙা ঘাটলার পিছল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে ডুবে না মরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে জন্যই ঐসব ভয়ের গপ্পো বলে ঘাটলা থেকে দূরে রাখা হয়। মাহমুদ অবশ্য সাঁতার জানে এবং ঐসব আজগুবি কাহিনিতে ভড়কে যাবার বান্দা নয়। সে সুযোগ পেলেই সারা পুকুরে সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মধ্যে ছিপ ফেলে মাছ ধরারও চেষ্টা করে। ঘরে তার আব্বার যে হুইলে দুই বড়শিঅলা বিলিতি ছিপ আছে, সুযোগ পেলেই মাহমুদ ওতে বল্লার টোপ গেঁথে ঘাটলায় বসে থাকে। একবার সে এক রক্তবর্ণ বিরাট রুই মাছ ধরে বাড়ির সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। একশ' বছরের প্রাচীন রুই-কাতলা না থাকলেও পুকুরে বড় মাছের কোনো অভাব নেই। প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর মাইমল পাড়ার জেলেরা এসে মোল্লাবাড়ির পুকুরে মাছ ছেড়ে যায়। জাল ফেলে তোলেও। তখন মোল্লবাড়ির বাতাস মাছের গন্ধে ভরে যায়।

হাঁসগুলো ঘাটলার দিকে চলে গেলে মাহমুদ এসে ছাগিটার দড়ি খুলল। খুললেও দড়িটা ধরে রাখতে হয়। ছাগিটা খুব বদমাশ। একটু ছাড়া পেলেই সে দাওয়ার সুর্মা মরিচের ফলন্ত গাছ কিংবা বেগুন খেত তছনছ করে ফেলে। মাহমুদই ছাগিটার নাম রেখেছে কোহিনুর। কোহিনুরের বিশাল ওলান দু'টি লম্বা বানসহ দুধের ভারে মাটি ছুঁই ছুঁই হয়ে ঝোলে। সে সকাল-বিকেল দু'বেলা প্রায় দেড় সের দুধ দেয়। মাহমুদ নিজেই দুধ দুইয়ে নেয়। খায়ও নিজেই। এ দুধটুকু তার জন্যই বাপ-মা বরাদ্দ রেখেছেন।

কোহিনুরকে নিয়ে মোটা ও লম্বা দড়িসহ মাহমুদ জর্জ স্কুলের মাঠের দিকে চলল। ছাগিটাকে সেখানে ঘাসের মাঠে রেখে এসে মাহমুদ হাত-মুখ ধুয়ে ক্লাসের পড়া তৈরি করতে বসবে। বাড়ির বাইরে এসে দেখে এখনও রাস্তাঘাটের কুয়াশা সরেনি। যদিও বেশ বেলা হয়েছে এবং পূর্বের সীমা ছেড়ে সূর্য বেশ একটু ওপরে দাঁড়িয়ে তার কুয়াশাচ্ছন্ন মুখ দেখাচ্ছে। মাহমুদ দেখল তাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে তার সমান বয়সের হিন্দু মেয়েরা প্রাত্যহিক পুজো-আর্চার ফুল তুলে ফিরছে। তখন শহরের সবচেয়ে বড় ফুল বাগানগুলো ছিল মাহমুদদের মহল্লায়। মৌড়াইল গাঁয়েই ছিল এসডিও সাহেবের বাড়ি, খ্রিস্টান মিশন, নিয়াজ পার্ক, পুলিশ সাহেবের বাড়ি এবং সরকারি ডাকবাংলো। আর এর প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানেই ছিল সযত্নে তৈরি ফুলের বাগান। লাল রঙ-বেরঙের ফুলের সমারোহ। সারা শহরের দৈনন্দিন পূজার ফুল তুলতে ঝাঁক বেঁধে কমবয়েসি মেয়েরা খুব ভোরে আসত এদিকে। মাহমুদদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে তারা দলবেঁধে যেত। এদের কেউ কেউ মাহমুদের সহপাঠিনী।

মাহমুদকে দেখে তারা একটু হেসে রাস্তাটা পার হয়ে গেলে মাহমুদ কোহিনুরকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে মাঠে এসে নামল। কুয়াশা সরে গিয়ে ততোক্ষণে রোদ এসে পড়েছে মাঠে। নরম রোদ। মাহমুদ মাঠের পুবদিকে গিয়ে মাঠের অপরদিকে যেখানে মাদার গাছেরই একটা সারি এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে সেখানে একটা সবুজ ঘাসের উঁচু জায়গা দেখে কোহিনুরের লম্বা দড়ির খোটা পুঁতল। সারাদিন ছাগিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে নিরাপদে ঘাস খেয়ে পেট ভরাতে পারবে। খোটা পুঁতে হাতের ইট ফেলতে গিয়ে মাহমুদ দেখল একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

'এটা তোমার ছাগল? তুমি ছাগল পোষ?'

মাহমুদ একটু লজ্জা পেল। মেয়েটি তার সহপাঠি। খ্রিস্টান মিশনেরই মেয়ে। শ্বেতাঙ্গিনী। নাম মারিয়া কুকার। অরফেন। মিশনের দিদিমণিদের হোস্টেলে থাকে।

মাহমুদ একটু সংকুচিত হয়ে বলল, 'এটা ছাগল নয়, ছাগি। নাম কোহিনুর।' মাহমুদ ভাবল এখানকার সায়েবরা সবসময়ই বাংলা বলতে গিয়ে যেমন হামেশা গড়বড় করে ফেলে মারিয়াও বোধহয় ছাগলের স্ত্রী লিঙ্গ যে ছাগি এটা জানে না। এখন ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে সেও হাসার চেষ্টা করল, 'কোহিনুর খুব ভালো জাতের ব্ল্যাক গোট। আব্বা আসামের জয়ন্তিয়া পাহাড় থেকে কিনে আমাকে উপহার দিয়েছেন। দিনে দেড় সের দুধ দেয়। আমিই পালি, চরাই।'

'তুমি ছাগলের দুধ খাও?'

'কেন, খেলে কি হয়? মহাত্মা গান্ধীও তো খান।'

'ও' এ জন্যই তোমার গা থেকে ক্লাসে কেবল দুধের গন্ধ বেরোয়।'

খিল খিল করে হাসল মারিয়া, 'তোমাদের গান্ধিটা তো একটা নেকেড বেগার, গায়ে কাপড় পরতেও শেখেনি। ওফ, কি দুর্গন্ধ!'

মাহমুদ বুঝল শাদা চামড়ার দামড়িটা তাকে গায়ে পড়ে অপমান করে চলেছে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সেও হেসেই অপমানের জবাব দিল, 'আমি তো তোমার বেঞ্চেই বসি না তোমার পচা গন্ধের ভয়ে। আমি বসি কংকার সাথে ফার্স্ট বেঞ্চে। তুমি লাস্ট বেঞ্চে বসে কেবল আমার গায়ে দুধের গন্ধ পাও কি করে? আসলে ওটা তোমারই শাদা চামড়ার বাসি গন্ধ।'

'কি বললে, আমার গায়ে পচা গন্ধ?'

'শুধু তোমার গায়ে কেন, তোমাদের মিশনের সাহেব মেমদের গায়ে শুয়ের গন্ধ। তোমরা তোমাদের গায়ের দুর্গন্ধ পাবে কোত্থেকে, তোমরা যে উইকে একবারও গোসল করো না। কেবল সেন্ট মেখে গির্জায় গিয়ে যিশুকে ডাকলেই গন্ধ চাপা থাকে ভেবেছ?'

'দাঁড়াও আমি তোমার নামে ফাদার জোনসকে নালিশ করে দেব।'

বলেই মারিয়া চলে যেতে উদ্যত হলে মাহমুদ বলল, 'নালিশ দেবে দাও গিয়ে। আমিও ফাদারকে বলব, তুমি আমাদের গান্ধীকে লেংটা ভিখিরি বলে গাল দিয়েছ।'

'গাল দিয়েছি বেশ করেছি। ওই ফকিরটা আবার তোমাদের নেতা হলো কি করে? মহামেডানের নেতা তো মিস্টার জিন্নাহ। জিন্নার মেয়ে তো আমাদের কম্যুনিটির ছেলেকে বাগিয়ে বিয়ে করেছে। কিছুই জান না বুঝি? তুমি একটা ছাগল।'

বলেই মারিয়া হন হন করে মাঠের মাঝ বরাবর হাঁটা শুরু করল। মাহমুদ সত্যি অত কথার কিছু জানে না। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর মেয়ে খ্রিস্টানকে বিয়ে করেছে? এ কেমন কথা। খুব অবাক হলো মাহমুদ। তবুও ওই শাদা পেত্নিটার মুখের ওপর মনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো জবাব দিতে পেরে মাহমুদ খুব খুশি। হোক গান্ধী হিন্দুদের নেতা, তিনিও তো ইন্ডিয়া থেকে বৃটিশদের তাড়াতে চান। তার চামড়াও কালো। ওই শাদা পেত্নিটা কেন তাকে লেঙটা ফকির বলবে? নালিশ করলে করুক গিয়ে নালিশ। ফাদার মাহমুদকে ডেকে পাঠালে মাহমুদও বলবে, মারিয়া গায়ে পড়ে তাকে জাত তুলে গালমন্দ করেছে।

মাহমুদ বাড়িতে ফিরে এসে দেখে আম্মা এসেছেন। এত সকালেই নাশতা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। একটা চিনে মাটির বাসন ভর্তি ছিটারুটি আর গোল করে ভাজা ডবল ডিম। আদা ও গোল মরিচের গন্ধ উঠছে চালের ছিটারুটি থেকে।

ঘরে পা দিতেই জাহানারা বলল, 'রাতে ভয় পেয়েছিলি?'

'বা রে ভয় পাব কেন? এ বাড়িতে আমি সব সময়ই থাকছি না?'

'এর আগে তো একা কখনও এ বাড়িতে থাকিসনি। আমাদের ছেড়ে এই প্রথম একা একটা খালি বাড়িতে রাত কাটালি। ভয়ে আর চিন্তায় আমি আর তোর আব্বা কি ঘুমিয়েছি ভেবেছিস? সকালেই ছুটে এলাম।'

'কই আমি তো ভয় পাইনি। তবে এখানে ঠাণ্ডা একটু বেশি। এতো গাছপালা। সারারাত টুপ টুপ টিনের চালে পানির ফোঁটা পড়ে। শুনতে খুব ভালো লাগছিল। পেঁচা ডাকছিল ভয়ের ডাক। কিন্তু আমার কি যে ভালো লাগছিল আম্মা।' ডিম আঙুল দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে রুটির ভাজে রেখে মুখে পুরল মাহমুদ, 'আমি এখন থেকে এ বাড়িতেই থাকব।'

'বলে কি ছেলে?' অবাক হয়ে গেল জাহানরা। 'এ বাড়িতেই থাকবি কিরে? এখানে প্রতি সকালে নাশতা নিয়ে আসবে কে? তোর জন্য আমাদের চিন্তা হবে না? অত বড় বাড়িতে একা কেউ থাকে?'

'একাই বা থাকলাম কোথায়? আমাদের কোহিনুর আর হাঁস-মুরগিরা আছে না? জান আম্মা, আমি যে ওদের জন্যই গতরাতে এখানে থেকেছি ওরা বুঝতে পেরেছে। সকালে সবাই কি খুশি! খুদকুড়ো খেয়ে কেউ উঠোনে আর পুকুরে নেমে টই টই করছে। আমরা এদের যেভাবে একা ফেলে যাই একদিন দেখ পশ্চিমের জংলা থেকে শেয়াল আর বাঘডাশা এসে খেয়ে ফেলবে। আমি এদের পাহারা দিতে বাড়িতেই থাকব। তোমরা কেন যে ভয় পাও?'

মা দেখল, ছেলেটা আসলে তার মামু বাড়িতে কেন যেন ছোটবেলা থেকেই খাপ খাওয়াতে পারে না। সে জন্ম থেকেই কেমন নিরিবিলি পছন্দ করে। একটু ফাঁক পেলেই নিজের বাড়ির আঙিনায় এসে চুপচাপ বসে থাকে। পাখি দেখে, পতঙ্গ দেখে আর গাছের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবে। আর যখন পড়াশোনা করে তখন একেবারে ডুবে যায় বইয়ের ভেতর। ছেলেটার স্বভাবই যেন কেমন?

'ভয় না পেলেও তোর এ বাড়িতে একা থাকার ব্যাপারে তোর আব্বার বারণ আছে। আজ থেকে রাতের বেলা তোর সাথে আমাদের মসজিদের তালেবেলেম ছেলেটা, ওই যে ইমাম সাহেবের খিদমত করে আর মসজিদের বারান্দায় একা শুয়ে থাকে, ও থাকবে। ওরও বোধহয় শোয়ার জায়গা নেই। ইমাম সাহেবকে বললে খুশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে তোর সাথে থাকতে পাঠিয়ে দেবে।' ছেলের জন্য একটা ব্যবস্থা বের করতে পেরে জাহানারা খুশি, 'ও এসে থাকলে তোর লেখাপড়ায় মনোযোগ নষ্ট হবে না তো?'

'বা রে, রাতে এসে থাকলে ক্ষতি হবে কেন? আমি তো অনেক রাত জেগে পড়ি না। ও এলে শুয়ে পড়ব।'

'তাহলে আজ থেকে এ ব্যবস্থাই থাকল। এখন নাশতাটা খেয়ে নে। আর দুপুরে ঠিক সময় ও বাড়িতে খেতে আসবি। সবার পরে গেলে তোর পাতে কি দেব? জানিস না তোর মামুর বাড়িতে একশ' মানুষের পাত পড়ে?'

'জানি। সে জন্যই তো ও বাড়ি আমার ভালো লাগে না। মনে হয় সবাই আমার খাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।'

'তোর নানা যে আদর করে তখন তোর পাতে এটা ওটা তুলে দিত। সাত শরিকের ঘর না, হিংসে তো একটু হতোই।' জাহানারা ছেলেকে ও বাড়ির বাস্তব অবস্থাটা বোঝাতে চাইল, 'তাহলে এতে তোর লজ্জা পাবার কি আছে। তোর আব্বা আর আমি দিনরাত ওদের ভালোর জন্য খাটছি না? তাছাড়া ওটা তোর মামুবাড়ি লোকে বলে না, মামু-ভাগ্নে যেখানে, ভূতপ্রেত নেই সেখানে? তুই তো মামুদের থেকে আলাদা থাকতে ভালোবাসিস। সারাদিন বই আর বই। এতো পড়ে শেষে না তোর আবার বিমার পয়দা হয়?'

'তুমি কি যে বল না আম্মা, পড়লে মানুষের বিমার হয় বুঝি? দেখ এবার আমি ফার্স্ট হব। ওই মারিয়া মেয়েটা, ফেনকচুর মতো শাদা মুখওয়ালিকে এবারও ফার্স্ট হতে দেব না। ওর ইংরেজি জানার গর্ব আমি ভেঙে তবে ছাড়ব। আমাকে বলে কিনা আমার গায়ে ছাগলের দুধের গন্ধ? আমি ওকে এবারের ফাইনালে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। ইংলিশে এইট্টিফাইভ না তুলে ছাড়ব না।'

ছেলের কথায় জাহানারা না হেসে পারল না, 'ওর সাথে কেন বাঁধিয়েছিস?' জাহানারা জানে সায়েবদের মেয়ে হলেও মারিয়া খুব ভালো মেয়ে। মাঝেমধ্যে মোল্লাবাড়িতে এলে জাহানারার রান্নাঘরে এসে চুপ করে বসে তার এদেশীয় রান্না দেখে। মাছ মাংসে বাগাড় বা সম্ভার দেয়ার সময় চোখ ছানাবড়া করে কেশে ওঠে। জাহানারা প্লেটে তুলে কিছু খেতে দিলে না করে না। চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে বলে, 'খুব হট আন্টি, তবে খুব মজার।' জাহানারা হেসে মারিয়ার পাতে আরও এক টুকরো মাছ বা মাংস তুলে দেয়। সায়েবসুবোর বাচ্চা হলে কি হবে, মেয়েটা আসলে এতিম। থাকে যদিও মিশন হোস্টেলে, কিন্তু কেউ যে খুব আদর করে কিছু খেতে দেয় তেমন মনে হয় না।

'ওর সাথে ইংরেজিতে তুই পারবি কেন, ওর মাতৃভাষাই তো ইংলিশ।' হেসে ছেলের পিঠে হাত বুলাল জাহানারা।

'তাতে কি, মুখে বলতে পারলেই বুঝি পরীক্ষায় নম্বর ওঠে? লিখতে হয় না। ওর চেয়ে আমি শুদ্ধ ইংরেজি লিখি। ও তো ইংরেজি ব্যাকরণের কিচ্ছু বোঝে না। ফাদার ওকে কতবার ভুল বানানের জন্য ধমকেছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাই বুঝি?'

'ঘোষ পাড়ার কংকা এলে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।'

ছেলের কথায় হেসে গড়িয়ে গেল জাহানারা। ছেলের দর্পটা তার বেশ ভালোই লেগেছে। ছেলে কিনা জাত সায়েবের বাচ্চাকে ইংরেজিতে হারিয়ে দেয়ার সাহস রাখে।

৮

তৈমুর দোকানে বসে হিসাবের খাতাপত্র দেখছিল। এ সময় ঝড়ের বেগে সাফফাত, তৈমুরের মেজো শালা এসে দোকানে ঢুকেই বলল, 'দুলাভাই, কাল আমাদের সেমিফাইনাল ইয়াংম্যান ক্লাবের সাথে। এ খেলায় জিততে না পারলে আমার মান-ইজ্জত কিছু থাকবে না। ঢাকা থেকে ইউজিনকে আনতে হবে। আমাকে দু'শ' টাকা দিন। চাঁদা।'

তৈমুর শালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দোকানে এসে লাফিও না, শান্ত হয়ে বস।' তৈমুরের ফারসি হুঁকোয় দোকানের গোমস্তা ফিরোজ মিয়া একটা জ্বলন্ত কলকে বসিয়ে দিলে তৈমুর হুঁকোয় টান দিতে দিতে শালার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে উদাসিনতার ভান করল, 'তুমি আর গাঁয়ের কয়েকটি বেয়াদব মিলে গাঁয়ের টিমটা ভেঙে মোহামেডান স্পোর্টিং করেছ। আমি মৌড়াইল ক্লাবের সমর্থক। আমার কাছে চাঁদা চাইতে লজ্জা করে না?'

'আমি জানি, আপনি না করবেন। মোহামেডান ভালো খেলছে এটা আপনি আর গাঁয়ের কিছু লোক সহ্য করতে পারেন না। বণিক পাড়ার হিন্দু ছেলেরা গিয়ে ইয়াংম্যান করেছে। কই তাদের তো কিছুই বলতে পারেন না? ওরাও তো মৌড়াইল স্পোর্টিং ভেঙেই আলাদা ক্লাব করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাবেক চেয়ারম্যান উমেশচন্দ্র ওদের অর্থ জোগাচ্ছে। জমিদার বিহারি বাবু ওদের পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। আমাদের দোকান থেকে চাইতে এলে আপনি মৌড়াইল ক্লাবের কথা তোলেন। আব্বা থাকলে কিন্তু আমাকে দিতেন।' কথা বলতে বলতে সাফফাত উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা আসি।'

বলেই ঝড়ের বেগে সাফফাত বেরিয়ে গেল।

গোমস্তা ফিরোজ হুঁকোটা তৈমুরের সামনে থেকে সরিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে দ্রুত কয়েকটা টান মেরে কাশতে কাশতে বলল, 'কাজটা কি ভালো করলেন মহাজন? কিছু তো দিয়ে দিলেই পারতেন। শহরের ফুটবল খেলা নিয়ে কেমন উত্তেজনা চলছে দেখতে পাচ্ছেন না?. ইয়াংম্যান ক্লাব ঢাকা থেকে হায়ার করে প্লেয়ার এনেছে। মৌড়াইল ক্লাব ভেঙে এখন তিনটি দল হয়েছে। এখন আপনাদের গাঁয়ের টিম ভেঙে গেছে বলে ছোট মিয়াকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তবুও তো মোহামেডান করে তিনি আপনাদের গাঁয়ের মান বাঁচাচ্ছেন। দু'শ' চাইতে এসেছিল পঞ্চাশ দিয়ে দিলে পারতেন। যখন বাইরে থেকে হায়ার করে প্লেয়ার আনছে তখন টাকা তো দরকার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈমুর গম্ভীর হয়ে থাকল, কোনো কথা বলল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে গোমস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাশে এখন কত আছে?'

'শ' পাঁচেক হবে বলে মনে হয়।'

'তিনশ' গুণে আমাকে দাও।'

মহাজনের কথায় ফিরোজ টাকা গুণে তার হাতে দিল।

'আজ আর দোকানে আসব না। পাইকাররা এলে ঠিকমতো মাল বুঝিয়ে দিও। কেউ কিছু বাকি রাখতে চাইলে দিও।'

'জ্বি মহাজন।'

গোমস্তাকে নির্দেশ দিয়ে তৈমুর দোকান থেকে সোজা শ্বশুরবাড়ির দিকে হাঁটা দিল। বাড়িতে পৌঁছেই বুঝল বা'র বাড়ির ঘরে ছেলে-ছোকরাদের ভিড়। মোহামেডানের কোনো অফিস বা ক্লাবঘর না থাকায় পাড়ার বেয়াদপ ছোকরারা যে তার শ্বশুরের বসার দালানটিকেই এখন ক্লাবঘর এবং হায়ার করে আনা খেলোয়াড়দের আস্তানা বানিয়েছে তা তৈমুরের জানা ছিল।

তৈমুর ওদিকে না গিয়ে সোজা অন্দরে ঢুকে জাহানারার সামনা-সামনি হলো।

'তোমার ভাই সাফফাতকে ডাক।'

'কি ব্যাপার?'

'কাল ওদের সেমিফাইনাল, চাঁদা চাইতে গিয়েছিল। আমি দিইনি। এখন দেখছি সারা শহরে খেলা নিয়ে উত্তেজনা। কিছু টাকা তোমার ভাইকে বোধহয় দেয়া দরকার।'

স্বামীর কথায় জাহানারা আর কথা না বলে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই সাফফাতকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এল। তৈমুর গায়ের পিহরান খুলে খাটের উপর বসল। সাফফাতকে দেখেই তৈমুর বলল, 'বাইরে থেকে প্লেয়ার আনার জন্য লোক পাঠিয়েছ?'

'আজ সন্ধ্যার গাড়িতে যাবে।'

'কয়জন দরকার?'

'দু'জনকে আনলে ভালো হতো, কিন্তু অত টাকা আমরা কোথায় পাব? ধারকর্জ করে এখন একজনকেই আনতে লোক পাঠাচ্ছি। এখন সেন্টারে আমিই খেলব আর রাইট আউটে ম্যাকোয়া। ইন-এ খেলার জন্য ইউজিনকে পাওয়া গেলে জেতার সম্ভাবনা ছিল।'

'সম্ভাবনা বললে হবে না। তোমার টিমকে জিততে হবে। টাকা যা লাগে তোমার বোন দেবে। একদিনের মধ্যে যেখানে যেখানে ভালো খেলোয়াড় পাওয়া যায় আনতে লোক পাঠাও।'

ভগ্নিপতির কথায় হতচকিত হয়ে সাফফাত জাহানারার দিকে তাকালে জাহানারা হাসল, 'খেলছিসই যখন তখন তোর মনের মতো করে টিম সাজা, টাকা আমি দেব। তোর দুলাভাই তো আর আমাদের কারবারের মালিক না যে তোকে যখন যত চাস দিয়ে দেবে। তুই প্লেয়ার জোগাড় করে আন, টাকা আমার কাছ থেকে নিবি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফফাত বোনের কথা শুনে একবার তৈমুরের চেহারার দিকে চোখ তুলে মেজাজ বোঝার চেষ্টা করল। সেখানে হাসির কোনো রেখা নেই।

'এই লও তিনশ', এটা আমার ব্যক্তিগত হিসাব থেকে দিচ্ছি। আর তোমার বোন তো দিচ্ছেই। হেরে এসে বলো না টাকার জন্য হেরে গেলাম।'

'হারব কেন? আপনি তো মৌড়াইল টিম ভেঙেছে বলে আমাদের খেলা দেখতেও যান না। আমরা মন্দ খেলি না।'

তৈমুরের হাত থেকে টাকার বান্ডিলটা নিল সাফফাত, 'ও পাড়ার বণিকরা অনেক টাকা ছড়িয়ে প্লেয়ার আনছে। আগে যদি টাকার আশ্বাস পেতাম তাহলে বেণেদের দেখিয়ে দেয়া যেত। হারামজাদা মালাউনরা নাকি কলকাতার মোহনবাগান থেকে প্লেয়ার আনার জন্য লোক পাঠিয়েছে।'

'তাই নাকি, তাহলে তো ব্যাপারটা বেশ গুরুতর বলে মনে হচ্ছে সাফফাত মিয়া। এ খেলায় অন্তত ড্র রেখেও যদি ফাইনালে যেতে পার, আমি কলকাতার মোহামেডান থেকে রশিদকে তোমাদের সাথে ফাইনালে খেলার জন্য নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।'

তৈমুর হঠাৎ যেন একটু উত্তেজিত।

জাহানারা বলল, 'খেলা খেলা করে শেষতক তুই আর লেখাপড়া করতে না পারলে তখন কিন্তু সকলে দোষ চাপাবে তোর দুলাভাইয়ের ওপর। এ কথাটা মনে রাখিস ভাই।'

'আসি দুলাভাই। সুখবরটা সবাইকে গিয়ে শুনিয়ে দিই।'

সাফফাত আনন্দে আটখানা হয়ে বেরিয়ে যেতেই জাহানারা বলল, 'এমন কড়া শাসনের মধ্যে রেখে শেষে শালাকে আবার নিজেই পাগলামিতে উসকালে?'

'সারা শহরের লোকেরা আমাদের গাঁয়ের খেলাধূলার কৃতিত্বে এতদিন হিংসে করে এসেছে। এখন মুরব্বিরা কেউ বেঁচে নেই বলে শহরের দু'একটি বর্ধিষ্ণু মহল্লা মৌড়াইল গ্রামকে হারিয়ে দেয়ার স্বপ্ন দেখছে। তোমার ভাইয়েরা কিছু না জেনেই এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য উসকালাম। শুধু টাকার জোরে জেতা যায় না আমি জানি। তবে আজকাল শুনছি তোমার দু'ভাই-ই নাকি খুব ভালো খেলে, যদিও আমি দেখার ফুরসত পাইনি। ভালো খেললে খেলুক। যদি খেলেও মোল্লাবাড়ির গৌরব ধরে রাখতে পারে তবে খেলুক না। ওরা তো আর বিদ্বান হয়ে চাকরি করতে যাবে না! ঘরে বসে ঘরের টাকাই ওড়াবে। এর চেয়ে ভালো প্লেয়ার হয়ে নামডাক কিনতে পারলে আমি কেন বাধা দিয়ে ওদের পছন্দ ঠেকাতে যাব?'

তৈমুরের মুখের গাম্ভীর্যময় আদল থেকে যেন একটা গ্রাম্য প্রতিহিংসার ছটা ছিটকে বেরিয়ে এল। জাহানারা স্বামীর মুখের দিকে কতক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলল, 'তোমাকে মাঝে মধ্যে তোমার শ্বশুরের জিদে পেয়ে বসে। আব্বাও বেঁচে থাকলে আজ এটাই করতেন।' হারমানা বোধহয় এ বংশের রক্তের মধ্যেই নেই। আমার একটা কথা মনে রেখ, শালাকে উৎসাহ দিচ্ছ দাও, তবে সীমা ছাড়িয়ে যেতে দিও না। গতকাল বিকেলে তোমার বড় শালা শওকতকে দেখলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বড় আম্মার সাথে ভেতর বাড়ির ঘাটলার শানে বসে কি যেন ফিসফিস করছে। আমি মাস্টার সাহেবের কাছে গিয়ে পড়তে বসার তাগাদা দিলে আমার মুখের ওপর বলে দিল তার মাথা ধরেছে। আজ রাতে মাস্টারের কাছে যাবে না।'

তৈমুর এ কথার কোনো জবাব দিল না।

পরের দিন সকাল থেকেই বাড়িতে ভিড়। প্রায় শ'খানেক উঠতি বয়সের তরুণ বাইরের বিল্ডিংটা সরগরম করে রেখেছে। বেলা আড়াইটায় চট্টগ্রামগামী মেল ট্রেনে ঢাকা থেকে আগত ইউজিন ও ম্যাকোয়াকে পেয়ে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে সবাই। এমনকি মাহমুদের মতো নিরীহ ছেলেরাও প্লেয়ারদের ফাইফরমাশ খাটার জন্য বা'র বাড়িতে জমায়েত হয়েছে। মাহমুদ সাধারণত খেলাধূলায় নিজে কদাচ উৎসাহ দেখায়। আজ অবশ্য সে মামুদের হুকুম তামিল করার জন্য একপায়ে খাড়া। ছোট মামু সারোয়ার সকালেই তার শার্টের পকেটে খেলা দেখার জন্য দু'আনার কম্প্লিমেন্টারি টিকিট ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছে, 'খেলা দেখতে যাস কিন্তু। এমন খেলা আগে নিয়াজ পার্কে কোনোদিন হয়নি। সাবধান, আজ গল্পের বই নিয়ে বসবি না। এটা আমাদের গাঁয়ের মান-সম্মানের লড়াই। আসলে আমাদের বাড়ির সাথে সারা শহরের লড়াই। তোর তো আবার ওসবের খোঁজ-খবর নেই। খালি ফালতু গল্পের বই পড়া!'

সারোয়ার মামুর দেয়া টিকিটা মাহমুদ পকেট থেকে খুলে একনজর দেখল।

'তোর বন্ধু-বান্ধবকে মাগনা নিতে চাইলে আরও দু'টো টিকেটে তোকে দিতে পারি।'

'লাগবে না।'

'তোর তো আবার কোনো বন্ধু নেই, কেবল বই আর মিশনের মেয়ে আর ঘোষপাড়ার গোয়ালাদের মেয়ে কংকার সাথে বাঘবন্দি খেলা।'

হাসল সারোয়ার। ভাগনের প্রতি যে একটা গভীর টান আছে তা হাসিটা থেকেই আন্দাজ করা যায়।

'আচ্ছা মামু, খেলায় আমাদের টিম জিতবে তো? শুনলাম ইয়াংম্যানরা কলকাতার মোহনবাগান থেকে কাকে নিয়ে এসেছে?'

'আনুক না, আমাদের ব্যাকে দক্ষিণ পাড়ার হাবিব আর সিরাজ আছে না। ফাউল করে পা ভেঙে দেবে।'

'তাহলে মারামারি বেঁধে যাবে না?'

'আরে বোকা, আমরা তো মারামারিই চাই।'

'মারামারি করে সেমিফাইনালে জেতা যায়?'

'আমরা দরকার হলে মারামারি করে ফাইনালেও জিতব। আমাদের জিততে হবে। সারা শহর আমাদের বিরুদ্ধে কেন বুঝিস না? শহরের সব দোকানপাট হাট-বাজারে আমাদের গাঁয়ের লোকেরা কর্তৃত্ব করে। এ জন্য পইরতলা, কাজীপাড়া, বণিকপাড়ার বণিকরা, উলচাপাড়া, মধ্যপাড়ার উঠতি ব্যবসায়ীরা আমাদের ক্ষমতা খর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে চায়। মনে করে মৌড়াইল গাঁয়ের মোল্লাবাড়ির মুরুব্বিরা নেই। আমাদের দাপটের দিন শেষ হয়ে গেছে। খেলাটা তো আসলে আমাদের বাড়ির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, বুঝলি না?'

মাহমুদ কিছু বুঝতে না পেরে ছোট মামুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তাহলে তো খেলার মাঠে হাঙ্গামা বেঁধে যেতে পারে?'

'পারে মানে? আমাদের হারাতে চাইলে আলবাৎ আমরা সবাইকে পেটাব। আমাদের জিততে হবে, বুঝলি না?'

'আমার তাহলে খেলা দেখে কাজ নেই।'

'কাপুরুষ! দেব একটা থাপ্পড় লাগিয়ে। চল আমার সাথে স্টেশনে। কলকাতা থেকে ওদের টিমে কারা আসছে দেখি।'

ছোট মামু সারোয়ার মাহমুদের হাত ধরে টেনে স্টেশনের দিকে রওনা দিল।

এ হলো সকালবেলার ঘটনা।

এখন বেলা তিনটেয় মাহমুদ নিজেও উত্তেজিত। মোহামেডানে খেলার জন্য দু'জন সুদর্শন প্লেয়ার এসেছেন, ম্যাকোয়া ও ইউজিন। দু'জনই আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়। নিজের গাঁয়ের লোকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে মাহমুদ এখন নিজেও উত্তেজিত। খেলার নেশায় আজ সে নিজের বাড়ির কথাও ভুলে গেছে। আজ কোহিনুরকে বাইরে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়নি। বাড়িতে রেখে কাঁঠালের খেঁতা ও ফেন খেতে দিয়ে এসেছে। আর মোরগ-মুরগিগুলোকে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার সময় খোঁয়াড়ে তোলার জন্য মসজিদের তালেবেলেম ছেলেটাকে বলে এসেছে। আজ থেকে মায়ের ব্যবস্থামতো সে মাহমুদদের ঘরেই থাকবে।

বেলা সাড়ে চারটের দিকে মোহামেডান ও ইয়াংম্যান ক্লাবের খেলা শুরু হতেই উত্তেজনায় নিয়াজ মাঠের অসংখ্য দর্শক নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকল। হুইসেল পড়ার সাথে সাথেই মাহমুদ দেখল, তার মেজো মামু সাফফাত সেন্টারের গোল রেখা ভেদ করে একটু এগিয়েই মাঠের ডানদিকে অপেক্ষমান ইউজিনকে পাস দিয়ে নিয়ে দৌড়ে প্রতিপক্ষের সামনে পৌঁছতেই ইউজিন কয়েকজনকে কাটিয়ে সাফফাতকে বল গড়িয়ে দিতেই সাফফাত মুহূর্তমাত্র বল স্টপ করে সোজা এক অভাবনীয় কায়দায় পেনাল্টি এরিয়ার দু'হাত দূর থেকে উঁচু করে গোলপোস্টের দিকে কিক মারল। দম বন্ধ করে রাখা দর্শকদের মধ্য থেকে ঐকতানের মতো বেজে উঠল, 'গোল গোল গোল।' মনে হয় এ অভাবনীয় দৃশ্যে রেফারিও বুঝি ক্ষণকাল বিহ্বল থেকে বাঁশি বাজিয়ে আঙুল তুলে সেন্টারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এবার মৌড়াইল গাঁয়ের দর্শকবৃন্দ মাঠের যে অংশে সাধারণত জমায়েত সে অংশটা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

কেউ ভাবেনি যে মোহামেডান ও ইয়াংম্যান ক্লাবের মতো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি দলের খেলায় এমন একটা পরিচ্ছন্ন গোল হবে। সাধারণত দু'টি দলই পেনাল্টি এরিয়ায় প্রতিপক্ষকে বাগে পেলে ফাউল না করে ছাড়ে না। রেফারির পর্যন্ত সাহস থাকে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায়সঙ্গত পেনাল্টি ডিক্লারের। যাদের বিরুদ্ধেই পেনাল্টি বাজাবে তারাই রেফারিকে মারতে আসবে।

সেদিনের খেলা আর জমল না। কেউ প্রতিপক্ষের ব্যাকের কাছে পৌঁছবারই সুযোগ পেল না। সেন্টার ফরোয়ার্ডরা পেনাল্টি রেখার কাছাকাছি গেলেই কোত্থেকে যমের মতো অন্য কেউ এসে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তার ওপর আঘাত হানে। আহত খেলোয়াড় বেহুঁশ হয়ে মাঠে পড়ে থাকেন। রেফারি পেনাল্টি দেয়ার সাহস হারিয়ে শুধু ফাউল ডিক্লেয়ার করে নিজের জান বাঁচান। এ যাত্রা মোহামেডান ১-০ গোলে জিতে ফাইনালে চলে যায়। আর শহরে ছড়িয়ে পড়ে মোল্লাবাড়ির বিরুদ্ধে দারুণ উত্তেজনা।

এ পাড়ার লোকেরা বেশ চিন্তা-ভাবনা করে বাজারে বেরোয়। কারণ শহরে পরাজয়ের উত্তেজনা। তবে মৌড়াইল মহল্লার লোকদের গায়ে হাত তোলার সাহসও কারো নেই। কারণ এ গাঁয়ের কাছে শহরের লোকদের বার বার আসতে হয়। এ মহল্লাতেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন, এসডিও'র বাংলো, জর্জ ফিফথ হাই স্কুল ও নিয়াজ পার্ক। তবুও ক্ষণ উত্তেজনায় শহরের কাঁপুনি থামে না। যারা শহরের অন্নদা স্কুল কিংবা এডোয়ার্ড স্কুলের ছাত্র তাদের অভিভাবকগণ পুত্র-কন্যাদের অন্তত একটা দিন স্কুলে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখেন। কে জানে, মাথা গরম শহর কখন কাকে অপমান করে বসে। ঘরে ঘরে খেলার উত্তেজনা। শহরের লোকেরা ভাবে, অন্যায়ভাবে তাদের হারিয়ে দেয়া হয়েছে। গায়ের জোরে। অথচ মাহমুদ দেখেছে কি নৈপুণ্যের সাথে মেজো মামা প্রতিপক্ষের গোলের ভেতর বল ঢুকিয়ে দিয়েছে।

পরের দিন নিজের স্কুলে গিয়ে মাহমুদ শুনতে পেল ফাদার জোনস পাড়ার টিম বিজয়ী হওয়ায় স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। মাহমুদ স্কুলের বারান্দা থেকে নামার সময় দপ্তরি রোশন মিয়া বলল, 'আপনাকে ফাদার লাইব্রেরিতে ডেকেছেন।'

মাহমুদের বুকটা ধক করে উঠল। নিশ্চয়ই সাদা পেত্নীটা ফাদারের কাছে নালিশ দিয়েছে। মাহমুদ ভয়ে ভয়ে লাইব্রেরির দরজায় দাঁড়াতেই ফাদার ডাকলেন, 'ভেতরে এস।'

মাহমুদ ফাদারের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে তার পা কাঁপছে। ফাদার এক্ষুনি যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি সাদা চামড়ার মানুষদের হিংসা কর কেন? কিংবা তার স্বভাবসুলভ ভাষায় তুমি মারিয়াকে অপমান করেছ, তার কাছে ক্ষমা চাও। তখন কেমন হবে?

ফাদার মুখ তুলে তাকালেন। মুখে মৃদু হাসি, 'তুমি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ডেফোডিল কবিতাটির যে ব্যাখ্যা লিখেছ তা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি তোমাকে 'ঈশপস ফেবল' বইটি উপহার দেয়ার জন্য ডেকেছি।'

মাহমুদ হাফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, মারিয়া মুখে যাই বলুক, ফাদারকে কিছু বলেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত সয়-সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারে আনুর জামাই যে আশা নিয়ে এসেছিল এর কিছুরই আপাতত সম্ভাবনা নেই দেখে সে অনেকটা হতাশ হয়েই বড় আম্মার ঘরে গিয়ে হাজির হলো। আমজাদ মিয়াকে সকালে নাশতা খাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নিজের কামরায় ঢুকতে দেখে বড় আম্মা একটু অবাকই হলেন, 'কি ব্যাপার আমজাদ মিয়া? কি মনে করে?' মোড়াটা জামাই মিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বড় আম্মা বললেন, 'বসুন। আপনারও বোধ হয় ছুটি ফুরিয়ে এল...।'

'এ ব্যাপারেই আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি বড় আম্মা। মাসও শেষ। আগামি মাসের পহেলা তারিখ আমার কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।'

'এবারও কি আনুকে ময়মনসিংহের গাঁয়ের বাড়িতে রেখেই আপনি কলকাতায় যাবেন?' শাশুড়িসুলভ তীর্যক ভঙ্গিতে একবার মেয়ে জামাইয়ের দিকে তাকালেন বড় আম্মা, 'সারা বছর আমাদের মেয়েটাকে গাঁয়ের বাড়িতে রেখে আপনি কলকাতায় পড়ে থাকবেন এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আমজাদ মিয়া। জানুর আব্বা বেঁচে থাকলে মেয়েকে কিন্তু এভাবে একটা অজ পাড়াগাঁয় ফেলে রাখতে দিতেন না। লেখাপড়া শেষ করে আপনি যখন কলেজে চাকরি নিলেন তখন জানুর আব্বা খুব খুশি হয়েছিলেন এই ভেবে যে, আপনি আনুকে আপনার নিজের কাছে নিয়ে রাখবেন।'

বড় আম্মার কথায় একটু হকচকিয়ে গেল আমজাদ। সে অন্য বিষয় নিয়ে আনুদের এই প্রভাবশালিনী সৎ মায়ের কাছে এসেছিল। আমজাদ ভাবেনি যে বড় আম্মা তার কামরায় ঢোকামাত্রই আনুর গাঁয়ে পড়ে থাকার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করবেন।

আমজাদ আমতা আমতা করে বলল, 'আনুকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটু অসুবিধা আছে বড় আম্মা। আমার গাঁয়ের বাড়িটা একেবারে অনাবাদি ছাড়া বাড়ির মতো পড়ে আছে। তাছাড়া আমার নিজের কিছু জমিজমাও আছে। এসব দেখাশোনা করার জন্য বাড়িতে যারা আছে তাদের ওপর ভরসা রাখতে পারি না।'

'আপনার আম্মা তো এখনও বেঁচে আছেন। শুনেছি বেয়াইন বেশ শক্তমক্তই আছেন...।'

'তাহলেও আনুকে তার দরকার।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি বিয়ের সময় আপনাদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল আমাদের মেয়েটাকে আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে শহরে বন্দরে যেখানেই আপনি থাকেন আপনার সাথেই রাখবেন। কারণ আমাদের মেয়েকে আমরা গ্রাম্য গৃহস্থালীর উপযোগী করে গড়ে তুলিনি। তারা প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে। এর জন্যই তার বাপ আপনার পড়ার খরচ বাবদ বেপরোয়া খরচ করে আপনাকে এমএ পাস করিয়েছে। এরপরও যদি আনুকে গিয়ে আপনার ঘর গৃহস্থী ঠেলতে হয়, ধান ভানতে হয়, সেটা কিন্তু আমাদের কারো চোখেই ভালো ঠেকছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না না আম্মা, আনুকে আমাদের বাড়িতে কিছুই করতে হয় না। আমাদের ধান পাটের লওয়াথোয়া করার জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া আমার এখন নতুন চাকরি। একটু সচ্ছলতা পেলেই আমি আপনাদের মেয়েকে শহরে নিয়ে যাব।' আমজাদ মোড়াটায় বসল, 'ভেবেছিলাম যদি এখানে ভাগ বাটোয়ারাটা হয়ে যায় তাহলে আগামি মাসেই কলকাতায় নিয়ে বাসা বাড়ি করে থাকব।'

এবার বড় আম্মার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে আমজাদ সকালের নাশতা না করেই কেন তার কামরায় হাজির হয়েছে।

'ও আপনি তাহলে আপনার স্ত্রীর পাওনার ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছেন। দেখুন জামাই মিয়া, আমি এদের সৎ মা। আমি নিঃসন্তান। সম্পত্তি এখন ভাগ হলে লাভবান হতাম আমি। আমি সেটা চাইও।'

এ সময় বড় আম্মার নিজের কাজের মেয়ে নাশতার প্লেট ইত্যাদি খাটের ওপর দস্তরখান বিছিয়ে রেখে গেল।

'নিন বিসমিল্লাহ করুন। যে কথা বলছিলাম, আমিও মোল্লা সাহেবের পুঁজিপাট্টা যা কিছু আছে শরিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে বলি। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাতবর ব্যক্তিরা ছোটবিবির এতিম ছেলেমেয়ে আর আপনার নিজের শালাশালীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখনই ভাগবাটোয়ারা করতে সম্মত হননি। আমি তাদের অসম্মতির পরোয়া না করলেও পারতাম। কিন্তু আমি আমার সতীনের ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তৈমুর মিয়ার হেফাজতের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি।' আমজাদের পাতে গরম পরোটা ও মুরগির ঝোল তুলে দিলেন বড় আম্মা, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এতে আপনি সন্তুষ্ট নন। আপনি তাহলে শহরের মাতবরদের কাছে গিয়ে আপনার স্ত্রীর অংশ আলাদা করে দিতে বলুন।'

আমজাদ ততোক্ষণে নাশতার প্লেটে হাত লাগিয়েছে। ঝোলে ভিজিয়ে সে পরোটার অংশ মুখে পুরে বলল, 'না আমি বলছিলাম কি দোকানপাট আর নগদ টাকার ব্যাপারটা না হয় ব্যবসার খাতিরে এখন তৈমুর ভাইয়ের হাতেই থাক। কিন্তু প্রায় একশ-দেড়শ বিঘা জমি তো এখন ভাগবাটোয়ারা করে দিলে পারে।'

'এই আরেকটা ভুল আপনি করছেন জামাই মিয়া, খেত খামার হলো স্থাবর সম্পত্তি। এর বাটোয়ারা এই মুহূর্তে কি দরকার? এ তো আর কেউ লোপাট করে দিতে পারছে না। যেমন আছে তেমনি দশ বছর পরও থাকবে।' বড় বিবি তার মুখটা হঠাৎ আমজাদ মিয়ার কানের কাছে এগিয়ে আনল, 'আসল বিষয় হলো মোল্লা সাহেবের অস্থাবর সম্পত্তি। নগদ টাকা-পয়সা। তৈমুর সকলেরই এখন খুব বিশ্বস্ত, কিন্তু বিশ্বস্ত কতদিন থাকতে পারবে? সিন্দুকে যে টাকা ছিল এর বাইরেও মোল্লা সাহেবের যে লাখ লাখ টাকা ছিল না এর প্রমাণ কি? অনেক ব্যবসায়ীই মোল্লা সাহেবের টাকায় শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাচ্ছে। একথা আমার ভাইয়েরা আমাকে বলেছে। এ টাকার সন্ধান একমাত্র তৈমুর ছাড়া কেউ জানে না। ক্যাশের যে হিসাব রয়েছে মাতবরদের সামনে এর বাইরের হিসাব তো তৈমুর কারো কাছে ভাঙছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি পারেন সেটার খোঁজ করুন। তখন আপনাকে খেরো খাতার ভয় দেখাতে পারবে না, বুঝলেন কিছু?'

'আরে বড় আম্মা, আপনি তো আমাকে একটা নতুন কথা বললেন, তাই তো, আমি তো বিষয়টি চিন্তাই করিনি? আনু তো মনে করে তার ভগ্নিপতি একজন ফেরেশতা। আমার শ্বশুরের সব লেনদেনের বিষয়টা আপনাদের বড় জামাই ছাড়া কেউ জানে না। এটা না জেনে তো অংশিদাররা একজনের ওপর কায়কারবারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। আপনি তো আমার চোখ খুলে দিলেন বড় আম্মা।'

বলতে বলতে তার নিজের পায়ে কদমবুসি করার জন্য আমজাদকে নুয়ে পড়তে দেখে বড় আম্মা বললেন, 'আরে জামাই মিয়া করেন কি, থাক আর কদমবুসি করতে হবে না। শুনুন, আমার কথা নিয়ে এখন কোনো হৈ-হল্লা বাঁধিয়ে বিষয়টি মাটি করবেন না। এতে তৈমুর সতর্ক হয়ে যাবে। সে ভাবছে আমরা কেউ কিছু জানি না। কাগজপত্র ছাড়া যেসব লেনদেনে আপনার শ্বশুরের লাখ লাখ টাকা বাজারে খাটছে, সে ভেবেছে সে ধীরে ধীরে হাতিয়ে নেবে। ঋণ যারা নিয়েছে তারাও বিষয়টি কাউকে জানাবে না। কারণ তাহলে তৈমুর ভবিষ্যতে আর তাদের কোনো পুঁজি দেবে না।'

ফিস ফিস করে কথা বলছেন বড় আম্মা। একটু আগে তিনি আনুর ব্যাপারে যে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন সে চেহারাখানা যেন মন্ত্রবলে কেউ পাল্টে দিয়েছে। ধূর্ত আমজাদ মিয়া পর্যন্ত অবাক, 'আর আমাকে কিনা আমার লেখাপড়ার জন্য নেয়া টাকার হিসাবটার ভয় দেখায়? এখন আমি নিজেই সেটা সকলকে দেখাতে বলব। আমি তো আর পুকুরচুরি করিনি, কি বলেন বড় আম্মা?'

'না ওটা দেখতে চাইবেন না জামাই মিয়া। তাহলে আপনার হিতে বিপরীত হবে। কারণ আপনি কম নেননি। সে হিসাব চাইতে গেলে আপনার শুধু টাকা-পয়সা কেন, হয়ত জমিজমাও আর পাওনা থাকবে না। মাঝে মধ্যে আপনার টাকা নেয়ার ব্যাপারে আপনার শ্বশুরের মতো চাপা লোকও অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনিই একবার আমাকে বলেছিলেন, আমজাদটা কলকাতায় কোন পথে টাকা ওড়াচ্ছে আল্লাহ মালুম। সপ্তাহে দু'বার টাকার জন্য টেলিগ্রাম করে। মেয়েটিকে কার হাতে যে দিলাম? এ তো দেখছি আগরতলার রাজকুমারদের মতো দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। অথচ এক কিষাণের ছেলে লেখাপড়ায় এগিয়েছে দেখে মেয়েটাকে দিলাম। আমার টাকা পেয়ে এখন সে নবাবেরও বাড়া চালচলন শুরু করেছে। আমি কি জানতাম আরেক প্রমথেশ বড়ুয়াকে আমি মেয়েজামাই করেছি?' নিজেই নিজের কথায় হেসে ফেললেন বড় আম্মা, 'সে জন্যই বলছি ওসব হিসাবের কথা দেখতে না গিয়ে আপনি ডাক্তার বাবু আর বিহারি বাবুকে আপনার সন্দেহের কথাটা জানিয়ে রাখুন। ছোট বিবিকেও একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। তবে আমার কথা কাউকে বলবেন না। কেউ যেন না জানে যে, আমি তৈমুরকে সন্দেহ করি। এতে আপনার আমার দু'জনের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময় আনোয়ারা দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে বড় বিবির কামরায় ঢুকতেই দু'জনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বড় আম্মা আর আমজাদের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে গিয়ে আনোয়ারা বলল, 'শুনলাম তুমি সাত সকালে আম্মার ঘরে বসে নাশতা খাচ্ছ... ।'

তার কথা শেষ হবার আগেই বড় আম্মা বললেন, 'আরে এই যে আনু, আমি তোর জামাইকে আজ সকালে আমার সাথে নাশতা খেতে ডেকেছিলাম। বেচারা এসেছে অথচ আমাদের নিজেদের পেরেশানির জন্য একদিনও ওর সাথে ওদের বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে একটু আলাপ করতে পারি না। বেয়াইনের খোঁজ-খবর নিতে পারিনি। জানু কি তৈমুরকে বাজারে বিদেয় করে কামরায় ফিরেছে?'

'না, বুবু এখনও পাকঘরের কাজ করছে। তৈমুর ভাইকে আমিই খাইয়ে বাজারে বিদেয় করেছি। বুবু সাফফাতের খেলোয়াড়দের জন্য পাউরুটি আর ডিমের ওমলেট বানাচ্ছে। যাই আমি গিয়ে একটু সাহায্য করি।'

আনোয়ারা বেরিয়ে গেলে বড় আম্মা আমজাদ মিয়ার কানের কাছে মুখ এনে আবার বলল, 'সাবধান জামাই মিয়া, এসব কথা যেন আনু জানতে না পারে।'

'আনুকে জানাব, আপনি পাগল হয়েছেন বড় আম্মা?"

'আরেকটা কথা। শহরের মাতবরদের কাছে কথাটা পেড়েই আপনি আনুকে নিয়ে এবারকার মতো ময়মনসিংহ চলে যান। সেখান থেকে আপনার কাজের জায়গায়। একটু ধৈর্য্য ধরে এগুতে হবে। মনে রাখবেন আপনার আর আমার মতলব হাসিল করতে হলে সবুরের দরকার। আর ফাদার জোনসের কাছে ওসব তুলতে যাবেন না। কারণ সে তৈমুরকে সাধু-সন্ত মনে করে। সে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ শুনলেই আপনাকে সন্দেহ করবে।'

'আমি জানি।'

'তাহলে খোদা হাফেজ।'

আমজাদ মহা খুশি মনে বড় আম্মার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরল তৈমুর। মুখখানা গম্ভীর। জাহানারা স্বামীর সামনে ভাত বেড়ে দিয়েই বুঝল শহরে বা দোকানে নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে। কিন্তু মুখের ওপর খাবার সময় জাহানারা সাহস করল না কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে। খাওয়া শেষ করে বিছানায় এসেই জাহানারা প্রশ্ন করল, 'খেলাধূলো নিয়ে শহরে কিছু হয়েছে নাকি?'

তৈমুর ছোট্ট জবাব দিল, 'না তো!'

'তাহলে গোমড়া মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকলে কেন? এখনও গাল ফুলিয়েই রেখেছ, একটা কথাও বলছ না?'

তৈমুর কি জবাব দেবে যেন ভেবে পাচ্ছে না।

'ক্যাশ নিয়ে কোনো গোল বেঁধেছে বুঝি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে না। ক্যাশ তো আজকাল ফিরোজ মিয়াই মেলায়। আমি মেলাতে গেলেই গোল বাঁধে। এখন ফিরোজের হাতে দোকানের হিসাব ছেড়ে দিয়েছি।'

'তাহলে দুশ্চিন্তা করছ কেন?'

'দুশ্চিন্তা না করে আর পারছি না মাহমুদের আম্মা। কোন দিকটা সামলাব বল, ব্যবসা-বাণিজ্য আর খেতখামার দেখলে তোমার ভাইদের দেখতে পারছি না। তুমি তো জান, তোমার ভাইয়ের আমার ডাক-দোহাই কিছু শোনে না। লোকে বলবে আমার অভিভাবকত্বের কারণেই তোমার ভাইয়েরা নষ্ট হয়ে গেল। আমি এখন কি করি? আল্লাহ আমার ওপর কেন এ দায়িত্ব দিলেন যা বইবার শক্তি আমার নেই?'

তৈমুর স্ত্রীর দিকে পাশ ফিরে শুতেই জাহানারা বিছানায় উঠে বসে গেল, 'কি হয়েছে খুলে বলছ না কেন?'

'কি খুলে বলব? তোমার কাছে বলার উপযোগী কথা হলে তো বলব? এমন কথা যা আমি তোমার কাছে বলতেও লজ্জা পাচ্ছি।'

'সেকি?'

'তোমার ছোট ভাই যেটার নাক টিপলে এখনও দুধ বেরিয়ে আসবে, আজ জানলাম সে নিয়মিত খারাপ পাড়ায় ঘোরাফেরা করছে।'

'কিসব যা তা বলছ?'

'দেখ জানু, আমি বাজারের লোক। ছোটবেলা থেকেই বাজারের আবহাওয়ায় কেটেছে। বাজারে যা রটে তা সবার আগে দোকানদারদের কানে আসে। তোমার ভাই সারোয়ার বাজারের খানকি পাড়ার গোলাপি নামের এক কিশোরির কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছে। শুনলাম শরাবও নাকি খায়।'

জাহানারা তৈমুরের কথায় পাথর হয়ে থাকল। তার মুখে কোনো জবাব ফুটল না। সে কিছুক্ষণ নিষ্প্রাণের মতো বসে থেকে শেষে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

তৈমুর এবার সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'এটা শুনেই এতটা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এমনও হতে পারে কোনো দুষ্টু বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সেখানে যাওয়া শুরু করেছে। ভয় পাচ্ছি তো মদের নেশায় পেয়েছে বলে।'

জাহানারা কোনো জবাব না দিয়ে অন্ধকারেই ছাদের কড়িকাঠের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'আমার ছেলেটা যে এ বাড়ির আবহাওয়ার বাইরে গিয়ে একাকি আমাদের বাড়িতেই পড়ে থাকতে চায় এতে এখন আমি অখুশিই নই জানু। এর চেয়ে নিঃসঙ্গ থাকাই ভালো।'

'আমার ছেলে যেখানেই থাকুক সে ভালোই থাকবে। তুমি তো আর পাপের কামাইয়ে ছেলে মানুষ করছ না।'

'তোমার কথা বুঝতে পারলম না, তোমার ভাই কি পাপের পয়সায় মানুষ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ হচ্ছে। আমার কথা বুঝতে পারছ না?'

'বুঝিয়ে বল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানো না? আমার বাপ মানে তোমার চাচা এক জীবনে খানকিপাড়ায় পড়ে থাকতেন? লোকে দুর্নাম দেয় তিনি সেখানকার কোনো বেশ্যার পয়সাতেই নিজের মালিকের দোকানপাট কিনে বড়লোক হয়েছিলেন। তিনিও আফিমের নেশা করতেন।' জাহানারা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'তার রক্তের দোষ তো কেউ না কেউ পাবে। তুমি বৃথাই খেটে মরছ তৈমুর ভাই। আমার বাপের কিছুই থাকবে না। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সব শেষ হয়ে যাবে।'

বহুদিন যাবত জাহানারার সাথে তৈমুরের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর জাহানারাকে আগের সেই 'তৈমুর ভাই' সম্বোধনটি ছাড়াতে হয়েছিল। হঠাৎ আজ দিশেহারা মুহূর্তে জানুর এই 'তৈমুর ভাই' ডাকটি শুনে তৈমুর মনে মনে হাসল।

'অত অস্থির হওয়ার কিছু নেই। সারোয়ার এখনও ছেলে মানুষ। যাদের পাল্লায় পড়ে সে ওপাড়ায় যাচ্চে বলে খবর পেয়েছি তারাও এ শহরের অতিশ গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরই বখা ছেলের দল। ব্যাপারটা যখন বাজারে রটে গেছে তখন এর একটা বিহিত হবে।'

'কি বিহিত? তোমরা বাজারের খারাপ পাড়াটা জোর করে তুলে দিতে পারবে? ছেলেগুলোকে দুধের পুকুরে গোসল দিয়ে আনলেও এরা মানুষ হবে ভেবেছ? হবে না। আমার এখন ভয় হচ্ছে তোমাকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে কি ভয়?'

'সারোয়ার এখন তোমাকে শত্রু ভাবা শুরু করবে।'

'সেটা অবশ্য যতটুকু বুঝতে পারছি তোমার ওই অপগণ্ড ভাইটি ভাবতে শুরু করেছে। ওই প্রসঙ্গেই তো আমি এসব কথা জানতে পারলাম।' তৈমুর এবার নিজেই বিছানায় উঠে বসল, 'যে আমাকে তোমার ভাইয়ের অধঃপতনের খবরটা বলেছে, তার কাছেই জানতে পারলাম সারোয়ার মাতাল হয়ে চিৎকার করে আমাকেই গাল দিচ্ছিল। আমি চোর, আমি তোমাদের সম্পত্তি লুটেপুটে খাচ্ছি ইত্যাদি।'

'চল্র এসব ছেড়ে আমরা আমাদের ঘর-সংসারে ফিরে যাই।'

'তোমার আব্বার ব্যবসা-বাণিজ্য আর তোমার ভাইদের কি হবে?'

'জাহান্নামে যাক বাপের সম্পত্তি আর ভায়েরা। চলো কষ্টে-সৃষ্টে নিজের ছেলেটিকে গিয়ে মানুষ করি।'

'এখন আর ছেড়ে যাওয়া চলে না জাহানারা। প্রথম দিন, যেদিন আমার শ্বশুরের ইন্তেকাল হয় আমি তোমাকে এ কথা বলেছিলাম। তুমি তখন আমাকে অকৃতজ্ঞ বলে খোটা দিয়েছিলে। এখন তুমি ছেড়ে দিতে বললেই ছেড়ে দিতে পারি না। বদনাম, কুৎসা আর অপবাদ শোনার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাকে থেকে যেতে হবে। পারব না জেনেও। এটিই আমার ভাগ্য।'

'নিজের ছেলের কথা ভাববে না?'

'তার জন্য তুমি তো আছ। মাহমুদ মানুষ হবে আমি জানি। আমি দোয়াও করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিভাবে জান?'

'যারা মানুষ হয় তাদের মুখে সেটা লেখা থাকে। মাহমুদের মুখে যে লেখা, আমি পড়তে পারি। ও তো ঠিক তোমার মতো হয়েছে। তোমার মতোই ওর আত্মসম্মানবোধ, তোমার মতোই লজ্জা। দেখ আমাদের মাহমুদ অনেক বড় হবে। টাকা-পয়সা হয়ত হবে না, তবে বিদ্বান হবে।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাই যেন করেন।'

ত্বরিৎ বিছানা থেকে উটে জাহানারা তৈমুরকে জড়িয়ে ধরলে তৈমুর জাহানারার ললাট রেখায় সহসা একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে স্ত্রীকে গভীর স্পর্শে আদর করতে থাকল।

১০

এশার নামাযের ঘণ্টাখানেক পর মাহমুদ বাড়ির উঠোনে কারো প্রবেশের আওয়াজ পেয়ে হারিকেন বাতিটা উসকে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে উঠোনে?'

'আমি মসজিদ থেকে এসেছি। আবদুল আলিম।'

খুব বিনীত সুরে আগন্তুক তার নাম বলল।

মাহমুদ বুঝল যে তালেবেএলেম ছেলেটি। মসজিদে ইমাম হুজুরের সাহায্য করার জন্য অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেয়ার জন্য যাকে রাখা হয়েছে। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদরাসায় পড়ে। তার থাকার জায়গার কোনো ব্যবস্থা এখনও কেউ করে দেয়নি বলে তার আম্মা তার সাথেই একে রাখতে বলে গিয়েছিলেন।

মাহমুদ উঠে দুয়ার খুলে দিয়ে বলল, 'এসো।' ছেলেটিও গোটানো বিছানা নিয়ে, 'আসসালামু আলাইকুম' বলে বিনীতভাবে ঘরে প্রবেশ করল। ছেলেটি মামুদেরই বয়সের। লম্বা সফেদ পিরহান, মাথায় গোল টুপি। পরিধানে লুঙ্গি ও পায়ে রবারের স্যান্ডেল। গায়ের রং মাহমুদের চেয়ে ঈষৎ ময়লা হলেও তাকে ফর্সাই বলা যায়। চেহারায় এক ধরনের ভয় মেশানো লাবণ্য টলটল করছে। চোখ দু'টি ছোট কিন্তু উজ্জ্বল। স্বাস্থ্য সুগঠিত। সে ঘরে ঢুকে গোটানো বিছানা বগলের নিচে নিয়ে দিশেহারা দৃষ্টিতে ঘরের আসবাবপত্র দেখছে।

'তোমার শোয়ার জন্য আমার চৌকিটা ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি এখানে শোও। আমি আব্বা-আম্মার খালি বিছানায় খাটের ওপর শোব।

মাহমুদের কথায় আবদুল আলিম নিঃশব্দে মাহমুদের চৌকিতে বিছানা পাতল।

মাহমুদ বলল, 'মসজিদের বারান্দার পাশে তো একটা কামরা আছে। আগের মুয়াজ্জিন সেখানে থাকতেন। তোমাকে কেন সেখানে থাকতে দেয়নি?'

'আমাকে তো সেখানেই থাকতে দিয়েছিল। আমি থাকিনি।'

'কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার একা থাকতে ভয় লাগে। এক রাত থেকেছিলাম। এতবড় মসজিদ, আল্লাহর ঘর, সারারাত খাঁ খাঁ করে। সে রাতে একটুও ঘুমতে পারিনি। কেবল মনে হয়েছে কারা যেন মসজিদে চলাফেরা করছে। কারা যেন নামাজ আদায় করছে। ভয়ে আমি সারারাত জোরে জোরে কুরআন পড়ে সজাগ রাত কাটিয়েছি।'

কথা বলার সময় আবদুল আলিমের চোখের পাতা ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে থাকল। মাহমুদ হেসে বলল, 'তুমি বুজি কুরআনে হাফিজ?'

'না এখনও সবটা হেফজ করতে পারিনি। তবে বছরখানেকের মধ্যেই পুরোটা মুখস্ত বলতে পারব। ক্বেরাত অত সোজা ব্যাপার নয়।'

'তুমি কার কাছে শেখ?'

'আমার ক্বারী হুজুরকে তো সবাই চেনে, ফখরে বাঙ্গাল হযরত মওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব।'

ছেলেটি বিছানায় বসল।

আবদুল আলিমের শিক্ষককে এ বাড়ির সবাই চেনে। শ্রদ্ধা করে। মাহমুদের আব্বার তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এ বাড়িতেও বিয়েশাদি, মিলাদ-খাতনায় মাঝেমধ্যে তিনি আসেন। তখন তার মাথায় থাকে কালো টোপর পরা এক বিশাল সবুজ পাগড়ি। তিনি মোল্লা বাড়িতে আসছেন শুনলেই বাড়িতে তমিজ রক্ষার হুড়াহুড়ি পড়ে যায়। দেয়াল থেকে ছবি, মানুষের আকৃতি আঁকা ক্যালেন্ডার ইত্যাদি নামিয়ে ফেলা হয়। সবচেয়ে সতর্ক থাকেন জেনানা মহল। বেপর্দা কাউকে দেখলে তিনি যদি আবার এ বাড়িতে লোকমা ধরতে রাজি না হন? যেসব যুবকদের মাথায় চুল লম্বা তারা ভয়ে আড়াল খোঁজে। হুজুরের চোখে পড়লেই ডাক দিয়ে বলবেন, 'ইধর আও।'

ভয়ে ভয়ে তার নির্দেশমতো কাছে গেলে বলবেন, 'কিসকা বেটা হো তুম? বাপ কা ক্যায়া নাম?'

বাপের নাম বললেই তিনি সহজে চিনে ফেলে ধমকে উঠবেন, 'ইতনা শরীফ আদমিকা এ্যায়সা বেলেহাজ ফরজন্দ? যাও বাল কাটকে টোপি পিনকে আও।'

এ অবস্থায় শহরের সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক-যুবতিরা তার চলাফেরার সম্ভাব্য পথকে এড়িয়েই চলে। তবে তাঁকে শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অন্তর থেকে ভালোওবাসে। তাকে না হলে এ শহরের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানই চলে না। দু'টি ঈদের নামাযে তিনিই ইমামতি করেন। তার সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তেলাওয়াত শুনতে শহরের সকলের কানই তৃষ্ণার্ত থাকে। অসুখে-বিসুখে কিংবা কোনো ধর্মীয় জলসায় যোগ দিতে তিনি দেশের বাইরে থাকলে সে বারের ঈদের জামাত যেন অপরিতৃপ্ত থেকে যায়। তাছাড়া তাঁর মতো নির্লোভ, আত্মভোলা আলেম সচরাচর দেখা যায় না।

আবদুল আলিম মওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবের শিষ্য জেনে মাহমুদও কেমন যেন একটু শ্রদ্ধামিশ্রিত বিব্রত অবস্থায় পড়ে গেল। মাহমুদের টেবিলে ছড়ানো বইপত্র দেখে আবদুল আলিম জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বুঝি ইংরেজি স্কুলে পড়েন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, শুধু ইংরেজি স্কুলেই পড়ি না, সাহেব-মেমসাহেবদের কাছে পড়ি। তা বলে আমাকে আপনি বলতে হবে না, আমি তো তোমার সমবয়েসিই হব। আমার নাম মাহমুদ। নাম ধরে ডাকলেও চলবে।'

'আপনি কুরআন পড়েননি?'

'কেন পড়ব না? আমিও তো মোল্লা। জানো না এটা মোল্লা বাড়ি? সবাইকে খুব ছোট বয়সেই কুরআন খতম করতে হয়, নামায পড়া শিখতে হয়। তবে তোমার মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি না।'

'আমার হুজুরের কাছে শুনেছি এ বাড়ি থেকে নাকি আগেরকালে অনেক আলেম-ওলামা বেরিয়েছেন। তারা অনেকে বড় বড় কিতাব লিখে গেছেন, সে কিতাব এখনও দেওবন্দে পড়ানো হয়।'

এ বাড়ির অতীত সম্বন্ধে আবদুল আলিমের বেশ পরিষ্কার ধারণা আছে দেখে মাহমুদ খুশি হলো, 'হ্যাঁ আমিও শুনেছি। তবে এখন তো আরবি ফারসির চর্চা আমাদের বাড়িতে কেউ করেন না।' হাসল মাহমুদ, 'লেখাপড়ার দিকেও এ বাড়ির মানুষের ঝোঁক কমে গেছে। সকলেই এখন ব্যবসায়ী। তবে এখন পর্যন্ত আমদের বাড়ির কেউ সরকারি চাকরি নেয়নি।'

'আপনি তো ইংরেজি পড়েন। আপনিও পড়া শেষ করে ব্যবসা করবেন?'

হেসে প্রশ্ন করল আবদুল আলিম।

মাহমুদ হাসল, 'না, দোকানদারি আমার ভালো লাগে না।' মাহমুদ বুঝল, আবদুল আলিম যদিও তারই বয়েসি, তবুও কথাবার্তায় এবং ছবিসুরতে তার চেয়েও ছেলেমানুষি কৌতূহলে পূর্ণ। 'আমি লেখাপড়া শিখে কি করব তা কি এখনই জানি? আমার কেবল বই পড়তে ভালো লাগে। এমন বই যাতে আমার অজানা অনেক বিষয় থাকে। আমি এমন কিছু করব যাতে আমার বইপড়া বন্ধ করতে হবে না।' মাহমুদ কথা বলতে বলতে তার বাপ-মায়ের বিছানায় গিয়ে বসল, 'এখন রাত হয়েছে অনেক, চল শুয়ে পড়ি। আর কাল সকাল থেকে আমাকে তুমি করে বলবে।'

'আমার হঠাৎ কাউকে তুমি বলাটা আসে না যে? এক কাজ করলে হয় না?'

'সেটা আবার কি?'

'আপনি, আরে আবার আপনি বলছি, তুমি আমার দোস্ত হয়ে যাও না, তাহলে দোস্তকে তুমি বলতে আটকাবে না।'

'বেশ এখন থেকে তাই হলো।'

'তাহলে বাতি নিভিয়ে এসো শুয়ে পড়ি।'

মাহমুদ বাতি নিভিয়ে বালিশে মুখ চেপে হাসতে লাগল।

সকালে সুমধুর কুরআন তেলাওয়াতের শব্দে মাহমুদের ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙলেও আবদুল আলিমের ক্বেরাত শোনার জন্য সে বিছানায় চোখ বুজে পড়ে থাকল। আবদুল আলিম তখন সূরা রহমানের মাঝামাঝিতে চলে এসে মওলানা তাজুল ইসলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের ভঙ্গীতে প্রশ্নবোধক আয়াতগুলোতে নেমে শরীর দুলিয়ে বিচিত্র সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করছে।

খুব ভালো লাগল মাহমুদের। সে বিছানায় উঠে বসে চুপ করে ক্বেরাত শুনতে লাগল। সূরা শেষ হলে হঠাৎ কোহিনুরের ডাকটা কানে বাজতেই সে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল।

'এখন আমার ছাগিটাকে মাঠে নিয়ে যেতে হবে। হাঁস-মুরগি ছাড়তে হবে।'

আবদুল আলিম বলল, 'আমারও শেষ।' কিতাব গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'তোমাকে ঘুমে রেখে আমি মসজিদে গিয়ে ফজরের আযান দিয়েছি। নামায শেষ হলে ফিরে এসে সূরা রহমান তেলাওয়াত করে তোমার ঘুম ভাঙালাম। মসজিদে বোধহয় আমার নাশতা এতোক্ষণে দেয়া হয়েছে দোস্ত। আমি যাই, নাশতা সেরে মাদরাসায় যাব।'

আবদুল আলিম বেরিয়ে গেলে মাহমুদ বাইরে এসে যথারীতি খোয়াড় খুলে দিল। তখনও কুয়াশা ছাড়েনি। বেগুন খেতের দিকে তাকিয়ে বুঝল সারা রাত ঘন কুয়াশা ছিল। বেগুন পাতাগুলো পানিতে সপ সপ করছে। টুনটুনিদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া না গেলেও দোয়েল আর চড়ুইয়ের ডাকে সকালের আবহাওয়াটা ভরে আছে। সিঁড়ির কাছের সবগুলো ফুলগাছে ফুল ফুটেছে। বিশেষ করে গাঁদার ঝাড় ফুলে ফুলে হলুদ। সুর্মা মরিচের গাছগুলোতে কালো মেঘের কড়ে আঙুলের মতো মরিচগুলোও পুষ্ট হয়ে দুলছে। তার আব্বার প্রিয় এই মরিচ গাছগুলো। তিনিই সুর্মা মরিচ পছন্দ করেন। বেল গাছটায় অনেকগুলো কাক ডানায় মুখ গুঁজে ঝিমুচ্ছে। এখনও তাদের আহারের জন্য উড়ে যাওয়ার সময় হয়নি। কুয়াশা আর প্রচণ্ড শীতে ধূর্ত পাখিগুলো জবুথবু। মাহমুদ চাদরে শীত মানবে না দেখে গরম কাপড়ের হাফপ্যান্ট, ফ্লানেলের কলাকাতা রঙের মোটা শার্ট পরে তার ওপর নতুন বিলেতি ব্লেজার চাপিয়েছে। কোটটা গাঢ় নীল রঙের আর বোতামগুলো সোনালি রঙের। কলকাতা থেকে আব্বা সদ্য এনে দিয়েছেন। টাইও আছে মাহমুদের। তবে সে পরে না। যদিও স্কুলে টাই বাঁধাটাও তাদের শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। কেউই বাঁধে না। মাহমুদকে এ পোশাকে খুব মানায়। সবাই তাকিয়ে থাকে। এমনকি ফাদার জোনসও এ পোশাকে তাকে দেখলে প্রিত হয়ে ওঠে। বলেন, 'মাই সান, তোমাকে তো সাহেবের বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে।'

মাহমুদ তখন শরম পেয়ে মাথা নুইয়ে ফেলে। ফাদারের কৌতুহলী চোখের দিকে তাকাতে পারে না। স্কুল শেষে বাড়িতে এসেই সে ব্লেজার আর ফ্লানেলের গ্রিন শার্ট খুলে আলমারিতে রেখে দিয়ে সাধারণ শার্ট-প্যান্ট পরে মাঠে বেরোয়। যদিও লজ্জায় পড়েই মাহমুদ এমন করে, তবুও বিলেতি পোশাকের প্রতি তার মমতা বেড়ে যায়। সে আবিষ্কার করে বিলেতি পোশাকেই তাকে মানায় ভালো। ওই পোশাকেই সে সমবয়েসি শুধু নয়, সবাইকেই ছাড়িয়ে যায়। রাস্তায় ওই পোশাকে বেরুলে সবাই তার আপাদমস্তক দেখতে থাকে। পায়ে গ্লাসকিডের ইংলিশ স্যু, তাও আবার জগৎ-বিখ্যাত ফ্লেকস কোম্পানির তৈরি। মাখন রঙের উলের মোজা। তার সাথে আবার বৃটিশ কিশোরদের সর্বাধুনিক পরিধেয়, যা বিলেতে এখন প্রতিটি বালকই পরছে। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক গায়ে দিলেই মাহমুদের মনে হয় সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মতো একটি মফস্বল শহরে বুঝি একটু আলাদা। একটু বেশি স্মার্ট। আর তার চেহারা, গায়ের রঙ, শরীরের গড়নও তার কাছে মনে হয় কেমন যেন অন্যদের চেয়ে একটু বেশি সুন্দর।

এই আধুনিক রুচি তৈরি হওয়ার ব্যাপারে তার মায়ের আগ্রহই বেশি। তার মাকেও মাহমুদ দেখেছে পটের বিবির মতো সেজে থাকতে। তার আব্বা কলকাতা থেকে দোকানের জন্য মাল আনতে গেলেই তার আম্মা খ্রিস্টান মিশন থেকে আনা ইংরেজি ম্যাগাজিন দেখিয়ে দেখিয়ে ছেলের জন্য আধুনিক মডেলের প্যান্ট-শার্ট আনতে বায়না ধরে। নিজেও কাননবালা স্টাইলের শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোটের অর্ডার দেন। ফলে এ শহরের সবচেয়ে আধুনিক রুচির পোশাক পরে মাহমুদের ক্ষুদ্র পরিবারটি। এতে অবশ্য বাপ-মায়ের অন্য শরীক এবং প্রতিবেশীদের ঈর্ষারও অন্ত নেই। তারা একটু সুযোগ পেলেই টিপ্পনি কাটে। আবার নিজেরা যখন কোথাও বিয়েশাদিতে বেড়াতে যায়, তখন আসে মাহমুদের মায়ের শাড়ি-ব্লাউজ প্রসাধনী ইত্যাদি ধার নিতে।

আজ সকালে উঠোনে হাঁস-মুরগি ছাড়তে নেমেই মাহমুদ টের পেয়েছে শীতটা প্রচণ্ড। খোয়াড় খুলে দিয়েই সে ঘরের ভেতরে এসে তার গরম কাপড়গুলো পরে নিয়েছে। জুতো-মোজাও পরেছে। কারণ এখন এই কুয়াশার মধ্যেই তাকে বেরুতে হবে কোহিনুরকে মাঠে রেখে আসার জন্য। তারপর মামা বাড়ি গিয়ে নাশতা খেতে হবে। কি একটা খ্রিস্টান পরবের জন্য আজ স্কুলও বন্ধ।

মাহমুদ কোহিনুরকে নিয়ে রাস্তায় বেরুতেই দেখল উত্তর দিক থেকে কুয়াশা ভেদ করে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি তার দিকে হাত তুলে এগিয়ে আসছে। হাঁটা দেখেই মাহমুদ চিনতে পারে মারিয়া আসছে। সহসা তার মনে হলো মারিয়া মেয়েটা একটু ঝগড়াটে হলেও তেমন খারাপ নয়। শাদা চামড়া বলে একটা আহত দম্ভ থাকলেও সে মাহমুদকে অপছন্দ করে না। তাছাড়া আম্মাও বলেন, মেয়েটা দুঃখি, এতিম। এতিমদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে নেই।

এখন এই সাত সকালে আধো-আলো আধো-কুয়াশার মধ্যে মারিয়াকে মর্নিং ওয়াক করতে দেখে মাহমুদের ভালোই লাগল। আর মারিয়া যে সেদিনের সেই অপমানজনক কথাবার্তার পরও ফাদারের কাছে নালিশ করেনি এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকাও তার উচিত মনে হলো। মারিয়া কাছে এসে দাঁড়াতেই মাহমুদ অত্যন্ত সম্ভ্রমভরে তাকে সম্বোধন করল, 'এই যে মিস কুকার, কেমন আছ? তোমাকে তো কাশ্মীরি শালে দারুণ মানিয়েছে, কোথায় পেলে?'

'ফাদার বড়দিনে প্রেজেন্ট করেছিলেন।'

'দারুণ।'

'তোমার ভালো লেগেছে?'

'খুব।'

'তাহলে আগামি বড়দিনে আমি একটা শাড়ি পরব। তোমার মাদার আমাকে শাড়ি পরা শিখিয়ে দেবেন বলেছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসল মারিয়া। মুখখানি শীতের দাপটে শুকনো হলেও তার হাসিটা সরল। মাহমুদ দেখল যে গায়ে কাশ্মীরি শাল থাকলেও মারিয়া শীতে ঠির ঠির করে কাঁপছে। তার ঠোঁট ফেটে রক্তবর্ণ হয়ে আছে। গাল আর নাকের ডগাও লাল। নাকে সর্দি থাকায় একটা রুমালে বার বার নাক আর চোখ মুছছে।

মাহমুদ বলল, 'তোমার তো সর্দি লেগেছে বলে বোধ হচ্ছে। এত সকালে ভর কুয়াশার মধ্যে কেন বেরিয়েছ?'

'ও কিছু নয়। কোহিনুরকে ব্রেকফাস্টে নিয়ে যাচ্ছ বুঝি?'

মারিয়া আবার হাসার চেষ্টা করতে গিয়ে ফাটা ঠোঁটের কারণে সুন্দর করে হাসতে পারল না। হাতের রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে শীতে কাঁপতে লাগল। মাহমুদ দেখল, মারিয়ার পায়ে সাধারণ একজোড়া কম দামের চটি। সাধারণত সায়েবরা এ ধরনের চটি পরে না। এ চটিতে শীত ঠেকানো অসম্ভব। সহসা মাহমুদের মনে পড়ল মেয়েটি গরিব। সায়েবের বাচ্চা হলে কি হবে, মিশনে সে অরফেন। তার মা তাকে বলেছিল, মারিয়া মেয়েটির বাপ-মা কেউ নেই বলেই মেয়েটা মিশনে আশ্রিতা। তাকে প্রকৃতপক্ষে দেখার কেউ নেই। মিশনের এ দেশিয় খ্রিস্টানরাও তাকে তেমন পাত্তা দেয় না। আর সায়েবসুবো যারা মিশনে পরিবার নিয়ে আছে তারাও সম্ভবত মারিয়ার সাথে ভালো ব্যবহার করে না কিংবা ডেকে একটু আদর করে না। যদিও সারাদিন ঐসব সায়েব-মেমরা খ্রিস্টীয় সেবা ও দয়ার কথা বলে। কেবল ফাদার জোনসই মারিয়া কুকারকে একটু আদর করেন। ফাদারই শিশু অবস্থায় মারিয়াকে মিশনে নিয়ে আসেন এবং এক বাঙালি খ্রিস্টান ধাত্রীর কাছে রেখে লালন-পালন করান। বহুদিন আগে মারিয়ার সেই ধাত্রী মাতাও মারা গেলে মারিয়া একা একাই মিশনের হোস্টেলে থেকে এতটুকু বড় হয়েছে। মারিয়া অবশ্য খুব ভালো ছাত্রী। ক্লাসে ঘোষপাড়ার কংকা আর মাহমুদ প্লেস নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মারিয়া কুকার তৃতীয় স্থান স্থায়ীভাবে দখলে রেখেছে। যে কোনো সময় ওপরেও উঠে আসতে পারে। কেবল সে একটু সেবাযত্ন আর পড়াশোনার অবকাশ পেলেই এদের একজনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজে ওপরে উঠে আসবে। এ কথা কংকা এবং মাহমুদ ঠিকই জানে এবং ভয়ে ভয়ে থাকে।

এখন স্যান্ডেল পরা অবস্থায় মারিয়াকে কাঁপতে দেখে মাহমুদ বলল, 'মিস কুকার, আমার সাথে চল কোহিনুরকে মাঠে রেখে আসি।'

'ব্রেকফাস্টের জন্য?'

এবার খিল খিল করে হেসে ফেলল মারিয়া। যদিও ঠোঁটে রুমাল চাপা থাকায় পুলকের আওয়াজটা তেমন ফুটল না।

মাহমুদও হাসল, 'আমাদের কোহিনুর ব্রেকফাস্টের ধার ধারে না। সকালে যে খাওয়া শুরু করে তা সন্ধ্যেয় শেষ করে আর সারারাত মনের সুখে জাবর কাটে। বরং আজ তোমাকে আমি ব্রেকফাস্ট খাওয়াব। যাবে আমার মামুবাড়ি? সেখানে আমার মা আছেন। গেলে তার সাথে দেখা হবে। যাবে মিস কুকার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাকে ওভাবে মিস কুকার, মিস কুকার বলে ডাকবে না। মারিয়া বলবে। ওভাবে বড়োরা ফর্মালিটি করে। তুমি আমার ফ্রেন্ড।' মারিয়া চাদর সামলে মাথা ঢাকল, 'হ্যাঁ যাব। ওখানে আন্টির হাতে ব্রেকফাস্ট খাব।'

'তাহলে এসো আগে কোহিনুরকে ঘাসের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে আসি।'

'বাহ খুব সুন্দর কথা। ঘাসের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে আসি। বাংলায় খুব সুন্দর কথা তুমি বল। তুমি একদিন লংফেলোর মতো কবি হয়ে যাবে না তো আবার? বাহ, ঘাসের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে আসি।'

মারিয়ার কথায় মাহমুদও চমকে গেল, 'আমি কবি হব? কি যে তুমি বলো না মারিয়া! ওভাবে তো আমি সব সময়ই কথা বলি!'

'হ্যাঁ, তোমার কথা শুনতে সব সময় আমি ভালোবাসি, কান পেতে রাখি। তুমি অন্যরকম বাংলা বল। কেউ তোমার মতো বলে না। এ জন্যই তো তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করি না। তোমার কাছ থেকে ভালো কথা, খারাপ কথা সব আমি শিখি।'

মাহমুদ অবাক হয়ে গেল, 'এ জন্যই বুঝি তুমি সেদিনের সেই ঝগড়ার কথা ফাদারকে বলনি?'

'না।'

'তুমি খুব ভালো মেয়ে মারিয়া। সেদিনের ঝগড়ার জন্য আমাকে মাফ করে দাও।'

'মাফ করব না। আমি তোমার গালাগালির ভাষা শিখব। ভালো ভাষা শিখব। তারপর ইচ্ছে হলে মাফ কর দেব।'

১১

কোহিনুরকে ঘাসের বনে রেখে মারিয়াকে নিয়ে মাহমুদ তার মামুবাড়ির বারান্দায় এসে উঠল। সামনের সবগুলো কোঠার দুয়ারই বন্ধ। এখন আর এদিকে কুয়াশা নেই। আরামদায়ক রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। মামুবাড়ির সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। মাঠে শীতের ধান ক্ষেতে পাকা ধানের ঢেউ। জোর বাতাস আসছে ধান ক্ষেত পেরিয়ে আর বাড়িটার প্রতিটি বন্ধ দরজা-জানালায় হাওয়ার ধাক্কা লেগে খট খট শব্দ উঠছে। দালানের পুবদিকে বিশাল পুকুর। পুকুরপাড়ে সারি করে লাগান কাঁঠাল গাছের মাথায় বাতাসের দাপানি। বারবাড়ির দালানেও কারো সাড়া শব্দ নেই। বারবাড়ির বারান্দাটাও ফাঁকা। দুয়ারগুলো ভেতর থেকে বন্ধ।

মাহমুদ বড় দালানের বারান্দায় পেতে রাখা লম্বা টুল দেখিয়ে মারিয়াকে বলল, 'এখানে বস। আমি আম্মাকে ডেকে তুলি।'

তার গলার আওয়াজেই সম্ভবত মাঝের কোঠার দুয়ার খোলার শব্দ হলো। বারান্দায় এসে মাহমুদের আনু খালা হাই তুলে জিজ্ঞেস করল, 'তোর সাথে এই সাতসকালে ওটি আবার কে রে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ বলল, 'এই যে খালা, এ আমার সাথে পড়ে, মিস মারিয়া কুকার। আমাদের মিশনেরই মেয়ে। আম্মার সাথে দেখা করতে এসেছে। আম্মা এখনও জাগেনি?'

'তোর আম্মা রান্নাঘরে। সেখানে গেলে সোজা আমার কামরার ভেতর দিয়ে চলে যা।' আবার হাই তুলল আনু খালা। ততোক্ষণে মারিয়া তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে 'গুড মর্নিং' বলতেই খালা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওমা' এ তো দেখি মেমের বাচ্চা? ওরে মাহমুদ, ওকে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলি?'

'বললাম তো ও আমার ক্লাসের বন্ধু। ফাদার জোনস এর অভিভাবক। আম্মাও খুব পছন্দ করেন। প্রায়ই তো আমাদের ও বাড়িতে আসে। আজ আমি ওকে আমার সাথে নাশতা খাওয়ার দাওয়াত করেছি।'

আনু খালা খুশি হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? তবে তো মেহমানকে খুব যত্ন করতে হয়। যা, তোদের ঘরে নিয়ে বসতে দে। রান্নাঘরে বোধহয় তোর আম্মা দুলাভাইকে খেতে দিয়েছে। যা, আমিও হাত-মুখ ধুয়ে এক্ষুনি আসছি। তোর মেহমানের সাথেই খাব।'

'তাহলে আমরা বরং রান্নাঘরেই গিয়ে বসি খালা।'

'সে কি রে, ইংরেজের মেয়েকে আমাদের হেঁসেলে নিয়ে খেতে দিবি?'

'তাতে কি, ও তো কতবার আমাদের বাড়ির হেঁসেলে বসে আম্মার বেড়ে দেয়া ডাল-ভাত খেয়েছে।'

এ কথায় মারিয়াও হেসে ফেলল, 'আপনি আন্টির বোন? আমি তো আন্টির কিচেনে গিয়ে যখন যা থাকে তাই খেয়ে নিই। আমি ইংরেজ না। আমার শরমও নেই। আমার দেশ নিউজিল্যান্ড। আমার বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। মিশনে আমি অরফেন। আশ্রিত।'

মারিয়ার মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে আনু থ হয়ে চেয়ে থাকল। মিশনের সায়েবসুবোর বাচ্চারা এমন স্পষ্ট উচ্চারণে বাংলা কথা বলতে পারে না। আনুও এক সময় ওই খ্রিস্টান মিশন স্কুলেই পড়ত। সে অবশ্য বহুকাল আগের কথা। হঠাৎ তার বিয়ের আগের কিশোরী জীবনের কথা মনে পড়ে গেলে সে মারিয়ার দিকে স্নেহ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এসো আমিই তোমাদের নিয়ে রান্নাঘরে যাই।'

আনু খালার পিছে পিছে মাহমুদ ও মারিয়া নানাবাড়ির বিশাল রান্নাঘরে এসে ঢুকল। একটু আগে মাহমুদের আব্বাকে জাহানারা নাশতা খাইয়ে বাজারে বিদেয় করে নিজে এক কাপ চা নিয়ে বসেছে মাত্র। এর মধ্যে আনুর সাথে মাহমুদ ও মারিয়াকে ঢুকতে দেখে জাহানারা অবাক হলো, 'এমন ফজরের অক্তে মারিয়া কোত্থেকে এলি রে?'

'মর্নিং ওয়াকে এসেছিলাম আন্টি। এখন খিদে পেয়েছে। খেতে দিন।'

চাঁচাছোলা কথা মারিয়ার। যেন সে এ পরিবারের কত দিনের আত্মীয়! জাহানারা হেসে ফেলল, 'ডিমের পোচ খাবি না পেঁয়াজ কেটে ভেজে দেব? সাথে চালের রুটি দিচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাই দিন। তবে ডিমটা ভেজে। পোচটোচ আমি খাই না আন্টি, বমি পায়।'

'ওমা, এ তো দেখি বাঙালির মতো রুচি!'

আনুও হাসল।

রান্নাঘরে শীতের দাপট একটু কম। বিশাল চুলোয় ধা ধা শব্দে কাঠের লাকড়ি জ্বলছে। ঘরের ভেতরে বাতাসটাও তাতানো বলে মারিয়ার গতর থেকে শীতের কামড় মুহূর্তে উবে যাওয়াতে সে চাদর খুলে মোড়ায় মাহমুদের পাশে বসে পড়ল।

জাহানারা চালের গরম রুটির ওপর ভাজা ডিম বিছিয়ে প্লেট তুলে দিল মারিয়ার হাতে আগে। মাহমুদ শাদা রুটিই মায়ের সামনে থেকে তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলে মারিয়া বলল, 'আমার পাত থেকে হাফ ওমলেট নাও। তোমার জন্য হয়ে গেলে আমার হাফ আমাকে ফেরত দিতে হবে, মনে থাকে যেন।'

মারিয়ার কথায় সবাই হাসল। জাহানারা বলল, 'ডিম তো ঝুড়িতে কাড়ি কাড়ি আছে। দু'জনে মিলে পেট ভরে খা। আমি আরও ডিম ভেজে দেব। ওরে মেয়ে, তোর ইচ্ছে হলে বাসি তরকারি নিয়েও খেতে পারিস। মাছের বাসি তরকারি আছে রুই মাছ দিয়ে রাঁধা, খাবি?'

মারিয়া কিছু বলার আগেই মাহমুদ বলল, 'বা রে, আমাকে দিন না, আমি খাব। তাহলে আর ওমলেট কেন?'

এ কথায় মারিয়াও লাফিয়ে উঠল, 'দিন আন্টি, আমি গেস্ট, আমাকে আগে দিতে হবে।'

মারিয়ার হা-ভাতে আগ্রহে জাহানারা খুশি। জাহানারা একটা প্লেট হাতে রান্নাঘরের বিশাল আলমারির দিকে এগিয়ে গেল, 'দাঁড়া দু'জনকেই দিচ্ছি। একটু সবুর মেনে বোস। আমি বাসি সালুনটা আগে একটু গরম করে নিই।'

এ সময় ঘরে এসে ঢুকল সারোয়ার। মাথার চুল উস্কুখুস্কু। পরনের পায়জামা ও শার্ট কুঁচকে আছে। দেখলেই মনে হয় চেহারাটা একটু অস্বাভাবিক, চোখ লাল। সারোয়ার ঘরে ঢুকেই জাহানারাকে বলল, 'কিছু খেতে দাও তো বুবু।'

'তার আগে বল রাতে কোথায় ছিলি।'

জাহানারা হাতের খুন্তিটা তাওয়ার অন্য পাশে রেখে পূর্ণ দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল, 'তোর সম্বন্ধে যা শুনতে পাচ্ছি তাতে তো তোর পাতে খাবার দিতে ইচ্ছে হয় না।'

'আমার সম্বন্ধে কার কাছে শুনলে? তোমার বর তৈমুর মিয়ার কাছে? তার সম্বন্ধেও তো মানুষ নানা কথা বলছে? কই, তার খাওয়া পরা তো এ বাড়িতে কেউ বন্ধ করেনি! ঠিক আছে, তোমার হাতে আমি আজ থেকে আর খাব না।'

বলেই সারোয়ার যেভাবে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

জাহানারা স্তম্ভিত হয়ে আনোয়ারার দিকে তাকাল। আনুও মনে হলো সারোয়ারের এ ধরনের আচরণের অর্থ খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা। আনু অবাক হয়ে বলল, 'কি হলো বুবু? সারোয়ার তোমার সাথে এ ধরনের বেয়াদপি করল কেন? আর তুমি যে বললে, রাতে ও কোথায় ছিল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা বোনের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে কতক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে সারোয়ারের যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকল। সারোয়ার তখন উঠোন পেরিয়ে আনুর কামরায় গিয়ে ঢুকছে। সারোয়ারকে নিজের কামরায় ঢুকতে দেখে আনু বলল, 'যাই, দেখি সারোয়ারটা তোমার সাথে হঠাৎ আজ এমন করল কেন?'

'শোন আনু, দাঁড়া।'

'ও ঘরে আমজাদ জেগেছে না?'

'তোমাদের জামাই তো খুব ভোরেই জেগেছে। এতোক্ষণ বড় আম্মার সাথে তার ঘরে বসে আলাপ করছিল। এতোক্ষণে বোধহয় কামরায় ফিরে চা-নাশতার জন্য হাপিত্যেশ করছে।'

'তাহলে তুই যা, আমি মাহমুদ আর মারিয়াকে বিদেয় করে এক্ষুনি জামাইয়ের জন্য চা নাশতা পাঠাচ্ছি। আর শোন, আমজাদের সামনে সারোয়ারকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবি না।'

'ঠিক আছে, করব না। কিন্তু বুবু, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি যে বললে সারোয়ার রাতে বাড়িতে ছিল না, তাহলে সে কোথায় ছিল?'

আনোয়ারা যেতে উদ্যত হয়েও দরজার কাছ থেকে চুলোর ওপর ঝুঁকে থাকা জাহানারার দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

জাহানারা একবার মারিয়া ও মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বোনের মুখের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে খুব আস্তে করে বলল, 'ওর কথা তোর দুলাভাইয়ের কাছে যা শুনলাম, এখন ওর এই আচরণে মনে হচ্ছে সবই ঠিক।'

'দুলাভাই কি বলেছে?'

'সারোয়ার খারাপ হয়ে যাচ্ছে আনু।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ বোন, সারোয়ার গতরাতে বাড়ি ছিল না।'

'কোথায় ছিল তাহলে?'

'বাজারে।'

'বাজারে কোথায়, আমাদের দোকানে?'

'বাজারের খারাপ পাড়ায়।'

'বলো কি বুবু?'

'তোর দুলাভাইয়ের কানে কে যেন নালিশ করেছে। এখন দেখলি বিষয়টি মিথ্যে নয়।'

বলেই জাহানারা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলে আনু ধপ করে একটা মোড়ার ওপর বসে পড়ল। মারিয়া ও মাহমুদ কি বলবে বুঝতে না পেরে আনুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে আনু বলল, 'মাহমুদ, তুই ওকে নিয়ে তোদের বাড়িতে চলে যা। একটু পরে আমি কাউকে দিয়ে ও বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দেব।'

মারিয়া আর মাহমুদ হাতের প্লেট মেঝেয় রেখে বেরিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারিয়া বলল, 'বাজারের খারাপ পাড়াটা কোথায়?'

মামুবাড়ি থেকে মাহমুদ মারিয়াকে নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে এসে খাটের ওপর বসে দু'জন গল্প করছিল। মারিয়া অবশ্য ফেরার সময় তার হোস্টেলে ফিরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মাহমুদ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছে। মামু সারোয়ারের ঘটনায় মাহমুদের মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। ও বাড়িতে যে মামুটিকে তার একটু পছন্দ, সে এই সারোয়ার। মাহমুদের চেয়ে সাত বছরের বড়। সারোয়ারও মাহমুদকে খুব পছন্দ করে। মাহমুদকে ম্যাটিনি শো'র টিকিট, গল্প-উপন্যাস আর মাঝে-মধ্যে এটা-ওটা উপহার দেয়। তাছাড়া টাউন হলের পাশে যখন মাছ ধরার প্রতিযোগিতা হয় তখন সারোয়ার কোত্থেকে যেন পান কিনে এনে মাহমুদকে দেয়। সবাই জানে মাহমুদের মাছ ধরার শখ। তার এক জোড়া হুইলের ছিপও আছে। এই ছিপগুলো সারোয়ারই জোগাড় করে দিয়েছে।

মারিয়ার কথায় মাহমুদ মুখ তুলে তাকাল, 'ওসব তুমি বুঝবে না মারিয়া।'

'কেন বুঝব না? আমি তো বাংলা বুঝতে পারি! না বুঝলে ইংরেজিতে বল, আমি বুঝতে পারব।'

'বাজারে খারাপ মেয়েরা যেখানে থাকে সেটাকে বলে খারাপ পাড়া। আমার সারোয়ার মামু সেখানে যেতে শুরু করেছে।'

'প্রস্টিটিউট?'

মারিয়ার প্রশ্নে মাহমুদ মুখ নামিয়ে ফেলল। কোনো জবাব দিল না।

মারিয়া বলল, 'ও মাই গড! ভেরি ব্যাড। তোমার মামুকে যিশু ক্ষমা করুন। তোমার মামু কি ওখানে কাউকে ভালোবাসে?'

চোখ বড় বড় করে মারিয়া তার কৌতুহল প্রকাশ করছে। যেন নেটিভদের সমাজ সম্বন্ধে তার অপার কৌতুহলে তরঙ্গ উঠেছে।

'আমি জনি না মারিয়া।'

'তোমার মামুকে তোমার আম্মা খুব ভালোবাসেন?'

'আমরা সবাই খুব ভালোবাসি সারোয়ার মামুকে।'

'তাহলে তাকে আন্টি খারাপ বলছেন কেন?'

'তিনি খারাপ পাড়ায় গিয়ে যদি খারাপ হয়ে যান এই ভয়ে।'

'তিনি যদি সেখানে কাউকে ভালোবাসেন তবে কেন সেখানে যাবেন না? ভালোবাসলে যেতে হয় না বুঝি!'

'তুমি আমাদের সমাজের ভালোমন্দ কিছু বোঝ না মারিয়া। সারোয়ার মামুর মতো সুন্দর মানুষ খারাপ মেয়েদের কাউকে কেন ভালোবাসবেন? তিনি হলেন এ শহরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের ছেলে।'

মাহমুদের কথায় মারিয়া একেবারে চুপ মেরে গেল। মনে হলো, সারোয়ার মামুর খারাপ পাড়ায় যাওয়াটাকে সে পছন্দ না করলেও ভালোবাসলে যে কেউ যেখানে খুশি যেতে পারে তার এই বিশ্বাস। তবে মাহমুদদের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে যে একটা দুর্ভাবনার সূচনা হয়েছে তা মারিয়া বিদেশি হলেও যেন বুঝতে পেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময় মামুবাড়ি থেকে নাশতার প্লেট মাটির সরা দিয়ে ঢেকে নিয়ে একটা কাজের মেয়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'নাশতা নিয়ে এলাম। খেয়ে সারলে প্লেট নিয়ে যাব।'

মাহমুদ সরা উদোম করতেই মারিয়া ডিমের ওমলেট ও চালের গরম রুটি সমানে মুখে পুরতে লাগল। মাহমুদও হাত বাড়িয়ে একটা চালের রুটি আর ওমলেটের দিকে মারিয়ার আগ্রহ দেখে মাহমুদ ভাবল, সত্যি, মারিয়াটাকে সম্ভবত মিশনে ঠিকমতো কেউ খেতে দেয় না।

মাহমুদ রুটির টুকরোটা হাতে রেখে বলল, 'তুমি সবটাই খেয়ে নাও মিস কুকার। আমি আর খাব না।'

ততোক্ষণে ও বাড়ির কাজের মেয়েটা নিজেই এ বাড়ির চুলোয় শোলার আগুনে চা করে দু'জনের সামনে রাখল।

১২

সন্ধ্যার একটু পরেই অন্যান্য মফস্বল শহরের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরটাও জনশূন্য হয়ে পড়ে। এ শহরকে যারা সারাদিন প্রাণচঞ্চল রাখে তারা সবাই আশপাশের গাঁয়ের লোক। মৌড়াইল, মিরাইলকান্তি, কাউতলা, ভাদুগড়, রামরাইল থেকে শুরু করে আবলুস-বিরামপুর পর্যন্ত শহরের সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণ দিকের জনবসতিগুলো ছড়িয়ে আছে। অন্যদিকে পুনিয়ট, পৈরতলা ইত্যাদি শহর-সংলগ্ন জনবসতিগুলোও মূলত গ্রামই। আর উত্তরদিকে সুহিলপুর পর্যন্ত সবগুলো গ্রাম জনপদ নিয়েই ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর। শহরের চারদিকে তিতাস নদী শহরটাকে বাসুকি সাপিনীর মতো প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে। আর নৌ চলাচলের সুবিধার জন্য কেউ হয়তো কোনোকালে একটা অপ্রশস্ত খাল কেটে শহরটিকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। ধান, চাল আর মরিচ-মশলার নাও নিয়ে আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা অতি সহজেই শহরের ভেতর ঢুকে যায়। নাও এসে লগি বাঁধে একেবারে শহরের হৃদয়-মধ্যে। থানার সামনে খালের দীর্ঘতটরেখা শান বাঁধানো হওয়ায় জায়গাটায় নাও ভিড়ানো যেমন সুবিধা, তেমনি পরবর্তী খেপের জন্য অথবা গাঁয়ের যাত্রী-নারীদের এখান থেকে নৌকায় উঠতে সুবিধে। খালের উপর পাড় থেকেই শুরু হয়েছে হাটবাজার, এলাকা। জগৎবাজার, টানবাজার, ছাতিপট্টি, সড়কবাজার, গরুর হাট ইত্যাদি। প্রায় সবগুলো হাটেই বাদশা মোল্লার কোনো না কোনো দোকান বা কারবারের কেন্দ্র আছে। মোল্লা সাহেবের ইন্তেকালের পর তৈমুর এখনও সবগুলো ব্যবসা গোছাতে পারেনি। তবে দু'একটা গুটিয়ে ফেলেছে। বৃহস্পতিবারের হাটে দালালি করার জন্য গরুর হাটের পাশে মোল্লা সাহেবের একটা গদি ছিল। এখন উপযুক্ত লোকের অভাবে তৈমুর গদিটা তুলে নিয়ে দোকানটা একজন বাঁশবেতের হিন্দু আড়তদারের কাছে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কথাবার্তা পাকা করে ঘর খালি করে দিয়েছে তৈমুর। কিন্তু কথানুযায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনও এক বছরের অগ্রিম গ্রহণ করেনি। আড়তদার সাহাবাবুর সাথে কথা হয়েছে যখনই তৈমুর লোক পাঠাবে তখনই হিসাব করে এক বছরের ভাড়া আড়তদার পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু আজ হাট ভেঙে যাওয়ার পরও তৈমুরের কাছ থেকে আড়তদারের কাছে কেউ ভাড়ার টাকার জন্য আসেনি।

ভাঙা হাটের চারপাশের অলিগলিতে অন্ধকার নেমে এসেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্পপোস্টের মাথায় কেরোসিনের বাতি একটু আগে বাতিঅলারা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেও এতে অন্ধকার দূর হওয়া দূরে থাক, এ আলোয় হাত মেললে হাতের পাঁচটা আঙুলও ঠিকমতো পরখ করা যায় না। আড়তদার সাহাবাবুদের দোকানের উল্টোদিকের মাথায় একটা চায়ের দোকানের সামনে তখন গলির কয়েকটা মেয়ে এসে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে। সবাই দোকানের সামনে এসে চা-সিগ্রেট আর পান হাতে নিয়ে গলির মুখে পেতে রাখা একটা লম্বা টুলের ওপর বসে হাসাহাসি করতে লাগল। অর্থহীন হাসি। মেয়েগুলোর সাজ দেখলেই বোঝা যায় এরা গাঁয়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং হাটের দালালদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। গলিটা আসলে জগৎবাজার থেকে সড়কবাজারে যাওয়ার একটা সংযোগ পথ। পথের দু'পাশে বাজারে মেয়েদের বস্তি। একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে বস্তির প্রতিটি ছাপড়ার দরজায় একটি করে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখে উৎকটভাবে পাউডার মাখা। ঠোঁটে আলতার লাল রঙ ছাপিয়ে পানের খয়েরভরা কালচে রস বেরিয়ে এসেছে। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই এক ধরনের প্রদর্শন ভঙ্গি। বস্তির ভেতর থেকে ভাঙা গলায় কারো গান গাওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তবে গানের কলির চেয়ে হারমোনিয়ামের শব্দটিই পথচারীদের কানে আগে এসে লাগে। মাঝেমধ্যে ঘুংঘুরের শব্দও বাজছে। এমন কেউ কেউ নিশ্চয়ই এখানে আছে যারা নাচগানও জানে।

গলির ভেতরকার প্রথম বস্তিটির দোরগোড়ায় একটি একুশ বাইশ বছরের মেয়ে এসে লাইট পোস্টের নিচে দঁড়াল। আশপাশের মেয়েদের মতো তারও সাজগোজ হলেও দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কেমন যেন একটু স্বাতন্ত্র আছে। সে অন্যান্য মেয়েদের মতো অর্ধ উলঙ্গ নয়। তার শাড়ি পরাটা দেখতে গৃহস্থবাড়ির বউদের মতো। সারাগায়ে সোনার গয়না। দেখলেই মনে হয় সে এখানে একটু আলাদা, একটু অভিজাত। অন্য মেয়েদের চেয়ে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তাকে একটু দীর্ঘাঙ্গী বলে ধারণা হয়। পিঠে এক দীর্ঘ বেণি ঝুলছে। পরনে একটা লালপাড়ের গাঢ় হলুদ রঙের শাড়ি। গায়ে লাল ব্লাউজ। গায়ের রং যে ফর্সা তা ল্যাম্পপোস্টের আধো আলো আধো অন্ধকারেও বোঝা যায়। মেয়েটি এসে দাঁড়াতেই অন্যান্য দুয়ার থেকে এক ধরনের মুখচাপা হাসির শব্দ উঠল। পাশের দরজার সামনে বসা একটি মেয়ে তার মোড়াটার সাথে আরও একটি মোড়া তুলে এনে হলুদ শাড়িওয়ালির সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'নে বোস গোলাপি বু। এতোক্ষণে এসে দাঁড়ালি?'

'সারাদিন ঘুমিয়ে গা ঘিন ঘিন করছিল। রাঁধা শেষ করে নেমে এলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোড়াটায় বসতে বসতে জবাব দিল গোলাপি। সে আঁচল ঘুরিয়ে মাথার ওপর তুলল।

'তোর কি, তোর তো আজকাল আমাদের মতো দুয়ার ধরে দাঁড়াতে হয় না। বাঁধা নতুন মানুষ জুটেছে। শুনেছি তোর ওই ছোকড়াটার বাপ নাকি বামুনবেড়িয়ার অর্ধেক দোকানপাটের মালিক ছিল। অমন বাঁধা মানুষ পেলে আমাদের মতো তোর আর গতর দেখিয়ে হররোজ দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? ছোকড়াটা নাকি তোকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়? কাল মাতাল হয়ে নাকি এসব কথা মাধুরিকে বলছিল। সত্যি নাকি রে গোলাপি বু?'

মেয়েটা গোলাপির পাশে মোড়া রেখে বসল। তার চোখে কৌতুহল চকচক করছে। মনে হয় একটু ঈর্ষাও জ্বল জ্বল করে উঠল চেহারায়।

গোলাপি এসব কথার কোনো জবাব দিল না। সে গলিটার প্রবেশপথের দিকে চেয়ে থাকল। এ সময় আরও দু'একটি মেয়ে যার যার আসন হাতে করে গোলাপিকে ঘিরে বসল। এতক্ষণ এরাই খদ্দের ধরার জন্য গলিটার মাথায় সেজেগুঁজে দাঁড়িয়ে সমানে পান চিবুচ্ছিল আর এদিক-সেদিক পিক ফেলছিল। এদের একজন একেবারে গোলাপির গা ঘেঁষে বসেছে। সে মনে হয় এই মেয়েদের মধ্যে অন্যদের চেয়ে একটু বয়সে বড়। এতক্ষণ গোলাপির সাথে যে মেয়েটি কথা বলছিল তার নাম জ্যোসনা। জ্যোসনা গোলাপিকে মুহূর্ত আগে যেসব প্রশ্ন করছিল গোলাপির গা ঘেঁষে বসা মেয়েটি সম্ভবত এর কিছুটা শুনেছে। সে পান চিবুতে চিবুতে নিজেই শুরু করল, 'কত লোকেই বিয়ের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যায়। আবার বছর পেরুবার আগেই ফেরত আসতেও দেখি। এবার গোলাপির পালা। গোলাপির অবশ্য ফিরে আসতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। কারণ বাবুটির কেবল গোঁফদাড়ি উঠেছে। আমাদের গোলাপি বিবির ওপর টানটা একটু বেশি।' মেয়েটি পিক ফেলে ফিক করে হাসল, 'এ জন্যই গোলাপজানের কাছে একটু বসলাম, কে জানে কবে আবার দেখা হয়?'

এবারও গোলাপির মুখ থেকে কোনো কথা বেরুল না।

জ্যোসনাও এবার একটু খোঁচা দিল, 'বড় মানুষের বাড়ির বউ হবে বলে গোলাপি বু'র গোমর বেড়েছে, আমাদের সাথে মুখ খুলতেই চায় না।'

এবার গোলাপি আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারল না, 'তোরা বড় বেশি বকবক করিস জোছনি, আমি মরি আমার নিজের জ্বালায়। আর তোরা যা হবার নয় তা নিয়ে আমাকে খুঁচিয়ে মারছিস। ভেবেছিস একটা পাগলের কথায় আমি পাড়া ছেড়ে চলে যাব? কেন যে লোকটা আমার পেছনে লেগেছে! লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দিলেও আবার আসে। এখন আমি যে কি করি? মনে হয় এখানকার ভাত উঠেছে। অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।'

'সে কি, এ পাড়া ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি?'

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল জ্যোসনা। সবাই উবুড় হয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো গোলাপির দিকে তাকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাপি বারবণিতা হলেও সমাজের মনোভাব থেকে গাফেল নয়। সে জানে তার এই নবাগত খদ্দেরটি তার জন্য অযাচিত বিপদ ডেকে আনছে। প্রতিদিনই ভাবে, সারোয়ারকে আর তার ঘরে বসাবে না। কিন্তু সারোয়ার এসে সামনে দাঁড়ালেই তার চোখের দিকে তাকিয়ে গোলাপি আর কথা বলতে পারে না। কি যেন একটা আছে ওই ছোকরাটার চোখের মধ্যে যা অন্য দশজন খদ্দেরের মধ্যে গোলাপির মতো দেহপশারিণীও কোনোদিন খুঁজে পায়নি। আগে সারোয়ার ঘরে এলেই গোলাপি টাকা চাইত। সারোয়ারও চাওয়ামাত্রই পকেট থেকে বেহিসাব টাকা দিত। এখন আর গোলাপি টাকার কথা না তুললেও সারোয়ার নিজেই গোলাপির হাতে টাকা তুলে দেয়। কোনো কোনো দিন বলে, 'এই নাও, আজ ভালো করে বাজার আনিয়ে রাঁধো। রাতে এখানেই খাব।' গোলাপি অবাক হয়ে ছোকরাটির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'রাঁধব মানে, আমার হাতে খাবে?'

'কেন, তুমি কি কামরাঙা মরিচ বেটে রাঁধো নাকি যে খাওয়া যাবে না? আমি রাতে এখানে খাব এবং এখানেই আজ রাতটা থাকব। কোনো নিষেধ আছে নাকি? কই জানি না তো!'

বলেই সারোয়ার বেরিয়ে যায়। অবাক বিস্ময়ে গোলাপি তার নতুন খদ্দেরটির যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবে। অকারণেই মনে হয় তার দু'চোখ বয়ে কোনো দূরতম স্মৃতি যেন গরম পানির নদী হয়ে নেমে আসে। গোলাপি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে বালিশ আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কেউ ডাকলে দুয়ার মেলে না। আবার নিজের তাগিদে যেন নিজেই বিছানা ছেড়ে উঠে চোখে পানির ঝাপটা দিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করে নেয়। ঘরের শিকল তুলে দিয়ে ডোলা হাতে নিজেই বাজার করতে বেরোয়। মাছ আর তরকারি হাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে পছন্দমতো বাজার করে ঘরে ফিরে এসে যত্ন করে রাঁধে। এ সময় সর্বক্ষণ গোলাপি গুণ গুণ করে গান গায় আর তরকারিতে মশলার ফোঁড়ন দেয়। বাগাড়ের ছ্যাঁত ছ্যাঁত আওয়াজ শুনেই প্রতিবেশী মেয়েরা বুঝতে পারে গোলাপির নতুন বাবু আজ রাতে গোলাপির ঘরে খাবে।

হাট ভেঙে গেলেও সাহাবাবুদের নতুন ভাড়া করা বাঁশবেতের আড়তে কেরোসিনের হারিকেন জ্বলছিল। দোকানের মালিক মাধব সাহা তখনও হিসাব মেলাচ্ছে। কর্মচারীরা কেউ তামাক টানছিল, কেউ আজ সারাদিনের বেচাবিক্রির পর বেতের ঝুড়ি, চাটাই, বাঁশের ধাড়ি ইত্যাদি ঠিক করে সাজিয়ে রাখছিল। এর মধ্যেই সবাই বলাবলি করছিল, তাদের পৈতৃক ব্যবসায়ের জন্য অর্থাৎ বাঁশবেতের কারবারের জন্য মোল্লা সাহেবের এ দোকানটা বেশ পয়া। প্রথম দিনেই হাজার দুয়েক টাকা আমদানি সোজা ব্যাপার নয়। মাধব সাহা খাতা লেখা শেষ করে ক্যাশ মিলিয়ে মাথা তুললেন। সামনে সাহাবাবুর বড় ছেলে ললিত। ললিতের দিকে তাকিয়ে মাধব সাহা জিজ্ঞেস করলেন, 'তৈমুর মিয়া ভাড়ার টাকার জন্য দুপুরে লোক পাঠাবেন বলেছিলেন, কেউ এসেছিল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, কেউ আসেনি। বাড়ি যাওয়ার সময় আমিই ওদের ওখানে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসতে পারি।' বলল ললিত।

'মন্দ হয় না। তুই নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে এলে তৈমুর খুবই খুশি হবেন। তাছাড়া এমন ভালো জায়গায় দোকানটা পেয়েছি, মালিকপক্ষকে একটু খুশি রাখাও দরকার।'

'তাহলে টাকাটা গুণে আলাদা করে রাখুন। আমি দোকান বন্ধ করে সড়ক বাজার যাব।'

ললিতের কথায় সাহাবাবু টাকা গুণে বাকসের ওপর একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে বলল, 'এখানে বারো শো টাকা আছে। এক বছরের অগ্রিম। দেয়ার সময় গুণে দিস।'

সাহাবাবু বেরিয়ে গেলেন। ললিতও দোকান বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়াল। সড়ক বাজার যেতে হলে সামনের গলি ধরে গেলেই তাড়াতাড়ি হয়। যদিও হুক্কা পট্টি দিয়েও একটা রাস্তা আছে। কিন্তু হাট বাজারের তরুণ ব্যবসায়ীরা খারাপ পাড়ার রাস্তাটাকেই কেন জানি বেশি ব্যবহার করে। দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রুপোপজীবীনীর অবৈধ আকর্ষণই হাটের মানুষকে এ পথে চলতে বেশি আকর্ষণ করে। ললিত দোকান থেকে বেরিয়ে কাঁঠালি বটের নিচে এসে দেখল, গলিটির মাথায় কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গলির দিকে পা বাড়াতেই সারোয়ার চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে পড়ে গেল। সারোয়ার ললিতের বন্ধু। একই স্কুলে একসময় লেখাপড়া করত। এখন হঠাৎ সারোয়ারকে সামনে পেয়ে ললিত বলল, 'আরে তুই কোত্থেকে এলি? ভাড়ার টাকার জন্য দোকানে যাচ্ছিলি বুঝি? তোদের লোকের জন্য বসে থাকতে থাকতে একটু আগে বাবা আমাকে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি গেছে। ভালোই হলো তোর সাথে দেখা হয়ে গেল। টাকাটা নিয়ে যা। আমি টাকা নিয়ে তোদের গদিতে রওনা হয়েছিলাম।'

সারোয়ার প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও মুহূর্তের মধ্যে ললিতের এ ধরনের কথাবার্তার কারণটা আঁচ করে ফেলল, 'তুই কেমন আছিস শালা সাঁও? একেবারে পাক্কা ব্যবসায়ী হয়ে গেছিস।'

ললিত হাসল, 'নে এখানে বারো শো টাকা আছে। তৈমুর ভাইকে বলিস আমাদের নামে উসুল দিতে। তোকে পেয়ে ভালোই হলো। নইলে একবার সড়ক বাজারে ঢুকলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হতো না। টাকাটা গুণে নে সরো।'

'গুণতে হবে না শালা, আমি জানি তুই কম দিবি না।'

টাকার বান্ডিলটা সারোয়ার পকেটে পুরল। যেন মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। দু'জনই দু'জনের হাত ধরে একটু হাসল। বহুদিন পরে সাক্ষাতের পরিতৃপ্ত হাসি।

ললিত বলল, 'তাহলে আসি রে সরো। তোদের দোকান নিলাম, মনে হয় এখানে বেচাবিক্রি জমবে। একদিন গদিতে এসে চা খেয়ে যাস।'

'আসব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারোয়ার আনন্দটা অনেক কষ্টে চেপে আছে। এমন অযাচিত পাওয়ার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অথচ এ মুহূর্তে তার টাকারই দরকার বেশি।

ললিত চলে গেলে সারোয়ার সোজা পাড়ার ভেতর ঢুকে গোলাপির দরজায় এসে দাঁড়াল।

১৩

এবার সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা কিংবা কিছু নগদ হাতানোর ইচ্ছেটা আমজাদ মিয়াকে সম্বরণ করতে হলো। বড় আম্মা তাকে যথার্থ বুদ্ধি বাৎলিয়ে রাশ টেনে রাখার ফলে সে আনোয়ারাকে নিয়ে প্রথম ময়মনসিংহ ও পরে বাসা ভাড়া করে আনোয়ারাকে কলকাতায় নিজের কাছে রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলো। সবই বড় আম্মা আগে বেড়ে পরিবারের সবার সামনে সকলকে শুনিয়ে সমাধা করলেন। জাহানারা ভাবল, এতদিন বড় আম্মা সতীনের ছেলে-মেয়েদের সাথে যে ধরনের আচরণই করুন, আব্বার মৃত্যুর পর যেহেতু তিনিই এ বাড়ির প্রকৃত মুরুব্বি, সে কারণে হয়তো আনুর জামাইকে তিনি আনুর শ্বশুরবাড়ির দুঃখ-কষ্টের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বিয়ের সময় কথা ছিল আমজাদ আনুকে গাঁয়ে ফেলে রাখবে না। সে যদি কলকাতাতেই কাজকর্ম জোটাতে পারে তবে আনু তার সাথেই থাকবে। এই শর্তেই মোল্লা সাহেব আমজাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সমুদয় খরচ বহন করতে সম্মত হয়েছিলেন। আমজাদ কেবল শ্বশুরের ধরাবাঁধা মাসিক বরাদ্দে সন্তুষ্ট থাকার পাত্র ছিল না। সে মাঝে-মধ্যেই শ্বশুরকে আরও টাকা পাঠানোর জন্য বিব্রত করত। শেষের দিকে মোল্লা সাহেব আমজাদকে মাসে মাসে টাকা পাঠানোর ভারটা তৈমুরের কাছ থেকে নিজের কাছেই নিয়ে নেন। সম্ভবত তিনি কত টাকা তার ছোট মেয়ের বিদ্বান জামাতাকে পাঠাচ্ছেন তা তার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী তৈমুরকে জানতে দিতে দারুণ অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। তাছাড়া তৈমুর তো কেবল জাহানারার জামাই নয়, মোল্লা সাহেবের আপন ভাতিজাও। তিনি শেষের দিকে আমজাদকে নিজেই মানি অর্ডার করে টাকা পাঠাতেন। টাকার পরিমাণ নিয়ে তৈমুরের সাথে আলাপ-আলোচনাও করতে চাইতেন না। অথচ তার আর্থিক লেনেদেনের সব গোপনীয়তাই তিনি তৈমুরের সাথে বিশদ পরামর্শ না করে করতেন না, অন্তত তৈমুরকে অবহিত রাখাটা তার অভ্যেস ছিল। কিন্তু আমজাদের ব্যাপরে তিনি নিজেই আলাদা একটা হিসাবের খাতা রেখেছিলেন। তাও খাতাটা আবার পরিবারের অন্য কারো নজরে পড়ে সে আশঙ্কায় তা আলাদা করে বাড়ির লোহার সিন্দুকের গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যদিও আমজাদকে অতিরিক্ত পাঠানোর হিসাবটা মোল্লা সাহেব ছাড়া কেউ জানত না, কিন্তু আমজাদ যে বিয়ের সময়কার প্রতিশ্রুতির অধিক অর্থ নিচ্ছে তা সম্ভবত বড় আম্মার অজানা ছিল না। জানলেও বড় আম্মা এ ব্যাপারে মোল্লা সাহেবকে কোনো প্রশ্ন করেননি কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। তিনি বুঝতেন আনুকে বিয়ে দিয়ে বাদশা মোল্লার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর হিসাবি মানুষও ঠকেছেন। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে তিনি চাননি। তাছাড়া বড় আম্মা নিঃসন্তান হওয়ায় সতীনের মেয়েদের প্রতি এক ধরনের মমতাও হয়তো বোধ করতেন। এখনও করেন। এ জন্যই আমজাদ মিয়াকে তিনি আনুর ব্যাপারে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আনুকে গাঁয়ে ফেলে রাখাটা বড় আম্মারও অস্বস্তির কারণ। হাজার হোক তার সৎ মেয়েরা প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে। কষ্ট কাকে বলে তা জানু বা আনু কেউই জানেন না। গাঁয়ের গেরস্ত বাড়ির ধান-পাট ঝাড়াই-বাছাই বা গরু-বাছুর সামলানোর কাজকর্ম আনু কি করে করবে? তবুও আমজাদ যে আনুকে ময়মনসিংহের এক অজপাড়াগাঁয়ে ফেলে রেখে কলকাতায় বাবু সেজে থাকতে পারছে, সেটা কেবল মেয়ে হিসাবে আনুর পারিবারিক শিক্ষার গুণেই। আনু তার বাপ জীবিত থাকতে কোনোদিনই শ্বশুর বাড়ির দুর্নাম বা স্বামীর ব্যাপারে নালিশ জানায়নি। তবে মোল্লা সাহেব মাঝে-মধ্যে হয়তো বড় বিবির সামনে নিজেকে চেপে রাখতে পারেননি। হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোনো দুর্বল মুহূর্তে বলেই ফেলেছেন, 'মা-মরা মেয়েকে আমি বোধহয় শিক্ষিত জামাই পাওয়ার লোভে হাত-পা বেঁধে পানিতেই ফেলে দিলাম।'

এটুকু আক্ষেপের বেশি মোল্লা সাহেবের মুখ থেকে মেয়ে-জামাইয়ের বিষয়ে কোনো অনুযোগ শোনা যেত না। তবে তৈমুরের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করলেও তৈমুর সবই বুঝতে পারত। কারণ দোকানের ক্যাশ মেলাত তৈমুর নিজে। কোথায় কত টাকা খরচ হলো, চাচা নিজের খরচ বাবদ কখন কত টাকা লিখে রাখতে তৈমুরকে বলতেন, এ থেকেই তৈমুর বুঝতে পারত চাচা যে কোনো কোনো মাসে নিজের খরচ বলে অস্বাভাবিক টাকার অংক লিখে রাখতে বলছেন টাকাটা কোথায় যায়। কিন্তু এ নিয়ে তৈমুর মিয়া কোনো উচ্চবাচ্য কিংবা নিজের স্ত্রীর সাথে কানাকানি করেনি।

আমজাদ সম্পত্তি বাটোয়ারার ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে পড়েছে দেখে বড় বিবি একটু ধৈর্যের দাওয়াই হিসাবে নগদ দেনা-পাওনা কিংবা স্থাবর সম্পত্তি দাবির আগে তার অতিরিক্ত নেয়ার পরিমাণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলেছেন ভাগবাটোয়ারা তিনিও চান, তবে তাড়াহুড়ো করলে আমজাদেরই ক্ষতি হবে। যদি তৈমুর আয়রন চেস্টে রাখা আমজাদের হিসাবটা জাহির করে দেয় তাহলে কে জানে আমজাদের আদৌ পাওনা থাকে কিনা? এতে আমজাদ যখন ভয় পেয়ে কেঁচোর মতো গুঁটিয়ে গেছে, তখনই বড় আম্মা তাকে তৈমুরকে ঠেকাবার উপায়ও বাতলে দিলেন। বাজারের ব্যবসায়ী সমাজ ও দালাল-ফড়িয়াদের কাছে মোল্লা সাহেবের যে বেহিসাব অর্থ গচ্ছিত থাকত সে খবর তো একমাত্র তৈমুর ছাড়া এ বাড়ির সকলেরই অজানা। এ খবরটা নিয়ে কথা তুলতে তিনি আমজাদকে উসকে দিলেন। যাতে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠলে তিনি সৎ মেয়েদের উভয় জামাতাকেই বশে রাখতে পারেন এ কারণেই তিনি আমজাদকে এবার ভাগবাটোয়ারার চেষ্টা ছেড়ে কর্মক্ষেত্রে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আমজাদও শেষ পর্যন্ত বিষয়টা উপলব্দি করে আজ দুপুরের গাড়িতেই আনোয়ারাসহ ময়মনসিংহ ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভোরে তৈমুরের কামরায় এসে কড়া নাড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা তৈমুরকে সাধারণত খুব ভোরেই নাশতা খাইয়ে বাজারে বিদেয় করে। তৈমুর সকালে পুকুরঘাট থেকে গোসল করে সবেমাত্র পোশাক পরেছে। সে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে এ সময় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। দুয়ার খুলে দিতেই আমজাদ সালাম বলল। তৈমুর বলল, 'আসুন ভেতরে। এত সকালে কি ব্যাপার?' তৈমুর দুয়ার ভেড়ে দাঁড়াল, 'আপনার বিবি সাহেবা বোধহয় এখনও সজাগ হননি। চলুন পাক ঘরে গিয়ে নাশতা করি। আমার আবার বাজারে যাবার তাড়া।'

'আরে দুলাভাই, চিরকালই তো আপনার কেবল বাজার-বেসাতের দিকে ছোটাছুটি। একদিনও আপনাকে একটু একলা পাই না যে একটু আমাদের মতো গরিবদের সুখ-দুঃখের কথা বলব।' আমজাদ কথা বলতে বলতে ভেতরে প্রবেশ করল, 'বুজান বোধহয় পাকঘরে গেছেন। চলুন সেখানেই গিয়ে বসি। আমি আজ রওনা হব কিনা, আপনাদের অনুমতি নিতে এলাম।'

'সে কি জামাই মিয়া?'

তৈমুর একটু অবাকই হলো। আনোয়ারা যে জামাইসহ আজই চলে যাচ্ছে, কই এ কথা তো জানু তাকে আভাসেও বলেনি? 'রওনা হবেন মানে? আপনি কি আনুকে নিয়ে দেশে ফিরতে চাচ্ছেন?'

'শুধু আনুকে নিয়ে বাড়ি ফেরাই নয়, সুযোগ পেলে আপনার শালীকে নিয়ে বাড়ি হয়ে সোজা কলকাতায়।'

'খুবই সুখের খবর জামাই মিয়া। আমিও চাই আপনি আনুকে আপনার সাথেই রাখুন। কলকাতায় কি আগেই বাসা ভাড়া পেয়েছেন?'

'আপাতত আমার এক চাচার বাসায় গিয়ে আনু উঠবে। আপনি তো আমার চাচাকে চেনেন। ওই যে 'আজাদ' পত্রিকার প্রেস ম্যানেজার সামাদ সাহেব। তারপর ফোলেন স্ট্রিটের দিকে একটা বাসা খুঁজে নিতে বড়জোর এক সপ্তাহ লাগবে।'

হাত কচলে নিজের কৃতিত্ব জাহির করার ভঙ্গি করল আমজাদ।

'শাশুড়ি-আম্মাদের কাছে এসব বলেছেন?'

'বড় আম্মাকে বলেছি। এখন আপনাকে আর বুবুকে বলে ইজাযত নিতে এসেছি।'

'হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে নতুন বাসা বাড়ি ভাড়া করে থাকা তো বেশ ঝক্কির ব্যাপার। কিছু টাকা-পয়সা লাগলে জানুর কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। কোনো সংকোচ করবেন না। আমি এক্ষুনি জানুকে বলে দিচ্ছি। চলুন ও ঘরে গিয়ে নাশতা করি।'

তৈমুরের এ অযাচিত প্রস্তাবে আমজাদ সহসা কেমন একটু বিনম্র ভঙ্গিতে মাথাটা নুইয়ে রাখল, 'আপনি দুলাভাই সত্যিই খুব ভালো। এ সময় কিছু টাকা পেলে কি যে উপকার হবে?'

'সে তো বুঝি। আপনার না হয় চাইতে সংকোচ। কিন্তু আপনার স্ত্রীটি তো দরকারের সময় নিজের বোনের কাছে অসুবিধের কথা বলতে পারে। যা হোক, হাজারখানেক হলে আপাতত চলবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুব চলবে।'

'তাহলে নিয়ে যান। আগামী মাসে আমি মাল কিনতে কলকাতায় গেলে আপনাদের দেখে আসব। চলুন আমি মাহমুদের আম্মাকে আনুর হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে দিতে বলছি।'

তৈমুরের কথায় আমজাদ যেন হাতে স্বর্গ পেল। আনুকে নিয়ে কলকাতায় তার কর্মস্থলে বাসাবাড়ি করে থাকার পরামর্শটা তাকে দিয়েছেন বড় আম্মা। আমজাদের ওপর এ বাড়ির কেউই সন্তুষ্ট নয়। সে তার বিয়ের সময়ে দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখেনি বলে মোল্লা সাহেবও অসুখি মন নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। বড় বিবি চান অচিরে না হোক বছরখানেকের মধ্যে মোল্লা সাহেবের সকল স্থাবর-অস্থাবরে তার অংশ হাতে পেতে। অথচ এই পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল এই অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মোল্লা সাহেবের ব্যবসা-বাণিজ্য তার মৃত্যুর সাথে সাথেই ভেঙে পড়ুক, সেটা চান না। তারা তৈমুরকে দিয়ে বাদশা মোল্লার দোকানপাট ও পাটের আড়তদারি চালিয়ে যেতে চান। মৌড়াইল গাঁয়ের লোকদের সমর্থন তৈমুরেরই পক্ষে। এমনকি মিশনের ফাদার জোনস, যিনি মোল্লা সাহেবের পরম বন্ধু ও হিতৈষী, তিনিও তৈমুরকেই সাহায্য করছেন। এ অবস্থায় তৈমুর যদি বাদশা মোল্লার দোকানপাট, খামার, পাটের ব্যবসা ঠিকমতো সামলে উঠতে পারে তাহলে দশ বছরেও বড় বিবির পক্ষে সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারার প্রশ্ন তোলা সম্ভবপর হবে না। যত দিনে না জানু-আনুর ভাইয়েরা বড় হয়ে দাঁড়িয়ে ভগ্নিপতির কাছ থেকে তাদের পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে নিতে চায়। বড় বিবির পক্ষে ততোদিন মুখ বুজে থাকা কি করে সম্ভবপর? এ কারণেই তিনি আমজাদকে হাতে রেখে কাজ উদ্ধার করতে চান। আবার তৈমুরকেও চটিয়ে একেবারে হাতছাড়া করার বিপদটা তিনি বোঝেন। তিনি নিজে জানেন, তৈমুর দিনরাত খেটে শ্বশুরের ব্যবসাপত্র ঠিকমতো সাজিয়ে তুলছে। কিন্তু তৈমুর যা কিছু করছে তা তার আপন শালা বা চাচাতো ভাইদের স্বার্থে, বড় বিবি বা ছোট বিবি কিংবা আনুর জামাইয়ের স্বার্থের কথা তৈমুর ভাবছে না। অথচ এরা সকলেই চায় সম্পত্তি এবং নগদ অর্থের আশু ভাগাভাগি। এতেই এদের লাভ। তৈমুরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার অর্পণ করা না গেলেও সেটা হতো। কিন্তু তৈমুরের যোগ্যতা এবং বাদশা মোল্লার পরিবারের প্রতি স্থানীয় মাতব্বরদের মহব্বতজনিত কারণেই ডা. নন্দলাল তৈমুরের হাতে সবকিছুর চাবি তুলে দিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় কারো প্রতিবাদের কোনো সাহসই ছিল না। এখন বড় বিবি আমজাদের লোভকে কাজে লাগাতে চান। কিন্তু তার আগে এ বাড়ির সকলের মন জয় করতে আমজাদকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করতে চান বড় বিবি। তিনিই এখন আনোয়ারকে গাঁয়ের বাড়িতে না রেখে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। এতে জাহানারা যেমন খুশি হবে, তেমনি খুশি হবে গাঁয়ের এদের সকল আত্মীয়-স্বজন। আজ বড় আম্মার পরামর্শেই আনুর জামাই আনুকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার কথাটা তৈমুরের কানে তুলেছে এবং এর আশাতিত প্রতিক্রিয়া দেখে এখন একেবারে অভিভূত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমজাদকে সাথে নিয়ে তৈমুর রান্না ঘরের চৌকাঠ পেরুতেই জাহানারা একটু অবাক হলো, 'কি ব্যাপার! দু'ভায়রা এমন সাত সকালে একসাথে নাশতা খেতে এলে যে? কোনো মতলব আছে নাকি?'

'তোমার বোনজামাই আনুকে নিয়ে আজই ময়মনসিংহ যাচ্ছে। দুপুরের গাড়িতে। বেচারার সাথে এখানে আসার পর একবেলাও লোকমা ধরার ফুরসত পাইনি।'

তৈমুর এসে বিছানো মাদুরে আমজাদকে নিয়ে বসল।

'আনু চলে যাচ্ছে মানে? কই আনু তো আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি!'

বেশ একটু অবাকই হলো জাহানারা।

'হ্যাঁ আপা। আপনাকে জানাবে কিভাবে, গত রাতেই তো আপনার বোনের সাথে আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটার সিদ্ধান্ত হলো। ভাবলাম ভোরে আপনাকে আর দুলাভাইকে জানাব।'

অস্বাভাবিক হলেও বেশ বিনীত গলার আওয়াজ আমজাদের।

জাহানারা বিস্মিত চোখ তুলে আমজাদকে দেখল।

'আরও একটা সুখবর আছে। আমাদের জামাই মিয়া আনু বিবিকে এ মাসেই কলকাতায় নিয়ে রাখছে। এখন থেকে তোমার বোন কলকাতা শহরেই থাকবে। তুমিও মাঝেমধ্যে সেখানে গিয়ে বেড়াতে পারবে। আর আমাকেও মাল কিনতে গিয়ে এখন থেকে আর হোটেলে থাকতে হবে না। বুঝলে? দাও, নাশতা দাও। সময় কম, আমাকে আবার এখনই বাজারে ছুটতে হচ্ছে।'

সামনে রাখা চালের তৈরি সাদা রুটির স্তূপ থেকে কয়েকটা রুটি নিজের পাতে তুলে নিল তৈমুর। আমজাদকেও প্লেট এগিয়ে দিল। আমজাদ মুরগির ঝোলে রুটি ভিজিয়ে মুখে তুলতে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ আপা, আনুকে এবার যাওয়ার সময়ই সাথে করে নিয়ে যাব। আহা কিছুকাল আগেই যদি আপনার বোনকে সাথে করে নিয়ে যেতাম তাহলে আমার শ্বশুর মনে কত সুখ নিয়ে যেতে পারতেন। আমার আলসেমি আর কলেজের ঝামেলার জন্যই কিছু হলো না।' আমজাদ ঢোক গিলল। জাহানারা পানির গ্লাস এগিয়ে দিলে আমজাদ ঢক ঢক করে পানি খেল। সে বুঝতে পেরেছে জাহানারা ও তৈমুর উভয়েই আনুকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কথায় যারপরনাই আনন্দিত।

'এতদিন আপনাদের বোনকে আমি গাঁয়ের বাড়িতে রেখে গিয়ে আপনাদের মনের মধ্যে খুব পেরেশানি সৃষ্টি করেছি সন্দেহ নেই। তবে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন তাকে দিয়ে আমার মা কোনো লওয়াথোয়ার গৃহস্থালীর কাজই করায়নি। অলস হয়ে গাঁয়ে পড়ে থাকার চেয়ে আমার সাথে কলকাতাতেই থাকুক। কি বলেন দুলাভাই?'

তৈমুর হেসে ফেলল, 'ঠিকই তো। বউ কাছে থাকলে বিদ্বান মানুষের নানাদিকে চোখ যায় না। পিপাসাও কম পায়, ঘরেই যখন সরবত!' খুশিতে উচ্ছসিত তৈমুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকদিন পরে ভায়রার সাথে কৌতুক করার সুযোগ মিলেছে। 'আরে দেখ ভুলে গিয়েছিলাম মাহমুদের মা। যাবার সময় আমাদের আনু বিবির হাতে এক হাজার টাকা গুণে দিয়ে দিও। বড় শহরে গিয়ে নতুন সংসার পাতবে। আলমারিতে গত রাতে যে তহবিল রেখেছি সেখানে এক হাজার আছে। এবার আমি উঠি।'

১৪

সকালে দোকানে পা দিয়েই তৈমুরের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। গোমস্তা ফিরোজ তৈমুরকে জানাল যে, সকালে সাহাবাবুদের বড় ছেলে ললিত এদিক দিয়ে যাবার সময় জানিয়ে গেছে, সে নিজে সারোয়ারকে তাদের দোকানের এক বছরের ভাড়ার টাকা বুঝিয়ে দিয়েছে।

কথাটা শুনে তৈমুর কতক্ষণ থ হয়ে পাপোসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ফিরোজের অস্বস্তি ভরা মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'ভাড়ার টাকাটার উসুল খাতায় লিখে রাখ।'

'ক্যাশ না পেয়েই উসুল লিখতে বলছেন মহাজন?'

'কি করবে? মালিকের হাতে টাকা বুঝিয়ে না দিয়ে তো ললিত এ কথা বলেনি। খাতায় জমা লিখতে হবে।'

'সারোয়ার মিয়া কি টাকাটা জমা দেবে ভেবেছেন?'

'তা না দিলেও টাকা আমরা পেয়েছি এটাই লিখতে হবে। পরে সারোয়ারের নামে ভাড়ার টাকাটার খরচ দেখাতে হবে।'

তৈমুরের কথায় ফিরোজ খেরোখাতা টেনে হিসাবটা লিখতে লাগল। এ সময় সারোয়ার এসে দোকানে ঢুকছে দেখে ফিরোজ কলম রেখে টুলের ওপর বসল। মনে হয় এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। চোখ জোড়া অস্বাভাবিকভাবে ফোলা এবং অনিদ্রায় লাল হয়ে আছে। চুল শুকনো, উস্কুখুস্কু। পোশাকের কোনো শ্রী নেই।

তৈমুর সহসা তাকে টাকার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন না করে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে নাকি সারোয়ার?'

সারোয়ার ভগ্নিপতির কাছে অতটা ভদ্র ব্যবহার আশা করেনি। সে হতচকিতের মতো জবাব দিল, 'না দুলাভাই, আমি একটা কথা বলতে এই সাত সকালে দোকানে ছুটে এসেছি।'

'আমি জানি তুমি কি বলবে। ললিতের দেওয়া টাকাটা আমি খাতায় উসুল দিয়ে দিতে বলেছি। তবে কাজটা তুমি ভালো করনি, নিজেই চিন্তা করলে বুঝতে পারবে। টাকার দরকার হলে তোমার বোনের কাছেও চেয়ে নিতে পারতে। আমি তোমাদের ব্যবসা দেখি, হিসাবপত্র ঠিক রাখতে হয় আমাকে। আজ না হোক কাল এই টাকার হিসাব আমাকে দিতে হবে।'

'টাকাটা আমার খুবই দরকার ছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দরকারটাও আমি জানি। তুমি নিজেকে এভাবে নষ্ট করে ফেলতে চইলে ভেব না তোমার বোন আর আমি তা বসে বসে দেখতে থাকব। হয় তোমাদের কাজ কারবার আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, নইলে তোমাকে ওপথ ছেড়ে দিতে হবে।'

সারোয়ার মাথা নুইয়ে বসে থাকল। কোনো জবাব তার মুখে আসছে না। সে তৈরি হয়ে এসেছিল তৈমুরের সাথে কথা কাটাকাটি করার ইচ্ছেয়। কিন্তু এখন তৈমুরের মুরুব্বির মতো আচরণ এবং দায়দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে সারোয়ার থমকে গেল। এখন সে কি বলবে? হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমার লেখাপড়ায় মন বসছে না।'

এ কথায় তৈমুর কতক্ষণ সারোয়ারের চেহারার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ফিরোজ মিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'যাও তো সামনের দোকান থেকে কিছু নাশতা আর চা নিয়ে এস।'

ফিরোজ উঠে গেলে তৈমুর সারোয়ারের দিকে ফিরে বলল, 'কি করবে তাহলে ব্যবসা?'

'ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে ইস্কুল-টিস্কুল আমার পোষাবে না।'

'তোমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আর মাত্র আড়াই মাস বাকি, তোমার বড় ভাই গত বছর নানা ছুতোয় পরীক্ষা না দিয়ে এ বছর তোমার সাথেই দিতে যাচ্ছে। তুমি মোটামুটি খারাপ ছাত্রও নও। পরীক্ষাটা একটু মনোযোগ দিয়ে দিতে পারলে পাস করে ফেলবে।

'আমার কোনো প্রিপারেশন নেই।'

'এখনও সময় আছে সারোয়ার।'

'পড়াশোনা আমার ভালো লাগছে না, দুলাভাই।'

'নিজের সর্বনাশ এভাবে কেউ করে না। দরকার হলে বাজারের লোকজন ডেকে পাড়ার ওই খারাপ মেয়েটাকে আমি শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি, সারোয়ার। কিন্তু তা করতে যাব না, যদি তুমি পরীক্ষা দিতে রাজি হও।' তৈমুর ক্যাসের পেছন থকে সোজা উঠে এসে সারোয়ারের সামনে বসল, 'তুমি কেমন মানুষের ছেলে তাকি তুমি জান না?'

'জানব না কেন? আমার বাপ এ শহরের একজন ধনী-মানি লোক ছিলেন। কিন্তু তারও দোষ ছিল।'

'এ ধরনের কথাবার্তা আমি তোমার মুখ থেকে আর একটুও শুনতে চাই না সরো।'

'আপনি রাগ করছেন।'

'রাগের কি দেখলে? তিনি আমার চাচা এবং শ্বশুর ছিলেন। তার কাছে আমি ব্যবসা-বাণিজ্য শিখেছি। তিনি সব ব্যাপারে আমার ওস্তাদ ছিলেন। মানি, তার কিছু নেশার ব্যাপার ছিল, কিন্তু তার মতো বড় হৃদয়ের মানুষ এ শহরে আর কাউকেও পাইনি। নিজের চেষ্টায় একজন গোমস্তা থেকে তিনি রাজার ভাণ্ডার সঞ্চয়ের যোগ্যতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিয়েছেন। তোমাদের জন্য রেখে গেছেন রাজত্ব। এ রাজত্ব হেলায় নষ্ট হতে দিতে পারি না। তোমার যদি কোনো কারণে একাকি লাগে আমাকে বল, আমি ও তোমার বোন এ তল্লাটের সবচেয়ে উঁচু ঘরে তোমার জন্য সম্বন্ধ করাব। সবচেয়ে খুবসুরত বৌ জোগাড় করে আনব তোমার জন্য। এখনও সময় আছে, সর্বনাশের পথ থেকে তুমি সরে এসো সারোয়ার।'

অনেকটা মিনতির মতোই শোনা গেল তৈমুরের কথাগুলো। সারোয়ার কেমন যেন এসব কথায় একটু বিহ্বল হয়ে পড়ে বলে ফেলতে বাধ্য হলো, 'তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে বলেন দুলাভাই?'

'পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে বলি। তোমাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হবে। খানিকটা লেখাপড়া জানা থাকলে পরবর্তী জীবনে এ শহর আমাদের পরিবারের শত্রুরা তোমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে সাহস পাবে না। আমি জানি তোমাদের, শওকত বা সারোয়ারের জীবনে কোনোদিন কোনো অবস্থায় কারো চাকরি করে খেতে হবে না। তোমাদের জন্য আমার চাচা যথেষ্টই রেখে গেছেন। তবে এটাও মনে রেখ, মুর্খ হয়ে থাকলে এই রাজার ভাণ্ডার রক্ষা করতে পারবে না।'

ফিরোজ চা-নাশতা নিয়ে ঘুরে ঢুকল।

'নাও, আমার সাতে নাশতা খাও। আমি অবশ্য সকালে বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হলো, সকালে ঠিকমতো খেয়ে বেরোওনি।'

তৈমুরের আদেশে সারোয়ার একটা ডিম পোচ পিরিচ থেকে তুলে খেয়ে নিল। সামনে গরম ডালপুরি, মহাদেব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ফ্রেস সন্দেশ ও সরবি কলা পেয়ে সারোয়ার তৃপ্তির সাথে নাশতা করল। চায়ের কাপটা হাতে নিয়েই সারোয়ারের মনে হলো, তৈমুর প্রকৃতপক্ষে তার শত্রু নয়। হাজার হোক তার ভগ্নিপতি, আপন চাচাত ভাই। পর তো নয়। এতক্ষণ পর্যন্ত তৈমুর যা বলেছে সবই তো তার এবং তার ভাইদের মঙ্গল চিন্তা করেই। অথচ বাড়ির অন্যান্য শরিকদের ধারণা, তৈমুর ও তার বড় বোন জাহানারা আখের গোছাচ্ছে। এমনকি আনু বুবু'র জামাই পর্যন্ত একই সন্দেহ বাতিকে ভুগছে।

খাওয়া হয়ে গেলে চায়ের কাপটা রেখে সারোয়ার হঠাৎ তৈমুরের দিকে মুখ তুলে হাসল, 'পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে এখন দু'জন প্রাইভেট টিচার লাগবে। সারা বছর তো আমি বই ছুঁয়ে দেখিনি। ইংরেজি আর অংক এ আড়াই মাসে কভার করতে পারলে হয়।'

'বল কাকে ঠিক করে দেব? আমি নিজে গিয়ে অন্নদা স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক আর এডোয়ার্ড স্কুলের সেই অংকের স্যার অরিন্দম ঘোষকে আজই তোমাকে দু'বেলা বাড়িতে এসে পড়াতে বলে দেব।'

'না বাড়িতে আসতে হবে না। আমি নিজে গিয়েই স্যারদের বাসায় কোচিং করে আসব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথায় তৈমুর বুঝল যে, সারোয়ার নিয়মিত বাড়িতে রাত কাটাতে পারবে না বলেই এই আপত্তি। নিজেই টিচারদের বাসায় গিয়ে পড়ে আসতে চায়। বাজারের মেয়েটির মোহ ত্যাগ যে সহসা সম্ভব নয় এটা বুঝতে বাকি রইল না। তবুও সারোয়ারকে যে এতটুকু বশ মানানো গেছে এতেই তৈমুর খুশি। বলা যায়, এক আকস্মিক অসাধ্য সাধন।

'ঠিক আছে, তোমার যেমন মরজি। আমি একটু পর স্যারদের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলে আসব। সময়ও ঠিক করে এসে তোমার বোনকে জানাব। তুমি তার কাছ থেকে জেনে নিও।'

'না দুলাভাই, বুবুকে এসব বলার দরকার নেই, আমিই কাল সকালে এসে আপনার কাছ থেকে পড়ার রুটিনটা জেনে যাব। বুবু আমার ওপর ক্ষেপে আছেন। তাকে শুধু বলবেন আমি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। যেখানেই থাকি, আমি এখন থেকে বই নিয়েই থাকব।' বলল সারোয়ার।

তৈমুর আন্দাজ করল, সারোয়ার খারাপ পাড়ার গোলাপি মেয়েটির প্রতি একেবারে মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। সম্ভবত সে সেখানেই বইপত্র নিয়ে পড়ার কথা ভাবছে। তৈমুরের মনটা এতে দমে গেলেও সে মনের অবস্থাটা গোপন রাখার চেষ্টা করল, 'তুমি যখন বলছ যেখানেই থাক বই নিয়েই থাকবে, তখন তোমার বোনকে আমি বোঝাতে পারব।'

'তাহলে আমি উঠি দুলাভাই। ও আর একটি কথা, ভাড়ার টাকার সবটিই আমি খরচ করে ফেলিনি। এখনও সাত-আটশ টাকা অবশিষ্ট আছে। টাকাটা ফিরোজ মিয়াকে বলুন জমা নিতে।'

বলতে বলতে পকেট থেকে টাকার একটা চামড়ার খুতি বের করল সারোয়ার। তৈমুর বলল, 'থাক ও টাকাটা তোমার পরীক্ষা উপলক্ষে ব্যক্তিগত খরচের জন্য আমি দিলাম। ও টাকা আর ফেরত দিতে হবে না। টাকাটা পারিবারিক ব্যয়ের খাতেই লেখা হবে। তুমি এখন আমার সাথে কথা দিলে আমি ওতে বিশ্বাস করলাম। আশা করি, বিশ্বাস ভঙ্গের মতো তুমি কিছু করে তোমার বোনকে কষ্ট দেবে না।

সারোয়ার এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে দোকান থেকে মাথা নুইয়ে বেরিয়ে এল।

বেলা তিনটার দিকে সারোয়ার একগাদা বই একটা ছালার বস্তায় নিয়ে এসে খারাপ গলিটার মুখে দাঁড়াতেই কাঁঠালি বটের নিচে পানের দোকানের সামনে দুপুরের আলস্য-যাপবনরত মেয়েরা হঠাৎ চকিত হয়ে সারোয়ারকে দেখতে লাগল। একজন কুলি বস্তাটা এনে গলির মুখে নামিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেছে। কেউ জানে না বস্তার ভেতর কি আছে। সবারই ধারণা, গোলাপির এই অর্বাচীন খদ্দের বোধহয় গোলাপির জন্য কোনো হাটবাজার করে এনেছে। সকলেই তীর্যক দৃষ্টিতে সারোয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সারোয়ার বেপরোয়া। সে এক টানে বস্তাটা কাঁধে তুলে নিয়ে গলির ভেতরে ঢুকে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারোয়ার এসে গোলাপির দরজায় হাঁক দিতেই গোলাপি দুয়ার মেলে হতভম্ব। সামনে সারোয়ার একটা ছালার বস্তা কাঁধে নিয়ে দাঁড়ানো।

'এসব কি?'

'বই আর খাতাপত্র।'

কাঁধ থেকে বস্তাটা ঘরের চৌকাঠের ভেতরে ঠেসে দিল সারোয়ার।

১৫

আনোয়ারা বরসহ চলে গেলে এত বড় বাড়িটাই যেন জাহানারার কাছে বড় ফাঁকা হয়ে গেল। যে কামরাটার জন্য আমজাদ জাহানারার সাথে বেয়াদবি করেছিল, এখন সে কামরাটা খালিই পড়ে আছে। জাহানারা আর এ কামরায় ফিরে এল না। বরং শওকত ও সাফফাতকে তৈমুর বার বাড়ির দালান থেকে এখন এখানে এসে থাকতে হুকুম করেছে। কারণ বার বাড়িটা মূল দালান থেকে বেশ এক উঠোন দূর হওয়ায় জাহানারা তার ভাইদের দিকে ঠিকমতো নজর রাখতে পারে না। প্রাইভেট টিউটর কখন আসে কখন যায় তা জাহানারা অনেক সময় বুঝতেও পারে না। তাছাড়া পড়ার সময়টকু ছাড়া তার তিন ভাই কিভাবে সময় কাটায় এটাও জাহানারা ঠিকমতো জানে না। সারোয়ারের ব্যাপারে এ বাড়ির সকলেই একরকম আশা ছেড়ে দিয়েছে। সে কারো কথা শোনে না। তার খারাপ পথে পা বাড়ানোর খবরটা মহল্লার সবার ঘরেই আলোচ্য বিষয়। সকলেই সারোয়ারকে ভয়ের চোখে দেখে।

আনোয়ারাকে বিদেয় করেই জাহানারা বাড়ির মুনি-মানুষের সর্দার ইসমাইলকে বলল, 'ইসমাইল ভাই, আমার ভায়ের আজ থেকে ভেতর বাড়িতেই থাকবে। আপনি বার বাড়ি থেকে ওদের খাট আর বিছানাপত্র মাঝের কামরায় এনে পেতে দিন।'

ইসমাইল কথামতো কাজ করল। শওকত, সাফফাত এবং সারোয়ারের বিছানাপত্র এনে মাঝের কামরায় পেতে দিয়ে হেসে জাহানারাকে বলল, 'তোমার এক ভাই তো আজকাল বাড়িতে থাকে না। তার আশা একেবারে ছেড়ে দিও না। সারোয়ারই আমার মালিকের একমাত্র পুত্র যার মাথায় একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। খারপ পাড়ায় গেলেও সেই একদিন মোল্লা সাহেবের নাম রাখবে। তাকে হিসাব থেকে তুমি ও তৈমুর মিয়া একেবারে বাদ দিও না। আর দোষের কথা যদি বল, তাহলে ভেবে দেখ তোমার আব্বাজানেরও এসব দোষ ছিল। প্রথম জীবনে তারও নানা খারাপ অভ্যেস ছিল। আমি তার চাকর হলেও তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতোই দেখতেন এবং অনেক সময় নিজের মনের কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। তার ধারণা ছিল একদিন সারোয়ারই এ সংসারের হাল ধরার মতো হবে।'

'আমি সব জানি ইসমাইল ভাই। আমি জানি, সরো যদি তার দুলাভাইয়ের কাছে আমাদের কায়কারবারের কায়দাটা একটু শিখে নিতে পারে তবে আমার বাপের কষ্টের উপার্জন আর ব্যবসা-বাণিজ্য তলিয়ে যাবে না। মাহমুদের আব্বাও সরোর সুমতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য চেষ্টা করছে।' বলতে বলতে জাহানারা ইসমাইলের পেতে দেওয়া খাটের ওপর বসল, 'এখন আমাদের ভয়ের ব্যাপার হয়েছে, সরো না বাজার থেকে একদিন একটা খারাপ মেয়েকে এনে এ বাড়িতে ঢুকিয়ে বলে যে, এই আমার বউ। তাহলে আমরা কোথায় যাব? তখন তো আমার পক্ষে আর এ বাড়িতে বসবাস করা সম্ভব হবে না ইসমাইল ভাই। তাছাড়া এ বাড়ির অন্য শরিকরাও তা মানবে কেন, আপনিই বলুন?'

'আমার তো মনে হয় না সারোয়ার এ কাজ করবে। এখন বয়েসের পাগলামিতে একটু এদিক-সেদিক করছে। তোমার অন্য ভাই দু'টোও যে ফেরেশতা এটা ভেব না।' ইসমাইল খাটে বিছানার চাদর বিছিয়ে হাত দিয়ে সমান করতে গিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, 'বড়জনকে আমি এতদিন ভাবতাম তোমার ভাইদের মধ্যে এটাই বুঝি একটু সোজা মানুষ। কাল দুপুরে গোলাঘর থেকে ধান বের করতে গিয়ে দুয়ার খুলে দেখি, সে বাড়ির জোয়ান কাজের ছেড়িটাকে নিয়ে ধানের বস্তার ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে।'

'কে, শওকত? মর্জিনার সাথে? কই, আপনি তো আমাকে কিছু বলেন নি?'

কেমন যেন আঁতকে উঠল জাহানারা।

'বলিনি, বললে কি হত? তোমার কেবল দুশ্চিন্তাই বাড়ত। মর্জি মেয়েটিকে আমি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি যদিও, কিন্তু আমি তো আর আমার মালিকের ছেলের গায়ে হাত তুলতে পারি না। সে গোলার ধান চুরি করে মেয়েটার বাড়ি পাঠাত। কত মণ ধান সে রাতের অন্ধকারে পাচার করেছে কে জানে? এ অবস্থায় কেবল সরো মিয়া খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে তোমাদের কপাল চাপড়ে লাভ নেই বোন। বরং তৈমুর মিয়াকে বল এদের বিয়ে-সাদি দিয়ে ঘর-সংসারি করে দিতে। এতেও তৈমুর মিয়ার শ্বশুরের প্রতি কিছুটা কর্তব্য পালন হবে।'

কথাগুলো বলে ইসমাইল কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলে জাহানারা পাথরের মতো খাটের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

রাত বারোটার দিকে বড় বিবির ঘরের বাইরের শিকলটা একটু নড়ে উঠতেই তিনি নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে এলেন এবং সাবধানে দরজার খিল আলগা করে দিলেন। দরজাটা ফাঁক হতেই একটা কালো বোরখা পরা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি এসে বড় বিবির ঘরে ঢুকল। বড় বিবি আগের মতোই নিঃশব্দে দুয়ারে খিল এঁটে দিয়ে খাটের ওপর এসে বসলেন। শিথানে রাখা বিশাল পানের বাটা থেকে একটা পান তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন এবং বালিশের তলা থেকে জর্দার কৌটো বের করে এনে হাতের তালুতে সুগন্ধি জর্দা ঢেলে মুখে তুলে বিকৃত গলায় বললেন, 'আমার কাছে এখন এসে লাভ নেই মর্জি। তোকে হাজারবার বলেছি ধরা পড়লে এ বাড়িতে তোর ঠাঁই হবে না। পেটে বাচ্চা যাওয়ার আগে সাবধান থাকতে আমি তোকে সতর্ক করেছি। এখন জাহান্নামে যা। ইসমাইল সব কাহিনি জানু আর জানুর জামাইকে জানিয়ে দিয়েছে। আমি আর তোকে আমার খাস বান্দী করে এ বাড়িতে রাখতে পারব না।' খাটের পাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখা হারিকেন বাতিটা আরও একটু কমিয়ে দিলেন বড় বিবি, 'আমার সাথে দেখা করতে যখন তখন রাতবিরেতে এ বাড়িতে ঢুকবি না। মনে রাখিস, ইসমাইলের চোখ থাকবে এখন থেকে তোর ওপর। জানু যদি বুঝতে পারে তার ভাইয়ের পেছনে আমিই তোকে লাগিয়েছি, তাহলে খুব খারাপ হবে। এমনিতে আমি আমার সতীনের ছেলেদের মন্দ চাই না। চাই কেবল তৈমুরকে এ বাড়ির খবরদারি থেকে দূর করতে। ভেবেছিলাম তুই শওকত ছোকরাটাকে ভুলিয়ে যদি পেটে বাচ্চা ধরতে পারিস তাহলে এমন ব্যবস্থা করব যাতে তোর মতো বান্দির সাথে আমার সতীনের ছেলের বিয়ে দিতে সমাজ তৈমুরকে বাধ্য করে। তুই পারলি না। ইসমাইলের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলি। এখন যদি ওরা জেনে যায় তুই রাতের অন্ধকারে আমার সাথে দেখা করছিস, তাহলে ওরা ভাববে এসব আমারই কারসাজি। সৎমা বলেই আমি এদের সংসার ভাঙতে তোকে লাগিয়েছি।' বড়বিবি পান আর কথাগুলো যেন একসঙ্গে চিবিয়ে পিকদানে পিক ফেললেন।

'এখন আমি কি করব? ঘরে বসে থাকলে আমার খোরাক কোত্থেকে আসবে? আপনার কথাতেই তো আমি বড় মিয়ার কাছে গিয়েছিলাম। এখন আপনি আশ্রয় না দিলে আমি কোথায় যাই?' মর্জিনা গা থেকে বোরখাটা খুলে ভাঁজ করে কাঁধে রাখল। মেয়েটি কালো হলেও বেশ লম্বা। পিঠে দীর্ঘ বেণি। মাথার চুল কোঁকড়ানো। হাঁসের মতো লম্বা গলা। গলায় রূপোর হার। কানেও রূপোর অলঙ্কার। বুক দুটি ঠেলে উঠে তার স্বাস্থ্য ও সুঠাম শরীরের জানান দিচ্ছে। কালোর মধ্যে মর্জিনা যে বেশ সুন্দরি তা বোঝা যায়। 'আপনার কাজ করলেও আমি তৈমুর মিয়ার কাছ থেকে মাসে মাসে বেতন নিতাম। ইসমাইল আমাকে মেরে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আপনি তো বোঝেন আমার পক্ষে আর তার কিংবা জানু বিবির কাছে গিয়ে হাত পাতা সম্ভব নয়। তাহলে তারা আমার চুল কেটে মুখে কালি মাখিয়ে বের করে দেবে। এ অবস্থায় আপনি যদি আমাকে না বাঁচান বড়মা, তাহলে ফাঁসি লটকিয়ে মরব। ইসমাইল মহল্লার লোকদের জানায়নি বলে আমি এখনও মৌড়াইল গাঁয়ে আছি। জানাজানি হলে পাড়ার মাতবররা আমাকে দেশছাড়া না করে ছাড়বে?'

'ইসমাইল এ ব্যাপারে আর লোক জানাজানি করবে না। কারণ শওকত তার মালিকের ছেলে। তোর সাথে শওকতের নামও জড়িত। সে চুপ করেই থাকবে।' আবার পিকদানে পিক ফেললেন বড় বিবি, 'আমি তোকে এখন কিভাবে পুষব? তুই বরং চেষ্টা কর তোর সাথে শওকতের সম্পর্কটা যেন আলগা হয়ে না যায়। যদি লুকিয়ে-চুরিয়ে ছেলেটিকে ফাঁসাতে পারিস, তবে জানবি তুই বাদশাহজাদির কপাল নিয়ে জন্মেছিস। আমি এখন তোকে এক মাসের বেতন যা তৈমুর মিয়ার কাছে পেতিস তাই দিচ্ছি। এই নিয়েই লুকিয়ে চলে যা।'

বলেই বড় বিবি বালিশের তলা তেকে একটা খুতি হাতড়ে পাঁচটি রূপোর টাকা বের করে মর্জিনার হাতে দিলেন। মর্জিনা টাকাগুলো কোমরে গুঁজে সাবধানে বোরখায় গা ঢেকে অন্ধকারে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়িতে নেমে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রাতে একই সময় খাটের ওপর অন্ধকারে মুখোমুখি বসে কথা বলছিল তৈমুর ও জাহানারা। ঘরে একটা হারিকেন থাকলেও সেটা প্রায় নিভু নিভু। জাহানারা বলল, 'তুমি বরং আর দেরি না করে শকওতের জন্য উপযুক্ত ঘরে একটা বউ খুঁজে বের কর মাহমুদের আব্বা। ইসমাইল ভাই ঠিকই বলেছে। আমার বাপের সংসারের তলিয়ে যাওয়া তুমি ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এখন দেখ এদের সংসারি করার জন্য কিছু করতে পার কিনা। সংসার আর বউ ছেলেমেয়ে থাকলে কে জানে হয়তো সব হারিয়েও এরা টিকে থাকবে। আর যদি পেছনের কোনো টান না থাকে, তবে স্রোতের তোড়ে যেখানে খুশি ভেসে যাবে। সরোর আশা আমি এক রকম ছেড়েই দিয়েছি। এখন দেখ বাকি দু'টিকে বাঁচানো যায় কিনা।'

'সারোয়ারের ব্যাপারে তুমি খুবই হতাশ, আমি জানি। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো, তোমার ভাইদের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে বুঝদার। খারাপ পাড়ায় পড়ে থাকাটা তোমাদের পরিবারের কোনো নতুন পাপ নয়। এটা এ বংশের আদি পাপ। সবাই জানে এ দোষ আমার শ্বশুরেরও ছিল। তবুও তাকে এ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা করত। ভয়ও পেত। কারণ তার বিষয়বুদ্ধি ছিল। তিনি নিজের চেষ্টায় এ দেশের একজন ধনী মানুষ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাজারগুলোসহ সবগুলো মহল্লার বিচারক ছিলেন তিনি। তার কাছে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সুবিচারের জন্য ছুটে আসত। তিনি ইনসাফ করতে জানতেন বলেই আল্লাহ তাকে দু'হাতে দৌলতও দিয়েছিলেন। আবার বুদ্ধি ও বিবেকেরও কমতি ছিল না। তিনি বিয়ে করলেও ঘরে কসবী তুলেননি। তাদের কাছ থেকে হয়ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও নিয়ে থাকবেন। এতদঞ্চলের নিন্দুকদের মুখে আমি আজীবন এ কথাই শুনে এসেছি। কিন্তু আমার এতে বিশ্বাস জন্মায়নি। কারণ আমি নিজে তো দেখেছি কায়কারবারে আমার চাচা কী অমানুষিক পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতেন। এটাও অস্বীকার করা যাবে না, তার কতগুলো খারাপ নেশা ছিল। সারোয়ারের ব্যাপারেও আমার আশা, সে এখন যেমন ছেলেমানুষি করছে—তেমন অবস্থা চিরকাল থাকবে না। আমার তো মনে হয়, সেই একদিন আমার চাচার বিষয়-সম্পত্তির হাল ধরবে।' তৈমুর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিছানায় কাত হয়ে শিথানের জোড়া বালিশে মাথা রাখল।

জাহানারা বলল, 'যা-ই ঘটুক এসব নিয়ে আমি আর চিন্তা করতে চাই না। চিন্তা করে কি হবে? তবে শওকতের বিষয়ে যা জানলে এতে আর বসে থাকা যায় না। যত তাড়াতাড়ি পার তার বিয়ে দিয়ে আমাকে ভারমুক্ত কর। অন্তত আমার ভাইদের হেঁসেল ঠেলার জন্য একজন নিজের মানুষ ঘরে থাকলে হয়তোবা আমি নিজের বাড়িঘরে ফেরার একটা উসিলা বের করতে পারব। তখন কেউ বলবে না, ভাইদের সম্পত্তি লুটেপুটে খেয়ে আমি ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছি।'

'মর্জি মেয়েটার খোঁজ-খবর নিয়েছিলে?'

'না। আমি বুঝি ওই বড় বিবির বান্দিটার খোঁজ করতে যাব, যে কিনা আমার বোকা বদমাশ ভাইটার সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে গোলাঘরে ধরা পড়েছে! তুমি আমাকে কি ভাব বল তো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখানে ভাবাভাবির কিছু নেই মাহমুদের মা। মর্জিনার অত সাহস হবে না যে শওকতের দিকে হাত বাড়ায়। আমার তো সন্দেহ হয় শকওতের পেছনে ওই সোমত্ত জোয়ান মেয়েটিকে কেউ লেলিয়ে দিয়েছে। শওকতের এখন ভালোমন্দ যাচাই করার বয়স নয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কিন্তু আছে। মর্জি এ মাসের পাওনা নিতেও আমার কাছে আসেনি বা কাউকে পাঠায়নি। মেয়েটার ব্যাপারে তোমার একটু সতর্ক থাকা উচিত। এ গাঁয়েরই তো মেয়ে। একটু নজর রেখ। আর আমিও শওকতের সম্বন্ধ দেখছি। সমান ঘর, সমান বংশ মর্যাদাটুকু তো অন্তত পেতে হবে?'

তৈমুর অন্যদিকে পাশ ফিরতে গিয়ে স্ত্রীকে সাবধান করল। এখন রাত একটা। তৈমুরেরও প্রবল ঘুম পেয়েছে।

জাহানারাও স্বামীর পাশের বালিশে মাথা রাখতে গিয়ে অলস হাই তুলে বলল, 'সর্বনাশ, এটা তো আমার মাথায় আসেনি। মর্জিনা বড় আম্মার পেয়ারের কাজের মেয়ে। বেশ কয়েক বছর ধরে তার খেদমতে আছে। কে জানে কোন মতলবে মেয়েটিকে শওকতের পেছনে লাগানো হয়েছে। তবে এটাও জেন...' জাহানারা স্বামীকে নিজের দিকে ফেরানোর জন্য বাহু ধরে টান দিল, 'যদি বড় বিবি বা এ বাড়ির কেউ এর পেছনে থেকে থাকে তবে কাউকে ছাড়ব না।'

'কি করবে?'

'আমার ভাইদের কেউ সর্বনাশ করবে আর আমি বুঝি চুপ করে থাকব?'

'তা যে থাকবে না সেটা কি আমি জানি না ভেবেছ? প্রশ্ন হলো, করবেটা কি?'

'দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলব। সংসার, সম্পত্তি, দোকানপাট ভাগবাটোয়ারা করে সবার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলব। উঠোনে দেয়াল তুলে সৎ মাদের সাথে মুখ দেখাদেখি বন্ধ কর দেব। তুমি আমাকে চেন না? আমি বাদশা মোল্লার মেয়ে!'

'তাই বুঝি', বেশ শব্দ করে হাসল তৈমুর, 'তোমার সৎ মায়েরাও তো এটাই চাইছে। সম্পত্তি ও দোকানপাটের ভাগবাটোয়ারা। এই ভাগাভাগিটা যাতে এই মুহূর্তে না হয় সেটারই ব্যবস্থা করে গেছেন তোমার আব্বার বন্ধুরা। এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বিরাও। ফাদার জোনস, নন্দ কাকা, বিহারি বাবু, বংশী মাস্টার আর শহরের আড়তদাররা। তারা এই মুহূর্তে বাদশা মোল্লার ব্যবসাপত্র গুটিয়ে দিয়ে নগদ পয়সার হরিরলুট চান না বলেই তোমার সৎ মায়েরা এ ব্যবস্থায় দারুণ অসন্তুষ্ট। এখন যদি তুমিই এটা করে দাও, তাহলে তো তাদের খুশির আর সীমাই থাকবে না। তোমার বোন জামাই আমজাদ মিয়াও তাদেরই দলে, এটা ভুলে যেও না।'

'তাহলে তুমি এ অবস্থায় কি করতে বল?'

'মর্জিনা মেয়েটির ওপর নজর রাখতে হবে। আমার তো মনে হয়, তাড়িয়ে দিলেও হারামজাদির সাথে তোমার বড় আম্মাজানের সম্পর্ক আছে। হয়ত লেনদেনও আছে। শওকত মর্জির সাথে কতটা অগ্রসর হয়েছিল তা একটা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে বোঝা যাবে না। ধর মর্জি যদি বলে তার পেটে বাদশা মোল্লার নাতি বা নাতনি আছে, তখন কি করবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা আর ধৈর্য রাখতে না পেরে স্বামীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সটান বিছানায় উঠে বসল, 'কি বলতে চাও তুমি? তোমারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। শওকত ক'দিনের ছেলে? এখনও নাকে টিপ দিলে দুধ বেরিয়ে আসবে। তুমি আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে এই ধারণা কর মাহমুদের আব্বা?'

'এটা ধারণা না জানু, ভয়। আমি ভয় পাচ্ছি। জানো তো তোমার বড় আম্মাজান কি করতে পারেন? তেমন দুর্ভাগ্য যদি তোমার ভাই শওকতের কপালে থাকে, সে ব্যাপারে তোমাকে সজাগ থাকতে বলছি মাত্র। আমি কোনো অগ্রিম আন্দাজের কারবার করি না। তবে তোমার মা কতদূর নিচে নামতে পারেন তা তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি। সজাগ থাকার জন্যই তোমাকে এসব বললাম। বিছানায় বসে থেকে দুশ্চিন্তায় কিছু এগোবে না। শুয়ে পড়।'

তৈমুর আবার স্ত্রীকে নিজের দিকে টেনে এনে বালিশে শুইয়ে দিল।

১৬

আজ খ্রিস্টান মিশন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরুবে। এটা ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিন। এই পরীক্ষার জেরাল্ট নিয়ে মাহমুদ চিরকালের জন্য মিশন স্কুল ছেড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোনো হাইস্কুলে ভর্তি হবে। সেখানে শৈশবের শিক্ষক ফাদার জোনসের মতো দয়ালু মানুষ হয়তো আর মিলবে না। থাকবে না কৃষ্ণা ঘোষ কিংবা মারিয়া কুকারের মতো মেধাবি প্রতিদ্বন্দ্বিরা। মিশন এলাকার গির্জার নিচে বসে গল্পের বই পড়ার রোমাঞ্চকর দিনগুলো আর হয়তো ফিরে পাওয়া যাবে না। তবুও নতুন পরিবেশে নতুন বন্ধু-বান্ধব ও অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই মাহমুদের জন্য অপেক্ষা করছে। এসব চিন্তা করতে করতে মাহমুদ ভোর ছটায় বিছানায় উঠে বসল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলোর আভা এসে ঢুকেছে ঘরে। বড় দরজাটা একটু ফাঁক। সকাল সাড়ে পাঁচটায় তালেবেুএলেম ছেলেটা তাকে জাগিয়ে দিয়ে ফজরের নামাযের আযান দিতে সেই যে বেরিয়ে গেছে এখনও ফেরেনি। যাওয়ার সময় বলে গেছে, 'এই যে মাহমুদ মিয়া, ওঠ। আজ তোমার না ফল বেরুবে বলেছিলে? উঠে যাও, আমি মসজিদে গেলাম।'

ছেলেটা চলে গেলে মাহমুদ তাদের বিশাল ঘরের এ তীর থেকে ও তীর পর্যন্ত আবছা আলোর মধ্যে কাঠের বিমগুলোর দিকে তাকিয়ে এলোমেলোভাবে নানা কথা চিন্তা করছিল। এর মধ্যে তালেবেএলেম ছেলেটার আযান শুনল মাহমুদ। গলায় জোর আছে ওর। ও যখন আযান হাঁকে, মাহমুদ লক্ষ্য করেছে, এ বাড়ির ছেলে-বুড়ো সকলেই কান পেতে আযানের কথাগুলো শোনে। কেমন যেন একটা আলাদা মধুরতা আছে ওর আযানের ভঙ্গিতে।

কিন্তু মাহমুদের এ মুহূর্তে উঠতে ইচ্ছে হলো না। মনে হলো সাড়ে সাতটায় স্কুলের ঘণ্টা বাজবে। হয়তো এরও আধঘণ্টা পর ফাদার জোনস ও অন্যান্য শিক্ষক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষয়িত্রীরা প্রোগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে ক্লাসে ঢুকবেন। এত তাড়া নেই তার ফল নিয়ে সে ভাবে না। জানে, পরীক্ষা তার বেশ ভালোই হয়েছে। যদি কৃষ্ণা বা মারিয়াকে পেছনে ঠেলে সে প্রথম হতে পার তবে তো খুশির সীমাই থাকবে না। না পারলেও ক্ষতি নেই। তৃতীয় স্থান তো তার জন্য থাকবেই। তবে সে এবার মনে মনে একটু বেশিই আশা করে। এতদিন কেবল অংকের জন্যই মাহমুদ ঘোষপাড়ার বংশি মাস্টারের মেয়ে কৃষ্ণার সাথে পেরে ওঠেনি। মেয়েটার পাটিগণিতের মাথা একেবারে ছেলেদের মতো। একশ'র মধ্যে অংকে একশ'ই কৃষ্ণা বাগিয়ে নিয়েছে। আর মারিয়ার মাতৃভাষা ইংরেজি হওয়ায় সে স্বাভাবিক পারদর্শিতায় ইংরেজিতে ভালো করে। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বি দুটো বিষয়কে যেন এতদিন অধিকার করেই রেখেছিল। কিন্তু এবার অংক ও ইংরেজি পরীক্ষা দিয়ে এসে মাহমুদ তার আম্মার কানে কানে বলেছে, 'দেখ এবার আমিই ফার্স্ট হব। অংক সবগুলো কারেক্ট হয়েছে। ইরেজি ব্যাকরণেও এবার ভুল লিখে আসিনি বলে মনে হয়।'

জাহানারা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে একেবারে আত্মহারা হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি বলছিস?'

'মনে তো হয় এবার আমিই প্রথম হবো। ভূগোলও ভালো হয়েছে, ইতিহাসও ভালোই লিখেছি।' ছেলে মা'র দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, 'তবুও আব্বাকে এখনই কিছু আবার বলতে যেও না। আগে রেজাল্ট আসতে দাও, বলা তো যায় না। আমি যেমন ভাবছি, রেজাল্ট যদি সত্যিই তেমন না হয়?'

'তাতে কি, এমন সুখবর আমি তোর আব্বাকে না জানিয়ে পেটে রাখতে পারব বুঝি ভেবেছিস?'

মা ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে তার চুলে মুখ ঘষতে লেগেছিল।

সেই সুখ স্মৃতিই মাহমুদকে বিছানা ছাড়তে দিচ্ছে না। সে বালিশ আঁকড়ে হাসি মুখে বিছানায় শুয়ে আছে।

এর মধ্যেই পাখির ডাকে বাড়ির আঙিনাটা যেন ভরে যেতে লাগল। খোয়াড়ে মোরগ দু'টি পালা করে বাঁক দিচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে হাঁসের চৈ চৈ। সব কিছু ছাপিয়ে দোয়েলের ডাকটা কানে যেতেই মাহমুদ আর শুয়ে থাকতে পারল না। সে বিছানায় উঠে আড়মোড়া ভেঙে ভাবল, না আর শুয়ে থাকা যায় না, এখন ছ'টা বাজছে। দোয়েলটাই মাহমুদের ঘড়ি। প্রতিদিন ভোর ছ'টায় দোয়েলটা বাড়ির নিমগাছের একটা বাড়তি শুকনো ডালে বসে সুন্দর শিস তুলে ডাকে। পাখিটার সময়-জ্ঞানের একটুকুও হেরফের হয় না। মাহমুদ দেখেছে, সে দুয়ার মেলে বাইরে এলেই পাখিটা উড়ে যায়। মনে হয় দুয়ার মেলার শব্দটাকে দোয়েলটা ভয় পায় কিংবা তাদের বিশাল ঘরটার এমন একটা বিশাল দরজা খুলে যাওয়ার ফলে ঘরের ভেতরকার অন্ধকার দেখে দোয়েলটা বুঝি অবাক হয়ে উড়ে যায়।

মাহমুদ বিছানা ছেড়ে ফাঁক হয়ে থাকা দুয়ারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই দরজায় আম্মার হাতের কড়া নাড়া টের পেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখনও ঘুম থেকেই জাগিসনি বুঝি? ওরে তোর না আজ রেজাল্ট ।'

মায়ের ডাক শুনেই মাহমুদ তাড়াতাড়ি দরজার সামনে গিয়ে মাকে কদমবুসি করল, 'আমি তো জেগেই ছিলাম । এক্ষুণি তৈরি হয়ে আসছি । তুমি খোয়াড় খুলে দাও । আর আমাকে বিদেয় করে দিয়ে কোহিনুরকে সাথে করে ও বাড়িতে নিয়ে যাও ।'

মাহমুদ মাথা তুলে দেখল মায়ের পেছনে ও বাড়ির ইসমাইল মামার মেয়ে লতিফার হাতে সকালের নাশতার ট্রে । মাহমুদ এক দৌড়ে বাড়ির গেট পেরিয়ে সামনের পুকুরে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল । পানিতে ছেলের এই সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণটা জাহানারা জানে । ছেলে শীতে পুকুরের কুয়াশা-ওড়া পানিতে ধীরে ধীরে নামতে ভয় পায় । হিমশীতল পানির ভয় । এ জন্যই সহসা ঝাঁপিয়ে পড়া । এতে নাকি শীতটা কম লাগে । পাগল ছেলে!

একটু পরই মাহমুদ ভেজা প্যান্টসহ ঠির ঠির করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে ঢুকল । জাহানারা তাড়াতাড়ি আলনা থেকে তোয়ালে এনে ছেলের মাথা, বুক ও পিঠ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আজ কি পরে ফল আনতে যাবি? ব্লেজার পরবি?'

'না, সাদা পুলওভারটা আর সাদা প্যান্ট-শার্ট, সাদা কেডস পরব । আজ সব দুধের মতো সাদা পরব আম্মা ।'

খুশি ছলকে যাচ্ছে ছেলের কথায় । জাহানারাও আনন্দে আটখানা হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়বে ।

'দেখিস তুই-ই এবার প্রথম হবি, আমার মন বলছে ।'

'তুমি আমার সাথে চল না?'

'আমার সত্যি যাওয়ারই ইচ্ছে ছিল । কতদিন মিশনে যাই না । কিন্তু তোর বাপ এখনও দোকানে যায়নি । তাছাড়া আজ একটু পরে কে জানি আসবে তোর আব্বার কাছে । বললাম তো আমার মন বলছে তুইই প্রথম হবি ।'

চিরুণি দিয়ে সিঁথি ভাগ করে দিল ছেলের, জাহানারা । লতিফার হাত থেকে ট্রে নামিয়ে জলচৌকিতে রাখল, 'নে এবার ভেজা প্যান্টটা বদলে তোয়ালে পরে নে ।'

ছেলের বুকের পাটার দিকে তাকিয়ে জাহানারা দেখল ফরসা ধবধবে বুকের ছাতি বেশ পুরুষালি আয়তন নিয়ে যেন একটু প্রসারিত হয়ে উঠেছে । জাহানারা ছেলের বুকের দিকে মুখের একটু থুথু ছিটিয়ে দিয়ে বলল, 'মাশআল্লাহ । এবার পোশাক পরে নাশতা খেতে আয় ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদা পুলওভার, সাদা প্যান্ট ও সাদা কেডস পরে মাহমুদ মায়ের সামনে এসে বলল, এতো কিছু কিন্তু এখন খেতে পারব না আম্মা । আসলে ভয় লাগছে ।'

'ভয় কিসের? বললাম তো তুইই ফার্স্ট হবি, দেখিস ।'

দ্রুত মায়ের পাশে বসে নাশতা সেরে মাকে কদমবুসি করে বেরিয়ে পড়ল মাহমুদ । আজ হঠাৎ যেন জাহানারা ছেলের গোছগাছ দেখে কেমন চমকে গেছে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ বড় হয়ে যাচ্ছে—এটা সম্ভবত জাহানারার প্রথম নজরে এল। প্যান্ট পরার সময় হঠাৎ জাহানারার নিজের সন্তানের ভারী লম্বা শক্ত পেশির দিকে চোখ পড়ায় সারা মনে মাতৃসুলভ আনন্দানুভূতির বিদ্যুৎ যেন খেলে গেল। এই তো সেদিনও মায়ের আঁচল ধরে থাকত যে লাজুক শিশুটি, কখন সে এমন নিজের নিয়মে পাল্টে গিয়ে দৃষ্টান্তের মতো মজবুত হয়ে উঠেছে।

'ফি আমানিল্লাহ।'

জাহানারা মনে মনে নিজের ছেলের জন্য আল্লাহর দরগাহে দোয়া মাংলো। তার স্নেহদৃষ্টি মাহমুদের যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থেকে শেষে উদাস হয়ে গেল।

ফাদার জোনস ক্লাসে ঢুকতেই ছেলেমেয়েরা উঠে দাঁড়াল। সকলের উৎকণ্ঠার দিকে একবার ঘাড় কাত করে দেখলেন ফাদার। মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। তিনি মঞ্চের ওপর তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন। হাতে পরীক্ষার রেজাল্টের তালিকা ও প্রোগ্রেস রিপোর্টের ফাইল। দৃষ্ট উদাসীন। তার সামনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা। এদের তিনি প্রাইমারি ক্লাস থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত কেবল পাঠ্য বিষয়েই শিক্ষাদান করেননি, আদব-কায়দাও শিখিয়েছেন। স্বাস্থ্য, পোশাক-আশাকের ব্যাপারে সচেতন করে তুলেছেন। তিনি একজন খ্রিস্টান পুরোহিত শ্রেণির লোক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মের ছেলেমেয়েদের ওপর তার ধর্মের প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেননি। তবে যিশু খিস্টের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মাঝে মধ্যে খ্রিস্টানদের কোনো পরবের সময় বক্তৃতা করেছেন। যেমন বড়দিনের অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরই ডেকে কিছু না কিছু উপহার দিয়েছেন। তারাও ফাদারকে শিক্ষক হিসেবে এতদিন পিতার সম্মানই দিয়ে এসেছে। গত ছ'টি বছর এই ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তেমন কোনো অবাধ্যতার পরিচয় দেয়নি।

আজ তাদের এই শ্রেণিকক্ষে বসার কিংবা এ মিশন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে সম্পর্ক রাখার শেষ দিন। কারণ, স্কুলটি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্তই। যারা আজ সপ্তম শ্রেণিতে উঠবে, তারা চলে যাবে শহরের অন্যান্য বড় স্কুলে। যেমন অন্নদা, এডোয়ার্ড, জর্জ ফিফথ অথবা সরোজিনী হাইস্কুলে। ফাদারের সাথে আজই তাদের সম্পর্ক শেষ। সাধারণত ফাদার জোনসের স্কুলে কেউ ফেল করে না। খারাপ বা অমনোযোগি ছাত্র-ছাত্রীদের এমনভাবে বিশেষ যত্ন নেয়া হয় যে তারা কোনো না কোনোভাবে উৎরে যায়। যারা স্কুলের শৃঙ্খলা মানে না কিংবা সংশোধনের অযোগ্য তাদের স্কুলে রাখার নিয়ম নেই। তেমন ছাত্র-ছাত্রীর পিতামাতাকে ডেকে এনে অতিশয় বিনয়ের সাথে ফাদার অন্য কোনো পেশায় লাগিয়ে দিতে অনুরোধ করে তাদের বিদেয় করেন।

আজ উপস্থিত রেজাল্ট প্রার্থি কারোর মধ্যেই ফেল মারার ভয় না থাকলেও প্লেস ও সর্বমোট নম্বর নিয়ে টেনশন আছে। সবাই জানে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে কৃষ্ণা ঘোষই প্রথম হবে। কেবল কৌতুহল মাহমুদ ও মারিয়াকে নিয়ে। এদের মধ্যে কে দ্বিতীয় স্থান দখল করবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণা ও মারিয়া ডান পাশের বেঞ্চে সেজেগুজে বসে আছে। আর পাশের অর্থাৎ বাঁ দিকের সারিতে সাদা পুলওভার পরে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে মাহমুদ সামনের দিকে। এর মধ্যে সে একবারও মারিয়া কিংবা কৃষ্ণার দিকে তাকায়নি। তবে ক্লাসে ঢোকার সময় মারিয়ার মুখোমুখি পড়ে গেলে হাত উঁচু করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই মারি, এখান থেকে কোন স্কুলে যাবে?'

'ঠিক জানি না। ফাদার যেখানে বলেন। তুমি?'

'অন্নদা হাইস্কুল।'

'কৃষ্ণা বলছে সে সরোজিনীতে ভর্তি হবে না। কুমিল্লা চলে যাবে। সেখানে তার কাকা ল'ইয়ার। এতটুকুই আজ সহপাঠীদের সাথে কথাবার্তা। মাহমুদ অন্য পাশে সরে যাচ্ছে দেখে মারিয়া আবার তাকে ডাকল, 'এই শোন।'

মাহমুদ দাঁড়াল।

'তোমাকে পুলওভারে খুব মানিয়েছে, মনে হচ্ছে ফার্স্ট বয়।'

'ঠাট্টা করছ?'

'একদম না। বিশ্বাস না হলে কৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। ওই তো কৃষ্ণা আগেই গিয়ে বেঞ্চের প্রথম জায়গাটা বিড়ালের মতো দখল করে বসে আছে। কেমন টকটকে লাল ফ্রক পরেছে। একবার চেয়ে দেখ না।' হাসল মারিয়া।

মাহমুদ দেখল ফিরে গিয়ে লাইব্রেরি ঘর থেকে ফাদার আরও কিছু কাগজপত্র নিয়ে এ দিকেই আসছেন। সে আর কোনো কথা না বলে সোজা গিয়ে নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে পড়ল। কৃষ্ণার দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়েই সে চোখ নামিয়ে নিল। কৃষ্ণা দেখতে শ্যামলা হলেও এমনিতে খুব সুন্দরি। লাল ফ্রক, চুলে লাল ফিতে এবং পায়ে হিল-উঁচু সাদা জুতোতে তাকে অপরূপ লাগছে। তার চেহারায় সব সময় যেমন একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ লেগে থাকে, আজও তেমনি আছে কি-না তা দেখার সাহস হলো না মাহমুদের। কৃষ্ণা জানে কৃষ্ণাই প্রথম হবে। মাহমুদ পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার কালে থার্ড হয়েছিল। কৃষ্ণাই সব সময় প্রথম হয়। মারিয়া চতুর্থ স্থান ও পঞ্চমের মধ্যে ওঠানামা করে এ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। মারিয়া অবশ্য প্লেস নিয়ে ভাবে না। তার মেধার ধারণাই অন্যরকম। সে ভাবে, ভালো ছাত্র ও মেধাবি মানুষ প্লেস না পেয়েও নাকি হওয়া যায়। সে জোর দেয় নানা অপাঠ্য বিষয়ে জানার ওপর। মারিয়ার বিষয়ে এ স্কুলের সকলেরই ধারণা, মারিয়া তার সাদা চামড়ার দৌলতেই অনেক বড় চাকরি পেয়ে যাবে। তার আবার অত লেখাপড়া করার কি দরকার?

এ সময় ফাদার জোনস মঞ্চের সামনের দিকটায় এগিয়ে এলেন। কতক্ষণ একদৃষ্টে সকলের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন, 'রেজাল্ট তোমাদের খুব ভালো হয়েছে ছেলেমেয়েরা। ফার্স্ট-সেকেন্ড কিংবা প্লেসের জন্য তোমরা অনুতাপ করো না। সামগ্রিকভাবে এ ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাফল্যে আমি খুশি। পরিশ্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে নিচে থেকে একবার একজন ছাত্র ওপরে উঠে আসে আবার কেউ মেধার জোরে তাকেও ডিঙিয়ে আরও ওপরে চলে যেতে পারে। মনে রেখ, কোনো পরীক্ষাই শেষ পরীক্ষা নয়। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির পরও মানুষের জীবনে পরীক্ষা চলতে থাকে। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় প্লেস পাওয়াটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হলো মানুষ হিসেবে এ পৃথিবীতে সাফল্য লাভ করা। আজ রেজাল্ট জানানোর আগে তোমাদের প্রতি আমার শেষ কথা হলো, 'নো রিপেনটেন্স। কোনো অনুতাপ থাকবে না এবং বি কাইন্ড। তোমরা মানুষের প্রতি দয়ালু হবে।'

ফাদার কথাগুলো বলে একটু থামলেন। তার চোখ এখন কৃষ্ণার ওপর। ফাদারকে এভাবে একদৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মাহমুদের হৃদপিণ্ডের ভেতর কি যেন একটা ধক করে উঠল। না, সে বোধহয় এবারও কৃষ্ণাকে হারাতে পারল না। মাহমুদ মাথা নুইয়ে নখ খুটতে লাগল।

ফাদার ডাকলেন, 'শ্রীমতি কৃষ্ণা ঘোষ।'

'ইয়েস ফাদার।' কৃষ্ণা হাসি মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'মিস মারিয়া কুকার?'

'আয়ে'ম হিয়ার ফাদার।'

মারিয়াও যথারীতি উঠে দাঁড়াল। কৃষ্ণার মুখে হাসির ঝলক থাকলেও মারিয়া হতভম্ব। সে কি করে দ্বিতীয় স্থান পাবে? দারুণ কৌতুহলের অস্বস্তিকর তরঙ্গ যেন বয়ে গেল ক্লাসের ভিতর। মাহমুদ আর মাথা তুলতে পারছে না। বুকটা ধুক ধুক করছে। এত ভালো পরীক্ষা দিয়েও সে থার্ড প্লেসেই আটকে থাকল? মাহমুদের কান দু'টি এক্ষুণি তার নাম ধরে ফাদারের আহ্বানের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকল। কিন্তু আশ্চর্য, ফাদার তার নাম ধরে আহ্বানের বদলে কৃষ্ণা ও মারিয়াকে মঞ্চে তার পাশে দাঁড়াতে আহ্বান করলেন।

কৃষ্ণা এক লাফে উঠে গেলেও মারিয়া একবার মাহমুদের অবনত মুখের দিকে না তাকিয়ে পারল না। কেমন যেন এলোমেলোভাবে পা ফেলে সে গিয়ে মঞ্চে দাঁড়াল। মারিয়া আজ একটা মোটা গরম কাপড়ের কালো স্কার্ট এবং পকেটে গোলাপ ফুলের নকশা আঁকা গাঢ় হলুদ রঙের ফ্লানেলের শার্ট পরেছে। তারও ছিল উঁচু জুতো এবং কালো মোজা। ফাদার দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে তাদের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা, এবার এদের দু'জনের রেজাল্ট বলছি। আমাদের কৃষ্ণা এবার সেকেন্ড হয়েছে আর মারিয়া থার্ড। আর এবারের পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব হলো আমাদের আমির মাহমুদের। মাহমুদ এবার সব বিষয়ে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। সেই প্রথম। আমি তার খাতা অন্য দু'জনের সাথে মিলিয়ে এবার নিজেই অবাক হয়েছি। ফার্স্টবয় আমির মাহমুদকে আমার অভিনন্দন। মাহমুদ, মাই চাইল্ড, ওপরে উঠে এসো।'

এই অভাবনীয় আহ্বানে মাহমুদ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো পানিতে ঝাঁপসা। সে এখন স্টেজের ওপর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭

মাহমুদ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে খ্রিস্টান মিশন স্কুলের লেখাপড়া থেকে বেরিয়ে আসার সংবাদে জাহানারা ও তৈমুরের আনন্দের সীমা রইল না। এখন সে অন্নদা স্কুলে ভর্তি হবার বায়না ধরল। যদিও তৈমুর চেয়েছিল ছেলে বাড়ির পাশে জর্জ ফিফথ হাইস্কুলে ভর্তি হলে পরিবারের সকলের চোখের সামনে থাকবে। কিন্তু ছেলের মনে পরিচিত পরিবেশের বাইরে যাওয়ার আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত জাহানারাই বলল, 'অন্নদা স্কুলেই ভর্তি করে দাও। আমাদের পাড়ায় মাহমুদের সমান বয়সের ছেলেরা কে আর ওর মতো স্কুলে যায়? সবাই তো দোকানদারের ছেলে। এ পাড়ার গৃহস্থরা লেখাপড়ার চেয়ে দোকানদারীকেই বড় মনে করে। এ পরিবেশের চেয়ে শহরের সরকারি কর্মচারী আর উকিল মোক্তারের ছেলেদের সাথে ঘোরাফেরা অনেক ভালো।'

জাহানারার ইচ্ছেটা বুঝতে তৈমুরের এক মুহূর্তও বিলম্ব হলো না। তৈমুর স্ত্রীর কথায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে চিন্তা করল।

'তাহলে আগামী মঙ্গলবার ওকে অন্নদা স্কুলেই ভর্তি করে দেব। তোমার ছেলেকে বলো আজ একবার দোকানে গিয়ে ফিরোজ মিয়ার কাছ থেকে কিছু নতুন জামা-কাপড় তার পছন্দ মতো নিয়ে আসতে। হাইস্কুলে ভর্তি হলে এসব লাগবে। আমি গোমস্তাকে বলে রাখব।'

'তুমি পছন্দ করে কয়েকটা শার্ট-প্যান্ট নিয়ে এসো। জান তো তোমার ছেলের আত্মসম্মানবোধটা কেমন টনটনে। বলবে মামুদের দোকান থেকে মাগনা পোশাক আনতে কেন যাব? আমার কি জামা-কাপড় কম নাকি।'

জাহানারা হাসল।

তৈমুরও হাসল, 'তাহলে আমিই নিয়ে আসব। ওকে বলার দরকার নেই। এটুকু আত্মসম্মান থাকাটা আমিও চাই মাহমুদের মা।'

তখন ভোরবেলা। তৈমুর সকালের নাশতা সেরে বেরুবার মুখে। জাহানারা বলল, 'আরেকটা কথা।'

'বল।'

জাহানারা এদিক সেদিক তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল, 'আজ মর্জিনার সাথে দেখা হবে। আমিই আমার সাথে দেখা করার জন্য খবর পাঠিয়েছিলাম। ইসমাইল ভাইয়ের মেয়ে লতিফাকে পাঠিয়ে ওর খোঁজখবর নিতে চেয়েছিলাম। নিজেই নাকি বলেছে আমি জানুবিবির সাথে দেখা করতে ওনাদের পুরান বাড়িতে যাব। লতিফাকে বলেছে রাতে সে ওই বাড়িতে আসবে। আমার সাথে অনেক কথা আছে।'

জাহানারার কথায় তৈমুর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়িয়ে জাহানারার দিকে কতক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল।

'কিছু তো বলবে! তোমার অনুমতি হলে তবে তো যাব। ভয় পাচ্ছি, না জানি হারামজাদি কোন দুঃসংবাদ শোনায়? আমার তো ভয় হচ্ছে তোমার সন্দেহটাই ঠিক। আমি গেলে না আবার খানকি মাগি নিজের পেট দেখিয়ে দেয়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তবুও তোমাকে যেতে হবে। যদি তেমন ঘটনাই ঘটে থাকে তবে লোক জানাজানির আগেই সেটা সামাল দিতে হবে। তোমার ঘাবড়ে গেলে চলবে না জানু। মন শক্ত করে সব শুনবে কিন্তু নিজে কিছু বলবে না।'

'যদি অন্য কিছু বলে? ধরো নিজের দোষ কাটাবার জন্য শওকতের কথা বলে কিংবা মাসের বেতনটা চায়?'

'বেতন চাইবার ওর আর সাহস হবে কোথেকে? তবে তোমার এ কথা ঠিক মর্জি তোমার ভায়ের জোরাজুরির কথা বলতে পারে। বলতে পারে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বড় মিয়া জবরদস্তি করে ওকে ফাঁসিয়েছে।'

'তখন?'

'এ অবস্থায় তোমার কর্তব্য হবে মর্জিকে সান্ত্বনা দেওয়া। ও না চাইলেও ওর বেতনের টাকা দিয়ে দেওয়া। তাছাড়া মেয়েটিকে এখন ঘাটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা অবশ্য বলছি তোমার বড় মা'র এতে হাত আছে। কিন্তু যদি না থাকে? তোমার ভাইই যদি ওর ওপর জুলুম করে থাকে? তোমার ভাইটি যে ফেরেশতা নয় সেটা তো জান। সেক্ষেত্রে মর্জির মুখ বন্ধ করতে যত টাকা লাগে তোমাকে দিতে হবে জানু।'

তৈমুর এমনভাবে ঘটনার সম্ভাব্যতা বুঝিয়ে দিল জাহানারা নিস্তব্ধ। তৈমুর আবার একটু ভাবলেশহীন হাসি হাসল, 'আর যদি দেখা যায় তোমার বড় আম্মাই এর পেছনে আছেন তাহেল অর্থের জোরে হোক কিংবা গায়ের জোরেই হোক মর্জি মেয়েটাকে আমাদের বশ করতে হবে।'

এ কথা বলেই তৈমুর বেরিয়ে গেল।

আজ জাহানারা কোনো কিছুতে মন বসাতে পারল না। রান্না-বান্নার কাজ লতিফার ওপর ফেলে দিয়ে বেলা দশটার দিকে নিজের কামরায় এসে চুপচাপ শুয়ে থাকল। লতিফা এসে ডাকলে বলে দিল, আজ রাধা-বাড়া তুইই কর। আমার মাথা ধরেছে। দুপুরে দোকানে ভাত পাঠাবি। আর মাহমুদ এলে আমাকে ডেকে দিবি।'

'জি আচ্ছা।'

বলে লতিফা চলে গেলে জাহানারা দুয়ার এঁটে খাটে এসে শুয়ে পড়ল। এখন তার একটা চিন্তা, মর্জিনা মেয়েটা না জানি কি সংবাদ নিয়ে আসছে।

কোহিনুরকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে মাহমুদ ভাবল আজ কৃষ্ণাদের বাড়ি যাবে। সেই যে রেজাল্টের দিন মুখ গোমড়া করে কৃষ্ণা স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এরপর কৃষ্ণার সাথে আর দেখা নেই। মারিয়াও কয়েকদিন মর্নিং ওয়াকে বেরোয়নি। মাহমুদ ভাবল, মারিয়াকে সাথে করে সে আজ ঘোষপাড়ায় যাবে। মনে হয় কৃষ্ণার খুব অভিমান হয়েছে। ক্লাস থ্রি থেকেই কৃষ্ণা ছিল ক্লাসের প্রথম মেয়ে। সেকেন্ড প্লেস ছিল কান্দিপাড়ের দিলীপ বলে একটি ছেলের কিন্তু দিলীপ এবার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেনি। তার শরীরে বসন্তের গুটি ওঠায় সে এবার ড্রপ দিতে বাধ্য হয়েছে। যদিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলবসন্ত। ছেলেটি অসুখ নিয়ে পরীক্ষা দিতে রাজি থাকলেও ফাদার জোনস তাকে নিবৃত্ত করেন। ফাদার নিজে তাকে বাড়ি গিয়ে তার সেবা করে আসতেন। দিলীপকে তিনি এমনিতে সপ্তম ক্লাসের জন্য প্রমোশন দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু কোনো প্লেস দেননি। দিলীপদের পরিবার এতে সন্তুষ্ট। অসুবিধা হয়েছে কৃষ্ণাকে নিয়ে। কৃষ্ণা দারুণ অভিমানি মেয়ে। সে কিছুতেই মাহমুদের প্রথম হওয়াটা মানতে পারেনি। মাহমুদ শুনেছে কৃষ্ণা বাড়ি গিয়ে খুব নাকি কেঁদেছে। কৃষ্ণা ঘোষপাড়ার মাতবর বংশী মাস্টারের মেয়ে। এমনিতে সে মেধাবি এবং অহংকারী। মোল্লাবাড়ির একটি ছেলে পরীক্ষায় তাকে পেছনে ফেলে প্রথম হবে এটা যেমন কৃষ্ণার আন্দাজের বাইরে ছিল তেমনি তার পরিবারেরও। বংশী মাস্টার নিজে নাকি ফাদারের কাছে গিয়ে কৃষ্ণা ও মাহমুদের খাতা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে এসেছেন, নাহ মোল্লাবাড়ির তৈমুর মিয়ার ছেলেটিই এবারের ফাইনালে খুব ভালো লিখেছে। এসব কথা মাহমুদের আব্বার কাছে ফাদার নিজেই নাকি বলেছেন। আব্বা-আম্মার কাছে এসব বললে মাহমুদ জানতে পেরে তখুনি ভেবেছে একবার কৃষ্ণার সাথে দেখা করে আসা উচিত। কিন্তু একাকি কৃষ্ণাদের বাড়ি যেতে তার মন চাইল না। ভাবল মারিয়াকে নিয়ে যাবে। এক সময় তো তিনজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনজন একত্র হলে হয়তো কৃষ্ণা মুখ বেজার করে থাকবে না। আবার আগের মতোই হাসি-ঠাট্টায় ভরে যাবে।

সেদিন রোববার হওয়াতে মাহমুদ ভাবল মারিয়াকে হয়ত তার হোস্টেলেই পাওয়া যাবে। মাহমুদ জানে, রোববার গির্জা থেকে সকালে বেরিয়ে সোজা মারিয়া গিয়ে বাইবেল নিয়ে বসে। এমনিতে মেয়েটা অন্যান্য দিন বাগানে কাজ করে কিংবা রোদে আচার শুকায় কিংবা দিদিমণিদের কাছে সেলাই-ফোঁড়াই অথবা লেস বোনার কাজ শেখে। কেবল রোববারটায় খ্রিস্টান পাড়ার লোকদের কোনো কাজ নেই।

মাহমুদকে মিশনের গেট পেরিয়ে গির্জার সামনে আসতে দেখে, মারিয়া হাসতে হাসতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে, 'এই যে ফার্স্ট বয়! আমি তোমার খোঁজে বেরুচ্ছিলাম। প্রোগ্রেস রিপোর্ট হাতে পেয়ে বুঝি আর এদিকটা মাড়াতে ইচ্ছে করে না?'

'তা কেন, আমি তো তোমার খোঁজেই এলাম।'

'সত্যি? আমার খোঁজে এসেছ না ফাদারের আদর খেতে হাউজে যাচ্ছিলে?'

'তোমার সাথে শুধু দেখা করতেই নয় তোমাকে নিতে এসেছি মিস কুকার!'

'কোথায়? তোমার মামু বাড়িতে?'

'না। তোমাকে নিয়ে আজ কৃষ্ণাকে দেখে আসি। বেচারা অভিমান করে আছে।'

'চমৎকার আইডিয়া! চল।' মারিয়া এগিয়ে এসে মাহমুদের হাত ধরল, 'তুমি খুব ভালো, খুব উদার ছেলে। তোমার সাথে কৃষ্ণাদের বাড়ি যেতে আমি হ্যাপি হব।'

মারিয়ার কথা বলার তাড়াতাড়িতে ভুল বাংলা বেরিয়ে আসায় মাহমুদ হাসল, 'হ্যাপি হব না, বলো তোমার সাথে কৃষ্ণাতের বাড়ি যেতে আমার ভালোই লাগবে।'

'হ্যাঁ ভালোই লাগবে। এখুনি চল।'

জোরে হেসে ফেলল মারিয়া। মাহমুদও হাসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণাদের বাড়ির সামনের পুকুরে একটা সোমত্ত মেয়ে ভেজা শরীরে ঘাটলায় উবু হয়ে কি যেন করছিল। মেয়েটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সেদিকে চোখ যেতেই মাহমুদ চোখ নামিয়ে নিল। কিন্তু মারিয়া অবাক, 'এটা কে? ও অমন নেকেড কেন?'

'ও কৃষ্ণার বোন। পাগল। ওদিকে তাকাতে নেই।'

'কেন তাকাতে নেই? কৃষ্ণার বোন এ্যাবনরমাল?'

'হ্যাঁ মিস কুকার। শুনেছি ও জন্ম থেকেই এমন। আল্লাহর ইচ্ছে। ওদের কি করার আছে? সারাদিন ও পুকুরটায় পড়ে থাকে। কাঁচা মাছ, গুগলি, শামুক যা পায় তাই খায়। শীতকালেও গায়ে কাপড় রাখে না। বেঁধেও ঘরে রাখা যায় না। অগত্য ওর কথা এখন ওর পরিবার আর ভাবে না। মানুষ ওর দিকে তাকিয়ে মজা দেখে। চলো আমরা সামনে এগোই। অমন করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলে ওর বাড়ির লোকেরা খারাপ ভাববে।'

মারিয়াকে নিয়ে পুকুরটা দ্রুত পেরিয়ে যেতে চাইল মাহমুদ। কিন্তু মারিয়া নড়ল না। বরং র‍্যাপার টেনে ধরে বলল, 'দাঁড়াও, আমি দেখব। আচ্ছা কৃষ্ণারা ওর চিকিৎসা করায় না?'

'হয়ত ওরা অনেক চেষ্টা করেছে। ফল হয়নি। জন্ম পাগলি কি না!'

মাহমুদ ও মারিয়ার কথাবার্তায় পাগলিটা হঠাৎ মাথা তুলে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে সচকিত হয়ে একটা গোঙানির শব্দ তুলল। মনে হলো বাহিনীর মতো গড় গড় করে উঠেছে। এ সময় মেয়েটার সম্পূর্ণ দেহলতা মারিয়ার নজরে পড়ল, 'ওহ হাউ বিউটিফুল ফিগার।'

মাহমুদ চোখ তুলেই নামিয়ে নিল, 'ওভাবে তাকাতে নেই। দেখছ না ওর গায়ে কিছু নেই?'

'পাগলিটা কিন্তু কৃষ্ণার চেয়েও সুন্দরি! গায়ের রংটা কি মিষ্টি। আর শরীরটা কি নিখুঁত। ও গড!'

মারিয়ার আক্ষেপ ফুরাতেই সামনের বাড়ির গেট খুলে কে যেন বেরিয়ে এসে বলল, 'কে ওখানে?'

দেখা গেল কৃষ্ণা নিজেই বেরিয়ে এসে ঘাটলার ওপরে মাহমুদ ও মারিয়াকে দেখে একেবারে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, 'কি ব্যাপার, তোমরা কোত্থেকে এলে?'

মারিয়া হেসে বলল, 'মাহমুদ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। কৃষ্ণা ওকে হ্যালো বলো!'

কৃষ্ণার অপ্রসন্ন মুখে একটু হাসি ফুটল, 'বারে ভিতরে এসে বসবে তো।'

এ কথায় মারিয়া খুশি হয়ে কৃষ্ণাকে জড়িয়ে ধরল, 'আসলে আমরা তোমাদের বাড়িতে মাঠা খেতে এসেছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘোষদের বিখ্যাত মাঠা। খাওয়াবে না?'

কৃষ্ণা হেসে মাহমুদের দিকে মুখ তুলল, 'এসো মাহমুদ। তুমি এসেছ দেখলে আমার বাবা-মা খুব খুশি হবে। কৃতিত্বের জন্য আমার শুভেচ্ছা। কোথায় ভর্তি হচ্ছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ গেটটা পার হতে হতে বলল, 'অন্নদা স্কুলে। তুমি তো কুমিল্লা চলে যাচ্ছ বলে জানলাম।'

'বাবা তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার মেজকাকা আগরতলার ডাক্তার। তিনি বাবাকে লিখেছেন আমাকে সেখানেই নিয়ে যাবেন।'

জবাব দিল কৃষ্ণা।

সবাই কৃষ্ণাদের বারান্দায় এসে উঠল। কৃষ্ণার মা মাহমুদকে দেখে বারান্দায় বেরিয়ে হাসলেন, 'তুমিই তো মোল্লাবাড়ির জানুর ছেলে? তোমার নামই তো মাহমুদ?'

মাহমুদ বলল, 'জি, আপনি তো কতবার আমাদের বাড়ি গিয়েছেন। আমার নাম ভুলে গেছেন?' বলতে বলতে সে কৃষ্ণার মাকে কদমবুসি করতে উবু হলে তিনি মাহমুদকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বোলালেন, 'বেঁচে থাক বাবা, তোমার নানার মতো বড় মানুষ হও।'

মাসিমা তাদের মোড়া পেতে দিলেন।

মারিয়া বলল, 'আমরা আপনার বাড়ি আজ ঘোল খাব বলে এসেছি।'

মারিয়া এতোক্ষণে আঞ্চলিক 'মাঠা' শব্দটিকে পাল্টে দিয়ে 'ঘোল' বলাতে মাহমুদ হাসল। মারিয়া বলল, 'হাসলে কেন?'

'হাসলাম কোথায়? দেখছি তুমি বাঙালিদের চেয়েও ভালো বাংলা শিখে যাচ্ছ।'

নিজের কৃতিত্বে মারিয়া নিজেই জোরে হেসে উঠল।

মাসিমা বললেন, 'তোমরা বস, আমি দেখছি কার ঘরে এ সময় মাঠা পাওয়া যায়। মাঠা নিয়ে তো পাড়ার লোকেরা খুব ভোর বেলায় বেরিয়ে গেছে। তবুও আমি চেষ্টা করে দেখি, না পাওয়া গেলে দুপুরে একেবারে ভাত খেয়ে যাবে।'

মাসিমা চলে গেলে কৃষ্ণা বলল, 'তোমরা বস আমি চা করে আনছি।'

কৃষ্ণা যেতে উদ্যত হলে মাহমুদ কৃষ্ণার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল, 'কৃষ্ণা।'

কৃষ্ণা অবাক হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বির মুখের ওপর সরাসরি তাকাল।

'আমি এবার ফাস্ট হওয়ার জন্য খুব খেটেছিলাম। তবুও কখনও ভাবতে পারিনি যে তোমার মতো পড়ুয়া মেয়েকে হারাতে পারব। আমার ওপর রাগ করে থেক না। তুমি আগরতলায় গিয়ে খুব ভালো করবে।'

খুব দরদ মিশিয়ে মাহমুদ কথাগুলো বলল।

কৃষ্ণা হেসে বলল, 'আমি একটুও রাগ করিনি। আমি যদি বুঝতাম তুমি আমাকে পেছনে ফেলার জন্য পণ করে খাটছ তাহলে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারতে না। এখন আমার আর কোনো রাগ নেই।'

কৃষ্ণা চা করতে ভেতরে চলে গেলে মারিয়া ফিসফিস করে মাহমুদের কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'যাই বল পুকুর পাড়ে কৃষ্ণার বোনকে দেখে আমার মন খারাপ হয়ে আছে। ওকে ওরা ওভাবে ছেড়ে দিয়েছে কেন, একদম নেংটো? আচ্ছা ওকে কি নামে ডাকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওর আসল নাম কি তা তো জানি না, তবে পাড়ার লোকেরা ওকে পাগলি বলে। কেউ বলে 'শামুক খাওড়ি।' ওর একটা নাম নিশ্চয় আছে। আমি জানি না।'

'ওর কথা আমি ফাদারকে বলব। আমার মনে হয় কি জান, ও চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাবে। কেন যে কৃষ্ণারা ওকে এমনি ছেড়ে দিয়েছে?'

মারিয়ার আক্ষেপ শুনে মাহমুদ সঙ্গিনীর দিকে ফিরে তাকাল। মারিয়া বিদেশিনী হলেও তার হৃদয়টা কত ভালো। মাহমুদের খুব ভালো লাগল মারিয়া কুকারের ফর্সা দরদভরা মুখখানি।

১৮

আজ সন্ধ্যা বাতির সাথে সাথে জাহানারা একটা কালো চাদর জড়িয়ে হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার নিয়ে জর্জ স্কুলের সামনের পুকুরের দক্ষিণ পাড় ধরে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলো। একটু আগে মোল্লাবাড়ির মসজিদে আযান হয়েছে। এর মধ্যেই নামাযিরা মাগরিব পড়ে বেরিয়ে আসছে দেখে জাহানারা দক্ষিণ পাড়ের পশ্চিম পাঠশালার আড়ালে নিজেকে লুকাল। পাড়ার মাতবর আবদুল কাদির মুন্সিকে সবাই ভয় পায়। যদি তার নজরে একবার কোনো মেয়ে একটা পড়ে যায়, তাও আবার মোল্লাবাড়ির কোনো বৌ বা মেয়ে তাহলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। মোল্লাবাড়ির মেয়ের সঙ্গে কাউকে না নিয়ে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাচ্ছে দেখলেই তিনি বাড়ি বয়ে গিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসবেন। এদের খবরদারিতেই এখনও মৌড়াইল গাঁয়ের শালিনতা ও শরাফতি টিকে আছে। জাহানারাও কাদির মুন্সিকে সম্মান করে। খুবই নেক বখত মানুষ। আব্বার মৃত্যুর পর জাহানারাদের ভালোমন্দের খোঁজ-খবর নিতে তিনি মাঝে-মধ্যে তৈমুরের কাছে আসেন। তাকে সাহস দেন। জাহানারা ভাবল মুন্সি চাচা রাস্তাটা পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে স্কুলের পেছনে অপেক্ষা করবে।

এ সময় কোত্থেকে যেন কোহিনুরকে নিয়ে মাহমুদ এসে হাজির হলো, 'আরে আম্মা, তুমি এখানে কি করছ?'

জাহানারা ফিরে মাহমুদকে দেখেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক বাবা তুই আসাতে ভালোই হলো। আমি মাগরিব নামাযের মুসল্লিরা রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। এখন তোর সাথে যাওয়া যাবে। চল বাড়ি যাই।

মাহমুদ মাকে নিয়ে রাস্তায় উঠতেই একেবারে কাদির মুন্সির সামনে পড়ে গেল। মাহমুদ তাড়াতাড়ি সালাম বলতেই ওয়ালেকুম বলে মুন্সি সাহেব দাঁড়ালেন। কে যায়?

'আমি চাচা, আমি জানু।'

'ও বাদশা মিয়ার মেয়ে! বাপের বাড়ি থেকে এলে?'

'জি চাচা।'

'তোমার ভাই সারোয়ারকে সামলাও মা। আমি তৈমুরকেও বলেছি। বাদশা ভাইয়ের একটা ছেলে খারাপ পাড়ায় পড়ে থাকে এটা সহ্য হয় না। দরকার হয় গাঁয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচজন তোমাদের মদদ করবে। এ গাঁয়ের প্রতিটি পরিবার তোমার বাপের কাছে ঋণি। কতভাবে না তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করে গেছেন। তার পরিবারের কোনো নাফরমানি কাজ দেখলে বুকটা ভেঙে যায় মা। আজকাল মুরুব্বিদের ধমক কেউ আর শোনে না। কিন্তু তোমরা তো এ দেশের প্রথম ইসলাম প্রচারকদের বংশ। তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহম হোক, এ দোয়াই করি।'

কাদির মুন্সি কথাগুলো বলে এগিয়ে চলে গেলে জাহানারা মাহমুদের হাত ধরে বড় রাস্তার উপরই কতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কাদির মুন্সির মতো শরিয়তের ব্যাপারে কঠোর মানুষও বাদশা মোল্লার পরিবারের প্রতি কতটা সদয়, কতটা নরম। জাহানারা বুঝল গাঁয়ের মুরুব্বিরাও তার ভাইদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন দেখে ক্রুদ্ধ হওয়ার বদলে বরং সহানুভূতিশীল। সবাই চায় বাদশা মোল্লার পরিবারটি ধ্বংস হয়ে না যাক। অথচ তার নির্বোধ ভাইয়েরা যে যেদিকে ইচ্ছে ধ্বংসের দিকে নেমে যাচ্ছে। জাহানারা নিজের অজান্তেই মাহমুদের হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'চল যাই।'

ঘরে এসে জাহানারা নিজেই নিজের ঘর, আসবাবপত্র, উঠোন ইত্যাদি ঝাড় দিল। খোয়াড়ে হাঁস-মুরগি ঢুকিয়ে তালা দিল। মনে হলো কতদিন পর সে যেন আপন সংসারে এসেছে, যদিও একদিন পর পরই সে বাড়ি এসে সব কিছু তদারক করে যায়।

আজ যেন কাদির মুন্সির কথায় জাহানারার চমক ভেঙেছে। বাদশা মোল্লার ছেলেরা না পারুক, সে তো আছে। সেও তো বাদশা মোল্লারই মেয়ে। যদি বাদশা মোল্লার ছেলেরা এ বংশের প্রাচিন গৌরব ধরে রাখতে না পারে তবে তার মেয়ে কি চেষ্টা করতে পারে না? কেন পারবে না, তারও তো মাহমুদের মতো ছেলে আছে। মাহমুদ একদিন বিদ্বান হবে এ ব্যাপারে জাহানারার কোনো সন্দেহ নেই। এ বছরই ছেলে মিশন স্কুল থেকে সকল প্রতিদ্বন্দ্বিকে ডিঙিয়ে প্রথম হয়ে বেরিয়ে এসেছে। উপযুক্ত শাসন ও সাহায্য পেলে মাহমুদ যে হাইস্কুলেও সবাইকে ডিঙিয়ে যাবে তা জাহানারা ও তৈমুরের ভালো করেই জানা। হয়তো এ জন্যই নিজের বাস্তুভিটের ওপর জাহানারার যেন অসম্ভব মায়া পড়ে গেছে।

জাহানারাও আজ দোয়েল পাখিটার ডাক কানভরে শুনল। টুনটুনিটার অবশ্য কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। কোহিনুরকে যথাস্থানে বেঁধে মাহমুদ বড় ঘরে বই নিয়ে বসেছে।

এশার নামায পড়িয়ে তালেবেএলেম ছেলেটা খাওয়া শেষ করে মসজিদ থেকে ফিরবে। ঘর-দোয়ারের কাজ শেষ করে জাহানারা এসে ছেলের পাশে বসল।

'তুমি বুঝি আজ এখানেই থাকবে?'

মাকে জিজ্ঞেস করল মাহমুদ।

'নারে, এখানে আজ থাকতে আসিনি। এসেছি অন্য একটা দরকারে। তুই আর তোর তালেবেএলেম দোস্ত আজ রাত ন'টা পর্যন্ত মসজিদের পাশে আমাদের বারবাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে গিয়ে পড়া করে কাটাবি। গাঁয়ের একটি মেয়ে আজ গোপনে এখানে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। বিষয়টা কেউ যেন জানতে না পারে সে জন্য তোকে আগেই বলে সতর্ক করে রাখলাম। মেয়েটি চলে গেলে আমি তোদের এখানে ডেকে এনে ও বাড়ি যাব।'

'কে আসবে আম্মা।'

'মর্জি। ও বাড়ির কাজের মেয়ে মর্জিনাকে চিনিস তো! ওই আমার কাছে ওর কিছু দুঃখের কথা বলতে আসবে। বিষয়টা আমাদের গোপন রাখা দরকার। তুই হারিকেনটা নিয়ে এখুনি বারবাড়ির ঘরে চলে যা। তোর দোস্তকে বলবি, আমার আম্মা জরুরি কাজে রাত ৯টা পর্যন্ত এখানে থাকবে। খাওয়ার সময় তুই এসে টিফিনে রাখা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়বি বুঝিলি?'

'ঠিক আছে।'

মাহমুদ হারিকেন ও বইখাতা নিয়ে চলে গেল। পাঠ্যবই নয়। পাঠ্যবই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর কেনা হবে। একটা গল্পের বই। মাহমুদ এই ফাঁকে কয়েকদিন গল্পের বই পড়ে কাটাবার একটা সুযোগ পেয়েছে।

মাহমুদ চলে গেলে জাহানারা ছেলের পড়ার টেবিলটা গুছিয়ে দিয়ে একটা মোড়া এনে বারান্দায় বসল। ঝিঁঝি পোকার রবে বাড়িটা যেন ঝিম ধরে আছে। পেয়ারা গাছে একটা বাদুড় এসে বসাতে ডালপালা দুলছে। বেগুন খেতে ঝাঁক বেঁধে আলোর ফুলকি ছড়িয়ে দিচ্ছে জোনাকি। জাহানারা অপেক্ষা করছে কখন মর্জির মুখটা উঠোন পেরিয়ে এসে বারান্দায় তার মুখোমুখি হবে। কি বলতে চায় মর্জিনা? সে কি সত্যি এ কথাই বলতে আসছে, তার পেটে বড় মিয়ার ফরজন্দ আছে? একথা বললে জাহানারা কি করবে কিছুই স্থির করতে পারছে না। তৈমুরের সব সতর্ক উপদেশগুলো এখন তার মনের ভেতর যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। জাহানারা ভাবল এমন দুঃসংবাদ শুনলে সে প্রথমেই বান্দির বাচ্চা মর্জির দু'গালে ঠাস করে আগে কয়েকটি চড় লাগাবে। তারপর দেখা যাবে কি হয়। তার ভাইয়ের না হয় অনেক দোষ। কিন্তু তুই কোথাকার সতী?

হঠাৎ জাহানারার ভাবনায় ছেদ পড়ল। একটা ছায়ামূর্তি সারা শরীর কালো কাপড়ের বোরখায় ঢেকে উঠোন পার হয়ে আসছে। জাহানারা মোড়া থেকে উঠল না। আগন্তুক উঠোন পার হয়ে সোজা এসে বারান্দায় জাহানারার মোড়ার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

'আমি মর্জি, বড় বুবু।'

'জানি। আমার সাথে তোর কি কথা?'

সরাসরি প্রশ্ন করে ফেলল জাহানারা।

মর্জি সহসা কোনো জবাব দিতে পারল না।

'সারাজীবন আমাদের বাড়ির ভাত খেয়ে, আমার দেওয়া কাপড় পরে, আমার বাপ-মার সেবা করে তুই, তোর চৌদ্দগোষ্ঠি মানুষ হয়েছিস। বল আজ আমাদের কোন সর্বনাশ করতে তুই আমাকেই ডেকেছিস, বল আমি আজ শুনতেই এসেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারার গলা থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এল কর্তৃত্বের স্বর। এভাবে জাহানারা একটা চাকরানিকে ধমকে উঠতে পারে এটা এখন তৈমুর শুনলেও বিশ্বাস করত কিনা সন্দেহ। যদিও এ দেশের সবচেয়ে প্রতাপশালী মানুষের কন্যা সে। তবুও বাল্যের শিক্ষা যা সে ফাদার জোনসের স্কুলে পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষার গুণেই জাহানারা ছিল মোল্লাবাড়িতে সবচেয়ে নমনীয় এবং কমনীয় যুবতি। আজ যেন সকল সংস্কার ও শিক্ষার বাঁধ ভেঙে গেছে।

'আমার সৎমা'র খেদমতের জন্য আমি সারা বছর তোকে বেতন গুণি। ইসমাইল ভাইয়ের কাছে শুনলাম তুই আমারই ভাইয়ের সর্বনাশ করে সমাজে আমাদের হেয় করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিস। এখন বল তোর কি কথা আছে?'

এ কথায় ছায়ামূর্তির আবৃত শরীর থেকে বোরখার আবরণ সরে গেল। মর্জি সোজাসুজি উবুড় হয়ে জাহানারার দু'পা জড়িয়ে ধরে তার হাঁটুতে মুখ ঘষতে ঘষতে বিলাপ জুড়ে দিয়ে বলল, 'আমার কোনো কথা নেই বড় বুজান। আমার দোষ আমি স্বীকার করবার জন্যই আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি। আপনার ভাইয়েরও কোনো দোষ নেই, আমিই বড় মিয়াকে নাপাক করেছি। আমি আপনার পা ছুঁয়ে তওবা করতে এখানে এসেছি। আমি কিছু চাই না, আপনি আর বড় দুলাভাই আমাকে মাফ করে দিন। আমি আর এ গাঁয়ে থাকব না। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।'

গোঙিয়ে গোঙিয়ে এ কথাগুলো বলে মর্জিনা জাহানারার হাঁটুর ওপর মাথা চেপে বসে থাকল।

জাহানারা চুপ থেকে মর্জির এই অনুতাপ গ্রহণ করতে গিয়ে তার রাগও পড়ে গেল। এখন সহসা মনে পড়ল তৈমুরের উপদেশগুলো।

'মাথা তোল।'

জাহানারার গলা নরম হয়ে এল।

'আপনি মাফ না করলে আমি বিষ খাব বড় বুজান।'

'আমরা তোকে মাফ করে দিতে পারি মর্জি, যদি তুই তোর এই ঘটনার পেছনে কে আছে তা বলিস।'

জাহানারা এবার সরাসরি ভিতরের কথাটা জানতে চাইছে।

'ও কথা জিজ্ঞেস করবেন না বুজান ও কথা আমি ভাঙতে পারব না। তাহলে সারাগায়ে লাঠালাঠি শুরু হবে। আমার পাপ আমিই তো কবুল করলাম। এখন আমাকে আপনাদের যা খুশি শাস্তি দিন। আমার চুলকেটে দশজনের সামনে মুখে চুনকালি মাখিয়ে গাঁ থেকে বের করে দিন। আমি গোনাগার, আমি জাহান্নামি...।

মর্জি আবার বিলাপ জুড়ে দিল।

'থাম মর্জি, আগে বল তোর পাপের ফল তোর পেটে আছে কি না। খোলাখুলি বলে দে। আমি জানতে চাই আমাদের কতটা সর্বনাশ সইতে হবে?'

এ প্রশ্নে হঠাৎ যেন মর্জি থমকে গেল। এবার সে আকাশের দিকে কি ভেবে যেন একবার তাকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশে চাঁদ উঠেছে। আজ পূর্ণিমা। কোথাও কোনো মেঘের কুণ্ডলি আকাশে দেখা যাচ্ছে না। জ্যোস্নার মধ্যে চামচিকেরা ঝাঁক বেঁধে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।'

'আমিও এই ভয়ই পেয়েছিলাম বুজান। আল্লাহ এই পাপির ওপর রহম করেছে। আজই আমার হায়েজ শুরু হয়েছে। এই ভয়েই আপনার সাথে দেখা করে বিপদের কথা আপনাকে জানিয়ে বিষ খাব ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ দুপুর থেকে নামতে শুরু করেছে... ।'

'আলহামদুল্লিাহ, হে পরোয়ারদিগার তুমি আমার মরা বাপের মুখ বাঁচিয়েছ।'

জাহানারা তার কোমর থেকে একটা ছোট্ট খুতি বের করে খুলল, নে তোর বেতন। কাল থেকে বড় বিবি নয়, আমার এ বাড়িতে আমার বাড়িঘর আর ছেলেকে দেখাশোনা করবি।'

মর্জি এ কথায় কাঁপা কান্নার আওয়াজ তুলে জাহানারার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

১৯

মর্জিকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে জাহানারা তাকে নিজের বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে এল। পরের দিন ভোরে এসে মর্জি এ বাড়ির ঝাড়পোছ করবে, হাঁস-মুরগিকে খুদকুড়ো দেবে এবং কোহিনুরেরও চরানোর ভার নেবে। এ বাড়িতেই থাকবে, নিজের জন্য রাঁধবে এবং জাহানারার অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবে না। আব্রু মেনে চলবে বলেও মর্জিনা জাহানারাকে প্রতিশ্রুতি দিল। কেবল একটা ব্যাপারেই মর্জির ভয় এখনও যায়নি। যদি ও বাড়ির বড়বিবি তার বাঁধা কাজের মেয়ে মর্জিকে এ বাড়িতে কাজ করতে দিতে আপত্তি জানায়? মর্জি তার ভয়ের কথা জাহানারাকে জানিয়েছে।

'আমি তো বুজান আপনার দয়ায় এ বাড়িতে সুখেই থাকব। কিন্তু আপনার বড় আম্মা যদি এ নিয়ে আপনার সাথে কথা বাড়ায়?'

'বাড়াবে না। তুই না ভাঙলেও আমি জানি, তুই বড় আম্মার কথাতেই আমার ভাইকে ফাঁসাতে চেয়েছিলি। তিনি যখন জানবেন তুই আমার এ বাড়িতে আছিস আর আমিই তোকে এখানে এনে কাজে বহাল করেছি, তখন বুঝতে বাকি থাকবে না আমরা, আমি আর মাহমুদের আব্বা তার ষড়যন্ত্রটা জেনে গেছি। তখন একদম চুপ মেরে যাবেন। তোকে ডেকে জিজ্ঞেস করারও সাহস তার হবে না।' হাসল জাহানারা, 'তবে খালি বাড়ি পেয়ে তার ভাইদের দিয়ে তোর ক্ষতির চেষ্টা করতে পারে। সজাগ থাকিস।'

এ কথায় মর্জিনা চমকে গেল, 'কি ক্ষতি করতে পারে বুজান?'

'যে ক্ষতি তোকে দিয়ে আমার বোকা ভাইটার ওপর চাপাতে চেয়েছিল? তার নামে দুর্নাম রটাতে পারে। আর...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার ওপর হামলা করবে না তো আবার?'

'করতেও পারে। তোকে সাবধান হয়ে চলাফেরা করতে হবে।'

'আমি অন্দরের বাইরে পা দেব না বুজান?'

'তাহলে তো আরও ভালো। বাইরে বেরুলেও পর্দা করে বেরুবি। তবে মনে হয় যা ঘটে গেছে তা যখন আমরা জেনে গেছি তখন বড় আম্মার ভাইয়েরা আর আগে বাড়বে না। মাহমুদের আব্বাকে আমার সৎ মামুরা একটু ভয় পায়। গাঁয়ের লোকেরাও এসব জানলে ছি ছি করবে। তাছাড়া বড়বিবির ভাইয়েরা জানে, এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে আমিও সহজে ছেড়ে দেব না। বড়বিবিকে আমার বাপের ভিটেয় থাকতে হলে আমার হাতের মুঠোয় থাকতে হবে। তারা তোর ক্ষতি করলে আমিও যে তাদের বোনের ক্ষতি করতে পারি সেটা কি তারা হিসাব না করে পারবে? যা, এখন গিয়ে তোর বিছানাপত্র আর লোয়াজিমা নিয়ে ফিরে আয়। আমি ও বাড়ি থেকে তোর আর মাহমুদের রাতের খাবার পাঠিয়ে দেব।'

এ কথা বলে জাহানারা এ বাড়ির গেটের চাবি নিঃসংকোচে মর্জিনার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

যে দিন থেকে মাহমুদের প্রথম হাইস্কুলে যাবার কথা সেদিন খুব ভোরে তৈমুর ও জাহানারা এসে দেখে মাহমুদ আগেই গোসল সেরে পোশাক পরে তৈরি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টেরি কাটছে। পাশে বসে মিশনের মারিয়া কুকার বন্ধুকে এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। মর্জিনাও মাহমুদের জন্য নাশতা তৈরিতে ব্যস্ত। মর্জিনা আসার পর মাহমুদ নিজেদের বাড়িতেই নাশতা খায়। রাতের খাবারও। কেবল দুপুরে মামুদের বাড়িতে মায়ের হাতে একবেলা খেতে যায়। তাও তার অনিচ্ছায়। না গেলে মা আর সারোয়ার মামু রাগ করেন বলে।

তৈমুর ও জাহানারা খাটের ওপর বসল। দু'জনের মুখেই চাপা আনন্দ।

তৈমুর বলল, 'তোর ভর্তির সবকিছু আমি মিটিয়ে এসেছি। আজ থেকে যখন ক্লাসে যাচ্ছিস তখন ঘর থেকে বেরুবার সময় তোর মাকে কদমবুসি করে আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে বেরুবি। ক্লাসে বসে বলবি রাব্বি যিদনি এলমা। মাস্টার সাহেবদের আদবের সাথে সালাম জানাবি।'

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই মাহমুদ জবাব দিল, 'জি আব্বা।'

তারপর উঁচু হয়ে বাপ-মাকে কদমবুসি করল।

তৈমুর ছেলের মাথায় হাত রেখে বলল, 'থাক। তোর স্কুল তো ন'টা থেকে শুরু। অত আগে রওনা হবি?'

'নাশতা খেয়ে মারিয়াকে নিয়ে ফাদারকে সালাম জানাতে যাব।'

'খুব ভালো। ফাদারকে বলবি তোর মঙ্গলের জন্য যেন একটু দোয়া করেন।'

'বলব আব্বা।'

'আমি তাহলে দোকানে যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈমুর উঠে দাঁড়াল।

তৈমুর বেরিয়ে গেলে জাহানারা ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তোর আব্বা আজ খুব খুশি। সারারাত কেবল তোর কথাই বলেছে। সাত সকালে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'চল ও বাড়ি গিয়ে ছেলেটাকে জাগিয়ে দিয়ে আসি। আজ থেকে হাইস্কুলে যাচ্ছে, দোকানে যাওয়ার আগে একটু দেখে আসি। তোর আব্বার খুশিটা আমি ধরতে পারি তো!'

মাহমুদ কিছু না বলে মুচকি হাসল।

'মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করিস বাবা। তোর আব্বা তোকে অনেক বড় বিদ্বান বানাতে চায়। তোর বাপ নিজে তো এককালে খুব ভালো পড়ুয়া ছিল। কিন্তু আমার আব্বার জন্য লেখাপড়া করতে পারল না। তোর নানা তাকে তার কারবারে ঢুকিয়ে দিলেন। এখন তোকে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে তোর বাপ সেই সাধ পূর্ণ করতে চায়।'

মায়ের কথায় মাহমুদ মাথা নুইয়ে থাকল।

মারিয়া এতক্ষণ চুপ করে এ পরিবারের মুরুব্বিদের কথাবার্তা শুনছিল। এ দেশের একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের গার্জিয়ানদের মনে যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এ ধরনের স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে তা মারিয়া ভাবেনি। সচরাচর দেখেওনি। মারিয়ার খুব ভালো লাগল।

'মাহমুদ একদিন বিলেত যাবে আন্টি দেখবেন, আমি বললাম।'

হাসল মারিয়া। সে জাহানারাকে সাধারণত খালা বলে ডাকে। এখন হঠাৎ আন্টি বলাতে জাহানারাও হাসল।

মাহমুদ বলল, 'ইস, ইনি সব জানেন।'

'আমি সব জানিই তো। দেখ আমার প্রিডিকশন একদিন ঠিক ঠিক ফলে যাবে। চান্স পেলে বিলেতে যাবে না তুমি?'

'যাব না আমি বলেছি নাকি? চান্স পেলে তো তোমাদের নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত যেতে রাজি। পড়তে পড়তে যতদূর যাওয়া যায় সব জায়গায় যাব।'

হেসে উঠল মাহমুদ।

ছেলের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের ঝিলিকে জাহানারার মুখেও খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

ততোক্ষণে মর্জিনা নাশতার দু'টি প্লেট এনে মাহমুদ ও মারিয়ার সামনে রাখল। প্লেট জুড়ে বড় আকারের দু'টি কাতলা মাছের শুকনো ভাজি। এর পাশে ডিমের ওমলেট আর সামান্য গরম ভাত।

নাশতার বৈচিত্র্য দেখেই মারিয়া হেসে ফেলল, 'মর্জি তো খুব ভালো মেয়ে!'

মর্জি এ কথায় শরম সামলাতে অযথা মাথায় কাপড় টেনে জাহানারার দিকে ফিরল, 'বুজান আপনাকে নাশতা কি দেব?'

'আমি এত সকালে ভাত খেতে পারি নারে মর্জি। আমাকে শুধু এককাপ চা দে। সকালে ও বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। এখন বলতো এতবড় কাতলা মাছ কোথায় পেলি? এ তো আমাদের এ বাড়ির পুকুরের মাছ বলে মনে হচ্ছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ বুজান, একটু আগে জেলে পাড়ার লোকেরা পুকুরে জাল ফেলেছিল। এ আপনাদের ভাগের মাছ। আরও অনেকগুলো ডোলায় রেখেছি। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন।'

মর্জিনার কথা শেষ হতেই মারিয়া মাছ ভেঙে খেতে শুরু করেছে।

জাহানারা হেসে বলল, 'সাবধানে খাও গো সাদা মেয়ে। ও মাছে খুব কাঁটা আছে। তবে এর চেয়ে স্বাদের মাছ আর হয় না।'

এ কথা বলে জাহানারা নিজেই মাহমুদের প্লেট থেকে মাছ তুলে নিজেই কাঁটা বেছে ছেলের মুখের কাছে তুলে বললেন, 'নে খা।'

নাশতা শেষ হলে জাহানারা উঠল।

'তাহলে আমি যাই। তুই ফাদারকে সালাম জানিয়ে স্কুলে চলে যাস। আর তোর আব্বার কথামতো সবাইকে সালাম জানাবি আর সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবি। সাবধান, সহপাঠিদের সাথে ঝগড়া-মারামারি করবি না।'

মাহমুদ আবার মাকে কদমবুসি করল।

রাস্তায় বেরিয়েই মাহমুদ বলল, 'তোমার ভর্তির কি হলো মিস কুকার? বলেছিলে সরোজিনিতে ভর্তি হবে?' ফাদার এখনও তোমার ভর্তির বিষয়টি শেষ করছেন না কেন?'

'ঠিক জানি না। ফাদার কি যেন ভাবছেন।'

বিষণ্নভাবে গা ছাড়া জবাব দিল মারিয়া। মাহমুদ জানে এ এতিম মেয়েটির ভর্তি ও লেখাপড়ার ব্যাপারটা মিশনের দয়ার ওপর নির্ভর করছে। ফাদার যদিও মারিকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসেন তবুও ওদের মিশন কম্যুনিটিতে কি যেন কি একটা আছে। এখনও মারির ভর্তির বিষয়ের ফয়সালা হয়নি। এদিকে মিশনের খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের মধ্যে মারিয়া কুকারের রেজাল্টই সবচেয়ে ভালো।

মাহমুদ বলল, 'কৃষ্ণা সম্ভবত কুমিল্লার ফয়জুননেসায় ক্লাস শুরু করে দিয়েছে।'

'দিক। প্রভু যিশুর আমার জন্য যেমন ইচ্ছে তেমনি হবে। আমি এ নিয়ে খুব ভাবব না। জানো তো আমার আপনজন কেউ নেই। তোমার মায়ের মতো মাথায় চুমো খেয়ে আমাকে কেউ স্কুলে বিদেয় করবে না। তোমার আব্বুর মতো নিজে গিয়ে ভর্তিও করে দিয়ে আসবে না। প্রভু যিশুই আমার সব। একদিন আমি যিশুরই হয়ে যাব।'

কথাগুলো মারিয়া এমনভাবে বলল যে মাহমুদের খুব খারাপ লাগল। যিশুরই হয়ে যাব কথার ইঙ্গিতটা মাহমুদ ধরতে পারল না। মাহমুদ ভাবল মারিয়া বোধহয় হতাশা থেকে মৃত্যুর কথা বলছে। সে চমকে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'যিশুরই হয়ে যাবে মানে?'

মারিয়া মাহমুদের চমকে যাওয়া দেখে জোরে হেসে উঠল, 'কি বোকা ছেলে তুমি, এ কথারও মানে জান না?'

'জানব না কেন, যিশুরই হয়ে যেতে চাওয়া তো মরে যাওয়ার কথাই বোঝায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দূর বোকা, আমি প্রভুর হব বললে বোঝায় আমি নান হব। প্রভুর সেবিকা হব, বুঝলে?'

'কিন্তু সেটা কি করে হবে, তুমি তো ক্যথলিক নও। তোমাদের সম্প্রদায় তো আলাদা। তোমরা তো প্রটেস্টান্ট মিশনের? তোমাদের চার্চ তো ভিন্ন?'

'প্রভুর প্রেমিকা হতে চাইলে কোনো সম্প্রদায় লাগে না, বুঝলে?

মারিয়ার এ কথায় মাহমুদ থতমত খেয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। এসব ধর্মীয় জটিলতার কথা মাহমুদ তেমন না বুঝলেও সেও একটি প্রাচিন মুসলিম মোল্লা পরিবারেরই সন্তান। নিতান্ত ছেলে মানুষ হলেও সে একটি খ্রিস্টান পাড়ারই প্রতিবেশি এবং মিশন স্কুলের ছাত্র। তার আম্মা এবং খালাম্মারাও এই স্কুলে লেখাপড়া করে গেছেন। খ্রিস্টানদের মধ্যে যে অনেক সম্প্রদায় আছে তা মাহমুদের অল্পবিস্তর জানারই কথা। তার ধারণা, একমাত্র ক্যাথলিকদের মধ্যেই সন্ন্যাসিনী বা নান হওয়ার প্রথা আছে। অথচ মারি তো ক্যাথলিক নয়।

মাহমুদ হঠাৎ পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে মারিয়া হেসে বলল, 'অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি এখানে প্রটেস্টান্ট মিশনের অরফেন হলেও আমার বাপ-মা ক্যাথলিক ছিলেন। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রটেস্টান্ট চার্চের আওতায় বাপ্টাইজ হইনি। আমি একজন ক্যাথলিক মেয়ে। যিশুর দাসি হতে আমার কোনো বাধা নেই। ফাদার এ জন্য আমাকে কিছু বলবেন না। তবে তো তিনি আগেই তার সম্প্রদায়ে দীক্ষা দিতেন। বোঝ না এ কারণেই এখানে কেউ আমার ভালোমন্দের ব্যাপারে বেশি গা করে না। সকলেই ভাবে আমি তাদের সম্প্রদায়ের নই। একদিন আমি এ মিশন ছেড়ে চলে যাব।'

এবার যেন মাহমুদের কাছে মারিয়ার প্রতি এই মিশনবাসীদের অবহেলা ও উদাসিনতার কারণগুলো ঈষৎ স্পষ্ট হলো। মারিয়া তাহলে ফাদার জোনসের আশ্রিতা হলেও এ মিশনের খ্রিস্টানদের কেউ নয়?

মাহমুদ হঠাৎ কি ভেবে যেন বলে ফেলল, 'না মিস কুকার, তুমি প্রভুর প্রেমিকা হয়ো না।'

এ কথায় মারিয়া বুকপিঠ দুলিয়ে চাপা হাসির ফোয়ারা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যিশুর প্রেমিকা হব না তো কার প্রেমিকা হব, তোমার?'

এ প্রশ্নে মাহমুদ লজ্জিত হয়ে মাথা নুইয়ে ফেলল, 'আমি ও কথা বলেছি বুঝি? আমি বলতে চাইছি... ।'

'থাক আর চাইতে হবে না, এখন চল তাড়াতাড়ি ফাদারের আশির্বাদ নিইগে। তোমার স্কুলের সময় হয়ে এল।'

মাহমুদকে একরকম টেনেই মারিয়া গির্জা বাড়ির দিকে নিয়ে চলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে আমি একটা টিনের সুটকেস নিয়ে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে এসে নামলাম। সম্ভবত সেটা ছিল শীতকাল। সন্দেহ নেই আমি কবি হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ প্রাচীন মোগলাই শহরে পা রেখেছিলাম।

চারদিকে ঘোড়ার গাড়ির ডাকাডাকি হই-হুল্লোড়ের মধ্যে আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভেবে নিলাম আমার গন্তব্যের কথা। আমি যাব ২৮১ নবাবপুর, একেবারে ধোলাইখালের পাশে যেখানে নবাবপুর গিয়ে একটি পুলের মাথায় শেষ হয়েছে এর পাশের একটি হোটেলে। পুলটা পেরোলেই জনসন রোডের শুরু। ডানদিকে কোর্ট হাউস স্ট্রিট, বাঁদিকে মুকুল সিনেমা, খ্রিস্টানদের গির্জা এবং একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্ক। যে পার্কে সিপাহি বিদ্রোহের সময় কয়েকজন বিদ্রোহী সিপাহিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

আমি একজন পথচারীকে নবাবপুর রোডটা কোথায়, কোন দিকে গেলে নবাবপুরে পৌছতে পারব জিজ্ঞেস করলাম। এর আগেও আমি দু'একবার ঢাকায় এসেছিলাম। এসেছিলাম আমার খালার বাসায় উঠতে গিয়ে। নবাবপুর রোডের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম। আমার এক খালা ১২ নম্বর ইসলামপুর রোডে থাকতেন। তার স্বামী ছিলেন একজন শিক্ষক। এ কারণে আমি নবাবপুর রোডটা চিনি না এমন তো নয়। কিন্তু ফুলবাড়িয়া স্টেশন পেরিয়ে কিভাবে নবাবপুর রোডে পৌছব সেটাও আমি ভালো করে জানতাম না।

পথচারী আমাকে বলল, ওই তো সামনে নবাবপুর রোডের মাথা। ডানদিকে গেলেই নবাবপুর চলে যান। আমি সুটকেসটি হাতে তুলে হাঁটতে শুরু করলাম। সুটকেসটি আমার হালকাই ছিল। কিছু কবিতার জীর্ণ খাতা, একটি বই আর কিছু কাপড়। সে সময় আমি সবে হাফপ্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরতে শুরু করেছি। আমার পরনে ছিল কুমিল্লার খদ্দরের মোটা হলুদ পাঞ্জাবি। পায়ে রাবারের স্যান্ডেল।

আমার কাছে মূল্যবান কোনো কিছুই ছিল না। অল্প কিছু টাকা ছিল। যা কষ্টে সংগ্রহ করে আমি বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিলাম। তবে একটি দামি জিনিস আমার সাথে ছিল। সেটা হলো 'কলম'। লাইফ টাইম। আকারে ছিল ছোট। আংটাটি ছিল বিচিত্র এবং ছোট। ওই একটি জিনিস সম্বল করে যা আমার শরীরের মধ্যে ঝোলানো কাপড়-চোপড়, সুটকেস, জামা ও জুতো সব কিছুর মধ্যে অধিক মূল্যবান।

একটু হেঁটে গিয়ে আমি নবাবপুরে পড়লাম। এর চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা ঢাকায় আর ছিল না। একটু এগোতেই দেখি ভিস্তিওয়ালারা তাদের চামড়ার মশক বহন করে রাস্তা ধুয়ে দিচ্ছে। তাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়ি। গাড়োয়ানরা খোশ মেজাজে ঘোড়ার সাথে কথা বলতে বলতে ঘণ্টি বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। রাস্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বেরিয়েছে সালোয়ার-কামিজ পরা অনেক মেয়ে। কারো হাতে চায়ের কাপ, কারো হাতে সিগারেটের প্যাকেট বা পানের মোড়ক নিয়ে তারা আশপাশের বাড়িগুলোতে ঢুকছে। সারাটা রাস্তায় একটা অতিশয় প্রভাত বেলার গন্ধ ছড়ানো। গন্ধটা বিরিয়ানি, মুরগি পোলাও, তেহারি ও নেহারির সাথে ঘোড়ার গায়ের গন্ধ এবং গরুর সদ্য রাঁধা গোশতের ঘ্রাণে সংমিশ্রিত। সবটাই যে নবাবপুরের গন্ধ এটা কিন্তু ঠিক নয়। নবাবপুর থেকে বেরিয়ে যাওয়া ঠাটারিবাজার এবং আরও কয়েকটি রাস্তার আশপাশের নাশতার রন্ধনশালার উপচেপড়া গন্ধ নাকে টের পাচ্ছিলাম। এই গন্ধ আমি যেখানে যাব সেই রথখোলা পর্যন্ত প্রসারিত। তারপরই বাতাস অন্যরকম। কারণ ধোলাইখাল পর্যন্ত নবাবপুরের যে আমেজ তা পুলটা পেরোলেই আর থাকছে না। আমি রথখোলার মোড়ে গিয়ে সুটকেসটা একবার নিচে নামিয়ে একটা সিগারেট ধরাবার চিন্তা করলাম। এখানে অকপটে স্বীকার নিচ্ছি যে, আমি খুব অল্প বয়সেই ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। যে অভ্যাস সত্তরে এসেও ছাড়তে পারিনি। কিংবা ছাড়িনি। ছাড়িনি এ কারণে যে, আমার বুকে কোনো কফ-কাশি, হাঁপানির মতো দুরারোগ্য ব্যাধি আমাকে কখনও অবশ করেনি। আর এখন তো জীবনের শেষ মাথায় এসে যখন আমার প্রভু আল্লাহর নামে সপ্তাহের একদিন বৃহস্পতিবার জিকির শুরু করি তখন এ বিশ্বাস কেমনভাবে যেন হয়েছে যে আমার বুকটা আর গোলযোগপূর্ণ বোধ হবে না। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু সংস্কার থাকে। অদৃশ্যের ওপর যুক্তিহীন ভরসা থাকে। আমারও আছে। কত দেখলাম, কত পড়লাম, কত কিছু ঘাটলাম আর বেছে নিলাম নিজের দুর্ভোগ। কিন্তু প্রায় অন্তিমে এসে এখন এমন বহু বিষয়ে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি যা দেখা যায় না। হাত বাড়ালে ধরা যায় না। কিন্তু আমার কাছে চিন্তিতভাবে তা বিদ্যমান।

কেউ যদি বলে আমি কুসংস্কারে বিশ্বাসী, বলতে পারে। আমি আমার অভিজ্ঞতার অন্ধকার অঞ্চল পার হতে হতে আলোর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি। এই আলোর ঝলকানিতে এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আলোর ভেতরে আলো দেখতে পাচ্ছি। এ অবস্থাটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমার কবিত্ব শক্তি আমার প্রভু যেটুকু অনুমোদন করেছেন তা দুঃসাহসীর মতোন বলে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই রচনা শুরু করলাম। সাধ্যমতো সত্য-মিথ্যা-স্বপ্ন-অদৃশ্য সব লিখে যাওয়ার বাসনা রাখি। আমি বলছি না, এ আমার জীবনের অংশ, আমি যা বলব এর সবটুকু সত্য। আমি স্বপ্ন জগতের মানুষ, আমার কাছে নিরেট সত্য দাবি করা নির্দয়তা ছাড়া কিছু নয়। আমি বলব আমার কাহিনি। বলব আমি এভাবে জীবন কাটিয়েছি। কেউ বিশ্বাস করার ইচ্ছে থাকলে তিনি করবেন। কেউ মিথ্যার অভিযোগ উত্থাপন করলে আমি বলব যে কবির চেয়ে সত্যবাদী সমাজে খুব বেশি জন্মায় না।

আমি টিনের সুটকেসটার উপর রথখোলার মোড়ে যেখানে দুধ বিক্রেতাদের সারি জমে উঠেছে এর এক প্রান্তে চুপচাপ বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার শখের সিগারেট বার্কলে। সাধারণত এটি খাওয়ার মতোন পয়সা আমার থাকত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিজারই টানতাম। কিন্তু আমার এ মহানগরীতে কবি হওয়ার বাসনা নিয়ে নতুন অতিথি। সে জন্য দু'একটি বার্কলে সিগারেট অন্য প্যাকেটে ঢুকিয়ে এনেছিলাম। আরামে সুখটান মারছি। আমি তখনও জানতাম না আমার পেছন দিকটা আউট অব বাউন্ড (বেশ্যাপাড়া)।

একজনকে, আমার সমবয়সি হবে এক তরুণকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ওই তো মসজিদ। আমি ২৮১ নং বাড়িতে যাব। ছেলেটি চমকে উঠল। বুড়ির হোটেলে?

আমি বুঝতে পারলাম ছেলেটি আমার গন্তব্য সম্পর্কে নিভুল কৌতূহল প্রকাশ করছে। হ্যাঁ ভাই।

কার কাছে যাবে!

কবি লুৎফর রহমানের কাছে।

তাড়াতাড়ি যান। একটু পরেই উনি তো অফিসে চলে যাবেন। আমি দেখে এসেছি উনি নিচে খেতে বসেছেন।

আমি কালবিলম্ব না করে সিগারেটে দু-তিনটে সুখটান মেরে সুটকেস নিয়ে দ্রুত পা ফেলে মসজিদের পাশের গলি দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

বাঁ দিকে তাকাতেই বুড়ির খোয়া ওঠা অতিশয় প্রাচীন দোতলা ইমারত। আমি ঢুকেই দেখলাম লুৎফর রহমান, একদা যিনি আমার দাদার বাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন এবং দীর্ঘকাল কলকাতায় গ্র্যান্ড হোটেলে বেয়ারার চাকরি করে কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখে সামান্য পরিচিতি অর্জন করেছিলেন সেই প্রসন্ন মুখচ্ছবি লুৎফর কাকু।

আমাকে দেখে খুবই যে বিস্মিত হয়েছেন এমন ভাব তার চেহারায় ফুটে উঠল না।

কখন এলে?

এই তো সকালের গাড়িতে।

তিনি আমার কথায় আমার হাত থেকে সুটকেসটি নিয়ে যেখানে চাটাই বিছিয়ে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল এর পাশে রেখে বললেন, আগে নাশতা করে নাও। উপরে গিয়ে কথাবার্তা হবে। তিনি মোটা বিশাল আকৃতির এক বৃদ্ধা মহিলার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে খেতে দিতে বললেন। বৃদ্ধা আমাকে এ সকালবেলাতেই গরম ভাত এবং কাঁচকি মেশানো আলুর ভাজি প্লেটে ভরে দিয়ে ঠেলে সামনে রাখতে গিয়ে বললেন, কোত্থেকে? শাহবাজপুর থেকে? শাহবাজপুর আমার শ্বশুরবাড়ি।

মুখে প্রসন্ন হাসি।

আমি বললাম, না নানি। আমার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

বুড়ি আর কথা বাড়ালেন না।

আমি সকালবেলায় গরম প্রাতরাশ পেট ভরে খেয়ে নিলাম। তারপর ধুয়ে মুছে কুলকুচা করে সুটকেসটা নিয়ে উপরে চলে এলাম। লুৎফর কাকু তখন অফিসে যাওয়ার জন্য পাঞ্জাবি পরে নিয়েছেন। আমাকে পাশের খালি সিটটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে বসো। কেন এসেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কাজের জন্য।

তোমার বাপ-মা জানেন?

আপনার কাছে আসব এ কথা বলে চলে এসেছি।

তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অত্যন্ত মৃদু শব্দে বললেন, গতকাল কাফেলায় তোমার একটি গল্প ছাপা হয়েছে—'জীবন'। ভালো লেখা। ডাকে পাঠিয়েছিলে? আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

তিনি কাগজের ভাঁজ থেকে সাপ্তাহিক কাফেলার একটি সংখ্যা আমার হাতে দিয়ে বললেন, সুন্দর করে ছেপেছে। এখন কাফেলা দেখছেন কবি ওয়াছেকপুরী, আবদুর রশিদ ওয়াছেকপুরী। তার কবিতা তো নিশ্চয় দেখে থাকবে। ইচ্ছে করলে আমি অফিস থেকে না ফেরা পর্যন্ত তুমি একবার ইসলামপুর থেকে ঘুরে আসতে পার। ২৫ নম্বর ইসলামপুরের দোতলায় কাফেলা অফিস। গেলেই তাকে পাবে। শোনো, তোমার অনেকগুলো কবিতা কলকাতার কাগজে ছাপা হয়েছে। 'নতুন সাহিত্য', 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদিতে।

এখানকার তরুণ কবিরা সবাই আমার নাম জানে। কিন্তু জানে না তুমি কোথাকার লোক। যা হোক টাকা-পয়সা সাথে আছে তো? না থাকলে আমি এখন কিছু দিতে পারি।

২

AMARBOI.COM

আমি হেসে বললাম, লাগবে না কাকু। আমার কাছে মাসখানেক চলার মতো হাত খরচের টাকা আছে।

বেশ। ভালোই হয়েছে। যখন থাকতেই এসেছ তাহলে তো হোটেলে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতেই হবে। বলতে বলতে তিনি নিচে নেমে গেলেন।

ঢাকায় এসে আমি যে প্রথম আনন্দে আটখানা হয়ে গেলাম তা হলো কাফেলা পত্রিকায় আমার গল্প 'জীবন' অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়েছে বলে। আমি আরও একটি বার্কলে সিগারেট ধরিয়ে গল্পটির আদ্যোপান্ত পড়ে নিলাম। ছাপার কোনো ত্রুটি নেই। কাগজটি গুটিয়ে নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে নিচে নেমে আসতেই বুড়ির সাথে দেখা।

ও মিয়া, শুনলাম থাকবার আইছ? বুড়ির মনোভাবটা বেশ খুশি খুশি।

আমি হাসলাম।

কই যাইবার লাগছ? দুপুরে আইসা খাইয়ো। লুৎফর মিয়া সব আমারে বইলা গেছে।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। জনসন রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম সদরঘাটের মোড়ে। সেখানে জেনারেল পোস্ট অফিসের গেটের পাশে তখন ছিল মজলিশ ভাইয়ের ম্যাগাজিনের দোকান। তিনি চৌকিতে বই সাজিয়ে সবই কলকাতার পত্রপত্রিকা বিক্রি করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক পরে এঁরাই নিউমার্কেটে মজলিশ বুক স্টল খুলেছিলেন। যা হোক এতসব পত্রপত্রিকার মধ্যে চলতি মাসের 'নতুন সাহিত্য' এক কপি ছিল। যাতে আমার একটি সনেট ছাপা হয়েছিল। আমি পত্রিকা কিনতে চাইলে মজলিশ ভাই বললেন, আপনার লেখা আছে নাকি?

আমি পত্রিকাটি খুলে তাকে পড়তে দিলাম। তিনি হাসলেন। আবার আসবেন। আমার কাছে অনেক পত্রপত্রিকা পাবেন। কয়েক দিনের মধ্যে আসবে। 'কীর্ত্তিবাস'-এর নাম শুনেছেন? কবিদের পত্রিকা। 'ময়ূখ', 'কীর্ত্তিবাস', 'চতুরঙ্গ', 'দেশ' সবই আমার কাছে পাওয়া যাবে। আমি হেসে দাম মিটিয়ে দিয়ে কাফেলা অফিসের দিকে রওনা হলাম।

'কাফেলা' অফিসটি ইসলামপুরের দিকে সদরঘাট মোড় থেকে একটু এগুলেই বাঁ হাতে পড়ে। আমি ঠিক অফিসের সামনে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি আঙুল তুলে দোতলা দেখিয়ে দিলেন এবং কোন দিক দিয়ে যেতে হবে সেটাও একটু আগবাড়িয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। আমি মূল রাস্তা থেকে গলির মধ্যে ঢুকে গেটটা পেয়ে গেলাম। একটু ইতস্তত করে ভেতরে পা দিয়ে দোতলার সিঁড়ি ধরে উপরে এসে দেখলাম, একটি বা দুটি চেয়ার পাতা আছে, পাশেই একটি টেবিলের পাশে, একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক বসে আছে। তার চুলগুলো এলোমেলো, চোখ ঈসৎ রক্তাভযুক্ত, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং মুখাবয়ব একটু লম্বাটে ধরনের।

আমি হাত তুলে সালাম জানালাম।

তিনি সালামের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী চাই?

আমি হেসে বললাম, কবি আবদুর রশিদ ওয়াছেকপুরী সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছি। আমার কথায় বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক বেশ প্রীত হয়েছেন, তিনি হাতের সাহায্যে সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বসতে ইশারা করলেন এবং সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছি।

আমি বললাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে। আমার নাম আল মাহমুদ। চলতি সংখ্যার কাফেলায় 'জীবন' গল্পটি ছেপেছেন। আমার এ কথায় আশ্চর্য, কবি আবদুর রশিদ ওয়াছেকপুরী আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তোমার গল্পটি তো অসাধারণ, আজ কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সাহেব তোমার গল্পটির ব্যাপারে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তার কাছে শুনলাম, তুমি মূলত কবিতাই বেশি লেখ। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, গদ্য লেখায় তোমার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। কবিতার সাথে গল্পও চালিয়ে যাও। ঠিক আছে, বসো।

আমি তার আদেশ অনুযায়ী চেয়ারে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, পকেটে কি আরও কোনো লেখাপত্র আছে?

আমি বললাম, একটি কবিতা আছে। দেব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমি যতটকু মনে করতে পারি মাত্রাবৃত্তে লেখা একটি সমিল কবিতা তার হাতে দিলাম। কবি আবদুর রশিদ ওয়াছেকপুরী কবিতাটির ওপর এক নজর চোখ বুলিয়েই তা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন।

পরে অবশ্য আমি জেনেছিলাম এই ছন্দটি জনাব ওয়াছেকপুরীর খুবই পছন্দের ছন্দ, যা হোক তার সাথে আমার প্রথম দর্শন ও পরিচয় মোটামুটি সুখেরই হলো।

টেবিলে বসে খোশগল্প করতে করতে চায়ে চুমুক দিচ্ছি, ঠিক সে মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করলেন সুট-কোট পরা দশাসই লম্বা, ফর্সা একজন ভদ্রলোক। তাকে দেখেই মনে হলো তিনি কেওকেটা ব্যক্তিই হবেন। ওয়াছেকপুরী তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইনি হলেন কাফেলার মূল সম্পাদক এবং মালিক জনাব নজমুল হক। তিনি আমার দিকে একবার তাকালেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

এ হলো আল মাহমুদ। এবারের যে গল্পটির কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এ হলো সেই ছেলে।

কবিতাও লেখে।

এ কথায় হক সাহেব আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তোমার গল্পটি আমি পড়েছি। খুব ভালো লেখা। তবে তোমাকে দেখে এত ভালো গল্প তোমার মতো একটি কিশোর লিখতে পারে এটা ভাবতে দ্বিধা হচ্ছে। বলে তিনি হেসে ফেললেন। আমিও হাসলাম। হক সাহেব কিছুক্ষণ থেকেই ওয়াছেকপুরীর সাথে কি যেন ফিসফিস করে বলতে বলতে পাশের কামরায় প্রেসে গিয়ে ঢুকলেন। একটু পর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বেরিয়ে গেলেন। তার চলে যাওয়ার পর প্রেস ম্যানেজারকে ওয়াছেকপুরী ডেকে এনে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি আফজাল সাহেব, কাফেলার কাজকর্ম, কম্পোজ, মেকাপ তার তত্ত্বাবধানেই হয়। আমি হাত বাড়ালাম তার দিকে কিন্তু তার হাত প্রেসের কালিতে অপরিষ্কার থাকায় তিনি হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন, আমার হাতে কালি লেগে আছে। তবে আপনার 'জীবন' গল্পটি আমি কম্পোজ করেছি। ভালো লেখা। আপনি আরও গল্প লিখুন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। এই প্রেসম্যান আফজালের সাথে বাকি জীবন আমার সংশ্লিষ্টতা বেড়েই চলেছিল। তিনি কাফেলা থেকে সমকাল, সমকাল থেকে বাংলা একাডেমি প্রেসে দায়িত্ব পালন করে গেছেন, আমি জানি না আফজাল আজও বেঁচে আছে কি-না। কিন্তু আমার জীবনে এবং লেখায় কম্পোজার ছিলেন আফজাল। এমন হাসিমুখ মানুষ আমি কমই দেখেছি। প্রেস লাইনের লোকেরা যে এমন সাহিত্যরসিক ও লেখকদের ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হতে পারে—তা আমি দেখিনি। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওয়াছেকপুরীর সাথে কাটিয়েছিলাম।

আমার মনে হলো নিঃসন্দেহে তিনি কবি কিন্তু তার আচরণ একটু অসংযত। বলা যায় তিনি হিসাব করে কথা বলতে জানেন না। আমার মতো সদ্য ঢাকায় আসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন কিশোর কবির সাথে কতটা সৌহার্দ্য দেখানো যায় তা সম্ভবত কবি ওয়াছেকপুরীর একেবারে জানা ছিল না। তবে তার কিছু কবিতা সব সময় আমাকে উদ্বুদ্ধ রেখেছে। পরবর্তীকালে বলা যায়, তিনি লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং জটিল রহস্যময় তাসাউফের ডোবায় ডুব দিয়ে সাহিত্য থেকে অন্তর্নিহিত হয়ে যান। তার জন্য আমার গভীর বেদনাবোধ আমি অন্তরে অনুভব করি।

মানুষের জীবন হলো এক অন্তহীন রহস্যময় বিষয়, যা শত উপন্যাস লিখেও শেষ করা সম্ভব নয়। আমি যখন কবি ওয়াছেকপুরীর কথা ভাবি, তখন একজন কবির অপার সম্ভাবনার মৃত্যু কীভাবে হয়, এ নিয়ে না ভেবে পারি না।

আমি জানি কবিত্বের মৃত্যু নেই। কিন্তু তা বাক্য সৃষ্টিতে ব্যবহার না করলে, ছন্দে-ধ্বনিতে ব্যবহার করতে না পারলে এবং বিকল্প সৃষ্টিতে পারঙ্গমতা সৃষ্টি করতে না পারলে তা যে রক্তের মধ্যেই সমাহিত হয়ে যায় সেটা আমার অজানা নয়। এই সত্যি হয়তো ওয়াছেকপুরী তার কামনা-বাসনা, ধর্ম চেতনায় অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন।

আমি যতটুকু জানতাম কবি ওয়াছেকপুরী তার গ্রামের বাড়িতে (নোয়াখালী কিংবা ফেনীতে) স্ত্রীকে রেখে ঢাকায় জীবনযাপন করতেন। কবিপত্নীর নাম ছিল হালিমা। ওই হালিমার গর্ভে ওয়াছেকপুরীর জঙ্গি নামে একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল, স্ত্রী-পুত্রকে ওয়াছেকপুরী অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তবে ওয়াছেকপুরী যেহেতু কবি ছিলেন সে কারণে স্বভাবসুলভ উদাসীনতায় আত্মীয়তা তার মধ্যে দৃঢ় হতে দেননি। অথচ তিনি তার পুত্রকে নিয়ে একটি অসাধারণ কবিতা লিখেছিলেন বলে আমার মনে পড়ে। হালিমা ভাবীকে গ্রামে রেখে এসে ওয়াছেকপুরী পরবর্তীকালে অন্য একটি বিবাহ করেছিলেন। তার জীবন সুখের হয়েছিল কি-না তা আমার জানা নেই। কবিকে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়। কিন্তু কবিতা ছাড়া যায় না। আক্ষেপের বিষয়, ওয়াছেকপুরী অনেক কিছুর সঙ্গে কবিতাকেও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

৩

কাফেলা থেকে রাস্তায় নেমে আমার মনে হলো ঢাকা শহর থেকে সুন্দর শহর আর বুঝি জগতে নেই। আমি এর আগেও ঢাকায় এসেছি। কিন্তু এবারের আসাটা ফিরে যাওয়ার জন্য নয়। যতটুকু মনে পড়ে, ঋতুটা ছিল বসন্তের আমেজে ভরপুর। শীতের প্রকোপ শেষ না হলেও রাস্তার আশপাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের উপরিভাগটা সহসা যেন লাল ফুলে ভরে গেছে। আমি ওই কাফেলার রাস্তা ধরেই ওয়াইজঘাটের দিকে হাঁটা দিলাম। ওয়াইজঘাটের অলিগলি পার হয়ে উপস্থিত হলাম বার্কলেন বাঁধের ওপর। অর্থাৎ বুড়িগঙ্গার তীরে। তো বাঁ-হাতি রাস্তা ধরে চলতে চলতে এসে উপস্থিত হলাম সদরঘাট। সেখানে বিশাল কামানটি দর্শনীয় বস্তু হিসেবে পাথরের মঞ্চের ওপর বসানো ছিল। অনেকে বলতেন কালো খাঁ কামান। কামানটির নাম ছিল বিবি মরিয়ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় কোনো যুদ্ধের সময় কামানটি বুড়িগঙ্গার তীরচ্যুত হয়ে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। কামানটিতে গ্রাম থেকে আসা হিন্দু বধূরা সিঁদুর দিয়ে পূজা করত। হয়তো তারা এটাকে তাদের শিবলিঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করত। আমি কামানটির ওপর হাত দিয়ে এর বিশাল আকার ও লৌহ গহ্বর দেখে নিলাম। এ কামানটিকে নিয়ে আমার একটি কবিতাও আছে। কবিতাটির নাম 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো'। আমি যখন 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' লিখি তখন কামানটি সদরঘাটে ছিল না। তুলে আনা হয়েছিল গুলিস্তান মোড়ে। সেটা অনেক পরের কথা।

আমি যখনকার কথা বলছি তখন গুলিস্তান অঞ্চলটির আশপাশে খানাখন্দ, কচুঘেঁচু এবং অনাবাদি খালি জমি পড়ে ছিল। এর মধ্যে বিটুনিয়া বলে একটি সিনেমা হলের কথা মনে পড়ে। এই সিনেমা হলে ইংরেজি ছবি দেখানো হতো। দর্শক ছিল ইংরেজরা।

পাকিস্তান হওয়ার পর এ হলটি ইংরেজি শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাভোগী একটি শ্রেণির বিদেশি সিনেমা দেখার হল রূপে বিবেচিত হচ্ছিল।

আবার কামানের কথায় ফিরে আসি। কামানটি ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসম্পদ। এটি নিয়ে তখন ঢাকার পৌর কর্তৃপক্ষ কিংবা যারা প্রত্ন সম্পদের রক্ষক তারা মনে হয় এর সঠিক স্থান নির্ণয় করতে পারছিলেন না। এখানে-ওখানে ঘুরেফিরে বিবি মরিয়ম এখন ওসমানী উদ্যানের গৌরব বৃদ্ধি করছে।

যা হোক আমি সদরঘাটে কিছুক্ষণ ঘুরেফিরে যাওয়ার সময় আবার মজলিশ ভাইয়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, আরে আপনি এসেছেন দেখুন কীর্ত্তিবাসের প্যাকেট এসে গেছে। তিনি একটি প্যাকেট থেকে গাঢ় নীল রঙের প্রচ্ছদের ওপর লাইনো টাইপে 'কীর্ত্তিবাস' লেখা পত্রিকাটি আমার হাতে দিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকাটি দেখে আমার মন ভরে গেল। কাগজ দেখেই এই পত্রিকাটিতে লেখা পাঠাব বলে মনস্থির করে ফেললাম।

আমি যখন কাগজটি দেখছি, তখন আমার পেছনে পিঠের সাথে প্রায় বুক লাগিয়ে আরও একজন কীর্ত্তিবাসের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছিল। আমি মুখ ফিরিয়ে যুবকটিকে দেখলাম। আমি মুখ ফেরাতেই সে বলল, আমার নাম দেবব্রত চৌধুরী। তখন আমি আমার পরিচয় দিতে বাধ্য হলাম। বললাম, আল মাহমুদ।

হ্যাঁ কলকাতার কাগজে আপনার কবিতা দেখেছি। আপনার বাড়ি তো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। আমি হবিগঞ্জের লোক। আমিও কবিতা লিখি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি।

ওই নামে আমি কারো কবিতা কোনো পত্রিকায় পড়িনি। হয়তো তিনি ঢাকার পত্রপত্রিকায় লেখেন। আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। আমি মজলিশ ভাইকে কীর্ত্তিবাসের দাম পরিশোধ করামাত্র তিনি আরও একটি প্যাকেট থেকে খুব সুন্দর সাদা আর্ট পেপারের প্রচ্ছদওয়ালা একটি পত্রিকা আমার হাতে দিলেন। পত্রিকাটির নাম 'ময়ূখ'। এটিও কবিতা পত্রিকা। আমি এবং দেবব্রত দু'জনে খুব উৎসুক হয়ে পত্রিকাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম। সম্পাদক জগদীন্দ্র মণ্ডল। পাতা উল্টিয়েই দেখলাম, এতে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা দিয়ে শুরু। দারুণ আকৃষ্ট হলাম 'ময়ূখ' পত্রিকাটির প্রতি। আমি ও দেবব্রত হাঁটতে হাঁটতে সদরঘাটের মোড় পার হয়ে ধোলাইখালের ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়ালাম। দেবব্রতকে বললাম, আমি এখানে এই মসজিদের পাশে থাকি।

এটা তো নবাবপুর রোডে পড়ে। নম্বর কত?

আমি বললাম ২৮১।

ঠিকানাটি একটি কাগজে টুকে নিল দেবব্রত চৌধুরী এবং একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, তাহলে আমি আসি।

দেবু চলে গেলে আমি ভেতরে গিয়ে লক্ষ করলাম, চার-পাঁচ জন লোককে বুড়ি খাওয়াচ্ছে। আমার দিকে চোখ পড়তেই বলল, ওই মিয়া, জলদি আহো।

এ কথায় আমি দ্রুত উপরে উঠে গিয়ে পরনের পাজামা ও শার্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরে নিলাম এবং নিচে এসে কুয়ার পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেলাম।

ততক্ষণে সবাই প্রায় উঠে গিয়েছিল। বুড়ি আমার দিকে একটা টিনের থালা এগিয়ে দিল এবং একটি বড় টিনের চামচ দিয়ে ঝাঁকা থেকে ভাত তুলে পাতে ঢেলে দিল। দেখলাম, এক টুকরো মাছ ও আলুসহ ঝোলভরা একটি বাটি আমার সামনে। আমি ঢেলে নিয়ে খেতে শুরু করলে কোত্থেকে একটা লম্বামতো ফর্সা লোক এসে দাঁড়াল। বুড়ি ওই লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা বাক্স থেকে মুঠ করে কী যেন বের করে তাকে দিল। আমার মনে হয় পয়সা-কড়ি হবে। আমি আপন মনে খাচ্ছিলাম। আর আড়চোখে লোকটাকে দেখছিলাম। বেশ ছিমছাম স্বাস্থ্য এবং বেশ একটু লম্বাও বটে। চোখ দুটি রক্তবর্ণ। ফিরে যাওয়ার সময় বুড়ি বলল, খাবি?

না।

লোকটি বেরিয়ে গেল।

আমি এবার বুড়ির দিকে তাকালাম।

আমার ছেলে।

আমি কোনো কথা না বলে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই বুড়ি বলল, শীতের লেপকাঁথা আনছ?

আমি হাসলাম। আনিনি, তবে একটা ব্যবস্থা তো হবে। লুৎফর কাকু আসুক।

ওমা একেবারে মুক্ত সুরত! লুৎফর মিয়া তো কইল বড় ঘরের ছেলে।

আমি একটু লজ্জা পেয়ে কেটে পড়লাম। উপরে এসে খাটে শুয়ে পড়লাম। ঘুমটুম কিছুই হলো না। মন পড়ে আছে 'কীর্ত্তিবাস' ও 'ময়ূখ'-এর দিকে। পত্রিকা দুটো খুলে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। যেন এক অনাবিষ্কৃত নতুন জগতে প্রবেশ করেছি। যেখানে পৌঁছতে না পারলে আর শান্তি নেই।

কীভাবে একজন মানুষ বালক বয়সেই কিংবা বয়োসন্ধিকালে কবি হয়ে ওঠে তা আমার এই নেশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। মনে হচ্ছে, কবিতা ছাড়া আমার আর কোনো পাঠ্য নেই। আর কিছু করতে যেন মনের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায় নেই। কারো প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই। এমনকি আমার নিজের প্রতিও কোনো দায়িত্ব অনুভূতি নেই। যদি থাকত তাহলে এই শীতের সময় বাড়ি থেকে লেপ-তোষক নিয়ে আসতাম। হায় আল্লাহ আমার একটি বালিশও ছিল না। আমি এসে পড়েছি প্রাচীন একটি মোগলাই শহরে। যে শহর সহসা এর সামন্ততান্ত্রিক খোলস ফাটিয়ে এক দশকের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে। হয়ে উঠবে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ধর্মসহ যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল। পুঁজিবাদী চতুরতা তখনও ঢাকা শহরের সদা সতর্ক লোকদের মধ্যে প্রবেশ করেনি। এখনও পাড়ার সর্দারদের শাসনে গোত্রপতিদের প্রতাপে অভ্যস্ত। কিন্তু ঢাকায় প্রবেশ করেছে কলকাতা থেকে অনিশ্চিত ভাগ্যের দিকে অন্বেষণকারী একদল মুসলমান আমলা, দোকানদার, হায়-আফসোকারী উচ্ছিষ্ট এবং একই সাথে ইংরেজি শিক্ষিত জালিয়াত ধরনের ছাত্রদের দল। এরা প্রায় সবাই কালো শেরওয়ানি ও জিন্নাহ ক্যাপ পরা ছিল। ঢাকার সাথে তাদের জীবনের প্রকৃতপক্ষে কোনো মিল ছিল না। ঢাকাকে তারা তেমন ভালো করে চিনত না। তাদের প্রবেশকালে এ প্রাচীন মোগল শহর জাহাঙ্গীরনগরকে মনে হয়েছিল অতিশয় অন্ধকার একটি অঞ্চল মাত্র।

নবাবপুরই ছিল ঢাকার অন্যতম রাস্তা। এর প্রতিটি বাড়ির গায়ে ছিল প্রাচীনতার গন্ধ। হিন্দু থেকে মুসলমান হোক, এর বাসিন্দারা ছিল সাবেক সামন্তবাদী নাগরিকদেরই বংশধর। উত্তরসূরি। তাদের ইমারতের গায়ে প্রাচীনতার গন্ধ। অধিকাংশ বাড়িই ছিল সুরকি ঝরানো দাঁত বেরিয়ে পড়া প্রাচীনতায় স্থবির। এখানে আসা পাকিস্তান আমলারা যার একটি বড় অংশ ছিল উর্দু ভাষাভাষী। আর এসেছিল বিহারি রিফুজির দল। এসেই তারা ঢাকা শহরকে অপরিচ্ছন্ন এবং গোবরের চ্যাপ্টা করা ঘুটে বাড়ির দেয়ালে শুকাতে দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছিল।

তারা অভিজাত উর্দুভাষী ছিলেন, এসেছিলেন উত্তর প্রদেশ থেকে কিংবা মধ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। অভিজাত মুসলমানরা এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে মেজাজ খাট্টা করে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। তাদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষগুলো কথা বললেই বুঝতে পারত এরা খুবই অসন্তুষ্ট দেশত্যাগী হিজরত করা শ্রেণি।

৪

এখানে এসেই বিহারিরা নিজেদের নেতৃত্বের ভুলের কারণে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যা ছিল বাংলাদেশের জনগণের কাছে একেবারেই অসহনীয়। তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করল যে তারা বাঙালি মুসলমানদের থেকে অনেক উন্নত ধরনের এক সম্প্রদায়। তারা উর্দুর চর্চা করত বটে, কিন্তু জেনেশুনেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা দেখাতে লাগল। সে সময় ভাষার ব্যাপারে বাঙালি মুসলমানদের সেন্টিমেন্ট ছিল তাদের একেবারেই আন্দাজের বাইরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনকার সময় পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ের অধিকাংশ চাকরি বিহারিদের করায়ত্ত হলো।

হয়তো তাদের প্রোভাইড করার জন্য এটা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একটি উদার ব্যবস্থা কিন্তু বিহারিরা এই উদারতার এতটুকু যোগ্য ছিল না। তারা রেলওয়ে ওয়াকশপে কলকজা ইত্যাদি মেরামতের কিছুটা দক্ষতা দেখিয়ে ছিল। কিন্তু রেলওয়ে পরিচালনার মতো দক্ষতা তাদের ছিল না। আমি এদের কাণ্ড-কীর্তির অনেক বিষয় অবগত ছিলাম। কারণ আমার এক খালাত ভাই তখন রেলওয়ের বড় কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বিহারিদের ব্যাপারে উদারই ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ বিহারি অফিসার ছিলেন আচরণে অসংযত এবং মন-মানসিকতার দিক দিয়ে দাম্ভিক। এ অবস্থার সুযোগ নিতেন সাধারণ বিহারি যাত্রীরাও। দেখা যেত যে বিহারি মেয়েরা প্রথম শ্রেণি ও মধ্যম শ্রেণির কামরায় উঠে পা ছড়িয়ে থাকত। বাঙালি যাত্রীদের জায়গা দিতে চাইত না। এ নিয়ে পথেঘাটে নানা বিরোধের সৃষ্টি হতো এবং বিহারিদের সম্বন্ধে এ দেশের মানুষের স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল।

যদি বিহারিরা এ দেশে আশ্রয় নিয়ে এ দেশের মানুষের সাথে রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে এ মাটিতে মিশে যেতে পারত তাহলে মুক্তিযুদ্ধের পর বিহারিরা যেভাবে ঝাড়ে-বংশে উৎখাত হয়ে গেল, এ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হতো না। এর জন্য তাদের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ দায়ী। তারা বাঙালি মুসলমানকে হীন ভাবত। নিচু স্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য করত। অথচ বিহারিরা ছিল রিফুজি, আমাদের আশ্রিত। তাদের এ বিচ্ছিন্ন থাকার পেছনে আরও একটি ঘটনা হয়তো উৎসাহ যুগিয়ে থাকবে, সেটা হলো দেশ ভাগ হওয়ার পর যেসব মুসলমান পুঁজিপতি এ দেশে এসে ব্যবসা জাঁকিয়ে বসে লুণ্ঠন শুরু করেছিল তাদের অন্যতম দাদা দাউদ ইস্পাহানির দল। তারা শ্রমিক-কর্মচারী হিসেবে বাঙালিদের চেয়ে বিহারিদের বেশি বিশ্বস্ত ভেবে অধিক মাত্রায় নিয়োগ দিয়েছিল। যেমন আদমজি জুট মিল থেকে শুরু করে প্রায় সব কলকারখানা, জুট মিল এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বিহারি শ্রমিকদের প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছিল। এতে প্রতিদ্বন্দ্বি বাঙালি শ্রমিকদের গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। এর ফলে বিহারিদের সাথে এ দেশের মানুষের বিশেষ করে কিষাণ শ্রমিক ধরনের শ্রমনিপুণ মানুষের একটা ফারাক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সব ধরনের বিহারিই বাঙালি নিম্নআয়ের মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করত এবং চেষ্টা করত উচ্চশিক্ষিত বাঙালিদেরও সুযোগ পেলে অপদস্ত করার।

এ ব্যাপারে আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি—কোনো এক রমজান মাসে আমি ও আমার চাচা, তিনি কৃষি বিভাগের থানা অফিসার হিসেবে তখনও কর্মরত ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে ছিলেন পুলিশের দারোগা। দেশ ভাগের সময় জলপাইগুড়িতে তার পোস্টিং ছিল। দেশ ভাগ হয়ে গেলে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং কৃষি বিভাগে যোগাযোগ করেন। আমার চাচা এমনিতে ছিলেন শিক্ষিত মানুষ। বিএ পাস করেছিলেন এবং বহু বিষয়ে ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পণ্ডিত। অনর্গল ইংরেজি বলতে পারতেন। সাবেক দারোগা হলেও তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্রলোক ছিলেন।

আমি তাকে নিয়ে রমজান মাসে চট্টগ্রাম থেকে ফার্স্ট ক্লাসের রিজার্ভেশন নিয়ে মেইল ট্রেনে উঠেছিলাম। চাচা রোজাদার ছিলেন। আমিও রোজা রেখেছিলাম। ট্রেন সীতাকুণ্ডে এসে একটু দাঁড়াতেই দু'জন বিহারি যুবক আমাদের কামরায় গায়ের জোরে উঠে গেল। আমি রিজার্ভেশনের কথা তুলতে গেলে চাচা আমাকে নিষেধ করলেন। বললেন, বসতে দাও। ট্রেন সীতাকুণ্ড স্টেশন থেকে ছাড়ামাত্রই ওই বেয়াদব দুই বিহারি ছোকরা সিগারেট ধরাল। আমি তাদের এবার বাধা না দিয়ে পারলাম না। আমি বললাম যে, আপনারা এভাবে সিগারেট খাচ্ছেন! আমি ও আমার চাচা দু'জনেই রোজাদার। 'রোজাদার তো কেয়া হুয়া'—এ ধরনের বাক্য বলে যুবক দুটি আমার চাচার দিকে তাকাল। চাচা একটি টাওয়েলের প্রান্তভাগ দিয়ে নাক ঢেকে বসে ছিলেন। যখন বিহারি যুবক দুটির ফাজলামো কথাবার্তায় তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, তখন তিনি বাঘের মতো গর্জন করে ওই দুই বিহারি যুবকের কলার চেপে ধরলেন এবং দু'জনকে দু'হাতে শূন্যে তুলে আমাকে ইশারা করলেন টেনের দরজা খুলে দিতে। আমি দেখলাম মহাবিপদ! আমি চাচাকে জানি। তিনি এ দু'জনকেই বাইরে ছুড়ে ফেলে দেবেন, এতে আমার সন্দেহ রইল না। আমি দরজা না খুলে চাচাকে জাপটে ধরে বললাম, মাফ করে দিন। চাচা তখন ওই দুই যুবকের গলা চেপে ধরে শূন্যে তুলে ধরে রেখেছেন। চাচা ছিলেন অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী ট্রেনিংপ্রাপ্ত মানুষ। আমার কাকুতিমিনতি শুনে দু'জনকে সিটের ওপর ছুড়ে দিলেন। এ সময় পরের স্টেশনের লাইন ক্লিয়ার না থাকায় আউটার সিগন্যালের কাছে এসে হুইসেল বাজাতে বাজাতে শ্লো মোশন নিল ট্রেনটা। আমি হাতের ইশারায় বিহারি যুবক দুটিকে গাড়ির দরজা দেখিয়ে দিলাম। আর সাথে সাথে ভীত খরগোসের মতো যুবক দুটি দরজা খুলে লাফিয়ে পালিয়ে গেল। চাচা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আর গোস্বা চেপে রাখতে পারিনি ভাতিজা। আল্লাহ্ মালুম আমার রোজাটা থাকল কি-না। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, আপনি এ পরিস্থিতিতে রাগাম্বিত না হলে পবিত্র রমজান মাসেরই পবিত্রতার ক্ষতি হতো।

এ ছিল বিহারিদের ধৃষ্টতার ও একই সাথে বেতমিজ আচরণের একটি দৃষ্টান্ত। তারা মিশতে চাইল না বলে বাংলাদেশের মাটি তাদের নিল না। তারা ধর্মের ঐক্যের কথা কোনোদিন বিবেচনা করত না। নিজেদের মনে করত বাঙালি মুসলমানদের থেকে অনেক উন্নত মানুষ তারা। তাদের নির্বোধ মনোবৃত্তির জন্য কত নিরীহ বিহারি নর-নারী বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে এখনও নিগৃহীত হচ্ছে।

আমার ওই দিনের সাফল্যের কথা রাতে আমি লুৎফর কাকুকে জানালে তিনি হাসলেন। বললেন, তোমার পৌঁছার আগেই তোমার লেখা নিয়ে একটু-আধটু কথা হচ্ছিল। এর কারণ অবশ্য তোমার কলকাতামুখিতা। সব কবিতাই কলকাতায় ছাপা হচ্ছে। আমার মনে হয় তোমার এবার ঢাকায় শেকড় গাড়া উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি লুৎফর রহমানের কথার বাস্তবতা আগে থেকেই বুঝতাম কিন্তু ঢাকার ডাকে পাঠিয়ে কবিতা আমি অল্পই ছাপাতে পেরেছিলাম।

রাতে লুৎফর রহমানের অনুগ্রহে আমি একটি সুজনি এবং কম তুলোর লেপ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। লুৎফর রহমান শুয়ে শুয়ে আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন যা আমি আজও বিস্মৃত হইনি। তিনি বলেছিলেন, তোমার অসাধারণ ক্ষমতা আছে কিন্তু তুমি কবিতায় বেশি খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছ। এ বিষয় দুটি নিয়ে তোমাকে ভেবে দেখতে হবে। দেখো আমাদের দেশে কথাশিল্পীর বড়ই অভাব। কিন্তু কবিরা রাজত্ব দখল করে বসে আছে। তুমি একটু ভেবেচিন্তে পথ ঠিক করে নিও।

সকালে ভোরবেলা আমি ঘুম থেকে জেগে দেখি আমার আশ্রয়দাতা লুৎফর রহমান নেই। বিছানাও গুটানো। বুঝলাম তিনি সকালবেলা কোনো জরুরি কাজে বেরিয়েছেন। এদিকে ঘুম থেকে এক ধরনের উদ্দীপনা আর ছন্দে দোলা আমাকে মুখ না ধুয়ে প্যাড টেনে কবিতা লেখায় ঝুঁকিয়ে দিল। আমি এক নিঃশ্বাসে একটি ছোট কবিতা লিখে ফেললাম ছন্দে। কবিতাটির নাম ছিল 'স্বীকারোক্তি'। লিখে বুঝতে পেরেছিলাম কবিতাটি আমার বিবেচনায় উত্তীর্ণ রচনা। আমি কবিতাটি লিখেই মনে মনে স্থির করে ফেললাম, যেহেতু আমার বিবেচনায় লেখাটি সফল হয়েছে বলে ধারণা হচ্ছে তখন ঢাকার সবচেয়ে দুরূহ সাহিত্যের পৃষ্ঠায় লেখাটি ছাপতে দেব। সেটা হলো 'দৈনিক আজাদ'-এর 'সাহিত্য মজলিশ'। যে পৃষ্ঠাগুলো সম্পাদনা করতেন তৎকালীন বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান কবি আহসান হাবীব।

আমি ছিমছাম হাতে কবিতাটি একটি সাদা পৃষ্ঠায় কপি করলাম। এখানে একটা সত্য কথা উচ্চারণ করি্য—আমার হস্তাক্ষর সুন্দর নয়। এ ধারণাটি সৃষ্টি হয়েছিল আমার আব্বার একটি খেদোক্তিতে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাইরে হয়তো কোনো আত্মীয়ের বাড়ি থেকে একটি পত্র লিখেছিলাম। পোস্ট কার্ডে। যথাসম্ভব সুন্দর অক্ষরেই উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে চিঠিটি লেখা হয়েছিল।

আমার মার কাছে শুনেছি, পত্রটি পেয়ে আমার আব্বা আমার চাচাকে ডেকে বলেছিলেন দেখ তো মিয়া তোমার ভাতিজার চিঠি। এ ধরনের হাতের লেখা কি কোনো ভদ্র ঘরের ছেলে লিখতে পারে! অক্ষরগুলো কেমন কাউয়ার ঠ্যাং। এ ঘটনা জেনে আমার হস্তাক্ষর সম্বন্ধে আর কোনো দিন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাইনি। শুধু আমার স্ত্রী হয়তো-বা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলতেন, আমার হাতের লেখা নাকি খুবই মিষ্টি। কিন্তু আমি এসব প্রতারণায় ভুলিনি। আমি এখনও মনে করি, আমার আব্বার কথাই ঠিক। আমার হস্তাক্ষর যথাযথ নয়।

৫

আমি সকালের নাশতা সেরে একটু আগেভাগে গোসল করে নিলাম। আমার সুটকেসে একটা সাদা হাফশার্ট ছিল। আর ছিল একটি সাদা ফুল প্যান্ট। এর সাথে সাদা কেডস থাকলে খুবই ভালো হতো। কিন্তু তা ছিল না। আবার আর্থিক সামর্থ্যও ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। অথচ কোনো এক সময় আমার পিতার জুতার ব্যবসা ছিল। তিনি ফ্লাকসর গ্লাস্কিড জুতা আমার জন্য বাছাই করে নিয়ে আসতেন।

আজ সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত আমার ফ্যামেলি। এ অবস্থায় একজোড়া রাবারের স্যান্ডেল অন্তত পাদুকা হিসেবে আছে, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট বলে ভাবতাম।

আমি সাদা হাফশার্ট ও সাদা প্যান্ট ইন করে পায়ে রাবারের স্যান্ডেল লাগিয়ে রওনা হলাম আজাদ পত্রিকা অফিসের দিকে। আমি যখন আজিমপুরের ওই অঞ্চলে আজাদের গেটে গিয়ে হাজির হলাম তখন এর গেট এবং ভেতরকার দৃশ্যটি একনজর দেখে একটু ভড়কে গেলাম। দেখেই মনে হলো যে, এ হলো এক বিশাল প্রতিষ্ঠান, যা দেশ ভাগ হওয়ার পর কলকাতা থেকে উঠে এসেছে। তখনও গ্রামেগঞ্জে, শহরে, মফস্বলে সংবাদপত্র হিসেবে মুসলমানরা আজাদকেই বুঝতেন। আর সাংবাদিক শব্দের অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মাওলানা আকরাম খাঁ। গেটের দারোয়ান আমার দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল, কার কাছে যাবে খোকা! মুকুলের মহফিলে? মোদাব্বের সাহেব তো এখনও আসেননি।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না আমি সাহিত্য বিভাগে যাব—কবি আহসান হাবীবের কাছে।

চলে যাও, তিনি এসেছেন।

আমি গেটটা পেরিয়ে নিজের অবয়বের দিকে তাকালাম। আমাকে খোকা বলার কার্যকারণ অনুসন্ধান করে বুঝলাম, এ পোশাকে আমাকে খুব ছেলেমানুষ লাগছে হয়তো। হয়তো লাগছে নিতান্ত বালকের মতো। তবুও সাহস করে একেবারে গিয়ে আজাদের সাহিত্য মজলিসে হাজির হয়ে গেলাম। কবি আহসান হাবীব তখন মাথা নুয়ে টেবিলে সম্পাদনার কাজ করছিলেন। যতটুকু মনে করতে পারি, তার সামনে টেবিলের এ পাশে কয়েকজন লোক বসে ছিলেন। তাদের দু'জনের কথা আমার এখনও মনে আছে। একজন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, অন্যজন গোলাম রহমান (শিশু সাহিত্যিক)। এ সময় সহসা হাবীব ভাই মাথা তুলতেই আমাকে দেখতে পেলেন। আমি কোনো ভূমিকা না করেই বললাম, একটা কবিতা দিতে এসেছি।

পকেটে 'স্বীকারোক্তি' কবিতাটি তখন হৃৎপিণ্ডের সাথে ডিপ ডিপ করছিল।

আহসান হাবীব হাত তুলে পাশের একটি কামরার দিকে দেখিয়ে বললেন, মুকুলের মহফিল ওইদিকে। আমি স্বভাবসুলভ দ্রুততায় বললাম, আমি সাহিত্য বিভাগে কবিতা দিতে এসেছি।

হাবীব ভাই খানিকটা বিস্মিত হলেন কি-না জানি না। তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, দেখি!

আমি পকেট থেকে আমার 'স্বীকারোক্তি' কাঁপা হাতে খুলে তার হাতে দিলাম। তিনি সাথে সাথে কবিতাটির ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। হয়তো বা দু'বার বা তিনবার পড়লেন নিঃশব্দে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি—কেউ লেখা দিলেই আহসান হাবীব সাথে সাথে পড়তেন। বলতেন না পরে এসো, আমি পড়ে দেখব।

সম্পাদনার অসাধারণ গুণ ছিল কবি আহসান হাবীবের মধ্যে অথচ সম্পাদক হিসেবে, সাহিত্যের শনাক্তকারী হিসেবে যে সম্মান তার প্রাপ্য ছিল তা আমরা তাকে দিতে পারিনি। এটা আমাদের সাহিত্য তথা সৃজনশীল লেখক সম্প্রদায়ের গ্রাম্যতা ছাড়া আর কিছু নয়।

হাবীব ভাই পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তকিয়ে থাকলেন এবং মৃদু হাসলেন—ভালো। তবে এ কবিতাটি যে আজাদে ছাপা যাবে না।

তিনি হাত বাড়িয়ে লেখাটি আমাকে ফেরত দিলেন। আমার মনে হলো এই মুহূর্তে পথিবী ভেঙে পড়েছে আমার ওপর। আমি খুব ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে এলাম। একবারও বিবেচনা করলাম না যে, আমার কবিতায় এমন কিছু শব্দ আছে যা আজাদ পত্রিকার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমি ভুলে গেলাম কবি আহসান হাবীব আমার কবিতাটি পড়ে নিচু স্বরে বলেছিলেন—ভালো। কিন্তু তা আজাদের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমি আহসান হাবীবের ভালো বলাকে ভুলে গিয়ে তার প্রত্যাখ্যানকে গ্রহণ করেছিলাম। হয়তো মনে মনে তাকে অপছন্দও করেছিলাম। এমনকি হতে পারে যে, খানিকটা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু পরবর্তী জীবনে তার সাথে আমার যে বিনিময় ঘটেছে, যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে সেটা তার অসাধারণ কবিত্ব শক্তি, সম্পাদনার শক্তি এবং উদারতার জন্যই ঘটেছিল।

এর পরের মাসে আমার এ কবিতাটি কলকাতার কবিতা পত্রিকা ময়ূখে উপযুক্ত সম্মানের সাথে ছাপা হয়। ওই সংখ্যায় বুদ্ধবে বসুর কবিতা ছাপা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে। ছাপা হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত কবিতাও। এসব কিছু ক্ষুদ্র ঘটনার কারণেই আমি কলকাতায় লিখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার কবিতার জন্য তখন সুন্দর পত্রিকায় স্থান সঙ্কুলানের প্রয়োজন ছিল। পরে স্থান-কাল ইত্যাদি বিষয় আমার বিবেচনায় আসে। আগে স্থান করে নিতে চেয়েছিলাম, নিয়েছিলাম বলেই আজও কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি।

এর মধ্যে একটি আকস্মিক ঘটনায় আমি লুৎফর রহমানের পাশের সিটে যেভাবে ঠাঁই করে নিয়েছিলাম, সেখান থেকে উৎখাত হতে হয়েছিল। ওই সিটের যিনি আসল বর্ডার বা মালিক ছিলেন তিনি অকস্মাৎ দেশের বাড়ি থেকে ফিরে এসে বুড়ির হোটেলে তার সিটে আমাকে দেখে দারুণ অখুশি হলেন। কিন্তু আমি তাকে বিনয়ের সাথে বললাম, আপনার অনুপস্থিতিতে কয়েকদিন মাত্র এখানে শুয়েছি। এখন আপনি এসেছেন আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

আমাদের এ কথাবার্তার সময় বুড়ি নিচ থেকে উপরে উঠে এসে বললেন, এই ছেলে তুমি তোমার লেপ-তোষকসহ আমার পেছনে এসো। আমি তাকে অনুসরণ করে আমার গাঁটটি-বোঁচকাসহ এমন এক তর্জার ঘরে এসে হাজির হলাম, যেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে ওই খারাপ পাড়ার সীমানায় নির্মিত হয়েছিল। এসব ঘরে সাধারণত বুড়ির নিজের নাতি-নাতকরা বাস করত। আমি বুঝলাম, বুড়ি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে এখানে একটা চৌকিতে জায়গা করে দিলেন। পায়াভাঙা একটা টেবিলও বুড়ি কোত্থেকে এনে বসিয়ে দিলেন। দিলেন একটা টেবিল ল্যাম্পও। আমি আজ যখন এই ঘটনার কথা স্মরণ করি তখন বুড়ির উদারতার কথা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

এর মধ্যে সন্ধ্যার দিকে লুৎফর রহমান আমাকে বললেন, তোমাকে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ার আহ্বান করা হয়েছে। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

আমি বুঝলাম ময়ূখে এবং কলকাতার আরও কয়েকটি কাগজে আমার কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় সওগাত অফিসের ওই প্রগতিবাদী সংগঠনটি আমাকে দেখার আগ্রহে ডাক দিয়েছে। আমন্ত্রণটি জানিয়েছিলেন কবি বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর।

আমি নির্দিষ্ট দিনে আমার সবচেয়ে ধোপ-দুরস্ত একটি খদ্দরের পাঞ্জাবি-পাজামা এবং সেই রাবারের স্যান্ডেল পরে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের অনুষ্ঠানে হাজির হলাম। সাথে লুৎফর রহমানও আছেন। সেখানে যাওয়ামাত্র আমাকে বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তিনি আমার সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করলেন। আমাকে একটি বেঞ্চে বসিয়ে দেওয়া হলো এবং ওই প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। যতটুকু মনে করতে পারছি, সেখানে ড. আনিসুজ্জামানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বঙ্কিচন্দ্রের ওপর তার গবেষণামূলক একটি বিষয় নিয়ে আসরে প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন।

আসর শুরু হলে প্রথমে তিনি বেশ কিছুক্ষণ তার ওই গবেষণামূলক রচনা থেকে পাঠ করে শোনালেন। তারপর শুরু হলো গল্প ও কবিতা পাঠের আসর।

গল্প পড়লেন সেই সময়কার সবচেয়ে উদীয়মান কথাশিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ। আমি তখনও এ আসরের মূল সমালোচক খালেদ চৌধুরীকে চিনতাম না। তিনি আমার পাশেই বসে ছিলেন। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমাকে বললেন, আমার নাম খালেদ চৌধুরী। আপনাকে স্বাগতম। কী নাম যেন বোরহান বলল?

আমি বললাম, আল মাহমুদ।

ও হ্যাঁ, এ নামটা আমি কোথাও দেখেছি। এ সময় দু'জন সঙ্গীসহ আসরে প্রবেশ করলেন কবি শামসুর রাহমান। তার এক পাশে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একজন স্বাস্থ্যবান যুবক। নাম শহীদ কাদরী। অন্যজন শার্ট ও পাজামা পরা কবি ফজল শাহাবুদ্দীন। সম্ভবত আগেই এ আসরের নিত্য যাতায়াতকারীদের মধ্যে জানানো হয়েছিল আল মাহমুদ নামে একজন তরুণ কবি কবিতা পড়বে। কিংবা হয়তো কেউ জানতই না। এটা আমার আন্দাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প ও কবিতা পাঠের পর আমাকে তখনও পড়তে দেওয়া হয়নি। শুরু হলো সমালোচনা। প্রথমে ধরা হলো আলাউদ্দিন আল আজাদকে। খালেদ চৌধুরী তার গল্পটিকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন। তার আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল কঠোর মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ কিছুক্ষণ আগেও আমার ধারণা হয়েছিল গল্পটি ভারী সুন্দর এবং বাস্তবসম্মত। খালেদ চৌধুরী সাহিত্যের আবহাওয়ায় প্রচলিত নিষ্ঠুরতম বাক্যে আজাদকে নাকচ করে দিলেন। আজাদ তখন তার দুটি অসাধারণ গল্পগ্রন্থের জন্য পাঠকদের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। একটির নাম 'জেগে আছি', অন্যটি 'সৃষ্টি'।

আমার হৃদয় কেঁপে উঠল। আমি কোথায় এসে পড়েছি। আমার অদূরেই বসে ছিলেন অন্য একজন কবি কথাশিল্পী সায়ীদ আতিকুল্লাহ। তিনি সুখটান দিয়ে দিয়ে ধূমপান করছিলেন।

লেখককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হলে আজাদ তার গল্পটিকে শুধু সমর্থন করলেনই না বরং বললেন, এটি একটি জীবনবাদী গল্প এবং খালেদ চৌধুরীর আলোচনাকে তিনি মৃদু ভাষায় অসঙ্গত বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি ভালো করে লক্ষ করেছি যে, খালেদ চৌধুরীর অসঙ্গত আলোচনার মধ্যে তৎকালীন প্রগতিশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রবক্তাদের অদৃশ্য দৃঢ় সমর্থন ছিল। এরপর আমার ঠিক মনে নেই আর কেউ কিছু পড়েছিলেন কি-না। সবার মধ্যে দাঁড়িয়ে সহসা বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ঘোষণা করলেন, আজ একজন তরুণতম কবি এখানে কবিতা পড়তে এসেছেন। তার নাম আল মাহমুদ। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং আসরের সবার দিকে তাকিয়ে সালাম বললাম। পকেট থেকে মাত্রাবৃত্তে লেখা একটি মিলের কবিতা বের করে ভয়ে অশুদ্ধ উচ্চারণে চিঁ চিঁ শব্দে কবিতাটি শেষ করেই বসে পড়লাম।

কী আশ্চর্যের ব্যাপার! খালেদ চৌধুরী আমার কবিতাটির মিল ও ছন্দের প্রশংসা করলেন। বললেন, এর দ্বারা ভবিষ্যতে ভালো কবিতা হতে পারে।

আসরে চা পরিবেশন করা হয়েছিল কি-না তখন আমার আর মনে নেই। আমি ভয়ে সিগারেট পর্যন্ত ধরাতে পারছিলাম না। কারো দিকে তাকাতে পারছিলাম না। শুধু আড়চোখে শামসুর রাহমানের দিকে তাকালাম। কারণ তার কবিতা বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় আমি দেখেছিলাম।

৬

এবার সমালোচনার পালা। বোরহান কবিতা পড়ার পর একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে নিলেন। আলোচনার জন্য মনে হয় মনস্থির করতে পারছিলেন না কার নাম বলবেন। আমি তো ভয়ে খরগোসের মতো কান খাড়া করে আছি। বোরহান সম্ভবত একবার শামসুর রাহমানের দিকে তাকালেন। শামসুর রাহমান হাতের ইশারায় অসম্মতি জানালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়ীদ আতিকুল্লাহ সিগারেট ফেলে দিয়ে উদাসীন হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অবশেষে খালেদ চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে বিস্মিত করে আমার কবিতাটির প্রশংসা করলেন। বললেন, কবির জাগতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা কম হলেও ছন্দ বিষয়ে সর্বোপরি মিলের দিক দিয়ে সতর্কতা আছে বলে মনে হয়। আমি অবশ্য কবিতার ছন্দ নিয়ে মাত্রা গুনে দেখে কথা বলতে পারব না, কিন্তু মিলগুলো বালকোচিত নয়। লিখতে হলে এই কবিকে সমাজ বাস্তবতা সম্বন্ধে ব্যাপক পড়াশোনা করতে হবে। তিনি এই প্রথম আমাদের সভায় কবিতা পড়লেন। আমি তাকে স্বাগত জানাই। বলে এককথায় বক্তৃতা শেষ করে আমার পাশে এসে বসলেন।

এরপর চা পর্ব শুরু হলো। আমি স্বস্তি পেয়ে শামসুর রাহমানের সামনে গিয়ে তার সাথে যেচে পরিচিত হলাম। তার পাশে যে দু'জন বসেছিলেন তারা এক রকম অবজ্ঞা ভরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। এদের একজন শহীদ কাদরী, অন্যজন ফজল শাহাবুদ্দীন। কিন্তু আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, একটু আগে আমার মাত্রাবৃত্তের কবিতাটি এর মধ্যে ঈষৎ, আলতোভাবে তাদের স্পর্শ করেছে। হয়তো বা। কিংবা এমনিতে কৌতূহল।

আমি শামসুর রাহমানের পার্শ্ববর্তী দু'জনের একজনের কবিতা পত্রত্রিকায় নিয়মিত দেখে থাকি। তার নাম ফজল শাহাবুদ্দীন। ছিমছাম শীর্ণকায় শরীর। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। মাথায় ঘনচুল। চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি। অন্যজন শহীদ কাদরী। আমি তখনও তার কোনো কবিতা কোনো পত্রপত্রিকায় পাঠ করিনি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। একটু মোটাসোটা শরীর। ঘন চুল ঈষৎ কোঁকড়ানো পেছন দিকে ব্রাশ করা। চোখ একটু উদাসীন এবং আঙুলের ফাঁকে দামি সিগারেট।

চা খাওয়া শেষ হলে আসর ভঙ্গ হলো। আমি শামসুর রাহমানের সাথে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য তার গ্রুপটিকে অনুসরণ করে সওগাত অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। শামসুর রাহমান বাঁ দিকে মোড় নিয়ে বললেন—আমি আসি।

পরে জেনেছিলাম তার বাড়ি লায়ন সিনেমার সামনে অশোক লেনে। সেখানে তার পিতার একটি প্রেস ছিল। ইউনিভার্সাল প্রেস। আমি তখনও জানতাম না শামসুর রাহমানদের আদি বাড়ি রায়পুরা থানার পাহাড়তলী, মেঘনার পাড়ে। শামসুর রাহমান বাড়ির দিকে রওনা দেওয়া মাত্রই আমাকে শহীদ কাদরী কনুই আকর্ষণ করে টানল আরে ইয়ার চলো আমাদের সঙ্গে। শামসুর রাহমান তো বাড়ি গেলেন, আমাদের সঙ্গে চলো বিউটি বোর্ডিংয়ে গিয়ে বসি। তোমাদের সাথে একটু খোশগল্প করি। এ কথায় দেখলাম ফজল শাহাবুদ্দীনও হাসছে। আমি এদের অনুসরণ করে বাংলাবাজারের পথ ধরলাম। বিউটি রেস্তোরাঁয় এসে দেখি রেস্তোরাঁটির সামনের চত্বরে খালি জায়গায় অনেক গ্রুপ গোল গোল হয়ে বসে আলো-আঁধারিতে আড্ডা মেরে চলেছেন। আমরা সোজা গিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। তখনও আমার জানা ছিল না যে বিউটি বোর্ডিংয়ের রাস্তার পাশেই কাদরী সাহেবের আস্তানা। একটি পুরনো দোতলা বাড়ির উপরতলায়। এক সময় কাদরী সাহেব এখানে থাকতেন। আর ফজল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহাবুদ্দীনের আদি বাড়ি আমাদের এলাকায় হলেও অর্থাৎ নবীনগর থানার শাহপুর গ্রামের বাসিন্দা হলেও এরা বহুকাল যাবৎ পিতার চাকরির সুবাদে ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠিত। ওই সময় থাকতেন কমলাপুরে।

এখানে এসে ফজল ও শহীদ কাদরীর সাথে আলাপ-আলোচনায় আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বুঝলাম পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের আদর্শগত টার্গেট মার্কসবাদের সাথে এদের মৌলিক বৈপরীত্য আছে। এরা শামসুর রাহমানের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী রোমান্টিক বাসনার সন্তান। আমি এদের খুব পছন্দ করে ফেললাম। মনে হলো আমি একটা দিগভ্রান্ত বালিহাঁস হঠাৎ একটা হাওরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এখানে আমি শহীদ কাদরীর বিদ্যাবত্তা, তাদের ঢাকায় রিফুজি হয়ে আসার কথা জানতে পারি। জানতে পারি যে কাদরী সাহেবের মরহুম আব্বাজান কলকাতার একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন। যে পত্রিকাটি আদর্শগত দিক থেকে মুসলিম স্বার্থের অনুকূল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ সম্বন্ধে এদের বিরূপ মন্তব্য, উচ্চহাস্য ও টীকা-টিপ্পনি আমাকে সাহসি করে তুলল।

প্রথম সাক্ষাতে এদের কথাবার্তায় আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম, মনে প্রশ্ন জেগেছিল এরা কারা? আমি কাদের পাল্লায় পড়েছি? পরে একটু একটু করে বুঝতে পেরেছিলাম এরাই মস্ত শহরে আমার সুহৃদ হওয়ার মতো ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে যে সময় আমি অন্য কাউকে এমন কবিতাঅন্তপ্রাণ, বিদ্বান এবং অল্প বয়সে বেশি পাঠে প্রাজ্ঞ আর কাউকে পাইনি। আমি মুগ্ধ হয়ে এদের কথা শুনতাম। ওদের পাঠ্য বিষয় পাঠ করতাম এবং এদের মতো জাস-জুতো এবং কলম ব্যবহার করতাম। হঠাৎ আমি এই নব্য ঢাকাইয়া কবিতায় শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী ও ফজল শাহাবুদ্দীনের চুম্বকে অভিভূত হয়ে গেলাম। এ প্রসঙ্গে আরও কথা নিশ্চয় এই রচনায় সামনে বিস্তারিত মেলে ধরা যাবে।

অনেক রাত আমি নবাবপুর বেশ্যাপল্লীর পাশে আমার তর্জার ঘরে ফিরে এলাম। হোটেল তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ রাত ১২টার পরে লঙ্গরখানার মতো ওই হোটেলটি আর চালু থাকত না।

আমার ছাপড়ার ঘরের তালা খুলে টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে দেখি একটি প্লেটে থালায় ঢাকা ভাত-তরকারি। দেখেই মনটা খুশি হয়ে গেল। রাতে অভুক্ত থাকতে হবে না। আমি একটা টিউবওয়েল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। আলু ভাজি, কাঁচকি মাছের ঝোল আর ডাল। অমৃত সমান মনে হলো। খাওয়া শেষ করে যখন একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বিছানায় পিঠ রেখেছি, এ সময় বেড়ার দরজা ফাঁক করে কে যেন এক নারীকণ্ঠ আমাকে ডাকল, হৈ যে মাস্টার সাব অত রাত কইথেক্কা আইলেন?

আমি এই আকস্মিক আহ্বানে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। কে ডকে?

দেখি আমার বেড়া ফাঁক করে কৌতূহলী দুটি চোখ আমাকে দেখছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাইল সকালে আমাকে একটা চিঠি লিখবার পারবেন? দুই টাকা দিমু, এক প্যাকেট সিগারেট দিমু। পারবেন না?

আমি বললাম, কী চিঠি, কাকে চিঠি?

আরে বুঝলেন না? আপনি কচি বাচ্চা নেহি?

আমার পিয়ারের মানুষকে। খুলনায় থাকে, খালিশপুরে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আপনি বলবেন আমি লিখে দেব।

লেখার মজুরিটা আগে চাই নাকি? নেন দুইটা টাকা। আর এই সিগারেটের প্যাকেট।

আমি একটু ইতস্তত করে টাকা ও সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বললাম, আপনার নাম কী?

আমার নাম?

খিলখিল হাসির শব্দ।

আমার নাম পরমা সুন্দরী। আমি নাচি, গাইতে জানি। আইবেন নাকি কাইল আমার ঘরে। পয়সা লাগব না। আমার চিঠিটা লেইখা দেবেন। বিরানি খাওয়ামু। বুড়ির হোটেলে খাইয়াত উচ্ছা ভাজির তিতা লাইগা গেছে পেঠের ভেতরে। সব জানি। একদিন আইসা আমার এখানে খাসির কলিজা ভাজি খাইয়া যান। কিন্তু কথা হইলো আমার ওই চিঠি লেইখা দিতে হইব। যখন যার কাছে কমু তার কাছে।

আমার হাতে দুটি টাকা আর বগা সিগারেটের একটি প্যাকেট থরথর করে কাঁপতে লাগল। ভেতরের শয়তান হিসহিস শব্দ তুলে বলল, কাল যা না। তুই তো মেঘ না চাইতে বৃষ্টি নামাইলি। যা বেটা কাল গিয়ে মজা করে আয়। আমি বেড়ার ফাঁকের কাছে মুখ এগিয়ে আনলাম।

আচ্ছা পরমা সুন্দরী তোমার আসল নাম কী?

মাস্টার ওরে বাব্বা পাগল হয়ে গেছে। এই আমার কাছে কাইল সকালে আসতে হবে। আমার চিঠি লেইখা দিতে হবে। আমার সাথে খাইতে হবে। আমি এর দাম দিমু। আমার সাথে দুস্তি করো আমি এর লাইগা জান দিমু। রাজি?

আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি জীবনে এ ধরনের কোনো আহ্বান বা প্ররোচনায় কখনও পড়িনি। সম্ভবত মেয়েটি কাঁপুনি ধরতে পেরে হাসল।

ওমা রাজি হইয়া গেছে। তয় আইয়ো। কাইল সকালে। যাইয়া কইয়ো না হুইবার চাই।

আবার খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ল পরমা সুন্দরী। আমি বিমূঢ় হয়ে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে গেলাম।

৭

আমি রাতে আর কোনো কাজই করতে পারলাম না। একটা সিগারেট টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সুখ স্বপ্নের এ ঘুম ছিল না। ছিল ভয়ের। আমি সকালে কীভাবে এত লোকের সামনে একটি প্রকাশ্য বেশ্যাপল্লীতে প্রবেশ করব। হায় খোদা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোর হলো বুড়ি নানির ভীষণ চেঁচামেচি ও দরজা ধাক্কানোর দাপটে। খিল খুলেই দেখি সামনে নানি।

এই ছ্যামরা খানকিদের সাথে কী বাতচিৎ করস? আমার বেড়া ভাইঙা পিরিত উপচায়া পড়ে? আবে আমার বেড়ার এত বড় ফোড়ল করছে কেউ গা? আমি ঠ্যাঙ ভাইঙা ফালামু খাড়া।

আমি বুঝলাম বুড়ির কাছে নিশ্চয়ই কেউ নালিশ করেছে। এমন কেউ যে ওপাড়ায় যাতায়াত করে। আবার রাভুর হোটেলেও আসা-যাওয়া করে।

এই ছ্যামরা এখনও তোর নাকে টিপ দিলে দুধ গলব। লুৎফর মিয়া কইছে খুব বড় ঘরের ছেলে তুমি। বাপ পরহেজগার, মাও বড় লোকের মাইয়া। সায়েরী করো, ভালোই; কিন্তু এ নাচনি খানকির সাথে আর কথা কইবি তয় আমি তোমারে হোটেল থেইকা খেদায়া দিমু। বুঝলা। যাও হাত-মুখ ধুইয়া নাশতা খাও গিয়া।

সাধারণত আমার সকালবেলার রুটিন ছিল ঘুম থেকে উঠে দোতলায় অন্য এক প্রুফ রিডারের ঘরে গিয়ে সংবাদপত্র দেখা। এককালের নাম করা সনেটিয়ার। দেখতে স্বাস্থ্যবান খাটো মানুষটি। আমাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি আমার একটি ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ ছেপে আমাকে খেলাঘরের সাথে যোগ করতে চেয়েছেন। তিনি সংবাদের খেলাঘর আসরটি সম্পাদনা করতেন। তিনি আমার সাথে ওই খেলাঘর আসরের নিয়মিত লেখক-কবি ওমর আলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্যেই ওমর আলী পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদেও কবিতা পাড়ার সুযোগ পেয়েছেন বলে আমার জানা ছিল। আমি হাত-মুখ ধুয়ে বুড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাধারণত নাশতা বলতে এ হোটেলে ভাতই খাওয়ানো হতো। কারণ হোটেলে যারা থাকত তারা নিম্নশ্রেণির, গরিব নিম্নশ্রেণির মানুষ। বুড়ি সকালে গরম ভাত কোনো ভাজিসহ পরিবেশন করত। আমাকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন।

আমি এসব আজ খাব না। আমি এত সকালে ভাত খেতে পারি না।

ও তেল অইছে। তয় কী খাইবা? ওই খানকি মাগী তোমারে খাওনের পয়সাও দিছে নাকি! এই পোলা কী খাইবি?

আমি অত্যন্ত নরম হয়ে সুর নামিয়ে বললাম, নানু আজ ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না। বাইরে গিয়ে নান রুটি আর নেহারি খেতে মন চাইছে।

আমার নম্র সুরে বুড়ি মুখ তুলে তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ছালার নিচে হাত দিয়ে একটা আধুলি বের করে আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, লও। মন চাইছে নেহারি খাও; কিন্তু বেড়া দিয়া চুবি দেবা না। বুঝলা ভালো মাইনষের পুত। যাও ভাগ।

আমি আধুলিটা হাতে নিয়ে মুখ ফেরাতেই দেখি কাগজওয়ালা সংবাদপত্রটি দোতলায় দিয়ে যাওয়ার জন্য সাইকেলে তালা লাগাচ্ছে। আমি বললাম, দিন আমার কাছে। আমি পৌঁছে দেব। সেদিন ছিল সাহিত্য প্রকাশের দিন। পত্রিকাটি খুলে দেখি এক বিরাট কবিতা 'বৃষ্টির পিবদে এক চড়ুই'—ওমর আলী। খুশি, আনন্দ ও ঈর্ষায় একেবারে থ হয়ে আমি কবিতাটি পড়তে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক-পা এক-পা করে সিঁড়ি ভেঙে কাগজটি যথাস্থানে রেখে আমি নাশতার জন্য বের হতে যাচ্ছিলাম। এ সময় দেখি বোগলের নিচে দৈনিক সংবাদ নিয়ে ওমর আলী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।

আল মাহমুদ আমার কবিতা ছাপা হয়েছে।

আমি বললাম, দেখেছি ওমর। খুব ভালো লেখা। চলো তোমাকে নাশতা খাওয়াব। বলতে বলতে ওমরকে নিয়ে আমি জংশন রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ওই রোডের পাশে অনেক ঐতিহ্যবাহী ঢাকাইয়া রেস্টুরেন্ট। তখন অতি ভোরবেলায় গরিব খদ্দেরদের জন্য নানরুটি, পরাটা এবং খাসির তেহারি, নেহারি অতি সস্তায় বিক্রি করত। দোকানে জায়গা পাওয়া যেত না। ভিড় লেগে থাকত। আমি ওমরকে নিয়ে কোনোমতে ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

নাশতা খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ওমর বলল, আমি একটি সুখবর নিয়ে এসেছি। আমি কৌতূহলী হয়ে ওমরের দিকে মুখ তুললাম। রেডিও পাকিস্তানে কবিতা পড়ার সুযোগ এসেছে। তুমি আর আমি। মুনীর চৌধুরীর উপস্থাপনায়। আসলে এ খবরটা তোমাকে দিতে এলাম। এ কথায় আমার মধ্যে একটা শিহরণ বয়ে গেল। সেটা আনন্দের নাকি অন্য কোনো আশঙ্কার তা ঠিকমতো বুঝতে পারলাম না। তখন রেডিও অফিস ছিল নাজিরাবাজারে। একদিন বা দু'দিন বাদেই ছিল প্রোগ্রামটি।

আমি ও ওমর আলী দুই বন্ধু গিয়ে যথাসময় হাজির হয়েছিলাম। মুনীর চৌধুরী তখনও এসে পৌঁছাননি।

রেডিও অফিসের গেটের ওপাশে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। সেখানে গিয়ে বসে চা-সিংগাড়া খাব আমাদের পকেটে অত পয়সা ছিল না। আমরা মুনীর ভাই আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় কে একজন পরিচিত লোক বলল, তোমরা কবি ফররুখ আহমদকে চেন? এসো পরিচয় করিয়ে দিই। এ কথায় তো আমরা খুশিতে বাগবাগ। ছেলেটা আমাদের হোটেলের ভেতর নিয়ে টেবিল আলো করে বসা লম্বা চুলওয়ালা দুধের মতো ফর্সা এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ইনি কবি ফররুখ আহমদ। ফররুখ ভাই এরা কবিতা লেখে। এর নাম আল মাহমুদ, উনি ওমর আলী। রেডিওতে এই প্রথম কবিতা পড়তে এসেছে।

ফররুখ আহমদ হাতের ইশারায় আমাদের দু'জনকে বসতে বললেন এবং ওয়েটারকে আমাদের দু'কাপ চা ও সিংগাড়া দিতে বললেন। আমরা ভয়ে দু'জনই কবতুরের মতো কাঁপছি।

কবি ফররুখ আহমদ! আমাদের চা-সিংগাড়া খাওয়াচ্ছে। এটা যেন স্বপ্নের মতো লাগছে।

ফররুখ ভাই আমাদের অবশ্য কোনো প্রশ্ন করলেন না। শুধু আমাদের মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে ছিলেন এটুকু মনে পড়ছে।

এই প্রথম আমাদের সাথে বাংলাভাষার একজন প্রধান কবি যার কবিতা ক্লাসে পড়েছি, সাক্ষাৎ হলো। চা খেয়ে আমরা মুনীর চৌধুরীকে তালাশ করতে ভেতরে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম। তাকে পেয়ে জীবনের প্রথম স্টুডিওতে মাইকের সামনে বসে পড়লাম। মুনীর ভাই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং অতিশয় সংক্ষিপ্ত কথায় আমরা যে অতি সাম্প্রতিক কাব্যাঙ্গনের মৌমাছি তা বলে দিলেন।

আমরা দু'জন পর্যায়ক্রমে দুটি কবিতা পড়ে গেলাম। ভয়ে, উচ্চারণে গলদ সৃষ্টি হওয়ায় যেন গলা দিয়ে রা বের হতে চায় না। তবে ওমরের কবিতাটা দীর্ঘ হওয়ার কারণে সে খানিকটা সামলে উঠতে পেরেছিল। আমি একেবারেই তা পারিনি। মুনীর চৌধুরী সমাপ্তিতে বলে দিলেন যে, আমার কবিতার বিষয়বস্তু ভালো; কিন্তু উচ্চারণ খুবই খারাপ। তিনি নিজে আমার কবিতার দুটি লাইন পড়ে শোনালেন। আমি খুবই শঙ্কিত হয়ে থাকলাম। তবে ওমরের কবিতার বিষয়বস্তু গল্পধর্মীয় হওয়ায় সে-ই সেদিন জিতে গেল। আমি মন ভার করে চেক নিয়ে ওমরের সাথে বেরিয়ে এলাম। কত টাকা পেয়েছিলাম এখন আর মনে নেই। শুধু মনে আছে আমার বিষয়বস্তুটা যে ভালো ও কাব্যময় তা মুনীর চৌধুরী উল্লেখ করেছিলেন। যদিও ওমরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এভাবে সাহিত্যে প্রচারধর্মিতায় আমাদের প্রবেশ ঘটল।

এর মধ্যে আমি কাজের খোঁজে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করতে লাগলাম এবং কাফেলায় নিত্য যাওয়া-আসাও করছি। বিকেলে চলে যাই বিউটি রেস্টুরেন্টে। শহীদ কাদরীকে পাওয়ার আশায়। শহীদ আমাকে দেখেই বেশ খুশি হয়ে ওঠে এবং ইউরোপীয় কবিতার জ্ঞানগম্ভীর ছেড়ে আমাকে সাহিত্য সম্বন্ধে পাকামি করার কায়দা-কানুন শেখাতে থাকলেন। আমি তার কথায় একেবারেই ভড়কে যাইনি। তবে গ্রাম্য সতর্কতার কারণেই আমি কাদরীকে বিশ্বাস করতাম না। দীর্ঘ মেলামেশার পর আজও করি না। ওর মধ্যে এক ধরনের অপমান করার, বিদ্রূপ করার, অবশেষে ক্ষতি করার একটা টেনডেন্সি আমি আজও দেখতে পাই। অবশ্য এটা যে শুধু আমার সঙ্গেই শহীদ করেছে তা না, সে করেছে নিজের জীবনের সাথেও।

মানুষ যে ধরনের জীবন আকাঙ্ক্ষা করে, আল্লাহ তাকে সে ধরনের জীবনের চারণই করে তোলেন হয়তো বা। কাদরী সাহেব সারাজীবন বিদেশেই কাটিয়ে দিলেন। অবশ্য এটাও আমি ভাবি এখানে থেকেই বা কী হতো? তার তো কোনো দেশ, দশ ও দায়িত্ববোধ ছিল না। এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে গুলিস্তান রেস্তোরাঁয় বসত, আর রাত ১০টার আড্ডা ভেঙে উঠে যেত। একটি রেস্তোরাঁয় দীর্ঘদিন কাটাতে না পারলে অন্য রেস্তোরাঁয় চলে যেত।

বিউটি বোর্ডিং থেকে রেকস রেস্টুরেন্টে সে জায়গাটা পুরনো হয়ে গেলে কিংবা অবিশ্রাম আড্ডায় বাধা সৃষ্টি হলে অন্যত্র চলে যেতে অসুবিধা কী। এক অদ্ভুত ধরনের শহুরে চরিত্র তৈরি করে নিয়েছিল কবি শহীদ কাদরী।

কিন্তু একটা বিষয় আমাকে তার প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল—সেটা হলো ক্রমাগত পড়ে যাওয়ার অক্লান্ত স্বভাব। ভালো খাওয়া ভালো পোশাক কাদরী সাহেব পছন্দ করত। কিন্তু যে বিষয়ে চর্চা ছিল তার প্রতিষ্ঠার কারণ সে ব্যাপারে আমার মনে হতো কাদরী সাহেবের এক ধরনের উন্নাসিকতা ছিল। অন্যকে বিদ্রূপ করার একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মগত স্বভাবের কারণেই শহীদ কাদরী অনেক বন্ধু পেয়েছিল এবং একই কারণে হারিয়েছিল। এই রচনায় তার কথা বারবার আসবে বলে আমি শুধু তার ব্যাপারে এটুকু ইঙ্গিত দিয়ে আমার ঢাকাইয়া জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার কাহিনিতে ফিরে যেতে চাই।

৮

এর মধ্যেই 'চাঁদধোয়া রাত' বলে আমি বেশ বড় একটি ছন্দের কবিতা লিখে ফেললাম। লেখাটি লিখেই সকালবেলা স্নানাহার শেষ করে সেজেগুঁজে কাফেলায় যাব ভেবে ঘরের বাইরে আসতেই লুৎফর রহমান আমাকে থামালেন। বললেন, এসো তোমাকে প্রুফ দেখার নিয়মটা শিখিয়ে দিই। মনে হয় দৈনিক মিল্লাতে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বেতন খুবই কম। পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর বেশি পাবে না। এতে অবশ্য তোমার হোটেলের খরচ ও সিগারেট এসবের ব্যয় মিটে যাবে।

আমি এ কথা শুনে কাফেলায় যাওয়ার প্রস্তুতির কথা চেপে রেখে লুৎফর রহমানের সাথে উনার বিছানায় গিয়ে বসলাম। তিনি প্রুফের কয়েকটি চিহ্ন আমাকে বোঝাতে লাগলেন। ফাঁক করতে হলে কী করতে হবে। ফাঁক ভরাট করতে হলে কী করতে হয়। কোন চিহ্ন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় দেখিয়ে দিলেন। তারপর একটি পত্রিকার প্রুফ দিয়ে কাটতে বললেন। আশ্চর্যের বিষয় আমি সব প্রুফ অবলীলায় কেটে গেলাম। তিনি বললেন মাথা তো খুব শার্প। গ্যালিটা তো বেশ ভালো করেই কাটলে, ইচ্ছে করলে ঢাকাতে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পার। যদিও ক্লাস করাটা নিয়মিত। তবুও ইচ্ছে থাকলে কি না হয়। কোথাও বের হচ্ছিলে নাকি?

আমি পকেট থেকে 'চাঁদধোয়া রাত' কবিতাটি লুৎফর রহমানকে পড়তে দিলাম। তিনি নিঃশব্দে পড়ে গেলেন। সুন্দর কবিতা— । যাও দিয়ে এসো। সন্ধ্যায় তোমাকে মিল্লাতে নিয়ে যেতে হবে। মনে হচ্ছে চাকরিটা এ সপ্তাহেই হয়ে যাবে।

দারুণ খুশিতে আমি ডগমগিয়ে উঠলাম।

কাফেলায় পৌঁছে দেখি একটা বিষণ্ণ অবস্থা। ওয়াছেকপুরীর কামরা বন্ধ। ভেতরে মনে হয় কেউ দু'জন তর্কাতর্কি করছে। আমি ডান হাতে প্রেসের দরজার ভেতর দিয়ে গিয়ে আফজাল মিয়ার কম্পোজ সেটআপের পাশে দাঁড়ালাম।

এই যে আসুন। আপনি এসেছেন ভালো হয়েছে। ভেতরে এখন লঙ্কাকাণ্ড চলছে। আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?

আমি বললাম, কীভাবে?

বেশ কয়েকটা প্রুফ জমে গেছে। ভেতরে নিয়ে যেতে পারছি না—এক নজর দেখে দেবেন? আপনি কি প্রুফ পড়তে জানেন?

আমি বোকার মতো বলে ফেললাম, পারি। দিন দেখি। আমি পাশের টুলের ওপর প্রুফগুলো মেলে দিলাম। দুটি লম্বা গ্যালি আর তিনটি কবিতা। আমি আগে কবিতাগুলো দেখলাম এবং সদ্য শেখা প্রুফ রিডিংয়ের চিহ্নগুলো বসিয়ে সংশোধন করতে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফজাল বলল, আরে বেশ—আপনি তো দেখি প্রুফ রিডিংও জানেন। আপনি এক কাজ করুন, আমি প্রফ ধরি, আপনি ওই লম্বা প্রুফগুলো পড়তে পড়তে কেটে যান। দুপুরে মেকআপ। বলুন তো ওয়াছেকপুরী সাহেব না দেখলে এগুলো কি পড়ে থাকবে?

আমি জবাব দেওয়ার আগেই নাজমুল সাহেব কখন যে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন আমি বুঝতে পারিনি। তিনি অবাক হয়ে আমার প্রুফ কাটা দেখছেন।

তারপর মুখ তুলে আফজালের দিকে তাকিয়ে বললেন, একে দিয়ে প্রুফে. কাজটি করিয়ে নিন। পকেট থেকে দশটি টাকা বের করে বললেন, নাও। তুমি বরং নিয়মিত এখানে সকালে এসে কাজ করতে থাক। সম্পাদনার কাজটা এবং কপি দেওয়া আমিই প্রতিদিন এখন থেকে করব। ওয়াছেকপুরী কাল থেকে থাকছে না। আমি তার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি। বলেই নাজমুল সাহেব প্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন এবং ঘাড় ফিরিয়ে আফজালকে বললেন, এর লাঞ্চেরও ব্যবস্থা করেন। বলেই পকেট থেকে আরও পাঁচ টাকার একটি নোট আমার হাতে দিলেন।

আমি তো স্তম্ভিত।

মনে মনে ভাবলাম, এটা কি আমার ভাগ্যচক্র ঘুরে যাওয়ার ব্যাপার! আজ রাতেই আমার মিল্লাতে হয়তো বা কাজ শুরু হবে এবং দিনের কাজও এখানে জুটে গেল। কত পাব?

যদি কাফেলা আমাকে মিল্লাতের চেয়ে একটু বেশি দেয় তাহলেই আমার দারিদ্র্য ঘুচে যাবে।

কাজ শেষ করে আমি ওয়াছেকপুরীর রুমে ঢুকলাম। তিনি গম্ভীর মুখে একটা চামড়ার ব্যাগে কাগজপত্র ভাঁজ করে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। আমাকে ঢুকতে দেখে হাসলেন। এই যে কবি এসো, লেখা দিতে এসেছিলে? আমি বললাম, একটা কবিতা।

পকেট থেকে 'চাঁদধোয়া রাত' বের করে তার হাতে দিলাম। তিনি কবিতাটি পড়লেন এবং খুব উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে আফজাল বলে একটা ডাক দিলেন।

আফজাল সাহেব এসে দাঁড়াতেই বললেন, এই হলো আমার মনোনীত শেষ কবিতা, এই কবিতাটিকে প্রথমে দিয়ে কবিতার পৃষ্ঠাটা মেকআপ করো। আমি আজ থেকে ইস্তফা দিয়ে যাচ্ছি। পত্রিকা হক সাহেব নিজেই দেখবেন। তা না হলে তার স্ত্রীই দেখবেন। বলেই তিনি ঘর্ঘর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

আমি যদিও ওয়াছেকপুরীর এ চাকরি ছাড়ার মধ্যে আমার একটা সুযোগের আভাস পেলাম, কিন্তু আজ অকপটে বলতে চাই ওয়াছেকপুরী ভাইয়ের ওই সাজানো আসরটিতে আমাকে বড়ই বেমানান ভেবেছিলাম। দুঃখে মনটা একটু বিমর্ষও হয়েছিল।

পরে অবশ্য আমি ওয়াছেকপুরীর অনেক সুখে-দুঃখে সঙ্গ দিতে পেরেছিলাম। এমনকি তার প্রথম স্ত্রী হালিমা খাতুনের সাথেও আমার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। তখন ওয়াছেকপুরীর প্রথম পুত্র জঙ্গীর জন্ম হয়েছিল। জঙ্গীর ওপর ওয়াছেকপুরী একটি অসাধারণ কবিতা লিখেছিলেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সারাদিন কাফেলায় বসে কাজ করে গেলাম। বেরোবার একটু আগে অফিসে এসে ঢুকলেন এক দীর্ঘাঙ্গিনী অত্যন্ত সুন্দর এক মহিলা। কাজী লতিফা হক। এই পত্রিকার সম্পাদক কাজী নাজমুল হকের স্ত্রী। তিনি কবিতা ও গান লিখতেন। তিনি ওয়াছেকপুরীর কামরায় আমাকে দেখে হাসলেন। আমি উঠে দাঁড়িয়েছি দেখে বললেন, ও আপনি, বসুন।

হক সাহেব আমাকে বলেছেন, আপনি খুব ভালো লেখেন। এখন থেকে আপনি এ কাগজটা দেখাশোনা করবেন। মাঝে মধ্যে আমি এসে সাহায্য করার চেষ্টা করব। তবে আমার ওপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। দুটি বাচ্চা সামলাতেই আমি হিমশিম খাই।

আমি এখনও লতিফা হকের চেহারাটি স্মরণ করতে পারি। অসাধারণ মাতৃমহিমায় উজ্জ্বল উষৎ শ্যামবর্ণা দীঘল চোখের অধিকারিণী এ মহিলাকে আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল রেখেছি। কারণ পরে আমার মতো একজন অসহায় কবির তিনি আশ্রয়দাত্রী হয়েছিলেন। আমি তার দুটি ছেলেকে অল্প কয়েক দিন ইংরেজি পড়িয়েছিলাম। এর মধ্যে একটি ছেলের নাম এখনও মনে আছে, তারেক। লতিফা হক ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিক নেত্রী নূরজাহান মোর্শেদের সহোদরা এবং অধ্যাপক সারওয়ার মোর্শেদের শ্যালিকা।

আফজাল আমাকে দুপুরে তার সাথে খাওয়ার আহ্বান জানালেন। যদিও আমাকে হক সাহেব লাঞ্চের টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। আফজালের আগ্রহে তার সাথে আহার্য গ্রহণ করলাম। এভাবে তার সাথে স্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যা আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকি।

সারাদিনের কাজ গুছিয়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। তখন বিউটি রেস্তোরাঁটা ছিল আমার কাছে নেশার আকর্ষণের মতো। গিয়েই সেখানে শহীদকে পেয়ে গেলাম এবং বললাম কাফেলার জন্য একটা কবিতা দিতে।

কী ব্যাপার!

মনে হচ্ছে কাফেলা পত্রিকাটি আমাকেই দেখতে হবে।

ও! বহুত আচ্ছা। ওয়াছেকপুরী ভাগোরাই?

আজই চাকরি ছেড়ে গেলেন!

কনগ্র্যাচুলেট আল মাহমুদ! তাহলে দাওয়ার চালে কিস্তিমাত?

আমিও তার সাথে হাসলাম যদিও। বিষণ্ন হাসি।

অতি উৎসাহে শহীদ কাদরী চেঁচিয়ে উঠল। এই প্রহ্লাদ বাবু। এই বেকার কবি পাশা উল্টে দিয়েছে। কাফেলায় ঢুকে পড়েছে। দু'কাপ চা লাগান। এই গাঁইয়া কবিকে একটু খাতির করি। পাশের টেবিল থেকে একটি ফর্সা তরুণ হো হো করে হেসে উঠল।

আমি এখানে শহীদদের সাথে চা-টা খেয়ে বললাম, কাদরী সাহেব আজ সন্ধ্যার দিকে একটু মিল্লাতে যেতে হবে। মনে হয় সেখানেও কিছু হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই নাকি? এ তো দেখি রাজ-রাজড়ার মতো কথাবার্তা।

আমি হাসলাম।

চলো দোস্ত তোমাকে রাইসার বাজার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। মনে হয় পকেটে মাল আছে। আমাকে তাহলে একটা সিগারেটের প্যাকেট কিনে দিও।

আমি কাদরী সাহেবকে সাথে নিয়ে নবাবপুরের দিকে হাঁটা দিলাম। ঢাকা শহরটাকে মনে হলো এক গুঞ্জনমুখর আনন্দপুরীর মতো। কি যে ভালো লেগেছিল এ ঢাকা শহরকে। ওই চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনার মুহূর্তে তা কী আর বলব।

পৃথিবীর কত শহর তো আমি ঘুরেফিরে বেড়ালাম। কিন্তু সেই যে পঞ্চাশ দশকের ঢাকা মহানগরীর মোহ আমাকে কোথাও দীর্ঘস্থায়ী হতে কিংবা প্রবাস যাপন করতে লুব্ধ করেনি। আজও করে না। যে শহর জীবিকা দেয়, সে শহরের প্রতিটি গলি, ঘুপচিও আমার কাছে প্রিয় মনে হয়। ঢাকা ছাড়া কোথাও গিয়ে এক সপ্তাহ থাকতে আমি হাঁসফাঁস করে উঠি। মনে হয় ঢাকাই আসলে আমার চিরপ্রিয়তমা মহানগরী। এখন এর মেট্রোপলিটন রূপ, যানজট, বোমাবাজি, রাজনৈতিক খেয়োখেয়ী, সন্ত্রাস কোনো কিছুই এ মহানগরীর গৌরবকে, নিরপেক্ষতাকে, অসাম্প্রদায়িকতা এবং ধ্যানমগ্নতাকে বিবর্ণ করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ তার নগর সম্পর্কে লিখেছেন–

"হে নগরী তব ফেনিল মদ্য
উছসি উছলী পড়িছে সদ্য
আমি তাহা পান করিব অদ্য
বিস্মৃত হব আপনা।"

আমাকে আমার সাহিত্য শুরু করার প্রথম দিন থেকে বলা হয়ে এসেছে যে, আমি গ্রামবাংলাকে আমার রচনার বিষয়বস্তু করে আসলে জসীম উদ্‌দীনের লাইনে অগ্রসর হয়েছি। সন্দেহ নেই জসীম উদ্‌দীন আমার অতি প্রিয় কবি; কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়, আমি জসীম উদ্‌দীনের কবিতার বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করিনি। জসীম উদ্‌দীনের বিষয়বস্তুর সাথে আমার কোনো পরিচয় নেই। এমনকি আমি জীবানন্দ দাশের কাব্যে সামান্য অভিভূত হলেও আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম আমি যে বাংলাদেশের কথা বলতে চাই সেটা শুধু আমারই বাংলাদেশ। সে বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে গ্রামছাড়া আর কিছুই নেই। এমনকি এ মহানগরীকেও সর্বদিক থেকে সর্বগ্রাসী গ্রাম এসে গিলে ফেলেছে।

৯

আল্লাহর কী অসীম করুণা আমার দুটি চাকরিই হয়ে গেল। এখন আমি আর লুৎফর রহমানের গলগ্রহ নই।

দিনে কাফেলায় প্রায় দুটো পর্যন্ত কাজ করি। এসে হোটেলে স্নানাহার করি এবং রাত পর্যন্ত একটানা ঘুমাই। রাতের খাওয়ার পর চলে যাই মিল্লাতের প্রুফ সেকশনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক রাত পর্যন্ত, অন্তত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত মিল্লাতে থাকতে হয়। মিল্লাতের মালিক ছিলেন মোহন মিয়া। মিল্লাতে তখন বেতন-ভাতার জন্য আন্দোলন চলছে। সাংবাদিকদের প্রশমিত করতে একবার শেরেবাংলা একে ফজলুল হক এসে একটা বৈঠক করেছিলেন। তার কথাকে অনেক মূল্য দিয়ে সাংবাদিকরা তাদের স্ট্রাইক তুলে নিয়েছিলেন; কিন্তু মিল্লাতের আর্থিক অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আমি অবশ্য অতি সামান্য বেতন পেতাম। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, বেতনটা ছিল পঞ্চাশ টাকা। আর কাফেলা থেকে সাকুল্যে আমি পেতাম দেড়শ' টাকার চেয়ে হয়তো বা দশ-বিশ টাকা বেশি। এতে আমার বেশ একটু সচ্ছলতা এসে গেল। থাকা-খাওয়ার জন্য ব্যয় হতো চল্লিশ টাকার মতো। বাকি সব টাকা আমার ব্যক্তিগত আড্ডাবাজি, বইপত্র কেনা এবং সুন্দর শার্ট-প্যান্ট পরার শখ মেটানোর।

আগে রাবারের স্যান্ডেল পরে ঢাকায় এসেছিলাম। এখন বাটার সুন্দর মজবুত জুতা-মোজায় পদদ্বয়কে সজ্জিত করলাম। এমনভাবে হাঁটতাম মনে হতো প্রাণশক্তি আমার পায়ে এসে জমা হচ্ছে। তবে পারিবারিক অভ্যাসের কারণে আমি অন্যান্য তরুণ কবির মতো বেতমিজ ছিলাম না। এখনও আগে মুরব্বিদের সালাম দেওয়ার অভ্যাসটি আছে।

বুড়ি আমাকে এখন প্রায় চোখে চোখে রাখছে। কারণ আমি হোটেলে সবচেয়ে নিয়মিত বোর্ডার। মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে টাকা-পয়সা গুনে দিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে এমন সব মানুষের আনাগোনা আছে, যারা কবিতা লেখে। মাঝে মধ্যে বুড়ি আমার অতিথিদের মাগনা চা খাইয়ে দেয়।

একদিন খুব ভোরবেলা বেড়ার ওপাশ থেকে পরমা সুন্দরীর গলা পাওয়া গেল।

এই মাস্টার আমারে দেখবার তোমার ইচ্ছে অয় না? এক্ষণ গলির মুখে যায়া খাড়াও। আমি রাস্তায় রুটি কিনতে যামু। বলেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি কবুতরের মতো কাঁপছি।

গায়ের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে দ্রুত কুয়ার পাড়ে এসে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপর বেড়ালের মতো নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালাম নবাবপুরের শেষ মাথায়। বেশ্যাপল্লীর গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে আছে ছিপছিপে ফর্সা এক যুবতি। মনে হলো আমার থেকে এক-আধা বছরের বড়ই হবে। কিংবা সমবয়সী। তখনও লোক চলাচল শুরু হয়নি। আমাকে হাতের ইশারায় মোড়ের দিকে যেতে ইঙ্গিত করল। আমি অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো হেঁটে ঠিক মোড়ের পাশে একটা চশমার দোকানের বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। এখানে একটি মোটা ফ্রেমের চশমা পরা সালোয়ার-কামিজে সজ্জিত ঢাকাইয়া মেয়ে কাজ করত। সে সবে দোকানটা খুলেছে।

আমাকে দেখে ভাবল, আমি বুঝি কোনো খদ্দের হব। চশমা নিতে এসেছি। মেয়েটি বলল, একটু দেরি হবে। আপনি ইচ্ছে করলে ভেতরে এসে বসতে পারেন।

আমি সোজা ভেতরে গিয়ে একটা টুলে বসে পড়লাম। মেয়েটি ঝাড়-মোছ করতে করতে আমাকে দেখছিল। এ সময় পরমা সুন্দরী এসে বারান্দায় দাঁড়াল। আমার গা কাঁপছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মাস্টার এত ডরাও ক্যা? আমি কী তোমার খাইয়া ফালামু? তোমার দেখবার সাধ ছিল না? এই দেখ আমি। তোমার সাথে তো খাতির করতে চাই একটা চিঠি লেখাইবার জন্য। তুমি আমার ঘরে আইবা খুব ভোরবেলা। ব্যাস, আমি গেলাম। তুমি তো কাঁপতাছ। দেইখো আবার এই কানির সাথে ভাব কইরো না। বলেই খিলখিল করে হেসে পরমা সুন্দরী অন্তর্হিত হলো।

মেয়েটি বেশ অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও মা এটা আবার কেমন কথা! আপনি চশমা নিবার আহেন নাই? এই খানকির সাথে আবার খাতির ক্যামনে? মরবেন! পাড়ায় ঢুকবেন না। আমি ঝিম মেরে টুলের ওপর বসে কাঁপছি দেখে হয়তো বা চশমাওয়ালির অনুকম্পা হলো। একটু হেসে বলল, আমি এখন চা-নাশতা খাব। আমার সাথে এক কাপ চা-নাশতা খাইবেন? আপনি কেউ গা?

এ কথায় আমি উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কী আশ্চর্য! মেয়েটা হঠাৎ আমার হাত ধরে ফেলল। আরে আপনি তো কাঁপছেন মিয়া! রাস্তায় পইড়া যাইবেন, বহেন ভেতরে। আমি পাশের দোকান থেকে নাশতা নিয়া আহি। বলেই পাশের দোকানে চলে গেল। দোকানে আমি একা।

চশমাওয়ালির একটু বিবরণ দিই। দেখতে ফর্সা, লম্বাটে মুখ এবং চিবকুটা একটু ভোঁতা ধরনের। পুরো কাচের কালো ফ্রেমের চশমা পরে আছে। চুলের বেণী বাসি হয়ে ঝুলছে। কিন্তু মুখখানাতে মায়া মেশানো।

একটু পরই থালায় করে সে চা-রুটি আর তরকারি নিয়ে ঢুকল।

আমার নাম নয়ন। আমি এ রাইসা বাজারেরই মেয়ে। বাপ-মা কেউ নেই। দোকানটা মামুর। র‍্যাংকিন স্ট্রিটের পাশে আমার মামুর একটা কারখানা আছে। ফ্রেম, গ্লাস এসব ফিট করার। আপনি কই থাকেন?

আমি বললাম, বুড়ির হোটেলে।

আরে ওটা তো খানকিপাড়ার লাগোয়া। ওইখানে আবার ভালো মানুষ থাকে নাকি?

আমি চুপ করে থাকলাম। আমার ভেতরে এখন একটা ঝাঁকুনি চলছে। ঠিকমতো চায়ের কাপটা ধরে রাখতে পারছিলাম না। কাঁপুনিতে ছলকে যাচ্চিল। নয়ন আমাকে তার নয়ন মেলে ভালো করে পরখ করছিল। কী করেন?

লিখি। পত্রিকায় চাকরি করি।

ছাংবাদিক?

হ্যাঁ।

তয় এই খানকির সাথে খাতির হলো কিবায়?

আমি কোনো জবাব দিলাম না। চা শেষ করে বললাম, নয়ন আমি তাহলে আসি।

মাঝে মধ্যে আসবেন। আপনার কাঁপুনি-ঝাঁকুনি দেইখা বুচ্ছি আপনি খুব ভালো মানুষ। বুড়ির হোটেল আমি চিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। গলিতে ঢুকলেই বুড়ির সামনা-সামনি। এই পোলা সায়েরি করবার কই গেছিলি?

আমি বুঝলাম যে আমি কোথায় গিয়েছিলাম বুড়ি সেটা জানে না, ভাবতেও পারেনি।

আমি হাসলাম। কই আবার যামু নানি। ভোরবেলা নবাবপুর দেখি। ঘোড়ার বাগ্যি দেখি, ভিস্তিওয়ালা দেখি। এসব নিয়া কবিতা লিখুম তো।

আরে পোলা তোমার ঘরে যে মেমান আইয়া বইয়া রইছে।

এ কথায় আমি হকচকিয়ে গেলাম; মেহমান!

আমি তাড়াতাড়ি বুড়ির পাশ কাটিয়ে আমার ছাপড়ায় গিয়ে দেখি আমার বিছানার ওপর দুই পা শটান করে শুয়ে আছে শহীদ কাদরী। ঢোকামাত্রই বলল, ইয়ার নাশতা খাওয়াও। তোমার এ বুড়ির হোটেলের জঞ্জালে আমার পোষাবে না। আমাকে গরুর গোশত আর চাপাতি খাওয়াতে হবে। তুমি এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে আল মাহমুদ?

আমি হেসে বললাম, ঢাকার ভেতরটা দেখছি কাদরী সাহেব! যা আপনি কোনো দিন দেখতে পারেন না। মানুষ এত সুন্দর, এত ভালো। কিন্তু তাদের বাইরের দিকটা দেখে বোঝা যায় না। আজ হঠাৎ আমার খুব বাড়ির কথা মনে পড়ছে। মনে হয় আমি সব সুখ-আনন্দ স্বাধীনতা ফেলে এখানে চলে এসেছি। এখানে থাকতে হলে আমাকে খুব দাম দিতে হবে কাদরী সাহেব। আমি সারা ঢাকা শহরটাকে যদি কিনতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো।

সাথে সাথে শহীদ কাদরী বললেন, কিন্তু আমি কিছুই কিনব না। দেখব, ঘাঁটব, থরে থরে সাজানো এই বিপণির ভেতর দিয়েই যাব। কিন্তু কিছুই কিনব না। তারপর উচ্চ হাসি।

১০

পরের দিন সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে দেখি আমার বিছানার ওপর একটা পোস্টকার্ড পড়ে আছে। লেখা দেখে চমকে উঠলাম। আমার চাচার হাতের লেখা অতি স্পষ্ট সুন্দর অক্ষর। আমার ডাকনাম উল্লেখ করে এবারত শুরু হয়েছে, 'বাবা পিয়ারু তোমার আব্বার নির্দেশে তোমাকে এ পত্র লিখিতেছি। তাহার একান্ত ইচ্ছা তোমাকে বিবাহ করান। এ উদ্দেশ্য লইয়া তোমার আব্বা পয়ালগাছার এক সম্ভ্রান্ত বংশে তোমার জন্য এক পাত্রী পছন্দ করিয়াছে। পাত্রীপক্ষের লোকেরা আগামী রবিবার তোমাকে দেখিতে আসিবে। তোমার মামু মহারাজ মিয়া অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিয়াছে। তুমি শনিবার দিন রাত্রির গাড়িতে বাড়ি ফিরিয়া আইস। দেখিও যেন অন্যথা না হয়।'

আমি চিঠি পেয়ে হতভম্ব। বলে কী! আব্বা আমার জন্য পাত্রী দেখে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য আমি এ কথাও আজ স্বীকার করি যে, হঠাৎ যেন আমার মনেও এই প্রস্তাবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে নারী সঙ্গের এক ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। ওই বয়সে কেন এটা হয়েছিল তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। কিন্তু আমার পিতা যে সঠিক সময় আমার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শনিবার দিন রাতে আমি ফুলবাড়িয়া স্টেশনে গিয়ে চট্টগ্রামগামী মেইল ট্রেনে চেপে বসলাম। মিল্লাতে আমার ডে অফ ছিল। কাফেলার আফজাল জানত যে, আমি শনিবার দিন বাড়ি চলে যাই। একদিন কাটিয়ে শেষ রাতে ফিরে আসি। আমার জন্য ছুটির কোনো দরকার ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়া তখন যেন দু'ঘণ্টার, এখনও তেমনি আছে। এখানে উল্লেখ্য, ঢাকা থেকে আমার বাড়ি দুই ঘণ্টার হওয়ায় আমি জীবনে অনেক ভুল করেছি। আমি ঢাকায় কখনও স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলতে চাইনি। ভেবেছি বাড়ি তো কাছে। যা কিছু করতে হয় বাড়িতেই করব।

ফলে আমি অতি সস্তার সময়ও এখানে একখণ্ড জমি কিনতে আগ্রহী ছিলাম না।

যা হোক, এ ভুলের মাশুল আমাকে পুরো মাত্রায় এখন দিতে হচ্ছে। অন্যভাবে দেখলে কবির আবার ঘরবাড়ি কী? কবির ঠিকানা হয় তার দেশ, তার জাতি, তার প্রকৃতি-পরিবেশ। এর মধ্যেই তিনি থাকেন। কেউ চিরকাল, কেউ শ' শ' বছর। আমি ভাবি, আমি ভুল করেছি, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করে দেখেছি, আমার মতো ভ্রান্তির মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন কত কবি, কত গায়ক, কত সুরকার আর কত দার্শনিক।

রাতে বাড়িতে গিয়ে সব সময় যা করি বারান্দায় উঠে একটি চিৎকার দিই আম্মা বলে। ওই ডাকে ঘরবাড়ি নড়ে ওঠে। ডেওয়া গাছের পাতা ছুঁয়ে শিশিরের ফোঁটা ঝরে পড়ে। নিমগাছের ভেতর থেকে একটা পাখি নিমনিম বলে ডেকে ওঠে। আর আম্মা হাস্যোজ্জ্বল মুখে জবাব দেন, দাঁড়া আসছি।

দরজা খুলে দিয়ে আম্মা বলেন, যা আগে ঘাটলা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আমি তরকারি গরম করে দিচ্ছি। খেতে বসলে আম্মা বললেন, তোর আব্বা তোর জন্য একটা মেয়ে জোগাড় করতে পাগল হয়ে গেছে রে, আমি কী করব বল। সব সময় আমার কানের কাছে শুধু বউ বউ করছে। বলছে কী জানিস—এই ঘরটায় একটা লম্বা-চওড়া বড় ঘরের মেয়ে তিনি জোগাড় করে আনবেন। আগামীকাল পয়ালগাছার বড়বাড়ির লোকেরা তোকে দেখতে আসবে। কিন্তু তুই এই কয়দিনে শরীরের কী হাল করে এসেছিস! মুখের হাড় ক'খানা দেখা যাচ্ছে।

অথচ আমি জানি ঢাকায় আমার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। ঢাকার জল-হাওয়া কেন জানি আমাকে স্বাস্থ্য দিয়েছে। সব সময় ঢাকার খাদ্য-পানীয় আমার স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল! ঢাকা কখনও কোনো অবস্থাতে আমার প্রতিকূল কোনো পরিবেশ সৃষ্টি করেনি। আজও বহুদূর বেড়াতে গিয়ে কয়দিন কাটিয়ে ঢাকায় ফিরলে আমার সুনিদ্রা হয়।

আমার মেজ মামু মহারাজ মিয়া তিনি পরবর্তী জীবন দুর্দান্ত ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড পোস্টে অসাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। খেলেছিলেন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও। তৎকালীন ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে তার মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন খেলোয়াড় আর বাঙালিদের মধ্যে ছিল না। ফুটবল খেলে খেলে পিতার অগাধ সম্পত্তি তিনি হেলায় নষ্ট করে ফেলেছিলেন।

পরের দিন আমার এ মেজ মামু নিজের বাড়িতে পয়ালগাছার সেই অভ্যাগতদের বিপুল আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর পয়ালগাছার লোকেরা আমাকে খুবই পছন্দ করেছিলেন; কিন্তু তারা ফিরে গিয়ে যে বার্তা পাঠান তাতে তাদের কন্যাটি নাকি কোনোক্রমেই ঘরণী হতে চায়নি বলে অসম্মতি জানিয়েছে।

আমি সেই পয়ালগাছার মেয়েটির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করি। তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন, কবির সংসার করা কতটা কঠিন কাজ। পয়ালগাছার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আমার পিতা জিদের বশবর্তী হয়ে ঘর ছেড়ে আমার জন্য কন্যার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন এবং এক সপ্তাহের ভেতর নবীনগর থানার বীরগাঁও গাঁয়ে সৈয়দ মোজাম্মেল হক সাহেবের কন্যা সৈয়দা নাদিরা বেগমের সাথে আমার সম্পর্ক স্থির করেন। সনটা এখন আর আমার মনে নেই। তবে ১৯৫৬ বা '৫৭ সালের হবে। কোনো ভরা বর্ষায় আমার বিয়ে হয়েছিল।

যেহেতু পয়ালগাছার মেয়েটি আমাকে কবি বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সে কারণে আমার স্ত্রীকে বারবার আমি যে কবি এ কথাটি বুঝিয়ে বলা হয়েছিল। তাঁর পূর্ণ সম্মতিতে আমাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কবির ঘর করতে আসছেন এটা আমার স্ত্রী ভালো করে জেনে এসেছিলেন।

আমার শ্বশুর ছিলেন শিক্ষক। হয়তো বা শিক্ষকের কন্যা বলেই তিনি একজন কবিকে বিয়ে করতে অসম্মত হননি। আমি কৃতজ্ঞ যে, তিনি অসম্মত হননি।

এক মাসের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। এখানে আমি অকপটে বলতে চাই যে, আমার পিতার পছন্দে স্থিরকৃত বধূ আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। আজও এ পছন্দের নানা দিক আমি আবিষ্কার করি এবং কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি, আমার স্ত্রী নাদিরা আমার সংসারের হাল না ধরলে আমার পক্ষে হয়তো বা দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল নিশ্চিন্তে কাব্যচর্চা সম্ভব হতো না। নারী কী দিতে পারে কবিকে তা একমাত্র কবিই জানে।

বিয়ের পর ঢাকায় ফিরে এসে একদিন নয়নের সাথে দেখা করতে গেলে সে বলল, এই যে কবি এসেছেন? আমি বুড়ির হোটেলে গিয়ে আপনার খোঁজ করেছিলাম। শুনলাম আপনি বিয়ে করতে গেছেন। কেমন বউ পেলেন?

আমি ছোট জবাব দিলাম, ভালো।

মেয়েটি হেসে বলল, আমি আপনার বউকে একটা উপহার দিব বলে চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের পাশের দোকানে দেখুন একটা সোয়েটার শোকেসে লাগানো আছে। আগুনের মতো লাল। দাম চৌদ্দ টাকা। কিন্তু আমার কাছে মাত্র দশ টাকা আছে। সে জন্য কিনতে পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথায় আমি মানিব্যাগ খুলে নয়নের হাতে পাঁচ টাকার একটি নোট দিলাম। সাথে সাথে নয়ন ছিটকে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল এবং পাশের দোকানের শোকেস থেকে নিয়ে এলো একটি লাল সোয়েটার। হাফ হাতা আধুনিক ডিজাইনে বুকের কাছে ফুলের কাজ। ভারী সুন্দর। বিশুদ্ধ উলের হাতে বোনা নরম তুলতুলে এ রক্তবর্ণের সোয়েটারটি আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন পরিধান করে আমার চোখকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন।

অবশ্য নয়ন এ কথা কোনো দিন জানবে না। নয়ন আজও বেঁচে আছে। আমার মতো প্রায় অন্ধ-অথর্ব হয়ে। যতটুকু জানি, জীবন তাকে শুধু বঞ্চনাই দিয়েছে। তবে শুনেছি, তার এক ছেলে চশমার এক বিরাট কারখানার মালিক হয়েছে। সুখে থাকুক নয়ন।

এর মধ্যে একদিন আমার কাফেলা অফিসে এসে হাজির হলেন তরুণ কবি ফজল শাহাবুদ্দীন। তিনি আমার অফিসের পাশে জগন্নাথ কলেজে পড়তেন। ওইদিন এসেই বললেন, শুধু কবিতা দিয়ে এবং কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ দিয়ে কাফেলার একটা সংখ্যা বের করো না কেন?

আমি ভাবলাম, মতলবটা খুবই চমৎকার। তার কথায় আমি কবিতা সংখ্যা কাফেলার পরিকল্পনা করলাম এবং পত্রিকায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। সম্ভবত এটাই ছিল তৎকালীন ঢাকায় কবিতা ও কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধাদি নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশের স্বতন্ত্র প্রয়াস। যতদূর মনে পড়ে, এ ব্যাপারে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ওই সংখ্যায় লিখেছিলেন খ্যাত-অখ্যাত অনেক কবি।

দারুণ উত্তেজনার মধ্যে আমার দিনগুলো বন্দুকের গুলির মতো আমার কানের পাশ দিয়ে একটি একটি করে বেরিয়ে যাচ্ছিল শব্দ করে। হয়তো আমি সচেতন ছিলাম কিংবা ছিলাম না। জীবনটাকে একটা আড্ডা মনে করে বিউটি রেস্তোরাঁর চায়ের টেবিলে খরচ করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে স্ত্রীর পক্ষ থেকে পিছুটান এসে আমাকে বিমর্ষ করে রাখত। কিন্তু আমি ছিলাম সব দিক দিয়ে কবি। উদাসীন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন।

পৃথিবীতে সব মানুষই যদি দায়িত্ববোধের পরিচয় দিত তাহলে জগতে স্বপ্নের সৃষ্টি হতো না। কাব্য রসাতলে যেত। এই কর্মনিপুণ পৃথিবীতে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের বড়ই দরকার। তা কে অস্বীকার করবে। তবু এমন মানুষ কী এক আধজন থাকবে না, যারা আকাশের নীল দেখবে, গাছের সবুজ এবং শঙ্গের গায়ে আল্পনা দেখবে, নারীর ভ্রূ রেখা কত সুন্দর! দেখবে ঢাকার আকাশে একটু মুখ তুললেই শত শত শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে ভাগাড়ের দিকে দৃষ্টি রেখে। নিশ্চয় এমন মানুষ দু'একজন দরকার। যাদের আমরা অবহেলা ও অবজ্ঞা ভরে হলেও বলব ইনি কবি, আমাদের জন্য স্বপ্ন লেখেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় আমার জীবন ছিল কবিতার ঘোরের মধ্যে গুঞ্জন তোলা এক রানী মৌমাছির মধু সংগ্রহের মতো। বিয়ের পর তা সহসা বদলে গিয়ে হয়ে উঠল তীব্র যৌন আকর্ষণে অনেকটা বাঁধভাঙা জোয়ারের আছড়ে পড়া তরঙ্গের মতো। এতটাই যৌন আকর্ষণে আমি উন্মাদনা অনুভব করতাম যে, সামান্য যেটুকু কর্তব্যবোধ আমার মধ্যে এতদিন টিকে ছিল তাও ভেসে গেল। ঠিকমতো অফিসে যাওয়া, নাওয়া-খাওয়া সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। কেবল বাড়ি যাওয়ার সুযোগ সন্ধান। নিজের বউয়ের কাছে যতক্ষণ থাকা যায়, তারও বেশি অবস্থান করার সুযোগ সন্ধান।

এতে অবশ্য একটা ক্ষতি থেকে আমি বেঁচে গেলাম। এই চিন্তা সত্তর বছরে উপনীত হয়ে আমি অনুভব করছি। কারণ পরমা সুন্দরী, নয়ন আরও যেসব অন্যায় আকর্ষণে আমি আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। তা আমার স্ত্রীর প্রতি অপ্রতিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আমাকে বাঁচিয়ে দিল। নষ্ট হতে হতে বেঁচে গেলাম। কবিতা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আসঙ্গ লিপ্সায় ডুবে গিয়ে বুঝলাম, কবিতা ছাড়াও বেঁচে থাকার গভীর আনন্দ আছে। মনে হয় বেশ কিছুদিন কবিতা লেখা প্রায় ছেড়েই দিলাম।

আমার একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, যৌন সুখের চেয়ে মহত্তর কোনো সুখ প্রাণিদের মধ্যে আল্লাহ্ সৃজন করেননি।

আজ অবশ্য এ ধরনের চিন্তার জন্য অনুতাপ করি। কারণ যৌনাকাঙ্ক্ষা মানুষের সংযম, শালীনতা, ভদ্রতা উত্যকার শীলগুলোকে একেবারেই তছনছ করে দেয়। এ হলো বৈধ যৌনাকাঙ্ক্ষা বিষয়ে আমার অনুভব। আর অবৈধ যৌনাকাঙ্ক্ষা মানুষকে কেবল লাঞ্ছিত করে না, অপমানিত, অপদস্ত করে শেষ পর্যন্ত ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। অনেক প্রতিভাবান লোককেও অবিশ্বস্ত করে তোলে। আমি আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে অবমাননায়, অপমানে জর্জরিত অবস্থায় পেয়েছি। আশ্চর্য যে তারা ওইসব সম্মানহানিকর ঘটনায় লাঞ্ছিত হয়েও মাথা তুলে বেঁচে থাকতে পেরেছেন। আমি কিছুতেই পারতাম না।

আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, স্ত্রী এসে ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই কবিতা ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। এখন আমার মনে হয় কবিতা যে যৌনতার কাছে হার মেনে শব্দহীন পায়ে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সেটা ছিল যুক্তিসঙ্গত। যৌনতাসর্বস্ব কিংবা বলা যায় দেহসর্বস্ব এক জোড়া যুবক-যুবতির কাছে কাব্য লক্ষ্মী কখনও যদি হার মানতো তাহলে হয়তো আমি আর কবিতায় ফিরে আসতে পারতাম না। কবিতা বিজয়ীনীর মতো যৌনতার কাছে পরাজয় স্বীকার না করে আমার ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু যৌনতার কোনো তৃপ্তি নেই। এ আগুন একবার দেহের ভেতর জ্বলতে দিলে সে সবকিছু পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।

কিন্তু তবু বাসনার তৃপ্তি হয় না। আমি সহসা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পেরেছিলাম তিতাস নদীর বাঁকে একটি নৌকায় সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে। কেন যেন মনে হলো একটি কবিতা লিখি। নৌকায় উবুড় হয়ে লিখে ফেললাম একটি চৌদ্দ লাইনের সনেট। কবিতাটির নাম দিলাম 'নৌকায়'। কবিতাটির গীতিময় সাফল্য আমাকে এতটাই দোলা দিয়েছিল যে, আমি একবারও স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে বারবার কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সম্ভবত এভাবে আমি গভীর কামলিপ্সা থেকে আবার কাব্যে ফিরে এলাম। ফিরে এলাম ঢাকায়। এবার চাকরি জুটল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান দৈনিক ইত্তেফাকে। এমনসব উদ্যমী মানুষের সাথে দৈবভাবে আমার মেলামেশার সুযোগ হলো যারা ছিল আমার কবিতার অনুরাগী।

এখানে একটা কথা বলতে চাই– কবিতা এমন এক বিষয় যা কবির অজ্ঞাতেই পাঠকদর মধ্যে তার সমর্থক সৃষ্টি করে। যা রাজনৈতিক সমর্থনের সাথে কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। রাজনৈতিক সমর্থন ও সহায়তা কবিকে ন্যুজ করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে।

তিনি প্রাচুর্যের মধ্যে থাকলেও তার স্বভাব হয়ে যায় ভিখিরির স্বভাব। একবার ভিক্ষাবৃত্তি তাকে যত্রতত্র হাত বাড়ানো শিখিয়ে দিলে সে হাত তিনি আর প্রতিহত করতে পারেন না।

কিন্তু প্রকৃত কবি অনাহারী থাকলেও ভিক্ষাবৃত্তিকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। যেমন করেছিলেন সাত সাগরের মাঝির অমর রচয়িতা কবি ফররুখ আহমদ।

ইত্তেফাকে একজন অসাধারণ কাব্যপ্রেমিক, তীর্যকভাষী প্রগতিশীল লোকের সাথে আমার পরিচয় ঘটলে আমার কবিতা প্রকাশের এক আশ্চর্যজনক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। তার নাম মোহাম্মদ আখতার। তিনি সহসা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার খাতায় বই করার মতো কয়টি কবিতা আছে। খাতাটি আমার ড্রয়ারেই ছিল। আমি খাতাটি বের করে মোহাম্মদ আখতারের হাতে দিলে তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা পড়ে গেলেন। কবিতা ছিল ৫১টি। মোহাম্মদ আখতার আঙুলে পৃষ্ঠা ও ফর্মা হিসাব করলেন, বললেন, চার ফর্মার একটি সুন্দর বই হবে। কী নাম দেবেন এই বইয়ের? আমি চিন্তা-ভাবনাহীনভাবে জবাব লিাম—'লোক লোকান্তর'। মোহাম্মদ আখতার মুখ গম্ভীর করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বয়স তো মাত্র বাইশ পেরোচ্ছে। কাব্যগ্রন্থের এই দার্শনিক নাম?

আমি হাসলাম।

মোহাম্মদ আখতার বললেন, আজই বইটি প্রেসে চলে যাচ্ছে। আমরা আপনার বইটির জন্য একটি যৌথ ফান্ড সৃষ্টি করেছি। এতে কিছু সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও চারুশিল্পী রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম কপোতাক্ষ। আপনাকে কিছু রয়ালটিও দেওয়া হবে। তবে আপনাকে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর সাথে লেগে থেকে একটি প্রচ্ছদ বের করে আনতে হবে। আজ থেকে লেগে যান।

আজ যখন অতীতের দিকে আমার অন্ধ চোখের পাতা বন্ধ করে ভাবনার মধ্যে ডুবে যাই তখন মনে হয় সবই ছিল এক অদৃশ্য আয়োজন। যা আমার প্রভু আমার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর আসঙ্গ লিপ্সা থেকে বেরিয়ে আসা জগতের অনেক সৃজনশীল মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমি তা আমার কাব্যের প্রেমের দ্বারাই সংযত রাখতে পেরেছিলাম। এর মানে এই নয় যে, আমি কোনো সাধুসন্ত বা দরবেশ ছিলাম। তবে আমি জন্মেছিলাম একজন সুফি দরবেশের পরিবারে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমার একটা উপেক্ষার শক্তি ছিল। সেটা অর্জিত হয়েছিল আমার পিতার কাছ থেকে। সাধুসন্তের মতো মানসিক গঠন প্রক্রিয়া আমি অর্জন করেছি পৈতৃক সূত্রে। আর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম বিলাসিতা, পোশাক-পরিচ্ছদে রুচি এবং সম্পদের অপচয়ের নেশা। এ জুটিকে মেলানো যায় না। কিন্তু আমার জন্মগত প্রতিভাই আমাকে এ বিপরীত স্রোতকে মেলাবার সুযোগ করে দিয়েছিল।

আমি কাইয়ুম চৌধুরীর কাছ থেকে একরঙা এক অসাধারণ প্রচ্ছদ আদায় করতে পেরেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছলেন, প্রচ্ছদটি এক রঙা হলেও ছাপা হলে মনে হবে কয়েক রঙে ছাপা হয়েছে। আমি আপনাদের খরচ কমানোর জন্য এ আয়োজন করেছি।

আজ অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে আমি স্বীকার করি, পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে কাইয়ুম চৌধুরীর মতো শিল্পীর আবির্ভাব না হলে আমাদের প্রকাশনা শিল্প এতটা পোক্ত হতো না। ব্যক্তি প্রতিভার কাছে ঋণ স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই। বরং এর মধ্যে নিহিত আছে গৌরব।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদ শিল্পে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন নিশ্চয় তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমি এ সাক্ষ্য দিতে চাই যে, কাইয়ুম ভাই এখনো প্রতিদ্বন্দ্বি প্রচ্ছদশিল্পী। প্রযুক্তিগত উন্নতি, সুন্দরের যে ছবি সৃষ্টি করে তা প্রাণহীন সুন্দর। আর কাইয়ুমের প্রতিটি স্ট্রোকই হলো আনন্দঘন বিস্ময়ের উন্মোচন। জীবন্ত এবং জাগ্রত।

'লোক লোকান্তর' বেরিয়ে গেল। মোহাম্মদ আখতার বাংলা একাডেমিতে বইটির প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করেন। এতে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে বইটির ওপর আলোচনা করেছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সেবা ব্রত চৌধুরী, আরও কয়েকজন সদয় আলোচক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমানসহ বিপুল কাব্যপ্রেমিকরা। সম্ভবত কবি শামসুর রাহমান সেখানে ছিলেন না। কিংবা ছিলেন। আমি এখন আর তা স্মরণ করতে পারছি না। তবে সেটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম প্রকাশনা উৎসব।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মোহাম্মদ আখতার কবিতার এতটা আত্মীয় ছিলেন তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে শহীদ হয়ে যান। আজ তার স্মৃতি সবাই ভুলে গেছে; কিন্তু আমি কী করে ভুলি? তিনি ছিলেন কবিদের উপকারী বন্ধু। এ কথা নিশ্চয় আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ শাজাহান সে সময়কার এসব উদীয়মান কবি ও বুদ্ধিজীবীরা কখনও ভোলেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু স্মৃতি মনে নিয়ে বসে থাকলে তা আর ইতিহাস হয় না। কাউকে না কাউকে সে ইতিহাস লিখতে হবে। কলম ধরলেই ঘটনার ছায়াছবি চলচ্চিতের মতো রিল খুলে দেয়। আর স্মৃতি বুকে নিয়ে বসে থাকলে তা বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিস্মৃতির ঘুণপোকা কেটে ধুলোবালুতে পরিণত করে মাত্র

আমি তীব্র যৌন চুম্বক থেকে বেরিয়ে এলেও স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করি। কাম এবং কাব্য যে পরস্পরের শত্রু নয় বরং স্বভাব সংযত হলে এর যে একটা মেলবন্ধন সম্ভব তা আমি এত অল্প বয়স ধরে ফেলতে পেরেছিলাম। যার জন্য আমাকে যত্রতত্র লাঞ্ছিত হতে হয়নি।

সন, তারিখ আমি বলতে পারব না। সহসা একদিন কবি শামসুর রাহমানের বিবাহের দিন ধার্য হওয়ায় আমরা যারা তার আশপাশে ছিলাম, আমি, শহীদ কাদরী ও ফজল শাহাবুদ্দিন বিবাহের ভোজসভায় উপস্থিত হয়েছিলাম। কথাটি এখানে আকস্মিকভাবে উল্লেখ করলেও এটা আমার কাব্যজীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। হয়তো ঘটনাটা ছিল আমার বিয়ের পরে। কিংবা আগে। কিন্তু ঘটনাটি স্মৃতির মধ্যে আছে বলে দিন, তারিখ ছাড়া উল্লেখ করছি। এখানে একটা কথা অকপটে স্বীকার করি যে, শামসুর রাহমানের সাথে আমি কখনও গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারিনি। মনের ভেতর থেকে তা চাইওনি এবং এর জন্য আমার কোনো আক্ষেপও নেই।

তাছাড়া পরবর্তী জীবনে শামসুর রাহমানের সুচতুর বন্ধুদের সাথেও আমার কোনো ঘনিষ্ঠতা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। আজও নেই। আমি লক্ষ করেছি, তারা সব সময় চেষ্টা করেছেন শামসুর রাহমানের জীবনের আলোকে আলোকিত হয়ে নিজের সার্থকতা পেতে। নির্ভয়ে বললে হয়, তাদের একজন হলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তিনি সব সময় আমার প্রতি বিরূপ। কেন বিরূপ আমি তার কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। হয়তো জীবনের ব্যর্থতাই তাকে এই বিরূপতার মধ্যে আটকে ফেলেছে। তিনি কবি হতে চেয়েছিলেন, হতে পারেননি।

কবিরা যখন ব্যর্থ হয় তখন তার থেকে অন্য কবিদের শত যোজন দূরে থাকাই শ্রেয়। আমি সেটাই করতে চেয়েছি।

এখানে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারতাম। সেটা এই রচনার সাথে সম্পৃক্ত হবে না বলে নিবৃত্ত থাকলাম। পরে কোনো ঘটনায় জিল্লুর রহমান, রশীদ করিম, কায়সুলহক ও সর্বশেষ রাহমানপ্রবণ আবু হাসান শাহরিয়ারের বৃত্তান্ত ও আমার প্রতি ঘৃণার উৎসবগুলো সাধ্যমতো লিপিবদ্ধ করব।

১২

এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকায় আমার লেখার চাহিদা বেড়ে গেল। আমি তখন কলকাতার বামপন্থী কাগজগুলোকেই বেশি মর্যাদা দিতাম। এর একটা কারণ এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে পারে যে, মার্কসাবদী পত্রিকাগুলো আমার কোনো লেখা পেলেই তা অত্যন্ত মর্যাদার সাথে প্রকাশ করত।

আমি সাধারণত ছন্দের কবিতাই লিখতাম। আমি সব সময় নিজেকে একজন গীতিপ্রবণ কবি হিসেবে বিবেচনা করি। কিন্তু মাঝে মধ্যে এক-আধটি গদ্য কবিতা আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে যেত। গদ্য শক্তি আমার কাব্যের সহায়ক ছিল বলে আমার ধারণা জন্মালে আমি এর উপযুক্ত ব্যবহারের প্রয়াসী হয়ে উঠলাম। হঠাৎ লিখিত হলো 'পিপাসার মুখ' বলে গদ্য ভাষায় সঞ্চারিত বিদ্যুৎবাহী একটি কবিতা।

আমি কবিতাটি তৎকালীন 'নতুন সাহিত্য'র সম্পাদক অনীল সিংহকে পাঠিয়ে দিলাম। ইতিপূর্বে অনীল বাবু সনেট প্রকৃতির বেশ ক'টি কবিতা ছেপে সহযোগিতা করেছিলেন। আমি ভাবতে পারিনি 'পিপাসার মুখ' তার হাতে গেলে কী প্রতিক্রিয়া হবে। অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কবির অপেক্ষা হলো সচ্চিকাল যাপন। এই অবসরে সুনীল গাঙ্গুলির 'কীর্তিবাস', জগদিন্দ্র মণ্ডলের 'ময়ূখ' এবং আরও কিছু বিচ্ছিন্ন সুন্দর পত্রিকায় আমার সনেট আঙ্গিকের কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল।

আমি সদরঘাটে মজলিশ বুকস স্টলে—যা তখন ছিল চৌকির ওপর মাদুর বিছানো পত্রপত্রিকার খোলা স্টল, গিয়ে হঠাৎ পেয়ে গেলাম 'নতুন সাহিত্য'র সর্বশেষ সংখ্যা এক ঝকমক মলাটওয়ালা ক্রাউন সাইজের নতুন সাহিত্য। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে খুলেই অভিভুত। 'পিপাসার মুখ' সুন্দর মর্যাদায় প্রকাশ পেয়েছে। সেটিই প্রথম কবিতা ছিল কি-না আজ আমার মনে নেই। কিন্তু কবিতাটির ভেতরে যে গদ্য স্রোতে বিদ্যুৎবাহিত ছিল তা আমি এখনও উপলব্দি করি। এক অস্বাভাবিক পুলক আমার অস্থি-মজ্জার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

এ হলো সাফল্যের এবং স্বীকৃতির ঝরনা। এ আনন্দে আমি যে কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু নারী রহস্য এক অঘটনঘটনপটিয়সী। প্রথমে মনে হলো বাড়ি চলে যাই। কারণ বাড়িতে আমার জন্য অন্তত একজন অপেক্ষা করছে। যার কাছে কবিতার কোনো কানাকড়ি মূল্য না থাকলেও কবির একটি আহ্লাদিত আশ্রয় আছে। কোনো ভালো কিছু হলে আমি কেন বাড়ি যেতে পাগল হয়ে যাই তা আমি বলতে পারি না। এখন কোনো বাড়িঘর নেই। আমার বসতবাড়িটি আমারই সহোদর এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন প্রায় গ্রাস করে নিয়েছে। অথচ আমার এ পৈতৃক ভিটার অর্ধেকের বেশি আমারই কেনা সম্পত্তি। আমি উদাসীন মানুষ। পৃথিবীর কোনো সৃজনশীল উদাসী মানুষের স্থায়ী আবাসভূমি থাকে না। আত্মীয়স্বজনেরা কেড়ে নিয়ে যায়। জানি না আমাকেও সেই দুর্ভাগ্য বরণ করে নিজের দেশ ও নাগরিক সমাজে বেঁচে চলতে হবে কি-না। তবু আমি বড় বাড়িকাতর মানুষ। সুখে, আনন্দে, দুঃখে, আমি বাড়ি চলে যেতে চাই। যেখানে জন্মেছিলাম সেখানে। কেন এমন হয় এর ব্যাখ্যা কে দেবে?

এর মধ্যে একদিন শহীদ কাদরী এসে আমাকে বোঝাল যে, এসব কবিতা-টবিতা আসলে ছেলেখেলা। ওসব ছেড়ে আমাদের মতো কবিদের নাকি দর্শনচর্চা করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচিত। আমি শহীদের কথায় খুব হাসছি দেখে কাদরী সাহেব একটু ফাপড়ে পড়লেন। আমি তাকে একেবারেই পাত্তা না দিয়ে একটি সিগারেট অফার করে পাশ কাটিয়ে ফজলের অফিসে চলে গেলাম। তিনি তখন নবাবপুরের একটি ছোট পোস্ট অফিসে কাজ করতেন।

তার একটি অভ্যাস ছিল বন্ধুকে সহসা ছেড়ে দিতে চাইতেন না। আটকে রাখতেন ছলে-বলে। যখন অফিস থেকে বের হতেন তখন একটি সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে কমলাপুরের দিকে রওনা হলেন। সাথে থাকতাম আমি। আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইতেন না। একদিকে সাইকেল, একদিকে আমি। একদিকে যন্ত্র, অন্যদিকে কবি বন্ধু। দু'জনকেই ঠেলতে ঠেলতে তিনি কমলাপুর ঠাকুরপাড়ার শেস প্রান্তে নিয়ে যেতেন। তারপর স্বার্থপরের মতো চলে যেতেন নিজের গৃহে। আর আমি একাকী দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিয়ে আসতাম নবাবপুর।

নতুন সাহিত্যে সহসা আমার এ বিদ্যুৎবাহী কবিতাটি প্রকাশ হওয়ায় আমার মধ্যে ওই 'চল বাড়ি চলে যাই' ভাবটি খামচাতে লাগল। আমি চিন্তা-ভাবনাহীন উদাসীন দরিদ্র কবি হলেও সেই দিনগুলোর গুরুত্ব ঠিকমতো উপলব্ধি করেছিলাম। বুঝেছিলাম আমি নতুন কিছু লিখছি। তাছাড়া সেই সময় আমাকে আঞ্চলিক শব্দের ব্যাপক প্রয়োগের মোহ পেয়ে বসল। অব্যবহৃত শব্দকেই আমি এখানে আঞ্চলিক শব্দ বোঝাতে চাই। যা গ্রামবাংলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমরা রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বাংলাভাষার যে কাঠামোটি পেয়েছি তা মূলত সংস্কৃতি ও প্রকৃতিতে সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত এক কোমল স্বভাবের ভাষা। এর মধ্যে তৎসম শব্দকে নমনীয় রাখার একটি কৌশল রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে সম্ভব করে তুলেছিলেন। কিন্তু আমি যে শব্দরাজিকে আঞ্চলিক শব্দ বলে উল্লেখ করেছি তা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলাভাষার পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত ব্যাপকতর ভাষারূপ। একে ঠিক আঞ্চলিক বলা আজ অনুচিত মনে হচ্ছে। এটাই বাংলাদেশের ভাষা ছিল। কলকাতার ভাষা থেকে একটু ভিন্ন হলেও একটা নিজস্ব গতি ও বাকভঙ্গি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো আমারও ভাষার ঐক্য বিদীর্ণ করার কোনো বাসনা নেই। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের যে ভাষাশৈলী নাটকে, কাব্যে খোলস ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসছে তাকে বুঝতে হবে। মানতে হবে যে, এটা বাঙালি জাতির আধুনিকতম ভাষারূপ। এই ভাষা মুসলমান মধ্যবিত্তরাই সৃষ্টি করেছে। করেছে রবীন্দ্রভাষার কাঠামোর মধ্যেই। মুসলমান ভাষা শিল্পীদের এ উদারতা স্বীকার করে না নিলে এর ভেতরকার সৃজনশৈলীকেই অস্বীকার করা হবে।

আমি রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি। কিন্তু মুসলমান হিসেবে রবীন্দ্র অবজ্ঞার আমিও তো শিকার। এই সদ্য ধামাচাপা দেওয়া যায় না।

ভেতরে 'চল বাড়ি চলে যাই' আমাকে তখন খামছে ধরেছে। বাড়ি যাওয়ার জন্য এই অস্থিরতার কথা মনে হলে আমি আজও সেই পুরনো ঢাকার স্টেশনটি যা একদা ফুলবাড়িয়া এলাকায় অবস্থিত ছিল এর ভেতরকার দৃশ্যগুলো দেখতে থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদর সাথে ভালো ব্যবহার করিনি বলে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বিউটি রেস্টুরেন্টের পেছনে শহীদদের বাসায় গিয়ে ডাকলাম। শহীদ আমাকে রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে গেল। আমি বিউটি রেস্তোরাঁয় এসে প্রহ্লাদ বাবুকে কিছু নাশতাসহ এক কাপ চা দিতে বললাম এবং চা পরিবেশনের আগেই দামটা তার টেবিলের ওপরে রেখে দিলাম। প্রহ্লাদ হাসলেন, আরে ভাই আপনার বন্ধুদের যেখানে হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে, পয়সা দেওয়ার নামগন্ধ নেই, সেখানে আপনি নগদ পয়সা দিয়ে চা খাচ্ছেন এটা তো বিরাট বিষয়। যান বসেন। একটা পরাটা আর ভাজি খান। চা আসছে।

শহীদ আসার আগে জাহাঙ্গীর বলে শহীদেরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, কাজিন আমার টেবিলে উবুড় হয়ে বসে পড়ল। ইসলামিক ইহিতাসের ছাত্র। তার একটি বড় গুণ এখানে উল্লেখ করতে চাই। জাহাঙ্গীর হিট্রি সাহেবের ইসলামের ইতিহাসের ইংরেজি ভাষ্য একেবারে একটানা মুখস্থ বলতে পারত। কিন্তু জাহাঙ্গীরের কথা, তার সুপুরুষ চেহারা আমাকে স্মৃতিকাতর করে ফেলে। কত মানুষের যে বাস্তুহারা হয়ে অপরিসীম দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটাতে হয়েছে তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। অথচ এরা কলকাতায় ছিল অত্যন্ত সচ্ছল সুখী পরিবার। এদের সৃজনশীলতা ছিল, কল্পনাশক্তি ছিল কিন্তু অবলম্বন ছিল না। এরা মাটির সাথে রক্তে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। যারা পেরেছে তারা ভাগ্যবান।

শহীদ এসে জাহাঙ্গীরের পাশে বসল এবং আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল। আমি বললাম, কাদরী সাহেব কাল আপনার দর্শনচর্চার বিষয়টি ঠিকমতো হজম করতে পারিনি। আজ বলুন, আমি হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করব। আমার কথায় কাদরী সাহেব সিগারেটে একটা মস্ত টান মেরে ধোঁয়া উগরে দিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন—আরে গাঁইয়া আল মাহমুদ তুমি ফিলোসফি বুঝতে চাও! ওটা হলো এক অখাদ্য ব্যাপার। তার চেয়ে নতুন সাহিত্যে তোমার কবিতাটি দারুণ সুন্দর। শেষ লাইনগুলোতে তুমি যেখানে লিখেছ, 'আমি জলপান শব্দের শিকারি' তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১৩

সত্যি কথা বলতে কি চাকরি, কাজ, সংবাদপত্র এবং সমসাময়িক সাহিত্য উদ্দীপনা থেকে আমি কেমন যেন একটা আলাদা হয়ে চলতে শুরু করেছি। কেন এমনটা হয়েছিল তার কোনো ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। ঢাকার বাইরে চলে যাওয়ার জন্য মনটা বড় উচাটন হয়েছিল। সেই 'চল বাড়ি ফিরে যাই' এই অবস্থাটি তখন আমাকে প্রায় চুম্বকের মতো টানছে। সন্দেহ নেই এতে লুকিয়ে ছিল যৌন উত্তেজনা এবং স্ত্রীর কাছে চলে যাওয়ার বাসনা।

কিন্তু আমি খুব ভালো করেই জানতাম এবার যদি চলে যাই তাহলে এসে চাকরি-বাকরি অর্থাৎ যেটুকু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে চলাফেরা করছি তা বন্ধ হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এক সময় কী কারণে যেন ঢাকায় একটু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এটা খুবই অশুভ লক্ষণ হিসেবে আমি বিবেচনা করেছিলাম। যখনই ঢাকায় কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তখনই লক্ষ করা যেত যে, এর কারণ ছিল ভারতে কোথাও না কোথাও মুসলমানদের ওপর দাঙ্গা-হাঙ্গা বা ইত্যাকার কোনো অশুভ ব্যাপার।

ঢাকায় তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু দু'একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেই গেল। এ অবস্থায় আমি একদিন ছুটে গেলাম র‍্যাংকিন স্ট্রিটে। র‍্যাংকিন স্ট্রিটের লারমিনি স্ট্রিটের মাথায় কবিতাঙ্গনের পেছনে বাস করত আমার বন্ধু সেবাব্রত চৌধুরী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার ছাত্র ছিলেন। কিংবা তখন হয়তো পরীক্ষা দিয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে খুবই অবাক হলেন সেবাব্রত। আমি তাকে হালচাল জিজ্ঞেস করায় বলল, ভালো অবস্থায় নেই। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন বসার ঘরে এসে ঢুকল এক হিন্দু যুবতি। তাকে দেখেই সেবা বলল, কী ব্যাপার, আপনি এ সময়ে! শহরের এ অবস্থায় কেন বেরিয়েছেন? যুবতিটি হাসল।

আমি তাকে বললাম, হাসছেন! শহরের অবস্থা কিন্তু ভালো নেই। আপনার এখন এভাবে শহরে চলাফেরা করা উচিত হয়নি। সেবা হেসে বলল, আরে তুমি তো বুঝতে পারছ না আল মাহমুদ। উনি তো ওইসব ব্যাপার-ট্যাপার একটু পছন্দই করেন। কথাটা খুব শ্লেষের সাথে উচ্চারণ করল সেবাব্রত।

আমি যুবতিটিকে বললাম, আপনি এক্ষুণি চলে যান। শহরে যে কোনো সময় পাড়ায় পাড়ায় খুনাখুনি শুরু হয়ে যেতে পারে। আর এটা হলো ঠাঁটারিবাজারের এলাকা। কসাইদের আখড়া। আপনি সোজাসুজি অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে নবাবপুর হয়ে চকবাজারের দিকে চলে যেতে পারবেন। ওইসব টিপ মুছে ফেলুন। আর এক্ষণি চলে যান। যুবতি বেরিয়ে গেলে আমি বললাম, সেবা তুমি তোমার কাকাবাবুকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তোমাদের বাড়ি চলে যাও। সেবাব্রতদের বাড়ি ছিল হবিগঞ্জে। সেবার সাথে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর হয়ে উঠেছিল। কারণ সেবাব্রত, দেবব্রত, হায়াৎ মাহমুদ এবং আমি মিলে 'সপ্তক' বলে একটা লিটল ম্যাগ বের করেছিলাম। একটি বা দুটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এটি সম্ভবত ঢাকার প্রথম লিটল ম্যাগ।

এ সময় সেবা সহসা বলল, দু'কাপ চা নিয়ে আসি আল মাহমুদ। কে জানে এটাই হয়তো আমাদের শেষ একসাথে চা খাওয়া হবে।

আমি এ কথায় চমকে গিয়ে সেবার হাত চেপে ধরলাম।

নাহ! আর থাকব না। চলে যাব।

আমি বেদনাবিভোরচিত্তে চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম। সেবা তখন চা আনতে ভেতরে চলে গেছে। আমার হৃদয় যেন চুরমার হয়ে গেছে। আমি এ অকারণ ভ্রাতৃহত্যার সঙ্গত কারণই খুঁজে পেলাম না। শুধু মুহ্যমান হয়ে মাথা নুয়ে বসে থাকা ছাড়া আমি কবি হিসেবে আর কোনো করণীয় খুঁজে পেলাম না। একটু পরে সেবাব্রত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'কাপ চা নিয়ে এসে সামনে বসে পড়ল। বলল, দুটি দাঙ্গাবিরোধী মিছিল বেরিয়েছে।

আমি চায়ে চুমুক দিলাম এবং অত্যন্ত মৃদুস্বরে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললাম, যেও না সেবু। এই উত্তেজনা সাময়িক। সেবু আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না। সেবাব্রতরা থাকেনি। ন্যায়সঙ্গত কারণেই চলে গিয়েছিল। সেবার সাথে দীর্ঘদিন পরে দিল্লিতে আমার সাক্ষাৎ হলো। দেখলাম সে একদম বুড়িয়ে গেছে। সে একটি কলেজে পড়ায় এবং নাট্যকলা বিষয়ে পড়ায় ও নাটক লেখে। কবিতা লেখাও ছেড়ে দেয়নি। আমাকে পেয়ে সেবা এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যে আমার জন্য তাকে সর্বক্ষণ সঙ্গ দিতে হয়েছিল। এর বেশি এখানে লিখতে চাই না।

শহীদ কাদরীকে দর্শনের দিকে উসকে ছিল সুকুমার দাশ বলে একজন পড়ুয়া ভাবুক মানুষ। তিনি আমাকেও পছন্দ করতেন। কিন্তু কখনও আমাকে দর্শন চর্চার কথা বলেননি। বরং আমার কবিতা পড়েন এ কথা তিনি জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এ কথা উল্লেখ করছি যে, বিউটি রেস্তোরাঁয় তিনিও নিয়মিত খদ্দের ছিলেন।

তিনিও শেষ পর্যন্ত ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। তার সাথেও আমার কলকাতায় সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন তিনি চায়ের দোকান পরিচালনা করতেন। মনে হয়েছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তিনি আমাকে পেয়ে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। যে লোকটি ঢাকায় দারুণ উদ্যমের সাথে দর্শনশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার শেষ পর্যন্ত জীবিকার উপায় হয়েছিল কলকাতায় একটি চায়ের দোকানে চা বিক্রেতা হিসেবে।

আমার এ বাড়ি চলে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই যুক্তিহীনভাবে আমার উপার্জনের ক্ষেত্রগুলোকে খানিকটা অবজ্ঞা করতে শেখাল। পরিস্থিতিটা অনেকটা আউট সাইডারের মতো।

এ সময় আমার খুব লালসা জন্মেছিল। একবার সেই পরমা সুন্দরীর কাছে যাই। হয়তো বা এতে আমার প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা খানিকটা উপশম হতেও পারে। কিন্তু আমি হোটেলওয়ালা বুড়িকে ভয় পেতাম। ততদিনে বুড়ি তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসার পথে আমার মায়ের সাথেও একদিন সাক্ষাৎ করে এসেছেন। তখন আমার ওপর তার প্রবল আধিপত্য ও অপত্য স্নেহ ঝরে পড়তে লাগল। আজ যখন সেই সময়কার কথা ভাবি তখন ওই বুড়ি, পরমা সুন্দরী ও নয়নের কথাও আমাকে ভাবতে হয়।

আমি অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমার নিজের কবিত্ব শক্তি ও গদ্য শক্তির ওপর আমার অগাধ ভরসা ছিল। কিন্তু নিজের সৎ চরিত্রতার ওপর আমার কোনো বিশ্বাস ছিল না। আমি মেয়েদের দিকে তাকালেই অযথার্থ আকর্ষণ অনুভব করতাম। কোনো অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার শক্তি আমার ছিল না। স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতাম মূলত যৌন কারণে; কিন্তু এ ভালোবাসয় আমার নিজেরই কোনো দায়-দায়িত্ব ছিল না। এখন যখন এসব কথা ভাবি আমার নিজের বিচারে আমার নিজেকে খারাপ লোক বলে মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে একদিন এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেল। কাফেলার মালিক নজমুল হক সাহেব মাসের বেতন মাসে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একটু গড়িমসি করতে লাগলেন। এতে আমার ধারদেনা হয়ে যেত এবং ঋণের কারণে গালমন্দ শুনতে হতো। বিষয়টি নিয়ে একদিন কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল নজমুল হকের সাথে। তিনি আমার সাথে অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করলেন।

আমি মুখের ওপর বলে ফেললাম আজ থেকে আমি আর কাফেলায় কাজ করব না। যেই কথা সেই কাজ। সোজা হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম নবাবপুরে এবং নবাবপুরের মাঝামাঝি এসে ফজল শাহাবুদ্দীন যে পোস্ট অফিসে কাজ করতেন সেখানে এসে উঠলাম। দেখি ফজল শাহাবুদ্দীন চিঠিপত্রের ওপর ঠাস ঠাস করে সিল মারছেন। আমাকে দেখে থামলেন। কী ব্যাপার আল মাহমুদ! আমি বললাম, কাফেলার চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ফজল হেসে বললেন, খুব ভালো কাজ হয়েছে।

ফজলের ক্ষুদ্র পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার ছিলেন অত্যন্ত ভালো লোক। তিনি জানতেন আমি কবি ও ফজল শাহাবুদ্দীনের বন্ধু। ভদ্রলোকটি আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। সম্ভবত আমার কথা তার কানে গিয়েছিল। তিনি বললেন, ফজল সাহেব আপনার বন্ধু এসেছেন। যান, আজ চলে যান।

আমরা এসে রাস্তায় নামলাম। ফজলের মনে হলো আমার চাকরি হারানোতে তিনি মোটেই উদ্বিগ্ন নন। বরং খুশিই মনে হলো।

আমি তার এই খুশিভাব দেখে একটু খোঁচা দিলাম। হেসে বললাম, আমি তো আর কাফেলায় নেই। এতে সবচেয়ে ক্ষতি হলো বোধ হয় আমার বন্ধুদের। এখন আপনাকে কবিতা ছাপাতে হলে দৈনিক আজাদে গিয়ে হাবীব ভাইয়ের শরণাপন্ন হতে হবে। আর হাবীব ভাই আমার মতো বন্ধুপ্রীতি দেখানোর মানুষ নন। তিনি এ দেশের শুধু বড় কবিই নন, একজন নিষ্ঠাবান বড় সম্পাদকও।

ফজল সাহেবকে নবাবপুর থেকে বিদায় দিয়ে আমি হাঁটতে হাঁটতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গুলিস্তান সিনেমার নিচের তলায় এয়ারকন্ডিশন কাউন্টারে এসে দাঁড়ালাম। তখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে অনেক লোকই গুলিস্তানের এ আরামদায়ক এয়ারকন্ডিশন করা জায়গাটিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। কর্তৃপক্ষ এতে কোনো বাধা দিত না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত সিনেমার একটি টিকিট কিনলাম। ছবিটির কী না নাম ছিল তা এখন আর মনে নেই। কিন্তু দু'জন নায়িকার নাম কেন যেন এখনও মনে আছে। একজন আভা গার্না অন্যজন প্রিয়ের এনজেলি। প্রিয়েরকে আমার অত্যন্ত ভালো লাগত। তিনি তার গলাবন্ধ সোয়েটারের ওপর একটা ক্রসযুক্ত সরু হার পরতেন। খুব সিম্পল পোশাকে সবসময় বঞ্চিত নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। আমার প্রিয় এই অভিনেত্রী শেষ পর্যন্ত মুনাকোর রাজাকে বিয়ে করে তার রাজ্ঞী হয়েছিলেন। সিনেমা হল থেকে বের হলে হঠাৎ আমার এক ঢাকাইয়া বন্ধুর পাল্লায় পড়লাম। তার নাম এখন আর আমার ঠিক মনে নেই। তিনি শহীদ কাদরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু ছিলেন। হঠাৎ একদিন বিউটি রেস্তোরাঁয় ঘোষণা করে দিলেন, আমি তোমাদের কবিতা-ফবিতা লিখব না। ভিখিরির জীবন আমি সহ্য করতে পারব না। আই উইশ টু বি রিচম্যান। পরে এই লোক সত্যিই অনেক ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। এটুকু মনে আছে তিনি বড় বড় হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিক হয়েছিলেন। তার অনেক টাকাকড়ি হয়েছে বলে জানতাম।

তিনি আমাকে হল থেকে বের হতে দেখে টেনে সিনেমা হলের পেছনে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে আশ্চর্য মজাদার কাবাব, চটপটি ও ফোসকা খাওয়ালেন। আমি ঢাকায় বহুদিন ধরে এলেও এ ধরনের খাদ্যের আস্বাদ কখনও গ্রহণ করিনি। একবার খেয়েই আমার আসক্তি বেড়ে গেল। প্রায় ক্ষীরি কাবাবের লোভে কত সন্ধ্যায় যে আমি এখানে এসে ভিড় করেছি।

১৪

কাফেলার চাকরি ছাড়ার কিছুদিন পর শুনলাম কবি শামসুর রাহমানের অনুরোধে নজমুল হক সাহেব সেখানে কায়সুল হককে নিয়োগ করেছেন। আমার এতে খারাপ লাগার মতো কিছুই খুঁজে পেলাম না। বরং মনে হলো কবি আবদুর রশিদ ওয়াছেকপুরী যেভাবে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাতে আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাকে ফেরাতে পারতাম। আমি লোভী ছিলাম বলেই তা করিনি। আজ কাফেলায় আমার বদলে কায়সুল হক এসে বসেছেন এটা তো অস্বাবাভিক কিছু নয়।

আমি এসব নিয়ে আর ভাবার মতো অবস্থায় ছিলাম না। রাতে পত্রিকার কাজ করে সকালে ডিউটিতে গিয়ে শহীদের সাথে লাঞ্চের পূর্ব পর্যন্ত বসে থাকতাম। আড্ডা গরম হয়ে উঠলে বিউটি বোর্ডিংয়েই লাঞ্চ সেরে নিতাম। উল্লেখ্য, বিউটিতে যাদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল তাদের কয়েকজনের নাম আমি আগে উল্লেখ করেছি। যাদের নাম বাদ পড়ে গেছে তাদের মধ্যে একজন হলেন শহীদ সিংহ ও নূরুল হক বাচ্চু। তারা তখনও জগন্নাথের ছাত্র। এরা পরবর্তীকালে অনেক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। শহীদ রাজনীতি, ব্যবসায় এবং নানাবিধ কারণে খ্যাতিমান হয়েছেন। আর নূরুল হক বাচ্চু চলচ্চিত্র নির্মাণে পরিচালক হিসেবে সুপরিচিত ব্যক্তি। জহির রায়হানের সাথেও আমার বিউটিতেই পরিচয় হয়েছে। তিনি সদালাপী ছিলেন না। কথা কম বলতেন বলে তার সাথে আন্তরিকতা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু আমি তাকে শ্রদ্ধা করতাম। ক্রিয়েটিভ মানুষের সব দিক থাকে না।

আরও একজনের কথা আমার খুব মনে পড়ে। কিন্তু তার নামটা ভুলে গেছি। নাম ছাড়া সাহিত্যে কোনো কাম হয় না। পরবর্তী সময়ে এই রচনা লিখতে লিখতে যদি তার নামটা স্মরণ রেখার ওপর ফিরে আসে তবে তার কথা লিখব।

'চল বাড়ি চলে যাই' এই অবস্থা আমাকে এক ঘোরের মধ্যে রেখেছে। রাতে ভালো ঘুম হয় না। সকালে ফজরের আজানের সাথে সাথে বিছানা ছেড়ে উঠে যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনও দোকানপাট সব বন্ধ থাকে। মানুষ ঠিকমতো জাগেনি। আমি একা একা নবাবপুর ধরে ঠাটারিবাজারের মোড় পর্যন্ত হেঁটে আসি। শুধু ভিস্তিওয়ালা ছাড়া তেমন কোনো মানুষের সাড়াশব্দ থাকে না। মনে হয়, নবাব রোডটাই ছিল ঢাকার প্রাণকেন্দ্র এবং এটাকে ধুয়েমুছে রাখার জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের একটা বিশেষ দায় ছিল।

কায়সুল হক কাফেলায় আসার পর আমি আর কোনোদিন ওই অফিসে যাইনি। এই ঘোরের মধ্যে একদিন মনে হলো কবি আহসান হাবীবের বাসায় গিয়ে আমার বন্ধু ওমর আলীকে দেখে আসি। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানলাম ওমর আলী এখন আর এই বাসায় থাকে না। চকবাজারে কোনো পুরান ব্যবসায়ী বাইন্ডিং কারখানার মালিকের বাড়িতে লজিং থাকেন। আমি খুঁজে পেতে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম খাঁটি ঢাকাইয়া পরিবেশে 'মাস্টার সাব' ওমর আলী বেশ মানিয়ে নিয়ে অনবরত কবিতা লিখে চলেছে।

পরিবেশটি আমার বড়ই ভালো লাগল। আমি ওমরকে পরামর্শ দিলাম এই আশ্রয়টি যেন সে পরিত্যাগ না করেন। শেষ পর্যন্ত আমি সুটকেস এবং বিছানাপত্র রোল করে বেঁধে গাড়িতে এসে বসলাম এবং ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্টেশনে এসে নামলাম। কিন্তু যার জন্য এতদূর ছুটে আসা, সে দু'একদিন আগে কুমিল্লা চলে গেছে। আমার স্ত্রীর বড় বোন বললেন, তখন কুমিল্লা সদর হাসপাতালে থাকতে। তার স্বামী ড. কাজী গোলাম আম্বিয়া ছিলেন ওই হাসপাতালের কেমিস্ট। সম্ভবত আমার শ্বশুর বড় মেয়েকে দেখতে যাওয়ার পথে আমাদের বাড়ি থেকে তার ছোট মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন। এখন আমি বাড়িতে এসে সহসাই কুমিল্লায় গিয়ে কি করে উপস্থিত হই! লজ্জা-শরম বলে একটা কথা আছ। অন্যদিকে আমার মায়ের কাছে জানলাম, তার বউমা কমপক্ষে এক সপ্তাহের জন্য পাড়ি জমিয়েছে। অবশ্য আম্মা আমাকে কুমিল্লায় যাওয়ার জন্য খুবই উসকাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি একটু আত্মসম্মান এবং একটু দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে বাড়িতেই থেকে গেলাম। এতে আমার একটি মহৎ উপকার হয়েছিল। সেটা হলো এ সময় আমি আমার ফেলে যাওয়া বাউণ্ডুলে বন্ধুদের আবার খুঁজে বের করতে পারলাম। এরা ছিল আমার কৈশোর জীবনের ঘরপোড়া বাছুরের দল। এদের কোনো বিত্তবেসাত বা স্থায়ী ঠিকানা বলে কিছু ছিল না। এরা পিতৃ-মাতৃহীন এতিমও নয়। কিন্তু পিতা-মাতার প্রতি এদের কোনো আগ্রহ ছিল না। পিতা-মাতারও এদের প্রতি কোনো দায়িত্ববোধ ছিল বলে মনে পড়ে না। এদের নিজের জীবনের প্রতি কোনো স্বার্থপরতা আমি দেখিনি। তারা গল্প শুনতে ভালোবাসত এবং বেশিরভাগ সময়ই আড্ডায় মশগুল থাকত। এরা আহার-নিদ্রার পরোয়া করত না। স্বার্থপতা এদের চিন্তার ত্রিসীমায়ও ছিল না। এরা আমাকে কবি করে তুলেছিল। গল্প বলার অফুরন্ত ভাণ্ডার আমার মধ্যে সুপ্ত আছে। আমার জীবনে এরাই তা জাগিয়ে দিয়ে কথাশিল্পী করে তুলেছিল। আমি এদের সবার নাম মনে রাখিনি। মনে রাখিনি কারণ আমার জীবন হলো স্বার্থপর কবির জীবন। তবুও এদের কারো কারো কথা আমার সাহিত্যে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন এক গরুর গাড়িওয়ালার পুত্র সোলেমান। একজনের নাম জবান। একজনের নাম আলীম। আর একজন চিত্রালয় সিনেমা হলের চা-অলা। নামটা এই মুহূর্তে স্মরণে আনতে পারছি না। এরা আমাকে কথক হিসেবে গড়ে তুলেছিল। কাহিনিকার হিসেবে আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট করে দিয়েছিল। কবি হিসেবে কল্পনাপ্রবণ করে তুলেছিল। এদের অপরিসীম ঋণ আমার রক্তকনিকায় আমি বহন করছি।

রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির মতো ছিল না আমার জীবন কাহিনি। কিন্তু আমি ম্যাক্সিম গোর্কির 'পৃথিবীর পাঠশালা' পড়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল এই লেখকের সব ঘটনা আমার জানা আছে। বাড়ি ফিরে নাদিরাকে না পেয়ে আমি আমার সেই পরিতৃপ্ত পচাগলা হাড়গোড়বিশিষ্ট নিঃস্বার্থ বন্ধুদের খুঁজে বের করলাম। সবাইকে আমন্ত্রণ করলাম বাড়িতে। ভালো কিছু খাওয়ার লোভ দেখালাম। নিজে গিয়ে বাজার করলাম। আমার মা সাধ্যমতো তাদের জন্য মজাদার রান্না প্রস্তুত করলেন। আক্ষেপের বিষয়, আমার বন্ধুরা সবাই এলো না। যে দু'একজন এসেছিল তাদেরও কোনো উৎসাহ ছিল না। একজন তো মুখের ওপর বলে দিল, তুই তো অনেক বড় হয়ে গেছিসরে পিয়ারু। অনেক বড়—আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। দে একটা সিগারেট দে।

তারা খেয়ে চলে গেলে আমি আমার পশ্চিমের ঘরটায় একা একা কাঁদলাম। কখনও নিঃশব্দে কখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আমার মা সব দেখলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। আমাকে বরং একা থাকতে দিলেন। পরে জেনেছি তিনি গোপনে কুমিল্লায় আমার স্ত্রীর কাছে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এ সময় আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কয়েকজন বিখ্যাত অলির মাজারে যাওয়ার একটু অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে কাজী খোনকারের মাজার থেকে শুরু করে অন্যান্য বুজুর্গদের মাজারে আসা-যাওয়া করতে শুরু করেছি।

এক রাতে আমার পিতার শিষ্যের সাথে কাজী খোনকারের মাজারে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার কলকি সাজাচ্ছিলেন। তিনি তার কলকির সম্মান রক্ষার আহ্বান জানাবেন এটা আমি কখনও ভাবিনি। তিনি তার কলকিতে দম নিতে নিতে হঠাৎ আচমকা আমার দিকে জোড় হাতে কলকিটি তুলে ধরলেন। এ অবস্থায় আমার আব্বাকে আমি পড়ে যেতে দেখেছি। তিনি কলকিটি স্পর্শ করতেন। কিন্তু অত্যন্ত সম্মানের সাথে অন্যের হাতে তুলে দিতেন। আমি এটা পারলাম না। আমি কলকিটা কানের দিকে সোজা রেখে বিরাট শক্তিতে কয়েকটা দম মেরে দিলাম। আমি ওখানে ঝিম ধরে কিছুক্ষণ বসেছিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন চেতনা চেতনে আবার সম্বিত ফিরে পেলাম তখন দেখি সন্ধ্যা এখন ভোরবেলায় পরিণত হয়েছে। ঘাসে যেমন শিশির পড়ে থাকে তেমনি আমার পশমের কোটের ওপর শিশির বিন্দু জমা হয়েছে।

অথচ সারা শীতের রাত আমার ওপর দিয়ে বয়ে চলে গেছে। অথচ না, আমার কোনো সর্দি হয়েছে, না আমি কাশলাম। দেখলাম আমিকাজী খোনকারের দরগায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মাটিতে শুয়ে আছি। কোথাও কেউ নেই। একা হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে চলে এলাম। টোকা দিতেই দরজা খুলে যিনি দাঁড়ালেন তিনি আমার স্ত্রী। আমার চেহারার ছবি-সুরত দেখে আঁতকে চিৎকার দিয়ে উঠলেন আম্মাগো বলে।

আম্মা এই চিৎকার শুনে এক লাফে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ঠেলে আমাকে তার লেপের ভেতর লেপচাপা দিলেন।

১৫

হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ায় কথাটি এখানে উল্লেখ করতে চাই। সেটা হলো, আমি এবার বাড়ি আসার কিছুদিন আগে কবি ওমর আলীর প্ররোচনায় দৈনিক সংবাদের খেলাঘর পাতার সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। হাবিবুর রহমান ছিলেন সে সময়ের একজন দক্ষ সনেটিয়ার। আমি খেলাঘর আসরে যেতেই তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। খেলাঘর আসরের জন্য কী এনেছ? আমি হতভম্ব! আমি কোনো লেখা নিয়ে আসিনি। হাবিব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সহসা মনে পড়ল, আমি একদিন আগে মাত্র একটি ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক থেকে 'ইফ আই নিউ দ্য বক্স' কবিতার একটি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছিলাম। লেখাটি আমার পকেটেই আছে। আমি অনুবাদটি পকেট থেকে বের করে কবি হাবিবুর রহমানের দিকে মেলে ধরলাম।

তিনি লেখাটি আমার সামনে আবৃত্তি করলেন এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বারবার বলতে লাগলেন–

'হাসির বাক্স কোথায় আছে যদি জানতাম সন্ধান,
যত বড় তার চাবি হোক ভাই আনতাম খুঁজে খুঁজে।'

হঠাৎ তিনি বললেন, এ দুটো লাইনের মূলটা একটু পড়ো তো। আমি বললাম, ইফ আই নিউ দ্য বক্স হয়ার স্মাইলস ওয়ার ক্যাপ্ট নো ম্যাটার হাউ লার্জ দ্য কি। পড়তেই তিনি আমাকে প্রায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, এ সংখ্যায় লেখাটা যাচ্ছে।

লেখাটা পরের সংখ্যায় খেলাঘরে প্রকাশিত হলো। আক্ষেপের বিষয়, আমি শেষ পর্যন্ত খেলাঘরের সঙ্গে আর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারিনি। কারণ, কাব্যে আমার উর্ধ্বগতি। এর মধ্যে আমার লেখা কলকাতার সর্বোচ্চ পত্রপত্রিকায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সেই যে আমি চিতাস চরের ছেলে দিয়ে সত্যযুগে শুরু করেছিলাম, আমি তো আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। বাংলা কবিতার তিরিশ দশকীয় বিরাট আবর্তের মধ্যে চোখে পড়ার মতো পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি। যারা কাব্যরসিক তারা আমার আরবি নামটিতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন।

আমার দাদা আমার নাম রেখেছিলেন মীর মোহাম্মদ আবদুস শোকুর আল মাহমুদ। আমি তা সংক্ষেপ করে আল মাহমুদ নামে লিখতে শুরু করেছি। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকনাম পিয়ারু। এই শব্দটির খোলস কাটিয়ে প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে। এখন শুধু পাখার রঙ-বেরঙে চিত্র দেখিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো। তবে এই সময় এ দেশের সাহিত্য সম্পাদকদের গোমড়ামুখো অক্ষমতা ও অবিচেনাপ্রসূত প্রত্যাখ্যানের আঘাতে আমার পাখনা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা কম করেনি। এতদিন যাদের বন্ধু ভাবতাম তারাও এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূক্ষ্ম হুল বসিয়ে দিতে তৎপর।

তবু আত্মসম্মান বড় বালাই। কী যেন এক আত্মসম্মান বোধ ও কবিত্বের অহঙ্কার আমাকে পেয়ে বসেছে।

আমি কোনো ব্যাপারেই সহজে হার মানতে চাইতাম না। আমাকে নিয়ে কোনো বিতণ্ডা বেধে গেলে আমি ধৈর্যসহকারে তা শুনতাম এবং জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতাম। এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, বেগম পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর একটি কবিতা ছাপা হলো। কবিতাটি এতই মাধুর্যমণ্ডিত ছিল যে, সবাই চমকে গিয়েছিল এটা আমি মনে করতে পারি। তখন সম্ভবত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বেগম, সওগাত ইত্যাদি দেখাশোনা করছেন। কেউ কেউ সন্দেহ করলেন কবিতাটি যার নামে ছাপা হয়েছে হয়তো বা রচনাটি তার নাও হতে পারে। নিশ্চয় এতে গাফ্ফার চৌধুরীর কিছু অবদান আছে।

আমি অবশ্য এটার বিরুদ্ধে মত পোষণ করতাম। আমি ভাবলাম, লেখাটি যার নামে ছাপা হয়েছে সেটা তো তারও হতে পারে। আমি আজ এত দীর্ঘদিন পরে সেই লেখিকার নাম উচ্চারণ করতে চাই না। কারণ পরবর্তী জীবনে তিনি তো আর কবিতা রচনার জন্য জীবন ব্যয় করেননি। তবে তিনি একেবারে অখ্যাতও ছিলেন না। এদিক-সেদিক তার লেখা দেখতাম। একবার পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সংঘ নামক একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের আসরে তাকে দেখেছিলাম। তাকে মনে হয়েছিল শ্যামবর্ণা ছোটখাটো এক বালিকার মতো। হয়তো তার আকার-আকৃতি, চেহারা-ছবি-সুরতের চেয়ে তার সাহিত্য প্রতিভা ছিল একটু বেশি অগ্রসর। আর সম্ভবত সে কারণে তিনি ভারসাম্য বজায় রেখে সাহিত্যে একনিষ্ঠতা অবলম্বন করতে পারলেন না। মেয়েদের এই দুঃখের কাহিনি আমার যেহেতু অল্পবিস্তর জানা ছিল, সে কারণে আমি ওই মহিলার, যাকে প্রথম দেখে আমার বালিকা মনে হয়েছিল।

যারা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ইতিহাসে মেয়েদের লেখালেখির এই বৈপরীত্য সম্বন্ধে অবগত আছেন। তারা নিশ্চয় আমার এ ইঙ্গিতটা উপলব্ধি করবেন।

আমাদের সময় এই ঢাকায় কত উজ্জ্বল মুখ নারী প্রতিভা লেখার জগতে আসতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তারা কেউ সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত থাকেননি। কেন থাকেননি এ বিষয়ে আমি আর নিষ্ফল আলোচনা করতে চাই না। তবে এটুকু বলব, তারা প্রতিভাবান ছিলেন। সাহসিও ছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসি ছিলেন না। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সাহিত্য সৃজনশীল লেখককে দুঃসাহসি হতে প্ররোচনা দেয়। যারা এই প্ররোচনা গ্রহণ করতে পারেননি তারা থাকেননি। এখানে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। আমরা মেয়েদের কথা বলি মেয়ে বলে। কিন্তু কত প্রতিভাবান যুবক যে সাহিত্য ছেড়ে চলে গেছেন তার হিসাব কে জানে, কে রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জন্য সবচেয়ে অসুবিধা ছিল যে, আমার এ শহরে কোনো মুরব্বি ছিল না। আপনজন তো নয়ই। অথচ আমি যা কিছু পছন্দ করি, সুখাদ্য, সুরুচি, সৌহার্দ্য এবং সুন্দরী নারী—সবই এই ঢাকা শহরেই আমি বারবার খুঁজে পেতে বের করতে পেরেছি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যাকে বলে বন্ধুত্ব তা আমি আজও এ শহরে খুঁজে পাইনি। হতে পারে যে, আধুনিক মানুষের কোনো বন্ধু হয় না। আর কবির তো নয়ই।

এই রচনায় আমি ইতিপূর্বে যাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল বলে উল্লেখ করেছি তারা সবাই ছিল আমার প্রতিদ্বন্দ্বি। ছিল ঈর্ষাকাতর এবং একই সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকার মানসিকতায় চতুর। এই চাতুর্যকে তো আর বন্ধুত্ব বলা যায় না।

ওমর আলীর সঙ্গে আমার হৃদয়ের একটা যোগ স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ওমর ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিনির্ভর মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জমান। এখনও তিনি আগের মতোই আছেন। আমি এতে কোনো দোষ দেখি না। কবির পরিতৃপ্তির চেয়ে অন্যতর প্রবৃদ্ধি তাকে কোনো সাহায্য করে না। তবে একটা বৈপরীত্য আমি আজও বুঝতে পারি না। সেটা হলো ওমর ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। পড়াশোনাও করেছিলেন ব্যাপকতর আগ্রহে। চশর থেকে ইলিয়টস পর্যন্ত সবই ছিল তার নখদর্পণে। তবুও চিরহরিৎ নিঃস্বর্গে নিমজ্জমান থাকতে ওমর আলী কেন নিজেকে এত ঘোরের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন তা আমার বোঝার কেনো সাধ্য আছে বলে আমি মনে করি না।

AMARBOI.COM

১৬

বেশ কিছুদিন বাড়িতে থাকলাম। কাজ নেই, কর্ম নেই, ঢাকা, কলকাতা সাহিত্য সংস্কৃতি কোনো কিছুতেই আকর্ষণ নেই। যে আকর্ষণে আমি ঘরে ফিরেছি তার উদার অন্নজলে, প্রেমে, পরামর্শে আমি গভীরভাবে পরিতৃপ্ত। আকাঙ্ক্ষা মিটে গেলে আর যাই হোক কাব্য সৃষ্টি হয় না। আমি তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পরিচিত মুখ অনুসন্ধান করতে করতে কিংবা বলা যায় আড্ডা মারা লোক খুঁজতে খুঁজতে অকস্মাৎ পেয়ে গেলাম এক প্রতিভাবান হোমিও চিকিৎসক। তার নাম চণ্ডিপদ চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে অসমান বয়সী হলেও আমার এক ভাতিজা মোহাম্মদ মুসা হয়ে উঠল আমার নিত্যসঙ্গী। তার পরামর্শে এবং সহযোগিতায় আমি স্টেশন রোডে কিশোর প্রগতি মজলিশ নামে একটা পাঠাগার সৃষ্টি করলাম। এর অধিকাংশ বই ছিল বন্ধ হয়ে যাওয়া লালমোহন স্মৃতি পাঠাগার থেকে পাওয়া। এসব বই মোহাম্মদ মুসা এনে কিশোর পাঠাগারে তুলেছিল। আমার এ প্রয়াস আমার পরিবারের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করলেও কেউ কিছু বলল না। কারণ সবাই জানে, আমি লেখাপড়া করি। কবিতা লিখি। বড় কাগজে ছাপা হয়। অন্যায় তো কিছু করিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যেহেতু আমি বিবাহিত এবং রুজি-রোজগারের কোনো সংস্থাপন করতে পারছি না। ঢাকায় ছিলাম। টিকতে না পেরে বাড়ি ফিরে আসলাম। এটা আমার পরিবার-পরিজনের কাছে আক্ষেপ হয়ে দেখা দিল।

আমার শ্বশুরবাড়িতেও আমাকে নিয়ে চিন্তার অন্ত রইল না। কিন্তু আমার স্ত্রীর হাসিমুখ দেখে আমার শ্বশুর আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে পারেননি। আমার স্ত্রী যে আমাদের বাড়িতে মহাআনন্দে আছে দেখে তিনি বেশ অবাক হয়ে থাকতেন। আর আমার স্ত্রীরও একটা পরম গুণ ছিল। সেটা হলো, সে যখন বাপের বাড়ি যেত তখন শ্বশুরবাড়ির গুণকীর্তন করত। শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে একটি কথাও হজম করতে পারত না। যখন আমাদের বাড়িতে থাকত তখন নিজের বাপ-মায়ের এবং তাদের বংশ মর্যাদার দর্পে গরিয়ানভাবে চলাফেরা করত। এই গুণের জন্য আমি মহাআনন্দে ছিলাম।

যে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের কথা উল্লেখ করেছি তিনি খুবই একটা কাব্যপ্রেমিক ছিলেন এটা বলা যাবে না। তবে আমাকে খুব পছন্দ করতেন। পছন্দ করতেন মোহাম্মদ মুসাকেও। অন্যদিকে আমার জন্য আরেকটি বিশ্রামহীন আড্ডার উষ্ণ ব্যবস্থা সৃষ্টি হলো। সেটা হলো আসাদ চৌধুরী বলে এক কবি। তিনি ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে নিজের বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। তার কাছে ঢাকার অনেক কবি আসা-যাওয়া করছিল। তারা সবই জানত যে, আমার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং নিয়মিত আসাদ চৌধুরীর ডেরায় গিয়ে হাজির হতাম। এই সূত্রে অনেক বিচিত্র মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তারা সবাই ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। তারা এখনকার শিক্ষকদের মতো ছিলেন না। তারা লেখাপড়ায়, জ্ঞান-গরিমায় অনেক উঁচুদরের মানুষ ছিলেন। সম্ভবত সেখানে আসাদ চৌধুরীর ডেরায় আগত অতিথি হিসেবে আমার সঙ্গে আহমদ ছফার সাক্ষাৎ হয়েছে। তার কথা বলার বিশিষ্ট ধরন, চোখ-মুখের কায়দা-কানুন, এক্সপ্রেশনের তাক লাগানো বিষয়াদি আমাকে তেমন প্রভাবিত করতে না পারলেও, তার বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক পড়াশোনা, শ্রেণিবিভাজন নিয়ে উদ্দীপনা, কথাবার্তা এবং লেখাপড়ার বহু বিস্তীর্ণ পরিধি আমাকে মুদ্ধ করে ফেলেছে। আমাকে প্রথমদিনই আহমদ ছফা আংকেল বলে সম্বোধন করেছিলেন। হতে পারে সেটা ব্যঙ্গার্থে। আমি কিন্তু এ সুযোগটি কখনও ছাড়িনি। আমি তাকে যখন যেখানে পেরেছি কেমন আছ ভাতিজা বলে হাত বাড়িয়ে দিতাম। মেজাজ ভালো থাকলে সে আমার সঙ্গে খুব বিনীত ব্যবহার করত। আর মেজাজ খাট্টা থাকলে শামসুর রাহমানের প্রসঙ্গ তুলে দু'হাত জোড় করে আকাশের দিকে তুলে প্রণাম করতে করতে বলত 'দেবতা'। অর্থাৎ শামসুর রাহমানকে দেবতুল্য ব্যক্তি হিসেবে সে মান্য করে এটা আমাকে চিমটি দিয়ে বুঝিয়ে দিত। আমি এসব জেনেও আহমদ ছফার আড্ডাখানায় পরে ঢুঁ মারতে ভুলে যাইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসাদ চৌধুরীর বেশ জমজমাট অাঁতেলেকচুয়াল আসর পাকাপাকিভাবে বসে গেছে। এতে আমার সাহিত্য বাসনা আবার ঘর থেকে ভিন্নমুখী হওয়ার উপক্রম হলো। এর মধ্যে আমার এ অর্থহীন সময় কাটানো আমার পিতার কাছে হয়তো বা ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ ভোরবেলা নাশতার সময় আব্বা আমাকে ডেকে আনতে বললেন।

আম্মা আমাকে আব্বার বার্তা জানালে আমি দ্রুত উঠে আব্বার নাশতার দস্তরখানে গিয়ে হাজির হলাম। আব্বা কোনো ভূমিকা না করে বললেন, আবার ঢাকায় যাও। আমার মনে হয় ঢাকায় তোমার কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে। চলে যাও। বড় হতে হলে একটু কষ্ট করতে হয়। তোমার একটু স্থির হয়ে লেগে থাকার অভ্যাস করা উচিত। বউমা এখানে থাকুক। কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই ঢাকায় ফিরে যাও। আমি তোমার জন্য বিশেষ করে দোয়া করেছি।

আমার টুঁ শব্দটি করবারও সাহস হলো না। ততক্ষণে আমার স্ত্রীও আমার মায়ের দেহের আড়ালে লুকিয়ে আমার পিতার কথা শুনে ফেলেছে।

আমার বাপের কণ্ঠস্বর এতটুকু কর্কশ ছিল না। বরং গলায় আমার প্রতি দরদ যে উপচে পড়ছে সেটা আমি বেশ ভালো করেই বুঝেছিলাম।

আব্বা যখন বলছিলেন যে, তোমার জন্য দোয়া করেছি তখন আমি বুঝলাম তিনি তার প্রভুর কাছে আমার জন্য এমন কিছু চেয়ে বসেছেন যা পাওয়ার যোগ্যতা আমার এতটুকুও আয়ত্তে আসেনি। আব্বা নাশতা সেরে চলে গেলে আম্মা আমাকে বললেন, তোর বাপ কাল সারারাত এমনকি তাহাজ্জুদ পর্যন্ত তোর জন্য কান্নাকাটি করেছে। আমি অবশ্য এ ব্যাপারে তোকে কিছু বলতে চাই না। তবে মনে হয় ঢাকাতে তোর উন্নতির ব্যবস্থা হবে।

আমার আব্বা এবং আম্মার এসব কথাবার্তা আমার অর্থহীন কামুক জীবনের ওপর চাবুক মেরে দিল। আমি আর আমার স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকাতেই পারছি না। ভাবলাম ঢাকায় চলে যাই। একদিন সন্ধ্যায় আম্মাকে বললাম, আমি ভোরের গাড়িতে ঢাকা চলে যাচ্ছি।

তোর কাছে টাকা-পয়সা আছে?

আপনাদের বউ আমাকে দুশ' টাকা দিয়েছে।

আমি তোকে আরও দুশ' টাকা দেব। চিঠি লিখলে পরে আরও পাঠানোর চেষ্টা করব। তুই চলে যা বাপ।

ভোরের ট্রেনে আমি আবার সেই ফুলবাড়িয়া স্টেশনে এসে নামলাম। একটা টিনের সুটকেস আর লেপ-তোষকসহ একজনের শোয়ার মতো একটা বেডরোল। সোজা গিয়ে বুড়ির ওখানে হাজির হলাম। আমাকে দেখেই অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন বুড়ি। বললেন, 'বদমাশ ছেলে। সায়েরি করো তো এত লটরপটর করো কেন। চাকরি ছাইড়া দোড়াইলা, এই পোলা? বউ খুবই পছন্দ হইছে। আরে আমি তো খুব খুশি। এই এলাকায় থাইক্যা কারো কি বউয়ের দিকে টান থাকে? হোন ভালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইনষের পো, এবার তোমারে থাকার জায়গা দেবার মতো জায়গা আমার নাই। তবে দু'বেলায় খাওয়াবার পারুম। একটা জায়গা বার করতে পারবা না?

আমি কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই বললাম, তাহলে নানি আমার এ বিছানাপত্র একটা দিনের জন্য রেখে দেন। দেখি একটা জায়গা খুঁজে বের করতে পারি কি না।

হঠাৎ মনে হলো একবার নজমুল হক ও লতিফা হকের বাসায় যাই না কেন? আমিও তো উনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি। এমনিই একটু দেখা-সাক্ষাতের জন্য যেতেই পারি।

পঁচিশ নম্বর বনগ্রাম রোডের সেই বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে দরজায় দাঁড়ালাম। কড়া নাড়তেই হক সাহেব গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরা অবস্থায় দরজা খুলে দিলেন।

আরে এ যে আমাদের আল মাহমুদ! ঢাকা ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে? ততক্ষণে লতিফা হক স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে বললেন, ভেতরে আসুন না।

আমি সোফায় গিয়ে বসলাম। লতিফা হক জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথায় কাজ করছেন?

বললাম বেকার। থাকার জায়গা খুঁজছি।

থাকার একটা ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি। কিন্তু আমার দুটি ছেলেকে প্রাইমারি স্টেজে পড়াতে হবে। পারবেন? ইংলিশ মিডিয়াম।

আমি হেসে বললাম, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তাহলে চলে আসুন। আমাদের এই পেছনের ঘরটায় থাকবেন।

আমার মনে হলো আমার জন্য এক অযাচিত মাতৃকণ্ঠস্বর যেন বেজে উঠল। আমি কখনও এ ঋনের কথা ভুলতে পারি না। আমি তার দুই ছেলেকে কিছুদিন ইংরেজি ভাষায় নামতা পড়িয়েছিলাম। আরও কী যেন পড়িয়েছিলাম। আর এর বিনিময়ে এমন কিছু লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, যা ভাবতেও অবাক লাগে। আমি থাকা অবস্থায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদও এ বাড়িতে অতিথি ছিলেন। তার সেবাযত্নের জন্য হক সহেব এবং মিসেস হক সদা তৎপর ছিলেন। হঠাৎ একদিন সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, মাথায় কিস্তি টুপি, ফর্সা, হালকা-পাতলা এক যুবক এসে হাজির হলেন। তিনি সাহিত্যবিশারদের ভাতিজা, ড. আমহদ শরীফ। এ কথা এ জন্য উল্লেখ কলাম যে, ড. শরীফ তার খ্যাতিমান চাচার অত্যন্ত অনুগত হিসেবে আমার চোখে পড়েছিল। এটা একটা স্মরণে রাখার মতো ঘটনা বলেই আমি উল্লেখ করলাম।

ওই বাড়িতেই আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ড. খান সারওয়ার মোর্শেদ এবং তার স্ত্রী নূরজাহন মোর্শেদের। মিসেস নূরজাহন মোর্শেদ তখন সম্ভবত রাজনৈতিক গৌরবে বেশ সুপরিচিত এবং প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কাজী লতিফা হক ছিলেন এই মহিলা নেত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নি।

আমি এতই ক্ষুদ্র ছিলাম যে, তারা বোধ হয় আমার দিকে চোখ তুলেও তাকাননি। কিন্তু ঘটনাটি আমার স্মৃতিতে থাকায় উল্লেখ করলাম মাত্র। এ বাড়িতে থাকায় আরও কিছু সুফল পেয়েছি, যা সময় ও সুযোগমতো বর্ণনা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা গোঁজার একটি ঠাঁই পেয়ে বলা যায় আমি এক রকম বর্তে গেলাম। এ বাড়িটিতে অসুবিধা ছিল, এখানে আমার বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে আনা যেত না। সেটা সম্ভবও ছিল না।

আমি সাধারণত আর্লি রাইজার। চিরকালই খুব ভোরে ঘুম ভাঙে আমার। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকতে এ অভ্যাসটি গড়ে উঠেছিল। আজানের পর জেগে উঠতাম। কোনো কোনো দিন আলসেমি করে শুয়ে থাকলে আব্বা ফজরের নামাজ পড়ে এসে ছেলেমেয়েরা বিছানা ছাড়ছে না দেখে খুবই আপত্তি জানাতেন। কিন্তু মায়ের ব্যাপারে ছিলেন আমার পিতা অত্যন্ত দয়াপরবশ। অত সকালে আমার মায়ের ঘুম ভাঙত না। আব্বা সবাইকে তুলে দিতেন, কিন্তু আম্মার কারুকার্যময় প্রাচীন কাঁঠাল কাঠের খাটটির দিকে এগোতেন না।

সাধারণত কাজের মেয়ে দু'জন ধোয়ামোছা এবং নাশতা তৈরির কাজ করত। আমি যখন খুবই ছোট ছিলাম তখন আলেকজান বলে যে মেয়েটির ওপর আমার নার্সিংয়ের ভার ছিল, সে সব কাজ করত। যেভাবে বেড়ে উঠিতে তার নাম আলকি বলে উল্লেখ করেছি। তার গৃহত্যাগের ট্রাজেডিও নিশ্চয় আমার পাঠক ভোলেননি।

র‍্যাংকিন স্ট্রিটের বাড়িটির আশপাশে কোথাও কমরেড তোহা থাকতেন। পাড়ার সবাই তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। আমি খুব সকালে উঠে মর্নিংওয়াকে যাওয়ার সময় দেখতাম একটি হ্যান্ডব্যাগ হাতে নিয়ে কমরেড তোহা ভাই রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন। আমি সালাম দিলে চমকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাতেন। আমিও তার দৃষ্টিতে পড়ার জন্যই চেষ্টা করতাম।

একদিন এক পানের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমি সালাম দিলে হাসলেন, কী কবি!

আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেতাম। ভাবতাম কমরেড তোহার মতো ব্যক্তি আমি যে কবি তা জানলেন কী করে?

আমি লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে দেখলাম তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। চলে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের নায়ক কমরেড তোহাকে মনে হতো একজন নিঃশব্দচারী রূপকথার নায়কের মতো। সাম্যবাদী নায়ক।

পরে অবশ্য তার সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেটা মুক্তিযুদ্ধের পর।

আমাদের পাশেই কোথাও কবি জাহানারা আরজু থাকতেন, একটা ছোট বস্তির মতো বাড়িতে। একবার মাত্র সেখানে গিয়েছিলাম। তখনও তারা কবিতাঙ্গনের বিশাল বাড়ি ও জমিজমার মালিক হননি। আর ওই পাড়ায় দেখতাম অনেক রাজনৈতিক খ্যাত-অখ্যাত নেতার আনাগোনা।

খুব সকালে আমার কোনো কাজ না থাকায় আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম নবাবপুরের দিকে। তারপর নবাবপুর ধরে হাঁটা শুরু করতাম সদরঘাটের দিকে। এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল যে, নয়নের চশমার দোকানটা পর্যন্ত তখনও বন্ধ দেখতাম। আমি সদরঘাটের কামানটা খুব পছন্দ করতাম। কোনো এক কবিতায় কামানটিকে কালেখার কামান বলে উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে কামানটির নাম ছিল বিবি মরিয়ম। আমি এর নাম দিতে পারি বুড়িগঙ্গা স্নান।

একদিন খুব ভোরবেলা সদরঘাটের বার্কলেন বাঁধ ঘুরে যখন ফিরে আসছি তখন পেছন দিক থেকে কেউ যেন ডাক দিল এই ছ্যামড়া, এই মাস্টর!

আমি ফিরে চমকে গেলাম। পরমা সুন্দরী! বুড়িগঙ্গা থেকে সদ্যস্নাতা। লালপেড়ে সাদা জমিনের শাড়ি পরা। একেই বলে ঢাকাই শাড়ি।

আমি দাঁড়াতেই পরমা সুন্দরী প্রায় আমার শরীরের ওপর এসে পড়ল। এই পোলা তুমি কোথায় পালিয়ে গেছ? আমি কোনো কথা বলছি না। পরমা সুন্দরীর রূপ দেখছি। আজ যতটুকু মনে করতে পারি তার গায়ের রঙ ছিল ফর্সা। চুল ছিল বেশ ঘন। যাকে বলে কেশপাশ।

আরে মাস্টার আমি কী তোমাকে খেয়ে ফেলব ভাই? এককালে আমার তোমার মতো একটা ভাই ছিল। একদম তোমার মতো চেহারা। হায় ভগবান! আমি যার ভালো করতে চাই সেই কি না আমাকে খানকি মনে করে।

আমি মনে করলাম এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরমা সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করার দৃশ্যটি অনেকে হাঁ করে দেখছে। পরমা সুন্দরীও সম্ভবত বিষয়টি লক্ষ করে আমাকে ইশারায় বলল, এই মিয়া হাঁট। দেখ না বেপাড়ার মেয়ে দেখলে বাজার বইসা যায়।

আমি হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছি।

পরমা সুন্দরী হঠাৎ বলে বসল, মাস্টর তোমার নাম কী? কী যেন একটা নাম বলছিলা, আমার ইয়াদ নাই।

আমি ছোট করে বললাম, আমার নাম পিয়ারু।

না এই নাম না। কী নাম যেন কইছিলা, এই পোলা লুকাইবা না। আচ্ছা বুড়ির ডেরা ছাইড়া এখন কই আছ?

আমি বললাম, ঠাটারিবাজারের কাছে।

আমার লগে পাড়ায় যাইবা? তোমারে চা-মিষ্টি খাওয়ামু। আজ আমার ব্রত ভাঙার দিন। রায়সা বাজারের সন্দেহ খাওয়ামু, যাইবা? আর দেহটা দিমু, যাইবা?

আমি সহসা দাঁড়িয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, না বুবু।

কী বললি ছোকরা, আমাকে বোন কইলি?

আমি কী ভেবে যেন ভিক্টোরিয়া পার্কের প্রান্তে এসে হঠাৎ বোকার মতো একটা দৌড় মারলাম। পেছন থেকে পরমা সুন্দরী নিশ্চয় আমার নাম ধরে ডেকেছিল। আজ আর মনে নেই। আমি উপচানো কান্না লুকাতে দৌড়ে পালিয়েছিলাম। বাহান্না বাজার তেপান্ন গলির ভেতর দিয়ে আমি আজও দৌড়ানোর দুঃস্বপ্ন দেখি। বালিশে মাথা ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলি। মনে হয় আমি লক্ষ্মীবাজার, শাঁখারী পট্টির ভেতর দিয়ে, ইসলামপুরের সব গাড়িঘোড়া ঠেলে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটছি। আজ আল্লাহ আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাশ্রয় রাখেননি। কিন্তু এই বাহান্না বাজার তেপান্ন গলির এক উপচানো মায়াবী শহর আমাকে অন্ন দেয়, বস্ত্র দেয়, সম্মান, প্রতিপত্তি দেয়। আর দিয়েছে কবিদের যা একান্ত কাম্য আসঙ্গের আরাম। মনে হয়, কবি হওয়া সত্যি কোনো ইচ্ছার বিষয় নয়। পরম ভাগ্য।

একদিন মর্নিংওয়াক শেষ করে বাসায় ফিরে দেখি মিসেস হক বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি চশমা পরা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। আমি দেখেই বুঝলাম নয়ন। একটু ভয় পেলাম। আমার কাছে আমার একজন মেয়ে বন্ধু এসেছে এটা মিসেস লতিফা হক কীভাবে নিচ্ছেন কে জানে।

আমাকে দেখেই তিনি নয়নকে বললেন, ওই যে আপনার কবি এসে গেছে। বলেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

নয়ন আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে বলল, এই সিঁড়িটা ভারী পরিচ্ছন্ন। আমি এখানে একটু বসি?

আমিও উঠে নয়নের পাশে বসে পড়লাম। কী ব্যাপার নয়ন?

ঠিকানা খুঁজে বের করে চলে এসেছি। একটা খবর জানাতে চাই।

কী খবর নয়ন?

একদিন আগে আমাদের ওই খারাপ পাড়াটায় মাতালদের খুব হট্টগোল হয়েছে। ছুরি মারামারি। তোমার ওই পেয়ারের খানকিটা খুব জখম হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রিকশা থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে বলল, ওই মাস্টারকে বলো একবার আমার খোঁজ নিতে। বলো তোমার বোন । আমি তোমাকে অনেক খুঁজে বের করেছি। তুমি তো আর ওইদিকে যাও না। আর গেলেও আমার দোকানে দাঁড়াও না। আচ্ছা তোমার বউকে আমি যে সোয়েটারটা দিয়েছিলাম, সেটা কী তাকে দিয়েছিলে?

সহসা এক পোচ লাল রঙের উলের উত্তাপ যেন আমার সারা গায়ে আরাম বুলিয়ে দিল। আমি হাত বাড়িয়ে নয়নের হাত চেপে ধরলাম। মনে হলো যে, আমি বোধ হয় পৃথিবীর কোনো প্রথম যুবতির হাত আবেগে চেপে ধরেছি। এ অবস্থায় আমি বুঝতে পারলাম নয়নের থরহরি কেঁপে উঠেছে। আমি হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, নয়ন একটা কাজ জোগাড় করতে পারছি না। তাহলে তোমার ভাবীকে ঢাকায় নিয়ে আসতাম।

ওই পরমা খানকিকে হাসপাতালে দেখতে যাবে?

না।

যেও না। আবার কোন বিপাকে পড়ে যাও! তার চেয়ে বরং একটা কাজের চেষ্টা করো, তুমি যদি চাও আমি আমার দোকানে তোমাকে কাজ দিতে পারি। দোকান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। ফ্রেমের দাম বলে চশমা বিক্রি করবে। করবে? প্রতিদিন এক টাকা করে পাবে। সপ্তাহে সাত টাকা।

আমি বললাম, একটু ভেবে দেখি!

না, ভাবার সুযোগ নেই। ভাবতে গেলে কাজটা খুব ছোট মনে হবে। আসলে তো আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। বাঁচতে চাও না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কোনো জবাব না দিয়ে নয়নের পুরো কাচের চশমা ঢাকা চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এ সময় মিসেস হকের কাজের মেয়েটি আমাদের সিঁড়ির পাশে দুই কাপ চা নামিয়ে রেখে গেল। মেয়েটি হাসছে। একটু দম ধরুন, নাশতা নিয়ে আসছি।

আমি খুব লজ্জাবোধ করলাম। ভাবলাম মিসেস হক নয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্কে নিশ্চয় অন্যরকম ভেবেছেন। আল্লাহ মালুম। কেন মানুষ একজোড়া যুবক-যুবতির ঘনিষ্ঠ হওয়ার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখতে পায়! প্রেম ছাড়া কি আর কোনো সম্পর্ক নেই পৃথিবীতে! যৌবনের সব সম্পর্ক কী প্রেমের সম্পর্ক?

এ সময় মেয়েটি আবার ফিরে এলো। সামনে রাখল এক বাটি খাসির গোশত ও দুটি পরোটা।

ক্ষুধার্ত আমি ও নয়ন পরম পরিতৃপ্তি সহকারে পরমান্ন ভেবে শুরু করলাম।

১৮

বিয়ের পর বহুদিন দৈনিক ইত্তেফাকে যাওয়া হয়নি। এক সন্ধ্যার পর বহুদিনের পরিচিত এবং আমার এককালের আশ্রয়দাতা পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখে নিউজ সেকশন ও প্রুফ সেকশনের সবাই একেবারে হৈচৈ করল। তখন তাহের উদ্দিন ঠাকুর ছিলেন ইত্তেফাকের চিফ রিপোর্টার। আমাকে দেখে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। তার কাছে গেলেই তিনি বললেন, কী হয়েছে? বিয়ে করতে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না?

আমি মাথা নুয়ে থাকলাম। বললাম আমি অসুস্থ ছিলাম। তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, ডাহা মিথ্যা কথা। লাই। আমাকে নিয়ে তিনি সিরাজ ভাইয়ের (সিরাজউদ্দীন হোসেন) টেবিলে এসে দাঁড়ালেন। সিরাজ ভাই মুখ তুলে আমাকে এবং ঠাকুর সাহেবকে দেখছেন। আমি ছিলাম সিরাজ উদ্দিন হোসেনের ভাগিনা জুনিয়র সাব-এডিটর আহসান উল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আহসানের সঙ্গে বহুবার তার বাসায় গিয়েছি। ঠাকুর সাহেব বললেন, অসুখ হয়েছিল, বলছে। ও তো বিয়ে করতে গিয়েছিল। বউ আর অসুখ গুলিয়ে ফেলেছে। সিরাজ ভাই হাসলেন। বললেন, আজই জয়েন করো। পরে তোমার অজুহাত শুনব।

ততক্ষণে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রুফ সেকশনের ইনচার্জ কাজী শহীদুল ইসলাম। যিনি কবি কাজী রোজীর পিতা।

আমি তার পেছনে পেছনে প্রুফ সেকশনে চলে এলাম। সবাই আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। শুধু মুখ ফিরিয়ে থাকতেন মোহাম্মদ আখতার ও লুৎফর রহমান।

আমি দু'জনকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইলাম। কাজী সাহেব আমাকে দেখালেন খাতা। বললেন, তোমার নাম এখনো আমি বাদ দিইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তো পনের দিনের ছুটি নিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলাম। জীবনের স্বাদ চাকতে এক হাতে 'লোক লোকান্তর' অন্য হাতে সৈয়দা নাদিরা বেগম। সত্যি আমি কত ছেলেমানুষ ছিলাম! কিন্তু জানি না ইত্তেফাকের পরিবেশ পিয়ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ব্যক্তি পর্যন্ত কেন আমাকে এত পছন্দ করতেন? কবিতার জন্য? তা তো হতে পারে না। তবে পরবর্তী জীবনে এক মার্কিন কবি মহিলা আমাকে বলেছিলেন, আমার হাসিটি নাকি জগৎজয়ী। তার নাম নাওমী শিহাব নাঈ। এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত সুপরিচিত কবি ব্যক্তিত্ব। তার অন্যতম কর্ম 'আন্ডার দি সিনস্কাই'। বিশ্ব কবিতা সংকলনে তিনি আমার দুটি কবিতা গ্রহণ করেছিলেন। কবিতা দুটির অনুবাদক কবীর চৌধুরী।

আমি রাতেই অনভ্যস্ত হাতে কাজে যোগ দিলাম। স্বাক্ষর করতে গিয়ে দেখি প্রায় আড়াই মাস আমার নাম হাজিরা খাতায় টেনে ধরে রেখেছেন কাজী শহীদ ইসলাম। অত্যন্ত দয়ালু মানুষ ছিলেন তিনি। হতে পারে যে তার কন্যা রোজীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কারণেও তিনি আমার প্রতি মমতা দেখিয়েছিলেন। কী যে আনন্দ হলো তা ভাষায় বর্ণনা করার গদ্যরীতি আমি কোথায় পাব? সারারাত আনন্দে ছটফট করলাম। ঘুম এলো না। পরের দিন সকালে আমার ছাত্রদের ইংরেজি নামতার স্টাইলটা ধরিয়ে দিয়ে ছুটে আসলাম নয়নের দোকানে। নয়ন দোকানের প্রবেশপথে পেছন ফিরে লেন্স বাছাই করছিল। আমার মনে হলো নয়নকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু সংকোচে তা পারলাম না। শুধু ছোট্ট করে পেছন থেকে ডাকলাম, সুনয়নী।

নয়ন পেছন ফিরে আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লেন্স ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল, আমার প্রতি আবার প্রেম উথলে উঠল নাকি? আমার চাকরিটা গ্রহণ করবে মনে হচ্ছে।

আমি পেছন থেকে বললাম, আমাকে একটু ভালো করে দেখ না মৃগনয়না।

এ কথায় চমকে মুখ ফিরিয়ে বসল নয়ন।

আমি হাসলাম। বললাম, নয়ন কেউ কি কখনও কোনো বন্ধুর চাকর হয়? আমি আবার ঢাকার রাজা হয়ে গেছি। ইত্তেফাকে আমার চাকরিটা গত রাতে ঝালাই হয়ে গেছে।

এবার তাহলে বউকে নিয়ে এসে ঢাকায় আস্তানা গাড়তে পারবে?

কেন পারব না?

আমার চাকরি হওয়াতে তাও আবার ইত্তেফাকে সবচেয়ে বেশি খুশি হলেন মিসেস লতিফা হক। তিনি তখন গীত রচনা করেন। গানের রসিকদের কাছে খুব খ্যাত হয়ে উঠেছেন। আমি যে আর তার বাসায় থাকব না এটা বুঝতে পেরে তিনি বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন। হক সাহেব আপনাকে কতটা স্নেহ করেন তা কী আপনি জানেন না?

এ কথায় আমি মাথা নুয়ে থাকলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তী জীবনে ওই পঁচিশ নম্বর বনগ্রাম লেনের বাড়িটির স্মৃতিকে আমি অমর করে রাখতে চেয়েছি। আমার কাবিলের বোন উপন্যাসের ভিত্তিভূমি ও গৃহ পরিবেশ রচনা করেছি ওই বাড়ির ইট, কাঠ ও পাথর স্পর্শ করে।

একদিন বিকেলের শিফটে কাজ করতে করতে মুখ তুলে দেখলাম এক ফর্সা মতোন ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, এই যে আল মাহমুদ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার নাম এখলাস উদ্দীন।

আমি ছড়াকার ও ছড়া সংকলক এখলাস উদ্দীনকে আগে থেকেই অল্পাধিক চিনতাম। আমি সহসা মানুষকে তুমি বলতে পারি না। সেটা আমার পারিবারিক শিক্ষার কারণে। কিন্তু এখলাস আমাকে তুমি করে বলার কারণে আমার তেমন খারাপও লাগেনি। আমি বললাম,বসুন।

আমি এসেছি তোমার একটি পাণ্ডুলিপি চাইতে। আমরা চট্টগ্রামের বইঘর থেকে বাংলাদেশের চারজন কবির সিরিজ বই বের করব। প্রকাশনা হবে অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক। প্রতিটি বই বক্স সজ্জিত হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাদের বই?

শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী। আর বয়স্কদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান। আপাতত এ চারজন।

আমি বললাম, আমি রাজি।

তোমার বইয়ের নাম কী হবে?

'কালের কলস'।

আমার কথায় আনন্দে শিহরিত হলেন এখলাস উদ্দীন। মনে হলো শিশুর মতো খুশিতে উচ্চারণ করলেন, 'কালের কলস'? এ নাম কোথায় পেলে?

আমি বললাম, আমার একটি কবিতা থেকে।

বললেন, তোমার পাণ্ডুলিপিটা এখন কোথায়?

আমি ড্রয়ার থেকে কালের কলসের পাণ্ডুলিপিটি এখলাস সাহেবের হাতে তুলে দিলাম।

এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনার মতো চারজন কবির চাররঙা কভারসমৃদ্ধ প্রকাশিত হলো চারটি বই। আমাদের প্রকাশনা শিল্পের মোড় ফেরার ইতিহাস এতে ঝলমলিয়ে উঠল। কবিতা বাংলাদেশের আধুনিক মানুষের শিক্ষিত যুবক-যুবতি ও অধ্যাপকীয় জগতের পাঠ্য হতে পারে তা এই বইঘরের প্রকাশনা আবিষ্কার করে ফেলল।

এ কথাগুলো উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, কবির জীবনের সঙ্গে এ দেশের প্রকাশনা শিল্পেরও একটা উল্লম্ফন আছে তারও একটা বিবরণ দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করছি।

যাত্রাবাড়ীতে কাসেম সরদারের বস্তিতে আঠার টাকা ভাড়ায় আমি একটি পাকা ঘর পেয়ে গেলাম। কাসেম সরদার আমি ইত্তেফাকে কাজ করি শুনে বাড়িটি দিতে রাজি হয়ে গেলেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, বউ আছে তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলবত আছে। অবশ্য আপনি চাইলে বানিয়েও নিয়ে আসতে পারি।

উচ্চহাস্য করলেন কাসেম সরদার। না না ইত্তেফাকের সাংবাদিকরা তা পারবে না।

কিছুদিনের মধ্যে নাদিরাকে নিয়ে এলাম ঢাকায়। সে অবশ্য খুব খুশি মনে আসেনি। কারণ মোল্লা বাড়িতে বড় বউয়ের মর্যাদার স্বাদ সবে পেতে শুরু করেছিল। এ অবস্থায় ঢাকা চলে আসা এবং সর্বকর্ম নিজ হাতে করার দায়ভার নিশ্চয়ই তাকে বিরক্ত করেছে। অন্যদিকে তার জন্য আরও একটি গৌরবজনক বিষয় হলো সে ছিল পোয়াতি। আমার প্রথম ছেলে মীর মোহাম্মদ শরীফ তখন তার গর্ভে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি চেয়েছিলেন এ সময়টা সে তাদের কাছে বীরগাঁওয়ে থাকবে। আমার ঢাকায় স্থায়ী আবাসিক জীবনের সূচনা হলো। সব কথা দিন-তারিখ মতো সাজিয়ে বলার সাধ্য আমার নেই। যখন যা মনে আসছে তা লিখছি। ঘটনা সাজাতে হলে তার পর্যায়ক্রমে মানতে হয়। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমার হাতে আর সময়ই বা কই? সব সময় ভাবি আর একটি কবিতার বই শেষ করতে পারলেই আমার কাজ বোধহয় পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু কবির সৃজন লালসা দাবাগ্নির মতো। নানাদিক থেকে তাতে যদি দাহ্য বস্তু একত্র হয় তাহলে তা কে নেভাতে পারে?

এ সময় সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো আমার জীবনে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমার কাব্যের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির স্বীকৃতি পাওয়া। আমাকে সবাই বিশেষ করে আমার বন্ধু শহীদ কাদরী একজন গ্রাম্য লোক বলে প্রচার করতে উদ্যোগী হয়। তিনি ভেবেছিলেন আমি এতে খুব ক্ষিপ্ত হব। কিন্তু আমি সহজেই আমার গ্রাম্যতাকে মর্যাদা হিসেবে ঘোষণা করলাম। বললাম, আমি তো গ্রামের লোক। এভাবে পঙ্‌ক্তি রচনা করলাম। এতে তার এবং তার প্রকৃত গুরু শামসুর রাহমানের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল আমি তা এখন ভুলে গেছি। হয়তো বা তাদের প্রতিক্রিয়াকে এতটুকু মূল্য দিইনি বলে তা বিশ্রুত হয়েছি। আমার গ্রাম্যতাকেই আমার উদ্ভাবনার সূতিকা বলে মেনে নেওয়ায় তৎকালীন আরবান কবিকুলের আরোপিত নাগরিকতা ও মূর্খতাকে আমি পাশ কাটিয়ে যেতে পেরেছি। বাংলাদেশে কবিতার ইতিহাস হলো ষড়যন্ত্র, হিংস্রতা ও প্রতিভাকে অস্বীকারের ইতিহাস। এতে প্রকৃত কত কবি যে কাব্য রচনা ত্যাগ করে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন তার কে হিসাব রাখে। অনেকে প্রতিভার ফুৎকারে বাতাসে আগুন ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আমার মনে পড়ছে হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়ীদ আতিকুল্লাহ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ মামুন, আবদুর রশিদ খান, আবদুর রশিদ ওয়াছেকপুরী, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নিলুফার বানু, লতিফা হিলালী ও জিয়া হায়দারের কথা। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কথাও আমি সাহস করে বলতে পারি। তিনি যে আড়ম্বর নিয়ে শুরু করেছিলেন তার কী পূর্ণতা পেয়েছেন? হয়তো আমার এই বিবরণে বিতর্ক সৃষ্টি হবে। এটা জেনেই আমার জীবন দৃষ্টি আমি বর্ণনা করে ব্যাখ্যা করছি। সমালোচনা তো থাকবেই। তবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি একজন কবির নাম উল্লেখ করব যিনি সাহিত্যের নিয়ম পূর্ণ করেও পূর্ণতার সম্মান এই হিংস্র দেশ থেকে আদায় করতে পারলেন না। অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাশিল্পী হিসেবে তিনি যদি গণ্য হতে চাইতেন তাহলে তার প্রতিদ্বন্দ্বি খুঁজে পাই না। জানি না তিনি কবি হতে চেয়েছিলেন কেন? তিনি তো গদ্যেই মহাকাব্য রচনা করেছেন। তার নাম আলাউদ্দিন আল আজাদ।

১৯

আবার স্বাভাবিকতায় ফিরে এলাম। ঘরে বউ। বাইরে ইত্তেফাক জীবনে কাব্যের ঘনঘটা থাকলেও আমার মধ্যে বাস্তব বুদ্ধি, সংসার ও দুঃসাহসিক চিন্তা-ভাবনা সবই মোটামুটি নিজের মধ্যেই সমাহিত হয়ে থাকল। আমি স্বীকার করি, কবির জন্য স্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তবে স্থিতির মধ্যে যে কবিতা হয় সেটা সর্বোত্ত, এটা ভাবি না। অস্থিতির মধ্যেও হয়। অস্থিতি, চাঞ্চল্যের মধ্যে সিগারেটের প্যাকেট উল্টিয়ে রাখতে একটি কবিতা হয়ে যায়। সেই কবিতার নাম হয় 'মায়াবৃক্ষ'।

ভালো তো যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নয়নের কাছে বা ও পথে পা বাড়ালে হঠাৎ গিয়ে ঢুকতাম। দেখতাম, নয়ন লেন্স পরিষ্কার করছে। ওটা তার প্রতিদিনের কাজ। আগেও বলেছি, আমি পেছন দিক থেকে গিয়ে তাকে ফুসলাতাম। সে খুশি হতো বলে আমার মনে হয়েছে। বউ আসার পর ভাবলাম, একদিন নয়নকে ধরে নিয়ে যাই। তার কত আগ্রহ ছিল যে, আমি আমার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে আসি।

যে দিনের কথা বলছি, সেদিন ঢুকেই নয়নের সামনাসামনি পড়ে গেলাম।

এই যে নবাব সলিমুল্লাহ! কী উদ্দেশে নবাবপুর?

আমি হেসে বললাম, তুমি তো বললে বিশ্বাস করবে না, তোমাকে আমার বউয়ের কাছে নিয়ে যেতে চাই।

সর্বনাশ! এমনি দেখ আমি দেখতে ভালো নই। তার ওপর চোখের রোগ। লোকে কানি বলে। আমি কি কোনো কবির বউয়ের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাছাড়া দোকান বন্ধ রাখব কী করে?

এ সময় কোত্থেকে এসে পেছনে দাঁড়াল আমার কবি বন্ধু শহীদ কাদরী।

আরে কই যাও এই চশমাওয়ালির সঙ্গে? চলো গুলিস্তান।

কাদরীর এ মাঝে পড়ে যাওয়ার সুযোগটা পুরোপুরি নিল নয়ন। এই নাও তোমার দোস্ত এসে গেছে। আমি বরং একটু দোকানে থাকি। এ সময়টা খদ্দের আসে। আমি তো তোমার বাসার ঠিকানা জানি। একদিন হঠাৎ আমি যাত্রাবাড়ী গিয়ে হাজির হব।

আমি বুঝলাম নয়ন ফসকে যাচ্ছে। সে দোকানে ঢুকে গেল।

আমি কাদরী সাহেবের সঙ্গে রাস্তায় নামতেই কাদরী সাহেব তার পকেট থেকে একটা বগা সিগারেট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, পিরিতি চলছে নাকি?

আমি বললাম, না কাদরী সাহেব। আপনি একে চেনেন না। আমি এ পাড়ায় যখন ছিলাম তখন ও আমাকে নানা দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। বড় ভালো মেয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন '৬৯-এর গণআন্দোলন তুঙ্গে এবং শেষ পর্যায়ে। অদ্ভুত একটা ছড়া লিখে ফেললাম। এক কারফিউর রাতে বসে।

যাত্রাবাড়ীতে।

নাম দিলাম 'ঊনসত্তরের ছড়া'—

"ট্রাক ট্রাক ট্রাক
শুয়ার মুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ।"

এ ছড়াটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানান আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। গলায় হারমোনিয়াম জড়িয়ে ছাত্র-শিল্পীরা গেয়ে উঠেছিল—

"কোথায় পাব মতিউরকে
ঘুমিয়ে আছে সে
তোরাই তবে সোনামানিক
আগুন জ্বেলে দে।"

দেখতে দেখতে স্বাভাবিক জীবন ঘটনার আবর্তে পড়ে গেল। হঠাৎ ইত্তেফাক বন্ধ করে দিল সামরিক সরকার। আবার বেকার এবং ঢাকায় থাকার আর জায়গা খুঁজে পাইনি আমি। আমার স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি রেখে নিজের বাড়ি চলে এলাম। এ সময় একটা চিঠিতে সৈয়দ আলী আহসান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি সেখানে যাওয়ার আগে একদিনের জন্য ঢাকায় এলাম। সকালবেলা ট্রেন থেকে নেমে নবাবপুর দিয়ে হেঁটে আসছি। হঠাৎ দেখা হলো দাদা ভাইয়ের সঙ্গে, রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই।

এই যে আল মাহমুদ আমি আপনাকে খুঁজছি। আপনার একটি ছবি দরকার।

বললাম, আমি কি পকেটে ছবি নিয়ে হাঁটছি দাদা ভাই? ছবি কেন? আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দাদা ভাই বললেন, আপনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। এ জন্য ছবি দরকার। চলুন ওই স্টুডিওতে ঢুকে পড়ি।

আনন্দে, আলোড়নে, বিস্ময়ে আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—দাদা ভাই?

হ্যাঁ, আগামীকাল ঘোষণা হবে। এ জন্য ছবি দরকার। পুরস্কারটি '৬৮ সালের। কিন্তু ঘোষিত হচ্ছে একটু দেরিতে। একটি ফটোগ্রাফির দোকানে ঢুকে আমরা ছবি তুললাম। দাদা ভাই শিশুসাহিত্যে, আমি কাব্যে। আরও দু'জন ছিলেন। তারা কিসে পেয়েছেন আজ আর মনে নেই। টাকার অংকটা ছিল ৫ হাজার টাকা। আমার জন্য অনেক। অনেক, অনেক, অনেক। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ততদিনে আমার জন্য আমার প্রথম পুত্র প্রসব করেছে আমার স্ত্রী। লজ্জায়, ভয়ে, দারিদ্র্যে আমি শ্বশুরবাড়ি যাইনি। যা হোক বাংলা একাডেমি পুরস্কার আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। অন্যরা যখন আদমজী, রাইটার্স, গিল্ডের পুরস্কার পেয়ে আনন্দে টগবগ করছে তখন আমাকে দেওয়া হলো সম্পূর্ণ উল্টো দিকের পুরস্কার। খুশিতে বাগবাগ হয়ে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন শ্বশুরবাড়ি যাব, তখন এখলাস উদ্দীনের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে হাত চেপে ধরলেন। মনে হয় বাংলা একাডেমির গেটেই ঘটনাটা ঘটেছে।

কী ব্যাপার এখলাস ভাই?

আজ রাতেই চট্টগ্রাম।

আমি বললাম, কী বলছেন? সেখানে কী করতে যাব? এখলাস বললেন, আমরা স্থির করেছি তোমাকে বইঘরে নিয়ে যাব। সেখানে টাপুর টুপুর ও আরও কয়েকটি পত্রিকার প্রুফ দেখার লোক তোমার চেয়ে ভালো আর কে হবে? চলো, ভাই, না করো না। তোমার জন্য থাকার ব্যবস্থা করেছি।

উদ্‌ভ্রান্ত আমি এখলাসের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, আমি একবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসি। তিনি রাজি হলেন না। বললেন, বউ ডেঞ্জারাস ব্যাপার। তুমি একবার বউয়ের কাছে গেলে আর আসবে না। বরং তুমি জয়েন করে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমরা তোমার সব খরচ দিয়ে দেব।

এখলাস তার কথা রেখেছিল। বইঘরের সৈয়দ মোহাম্মদ শফির উদারতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে পাথরঘাটা এলাকায় ইকবাল ম্যানশনের চারতলায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পাশেই ছিল চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত গায়ক শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব। অনেকেই জানেন না যে, বৈষ্ণব একজন খ্যাতনামা প্রেসম্যান ও মেশিনম্যান ছিলেন। এখানেই আমি পরবর্তীকালে 'সোনালী কাবিন'-এর সনেটগুচ্ছ রচনা করি। এখানে থেকে পরিচয় হয়েছিল চট্টগ্রামের বিখ্যাত বংশিবাদক সাহিত্যিক সুচরিত চৌধুরীর সঙ্গে। তার সাথে এ সম্পর্ক, তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, অটুট ছিল। আমার হৃদয়ে আজও অটুট। সবাই শ্যাম বৈষ্ণবের সঙ্গীত সহচরী শেফালী ঘোষের কথা জানেন। তিনি অসাধারণ গায়িকা সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্যামের ঘরে ছিলেন এক অসাধারণ সুন্দরী-রূপসী নারী শ্যামের স্ত্রী রূপে রাধিকা। গুণে ও আতিথ্যে ছিলেন প্রকৃতই আমার ভগ্নির মতো। আমাকে ভাই বলে ডাকতেন। অনেক স্খলন থেকে শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব সে সময় আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। আমি যদি তখন কেবল কবির জীবন গ্রহণ করতাম, নিশ্চিতই আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। 'সোনালী কাবিন' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ শুধু পেছনে পড়ে থাকত। কিন্তু শ্যামের আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে আমি এক পিচ্ছিল ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে এসেছি। আমি তো সব কথা অকপটে বলতে চাই। কিন্তু কী করে বলি! এখনও এদের অনেকে জীবিত। খ্যাতির দিক থেকে কেউ কারো থেকে কম নয়। কেউ আমার কোনো বাক্যে এই কথা বলে যদি বিব্রত হয়, মাহমুদ ভাই কেন এতসব কথা বলতে যাচ্ছে! তাহলে কি আমি মাথার ওপর আর আচ্ছাদন রাখতে পারব?

মাঝে মধ্যে গভীর রাতে শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব উঠে এসে আমার দরজায় টোকা দিতেন। বলতেন, ওঠো কবি আকাশে চাঁদ উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দরজা খুলে দিলে তিনি মুখ বাড়িয়ে আমার টেবিলের ওপর রাখা খাতা দেখতেন। খুশি হতেন আমি এখনও সনেটগুলো পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। খুশিতে গেয়ে উঠতেন, হায়রে সাম্পানওয়ালা ... ।

কবির জীবন কী রকম হয় তার কোনো দৃষ্টান্ত আমার কাছে নেই। অথচ অনেক কবির জীবন-কাহিনি বা স্মৃতিকথা আমি পাঠ করেছি। একবার এক বিদ্বান ব্যক্তি আমার বই 'যেভাবে বেড়ে উঠি' টিভিতে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন—'লোকে বলে আপনার এই বইয়ের পঞ্চাশ ভাগ সত্য এবং পঞ্চাশ ভাগ মিথ্যা'। আমি হেসে বললাম, আপনি তো ইংরেজি সাহিত্যের তুখোড় ছাত্র ছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের খোঁজ-খবর রাখেন। আপনিই বলুন, একটা বই সেটা আত্মজীবনী হোক বা উপন্যাসই হোক এর পঞ্চাশ ভাগ সত্য হলে এটা কি অকল্পনীয় সাহিত্যে সত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়? তিনি পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। কারণ আমার ধারণা এই বইয়ের দ্রুতগতি ও গদ্যের বিদ্যুৎ ওই ভদ্রলোকের আয়ত্তাধীন ছিল না। তিনি রাজনৈতিক পক্ষপাত থেকে আমাকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন। হয়তো আজও চান। কিন্তু আমি তাকে একটা কথা বলতে পারি, পঞ্চাশ দশকের যে ক'জন কবি খ্যাতি-অখ্যাতি নিয়ে বেঁচে আছেন তাদের একটিমাত্র জীবন-কাহিনি। আর সেটি হলো 'যেভাবে বেড়ে উঠি'।

কবিদের জীবন এ রকমই হয়। কোনো কবিই তো সত্য রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাহিত্যে আসেন না। কিন্তু লোক তার মিথ্যাকে সত্য ধরে নিয়ে তাকে পুরস্কৃত করে এবং অমরতার মালায় তার নামটি গেঁথে নেয়। আমি অবশ্য অমর হওয়ার বাসনা থেকে কাব্য রচনা করিনি।

AMARBOI.COM

২০

এখানে একটি কথা হঠাৎ মনে পড়ল, আমি চট্টগ্রাম আসার আগে শহীদ কাদরী আমাকে রায়সাহেব বাজারের চশমার দোকান থেকে ধরে গুলিস্তান রওনা হয়েছিলেন। তিনি সোজা এসে তখনকার গুলিস্তান এলাকার সবচেয়ে ভালো কাবাব প্রস্তুতকারক রেকস রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলেন। এখানে এ সময় ছিল কাদরী সাহেবের আড্ডার আসর। এ আসরে বসলে রাত ১২টার আগে ওঠা যেত না। এখানে ঢুকে কিছুক্ষণ গালগল্প করতে গল্পকার ও কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক এসে প্রবেশ করলেন। হাসান প্রগতিশীল লেখক হিসেবে তখন বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কী একটা বিষয় নিয়ে যেন কাদরী সাহেবের সঙ্গে বেধে গেলে হাসান মার্কসবাদী আদর্শের ওপর তার আস্থার কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করলেন। কাদরী সাহেবের তখন প্রকৃতপক্ষে কোনো আদর্শ ছিল না। ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের কিছু জ্ঞান এবং কিছু দার্শনিক পড়াশোনা। কাদরী সাহেব হাসান আজিজুল হককে নানা রেফারেন্স উল্লেখ করে জব্দ করতে চাইলেন। কিন্তু হাসান ছিলেন অনড়। নিজের আদর্শগত রাজনৈতিক আশ্বাসের ওপর অত্যন্ত অবিচল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কোনো কারণে হোক আমিও তখন হাসান আজিজুল হককে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলাম। আমি জানতাম যে, কাদরী সাহেবের কোনো আদর্শ নেই। তিনি কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যের দোহাই দিয়ে এ দেশের কম ইংরেজি জানা লেখকদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে চাইতেন। হয়তো আজও তার সে অভ্যাস যায়নি। তবে এ দেশে বসে জগৎকে জানা আর নিউইয়র্কে বসে জানা—এই দুই জানার মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য দেখি না।

যা হোক, কথাটা আকস্মিকভাবে উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, হাসানের সঙ্গে আমার আদর্শগত বিরোধ এখন যে পর্যায়ে আছে তা কোনো অবস্থাতেই মিলবে বলে মনে হয় না। আমি তার লেখালেখিরও সামান্য সমালোচনা করে থাকি। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, তিনি তার গল্প-উপন্যাসে নতুন কিছু আমাদের জন্য যোগ করেছেন।

চট্টগ্রামে আসার পর যে ব্যক্তি আমাকে এগিয়ে এসে গায়ে পড়ে আপ্যায়ন করেছিলেন তিনি সুচরিত চৌধুরী। মূলত তিনি সাহিত্যেরই লোক ছিলেন। কিন্তু সঙ্গীত সাধনায় বিশেষ করে বংশীবাদনে বিশেষ পারদর্শিতায় সাধনার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন তিনি আর এর থেকে বের হতে পারেননি। তার পিতা ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। লোকসাহিত্যে ও লোকগীত সংরক্ষক হিসেবে তার খ্যাতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্যাদাপূর্ণ।

আমি বুড্ডিস্ট ট্যাম্পল রোডের ওই বাড়িটির কথা কখনও ভুলিনি। ওই বাড়িটি আমাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। ওই বাড়িতেই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল চট্টগ্রামের অনেক বিত্তশালী লোকের, যারা সুচরিত চৌধুরীকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করত।

এখানে থাকতেই আমার গভীর গোপন পড়াশোনার একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। বইপত্রেরও অভাব ছিল না। একদিন রাতে কাজ শেষ করে বার্মা রাজু হোটেলে ভাত খেয়ে বাসায় ফিরতেই শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব আমাকে বলল, খেয়ে এসেছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ আছে। আমি কিছু বুঝতে না পেরে আমার ঘরের তালা খুলে টেবিলে গিয়ে বসলাম। বৈষ্ণব আমার পেছনে।

ক'দিন আগে আমার বাসায় একটা মেয়ে এসেছিল। ওরা আমার গানের ভক্ত এবং অত্যন্ত নিচু সম্প্রদায়ের মেয়ে। আমার বাসায় এসেছিল, একদিন থেকে ছিল। তাতেই তুমি কী তাকে এই চিঠি লিখতে পারো।

বৈষ্ণব আমার সামনে আমারই লেখা একটি চিঠি মেলে ধরলেন।

দেখো আল মাহমুদ আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসি। ভালোবাসি অবশ্য তোমার কবিতার জন্য। অথচ এই মেয়েটির নামও আমি জানি না। আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে আসে, প্রণাম করতে আসে। তুমি কি তাকে প্রেমের চিঠি লিখবে? এটা কেমন কথা!

আমি মাথা নুয়ে বসে থাকলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ তোমার বউ আছে। একটা ছেলে হয়েছে। এখন তুমি বলো এই যে চিঠি লিখেছ এই মেয়েটিকে তুমি বিয়ে করবে? বলো তো আমি তাকে এনে দিতে পারি। আমি চাইলে তোমার মতো সম্ভ্রান্ত মুসলিম যুবকের হাতে মেয়েকে দিতে তারা অস্বীকার করবে না।

আমি কোনো কথা না বলে মাথা নুয়ে আছি দেখে বৈষ্ণব ঠাস করে আমার গালে একটি চড় মেরে দিল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন ছিল ছুটির দিন। আমাদের ফ্ল্যাটে যে কাজের মেয়ে সকালবেলা এসে ধোয়ামোছা করত সে এসে আমার অনুমতি নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বলল, আপনাকে শ্যামবাবু তার সঙ্গে জলখাবার খেতে বলেছেন।

আমি পাশের কামরায় সব সাজিয়ে দিয়ে এসেছি। যান।

২১

প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান ভোজনরসিক মানুষ। তিনি তার বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বনভোজনের আয়োজন করলেন। আমাকেও ডাকলেন। যতটুকু স্মরণ করতে পারছি একটি বিশাল কাতলা মাছ তিনি স্বহস্তে রেঁধেছিলেন। অপূর্ব স্বাদযুক্ত রান্না আস্বাদন করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। এ পর্বের পরে আলাওল হলে সাহিত্যের ওপর একটি অনুষ্ঠান হলো। সেখানে বাংলা বিভাগের অনেক অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। সবার নাম আমার মনে নেই। ড. মনিরুজ্জামান অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছিলেন। আর সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. আব্দুল করিম। তিনি ইতিহাসের ক্ষণজন্মা পুরুষ হিসেবে উপমহাদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে জানতাম।

সহসা মনিরুজ্জামান আমাকে কিছু বলতে বললেন। আমার জন্য বিষয়টা ছিল একেবারেই নতুন। কারণ ইতিপূর্বে এমনিতেই আমি কোথাও বক্তৃতা করিনি। আর এটা তো হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যেখানে সবাই আমার চেয়ে জ্ঞানী ও বক্তৃতায় পটু।

আমি ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পা কাঁপছিল। আমাকে বক্তৃতা করতে হবে কি-না প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের সামনে! এ দুঃসাহস আমার কখনও ছিল না। কিন্তু নিরূপায় হয়ে আমি মাইকে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘোষক অবশ্য বিষয়টা বলে দিয়েছিলেন, আমাকে বলতে হবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা কবিতার বিষয়ে। আমি মাইকে কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে ভেবে নিলাম যা কিছু বলতে হবে তা স্পষ্ট বলতে হবে এবং আমার আগের কবিতার সঙ্গে আমার নিজের কবিতার পার্থক্য তুলে ধরব। আমি শুরু করলাম আমার নিজের উচ্চারণের ওপর জোর দিয়ে। আমি আলী আহসানের স্টাইলটা অবলম্বন করেছিলাম। কিন্তু বিষয় হিসেবে উত্থাপন করেছিলাম সে সময়কার আমার আগের কবি ফররুখ আহমদ, সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী আহসান, আহসান হাবীব তাদের কাব্যসম্পদ এবং শব্দ মাধুর্যের বিপরীত প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। আমি তাদের কবিতাকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী এবং আমার নিজের কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কাব্যধারার অবতারণা করেছি।

মুহূর্তের মধ্যে সবার দৃষ্টি স্থিরভাবে আমার মুখের ওপর এসে পড়ল। সৈয়দ আলী আহসান থেকে শুরু করে ড. করিম আমাকে ঘাড় ফিরে দেখছেন। ড. মনিরুজ্জামান থ হয়ে আমাকে দেখছেন। হয়তো ভাবছেন আমাকে এখনই থামানো দরকার। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা এবং অধ্যাপকরা আমার বক্তৃতা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

আমি এবার আমার আগের কবিদের কবিতাকে অস্বীকার করে আমাদের আধুনিকতম কবিতার প্রেম, প্রকৃতি, দেশপ্রেম, নিঃসর্গ ও নারীর বর্ণনা পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলাম। মাঝে মধ্যে সমর্থন খোঁজার জন্য চর্যাপদ থেকে শাহ মোহাম্মদ সগীরের ইউসুফ-জোলেখা এবং আলাওলের পদ্মাবতীর প্রসঙ্গ আমার ঠোঁটে আসা-যাওয়া করছিল। আমার প্রভু আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তা আমি আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতায় নিংড়ে নিংড়ে সবাইকে শুনিয়ে দিতে লাগলাম। এমনকি মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আমি অকপটে বিবৃত করতে পেরেছিলাম। তাছাড়া আমার মুখস্থ শক্তি আমাকে সাহায্য করেছিল। আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম আমি কার সামনে বক্তৃতা করছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ বক্তা সৈয়দ আলী আহসান ওই সভার সভাপতি। হতে পারে আমার কবিতা শক্তি আমাকে সাহস জুগিয়েছে হয়তো বা। অন্যদিকে বাংলাভাষার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব অধ্যাপকই উপস্থিত থাকায় আমার দুঃসাহস যেভাবেই হোক তাদের সরাসরি প্রাণিত করে রেখেছিল। আমি গুরু আলী আহসানকে উপেক্ষা করে এমন একটি বক্তৃতা করতে পারব তা তারা ভাবতে পারেননি। আমি বক্তৃতার শেষের দিকে হেসে বিনয়ের সঙ্গে আমাকে ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়ে বসে পড়লাম। তুমুল হাততালি বেজে উঠেছিল। আর আমি তাকিয়েছিলাম প্রফেসর আলী আহসানের মুখের দিকে। পরের বক্তা ছিলেন ড. করিম। সম্ভবত তিনিই ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন, আমি এতদিন আধুনিক বাংলা কবিতার অন্তরবস্তু কী তা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এই তরুণ কবির বক্তৃতা শুনে আমার মনে হচ্ছে এখন থেকে কবিতার আধুনিক স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করতে পারব। তারপর প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান আমার বক্তৃতার প্রশংসাই করলেন। যদিও তার নিজস্ব একটি ধারণার উল্লেখ এর মধ্যে ছিল।

শুধু মনিরুজ্জামান আমাকে বলেছিলেন, আমার বক্তৃতাটি তার কাছে বিশেষ অনুপ্রাণিত বক্তৃতা বলে মনে হয়েছে। তিনি বহুদিন অধ্যাপনা করেন কিন্তু কোনো কবির মুখে এ ধরনের বক্তৃতা শোনার সুযোগ এটাই হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠান শেষ হলে সবাই আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। আর আমি অনুভব করলাম যে, আমি এক আশ্চর্য গুরুমারা বিদ্যা আয়ত্ত করেছি—সেটা হলো বক্তৃতাবিদ্যা। আমি অস্বীকার করি না যে, বক্তৃতার কায়দা-কানুন আমার আগে না জানা থাকলেও আমি মুনীর চৌধুরী থেকে শুরু করে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান পর্যন্ত সবার বক্তৃতা শোনার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলাম।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে পারছি না, সেটা হলো আমাদের অনেক অসাধারণ কাব্য প্রতিভা বক্তৃতা দিতে সারা জীবনেও সম্মত হননি। হয়তো এই ভেবে সম্মত হননি যে, এতে কবির ধ্যান ও জ্ঞানের নীরবতা অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি এটা এক সময় নিজেও ভাবতাম। কিন্তু আমি যদি বলতে না জানতাম তাহলে আমাকে শেয়াল ও শকুনের খাদ্য হতে হতো।

'সোনালী কাবিন' সমাপ্ত করে আমি প্রথম ছুটে গিয়েছিলাম অধ্যাপক আবুল ফজলের কাছে। তিনি অসময়ে আমাকে আসতে দেখে বিস্মিত হলে আমি বললাম, আমি একটি সনেট সিকুয়েন্স আজই সমাপ্ত করেছি। এর অর্ধেক অংশ অর্থাৎ সাতটি কবিতা এর মধ্যে সমকালে দিয়ে এসেছি। আপনাকে না শুনিয়ে শান্তি পাচ্ছি না। আবুল ফজল মৃদু হাসলেন এবং আমাকে ভেতরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজে মুখোমুখি বসলেন।

পড়ো।

আমি থেমে থেমে 'সোনালী কাবিনে'র চৌদ্দটি সনেটই তাকে শুনিয়ে দিলাম। তার চেহারা দেখে মনে হয়েছিল তিনি ছন্দের দুলুনিতে মিল ও বক্তব্যের উপস্থাপনায় মাঝে মধ্যে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছেন। কবিতাগুলো শেষ হলে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, চা খাও।

এটা আমার কাছে একটা স্মৃতি। হয়তো তাৎপর্যহীন। কিন্তু যেহেতু আমি জীবনেরই ব্যাখ্যা করছি আর স্মৃতিতে ঘটনাটি সজাগ আছে তা উল্লেখ করা অপরিহার্য ভেবে শুধু লিখে গেলাম।

আমি যখন ঢাকায় এসে সমকালে কবিতাগুলো সমকাল সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরের হাতে তুলে দিই—এর আগে ওই সনেট সাতটি নিয়ে আমি সকালে শহীদ কাদরীর বাসায় গিয়েছিলাম। তিনি তখনও চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। আমি তার মুখের কাপড় সরিয়ে বললাম, কয়েকটি সনেট লিখেছি। শোনো।

কাদরী চোখ খুলে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে 'সোনালী কাবিন'-এর প্রথম সাতটি সনেট শুনে উঠে বসে পড়েছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ভালো হয়েছে। আমি চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসার কিছুকালের মধ্যে কাদরী সাহেব এসে আমার মেহমান হলেন। বললেন, কয়েক দিন থাকব। এ কথায় আমি মুহূর্তে আন্দাজ করে নিয়েছিলাম যে, ঢাকায় কোনো অঘটন ঘটেছে। হতে পারে এটা কাদরী সাহেবের পারিবারিক কিংবা শামসুর রাহমানের সঙ্গে কোনো বিষয়ে শহীদ কাদরীর বৈপরীত্য প্রকট রূপ ধারণ করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময় কাদরী সাহেব চুপচাপ থাকতেন। শুধু খাওয়ার সময় খানিকটা উৎসাহ দেখেছি। মাছ-মুরগি সবই সাবাড় করেছেন। কিন্তু খাওয়ার পর বাসায় এসে চুপচাপ শুয়ে পড়তেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও তার ভেতরের কথা বের করতে পারিনি। এর মধ্যে সুচরিত চৌধুরী এসে যোগ দিলেন। কাদরী সাহেবকে কিছু পান-টান করার আহ্বান জানালে তিনি দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। কিন্তু সন্ধ্যার আসরে সুচরিত বাবুর প্ররোচনায় বেশ খানিকটা মদপান করে ফেললেন। প্রথম তো খাব না, খাব না। পরে পিঁপেসুদ্ধ গলায় ঢেলে দিয়ে ভেতরের বিষ উগরে দিলেন। শামসুর রাহমানকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেছিলেন। আর যা করেছিলেন তা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই না।

কাদরী সাহেব কয়েক দিন কাটিয়ে যথারীতি ঢাকায় ফিরে গেলেন। আমি জানতাম এটা হলো শামসুর রাহমানের প্রতি বিশেষ কোনো কারণে অভিমান। যা হোক কাদরী ফিরে গেলে আমার স্বাচ্ছন্দ্য আবার ফিরে এলো। আমি বেশকিছু ছড়া কবিতা একের পর এক লিখে ফেলতে সক্ষম হলাম। পরে এ কবিতাগুলো দিয়ে শিশু একাডেমি থেকে 'পাখির কাছে, ফুলের কাছে' নামক একটি বই বের হয়েছিল। বইটির ছবি এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পী হাশেম খান।

এ সময় অকস্মাৎ একদিন জানা গেল ইত্তেফাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। আমি আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঢাকায় ফিরে এলাম এবং যথারীতি ইত্তেফাকের মফস্বল বিভাগে সাব-এডিটর রূপে মোহাম্মদ তোহা খানের সহায়ক হিসেবে যোগদান করলাম। তোহা খান ছিলেন দীর্ঘকায় মানুষ। লম্বয়া প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। তিনি সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সম্পাদনায় আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। নিজে শিকারি ছিলেন। সুন্দরবনের দুঃসাহসী বাঘ শিকারি পচাব্দী গাজীর জীবন বৃত্তান্ত উদ্‌ঘাটন করে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁর সঙ্গে রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত।

আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, মোহাম্মদ তোহা খান একজন সত্যানুসন্ধি মানুষ ছিলেন এবং অনেক বিষয়ে আমার পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি আমাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন।

২২

খিলগাঁও বাগিচায় একটি ভাড়া বাসায় এসে উঠলাম। ওই বাসাটি আমাকে খুঁজে দিয়েছিল আমার অতি বাল্যকালের বন্ধু আমিনুল হক আখন্দ। ডাকনাম চান মিয়া। চান মিয়া তখন সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করল। খিলগাঁওয়ে তার অনান্য ভাইয়ের সঙ্গে অবস্থান করছিল। তার স্ত্রী বিক্রমপুরের মেয়ে। দেখতে খুব সুন্দরী ও সুশ্রী ছিলেন। এদের বিয়েতে আমি কবুতরখোলা গাঁয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। চান মিয়া সদরঘাট মার্কেটে একটা দোকান কিভাবে যেন নিজের নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আমার এ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটি কেবল একটি অন্যায়ের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে আমি জানি। ঘটনাটি হলো এই চান মিয়া পাটের ব্যবসায়ের নাম করে কোনো এক ব্যক্তির কাছ থেকে হাজার বিশেক টাকা ধার নিয়েছিল। লোকটি আমার বন্ধুর ওপর ভরসা করে কোনো কাগজপত্র না রেখে টাকাটা দিয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল, চান মিয়া পাট কেনার ব্যবস্থা না করে ঢাকায় বেড়াচ্ছে। তখন লোকটি তার কাছে টাকা ফেরত চাইলে চান মিয়া বেমালুম অস্বীকার করে। আমি ঘটনাটি জানতাম। আমি চান মিয়াকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম। সে কর্ণপাত করেনি। ওই লোকটি ছিল ব্যবসায়ী। হাজার বিশেক টাকা তার জন্য তেমন কিছু নয়। হয়তো তিনি সামলে নিয়েছেন। কিন্তু চান মিয়ার জীবনে শুরু হলো অস্বীকারের বিপর্যয়কর প্রতিক্রিয়া। তার ব্যবসা-বাণিজ্যসহ কিছু দিনের মধ্যে সব খুইয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হলো। অথচ চান মিয়া ছিল শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী আহমদ আলী আখন্দের ছেলে। এটি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। এ থেকে আমার শিক্ষণীয় বিষয়ও কিছু ছিল। আমি প্রায়ই আমার স্ত্রীকে ঘটনাটির বর্ণনা দিতাম। সব হারিয়ে আমিনুল হক আখন্দ চান মিয়া আমার বারান্দায় শুয়ে থাকত। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাকে যথেষ্ট যত্ন করেছিল। কিন্তু মানুষ একবার ভেঙে গেলে তাকে তো আর মেরামত করা যায় না।

আমারও স্খলন পতন আছে। এ সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। আমি যাত্রাবাড়ী থাকতেই আমার সঙ্গে একটি নিঃসন্তান পরিবারের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তারা আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। এ পরিবারের বধূটি কিভাবে যেন আমার প্রতি একটু অন্য দৃষ্টিতে তাকাত। আমি সেই দুর্মর চাহনির অর্থ বুঝতে পেরে নিজেকে সংবরণ করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করতাম। কিন্তু ভেতর থেকে পারতাম না। একদিন ওই বধূটি আমার খিলগাঁওয়ের বাসায় এসে হাজির হলো। সারাদিন ছিল। আমার স্ত্রীর চোখে হয়তো খানিকটা ধরা পড়ে গিয়ে থাকবে।

আমার স্ত্রী আমাকে কিছু না বলে আমার সামনে সন্ধ্যায় বধূটির বিদায়ের সময় অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাকে সম্বোধন করে এবং নাম উচ্চারণ করে বলতে লাগল, দেখো মেয়ে, তুমি কেন এসেছ সেটা আমি জানি। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে অপমান করতে পারতাম। কিন্তু তুমি যার মেহমান তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হলো চিরজীবনের। তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না। কবির সঙ্গে আড়ালে-আবডালে সাক্ষাৎ করবে না। চিঠি দেবে না এবং কোনোরূপ ছলাকলায় ভোলাতে চেষ্টা করবে না। যাও। ভালোয় ভালোয় চলে যাও।

এরপর ওই বধূটির সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি। আজও তার কথা আমি ভাবি। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত কারণে আর আকর্ষণ বোধ করি না। সেই রাতে আমার স্ত্রী আমাকে অত্যন্ত অপমান করেছিলেন। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম থেকে তুলে তিনি আমাকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আমার জন্য অত্যন্ত শরমের ব্যাপার বলে আমি আর উল্লেখ করতে চাই না। সৈয়দের মেয়েরা ক্রুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে কী পরিমাণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারেন, তা যাদের ঘরের ঘরণী সৈয়দজাদী তারা নিশ্চয় উত্তমরূপে জানেন। আমি অবশ্য দুশ্চরিত্র লোক নই। তবে এর পেছনে যেটুকু দৃঢ়তা আমার মধ্যে কাজ করেছে, তা আমার স্ত্রীর কবিনিয়ন্ত্রণের আদব-লেহাজেই। তিনি আমাকে পাহারা দিয়েছেন এটা বলব না। তবে তিনি যে আছেন এটা আমাকে কখনও ভুলতে দেওয়া হয়নি।

ইত্তেফাকে ফিরে এসে আমার দিনগুলো স্বচ্ছন্দ ছিল। ছন্দ যদি সত্যি কোথাও আমি সৃষ্টি করে থাকি, সেটা ছিল কাব্যে। খুব দৃঢ় ও সমর্পিত চিত্তে আমি কবিতায় ছন্দ, অন্ত্য মিল ও অনুপ্রাস রচনা করে চলছিলাম। আমার সে অতীত পরিশ্রমই আজ হয়তো বা আমাকে জিতিয়ে দেওয়ার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

আমি চট্টগ্রাম যাওয়ার কয়েক বছর আগে দৈনিক পাকিস্তান বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার যিনি প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি আমাকেও নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি দেখলাম সেখানে শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন সম্পাদকীয় বিভাগে উচ্চপদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন কবি আহসান হাবীব। প্রুফ রিডার ছাড়া আমার পক্ষে ওখানে আর কোনো কাজ জোটানো সম্ভবপর ছিল না। আমি মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি সেখানে যাব না। আমার সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল সেটা শহীদ কাদরী আমাকে প্রায়ই বলতেন। কারণ সাহিত্যের যে সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা আমি জন্মগতভাবে আয়ত্তের মধ্যে এনেছিলাম সেটা পেশাগত কারণে অবনমিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনাকে আমি নাকচ করতে পেরেছিলাম। ফলে কবি হিসেবে শামসুর রাহমানের নামের পর যে ত্রিশটি নাম উচ্চারিত হতো, তাদের প্রত্যেকে আমি নিঃশব্দে অতিক্রম করে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ এ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি। আমি যদি তখন দৈনিক পাকিস্তানে শ্রেণিবিন্যাসে নিম্নস্তরে থাকতাম তাহলে আমার কবিত্ব বিপাকে পড়ে হার মেনে যেত।

এ সময় কাজী রোজীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা খুবই বৃদ্ধ পেয়েছিল। যদিও আমি তখন ইত্তেফাকে তার পিতার বিভাগে আর কর্মরত ছিলাম না। অন্যদিকে ইত্তেফাকে যারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল তাদের মধ্যে শহীদ সিরাজুদ্দিন হোসেন সাহেবের ভাগিনা আহসান উল্লাহ্ সর্বাবস্থায় আমাকে পছন্দ করতেন।

রোজী কবিতা লিখতেন এবং ছাত্রী ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি খানিকটা আকর্ষণীয়াও ছিলেন। আমি তার বাসায় যেতে পছন্দ করতাম। রোজীর আম্মা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার ভাই-বোনরাও আমার আগমনে খুশি হয়ে উঠত। সব মিলিয়ে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত রোজীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা তার পিতা কাজী সাহেব তেমন পছন্দ করতেন না। একবার তিনি আমাকে সুযোগ পেয়ে স্বগোতোক্তি করেছিলেন। আর সেটা হলো এ রকম, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে যেয়ো না। আমিও আর যাইনি। এভাবেই চাঁদ আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এবং চাঁদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছিল কি-না তা কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে পারে? আমি আর যাইনি। যদিও যাইনি তবুও বলব যে, সম্পর্কের ইতি এখানেই ঘটেনি। বরং সেটা এক দুর্যোগ মুহূর্তেই অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি যখন কলকাতায়, তখন রোজীর দুঃখে আমি দরবিগলিত ছিলাম। দুঃখে আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল।

যা হোক জীবনের সব ঘটনা তো আর সাক্ষী থাকে না। তবে অনেক বিষয় কবিতায় ছড়িয়ে যায়। নাম থাকে না, ধাম থাকে না। গ্রাম থাকে না। থাকে শুধু পাঠকের জন্য বিশ্রাম ও পরিতৃপ্তি।

আমি রোজীকে সেই বিদেশ বিভুঁইয়ে খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভবানীপুরের এক গলিতে কবিতা সিংহের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কবিতা সিংহের স্বামীর নাম ছিল সুবীর রায় চৌধুরী। সেখানে রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী, যাকে আমি রাজু বলে ডাকতাম। যে পূর্ণেন্দু পৈত্রীর রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ছবি 'স্ত্রীর পত্রে' বিন্দুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

এই পরিবারের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন কবি বেলাল চৌধুরী। আমি বিপদের সময় যেখানে পরম আশ্রয় পেয়েছিলাম। রাজু আমাকে ওই সময় কলকাতার ভেতর-বাহির চিনিয়ে দিয়েছিল। রাজু হতভাগিনী আজ আর জীবিত নেই। কিন্তু তার স্মৃতি আমার মনে অক্ষত আছে। রোজীরও কি নেই?

এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কোনো এক কোরবানির ঈদে অকস্মাৎ পিতাসহ রোজী আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন তা আমি জানতাম না। সম্ভবত আমার স্ত্রীকে দেখতে। আমার স্ত্রী পরম যত্নে তাদের আপ্যায়ন করেছিলেন বলে মনে আছে।

মানুষের জীবন কোনো আক্ষেপ হতে পারে না। আমিও আমার নিজের জীবন নিয়ে এখানে কোনো খেদ প্রকাশ করতে চাই না। আমার যা ভাগ্যে ছিল তা তো আমি পেয়েছি। আর যাকে বলে স্ত্রী ভাগ্য সেটাও আমার লভ্য হয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলার কিছুই নেই। চাইলেও অন্য কোনো জীবন আমি যাপন করতে পারতাম না। কবির জীবনই আমার স্বস্তি ও সততার কারণ বলে মনে করি। এই কাহিনি আর কতদূর টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে তা বুঝতে পারছি না। তবে আপাতত মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত গিয়ে তা পৌঁছি।

এবার 'সোনালি কাবিন' বইটির প্রকাশনার দিকে মনোযোগ দিলাম। তখনকার সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী ছিলেন গাজী শাহাবুদ্দীন। তিনি সন্ধ্যানী প্রকাশনা থেকে বইটি প্রকাশের জন্য আমার পাণ্ডুলিপিটি গ্রহণ করলেন। বইটি কাইয়ুম চৌধুরীর একটি অসাধারণ প্রচ্ছদ নিয়ে বের হয়েছিল। কিন্তু বইটি বাজারে যাওয়ার আগে পঁচিশ মার্চের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমি একটিমাত্র কপি হাতে ঢাকা থেকে সপরিবারে বেরিয়ে পড়েছিলাম এবং এই বইটি নিয়ে যাওয়ায় অনেক উপকার হয়েছিল আমার। যারা কলকাতায় আমার কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিল তারা এই বইয়ের কবিতাগুলো আস্বাদন করে আমাকে প্রশংসায় উদ্দীপিত করেছিল এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতা থেকে অরুণা প্রকাশনী আল মাহমুদের কবিতা বলে আমার যে বইটি প্রকাশ করেছিলেন, এই বইটি না থাকলে সেটা সম্ভব হতো না।

এ সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। তা না হলে বইটি বের হতো না। বইটির রয়ালিটি বাবদ নয়শত রুপি পেয়েছিলাম। এই টাকাটা না পেলে আমার অনেক অসুবিধাই হতো। কারণ আমি ঢাকা থেকে এক কাপড়ে আগরতলা ও গৌহাটি হয়ে কলকাতায় পৌঁছেছিলাম। সেই সব কষ্টের দিনের কথা স্মরণ হলে আজও আমি মুষড়ে পড়ি। পরে অবশ্য আমার অভাব-দারিদ্র্য দূর হয়ে গিয়েছিল। আমি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দফতরে একটি চাকরি পেয়ে যাই এবং লেখকদের মধ্যে মটিভেশনের কাজ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করি।

২৩

কাজী রোজী যখন তার পিতার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল আগের পর্বে যে ঘটনাটি ইঙ্গিতে উল্লেখ করেছি এখন তা একটু বিস্তারিতভাবে বলতে হচ্ছে। বলতে হচ্ছে অবশ্য আমার স্ত্রী সৈয়দা নাদিরা মাহমুদের বিশেষ অনুরোধে।

আমার স্ত্রী তখন সম্ভবত মোল্লাবাড়ির অষ্টম প্রজন্মের জ্যেষ্ঠ বধূ। বাড়িতে এমন একটা নিয়ম ছিল যে, বাড়ির বড় বউ যখন মোড়ায় বসে কাজ করত তখন অন্য বউরা আশপাশে বসে কাজ করত। কাজের ফাকে বড় বউ উঠে দাঁড়ালে অন্য বউরাও মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে যেত। আজ অবশ্য সেসব নিয়ম আর নেই। মানুষ কই যে থাকবে! এ কথাটা এ জন্য বললাম, রোজী তার পিতা যা দেখতে গিয়েছিলেন, সেটা তারা ঠিকমতোই দেখতে পেয়েছেন।

মানুষ তার আয়তনের চেয়ে বড় স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি অতিশয় ঊর্ধ্বমুখী হয় তাহলে হতাশার মেঘ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। আমি কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঢাকায় আসিনি। এসেছিলাম শুধু কবি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। একটু স্থান, কোথাও অনেকের ফাঁকে নিজের নাম ছাপা হয়েছে এতেই আমি তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু ব্যর্থ কবির দল সব সময় প্রকৃত কবিকে চিনে ফেলে। তাকে আর মাথা তুলতে দেয় না। সবাই শুধু মাথায় আঘাত করতে চায়। আর পদের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারিত হয়, যেমন শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী—তারা আমার সঙ্গী ছিলেন বটে। কিন্তু বন্ধু ছিলেন না। ছিলেন কঠোর ও নির্মম প্রতিদ্বন্দ্বি। সামান্যতম ছাড় তারা আমাকে দেননি। তবে আমি গ্রাম্য লোক বলেই অনেক বিষয়ে কারো পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকিনি।

এর মধ্যে একদিন নয়ন আমাদের বাসায় তার বিয়ের কার্ড নিয়ে উপস্থিত হলো। আমার স্ত্রী তাকে খুবই আপ্যায়ন করলেন। ঘরে নিয়ে আমি যে পড়ার টেবিলে বসি সেখানে ঠেলে বসিয়ে দিলেন। দ্রুত চা করে আনলেন। এ ফাঁকে নয়নের সঙ্গে আমার কথা হলো। আমি বললাম, বরটি কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– আমার কাজিন।

আমি বললাম, তাহলে তো ভালোই হলো।

– হ্যাঁ। এতে অবশ্য বদনাম ঘুচবে। আসলে তো বিয়েটা আমার সঙ্গে হচ্ছে না মাহমুদ ভাই। বিয়েটা হচ্ছে আমার যে চশমার দোকানটা আছে সেটার সঙ্গে। আমার মামু আমার জন্য ওই দোকান বরকে লিখে দিচ্ছেন। এবার তো বুঝতে পারলেন। আমি যেমন কানা-আন্ধা আছি তেমনি এককোণে পড়ে থাকব। তুমি যতই আমাকে মৃগনয়না-সুনয়না বলো, কিন্তু আমার বর জেনেশুনে এ আন্ধা বান্দীকে ঘরে তুলছে– বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল নয়ন। ট্রেতে চা নিয়ে এসে আমার স্ত্রী একেবারেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আরে একি! বিয়ের আগে এভাবে কাঁদে নাকি কেউ! আমি তো সব শুনেছি। তকদিরটা তো অন্য রকমও হতে পারে।

আজ বহুদিন পর আমার স্ত্রীর কথাই সত্য হয়েছে। নয়নের তকদিরটা একদম বদলে গেছে। তার ছেলে এখন ধনী ব্যবসায়ী। তবে নয়ন সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে। যদিও বাড়ি-গাড়ি হয়েছে। পুত্র-কন্যা হয়েছে। পরিবারে শিক্ষা-দীক্ষা ও অতুলনীয় ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়েছে, তবুও নয়নের অন্ধ চোখ ছাপিয়ে অশ্রুপাত হয়। একবার আমাকে বলেছিল—অনেক কিছুই দেখলাম না। হাতে ছুঁয়ে কি সব বোঝা যায়?

এ সময় আমি বেশ কিছু ভালো কবিতা লিখে ফেললাম। ভাবলাম জাফর ভাইকে দেখাই। সমকালে গিয়ে সিকান্দার আবু জাফরকে পেলাম না। পেলাম জাফর ভাইয়ের নিত্যসঙ্গী ইসমাইল মোহাম্মদকে। তিনি আমাকে পেয়ে সহজে ছাড়তে চাইলেন না। বললেন, লেখাগুলো তো রেখে গেলেই পারো। তোমার লেখা কম্পোজে দিয়ে দিই। পরে জাফর এসে দেখবে। আমাকে একটু পড়ে শোনাও না। এ কথায় আমি একটি সিগারেট ধরিয়ে তার পাশে বসে একের পর এক কয়েকটি কবিতা শোনালাম। ইসমাইল মোহাম্মদ ছিলেন সিনেমা ও নাটকের লোক। মনে হয় আমার কবিতার চিত্রকল্পগুলো তার মধ্যে দৃশ্যকল্পের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, দেখ কবি, ভবিষ্যতে তোমার স্থান কোথায় নির্ধারিত হবে তা আমি বলে দিতে পারলেও বলব না। তবে এটুকু বলতে পারি, তুমি একটি স্বতন্ত্র কাব্য ভাবনার উদ্‌গাতা, যা তোমার পূর্ববর্তীদের সঙ্গে মিলে না এবং পরবর্তীদের সঙ্গেও না। আসল কথা হলো তুমি একটা নতুন ভাষা নিয়ে এসেছ। আরে নাটক লেখ না কেন?

এই ছিলেন ইসমাইল মোহাম্মদ। লিখতে লিখতে তার স্মৃতি এসে গেল। লিখে দিলাম। খিলগাঁও বাগিচায় থাকতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তোপের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সময়, সন, তারিখ আমি উল্লেখ করার জন্য ভাঙা আয়নায় আমার মুখ প্রতিফলিত করতে চাইনি। এ সময়টায় আমি ছিলাম খুবই স্বার্থপরের মতো। শুধু লিখতাম আর নিজের লেখা গুনগুনিয়ে পড়তাম। আশা মিটত না। এ সময় কিছু গল্পও লিখেছিলাম, মনে পড়ে। পরে এ গল্পগুলো বাংলাভাষার পাঠকদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে। একটা দুর্নামও হয়েছে। সেটা হলো এই, আমি গল্পে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌনতাকে বেশি প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। আমি তা অস্বীকার করতে চাই না। তবে একই সঙ্গে এ কথা বলি, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা মূলত অশ্লীল। এর মধ্যে আমাদের জাতি সাহিত্যরস অনুসন্ধানে উন্মুখ হয়নি। আমার এ যুক্তিকে কেউ যদি বলেন খোঁড়া যুক্তি বা কুযুক্তি তাহলে আমি বলব, আমি জীবনের আচ্ছাদন উন্মোচন করতে চেয়েছি কেবলই আধ্যাত্মিক কারণে, কোনো অশ্লীল উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। এ সত্য আজ না মানলেও আমার আস্থা আছে, ভবিষ্যৎ আমাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করবে না।

আগে উল্লেখ করেছি, সত্তরের নির্বাচনের পর শেখ মুজিবের অসাধারণ নেতৃত্ব পাকিস্তানের কাছে আর কিছু পাওয়ার আশা প্রায় ত্যাগ করেছে বলে মনে হয়। তবুও ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর মিলিত শক্তি বাংলাদেশের জনগণকে উপেক্ষা করে ভুট্টোকে কোনো একটা মওকা সৃষ্টি করে দিতে প্রয়াসী হয়ে উঠেছিল। শেখ সাহেব ছিলেন পাকিস্তানের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী। এটা ঠেকানোর কোনো ক্ষমতা পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ছিল না। সামরিক জান্তা তখন পুরোপুরি ভুট্টোর পরামর্শে চলছে। শুরু হয়ে গেল শেখ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার একটা পর্যায়। এটা বাংলাদেশের মানুষকে বেশ ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রগতিবাদী কবিরা প্রকৃতপক্ষে শেখ সাহেবের পক্ষাবলম্বন করেননি। কেবল আমি, হ্যাঁ, আমি একাই ছিলাম শেখ মুজিবের পক্ষে, ৬ দফার পক্ষে, সর্বোপরি স্বাধীনতার পক্ষে। এ সময়কার একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করতে চাই। অন্যত্রও করেছি। সেটা হলো, রিকশায় আমি তখনকার 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। গেটে শামসুর রাহমানের সঙ্গে দেখা হলে আমি রিকশা থেকে নেমে এলাম। শামসুর রাহমান বেশ উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলতে লাগলেন, আমি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করি। শেখ মুজিবকে সমর্থন করি। তারপর তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তা এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই না।

অথচ আজকালের প্রেক্ষাপট কাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে।

কয়েক দিন আগে একটি টিভি চ্যানেলে সুকৌশলে আমাকে নিয়ে হাজির করা হলো। আমার অন্ধত্ব ও বার্ধক্যের সুযোগ নিয়ে আমার এককালের খুব অনুগত উপস্থাপক অনুষ্ঠানটির আঞ্জাম দিয়েছিল। যারা সেখানে থাকবেন বলে বলা হয়েছে তারা কেউ সেখানে ছিলেন না। ছিলেন আমার বন্ধু ফজল শাহাবুদ্দীন ও আল মুজাহিদী। উপস্থাপক আমাকে প্রশ্ন করলেন পঁচিশে মার্চের ঘটনা থেকে সে সময়কার কয়েকটি দিনের অভিজ্ঞতা জানাতে। আমি সত্য বর্ণনাই দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপক ফজল সাহেবের দিকে ফিরলেন এবং ফজল সাহেব তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, তার অভিজ্ঞতাও আমার অনুরূপ। আমি হাসলাম। এখানে আমি কোনো বিরূপ সমালোচনা করতে চাই না। কারণ এরা কোনো না কোনোভাবে আমার জীবনের বন্ধুত্বের আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থান করেছিল। আমি তাদের দ্বারা উপকৃতও কম হইনি। কিন্তু কখনও কোনো দু'জন কবির চরিত্র এক হতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সত্য আমি বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনোদিনই সঠিকভাবে পারিনি। আমার চোখ না থাকলেও চক্ষুলজ্জা আছে।

যা হোক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিশ্চয়ই একদিন কেউ না কেউ সঠিকভাবেই লিপিবদ্ধ করবে। হয়তো শতবর্ষ পরে। তখন আজকের প্রগতিশীলরা থাকবেন না। প্রতিক্রিয়াশীল বলেও কেউ হয়তো আর থাকবেন না। শুধু থাকবে ইতিহাসের কঠোর বাস্তবের বলিরেখাযুক্ত মুখাবয়ব।

এ সময় ইত্তেফাকে আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আহসান উল্লাহর সঙ্গে বন্দুকের লাইসেন্স চেয়ে দরখাস্ত করেছিলাম। লাইসেন্স সহজে পাওয়া গেলে আমরা দু'জন দুটি বন্দুক কিনলাম। আহসান উল্লাহ দু'নলা বন্দুক, আমি একনলা। এ সময় খুব শিকারের নেশা পেয়ে বসল। দু'জন একসঙ্গে শিকারে বেরিয়ে পড়তাম ঢাকার আশপাশের জলাভূমিতে। যেখানে কানিবক ছাড়া আর কিছু থাকত না। আমার নেশা এতটাই চেপে বসেছিল যে, একবার স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলাম শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে অবশ্য আমার শ্বশুর এসব বিষয়ে আমাকে খুবই নিরুৎসাহিত করলেন। তবুও এক ফাঁকে একটি পানকৌড়ি শিকার করেছিলাম। এই শিকারের অভিজ্ঞতা থেকেই লেখা হয়েছিল 'পানকৌড়ির রক্ত' গল্পটি। আর আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে নানা ধারণা, যা আমি সাহিত্যে কাজে লাগিয়েছি। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার আগে আমার প্রবল জ্বর উঠল। আমি বুঝলাম, এ জ্বর খুবই অসুস্থতায় আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে। শ্বশুরবাড়িতে আমি উপযুক্ত চিকিৎসা পাব না ভেবে ভৈরবে এসে বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। বোন আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, তুমি তো জলবসন্তে আক্রান্ত হয়েছ। আমি কানে ধরে তওবা করলাম, আমি আর শিকার করব না। সুস্থ হয়ে আর করিনি।

২৪

দেখতে দেখতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের আলোচনার দিনগুলো এসে গেল। প্রত্যেক দিনই তৎকলীন বাংলাদেশের মানুষ প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন। শেখ সাহেব আলোচনায় যাচ্ছেন, ফিরে আসছেন শূন্য হাতে। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, ইয়াহিয়া খান আলোচনা অমীমাংসিত রেখে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেছেন। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করার যে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল, সব কিছু উপেক্ষিত হলো। সারাদেশ এক অসহিষ্ণু আবহাওয়ার মধ্যে গোমড়াতে লাগল।

এর আগে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যে ভাষণ দেন তাতে সারাদেশ দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের ওপর ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শেক মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন তার সারা জীবনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রস্তুতি ৭ মার্চে এসে পরিচ্ছন্নভাবে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিপরীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তা বের করার জন্য ঐতিহাসিক চাপ সৃষ্টি করেছে। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি তার জাতিকে পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে ওইসব নিয়েই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। এটা ছিল বাঙালি জাতির এক মহাসিদ্ধান্তসূচক পথনির্দেশনা।

এই জাতির আদিম ঊষাকালের এক ইতিহাসে জানা যায়, সামন্ত যুগের এক পর্যায়ে এই দেশ মাৎস্যন্যায়ের কবলে পড়েছিল। চরম অরাজকতার মধ্যে দেখা যেত যে, সামন্ত রাজারা আজ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তো পরের দিন তার মাথা ধুলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। এই চরম অরাজকতা নীরোগের জন্য সামন্ত রাজারা সবাই মিলে গোপাল বলে এক মহাসামন্তকে রাজাধিরাজ ঘোষণা করল। এই গোপাল থেকেই শুরু হয়েছিল পাল যুগ। এ পাল যুগেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধি, জাতিগত ঐক্য ও শিল্প-সাহিত্যের অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালি জাতির। পালরা বৌদ্ধ হলেও সর্বধর্মের প্রতি তাদের ছিল গভীর আগ্রহ। তাদের মধ্য থেকেই উদ্ভব হয়েছিল মহারাজাধিরাজ মহিপাল। মহিপাল তৎকালীন ভারতের অধিকাংশই পাল রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। এটাই প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতির সৌর্য-বীর্য, সংস্কৃতি উদ্ভবের কাল। বলা যেতে পারে, এই কালেই বাঙালি কবি-সাহিত্যিক, চারুকলাশিল্পী, ধাতুশিল্পী ও তক্ষক শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছে। এই পালদের সমৃদ্ধি বাঙালি জাতির উদ্ভবের কারণ। দীর্ঘকাল তারা পাল রাজত্ব অক্ষুণ্ন রেখে দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলাদেশে ইসলাম প্রবেশ করে। গোপালের উত্থানের পর বাঙালি জাতির রাজনৈতিক উত্থানের দ্বিতীয় ঘটনা হলো ৭ মার্চের সিদ্ধান্তকারী বক্তব্য। যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে।

যা হোক, ইয়াহিয়া খান আলোচনা অসমাপ্ত রেখে বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেলেন। এতে আর বুঝতে বাকি রইল না যে, সামরিক বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁদেই পা দিয়েছেন। এর মধ্যেই ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মধ্যরাতে বিপুল বিক্রমে ঢাকা নগরীর ঘুমন্ত অধিবাসীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাঞ্জাবি হানাদারদের বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞে গুলি ও কামানের শব্দে মানুষের কানের পর্দা বিদীর্ণ হতে লাগল।

আমি সেদিন ইত্তেফাক অফিস থেকে ৯টার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার আসার অল্পক্ষণ পরেই সম্ভবত ইত্তেফাক অফিসে আক্রমণ চালানো হয় এবং অফিসটিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে কয়েকজন শহীদও হয়েছেন।

আমি বাসায় এসে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়েছি মাত্র। এ সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আমি ও আমার স্ত্রী কানফাটা শব্দের তাড়নায় খাট থেকে নেমে নিচে শুয়ে পড়ি। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে তখন হামলা শুরু হয়েছে। পাকিস্তান বাহিনী প্রথম প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল রাজারবাগে। কানফাটা এ শব্দের অবিশ্রান্ত গর্জনে আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এত ভয়াবহ শব্দ হচ্ছে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তাকে মৃদু ভাষায় বললাম, অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে আজ রাতে তা ভেঙে যাচ্ছে। এটা হলো পাকিস্তান ভাঙার আওয়াজ। পাকিস্তানের পাঞ্জাবি সেনারা ক্রুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান ভাঙছে, ভাঙার কী একটা আওয়াজ হবে না? কানে আঙুল ঢুকিয়ে শুয়ে থাকো। এই পাকিস্তান গড়ার পেছনে পাঞ্জাবিদের সামান্যতম কোনো অবদান নেই। নেই পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীরও। উত্তর প্রদেশ পাকিস্তান চায়নি। পাকিস্তান চেয়েছিল বাঙালি মুসলমানরা। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিন্নাহ সাহেব, গুজরাটের এক শিয়া পরিবারের ইংরেজি শিক্ষিত ব্যারিস্টার। তাকে সমর্থন দিয়েছিলেন ভারতের মুসলমান জনগণ। যাদের পাকিস্তানের বাসিন্দা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আর দিয়েছিলেন বাঙালি চাষি মুসলমানরা। পাকিস্তান গঠনে যাদের সামান্যতম অবদান ছিল না, আজ তারাই পাকিস্তান ভেঙে ফেলছে। সে মর্মান্তিক ভাঙনের শব্দই ছিল ঢাকায় ২৫ মার্চের কানফাটা গুলির শব্দ।

প্রতিটি রাতের একটা ভোর হয়। ঢাকায়ও ২৫ মার্চের রাতের ঘটনার পর একটা সকাল হয়েছিল। আর সকালেই উঠে ভীতি-বিহ্বল মহানগরী ঢাকার মানুষ পালাচ্ছিল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। আমরাও পালিয়েছিলাম। এই পালানো পথের মধ্যেই আমরা শুনতে পেয়েছিলাম রেডিওতে একটি অসাধারণ কণ্ঠস্বর। সেটা হলো মেজার জিয়ার ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর। তিনি প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘোষণা করেছিলেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার উজ্জীবনী মন্ত্র পাঠ করেছিলেন। সে অসাধারণ কণ্ঠস্বর যারা শুনেছিলেন তারা কি তা ভুলতে পারেন? আমরাও ভুলিনি। এভাবে রাজনৈতিক পর্যায় অতিক্রম করে আমরা প্রবেশ করেছিলাম সামরিক পর্যায়ে। বারুদ গন্ধকে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। এর নামই মুক্তিযুদ্ধ।

কয়েক দিন এদিক-সেদিক লুকিয়ে থেকে আমি সপরিবারে গ্রামের দিকে পালাতে লাগলাম। রাস্তায় অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ দেখেছিলাম। দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়েছিল। মৃতদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছিল শেয়াল ও শকুনের দল। ইতিহাসের এ পর্যায়ের অনেক ঘটনা আমি আমার উপন্যাস 'উপমহাদেশ'-এ লিখেছি। এ ভাঙনের ইতিহাস আমি লিখেছি 'কাবিলের বোন' নামক একটি উপন্যাসে। কারণ আমি জানতাম, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হবে। কবিরা কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। আমি আমার জাতির ইতিহাস, স্বাধীনতার স্পৃহা ও যুদ্ধের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছি। এর বেশি একজন কবি কি-ইবা করতে পারে। এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করি, আমি ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগে ইত্তেফাকের ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য টিকাটুলি গিয়েছিলাম। মতিঝিলের যেখানে শেষ সেখানে একটি ওষুধের দোকানে জরুরি ওষুধ কিনে বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় শহীদ কাদরীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমাকে দেখে তিনি উচ্চহাস্য করেছিলেন। সে হাসির অর্থ আমার কাছে তখনও যেমন দুর্বোধ্য ছিল আজও দর্বোধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা হোক, আমি সপরিবারে রায়পুরা থানার নারায়ণপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তিনি আমাদের একটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে আমার বোন লাইলী, তার স্বামী রাজ্জাক এরা সবাই ছিল। এ ছিল পাক বাহিনীর জন্য খুবই দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। এখানে আমি অল্প কয়েক দিন ছিলাম। ততদিনে এই এলাকাতে মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। তারা আসছেন, যাচ্ছেন। যুবকদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। ট্রেনিংয়ের জন্য নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। অথবা আগরতলায় নিয়ে যাচ্ছেন। এদের কাছে জানতে পারলাম, আমার ভগ্নিপতি পার্বত্য চট্টগ্রামের ডিসি হোসেন তোফিক ইমাম সেখান থেকে সপরিবারে আগরতলায় পৌঁছেছেন। তৌফিক ছিলেন আমার আপন খালাতো বোন পারুলের স্বামী। পারুলদের বাড়ি ছিল টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকার সমস্বপুর গ্রাম। আমার খালুজান শিক্ষক ছিলেন। সারাজীবন রাজশাহীতে শিক্ষকতা করে কাটিয়েছেন। তারা নিরাপদে আগরতলায় পৌঁছেছেন। জেনে আমি স্বস্তি পেয়েছিলাম। কারণ এ পরিস্থিতিতে নারায়ণপুরে আমি নিরাপদ ছিলাম না। মনে মনে দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষাও জেগে উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত তৌফিকের কাছ থেকে আমার চলে যাওয়ার একটি বার্তা মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে এসেছিলেন। ওই বার্তা পেয়ে আমি নারায়ণপুরে পরিবার-পরিজন রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আগরতলার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিলাম। যাত্রার রাস্তাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমি দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছি। ততদিনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। এই বেতার যন্ত্রটি যারা চালু করেছিলেন তাদের সবাইকে আমি চিনতাম। তারা মুহুর্মুহু জানিয়ে দিতে লাগল, বিপুল বিক্রমে মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্বের সবচেয়ে হিংস্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলায় নেমে পড়েছেন। প্রথমদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষয়ক্ষতি বেশি হলেও কিছুদিনের মধ্যে জানোয়ারের দলকে শায়েস্তা করার কায়দা-কানুন শিখে নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। পরে অবশ্য মুক্তি শব্দটা শুনলেই হানাদারদের বুক কাঁপত। বহুকষ্টে একটি খোলা বিশাল নৌকায় তিতাসের ভেতর দিয়ে আমরা সিংগার বিল ও মুকুন্দ বিলের স্টেশনের মাঝামাঝি এসে নাও ভিড়ালাম। আমরা মাটিতে পা দেওয়ার আগেই নদীর মাঝখান থেকে টহল বোটের ভেতর উদ্ধত রাইফেল নিয়ে হানাদাররা আমাদের দেখতে পেয়েছিল এবং প্রবল গুলিবর্ষণে আমাদের আক্রমণ করেছিল। আমাদের লিডার শহীদ বলে এক মুক্তিযোদ্ধা সবাইকে নৌকার ভেতর শুয়ে থাকতে বললেন। নিজে নৌকাটি ঠেলে ডাঙায় ঠেকিয়েছিলেন। তাকে কেউ কেউ পাল্টা গুলি করার পরামর্শ দিলেও তিনি পাল্টা গুলি না করে নৌকাটি ঠেলে কূলে এনে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পাঁচজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। চারজনই শহীদকে পাল্টা গুলি করার পরামর্শ দিলে তিনি বলেছিলেন, আমরা গুলি করে পালিয়ে যেতে পারব। কিন্তু আমাদের সাথে এতগুলো মানুষ মারা পড়বে। আমাকে ঠেলে বললেন, কবি সাহেব আপনি এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে গাছের আড়ালে-আবডালে সামনের দিকে যেতে থাকুন। আমি একটি কথা কখনও ভুলব না। আমরা যখন যাচ্ছিলাম আমাদের সঙ্গে ভৈরবের দুটি হিন্দু মেয়ে ছিল। তারা দু'জনে আমার দুটি হাত চেপে ধরেছিল। তারা এতই কাঁপছিল যে, মনে হয় হেঁটে আর সামনে এগোতে পারবে না। আমি এদের নিয়েই সাধ্যমতো জোরে হাঁটছিলাম। শহীদরা আমাদের সঙ্গে এখনও যোগ দেয়নি। এমন সময় ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কয়েকজন অস্ত্রধারী আমাদের থামতে নির্দেশ দিলেন। আমরা থামতেই আমাদের দলের মধ্যে মেয়েরা বিলাপ শুরু করে দিল। আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। ওই গ্রুপটার লিডার আমার মুখের ওপর আলো ফেলে বললেন, আরে ভাগিনা তুমি? চলে যাচ্ছ?

আমি স্তম্ভিম হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। হ্যঁ, আমি চিনি। সহসা আমার মনে পড়ল, এ এলাকা হলো আমার চাচা আবু সরদারের এলাকা। এরা আমার বাপ-মায়ের মামাতো ভাই। সহসা আমি সাহসী হয়ে উঠলাম। বললাম, আমাদের যেতে দিন মামু।

লোকটি বলল, চলে যাও ভাগিনা। জোরে চলে যাও। ততক্ষণে আমাদের সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধা দলটি সামনে এসে গেছে। রাজাকাররা আভাস পেয়ে আমাদের মাঝে রেখে ঝোপঝাড়ের আড়ালে সরে গেল। সম্ভবত তারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধা দলের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতেই চাইছে। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। আর তখনই নেমে এলো ঝমঝমে বৃষ্টি। অন্যদিকে ভোরের আভাস। আমরা যখন হাঁটা শুরু করেছি ঠিক তখনই নদী থেকে একটানা গুলির শব্দ হতে লাগল। আমরা শুয়ে পড়ার আগেই ভৈরবের যে মেয়েটি আমার ডান হাত ধরেছিল তার গায়ে গুলি লাগল। সে কোনো শব্দ করেনি। নিঃশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। আর বৃষ্টি ধুয়ে নিচ্ছে। শহীদ মাথা নুয়ে গুলিবিদ্ধ মেয়েটিকে দেখলেন। বললেন, ও তো মারা গেছে। কোমরে ও মাথায় গুলি লেগেছে। এর লাশ নিয়ে যাওয়া যাবে না। এ কথা শুনে আমার অন্য হাতে ধরা সহোদর বিলাপ করে উঠেছিল এবং বোনের লাশের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল।

২৫

যতটুকু মনে পড়ে আমরা বামুটিয়া বাজারের পাশ দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত প্রবেশ করলাম। সবারই তখন অবস্থা শারীরিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত। মানসিকভাবে একেবারেই বিপর্যস্ত। যে মেয়েটি পথে মারা গেল সীমান্ত অতিক্রমের সময় তার ছোট বোন আমার হাত ধরেই ছিল। তাকে মনে হচ্ছিল বোধ-শক্তিহীন একটা মানুষ মাত্র। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আমাদের শরীর জবজব করছিল। ভারতীয় প্রহরীরা সীমান্তে আমাদের অবস্থা দেখে কোনো প্রশ্ন না করে ইশারায় আমাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিয়েছিল। আমাদের দলের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। সীমান্ত অতিক্রম করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা একটা স্কুলের মাঠ পেরিয়ে সামনের একটা বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আশ্চর্য ঘটনা যে, প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও শরণার্থী দলের সবাই বাড়িটার দাওয়ায় উঠে যেতে লাগল। এমনকি আমার হাত ধরা ভৈরবের সেই মেয়েটিও। কিন্তু একাকী উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম। সহসা বারান্দায় উঠে দাঁড়ানোর সাহস আমার হলো না। বাড়ির এক বৃদ্ধা তর্জনি উঁচিয়ে বলতে লাগলেন, সবাই এখানে উঠবেন না। ওই গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ান। আসলে ভদ্রমহিলা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দলটার মধ্যে কয়েকজন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক আছেন। সে কারণে তিনি আমাদের বারান্দায় তুললেন না। যে কারণে আমি বৃষ্টির মধ্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। মুক্তিযোদ্ধা নেতা শহীদ আমাকে বললেন, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনাকে আপনার ভগ্নিপতির বাংলোয় পৌঁছিয়ে দিয়ে ক্যাম্পে চলে যাব। এদের দায়-দায়িত্ব এখন আর আমরা নিচ্ছি না। বর্ডার পার করে দিয়েছি। এখন যে যা ব্যবস্থামতো চলে যাবে।

আমার এ কথায় পাশের ঘর থেকে এক তরুণ বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে নেমে বলল, আসুন আপনারা। আমাদের ঘরে আসুন। বৃষ্টি থামলে যাবেন। দেখলাম ছেলে দুটির বয়স খুম কম। মনে হয় ছাত্র। ফলে সাম্প্রদায়িক ছুঁতমার্গ তাদের মধ্যে ছিল না। একটি ছেলে এসে আমার হাত ধরে টানল। আসুন আমাদের ঘরে। দেখুন আমাদের দিদিমা বাড়াবাড়ি করছেন। এই বিপদের মধ্যে আমরা আপনাদের এমনি ছেড়ে দিতে পারি না। বলে ছেলে দুটি আমাকে এবং শহীদকে টেনে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে দিল। সঙ্গে অন্য মুক্তিযোদ্দারাও বারান্দায় উঠে এলো এবং ভেজা পোশাক নিংড়াতে লাগল। প্রত্যেকের অস্ত্র এবার প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় দেখা গেল মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় আটজন! তারা বারান্দায় উঠে বৃষ্টির পানি নিংড়ে হু হু করে কাঁপছে। ছেলে দুটি কোত্থেকে যেন সিগারেট ও দিয়াশলাই এনে শহীদের হাতে দিল, আমিও একটি সিগারেট নিয়ে ধরালাম। পাশের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি আমার হাত ধরেছিল সে পাথরের স্থানু মূর্তির মতো আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা ঘণ্টা দেড়েক এ বাড়িতে ছিলাম। বৃষ্টি থেমে গেলে শহীদ তার দলবল নিয়ে উঠোনে নামল। আমিও তাদের সঙ্গে আছি।

আমি শহীদকে জিজ্ঞেস করলাম, শহীদ ভাই এই মেয়েটির মনে হয় খুব অসুবিধা হবে। অনুমতি দিলে একে আমার সঙ্গে নিয়ে নিই।

শহীদ বলল, আপনি পাগল হয়েছেন? এখানে একেসহ আপনি তো আপনার বোনের বাড়িতেও উঠতে পারবেন না। তা ছাড়া আপনি কি একে চেনেন?

আমি বললাম, না।

তাহলে একে নিয়ে আপনার মুশকিল হবে। ও আর ১০ জন শরণার্থী মানুষের মধ্যে মিশে থাকতে পারবে। কিন্তু আপনাকে আমি নির্দেশ অনুযায়ী সেক্রেটারি সাহেবের বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথায় আমি কাষ্ঠ পুত্তলিকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ভৈরবের সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাড়িটি ছেড়ে আসার সময় আমার খুব খারাপ লাগছিল। আমি নিজের জন্য কিছু ভাবছি না। মনে হচ্ছে এখনও সে আমার বাম বাহু চেপে ধরে আছে। তার করুণ চাহনি এখনও আমাকে পিছু ধাওয়া করে। মনে হয় মহা অন্যায় ও অন্যায়ভাবে ভারত সীমান্তে একটি অনাত্মীয়ের বাড়িতে তাকে ফেলে চলে এসেছি।

আমি যখন শহীদের সঙ্গে আমার ভগ্নিপতির গেটে এসে উপস্থিত হলাম, তার আগে শহীদ তার সঙ্গীদের একটি নির্দিষ্ট জায়গার নাম বলে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার আদেশ দিয়েছিল। তারা স্যালুট দিয়ে আমাকে ও শহীদকে রেখে চলে গিয়েছিল। আমরা যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সম্ভবত সকাল ৯টা বাজে। বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই সেখানে আমার ভগ্নিপতিকে দেখতে পেলাম। তিনি মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি উৎফুল্ল হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, যা হোক এসে পৌঁছেছেন? পথে নিশ্চয় খুব দুর্ভোগ গেছে?

শহীদ বলল, খুবই বিপদ ভেঙে আসতে হয়েছে। আমি তাহলে আসি।

শহীদ চলে গেলে আমি দেখলাম আমার বোন আমার পৌঁছার আভাস পেয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি খালেদ মোশাররফের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম। তার মাথায় ব্যান্ডেজ। হয়তো কোনো অপারেশনে গিয়ে আহত হয়েছিলেন।

যা হোক আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। আমার অবস্থা বুঝে আমার ভগ্নিপতি আমাকে ঠেলে ভেতরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন, আমি এতই ক্লান্ত ছিলাম যে, আমার কথা বলার শক্তি ছিল না। আমি ভেতরে ঢুকতেই আমার বোন আমাকে গোসলখানায় লুঙ্গি ইত্যাদি দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। যতদূর মনে পড়ে একটা অবশ মানুষের মতো গোসল সেরে এসে খাওয়ার টেবিলে বসে পড়লাম। খেয়েই একটি চৌকিতে শুয়ে পড়েছিলাম। আমার যাওয়ার দু'দিনের মধ্যে ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কলকাতা থেকে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে ইমামের ডাক পড়ল। তিনি সপরিবারে আগরতলা থেকে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় এসে দ্রুত পৌঁছলেন।

যতদূর মনে করতে পারছি আমরা উডস স্ট্রিটের একটি হোটেলে গিয়ে উঠেছিলাম। কয়েক দিন এখানে থেকে ইমামের জন্য বরাদ্দ বাড়ি পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

এ সময়ের অনেক ঘটনা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে চলচ্চিত্রের মতো আমার স্মরণে আসা-যাওয়া করলেও এগুলো বলার মতো স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তবে 'উপমহাদেশ' বলে আমার যে উপন্যাসটি আমি তাতে প্রায় অনেকটাই সত্য ঘটনা গল্পের ভাষায় লিখে রেখেছি। যদি আমার জীবন বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে এ রচনাটি এবং আমার উপন্যাস উপমহাদেশের কাহিনির কিছু অংশ মিলিয়ে তা করতে হবে। এখানে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন তুলে কোনো লাভ নেই। কবির প্রতিটি রচনাই রূপান্তরিত সত্য মাত্র। কিংবা বলা যায় অলঙ্ঘিত সত্য। প্রকৃত কবিরা কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেন না। নিতে পারে না। তবে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে এসে প্রথম দিকে আমি উডস্ট্রিট থেকে একদম বেরুতাম না। কারণ অতি কৈশোরে আমার খানিকটা জানা থাকলেও ওই সময়ে তা আগের মতো থাকার কথা নয়। আমি ভয় পেতাম ঠিকমতো বাসায় এসে পৌঁছতে পারব না। হায়! কলকাতা পরে আমি এমনভাবে তোমাকে চিনেছিলাম যাকে বলা যায় মর্মমূলে প্রবেশ।

আমি নয় মাস কলকাতায় অবস্থানকালে আমার প্রধান নেশাই ছিল কলকাতাকে জানা। এ ব্যাপারে যারা আমাকে সাহায্য করেছিলেন কলকাতার ওপর বই লিখেছেন সেই পূর্ণেন্দু পত্রী এবং কবিতা সিংহের মেয়ে রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী। রাজু অবশ্য কোনো বই লেখেনি, কিন্তু সে যখন শিখ ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কথা বলত তখন মুখ বাঁকিয়ে বলত, সরদারজি দেখুন আমি কলকাতাওয়ালী। ভবানীপুরে জন্মেছি। ভবানীপুরের মেয়ে। গোঁত্তা মেরে কোথাও ঘোরাবেন না। আসল ঠিকানায় নামিয়ে দেবেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বলতেন, উঠুন মামুদ মামা। এ ডাকটা এখনও আমি শুনতে পাই। হায় রাজু! তুই কোথায় হারিয়ে গেলি! তুই সত্যি কলকাতাওয়ালী ছিলি। এ কথা কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে এসে সহসা মনে হলো যে, আমি কৈশোরে যে কলকাতা দেখেছিলাম তার সবটাই চিনতে পারি। ভাবলাম একটু আনন্দবাজারে যাওয়া দরকার। যেখানে শক্তি আছেন, সুনীল আছেন, নীরেন চক্রবর্তী আছেন। আমি যে কলকাতায় এসেছি এটা তাদের জানানো দরকার। কারণ ক'দিন আগেও দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নাম উল্লেখ করে আমি কোথায়, কেমন আছি এমন প্রশ্ন অল ইন্ডিয়ায় রেডিওতে তুলেছিলেন। এর মধ্যে আমার ভগ্নিপতি তৌফিক ইমাম সাহেব আমাকে বললেন, ঘরে বসে থাকলে চলে? আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এ কথায় আমি একাকী আনন্দবাজারে বেরিয়ে পড়লাম। পথঘাট ঠিকমতো চিনব না বলে ট্রামে-বাসে না গিয়ে একটি ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আনন্দবাজার অফিসের গেটে এসে নামলাম। আনন্দবাজার প্রবেশে তখন খুবই কড়াকড়ি ছিল। একজন গোঁফওয়ালা লোক সাক্ষাৎকারীদের ভিড় সামলাচ্ছিলেন।

আমি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমি ঢাকা থেকে এসেছি। আমার নাম আল মাহমুদ।

বলতেই লোকটা চমকে উঠে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। তার মোটা গোঁফ বেয়ে প্রশ্নের কৌতূহল উপচে পড়ছে যেন। প্রশ্ন করলেন, কার সাথে সাক্ষাৎ করবেন?

আমি বললাম, সবার সঙ্গে। সবাই আমার বন্ধু। সুনীল, শক্তি যেই থাকুক বলুন আমি আল মাহমুদ।

ভদ্রলোক দ্রুত ফোন তুললেন। বললেন ঢাকা থেকে এসেছেন আল মাহমুদ। এ কথায় মনে হয় অপরদিক থেকে ত্বরিত আমাকে উপরে পাঠিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত হয়ে থাকবে। ভদ্রলোক আমার দ্রুত উপরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সঙ্গে একটি স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সোজা উপরে উঠে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে যে কামরাটিতে ঢুকলাম সেখানে পেলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। আমাকে দেখেই তিনি জড়িয়ে ধরলেন। অথচ এর আগে আমার সঙ্গে তার চাক্ষুষ দেখা হয়নি। আমি তার সম্পাদিত কীর্ত্তিবাসে নিয়মিত লিখে গেছি। এই প্রথম মুখোমুখি দেখা। তিনি আমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে বললেন, শান্ত হয়ে বসো। প্রাণে বেঁচে যখন এ পর্যন্ত আসতে পেরেছ তখন আর কোনো অসুবিধা হবে না। এক কাপ চা খাও। এর মধ্যেই আনন্দবাজারের বিভাগীয় অনেক সম্পাদক আমার আগমন বার্তা জেনে একে একে এসে সুনীলের কামরায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

আমি ঢাকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছি। তবে আমি হলফ করে বলতে পারি, ঢাকার প্রকৃত অবস্থা আনন্দবাজার গোষ্ঠী আমার কাছ থেকে প্রথম জানতে পেরেছিলেন এবং আমার কথায় তারা আস্থা রাখতে পেরেছিলেন। আমি কোথায় উঠেছি সেটা তারা জেনে আশ্বস্ত হলেন যে, আমি শরণার্থী হলেও নিরাশ্রয়ী নই।

২৬

আমার যতটুকু মনে পড়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার উপস্থিতি ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভকালের ইতিবৃত্ত বর্ণনার প্রথম সুযোগ। আমি দাবি করি যে, আমরা একটি যুদ্ধ শুরু করেছি এবং তা চালিয়ে যাওয়ার মতোন শক্তি আমাদের আছে। দেশব্যাপী মানুষের মধ্যে হানাদার বাহিনীর প্রতি যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে সেটাই এই যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়ার মতো সামরিক উপাদানে ও সাহসে ভরপুর। সম্ভবত আমি আনন্দবাজারের লেখক গোষ্ঠীকে এই প্রত্যয় দান করেছিলাম যে, এটা কোনো সামরিক হাঙ্গামা নয়। কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ পঁচিশে মার্চের ঘটনাকে ভুলে গিয়ে আবার ঠিক হয়ে যাবে সেটাও আর সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যতই শক্তিশালী হোক বাংলাদেশের জনগণের ঘৃণা তার চেয়েও শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ যুদ্ধ সহসা থামবে না।

আমার মুখের দিকে আনন্দবাজারের প্রায় সব লেখক ও সাংবাদিক একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। তারা আমার আগে আর কারো কাছে এটা যে প্রকৃতপক্ষে একটা মুক্তিযুদ্ধ তা শোনেননি। শুনলেও বিশ্বাস করেননি। তারা আমাকে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। তবে অধিকাংশই শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন।

যাহোক আমার মুক্তিযুদ্ধকালীন বিবরণ শেষ পর্যন্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, সন্তোষ ঘোষ এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পরবর্তী লেখাজোখায় প্রতিফলিত হয়েছিল।

আমি যেখানেই গেছি সে সময় কলকাতার নবীন-প্রবীণ সব লেখকেরই ভালোবাসা পেয়েছিলাম। এর কারণ এও হতে পারে যে, আমি এদের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারেই অপরিচিত ছিলাম না। 'কবিতা', 'কীর্ত্তিবাস', 'ময়ূখ'-এ লেখার সুবাদে আমি অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলাম। তাছাড়া তৎকালীন প্রগতিশীল পত্রিকায় 'নতুন সাহিত্য'র একজন প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলাম আমি। কফি হাউসে (এলবার্ট হল) আমার নিয়মিত যাতায়াত বেড়ে গেল। ততদিনে আমার ভগ্নিপতি প্রবাসে বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমি তখনও তার সঙ্গেই থাকছি। পার্ক সার্কাসের একটি বাড়িতে আমাদের আবাস। এর মধ্যে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল। বিভিন্ন খবরের কাগজে আমার বিষয়ে একটু-আধটু সমর্থনসূচক প্রতিবেদন ছাপা হতে শুরু হয়েছে। তা ছাড়া আট নম্বর থিয়েটার রোডে মুক্তিযুদ্ধের মূল অফিসের স্টাফ হিসেবে আমার নাম থাকায় আমি একটি পরিচয়পত্রও পেয়ে গেলাম। এটা ছিল আমার জন্য একান্ত জরুরি। কারণ তখন কলকাতায় চলাফেরা করার জন্য এই পরিচয়পত্রটি থাকা দরকার ছিল। আমাকে কেউ কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব না দিলেও আমি কলকাতার লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জোগানের কাজ করে চলছিলাম। শেষ পর্যন্ত মটিভেশনই আমার মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কাজ হয়ে দাঁড়াল।

মাঝে মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকার দায়িত্বও পালন করেছি।

পার্ক সার্কাসের মোড়েই ছিল সোহরাওয়ার্দী ভিলা। এই বাড়িটিতে কোনো এক সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পিতৃপুরুষরা বাস করতেন। একদিন সে বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। শুনেছিলাম সেখানে বাংলাদেশের কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়, ওই বাড়িতে গিয়ে আমি যার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম তিনি বেলাল চৌধুরী। তিনি সেখানে থাকতেন কি-না আমার জানা নেই। সব কথা ঠিক মনেও নেই। বেলাল চৌধুরী বছরখানেক আগে থেকেই কলকাতায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাল কাটাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার অনেক উপকার হয়েছিল। যতটুকু মনে করতে পারছি ওই বাড়িতে তখন আফরোজ বুলবুলের মা বাস করতেন। বৃদ্ধা আমাকে খুবই পছন্দ করেছিলেন এবং আমি পাক সার্কাসে বাংলাদেশ সরকারের একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করছি জেনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। বেলাল আমাকে নতুন করে কলকাতার লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তার সহায়তায় আমি কমল কুমার মজুমদার থেকে শুরু করে মৃণাল সেন ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। বেলালই আমাকে কবিতা সিংহের বাড়িতে নিয়ে তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যদিও কবিতা সিংহ এবং আমি পঞ্চাশ দশকের ঝাঁকের লেখক।

এ সময় আমি মাঝে মধ্যে বালু হাক্কাক লেনের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অফিসে হাজিরা দিতে যেতাম। কিন্তু রেডিওতে অংশগ্রহণ করিনি। কারণ আমার পরিবার-পরিজন তখনও বাংলাদেশে অনিশ্চিত অবস্থায় কাল কাটাচ্ছিল এবং পরিবার-পরিজনের কোনো খবরই আমার জানা ছিল না। আমি আমার কাজ সাধ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ে বেশি উদ্যমী হয়ে সম্পন্ন করে যাচ্ছিলাম। এ সময় আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, তাড়াতাড়ি এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে না।

কলকাতায় দীর্ঘদিন অবস্থান করায় এক ধরনের প্রস্তুতি আমার মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের খবর আমার সহজেই জানা হয়ে যেত। কারণ আমাকে মাঝে মধ্যে আট নম্বর থিয়েটার রোডে গিয়ে সেখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে হতো। সবাই আমাকে ভালোবাসতেন এবং প্রশ্রয় দিতেন। কেউ কেউ ডেকে কথা বলতেন। এমন কথাও বলতেন যে, আমি যেন কলকাতার লেখকদের আরও ভেতরে প্রবেশ করি। আমি তা করতে সক্ষম হয়েছিলাম বটে।

মাঝে মধ্যে আমার হৃদয়ে হতাশাও বাসা বাঁধতে চেষ্টা করত। কারণ এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিকে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস তখনও আমার গড়ে ওঠেনি। কফি হাউসে নকশালপন্থী লেখকরা মনে হতো আমাকে একটু এড়িয়ে চলতেন। আমি গায়ে পড়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করতাম। তারা তেমন উৎসাহ দেখাতেন না। সত্যি কথা বলতে কি তাদের দিক থেকে আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তাদের সবাইকে আমার কথা মোটামুটি শোনাতে পারলেও কয়েকজন নকশালপন্থী লেখককে বোঝাতে পারিনি। তারা অবশ্য আমার প্রতি কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। তবে তাদের অবজ্ঞা আমি বুঝতে পারতাম।

অবসর সময়ে আমি বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম। তিনি কলকাতার গলি-ঘুপচি, পথঘাট এবং কোথায় কী খাদ্য পাওয়া যায় তা উত্তমভাবে জানতেন। চীনা খাদ্য খেতে চাইলে তিনি আমাকে একদিন শ্রমজীবী চীনারা যে হোটেলে নিত্যনৈমিত্তিক আহার করে সেই অরিজিন্যাল চীনা হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। খুব মজাদার সেই খাদ্যের স্বাদ আমি ভুলিনি। কিন্তু গন্ধটা খুব উৎকট ছিল।

এ সময় হঠাৎ আনন্দবাজারের রবি বাসরীয় বিভাগের সম্পাদক আমার কাছে একটি কবিতা চাইল। তাদের কোনো বিশেষ সংখ্যার জন্য। এটা ছিল আমার জন্য দুর্লভ সম্মান। আমি তার হাতে 'প্রকৃতি' কবিতাটি তুলে দিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত স্থানে কবিতাটি স্থাপন করে প্রকাশ করেছিলেন। এ কবিতাটি ছাপা হলে বেলাল চৌধুরী আমাকে বলেছিলেন, আল মাহমুদ আপনি এ কবিতায় অসাধ্য সাধন করেছেন। বুদ্ধদেবরা এতদিন যে কথা বলার চেষ্টা করে চলেছেন আপনি তা একটিমাত্র কবিতায় বলতে পেরেছেন। জানবেন এ কবিতাটি কলকাতার সব কাব্যপ্রেমিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বেলালের এ কথায় আমি খুবই উদ্দীপিত হয়েছিলাম। জানি না বেলাল চৌধুরী এ কথাগুলো স্মরণ রেখেছেন কি-না। কিন্তু আমি আজও ভুলিনি।

২৭

সেই দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-কষ্টের দিনগুলোতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় মাঝে মধ্যে যেতাম। তার অফিসেও। যদিও কবিতার ব্যাপারে আমার পক্ষপাত ছিল শক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি বেশি। কিন্তু অকপটে স্বীকার করি, মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস সুনীল গাঙ্গুলী ও তার স্ত্রী আমার কাছে ছিলেন আশ্রয়দাতা আত্মীয়ের মতো। সুনীল গাঙ্গুলীর উদ্যোগেই অরুণা প্রকাশনী আমার কাব্য সংকলন 'আল মাহমুদের কবিতা' প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছিল এবং অরুণা প্রকাশনীর মালিক বিকাশ বাগচী আমাকে বইটির রয়ালিটি হিসেবে ৯০০ টাকা আমাদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে এসে দিয়ে গিয়েছিলেন। এ টাকাটা না পেলে আমার চলাফেরায় যে সচ্ছলতা তৈরি হয়েছিল তা হতো না।

মাঝে মাঝে যুদ্ধের খবরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে হতাশা আমার বুকে বাসা বাঁধতে চেষ্টা করত। সে সময় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মানুষের মতো যত্রতত্র ছোটাছুটি করে বেড়াতাম। বুঝতাম না কোথায় যাব, কী করতে হবে।

এ সময় বেলাল চৌধুরী আমাকে ভবানীপুরের এক গলিতে কবিতা সিংহের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমার সঙ্গে কবিতা, সুবীর রায় চৌধুরী ও তাদের কন্যা রাজেশ্বরী রায় চৌধুরীর (রাজুর) পরিচয় ঘটেছিল। আমি মাঝে মধ্যে ওই বাড়িতে গিয়ে সপ্তাহখানেক পর্যন্ত থেকে যেতাম। এ রাজুই আমাকে প্রকৃত কলকাতা চিনতে সাহায্য করেছিল। আমি রাজুর সেই কলকাতা চেনানোর গল্প এর আগে বলতে চেষ্টা করেছি।

একদিন কবি তারাপদ রায়ের সঙ্গে তার বাড়িতে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে খুবই আপ্যায়ন ও আপন করে নিয়েছিলেন। আমি যখন ঢাকায় কাফেলার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলাম তখন তারাপদ রায়ের একটি কবিতা আমি ছেপেছিলাম। তিনি টাঙ্গাইল থেকে কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবত ওই কবিতাটিই ছিল তার মুদ্রিত প্রথম লেখা। এটা আমার ধারণা। প্রকৃত তথ্য অন্যরকমও হতে পারে। তারাপদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একদিন অনেক রাত হয়ে গেল। এত রাতে বাসায় ফেরার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আমি তারাপদকে বললাম, এখন তাহলে কী হবে?

তারাপদ বলল, এই রাস্তার পাশের বস্তিতে থাকতে পারবে? আমি বললাম, কেন থাকতে পারব না। আমার জবাব শুনে তারাপদ দ্রুত রাস্তা থেকে নেমে ঢুকে গেল বস্তিতে। এক ঘরের দরজায় নক করতেই এক যুবতি কপাট মেলে দাঁড়ায় এবং তারাপদকে জোর হাতে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারাপদ বলল, এ আমার বন্ধু, আমার অতিথি। বাংলাদেশের খুব বিখ্যাত কবি। আজ রাতে এখানে থাকবে। সাবধান, কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হলে তোমাকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে। কেউ জিজ্ঞেস করতে এলে বলবে বাবু রেখে গেছেন। এ কথা বলে তারাপদ চলে গেলেন। মেয়েটি আমাকে ভেতরে নিয়ে বসাল। প্রথমে জিজ্ঞেস করল আমার খাওয়া হয়েছে কি-না। আমি বললাম, রাতের খাবার খেয়েই এসেছি। তখন সে বিছানা দেখিয়ে বলল, শুয়ে পড়ুন। আমি বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশের বালিশে শুয়ে পড়ল মেয়েটি। আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মেয়েটি সেটা বুঝতে পেরে বলল, শুয়ে পড়ুন। আমি বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের বালিশে শুয়ে পড়ল মেয়েটি। আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মেয়েটি সেটা বুঝতে পেরে বলল, বাবু আমার মনে হয় আপনার এভাবে শোয়া পছন্দ নয়। আমি নিচে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ি, আপনি ভালো করে ঘুমান। তারাপদ বাবু আপনার অসুবিধা হয়েছে শুনলে খুবই রাগ করবেন। মেয়েটি তার বালিশ সরিয়ে নিচে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক রাতে দরজায় টোকা পড়তেই মেয়েটি ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে কয়েকজন ষণ্ডামতোন লোককে বলল, এখানে কোনো হাঙ্গামা বাধাবে না। লোকগুলো বলল, ভেতরে কে আছে? তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে মেয়েটি দু'হাত মেলে তাদের ঠেকিয়ে দিল। বলল, তারাপদ বাবু রেখে গেছেন।

কথাটা শুনেই লোকগুলো থমকে গেল। আর কোনো হাঙ্গামা হলো না। তারা চলে যেতেই মেয়েটি দরজা বন্ধ করে তার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে ওই বস্তি ছেড়ে আসার সময় মেয়েটি আমাকে একটি কলা ও এক কাপ চা খাইয়ে পরিতৃপ্ত করল। আমি আসার সময় চৌকাঠের গোড়ায় আমাকে গড় হয়ে প্রণাম করল। আমি বললাম, এটা কী করলে?

সে গম্ভীর হয়ে জবাব দিল, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমার ঘরে একজন অপাপবিদ্ধ দেবতা মুশকিলে পড়ে রাত কাটিয়ে গেলেন।

আমি কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের বাইরে চলে এলাম। পরে উল্টোরথ পুরস্কারের সঙ্গে আমাকে বেঙ্গল পাবলিশার্সের মনোজ বসু জয় বাংলা পুরস্কার দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি একই মঞ্চে হয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক। সবার নাম এ মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না। এই অনুষ্ঠানের ছবি উল্টোরথ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। বেলাল চৌধুরীর কাছে শুনেছিলাম, ছবি নাকি ওই পাড়ার মেয়েটি পত্রিকা থেকে কেটে নিয়ে ঘরে বাঁধিয়ে রেখেছিল। কেন রেখেছিল তা অবশ্য আমি আজও বুঝতে পারিনি। তবে গড় হয়ে প্রণামের দৃশ্যটি আমি কখনও ভুলতে পারিনি।

একদিন হঠাৎ রাজু এসে কথা নেই বার্তা নেই আমাদের পার্ক সার্কাসের বাসায় হাজির। আমার ভগ্নিপতি ও বোন পারুল রাজেশ্বরী রায় চৌধুরীকে দেখে মনে হয় একটু চমকে গিয়েছিলেন। তাকে যথার্থ আপ্যায়ন করলেও আমার বোন আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আমার বোন বললেন, পিয়ারু ভাই, বাংলাদেশে আপনার সবচেয়ে আপনজন যিনি আমাদের ভাবী তার কথা কখনও ভুলবেন না। তার অপমান হয় এমন কোনো কাজ করবেন না।

আমার বোনের ইঙ্গিতটি আমি বুঝতে পেরে বললাম, আরে এ তো হলো কবিতা সিংহের মেয়ে, আমার ভাগ্নি।

আমার বোন হেসে বলল, আমি আপনাকে নিয়ে এসেছি, আপনাদের পরিবার সম্বন্ধে আমার জানা আছে। একটা কর্তব্যও আছে। এ জন্য এ কথাটি বললাম ভাই, কিছু মনে করবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে মুক্তিযুদ্ধ এক চরম পর্যায়ে উপনীত হলো। সব জায়গায় বাংলাদেশের ছেলেরা গ্রামে গ্রামে ঢুকে অপারেশন শুরু করল। হানাদার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি এমনভাবে বাড়তে লাগল যাতে 'মুক্তি' শব্দটি তাদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর ভীতি ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। আমি ভেবে নিয়েছিলাম এই যুদ্ধ কমপক্ষে নয়-দশ বছর চলবে। এ দীর্ঘ সময় কলকাতায় থাকতে হবে ভেবে আমার মধ্যে এক ধরনের হতাশাও সৃষ্টি হয়েছিল।

দুপুরে খাওয়ার সময় মাঝে মধ্যে আমার বড় ভাগ্নি জিজ্ঞেস করত—মামা, আমরা আর ঢাকা যেতে পারব না? আমি কতক্ষণ চুপচাপ থেকে তাকে যুদ্ধের মিথ্যা সংবাদ শুনিয়ে দিতাম। বলতাম, শুনিসনি পাঞ্জাবিরা মার খেয়ে ভূত হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাড়াতাড়ি ঢাকায় গিয়ে ভিক্টোরি সেলিব্রেট করব।

ওসব দিনের কথা মনে হলে মনটা কেমন জানি হয়ে যায়। ভাবি, ওই যুদ্ধটা আরও কিছুদিন চলতে দিলে হয়তো এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো যাতে বিশাল বাংলার স্বপ্ন যারা দেখতেন তাদের ইচ্ছা পূরণ হতো।

এর মধ্যে একদিন শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার বন্ডেলের বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। আমি সময়ের একটু আগে গিয়ে উপস্থিত হলাম। শক্তির বউ আমাকে দেখে কেঁদে ফেলল। বলল, তোমার বন্ধু এমন এক ঘটনা ঘটিয়েছে, বলো এখন আমি কী করি?

বললাম, কী হয়েছে?

সে কথা শোনার আগে তুমি চারটা খেয়ে নাও। আমি বললাম, খাব না। তুমি বলো কী হয়েছে? শক্তির স্ত্রী বলল, কী আবার হবে। শক্তি মদ খেয়ে আনন্দবাজার অফিসের সামনে গণ্ডগোল বাধিয়েছে। মদ খেয়ে ওই অফিসের সামনে আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের সবাইকে কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করেছে। চিৎকার করেছে। বলো ওর চাকরিটা কি আছে? এমনিতেই সন্তোষ বাবু ওর ওপর অসন্তুষ্ট। এখন এ কাণ্ড, বলো কী করি?

আমি বললাম, তাহলে আমি আসি।

কোথায় যাবে?

আগে সন্তোষদার বাসায় যাব। তারপর যা হোক একটা কিছু করব।

আমার এ কথায় শক্তির বউ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি অসময়ে গিয়ে সন্তোষ কুমার ঘোষের দরজায় বেল টিপলাম। আমার ভাগ্য ভালো যে, তখন তিনি সবেমাত্র খেতে বসেছেন। আমাকে দেখেই বললেন, বসে যাও। তার আন্তরিকতার এ ঘটনাটি আমি স্মরণে রেখেছি। খাওয়া হলে তিনি বিশ্রাম না নিয়ে বললেন, চলো এখনই অফিসে যেতে হবে। আমি তার সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। তিনি চৌরঙ্গির রাস্তার পাশে কোনো একটা বারে আমাকে নিয়ে ঢুকলেন এবং লেমন জিনের অর্ডার দিলেন। আমার মনে হয় এটা তার প্রিয় পানীয় ছিল। খেয়ে গাড়িতে উঠতেই আমি তাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে আছে একটা কবিতার কিছু লাইন—

“ফিরে আবার আসব না কক্ষণো
তোমার কাছে ভুলতে পরাজয়
সবাই বলত অমুক মাসে এসো
অমুক মাসে বছরে দশবার
তুমি আমায় বললে এসো নাকো
জীবনভর কাজের ক্ষতি করে।
কিংবা
লেভেল ক্রসিং দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
এখন তুমি পড়ছ কি হার্টট্রেন?”

সন্তোষদা জিজ্ঞেস করলেন এসব কার কবিতা?

আমি বললাম, একটু পরেই আপনি যার চাকরিটি বাতিল করতে যাচ্ছেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।

তিনি চমকে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। এভাবে একবার আমি অন্তত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চাকরিটি রক্ষা করতে পেরেছিলাম বলে দাবি করি। এসব বর্ণনার কোনো সন-তারিখ আমি উল্লেখ করতে পারব না। হয়তো এ ঘটনাটি আমি যেভাবে বলছি তার কিছু আগে ঘটেছিল কিংবা পরে।

শক্তির পরিবার অর্থাৎ তার স্ত্রী এ ঘটনার সাক্ষী।

AMARBOI.COM

২৮

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার দিনগুলোর কথা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আমার স্মরণ রেখার ওপর বিদ্যুতের ঝলক দিয়ে যায়। এর আগে আমি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী মিনাক্ষীর কথা উল্লেখ করেছি। শক্তি তখন আনন্দবাজারের শিশু বিভাগটি দেখতেন। এ কাজে তার এক ধরনের দক্ষতা সৃষ্টি হয়েছিল। পৃষ্ঠাটিতে আমিও দু'একবার লিখেছি।

আনন্দবাজার ছাড়া সাহিত্যের ব্যাপারে অন্যত্র যাওয়ার আমার কোনো স্কোপ ছিল না। কেউ নিয়েও যায়নি। তখন ছিল নকশালের যুগ। চারু মজুমদারের একচ্ছত্র প্রভাবের মধ্যে কলকাতা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত।

কফি হাউসে গেলে বুঝতে পারতাম নকশালীরা আমাকে দু'চোক্ষে দেখতে পারে না। অন্যদিকে সিপিআইয়ের ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখলে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। বসতে দিত। গায়ে পড়ে কফি খাইয়ে দিত। রাস্তায় দেখা হলে মেয়েরা গা ঘেঁষে অসঙ্কোচে চলাফেরা করত। তাদের আন্তরিকতা আমাকে হতাশা কটিয়ে উঠতে সাহায়ে করেছিল। এখানে অকপটে একটা কথা স্বীকার করি, আমি নিজেও নকশালীদের ভয় পেতাম। কারণ আমি চাকরি করতাম মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় অফিস ৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নম্বর থিয়েটার রোডে। কলকাতায় রাস্তাঘাটে চলাফেরার ব্যাপারে আমার প্রকৃতপক্ষে কোনো নিরাপত্তা ছিল না। একবার তো শিয়ালদা স্টেশনের কাছে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি এবং সতর্ক হয়েই হাঁটছি। এমন সময় কোত্থেকে একটা প্রাইভেট কার এসে আমার পায়ের পাতার ওপর দিয়ে জুতোসহ পা মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। এক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াল না। অথচ ড্রাইভার নিশ্চয় ভালো করে জেনেছে যে, সে আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছে। পায়ে জুতো থাকায় হাড়গোড় ভাঙল না বটে কিন্তু খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। ফুটপাথে উঠে লেংছিয়ে লেংছিয়ে বাড়ি ফিরে পায়ের চিকিৎসা করতে হয়েছিল।

নকশালীদের দাপটে কলকাতা তখন সম্পূর্ণভাবে পরাভূত। নকশালপন্থী কবিরা কলেজ স্ট্রিট এলাকায় আমার খুব নিন্দা করত। কিন্তু যেহেতু কলকাতার অধিকাংশ পাঠক সেখানকার সাহিত্য পত্রিকাগুলোর বদৌলতে আমাকে চিনত, সে কারণে আমার খ্যাতির ওপর মলিনতা তারা ছড়িয়ে দিতে পারেনি। সিপিআইয়ের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত দু'একজন কবি তখন আমার তত্ত্ব তালাশ নিতেন। তাদের মধ্যে দু'জনের নাম আমি উল্লেখ করতে পারি। একজন তরুণ সান্যাল আরেকজন কবি অমিতাভ দাশ। শেষোক্তজন আমাকে গভীর নৈটক্য দিয়েছিল। যদিও বেলাল চৌধুরী যার সঙ্গে আমি কলকাতায় ঘুরেফিরে বেড়াতাম, অমিতাভকে তেমন পছন্দ করতেন না। মাঝে মধ্যে আমি বালু হাক্কাক লেনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অফিসে গিয়ে ধরনা দিতাম। সেখানে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যেত।

এ সময় হঠাৎ কলকাতার বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটল। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। আমার কথা রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিতও হয়েছিল। ফলে তারাশঙ্করের এক নাতনির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পর চিঠিতে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার নাম কাঞ্চন কুন্তলা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে অনেক কিছু লিখত আমাকে। তখন আমি গণকণ্ঠের সম্পাদক। ব্যস্ততার মধ্যেই প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হতো। আমি এ সময় শুধু ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে অনেক মানবিক সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলেছিলাম। এর জন্য নিজেকে বড় ছোট মনে হয় আজকাল। মুক্তিযুদ্ধের পর কবি জীবনানন্দ দাশের কন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ আমাকে তার পিতার নামাঙ্কিত পুরস্কার দিতে ঢাকায় এসেছিলেন এবং রণেশ দাশের সভাপতিত্বে মঞ্জু আমাকে ওই পুরস্কার দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একবার আমার খুব সাধ হয়েছিল সীমান্তে যেসব জায়গায় মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্প করে আছে কিংবা ট্রেনিং করছে এসব কর্মতৎপরতা স্বচক্ষে দেখার। এই ভেবে একদিন কুষ্টিয়া সীমান্তে এক জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম। যেখানে প্রায় তিনশ' মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নিচ্ছে এবং মাঝে মধ্যে অপারেশনে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে দেখলাম মাত্র ২০টা প্লেটে মুক্তিযোদ্ধারা পর্যায়ক্রমে আহার করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি উপস্থিত হলে তারা থালা বাজিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। তারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাকে পেয়ে তাদের আনন্দ যেন উথলে উঠেছিল। সে স্মৃতি ভোলার নয়।

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ একটি পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপা হলো। তারা লিখেছেন, আমি নাকি ভিআইপিদের মতো পোশাক পরে কফি হাউসে ঘুরে বেড়াই। আমার শার্টের অর্থাৎ সাজ পোশাকের এমন সমালোচনা হতে পারে এটা ছিল চিন্তার বাইরে। বুঝলাম এটা ঈর্ষাকাতর নকশালপন্থী লেখকদের কাজ। প্রকৃত সত্য হলো এই যে, আমি যে শার্ট এবং প্যান্ট পরে ঢাকা থেকে গিয়েছিলাম সেটা ছিল একটু ঢাকাইয়া মেজাজের এবং একটু উচ্চমূল্যে কেনা। আমি যে পোশাকে ঢাকা থেকে পালিয়েছিলাম সে পোশাক পাল্টাতে পারিনি। পারিনি আর্থিক কারণে। নকশালপন্থী লেখকরা এটাকে নিয়ে প্রবন্ধ ফেঁদে বসেছে। আমি কফি হাউসে গেলে অনেকে আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আমি সরাসরি বললাম, এটা ঢাকার পোশাক। একটাই শার্ট, একটাই প্যান্ট। এটা পাল্টিয়ে ভিকারির পোশাক এখনও জোগাড় করতে পারিনি। এটা হলো একজন মুক্তিযোদ্ধা কবির পোশাক। যারা এ নিয়ে প্রবন্ধ ফেঁদেছেন তারা জানেন না, আমার আর কোনো পোশাক নেই। এতে প্রশ্নকারীরা বেশ বিব্রত হলো এবং আমার জবাব মুহূর্তে সারা কফি হাউসে ছড়িয়ে পড়ল।

এ সময় আমার সঙ্গে কবি ও শিল্পী এবং আনন্দবাজারের শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। পত্রীকে রাজু মামা বলে ডাকত। যেমন আমাকে মামুদ মামা বলে সম্বোধন করত। টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় পূর্ণেন্দু পত্রীর স্ত্রীর পত্রের প্রস্তুতি প্রদর্শনের আমন্ত্রণ পেলাম। যথাসময়ে রাজু আমাকে নিয়ে সেখানে হাজির হন। এ ছবিতে রাজু বিন্দুর অভিনয় করেছেন। তার উৎসাহে আমি ওখানে হাজির হলাম।

রাজুর কোনো সংলাপ ছিল না। নিঃশব্দ আবেগময়ী এক কিশোরীর চরিত্র। দারুণ ভালো লেগেছিল। পূর্ণেন্দু যদি বাংলা সিনেমায় প্রথম থেকে থাকতেন তাহলে বাংলা সিনেমার দুর্গতি ঘুচে যেত।

শো শেষ হলে রাজু আমাকে সেখানে উপস্থিত মৃণাল সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মৃণাল বাবু অনেকক্ষণ আমার হাত ধরে ছিলেন। আমার খোঁজখবর নিয়েছিলেন। আমি কোথায় আছি, কেমন আছি তা জেনে তিনি স্বস্তিবোধ করেছিলেন। সে সময় কলকাতায় খালাসিটোলা বলে একটি মদের আড্ডায় তরুণ লেখকরা ভিড় জমাতেন। কার সঙ্গে যেন আমি একবার সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। আমার সঙ্গে সেখানে অনেক খ্যাতিমান লেখকের পরিচয় ঘটেছিল। এই মুহূর্তে তাদের নাম উল্লেখ করতে পারছি না। স্মৃতিতে নেই। পরে মনে পড়লে আমি তাদের নাম উল্লেখ করব।

এ সময় আমার মানসিকতায় একটু শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। কেমন একটা গাছাড়া ভাব। কিন্তু আমি মনেপ্রাণে আল্লাহর কাছে যৌন সংযম প্রার্থনা করতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে আমার প্রভু আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এভাবে একদিন আমার সঙ্গে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ ঘটে গিয়েছিল। প্রথম সাক্ষাতে তিনি আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং আমার ওপর একটি মিনি বুক প্রকাশের উদ্যোগ নিতে আমার অনুমতি নিয়েছিলেন। সোনালী কাবিনের চৌদ্দটি সনেট নিয়ে ওই বইটি প্রকাশ হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাড়া পড়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রী মিনি বুকটি তাদের ব্লাউজের ভেতর লুকিয়ে রাখত। এটা কোনো ব্যাপার ছিল না। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আমার জন্য এ অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তার সঙ্গে সেই যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা তার শেষদিন পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। সন্দীপন আমাকে বাংলাভাষার আধুনিকতম জ্যান্ত কবি হিসেবে বর্ণনা করতেন। গত বছর ভানু সিংহ পদক আমাকে দেওয়ার জন্য যে অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে সন্দীপন আমার ওপর অসাধারণ কিছু কথা বলেছিলেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে আমার বিরাট ক্ষতি হয়েছে বলে আমি অনুশোচনা করি। তার মৃত্যুর আগে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। এটাই তার সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল ঢাকায় আসার। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের কারণে সম্ভবত অন্য কবিদের মতো দলবেঁধে ঢাকায় উপস্থিত হননি। আমি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলাম। তার একটি গ্রন্থের নাম ছিল 'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি'। হয় এটি তার কোনো বই অথবা কোনো প্রবন্ধের নাম হবে। এটি কলকাতাইয়া লেখকের চরিত্র থেকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

AMARBOI.COM

২৯

এর আগে আমি খালাসিটোলার কথা উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে আমার সাথে দেখা হয়েছিল কমল মজুমদারের।

তিনি এখন 'তার অন্তর্জলি যাত্রা' এবং 'পিঞ্জরে বসিয়া শুখ' বইয়ের জন্য খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বাংলাভাষায় ফরাসি কায়দা প্রয়োগ করতে গিয়ে এমন এক গদ্যভাষা সৃষ্টি করেছেন যা মূলত অস্বাভাবিক পাঠ কিংবা বলা যায় পেঁচানো গদ্য ভাষার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম যে, আমি তার লেখার অন্তর্বস্তু এবং মনুষ্যত্ববোধকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তার গদ্যকে নয়। আমার কথায় তিনি মনে হয় থমকে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমাকে কিছুই বললেন না। আমি তাকে বলেছিলাম যে, সাধারণ পাঠকের কাছে কষ্ট গদ্য সুধিন্দ্রনাথ দত্তও লিখতেন। কিন্তু ওই গদ্য পরবর্তীকালে তরুণ লেখকদের অনুকরণীয় হয়নি। বরং বুদ্ধদেব বসুর গদ্য অনুরকণীয় হয়েছে।

বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে এমন-কি জসীম উদ্দীনও অনেক ভালো গদ্য লিখেছেন। সুধিন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা কমল কুমারের গদ্যভঙ্গি শেষ পর্যন্ত বাংলাভাষীরা আর নেবে না। নেয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতটুকু মনে পড়ে কলকাতার সাধারণ মুসলমানরা আমাদের ভালোভাবে নেয়নি। তারা আমাদের থেকে নিজেদের একটু দূরে সরিয়ে রাখত। কথা বলতে চাইত না। কফি হাউসে মুসলমান লেখকদের দু'একজনের সাথে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত। আমার কাছে বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু পরে যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখেছি তাদের কাছে পাকিস্তান ছিল আশা-ভরসা ও অহঙ্কারের কেন্দ্রভূমি। আমরা সে পাকিস্তান ভেঙে ফেলার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছি এটা তাদের কাছে মনে হয়েছে দুঃস্বপ্ন। আমি আমার 'উপমহাদেশে' বইয়ে এর কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। একজন সামান্য মুসলমান পানের দোকানদার আমাদের কাছে খুশি মনে এক খিলি পানও বিক্রি করতে চাইত না। যদি বুঝতে পারত আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছি। সোজা বলে দিত আগে যাইয়ে। আমাদের প্রতি এ অবজ্ঞার ভাব লক্ষ করে আমি সাধারণত কলকাতার কোনো মুসলিম দোকানে কোনো কিছু কিনতে যেতাম না। অথচ এ কলকাতার সাথে ব্রিটিশ আমল থেকে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যবসায় বাণিজ্যে, দোকানপাট ও রুজি-রোজগারের বিষয় ছিল কলকাতা শহর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তখন বিপুল তাণ্ডব চলছিল। কারণ মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে অপারেশন চালাচ্ছিল। দেশের ভেতরে তাদের আশ্রয় ও খাদ্যপানীয়ের কোনো অভাব ছিল না। তারা স্থান থেকে স্থানান্তর ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং সুযোগমতো আঘাত হেনে বেশ দুঃসাহসের পরিচয় দিতে লাগল। এদের এই বীরত্বের কথা তখন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে এম আর আখতার মুকুল বেশ রসিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হতাশার দানা বেঁধে উঠেছিল। কারণ মুক্তিযুদ্ধ যতই বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে লাগল ততই কলকাতায় আমাদের প্রতি আতিথ্যের মনোভাব একটু অন্যরকম হয়ে যায়। সোজা কথা কলকাতা আমার তেমন আর ভালো লাগছিল না। অথচ আমি কোনো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ছিলাম না।

বোনের বাড়িতে পারিবারিক পরিবেশের মতোই আমার অবস্থা ছিল। আর থাকতাম তো পার্ক সার্কাসে। আমার পূর্ব পরিচিত এলাকা। এ সময়ের একটি ঘটনা খুব মনে পড়ে। ওই কলেজ স্ট্রিট এলাকাতেই কলকাতার এক মুসলমান বন্ধুর সাথে তার অনুরোধে তাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে তার পরিবার-পরিজনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে, বেরিয়ে পড়ল যে এটা আমারই এক দূরসম্পর্কীয় ফুপুর বাড়ি। আমার পারিবারিক পরিচয় অন্দরে ব্যক্ত করা হলে আমার ফুপু পর্দা থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, অমুক ভাইয়ের ছেলে না? তিনি আমার আব্বার নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমি তাকে কদমবুসি করলাম। ভেতর থেকে মেয়েরা সবাই এসে আমাকে দেখতে লাগল। সম্ভবত পাকিস্তান হওয়ার পূর্বেই কলকাতার সাথে আমার পরিবারের কিছু বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিবারের সাথে পরিচয় হওয়ার পর আমার মনে একটু সাহস ফিরে এলো। মনে হলো বিদেশ-বিভূঁইয়ে, বিপদে, মুছিবতে একেবারে মাঠে মারা পড়ব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুপু আমাকে বলেছিলেন, থেকে যা এখানে। আরে তুই তো আমার ভাইয়ের বেটা। তোর আব্বা মাল কিনতে এলে এক সময় এ বাড়িতেই এক-আধ-দিন কাটিয়ে যেতেন। পরে কলকাতার এখানে-সেখানে ওই বাড়ির ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা হয়ে গেলে তারা আমাকে মাহমুদ ভাইয়া বলে ডাকত। জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চাইত। আমি অবশ্য এ আত্মীয়তায় সাড়া দিতে তেমন আগ্রহ দেখাইনি। কারণ আমরা যে যুদ্ধে জড়িত ছিলাম আমার ফুপুরা ছিল এর ঘোর বিরোধী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৭ মাসের মাথাতেই একটা অখণ্ড আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করতে পেরেছিল। এর দু'মাস পরই ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাদের অভিযানের নির্দেশ দিলেন। ঘটনাটা ছিল খুবই আকস্মিক। এমন একটা ঘটনার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা একদম প্রস্তুত ছিল না। আমি ঢাকায় ফিরে আসার নির্দেশ পেলাম। সম্ভবত আমি আগেই উল্লেখ করেছিলাম আমার প্রতি নির্দেশ ছিল ঢাকায় চলে যাওয়ার। একটি স্লিপের মাধ্যমে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশটি দিয়েছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিকনায়ক জেনারেল ওসমানী। আমার ভগ্নিপতি আমাকে স্লিপটি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনাকে ঢাকা চলে যেতে হবে। একদিন অপ্রস্তুত অবস্থায় আকস্মিকভাবে একটি বিশাল সুটকেস নিয়ে আমি ভারতীয় বাহিনীর এয়ার ক্যারিয়ারে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেখানে যাদের দেখা পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর, আবিদুর রহমানসহ আরও কয়েকটি পরিচিত মুখ।

আমরা তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে নামলাম এবং দেখলাম যে, বিমানবন্দরটি প্রায় পরিত্যক্ত। লোকজন নেই। আমার সাথে যারা এসেছিলেন তারা প্রায় সবই বাক্সপেটরা কাঁধে নিয়ে গেটের দিকে দৌড়াতে লাগল। আমার বাক্সটি ছিল সত্যিই ভারী। বইয়ে ঠাসা এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ভর্তি। কী করব? বাক্সটি মাথায় তুলে নিলাম এবং অতিকষ্টে কোনোরকম বিমানবন্দরের গেট পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। দু'একটি বেবিট্যাক্সি দেখা গেল। হাতের ইশারায় ডাকলেও তারা আমার দিকে না তাকিয়ে দ্রুত চলে গেল। আমি একাকী দাঁড়িয়ে আছি নিরুপায়।

এ সময় একটি বেবিট্যাক্সি আমার গা ঘেঁষে যাচ্ছে দেখে আমি দু'হাত তুলে তাকে দাঁড়াতে বললাম গাড়িটি দাঁড়াল না। বেশ খানিকক্ষণ পথ গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ব্রেক করে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

খিলগাঁও বাগিচায়।

লোকটা কত দিতে হবে জিজ্ঞেস করল না। আমি দ্রুত সুটকেসটা নিয়ে উঠে পড়লাম।

ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন?

হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা স্টার্ট তুলে চলতে লাগল। মুখে কোনো শব্দ করল না। বুঝতে পারলাম না কার সাথে চলেছি, এ কেমন লোক! কিন্তু ড্রাইভার একরোখা গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে খিলগাঁও বাগিচায় এসে আমার বাসস্থানে দাঁড়াল।

বউ-বাচ্চা রেখে গিয়েছিলেন? তারা কি এখনও আছে! শহরে তো এখনও মানুষ ফেরেনি। সব গ্রামে পালিয়ে গেছে। আমি সুটকেসটা স্কুটার থেকে নিচে নামিয়ে রাখলাম। বললাম, কত দেব? আমার কাছে ভারতীয় নোট ছাড়া কিছু নেই।

অসুবিধা নেই। আমি তো দাম-দর করে আপনাকে আনিনি। মিটারও নেই।

আপনার যা খুশি তাই দেন।

আজ মনে হচ্ছে আমার ঢাকার দীর্ঘ জীবনে আমি একজন সুহৃদয় বেবিড্রাইভারকে পেয়েছিলাম যে কিনা শুধু মায়াবশত আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে খিলগাঁও বাগিচায় নিয়ে এসেছে। আজ আমার আর মনে নেই তাকে কত টাকার ভারতীয় নোট দিয়েছিলাম। মনে হয় চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ হবে। টাকাটা হাতে নিয়ে সেই কাঁচাপাকা বেবিচালকটি গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল।

আমি আমার ঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম দরজাটা হাঁ, খোলা। কপাট ঠেলে ভেতরটা দেখে মনে হলো কিছুই অবশিষ্ট নেই। অথচ আমার এ ক্ষুদ্র গৃহটি আসবাবপত্র, রেডিও, টুকটাক সুন্দর জিনিস দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। আমি বাড়িওয়ালার খোঁজ করে সামনে গিয়ে দেখি বাড়ির সবাই বিলাপ করছে। এ বাড়ির একটি ছেলে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছিল। তার শাহাদাতের খবর একটু আগেই এসে পৌঁছেছে। আমাকে দেখে তারা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। সে বুকফাটা কান্না আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না।

এ অবস্থায় আমি ধপ করে বসে পড়লাম। কোথায় আমার সুটকেস, কোথায় আমার ঘরের জিনিসপত্র জিজ্ঞেস করা। আমি একেবারে বোবা হয়ে বসেছিলাম।

আমাকে যেতে হবে রায়পুরা থানার সেই নারায়ণপুর, যেখানে আমার স্ত্রী-পুত্রদের রেখে গিয়েছিলাম। অথচ রেলপথ অকেজো হয়ে পড়ায় টঙ্গী পর্যন্ত বড়জোর ট্রেনে যাওয়া যাবে বলে শুনেছিলাম। যা হোক বাড়িওয়ালার এই শোকাহত বাড়িতেই আমি আমার বৃহদাকার সুটকেসটা রেখে একটা ঝোলায় কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার হাতে আড়াই হাজারের মতো ভারতীয় টাকা ও অল্প কিছু পাকিস্তানি আমলের মুদ্রা ছিল। অনেক কষ্টেসৃষ্টে এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে একটি ট্রেনে চেপে টঙ্গীর দিকে যাত্রা শুরু করলাম। গাড়িটি টঙ্গীতে এসে যাদের নামিয়ে দিল তারা সবাই মনে হয় নিরুদ্দেশ যাত্রী। এখানে নেমে হেঁটে কে কোথায় চলে যেতে লাগল আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমিও সামনের দিকে হাঁটা ধরলাম। কিন্তু বেশি দূর এগোনো গেল না। কোনো একটা হাটে এসে আমি নদীর পাড়ে একটি বেদে নৌকা ভাড়া নিয়ে ভৈরব বাজারের দিকে রওনা হলাম। নৌকাটা চালাচ্ছিল এক মধ্যবয়স্ক বেদে এবং তার অত্যন্ত সুচতুর কন্যা। মেয়েটি একশ টাকার বিনিময়ে আমাকে ভৈরবের টিনপট্টিতে ঠিক আমার বোনের বাসার সামনে নামিয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িটি খালি পড়ে ছিল আমি জানতাম। তারাও নারায়ণপুর আমার স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে একসাথে আছে। ওখানে নেমে আমার পরিচিত একটি রিকশা নিয়ে আমি নারায়ণপুরে রওনা দিলাম। পথে দেখলাম পাকিস্তানি জওয়ানরা সশস্ত্র অবস্থায় মুখ গোমড়া করে রাস্তায় বসে আছে। তারা এখানকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের হাতে আত্মসমর্পণ করেছে। যেতে যেতে ওই মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সাথে দেখা হয়ে গেলে দেখলাম তিনি আমার আত্মীয়। আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্যদের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছি। তারা আমার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছিল। কারণ আমার গায়ে জলপাই রঙের সোয়েটার। হয়তো তারা ভাবছে কোনো মুক্তিযোদ্ধা গ্রামে ফিরছে। আমি একবারও তাদের দিকে না তাকিয়ে কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে রাস্তা পার হলাম। আল্লাহর অপরিসীম রহমতে সন্ধ্যার একটু আগে আমার পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হলাম এবং রাতেই নৌকায় করে ভৈরব ফিরে এলাম।

৩০

চারদিকে ধ্বংস্তূপ। ভৈরব ব্রিজের একটা অংশ মেঘনার বুকে নেমে এসেছে। অর্থাৎ বিস্ফোরক দিয়ে এ অংশটিকে হানাদার বাহিনী নিজেরাই উড়িয়ে দিয়েছে। দৃশ্যটি এখনও আমার চোখে ভাসছে।

পরে অবশ্য এই ভাঙা ব্রিজটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা। ব্রিজটির এ অংশ ভেঙে ফেলার প্রকৃতপক্ষে কোনো যুক্তি ছিল না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের চাপের ফলে এবং তাদের অগ্রবাহিনীর অভিযানের ফলে দখলদার বাহিনী এ কাজটি করেছে।

এতে বোঝা যায়, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের কতটা ভয় পেত।

ট্রেন লাইনে ঢাকায় যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে আমি ও আমার স্ত্রী লঞ্চে রওনা দিলাম। শুনলাম নবীনগর থেকে নীলা বলে একটি লঞ্চ সদরঘাট গিয়ে পৌঁছত। যাত্রাটা অনিশ্চিত জেনেও আমি ও আমার স্ত্রী ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাংলাদেশের বাজারগঞ্জ থেকে অন্য একটি লঞ্চে নবীনগর বাজার ঘাট গিয়ে নামলাম। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল বলতে হবে। লঞ্চে ঠিকমতো জায়গা করে নিতে অসুবিধা হলো না। কারণ লঞ্চটির মালিক ছিলেন আমার মায়ের চাচা বিখ্যাত রাজনীতিবিদ আবদুর রহমান খাঁ। লঞ্চের কর্মচারীরা আমাকে কমবেশি চিনত। তারা সাদরে আমাদের কেবিনে জায়গা করে দিয়েছিল। আমরা বাক্সপেটরা ও একটি বেড রোল সম্বল করে সদরঘাটে এসে নামলাম। সেখানে থেকে রিকশায় এসে উঠলাম আমার লুট হয়ে যাওয়া পুরনো আবাস খিলগাঁও বাগিচায়। বাড়ির মালিক আমাদের দেখে খুশি হয়েছিল এবং নিজ ঘর থেকে একটি চৌকি, রান্নার হাড়িকুড়ি এবং একটি স্টোভ এনে দিয়েছিল। শুরু হলো আমাদের ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসার। কিছুই ছিল না আমাদের। কিন্তু আমরা এসে সংসার পেতে বসেছি একটা বিপজ্জনক এলাকায়। তখনও মানুষের বাড়িতে বাড়িতে লুটতরাজ চলছিল। এসব লুটপাট করছিল তখনকার দিনগুলোতে অমুক্তিযোদ্ধা ছেলেপেলে। এরা মানুষের বন্ধ দরজা ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ মালামাল ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছিল। কেউ কিছু বলার সাহস করত না। তাদের হাতে থাকত আধুনিক অস্ত্র।

এ সময় ঢাকায় ফিরে আসা যে বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি সেটা আমাকে অনেকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পাড়ার শুভানুধ্যায়ী মুরব্বিরাও। যদিও আমি খুব বাস্তববাদী ছিলাম বলে নিজেকে দাবি করতাম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ছিলাম অদৃষ্টবাদী। আর একজন অদৃষ্টবাদী যখন নিজেকে মার্কসবাদী বলে ঘোষণা করে তখন এ অসঙ্গতি ও ফাঁকটি নিজে ধরতে না পারলেও সামাজিক ইতিহাসে আত্মগোপনকারী আত্মার প্রকোষ্ঠে ধরা পড়ে যায়।

তখনও চতুর্দিকে গুলির শব্দ। রাত ঘনিয়ে আসে বর্বরতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। এ অবস্থায় কী করি কোথায় যাই! আমার সঞ্চিত অর্থও প্রতিদিনের পারিবারিক প্রয়োজনে খরচ হয়ে যাচ্ছে। ঢাকার প্রতিটি পাড়ার মানুষ আতঙ্কের মধ্যে আছে। কারণ পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের পর ঢাকা কয়েক দিনের জন্য জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত হয়েছিল। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পণ করেননি। তাদের কেউ কেউ ঢাকায় আত্মগোপন করে থাকলেও অধিকাংশই ছিলেন ঢাকার শহরতলি অঞ্চলে কিংবা তার চেয়েও দূরের কোনো গ্রামে। আমার মধ্যে অতি গভীর হতাশা ও আক্ষেপের সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় মুখচেনা অনেক লোককে আমি মানুষের বন্ধ দরজা ভেঙে লুটপাটে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। অথচ এদের ঘোষিত আদর্শ ছিল সমাজতন্ত্র। এরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর অন্তত পনের দিনের জন্য ঢাকাকে তারা এক পাশব নৈরাজ্যের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছিল। এরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে নিজেদের দাবি করত। যখন নিরুপায়ভাবে নিজের ঘরে নিজেই বন্দির মতো আছি ঠিক সে সময় আমার পূর্ব পরিচিত এক ছাত্রনেতা আফতাব আহমাদ এসে আমার দরজায় কড়া নাড়লেন। আমি দরজা খুলে দাঁড়াতেই দেখি আফতাব। আমি বললাম, কখন ফিরলে?

আফতাব আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, এক্ষুণি চলুন।

ভেতরে এসে এক কাপ চা খাও আফতাব।

চা যেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই সেখানে গিয়ে খাব।

আমি আফতাবকে বহুদিন ধরে জানতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের তুখোড় ছাত্র। ছাত্রলীগ নেতা এবং আমার বিশেষ অনুরাগী। আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার স্ত্রীকে উচ্চস্বরে বললাম, আমি আফতাবের সঙ্গে বেরোচ্ছি। অযথা টেনশনে থেকো না। আমি আফতাবের সঙ্গে এই প্রথম একজন মুক্তিযোদ্ধার আহ্বানে চৌকাঠ পেরুলাম। আফতাব আমাকে নিয়ে চলে এলো আমার চিরপরিচিত এলাকা ও এককালের বসবাসের এলাকা র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটে। অতীত ঢাকার সবচেয়ে উচ্চবিত্তদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এককালের আবাসিক এলাকা। অতীতের কাহিনিতে পাই এখানে একদা বাস করতেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, যিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রথম আত্মদানকারী বাঙালি নারী। এখানে কাজী নজরুল ইসলাম রাণু সোমকে গান শেখাতে আসতেন। যিনি পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসু হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে নায়িকা হয়ে উঠেছিলেন। এখানে নজরুলকে একদল যুবক বাধা দিতে এসে মারধর করতে চেয়েছিল। কিন্তু কাজী সাহেব তাদের হাতের বাঁশ নিয়ে তাদের পিটিয়ে একশা করে দিয়েছিল। এখানে কবি নাজমুল হক ও লতিফা হকের বাড়ি অবস্থিত। এখানে কোনো একটি গলিতে বাস করতেন কমরেড তোহা। সমাজবাদী কৃষক নেতা। এখানে একদা বাস করতেন আমার প্রিয় বন্ধু কবি সেবাব্রত চৌধুরী। একটি গলিতে বাস করতেন কবি জাহানারা আরজু।

একটি বাড়ির সামনে বসে আফতাব আমাকে নিয়ে নেমে পড়ল। ভেতরে বেশ কর্মচাঞ্চল্য দেখতে পেলাম। প্রেসে ছাপার কাজ চলছে। আমাকে নিয়ে নিচের তলায় একটি সুন্দর কামরায় আফতাব ঠেলে বসিয়ে দিল এবং দ্রুত একটি সম্পাদকীয় লেখার জন্য প্যাড এগিয়ে দিয়ে বলল, লিখুন। আমি বললাম, কী লিখব?

লিখুন যা খুশি। আপনি জানেন না কাল বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরবেন?

জানি!

তাহলে আর কী! বুঝে সমঝে ব্যালান্স করে লিখুন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা তো আপনার জানাই আছে। আমি কলমটা তুলে নিলাম। কাগজটা টেনে নিলাম। বললাম, এ পত্রিকার সম্পাদক কে?

আপনি।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বুঝলাম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমি আর কবিত্ব ফলাতে গেলাম না। পরিপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধাদের মতো বাস্তব আচরণ করতে হবে এটা বুঝতে পারলাম। শুধু একবার আমি আফতাবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাকে যে এখানে নিয়ে এসেছ এতে তোমাদের নেতাদের সম্মতি আছে কি-না।

আফতাব আমাকে নিশ্চিত করেছিল যে, এতে সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব, কাজী আরিফ, গোলাম আম্বিয়াসহ সবারই পূর্ণ সম্মতি আছে।

আজ বঙ্গবন্ধু আসছেন। এই শিরোনাম নিয়ে প্রকাশিত হয়ে গেল দৈনিক 'গণকণ্ঠ'র প্রথম সংখ্যা। সেই দিনগুলোর কথা যখন আজ স্মরণ করি তখন কারো অবস্থানকে আমার নিজেরসহ মানতে পারি না। অথচ আমরা কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এর জন্য কোনো অভিযোগ কি আছে? কোনো নালিশ, কোনো আক্ষেপ কিছুই নেই। তবে একজন মানুষ সম্বন্ধে আমি কিছু না লিখে গেলে এটা অকৃতজ্ঞ হবে। সেই মানুষ হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. আফতাব আহমদ। আমি গণকণ্ঠের পরিবেশে তাকে ভেতর-বাইরে সব দিক দিয়ে দেখেছি। দেখেছি তৎকালীন প্রগতিবাদী তরুণদের ভিড়ের মধ্যে অবিচল এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্রনেতা আফতাব আহমাদকে। নির্লোভ, আদর্শবাদী এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে।

এখানে আমি কোনো ব্যাপারে কারো প্রতি পক্ষপাতমূলক হৃদয়নাভূতি প্রকাশের জন্য এ রচনাটি লিখে যাচ্ছি না। শুধু একটি সত্য ও বাস্তবতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়ে কাহিনি বর্ণনা করছি। আমি তো আগেই বলেছি, এই সময়ে আমার দেখা মানুষের সততা, সভ্যতা, সখ্য পরবর্তীকালে অনেকেরই উল্টো দিকে প্রবাহিত হওয়ার কাহিনি বাংলাদেশে প্রকটিত আছে। আমি আফতাব আহমাদকে সৎ, সততা, বিপ্লবী এবং দৃঢ়চিত্তের মানুষ হিসেবে পেয়েছিলাম। আমি তো এ সাক্ষ্য না দিয়ে পারি না। পরে কে কী হয়েছেন এটা আমার আলোচ্য বিষয় নয়।

একবার রাজশাহীতে কোনো একটি আলোচনা সভায় ড. আফতাবের বক্তব্যে কোনো এক অধ্যাপক আপত্তি জানাতে উঠলে আমি বলেছিলাম, যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বক্তব্যে রাষ্ট্র বিব্রত হয় আমরা তার কথা শুনতে চাই।

আমার কথায় হল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ড. আফতাব এক অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলন বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে। ড. আফতাব আহমাদ গণকণ্ঠের সম্পাদনা এবং পরিকল্পনার জন্য ঘর থেকে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ কথা উল্লেখ করা জরুরি।

AMARBOI.COM

৩১

আফতাব আহমাদের সঙ্গে আরও দু'জন তরুণ গণকণ্ঠে আসা-যাওয়া করতেন। দু'জনই মুক্তিযোদ্ধা। একজনের নাম মধু, অন্যজন মোস্তফা জব্বার। মধুর সম্পূর্ণ নামটি আমি স্মরণ করতে পারছি না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অফিসে আমি তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। তখন সুনীল গাঙ্গুলি মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। মধুর সঙ্গে আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মধুকে মডেল করে তিনি এ উপন্যাসটি রচনা করবেন। এ কথাটা সুনীল গাঙ্গুলি আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু মধু ছিল সব ব্যাপারে উদাসীন। আমি যখন গণকণ্ঠ নিয়ে খুব বিব্রতকর অবস্থায় কাল কাটাচ্ছি, অনেক সন্তানহারা পিতা-মাতা ও স্বামীহারা বধূর আত্মঅভিযোগ নিজ হাতে লিখে নিচ্ছি এবং অফিসে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত কুদশিয়া বেগম কলির দ্বারা লিখিয়ে নিচ্ছি তখন কিংবা তার কিছু পর মধু দেশ ছেড়ে জার্মানিতে পাড়ি জমায়। আজও ফিরে আসেনি। তার মনে কী দুঃখ এবং বেদনা সৃষ্টি হয়েছিল যার জন্য যুদ্ধ শেষে মধু উদাসীন হয়ে দেশত্যাগ করেছিল এটা আমার জানা নেই। তবে তার অন্য সঙ্গী মোস্তফা জব্বার এখন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

কলিও এখন আর ঢাকায় থাকে না। কানাডায় সেটেল্ড। মাঝে মধ্যে ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, যারা ছিল নিঃস্বার্থ মুক্তিযোদ্ধা তাদের অনেকেরই ব্যক্তিজীবন পরবর্তীকালে উদাসনীতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যবসিত হয়েছে। তবে মধুর জন্য আমার মধ্যে খানিকটা আক্ষেপ আছে, খুব সুন্দর ঝকমকে স্মার্ট চেহারা ও বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা বলত মধু। ব্যক্তি জীবনে ছিল নির্লোভ। সুনীল গাঙ্গুলি ঠিক মুক্তিযোদ্ধাকেই তার উপন্যাসের মডেল করার জন্য বাছাই করেছিলেন। কিন্তু মধু তাকে সহযোগিতা করতে সম্মত ছিল না।

তাদের আমি আফতাব আহমাদের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলাম। গণকণ্ঠ এর মধ্যে অনেক জনপ্রিয় পত্রিকায় পরিণত হয়েছে। নজরুল হক বলে একজন সুপরিচিত সাংবাদিক গণকণ্ঠে নিউজ এডিটর হিসেবে যোগদান করেছিল। সংবাদ প্রকাশে তার মাত্রাজ্ঞান ছিল। কিন্তু আফতাবের তা ছিল না। দু'জনই নিউজ সেকশনে তর্কাতর্কি করে সময় অতিবাহিত করত।

অন্যদিকে জাসদের ঘোষিত আদর্শিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এ দেশের ক্ল্যাসিকাল কমিউনিস্ট পার্টিগুলো (প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য) কোনো সমর্থন পেল না। যতগুলো সমাজতান্ত্রিক দল এ দেশে প্রকাশ্যে কাজ করত তারা জাসদকে সন্দেহের চোখে দেখত। অথচ আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি কম পড়াশোনা থাকলেও জাসদের নেতারা এমনভাবে দেশে সমাজ বিপ্লবের জন্য সংগঠিত হয়েছিলেন যদি এ দেশে প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী দলগুলো তাদের সমর্থন দিত তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি সমাজ বিপ্লব সংঘঠিত হয়ে যেতে পারত। এর বেশি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ক্ল্যাসিকাল সমাজবাদী পার্টিগুলোর জাসদ সম্বন্ধে সতর্ক রক্ষণশীলতা তাদের আর স্বীকার করেনি। অথচ জাসদের ছিল ব্যাপক জনসমর্থন। কয়েক লাখ তরুণ বিপ্লবের জন্য আত্মদান করতে এক পায়ে খাড়া ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত আপোসমুখী ব্যর্থতার চোরাগলিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এই দোষ-ত্রুটি ও দায়িত্ব থেকে আমি আমার নিজেকেও আলাদা করতে পারি না।

গণকণ্ঠের একটি দিনও আমার আলস্য বা গালগল্প করে কাটেনি। অথচ আমাকে মাঝে মাঝে টেলিফোনে হুমকি দেওয়া হতো। প্রাণের ভয় দেখানো হতো। আমার একান্ত সহকারী কলিকে এসব হুমকির টেলিফোন ক্রমাগত হজম করে যেতে হতো। যুবতিটি এসব কথা আমাকে না বললেও তার আচরণে বুঝতে পারতাম আমি যতক্ষণ অফিসে থাকি ততক্ষণ সে ভয়ের মধ্যে কাল কাটায়। এক মুহূর্তও চোখের আড়ালে যেতে চায় না। তখন আমি যে গাড়িটি অফিসে আসা-যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতাম তার ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হয়েছিল সে যেন পথে কোথাও গাড়ি না থামিয়ে সোজা অফিসে অথবা বাসায় চলে আসে। কলি আমাকে বলত আমি যেন গাড়িতে মাথাটা নুয়ে থাকি। কারণ সে ভয় করত কেউ আমাকে মাথা লক্ষ করে গুলি করবে। এভাবেই আমার গণকণ্ঠে অল্প কয়েক মাসের বা এক-দেড়টি বছরের সম্পাদনার দায়িত্ব অতিবাহিত হয়েছে। আমি লিখতে চাইতাম কিন্তু মানুষের আত্মঅভিযোগ শুনতে শুনতে আমার সময় অতিবাহিত হয়ে যেত।

এ সময়ের একটি ঘটনা মনে পড়েছে, সমকালীন বিষয়ে লিখতে পারে এমন কবিদের আমি গণকণ্ঠে জড়ো করতে চেয়েছিলাম। আবিদ আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও কয়েকজন পরিচিত লেখককে গণকণ্ঠে এনেছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে সহযোগিতা করার চেয়ে অসহযোগিতা দেখিয়েছিল। এ সময়ের একটি কথা বলা দকার। আমি কলকাতায় কোনো একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গেলে আনন্দবাজারের সন্তোষ ঘোষ আমাকে ডেকে নিয়ে যান। আমি তার সামনে বসে আছি। তিনি হঠাৎ বললেন, আমি নাকি নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি।

আমি চমকে উঠলাম।

আমি জানতাম সন্তোষ বাবু অত্যন্ত কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আনন্দবাজার তার কারণে শনৈ শনৈ উন্নতির ধাপ পেরুচ্ছিল।

আমি তাকে বললাম, সন্তোষদা আমি একটি পত্রিকার সম্পাদক। সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা শেষ করে দেওয়ার একটা নির্ধারিত সময় আছে। তারা অফিসে কখন আসবে এবং লেখাটি শেষ করে দেবেন তা নিশ্চিত না হলে পত্রিকা মেইল ফেল করে। আপনি যার কথা বলছেন তার কোনো সময়জ্ঞান নেই। তিনি তো যখন খুশি তখন এসে লেখা শুরু করতে পারেন না। তার জন্য তো কাগজ মেইল ফেল করলে এর প্রতিকার আমাকে করতেই হয়।

আমার কথায় বুদ্ধিমান কড়া প্রশাসক অবস্থাটা বুঝে নিলেন। আর কোনো দিন তিনি গণকণ্ঠের ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

কবি আবিদ আজাদেরও এ ধরনের কবিসুলভ অফিস করার বাতিক ছিল। আমি এসব সহ্য করতে পারতাম না বলে তাদের অভিযোগেরও কোনো সীমা ছিল না।

হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে জীবনানন্দ কন্যা মঞ্জুশ্রী দাশ এসে আমার অফিসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন, তারা স্থির করেছেন, তারা মানে জীবনানন্দের পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীরা ঠিক করেছেন এ বছরের জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার আমাকে প্রদান করবেন। রণেশ দাশগুপ্ত অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি থাকবেন।

আমি এতে দারুণ খুশি হলাম।

মঞ্জুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো এবং আমি কবি জীবনানন্দ দাশের অনেক অজানা কাহিনি তার কাছে জ্ঞাত হয়েছিলাম।

এ পুরস্কারের পর আমি কলকাতায় গেলে অপর্ণা সেন আমাকে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং মঞ্জুশ্রী আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। যতটুকু মনে পড়ে অপর্ণা সেন আমার কণ্ঠে আমার কবিতা সোনালি কাবিন শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি পড়েছিলাম এবং গভীর মনোযোগসহকারে অপর্ণা সেন কবিতা বোঝার চেষ্টা করেছেন।

এছাড়া মঞ্জুশ্রী আরও অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এসব ঘটনা আমি কোনো ডায়েরিতে লিখে রাখিনি। আজ অকস্মাৎ এসব স্মৃতি মনে পড়ছে।

আমি জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতার উৎস সম্বন্ধে জানতে চাইতাম। কিন্তু মঞ্জু আমাকে কবিতার কথা না বলে বলত তার পিতার গদ্য রচনা সম্বন্ধে, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসগুলো সম্বন্ধে। এভাবে আমি কবি জীবনানন্দ দাশকে এক পরিশ্রমী কথাশিল্পী হিসেবে আবিষ্কার করেছিলাম এবং তার সব উপন্যাস সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। দেবাঞ্জলি মিত্র বলে এক কবিযুবতি আমাকে উপহারস্বরূপ জীবনানন্দের সব উপন্যাস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় দেবাঞ্জলি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আমার এককালের প্রিয় কবি দেবারতি মিত্রের কনিষ্ঠ ভগ্নি। তার এই পুস্তক উপহার দেওয়ার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। সে জন্য গভীর আক্ষেপ। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে পড়ছে, দেবারতি ঢাকায় এসে স্বামীসহ আমার অতিথি হয়েছিলেন। আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী তাদের আপ্যায়ন করেছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেবাঞ্জলি বলল, আমি চট্টগ্রাম কখনও যাইনি। আপনি কি আপনার কোনো পরিচিত ব্যক্তিকে বলবেন আমাদের এক-দু'দিনের জন্য আতিথ্য দিতে?

আমি বললাম, সম্ভবত ব্যবস্থা করা যাবে। বলে আমি আমার বন্ধু মুসা সাহেবকে টেলিফোনে এই দম্পতিকে দু-একদিনের জন্য থাকার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম। তিনি সে মতো ব্যবস্থা করে তাদের ১৫ দিন চট্টগ্রামে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। মুসার মিতু বলে একটি মেয়ে আছে। তাকে উদ্দেশ্য করে আমি অনেক ছড়া কবিতা লিখেছিলাম, যা আমার বইয়ে আছে।

দেবাঞ্জলি চট্টগ্রাম গিয়ে সেখানকার দর্শনীয় স্থান দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। যাওয়ার আগে দেবাঞ্জলি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি অভিযোগ করেছিলেন। বললেন, মাহমুদ ভাই শক্তিদা কবি হিসেবে অনেক বড়, সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ হিসেবে সংকীর্ণমনা। আমরা তাকে বই উপহার দিলে তিনি ছুড়ে ফেলে দিতেন। বলুন কোনো সিনিয়র কবির আচরণ এমন হওয়া উচিত? ঘটনাটি অকস্মাৎ উল্লেখ করলাম যে, ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে দেবাঞ্জলি হঠাৎ মারা যান। তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে বুঝতে পারি যে, সে দেবাঞ্জলিকে একদম ভুলে গেছে। একবারও তার কথা উল্লেখ করেনি। হতে পারে মনের গভীরে দেবাঞ্জলির জন্য তার গভীর শোক ও ভালোবাসা সংযুক্ত আছে। কিন্তু বাইরে এর কোনো প্রকাশ নেই। অথচ দেবাঞ্জলি ছিল প্রাণচঞ্চল, সুন্দরী, স্বামী অনুগতা একটি কিশোরীর মতো। আমি তাকে ভুলতে পারিনি। তার দিদি আমার বান্ধবী দেবারতির জন্যও আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। এরা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার নৈঃসঙ্গের দিনগুলোতে আমাকে আত্মীয়তা দিয়েছিল। এ কথা অকপটে উচ্চারণ না করলে আমার জীবন-ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৩২

এখানে একটি কথা হঠাৎ মনে পড়ায় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। আমি যখন গণকণ্ঠের সম্পাদক তখন নানা কাজে কিংবা সাহিত্য বিষয়ক কোনো আহ্বানে আমাকে ঘন ঘন কলকাতায় যেতে হতো। আমি থাকতাম কবিতা সিংহের বাড়িতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা আমাকে আতিথ্য দিতে খুবই আগ্রহী ছিল এবং রাজুর প্রতি আমার বিশেষ স্নেহসিক্ত আচরণের জন্য কবিতা এবং রাজুর পিতা আমাকে পেয়ে খুশি হয়ে উঠবেন। দেবারতি মিত্রের সাথে আমার বিশেষ মিত্রসুলভ বন্ধুত্ব থাকায় কবিতা আমাকে গেলেই একটি রেডিও প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে এবং ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ উদ্দেশ্যে দেবারতিকেও রাখত। আমার মনে হতো যে দেবারতির সাথে সাক্ষাৎ হোক একটা কবিতা চাইতেন। এ রকম অনেক প্রোগ্রামই আমরা দু'জনে একত্রে করেছি।

আরও একটি ঘটনা মনে পড়েছে, সেটা হলো বাংলাদেশের কবিদের আগমনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানে আমাকে ও দেবারতি মিত্রকে পাশাপাশি বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসে সহসা আমাদের দু'জনের মধ্যে বসে পড়ল। অনেকটা গোঁয়ারের মতো। এতে আমি ও দেবারতি উভয়েই বিরক্তিবোধ করলেও সুনীল গাঙ্গুলির আচরণ ছিল অভদ্রতাপূর্ণ।

সাধারণ কলকাতার লেখকরা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যা হোক দেবারতি মিত্র যিনি তার প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাঁধে' বইটি প্রকাশ করে নিজের বিশিষ্টতা প্রমাণ করেছিলেন। আমি কলকাতায় থাকার সময় সুযোগ পেলে দেবারতি মিত্র, বাড়ির সবাই বিশেষ করে দেবাঞ্জলি তার দিদির প্রতি আমার আগ্রহের বিষয়টি ঠিকমতো ধরতে পেরেছিল। বাড়ির সবাই আমি গেলে খুশি হয়ে উঠত। কিন্তু নানা ঘটনায় সুনীলসহ আরও দু'একজন দেবারতির সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে হয়তো ভালো চোখে দেখেননি। আমার এ ধারণায় ভুল থাকতে পারে। তবু বিষয়টি আমার জন্য উল্লেখের প্রয়োজন আছে। শেষ পর্যন্ত গণকণ্ঠ নিয়ে আমাকে এতটাই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় যে, আমি আর কলকাতার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব রেখে চলতে পারিনি। হয়তো এই সময়ের ভেতরে দেবারতি মিত্রের সাথে আমার আর মুখোমুখি হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। আমার ওপর জেল-জুলুম নানাবিধ আপতিক ঘটনা আমাকে দুমড়েমুচড়ে দেয়। সেসব কথা আমি যথাসময়ে যথাস্থানে উল্লেখ করতে চাই। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যাপারে এ দেশে একটি কথা চালু আছে যে, তিনি আকাশের মতো উদার। কেউ কেউ তাকে 'সুনীল আকাশ' বলে থাকেন। আমি অবশ্য তার অনেক সাহচার্য সাহায্য পেয়েছি। তা অকপটে স্বীকার করি। কিন্তু তাকে ভেতর থেকে যতটা গভীরভাবে জানতে পেরেছি তাতে আমার মনে হয়েছে তার চরিত্রে সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতা বাসা বেঁধে আছে। যেহেতু আমি এক বাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরে কোনো বাংলাদেশ আছে এটাই আমি অবিশ্বাসী সে কারণে হয়তো বা আমি তার আকাশের মতো চরিত্র উপভোগ করতে পারিনি। শেষের দিকে এসে তিনি শামসুর রাহমানকে সমর্থন দিতে থাকেন। এটাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যরূপে আমার কাছ দৃশ্যমান হয়েছে। আমি অবশ্য তার উদ্দেশ্যটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম এবং অকপটে তা আমার রচনায় উল্লেখ করেছি। বর্তমানে কলকাতার লেখকদের মধ্যে এক গভীর হতাশা নিয়ে এসেছে। এর কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই হতে পারে যে, তারা সব সময় আশা করে এসেছে দুই বাংলা এক সময় এক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তারা বুঝতে পেরেছেন সেটা হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বাংলা প্রায় উচ্ছেদ হয়ে গেছে।

কলকাতার নামি লেখকরা স্কুলে অন্তত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পড়ানোর আন্দোলনে রত আছে। এতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা আমরা আন্দাজ করতে পারি। তাছাড়া দুই বাংলা এক হবে কিসের ভিত্তিতে? ভাষাগত ভিত্তি ভেঙে পড়েছে। বাংলাভাষার চর্চা ও সম্ভাবনা সবটুকুই এখন ঢাকার করতলগত। ফেব্রুয়ারি মাসে এই মেলা উপলক্ষে দলে দলে যেসব কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের আগমন ঘটে থাকে তাদের প্রতি আমার সহানভূতির অন্ত নেই। তারা নিজের দেশের হিন্দি ও ইংরেজির বাস্তব প্রভাব ও পরাক্রমকে মেনে নিয়েছেন। এটা হলো ঐতিহাসিক সত্য। ভাষাগত স্বার্থ যেহেতু দুই বাংলাকে আর এক করার যৌক্তিকতাকে নষ্ট করে ফেলেছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কাছে আমাদের অর্থনৈতিক স্বার্থও আর অবশিষ্ট নেই। বাংলাদেশের চাষি মুসলমানরা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তুলেছে এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অভারতীয়। সে দিল্লিকে সমীহ করে চলার কোনো বাস্তব কারণ দেখতে পাই না। এখানে উল্লেখ যে, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কখনও ভাবি না যে, দুই বাংলা এক হওয়ার কোনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্বোপরি ভাষাগত কোনো যুক্তি আছে। আবেগে ইতিহাস চলে না। বাংলাদেশের জনগণ মূলত একটি স্বতন্ত্র অভাবনীয় জাতিসত্তার উদ্‌গাতা। তারা কলকাতা নিয়ে বহুদিন ধরে আর মাথায় ঘামায় না। ঐক্যবোধ করে না। আত্মীয়তা বোধ করে না। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের প্রদর্শিত রাখার যে সাম্প্রদায়িক কলাকৌশল সেখানে দেশ বিভাগের পর থেকে এতদিন প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে তারা প্রায় উচ্ছন্নে গেছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গে একটি বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। তবুও একটা সত্য আমি উচ্চারণ করতে চাই। সেটা হলো মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিরা যে উদার চিত্তে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও নিরাশ্রয় মানুষদের নিজেদের করে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিল তার কোনো দৃষ্টান্ত এই উপমহাদেশের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের উদ্ভবের পর তারা বাংলাদেশকে আর আপন করে দেখার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। আর আমাদেরও তো তাদের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। কেন থাকবে? একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র কোন যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের ভাষাগত আত্মীয়তার কথা ভেবে পেছন ফিরে তাকাবে! এ জন্যই আমি বলেছি যে, আবেগে ইতিহাস চলে না। তাছাড়া এর মধ্যেই বাংলাদেশের বাংলাভাষার যে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং করছে তাতে এ কথা এখন স্পষ্ট করে বলা যায়। এখানে এক স্বতন্ত্র বাংলাভাষার উদ্ভব হয়েছে। যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষার মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আর এর জন্য দায়ী পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিরা এবং লেখকগোষ্ঠীর মানসিক সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো বা দেবারতির সাথে আমার সম্পর্কের পেছনে কোনো সত্যিকারের হৃদয়ানুভূতি ও কবিসুলভ সহানুভূতির কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সুনীল গাঙ্গুলির মতো লোকেরা সেটা ভালো চোখে দেখেননি। চাননি। আর আমি কেন বা গায়ে পড়ে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সারাজীবনের দুর্ভাগ্য ও দুর্গতির কথা বিস্তৃত হব। এই রচনা বড়ই এলোমেলোভাবে শুরু করা হয়েছে। অনেক চরিত্রের সম্পূর্ণ নামও আমি উচ্চারণ করতে পারিনি। যেমন মধুর কথা বলেছি। যখন তার কথা লিখেছি তখন তার নাম পুরো মনে পড়েনি। এখন মনে পড়েছে। তার নাম ছিল রায়হান ফেরদৌস মধু। এদের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল আফতাব আহমাদের মাধ্যমে। গণকণ্ঠ যখন একটা সুসম্পাদিত রেডিক্যাল পত্রিকা হিসেবে দেশবাসী সবার আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে গণকণ্ঠের বিরুদ্ধাচারী কয়েকজন যুবক আফতাবকে ইউনিভার্সিটি এলাকা থেকে অপহরণ করে কোথাও নিয়ে আটকে রাখল।

খবরটা পাওয়া মাত্র তা আমি আ স ম আবদুর রবকে বলে এর প্রতিকার করতে বলি এবং দ্রুত করতে বলি। আমার কথায় রব সাহেব টেলিফোন তুলে ঢাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কাউকে গুরুগম্ভীর ভাষায় বললেন, যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আফতাবকে ছেড়ে দেওয়া না হয় তাহলে এর দায়-দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে। এই হুমকিতে কাজ হলো। এর কয়েক ঘণ্টা পরই আফতাব মুক্তি পেয়ে অফিসে ফিরে এলো। ঘটনাটি এখন আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার স্মৃতির মধ্যে নেই। শুধু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করলাম। এতে বোঝা যাবে যে, কী অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা গণকণ্ঠ প্রকাশ করে চলছিলাম। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে গুপ্তঘাতকদের হাতে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক হার মানা আমার স্বভাবের মধ্যে স্থান করে নিতে পারেনি। এসব ঘটনাবলির তরঙ্গে আমি লুটোপুটি খেতে খেতে এগিয়ে চলছিলাম। অবস্থাটা জীবনানন্দ দাশের হাঙ্গরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়ার মতো অবস্থা। কিন্তু একটা বিষয়, আমাকে মনে হতো দৈব সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কবিতা লিখতে পারছিলাম। আর তা হয়ে উঠছিল অত্যন্ত নির্ভুল সময়ের সাক্ষীর মতো। যা পারছিলাম না তা হলো নিজের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার কোনো খোঁজখবরই রাখতে পারতাম না। কেবল আমার স্ত্রী একাই এ ব্যাপারে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনুযোগ উঠেছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে রক্ষা করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন শিক্ষকের মেয়ে। সে কারণে তাকে কী করতে হবে তিনি নিজেই ঠিক করতে পারতেন। পরিবারের সাথে আহার-নিদ্রা ছাড়া আমার কোনো সম্পর্কই রইল না। সন্ধ্যার পর টেলিফোনে টেলিফোনে ঘরে বাইরে কোথাও স্বস্তি ছিল না। অন্যদিকে অভদ্রের মতো রিসিভার নামিয়ে রাখার কথাও আমরা চিন্তা করতে পারতাম না। ধীরে ধীরে ছাত্রলীগের সম্মেলনের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। এর সম্পূর্ণ বিবরণ আমার পক্ষে হয়তো এখন আর দেওয়া সম্ভব হবে না। তবুও যতটুকু এখন আমি মনে করতে পারি তা পরের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করতে চেষ্টা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্রলীগের সম্মেলনের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। সম্ভবত এটা ছিল ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সম্মেলন। গণকণ্ঠে যেসব ছাত্রলীগ নেতা এ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন তারা আশা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সম্মেলনে উপস্থিত হবেন। কিন্তু তিনি আ স ম রবদের ওই সম্মেলনে না এসে তার আত্মীয়-স্বজনের আয়োজিত ছাত্রলীগের ওই সম্মেলনে উপস্থিত হলেন। অন্যদিকে আমাকে দিয়ে গণকণ্ঠ সমর্থিত ছাত্রলীগের সম্মেলনকে উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হলো। আমি নিরূপায় ছিলাম। আমি সম্মেলনে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলাম তার আগাগোড়া ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে গেল। গণকণ্ঠ সমর্থিত ছাত্রলীগের নাম হলো জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল)। কিন্তু আমি চিরশত্রুতার পরিবেশে একদল ছাত্রের আরও বৈরীতে পরিণত হলাম। ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে আমি সময়ের স্রোতের সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম। যদিও বুঝতে পারছিলাম, আমার ভাগ্য বিপর্যয় অত্যাসন্ন কিন্তু কিছু করার ছিল না। অন্যদিকে গণকণ্ঠ এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যা ছিল গণমানুষের আস্থার আকর সংবাদপত্র। বিষয়টি খুব ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করলেও আমি আমার দুর্ভাগ্যের জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলাম। এর মধ্যে জাসদ বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। তারা কথা নেই বার্তা নেই একদিন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করতে গিয়ে পাল্টা ব্যবস্থা অর্থাৎ গোলাগুলির মুখে পড়ে পর্যুদস্ত হলো। সে রাতেই আমাকে গ্রেফতার করা হলো। রমনা থানার হাজতে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে পুলিশ কর্মকর্তারা চলে গেলেন।

সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হয় ফটোগ্রাফার নাসির আলী মামুনের। আমাকে হাজতে দেখে সে খুবই খুশি হয়েছিল মনে হয়। সে জানাল, তাকে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাড়ির সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। সে তার ক্যামেরাটি হারিয়েছে। পরের দিন সকালে আমাদের হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে এবং গাড়িতে করে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। দেখলাম সেখানে অনেকেই আছেন যারা আমাকে ভালো করে চেনেন কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার বিপক্ষে। তারা তাদের খাবার থেকে আমাকে খাওয়াতে লাগলেন। কারণ জেলখানার স্বাভাবিক খাদ্য আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আলবদর, রাজাকার হিসেবে যাদের আটক রাখা হয়েছে তারা আমার জন্য নিজেরা না খেয়ে তাদের উপাদেয় খাবার নিয়ে আমার সামনে বসল এবং আমাকে নানাভাবে সাহায্য করতে লাগল।

ভেলোর রাউন্ডে এসে সহজেই আমার অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে অন্য একটি হাজতখানায় যেখানে জাসদের ছেলেদের রাখা হয়েছিল সেখানে পাঠিয়ে দিল। এখানে এসে আমি যাদের পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে ছিলেন মশিউর রহমান যাদু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিয়া, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, শ্রমিক নেতা লিয়াকত আলী, মেজর জয়নাল আবেদিন, অলি আহাদ এবং কমরেড খালেকুজ্জামান প্রমুখ বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তি। কারাধ্যক্ষের নাম ছিল শামসুর রহমান। তিনি আমার সঙ্গে মোটামুটি ভালো ব্যবহার করেছিলেন। মনে পড়ছে যে, এখানে আমি দাউদ হায়দারের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কিংবা আমি ওখানে থাকার সময় নির্জন কোনো সেল থেকে তাকে এখানে এনে রাখা হয়েছিল।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। মশিউর রহমান যাদু মিয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহসিন ছিলেন আমার এককালের বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি কবি ছিলেন এবং 'কবিতা ও শোরুম' বলে তার একটি কবিতার বই ছিল। তার আকর্ষণে আমি মাঝে মধ্যে রংপুরে তাদের সেই বিশাল জমিদার বাড়িতে যেতাম। সহসা মহসিন যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আমি যে মহসিনের বন্ধু এটা যাদু ভাই জানতেন। তিনি আমাকে জেলখানায় সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিলেন। আমার কারাজীবন সহনীয় করে তোলার জন্য তিনি মাঝে মধ্যে অপূর্ব সব রান্নার ব্যবস্থা করে আমাকে খাওয়াতে লাগলেন। এভাবে মাস কয়েক পার হয়ে গেলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আমার মুক্তির জন্য বিশ্বব্যাপী একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এভাবে আমার নাম সম্ভবত সারা বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অ্যামনেস্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত যে মহিলা আমার জন্য বিশ্বব্যাপী একটি মুক্তির আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম এখন মনে পড়ছে না। তবে তার চাপে শেখ সাহেব বিব্রত বোধ করেছিলেন এটা আমাকে জানানো হয়েছিল। কয়েকদিন কিছুই লেখালেখি করতে পারিনি। কিন্তু অকস্মাৎ কারাগারের স্বল্প আলোয় রাত দশটা-সাড়ে দশটার দিকে আমি 'চক্রবর্তী রাজার অট্টহাসি' লিখে ফেলি। কবিতাটির নতুন আঙ্গিক-কলাকৌশলে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। পরের দিন কবিতাটি আমি যাদু ভাইকে পড়ে শুনাই। তিনি অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং বলেন, ভালো হয়েছে, তোমার কাজ তুমি চালিয়ে যাও। আমরা তো এখান থেকে কিছু নিয়ে বেরোতে পারব না। কিন্তু তুমি যদি এ ধরনের কিছু কবিতা নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারো সেটা হবে তোমার জন্য পরম সার্থকতা। উৎসাহ পেয়ে আমি 'মায়াবী পর্দা দুলে উঠো' বলে এক দীর্ঘ কবিতায় হাত দিই। এখানে অকপটে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো, ওই কবিতাটি লিখতে গিয়ে আমি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সাহায্য নিয়েছিলাম। কারণ আদালতকে কীভাবে সম্মান করে কথা বলতে হয় সেটা আমার জানা ছিল না। এ ব্যাপারে মওদুদ আহমদ আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি অবশ্য সভা-সমিতিতে আজও আমার দেখা পেলে দর্শকদের উদ্দেশে সেই স্মৃতির কথা উল্লেখ করেন। আমি তার অসাধারণ বাকপটুতার এবং বন্ধুত্বের প্রশংসা করি। এভাবে আরও দু'য়েক মাস পার হয়ে যায়। তখন আমার মুক্তির আন্দোলন জাসদের একমাত্র দাবি হয়ে উঠেছিল বলে জেলখানা থেকে জানতে পেরেছি। এখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। একদিন কারাধ্যক্ষের রুমে আমার ডাক পড়ল। বুঝলাম কেউ আমার সাক্ষাতে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সেখানে গিয়ে দেখি কবি শামসুর রাহমান আমাকে দেখতে এসেছেন। আমরা অনেকক্ষণ হাতে হাত ধরে বসেছিলাম। তিনি আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলায় আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছিল। কবি শামসুর রাহমান আমাকে জেলখানায় দেখতে যাওয়ার ঘটনায় আমি কখনও বিস্মৃত হইনি। এর আগেও হয়তো এ ঘটনা আমি উল্লেখ করেছি। আমার মুক্তির জন্য দেশব্যাপী যে আন্দোলন ও ব্যাকুলতা শুরু হয়েছিল আমি জেল থেকে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। অন্যদিকে জেলের বাইরে চলছিল দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা। অনেকে বলেন, সেটা ১৩৫০ সালের সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মতোই ছিল। যেই বিষয়ে ছবি এঁকে শিল্পী জয়নুল আবেদিন সারাবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ক্ষমতাসীনদের অপরিসীম ব্যর্থতার ফলে যে দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশকে শুকিয়ে মেরেছিল এর বিশ্লেষণ করে থিসিস লিখে অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার পেলেন। এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। অমর্ত্য সেনের প্রথম স্ত্রী নবনীতা দেব সেন আমার বান্ধবী। তিনি নরেন দেবের মেয়ে, যিনি ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করেছিলেন। কলকাতার হিন্দুস্তান পার্কের জ্যোতি বসুর বাড়ির পাশের বাড়িটির নাম 'ভালোবাসা'। ওই বাড়িটি নবনীতাদের বাড়ি। ওই বাড়িতে আমি একদিন অতিথি ছিলাম। ভূপালের একটি কবি সম্মেলন থেকে ফেরার সময় নবনীতা আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তার মাকে অর্থাৎ নরেন দেবের বিধবা স্ত্রীকে ওমর খৈয়ামের অনুবাদ পাঠ করে হতবাক করে দিয়েছিলাম। তার চোখ অশ্রুসজল হয়েছিল।

এসব স্মৃতি দ্রুত ধাবমান চালচিত্র হিসেবে আমাকে আজও অহরহ তাড়িয়ে বেড়ায়। সব কথা তো আর লিখে রাখতে কবিরা সমর্থ হন না। আমিও পারি না। জেলখানা খুব খারাপ জায়গা। মানুষের আত্মা সেখানে শুকিয়ে যায়। জীবনের একটি বছর ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে রেখে এসেছি। এর চেয়ে কষ্টের জীবন আমি কখনও কাটাইনি। আমার মুক্তির জন্য যারা তখন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে সাংবাদিক নেতা গিয়াস কামাল চৌধুরীর প্রয়াসকে ধন্যবাদ জানাই। তার অবিরাম চেষ্টার ফলেই আমি ঠিক এক বছর কারাগারে কাটিয়ে মুক্তি পেয়েছিলাম। অকারণে সৃজনশীল মানুষকে জেল খাটানোর একটা অভিশাপ আছে। আছে এক ধরনের দীর্ঘশ্বাস। তা আমি নিজের মধ্যে ধারণ করেছি।

তবে জেলখানা আমাকে একেবারেই কিছু দেয়নি এটা আমি বলতে পারব না। আমি জেলখানায় থাকাকালে ধর্মগ্রন্থগুলোর একটা তুলনামূলক পাঠ দেওয়ার সুযোগ পাই এবং চরম নাস্তিকতার দিক থেকে আস্তিকতার দিকে ফিরে আসার অবকাশ সৃষ্টি হয়। আমার ধর্ম করার প্রবণতা কারো কোনো প্রবঞ্চনার ফল নয়। পেট্রো-ডলারের মাজেজাও নয়। আমার নিজেরই গবেষণার অধ্যয়নের সুফল হলো আমার বিশ্বাস, আমার ঈমান। এ নিয়েই আমি ১৯৭৫-এ জেল থেকে বেরিয়ে আসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলখানায় বসেই বেশ দীর্ঘ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ল, চড়ুই পাখিরা দেয়াল পেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে কত অনায়াসে। এটি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। হয়তো আমার কোনো কবিতায় লিখেও ফেলেছি যে, জীবনে প্রথম চড়ুই পাখির সৌভাগ্যে আমি কাতর। জেলে থাকতে জানতাম, এ কেন্দ্রীয় কারাগারেই আমার পরিচিত আ স ম আবদুর রব, মেজর জলিল, আরও কয়েকজন জাসদ নেতা ভেতরেই আছেন। তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আমার ভারী ব্যাকুলতা ছিল। কিন্তু দেখা হতো না। একদিন শুনলাম, এদের কেউ কেউ জেলখানার হাসপাতালে আছেন। একবার এক ছুঁতোয় অসুখের ভান করে আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময় রাস্তায় মেজর জলিলের সঙ্গে আকস্মিক দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখে তিনি আফসোস করতে লাগলেন। বললেন, আমরা এখান থেকে যখন বেরোব তখন কিছু না কিছু হয়ে বের হব। কিন্তু আপনার জন্য আফসোস, বলে তিনি আমার হাত চেপে ধরেছিলেন। আমি বললাম, আমি তো কিছু হওয়ার জন্য আগেও চেষ্টা করিনি। জেলের ভেতরে এসেও করছি না। জানবেন, আমি শুরু থেকে যা ছিলাম জেল সেটিই আমাকে বানিয়ে ছাড়বে। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

নিজের সেলে ফিরে এসে ঘরে ঢুকতে যাব, দেখি শ্রমিক নেতা লিয়াকত সাহেব হাতের ইশারায় তার কাছে যেতে বলছেন। আমি তার কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, আপনাকে একটি কথা বলব বলব করে বলতে পারছি না, মনে কষ্ট পাবেন বলে।

আমি বললাম, আমি কোনো কিছুতেই কষ্ট পাই না লিডার। আপনার যদি কোনো কিছু বলার থাকে বলুন।

লিয়াকত সাহেব হাসলেন। আপনার ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনায় গণকণ্ঠের কলকাঠি নাড়ানোওয়ালারা বড় আতঙ্কে আছন। তারা ঠিক করেছেন, জেল খেটে আপনি সারাদেশে যে ইমেজ তৈরি করেছেন তা তাদের অনেকেরই নেই, থাকবে না। এ অবস্থায় আপনি বের হতে পারলেও তারা আর গণকণ্ঠ আপনাকে ফেরত দেবে না। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা একটি উইকলি বের করে আপনার হাতে দেবে।

এ কথায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। হা করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমি জানি, লিয়াকত কোনো ভুল সংবাদ দেবেন না। একটি মিথ্যা সংবাদ পেয়ে লিয়াকত তা কমিউনেকেট করেছেন তা আমি দেখিনি।

তিনি বললেন, আপনি বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি নিয়ে বের হবেন। জাসদের কোনো নেতাই আপনার মতো ইমেজ তৈরি করতে পারেনি। ফলে গণকণ্ঠ আপনার হাতে দেবে না।

এ কথায় আমার সহসা মনে হলো তাহলে এক বছর জেল খাটলাম কিসের জন্য?

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে আছি দেখে লিয়াকত সান্ত্বনার সুরে বললেন, দেখনু কবি সাহেব, আমার পরামর্শ যদি মনে করেন আপনার কোনো কাজে লাগবে, তাহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি যে কোনো মূল্যে জেল থেকে বেরিয়ে যান। আমি জানি, কোর্টে আপনার মামলাটি রায়ের অপেক্ষায় আছে এবং আমি নিশ্চিত, আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন। সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারি আপনার কী হয়?

আমি নিচু স্বরে বললাম, তিনি আমার ভগ্নিপতি।

সম্ভবত তিনিও আপনার ব্যাপারে শেখ সাহেবকে নমনীয় করে তুলেছেন। আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন।

আমি বললাম, সেটি কীভাবে হয়? আমার ওই ভগ্নিপতিই তো আমার পরিবারের এমনকি আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত জেলখানায় সাক্ষাতে অনাগ্রহী, গড়িমসি করেন।

লিয়াকত হোসেন বলেন, আরে কবি, আপনি একটি জিনিস বোঝেন না কেন, আপনি রাজনৈতিক ব্যক্তি নন। দেশের মানুষ আপনাকে ভালোবাসে। আপনার জন্য দেয়াল লিখনে ভরে গেছে। এ অবস্থায় আমার পরামর্শ হলো, যে কোনোভাবে বেরিয়ে যান। জাসদ আপনার ইমেজ হজম করতে পারবে না এবং আপনাকে সমূর্তিতে সেখানে আমার প্রবেশ করতেও দেওয়া হবে না। আমি কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি বেরিয়ে যাব।

পরের দিনই সকালবেলা আমার সঙ্গে গিয়াস কামাল চৌধুরী দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, এ সপ্তাহেই আমার ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, গণকণ্ঠ সম্ভবত সরকার বন্ধ করে দেবে। আপনি বেরিয়ে কোথায় যাবেন?

আমি বললাম, কেন ঘরে ফিরব!

গিয়াস কামাল বললেন, আরে মিয়া, আমার বেয়াই সাহেব আপনার আবার ঘর কোথায়? আপনি তো ঘরবাড়ি থেকে অনেক উঁচু হয়ে গেছেন। না, আমি এ জন্যই বললাম যে, বেরিয়ে কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে চলে যাবেন। কবিতা লিখবেন। না হলে সবাই মিলে আপনাকে খেতে, ঘুমোতে দেবে না।

আমি অবস্থাটি আন্দাজ করলাম। হেসে বললাম, পেশা ছাড়তে চাই না।

কিন্তু সরকার তো আপনাকে ওইটাই ছাড়াতে চায়, বলেই গিয়াস কামাল উঠে গেলেন।

আমার ফিরে যাওয়ার সময় হলো, আমার কোনো ওজন নেই। যেন হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছি। গণকণ্ঠে ফিরতে পারব না। আমার কোনো পেশা নেই। প্রথমে মনে প্রশ্ন জাগল, তাহলে কী করে বাঁচব? আমার সেলে বারান্দার নিচে সেদিন অনেক বিচিত্র বর্ণের ডালিয়া ফুল ফুটেছিল দেখতে পেলাম। আমি হালকা মেজাজ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই দেখি, যাদু ভাই, মশিউর রহমান যাদু মিয়া। কেন যেন মনে হলো, জেল জীবনকে সহনীয় করার জন্য এ নেতা আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন। প্রতি বেলা খাওয়ার সময় পাশে বসে খাইয়েছেন। কী মনে করে আমি সেদিন যাদু ভাইকে কদমবুসি করলাম। তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। আরে কবি, কোনো সুখবর আছে নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না যাদু ভাই, অনেক দুঃসংবাদ শুনলাম তো। এ জন্য আমার ওজন কমে যাচ্ছে। আমি ওজন হারিয়ে ফেলছি।

আচ্ছা দেখো তো, মুজিব তোমাকে কেন আটকে রেখেছে? এমন একজন কবিকে কেউ জেল খাটায়? প্রায় একটি বছর তো পার হয়ে গেল।

আমি হেসে বললাম, যাদু ভাই, আপনার জন্য আমার জেল জীবন কতটা সহনীয় হয়েছে সেটি তো আপনি জানেন না। তাছাড়া আমি জগতের সব ধর্মগ্রন্থ এ জেলখানায় বসে পড়ে ফেলেছি যাদু ভাই। আমাকে এখন আপনি ধর্ম সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত বলতে পারেন।

যাদু ভাই হেসে বললেন, আমি জানি তুমি কয়েক দিনের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাবে। বেরিয়ে গিয়ে যেখানেই থাকো, আমি যদি বাড়ি ফিরে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাই একবার এসো।

আমি বললাম, বলেন কী, আপনি ইশারা করলেই আমি যাব। জেলে বসে ভাবীর হাতে এত রান্না খেলাম, ভাবীকে এক নজর দেখব না!

যাদু ভাই হেসে বললেন, আরে তুমি তো জানো না তোমার ভাবী জেলে সাইবেরিয়ান রোস্ট পাঠাতে পারেননি। তুমি গেলে তোমাকে একান্তে বসে খাওয়াব।

আমি জীবনে বহু মানুষের হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে নিজের জীবনকে সার্থক মনে করেছি। এর মধ্যে সবচেয়ে মহৎ চরিত্রের মানুষ পেয়েছি সেই রংপুরের জমিদার পরিবারের মশিউর রমহান যাদু মিয়াকে। তাকে সবাই কঠোর মনের মানুষ মনে করত। কিন্তু আমি পেয়েছিলাম একজন সহৃদয়বান স্নেহসিক্ত মানুষ হিসেবে। যেহেতু আমি এসব কথা আর কোথাও লিখতে পারিনি, সে কারণে আমার জীবন বৃত্তান্তের এ অংশে লিখে রেখে গেলাম।

ওই সপ্তাহে একদিন বেলা ৩টার সময় জেলগেট থেকে একজন দাড়িওয়ালা পুলিশ এসে বারান্দায় দাঁড়াল। আমার দিকে হেসে বললেন, গোছগাছ করে নিন। আপনি খালাস।

দেখলাম, তার হাতে একটি চিরকুট আছে। ওই দিকে তাকিয়ে বললেন ২০ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি করুন। বারান্দায় সবাই হৈচৈ করে উঠল। এমনকি মশিউর ভাই পর্যন্ত। কিন্তু অলি আহাদ নিশ্চুপ ছিলেন। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি জানতাম, তখন তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করছিলেন। জেল সংক্রান্ত গ্রন্থ। আমি আশা করছিলাম ওই গ্রন্থে কোথাও না কোথাও আমার নাম থাকবে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম, ওই গ্রন্থে আমরা উল্লিখিত হইনি।

মুক্তির বার্তা পেয়ে আমি জেলারের রুমে গিয়ে হাজির হলাম। সঙ্গে ছোট সুটকেসটি আছে। জেলার আমাকে খুবই সম্মান দেখালেন। বললেন, যান। দেখবেন যেন এখানে আর আসতে না হয়।

আমি কিছু না বলে জেলারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমাকে কেউ নিতে এসেছে কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে আসবে? এটি হলো আকস্মিক সিদ্ধান্ত এবং আজই আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে।

আমি বললাম, অন্য কেউ তো আসবে না। তবে আমার স্ত্রী-পুত্ররা তো আসবে?

না তাদেরও জানানো হয়নি। আপনি বের হয়ে একটি জিপে উঠবেন। গোয়েন্দা বাহিনীর লোক আপনাকে বাসায় রেখে আসবে।

আমি নিশ্চিত হলাম, আমাকে অন্তত একা হেঁটে বাসায় যেতে হবে না।

গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা সঙ্গে একটি জিপে এসে আমি খিলগাঁও বাগিচায় আমার বাসার সামনে এসে নামলাম। তারা আমাকে বারান্দায় তুলে দিয়ে চলে গেল। দরজা খোলাই ছিল। দরজায় দাঁড়ানো ছিল আমার স্ত্রী সৈয়দা নাদিরা বেগম। সে বিস্ময়ে হতবাক।

আমি বললাম, বারান্দায় একটি ছোট বালতি দিয়ে পানি দাও। অজু করব।

সে দ্রুত একটি বালতিতে করে পানি এনে দিল। আমি সুটকেসটি খাটে রেখে বারান্দায় ভালো করে অজু করে নিলাম। বৈঠকখানায় প্রায় আসরের শেষ বেলায় আসরের নামাজ আদায় করলাম। ততক্ষণে আমার ছেলেমেয়েরা যে যেখানে ছিল ছুটে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি মনে করেছিলাম, এ এক বছর আর্থিক কষ্টে আমার স্ত্রী হয়তো ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু আমার স্ত্রীর মুখে শুনলাম, আমার বড় ছেলের লেখাপড়ায় কিছু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সেই সংসার চালাচ্ছে। বাকিরা বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে। আমি আমার স্ত্রীর দৃঢ়চেতা মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রতি আমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আমার স্ত্রী শিক্ষকের মেয়ে। আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করে বিয়ে করেছে। আমি ছেলেমেয়েদের সামনে আমার স্ত্রীকে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেললাম।

আবার শুরু হলো ঢাকার মুক্ত পরিবেশে একজন কবির স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

৩৫

এ সময় আমার খুব একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। সেটা হলো দূরে কোথাও অজ্ঞাতবাসে চলে যাওয়া। ভাবতাম নেপালে চলে যাই। কিন্তু আমার আর্থিক সামর্থ্য তেমন ছিল না বলে আমি ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ঘরেই বসে থাকলাম। এর মধ্যে সরকার গণকণ্ঠ বন্ধ করে দিয়েছে। আগেও উল্লেখ করেছি যে, আমি আর গণকণ্ঠের পক্ষ থেকে কিছুই আশা করতাম না। আশাভঙ্গের বেদনা নিয়েই আমি কারাগার থেকে নিজের ঘরে ফিরেছিলাম। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তার সান্নিধ্যে হাজির হয়েছিলাম। যার সঙ্গে গিয়েছিলাম আমি তার নাম উল্লেখ করতে চাই না। কারণ এতে তিনি বিব্রত হতে পারেন।

বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমার চোখের অবস্থা কেমন। এতে আমি বুঝতে পারলাম আমার জেল জীবনের অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁটিনাটি অসুবিধার দিকগুলো তার অজানা ছিল না। তিনি সহসা আমার পকেটে তিন হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, আগে পরিবারটা ঠিক কর। আর আমি ইউসুফ আলীকে বলে দিয়েছি। তুই শিল্পকলা একাডেমিতে জয়েন করবি। তোর শিক্ষাগত বিষয়টি ওয়েভ করে আমি তোকে সেখানে পাঠাচ্ছি।

আমি হাতজোড় করে বললাম, আমাকে আমার পেশায় রাখলে হয়তো ভালো হতো।

তিনি এতে অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, আমি যা বলি তাই কর। তার মুখের ওপর কথা বলার আমার এমনিতেও অভ্যাস ছিল না।

যা হোক আমি শিল্পকলা একাডেমিতে জয়েন করতে এসে দেখলাম তিনি একটি টাকার অঙ্ক উল্লেখ করে আমাকে তার সমতুল্য পদে স্থাপন করতে নিজ হাতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার হাতের লেখা ফাইলটি এখনও হয়তো শিল্পকলা একাডেমির কোথাও থেকে থাকবে। তখন শিল্পকলার পরিচালক ছিলেন মুস্তফা নূর উল ইসলাম। তিনি ইচ্ছা করলে ওই টাকার সমান মর্যাদায় আমাকে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তা না করে আমাকে শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহ-পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো, পরে অবশ্য আমি আমার কর্মক্ষমতায় এবং অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আরও দুটি ধাপ অতিক্রম করেছিলাম। প্রথমে ডেপুটি ডিরেক্টর। পরে ওই বিভাগের পরিচালক হিসেবে আমি অবসর গ্রহণ করলাম।

আমি শিল্পকলা একাডেমিতে কর্মরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হৃদয়বিদারক জীবনাবসান ঘটে গেল। আমাদের ঘরে, পরিবারে এতে এক ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হয়। আমার ছেলেমেয়ে, বউ-বাচ্চা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমরা তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমরা একেবারে ভিক্ষুকে পরিণত হয়ে গেছি। একেবারে কিছুই ছিল না আমাদের। কেউ কোনো দিন জিজ্ঞেসও করেনি যে আমরা কেমন আছি! আমার হৃদয়টা হাহাকারে ভরে গিয়েছিল। সব সময় মনে হতো কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্তু কোথায় পালাব?

'স্টেনগান কাঁধে নিয়ে হেঁটে যায় ১৯৭৩ সাল।' কিছুই আর মেলাতে পারছিলাম না। শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা বিভাগে মাথা নুয়ে বসে থাকতাম। ভাবতাম এমন কিছু করি যাতে সময়ের স্রোতকে অস্বীকার করে কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলা যায়। অনেক সময় নাচের মেয়েরা এসে আমার ঘরে বিশ্রাম নিত। রিহার্সাল দিতে দিতে ক্লান্ত হলে আমার ঘরে বসত। অথচ বসার ঘরের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু তারা আমাকেই সবচেয়ে নিরাসক্ত এবং আশ্রয়ের যোগ্য মনে করত।

আমি বারবার কবিতায় ডুব দিতে চেয়েছি। কিন্তু ধ্যান ও উদ্ভাবনা শক্তি আমার মাথা থেকে আমার বুকের ওপর ভেঙে পড়েছে। গণকণ্ঠে কত মানুষ আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। তাদের কেউ আমার আর খোঁজও নেয়নি। নেওয়ার প্রশ্নও ওঠেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে একটি মেয়ের কথা আমি কখনও ভুলিনি। তার নাম কুদসিয়া বেগম কলি। সে তখন কানাডা প্রবাসী। একবার এসে শিল্পকলা একাডেমিতে আমার টেবিলের সামনে বসে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। বলেছে মাহমুদ ভাই, আমরা সবাই পালিয়ে বেঁচেছি। কিন্তু আপনার ভাগ্য এ মাটির সঙ্গে জড়িত। আপনি কোথায় পালাবেন? তবে যদি আপনি না লেখেন তাহলে মস্তবড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

আমি আমার এককালের সহযোদ্ধা, সহকারিণীর এ উপদেশ, এ কথা কখনও ভুলিনি, এদেরও অনেক ত্যাগ স্বীকার আছে। বংশ লতিকার গৌরব আছে।

যতদিন কলি আমার সঙ্গে গণকণ্ঠে ছিল ততদিন আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি এ হলো চিশতিয়া তরিকার মজ্জুম পীর বখত চিশতির মেয়ে।

তবে আশার কথা, মাঝে মধ্যে শিল্পকলা একাডেমির বদৌলতে গ্রন্থ উৎসব বা গ্রন্থমেলায় বইপত্র নিয়ে আমাকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে দিল্লিতে পাঠানো হতো। আমি আগ্রহভরে যেতাম। একবার দিল্লি থেকে ফেরার সময় কলকাতার প্রকাশকরা কলকাতার বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য আমার থাকা-খাওয়ার খরচ দিয়ে মেলায় নিয়ে এসেছিল। এটা একটা অভিজ্ঞতা। তারা প্রাপ্যের অধিক সম্মানী দিয়ে একটা আরমানী হোটেলে আমার পছন্দমতো থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আমাকে পেয়ে হোটেলের মালিক ভারী আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ আমি তাদের রান্না পছন্দ করতাম। তারা রান্নায় কখনও লবণ ব্যবহার করত না। লবণের পরিবর্তে পাপড় ব্যবহার করত। দিনগুলো খুবই মজার ছিল। আমার কলকাতার বন্ধুরা অহরহ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ওই আরমানী হোটেলে জমায়েত হতো। আমার বিধ্বস্ত মানসিকতায় এই সফর এবং ব্যবস্থা ছিল উপশমের আরামদায়ক ওষুধের মতো। না হলে হয়তো আমি ঢাকায় মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে শিল্পচর্চা করতে পারতাম না।

ফিরে এসেই আমি গদ্য লেখা শুরু করলাম এবং আমার বিচারে অভাবনীয় সাফল্য এতে অর্জিত হয়েছে। আমি সব সময় বলে এসেছি, গদ্য-পদ্য যা কিছু কবি লেখেন তাই কবির কাজ। আমাদের দেশে একটা অভ্যাস আছে যে, ছন্দ মিলিয়ে কিছু না লিখলে তাকে আর কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। কিন্তু আমি সব সময় দাবি করে এসেছি যে, কবির সব ধরনের আঙ্গিক রীতিই হলো কবিতার কাজ।

এ সময় আমার একটা ধারণা হলো আমি কেবল কবিদের সঙ্গেই মেশামেশি করি বেশি। অথচ আমার পাশেই চারুকলার শিল্পীদের একটা আনন্দঘন জগৎ রয়েছে। একটু আগ্রহ দেখালেই আমি কি চারুকলার আঙ্গিক রীতি, রং ক্যানভাসের ব্যাখ্যায় পারঙ্গম হব না! যেই কথা সেই কাজ। আমি ছবি বোঝার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করলাম। অবশ্য আগে থেকেই আমার কয়েকজন শিল্পী বন্ধু বিদ্যমান ছিলেন। তাদের মধ্যে কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুনবী ছাড়াও পঞ্চাশ দশকের প্রায় সব শিল্পীই কোনো না কোনোভাবে আমার সাথে সমকালীনতার সূত্রে গাঁথা।

এ সময় দু'একটি এক্সিবিশনের ওপর আমি আলোচনার সূত্রপাত করলাম। তবে আমি বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের মতো অত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ চারুকলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্লেষণে সক্ষম হব সেটা আশা করিনি। তাতেও দেখলাম আমার একটা লেখা যা সুলতান ভাইয়ের ওপর আমি ভয়ে ভয়ে লিখেছিলাম তা প্রকাশ পেলে আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। এবার আমি ছবির ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলাম। কবিতার জন্য কাহিনি এবং রঙের জন্য চারুকলার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। আজও এ আগ্রহ আমাকে একেবারে ছেড়ে যায়নি। এ সময় বা তার কিছু পরে আমাদের শিল্প মাধ্যমে রাশা বলে একজন দারুণ শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। সে গাছের কাণ্ড নিয়ে খোদাইয়ের কাজ শুরু করে মানুষের বিস্ময়বোধ উদ্‌দৃক্ত করে তোলে।

এ থেকে আমার ধারণা হয়, মানুষের শিল্পশক্তি বিচিত্র। কে যে কীভাবে বেরিয়ে যাবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা আগে থেকে ধরতে পারা মুশকিল।

৩৬

শিল্পকলায় আমার ঢোকার কিছুদিনের মধ্যেই বেশ কয়েক রকম রদবদল হয়ে গেল। মহাপরিচালকরূপে ড. সিরাজুল ইসলাম শিল্পকলায় হাজির হলেন। তিনি এসে আমাকে সাবুত করার জন্য গবেষণা বিভাগে একজন পরিচালক নিয়োগ করলেন। তিনি ইতিহাস বিভাগের লোক ড. সিরাজুল ইসলামের ছাত্র সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। খুবই নিরীহ টাইপের মানুষ। কোনোরূপ বিভাগীয় হাঙ্গামার প্রতিযোগিতায় তিনি থাকতে চাইতেন না। তবে ড. সিরাজুল ইসলামকে অন্ধের মতো ভক্তি করতেন। আমি সব সময় একটু ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কারণ আমার বিদ্যার দৌড় তো আমি জানি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অনেক ছাত্রই ড. সিরাজুল ইসলামের ভক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে ড. পারেশ ইসলাম অন্যতম। ড. সিরাজুল ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ইসলামের ইতিহাসের ছাত্রদের ওপর কেন এত দৃঢ়মূল তা আমার জানতে খুব কৌতূহল হলো। আমি জানলাম তার ডক্টরেট মূলত 'লোদি বংশের নির্মাণশৈলী'র ওপর। তার থিসিসটি আমি আপ্রাণ চেষ্টায় এবং অনেক কষ্টে সংগ্রহ করলাম। 'লোদি আর্কিটেকচার', লোদিদের ইমারত তৈরির গঠন প্রক্রিয়ার সহজাত নিয়ে ড. ইসলাম এই থিসিস তৈরি করে পিএইচডি লাভ করেন। আমি বইটি বারবার পড়লাম। ছোট বই। সুলিখিত বর্ণনা। গঠনশৈলীর বিশ্লেষণ, স্তম্ভ, গম্বুজ নির্মাণ কৌশল সবই আমার জানা হয়ে গেল। এই বিষয়ের ওপর ড. ইসলাম পিএইচডি করে সগৌরবে অনেক ছাত্রছাত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির মাঝে জীবনযাপন করেন। একে তো আমার প্রতি ঈর্ষাকাতর এবং সুযোগ পেলে অপমান করার প্রয়াসী থাকত। অন্যদিকে ড. সিরাজুল ইসলামের মতো লোক গণকণ্ঠের এককালের সম্পাদককে হাতের মুঠোয় পেয়েছেন এই পরিস্থিতিতে আমাকে শিল্পকলা একাডেমিতে চাকরি করতে হচ্ছিল। স্বাধীনভাবে আমার কিছু করার সুযোগ ছিল না। কারণ মাথার ওপর ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। আমার দু'জন অফিসার ছিল। একজন সৈয়দ আলী কাজেম, প্রফেসর আলী আহসানের পুত্র, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটেল্ড। অন্যজন মো. জাবের, সন্দ্বীপের এক তরুণ। যে কি-না নানা দুর্ভোগ থেকে পরবর্তীকালে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। আমাকে প্রায়ই ডিরেক্টরদের সভায় ডাকা হতো। অথচ সেখানে আমার বদলে মাহমুদুল হাসান থাকার কথা। কিন্তু মহাপরিচালক সিরাজুল ইসলাম মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে আমাকেও তলব করতেন। অবশ্য আমাকে উল্টাপাল্টা কথা বলে খুঁচিয়ে অপমান করার জন্য। আমি এসব অপমান নীরবে সহ্য করতাম। কোনো প্রতিবাদ করতাম না। কারণ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশটাই ছিল আমার বিপরীত। এর মধ্যে আমার ব্যবহারে এবং ব্যক্তিগত আচরণে অনেকে আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তবে চারুকলা ও নাট্যকলা বিভাগের পারিচালকদ্বয় সুযোগ পেলেই আমাকে অপমানে জর্জরিত করার চেষ্টা করত। আমি মুখ বুজে থাকতাম কোনো জবাব দিতাম না।

আমি দৃঢ়ভাবে জানতাম এরা যতদিন চাকরিতে আছে ততদিন এদের দৌরাত্ম্য থাকবে। চাকরি থেকে চলে গেলে এদের কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু আমি যে বিষয়ে চর্চা করি তাতে আমি হয়তো কোনোদিনই বিস্মৃত হব না। এটা বুঝতে পারায় একটা প্রশান্তি আছে। তার বিপদও আছে। এ দুটি অবস্থার মধ্যে আমাকে নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে হয়েছে।

একদিন ডিরেক্টর সভায় ড. সিরাজুল ইসলামের গুণপনা দিয়ে আলোচনা চলছিল। আমাকে সেখানে হাজির রাখা হতো। আমি চুপচাপ নিঃশব্দে বসে থাকতাম। ড. সিরাজুল ইসলামের গুণপনা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনার পর ড. ইসলাম নিজেই আমাকে খোঁচা দেওয়ার জন্য বললেন, আরে আমাদের কবি তো চুপচাপ বসে আছে। সে তো কিছু বলছে না। সবাই আমার দিকে তাকাল বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে। আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম, স্যার আপনার কাজ ও আপনার ব্যক্তিজীবনের বৈপরীত্য আমাকে বিস্মিত করে। আপনি তো স্বনামধন্য ব্যক্তি। আমার প্রশংসা বা নিন্দায় আপনার কিছু এসে যায় না। তা ছাড়া আমার মূর্খতা এতটাই বিঘোষিত যে, আধুনিক বাংলা কবিতা ছাড়া আমাকে রক্ষা করার আর কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আপনি যে বিষয়ে থিসিস সাবমিট করে পিএইচডি আদায় করেছেন সেই লোদি আর্কিটেকচার আমি পড়েছি। থিসিসটি পড়ে মনে হয়েছে আপনার মতো দৈত্যের, আমি দৈত্য বললাম স্যার জ্ঞানের দিকে বিচার করে কিছু মনে করবেন না। একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র আন্তরিক পরিশ্রমের ফল হলো লোদি আর্কিটেকচার। বইটি ইমারত তৈরির বিষয়ে হলেও অনেকটা কাব্যগন্ধি। কারণ লোদি পাঠানদের শুরুতে দিল্লিতে কিছু ঘরবাড়ি তারা বানিয়েছেন। আপনি তার একটা ঠিকানা দিয়েছেন। আঁকিবুঁকি শহর, পড়েছি স্যার। তবে লোদিদের আসল পরিতৃপ্তি ছিল বাগান সৃষ্টিতে। তারা বাগানের ভেতর তাঁবু খাটিয়ে ফুর্তি করত। সেসব বাগানের একটা হলো দিল্লির লোদি গার্ডেন। এখনও আছ। এটুকু বলে আমি চুপ করে গেলাম। মনে হলো ঘরে বজ্রাপাত হয়েছে। চারুকলা, নাট্যকলার পরিচালকরা আমার কথায় মূর্ছাহত এবং ড. ইসলাম মনে হয় হঠাৎ ফানুসের বাতাস বেরিয়ে গেলে যেমন হয় তেমন হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ভাবতেও পারেননি আমি তার থিসিসটি পড়েছি এবং গর্বের সঙ্গে তার মুখের ওপর থিসিস নিয়ে যা আলোচনা করছি যা তার কাছে অভাবনীয়। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমি তাদের বহুভাবে চর্চিত নকল বুদ্ধিবৃত্তি ও মুখের ওপর চাপানো মুখোশটি এক থাপ্পড়ে খুলে ফেলেছি। এখন আমার বিনীতভাবে বিদায় চাওয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব অবশিষ্ট ছিল না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে মহাপরিচালকদের দিকে সোজা তাকিয়ে বললাম, স্যার আপনার অনুমতি হলে আমি আসি।

ঠিক আছে যাও। আমি তোমার ঘরে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার মুখে একটি হাসির কৌতূহলী ঝলকানি দেখে আমি কামরা তেকে দ্রুত বের হলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম পেছনে কথা বলার মতো কোনো বিষয় আমি ফেলে আসিনি। আমার ডিরেক্টররূপে আমি দু'জন লোককে পেয়েছিলাম। একজনকে আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সৈয়দ মাহামুদুল হাসান। নিতান্ত ভদ্রলোক। অন্যজন নাট্যশিল্পী মমতাজ উদদীন আহমদ। আমি ব্যক্তি চরিত্রের সমালোচনাকে এড়িয়ে চলতে সব সময় চেষ্টা করে এসেছি। মমতাজ উদদীনের সময় আমি একটি খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে পেরেছিলাম। সেটা হলো আব্বাস উদদীনের ওপর অনেক ব্যক্তির লেখা নিয়ে একটি সংকলন। কাজটি আমি করতে পেরেছিলাম তার খানিকটা উদারতার জন্য। এটা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি।

আমি ১৮ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমির সহ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। অনেক মহাপরিচালক এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমাকে পেয়েছেন। আমিও তাদের নির্দেশনায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। মুস্তাফা-নূর-উল ইসলাম থেকে শুরু করে আবু হেনা মোস্তফা কামাল পর্যন্ত আমি একটি স্বায়ত্তশাসিত আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মধারায় উৎপাদন অর্থাৎ প্রোডাকশন, এতে পুস্তক থেকে শুরু করে নাচ-গান পর্যন্ত সবই শামিল আছে, নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেছি। তাছাড়া শিল্পী মানুষদের গায়ক, নাট্যশিল্পী, এমনকি যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেছি। এতে আমার অনেক কিছু দেখার ও জানার উপভোগ করার সুযোগ হয়েছে। আমার কবিতার জন্য এগুলোর প্রয়োজন ছিল। আমি তা উদারভাবে শিল্পকলা থেকে গ্রহণ করেছি। অধিকাংশ মানুষকে আমার ভালো লেগেছে। তাদের আমার শিল্পী মনে হয়েছে। কিন্তু একজন মানুষের কথা আমি না বলে পারছি না। তিনি হলেন চারুকলা বিভাগের সাবেক পরিচালক জাহাঙ্গীর। আমি জানি না কেন তিনি সব সময় আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতেন। অথচ আমি কখনও তার সঙ্গে কোনো বৈরী আচরণ করিনি। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, আমি ছবি বোঝার চেষ্টা করতাম এবং পঞ্চাশ দশকের সব শিল্পীই আমার বন্ধু ছিলেন। ছবি বোঝাটা এক বিপজ্জনক ব্যাপার বটে। আরও একজন সব সময় আমাকে খুঁচিয়ে সুখ পেতেন। তিনি হলেন নাট্যকলা বিভাগের মহসিন। আমি অবশ্য তার খোঁচাখুঁচির পেছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকত বলে মনে করি না। আজ এরা কেউ শিল্পকলাতে নেই, আমিও নেই। তবুও আমার কবিতার জন্য আমি তো কোথাও না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও আছি, থাকবও। আহা! এরা যদি অন্তত নিজের কাজের মধ্যে থাকতে পারতেন, তাহলে কতই না ভালো হতো!

৩৭

মানুষের কলাকেন্দ্র বা আর্টকালচারের কেন্দ্রভূমিগুলো সম্বন্ধে মানুষের ধারণা খুবই মহৎ। মানুষ মনে করে ওইসব স্থান যারা পরিচালনা করেন তারা বোধহয় খুবই অসাধারণ কোনো ব্যক্তি প্রতীক, এই ধারণাটা জন্ম নিয়েছে শিল্পকলার প্রতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা থেকে। কিন্তু আমি এর মর্মস্থলে দীর্ঘদিন কাজ করে বুঝেছি যে, এখানে ভালো লোক যেমন আছে তেমনি মন্দ লোকের সংখ্যাও কম নয়। মোটকথা সাধুসন্ত মানুষ আমি এইসব কলাকেন্দ্রে খুঁজে পাইনি। শিল্পকলায় কাজ করার সময় আমার মাথার ওপর যাদের চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিংবা যারা এমনিতেই আমার বিভাগে আমার পরিচালকরূপে কাজ করে গেছেন আমি তাদের প্রশংসাই করি। তাদের মধ্যে একজন হলেন সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অন্যজন মমতাজ উদ্দীন আহমদ। আগেই এ কথা বলা হয়েছে। যেহেতু আমি আমার দীর্ঘ জীবনসূত্র বর্ণনা করছি সে কারণে এইসব ব্যক্তি বিশেষের ওপর আমার সুবিচার করা উচিত বলে আমি মনে করি। সৈয়দ মাহমুদুল হাসান যেভবেই এখানে এসে থাকুন তার মানবিক সত্তা ও আমার প্রতি বিশেষ অনুকম্পা আমি অনুভব করতাম। তিনি শিল্পকলা সম্বন্ধে গভীর উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কথা বলতেন কম। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারতেন না। নামাজ পড়তেন। ধর্মের নিয়মকানুন, রীতিনীতি স্বাভাবিকভাবে মেনে চলতেন। আমার কাছে তাকে সহজ-স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে মনে হয়েছে। তবে তিনি যে গুরুটির শিষ্য ছিলেন তিনি জ্ঞানী মানুষ ছিলেন বটে; কিন্তু স্বজ্জন ব্যক্তি ছিলেন না। কারো ব্যক্তি চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করে আমি আমার লেখাটিকে নষ্ট করতে চাই না।

শিল্পকলায় আমি ১৮ বছর চাকরি করেছি। নষ্টামি যেমন প্রচুর দেখেছি, তেমনি মানবিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশভঙ্গির চরম মুহূর্তগুলোতে আমি পুলকিত ও শিহরিত হয়েছি।

আমি এসেছিলাম সংবাদপত্র থেকে। সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে জেল খেটে আমি এখানে এসেছিলাম। যেন আমার নিয়তি আমার দুর্ভাগ্যের বেদনা সইতে না পেরে আমাকে উগরে দিয়েছিল আমাদের জাতির একটি কলা কেন্দ্র। এখানে সঙ্গীত, চারুকলা, নাট্যকলা, নৃত্যকলা বিষয়ে, শিল্পীদের সঙ্গে আমার যে মাখামাখি হয়েছে তাতে আমার নানা বিষয়ে সিদ্ধি লাভ ঘটেছে। এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় আমি শিখে নিয়েছি। কিন্তু সাংবাদিকতা আমাকে কখনওই মুক্তি দেয়নি। শিল্পকলায় দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও আমি প্রবন্ধাদি বেনামে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতে শুরু করি।

প্রকৃতপক্ষে আমার সব সময় মনে হতো আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার লেখালেখিতে ফিরে যাই। এ সময় আমার সঙ্গে আমার লেখক বন্ধুদের সম্পর্ক ক্ষীণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে আসে। তবে শিল্পকলায় চাকরির সময় আমার পারিবারিক দায়িত্ববোধ বেড়ে যায় এবং আমার স্ত্রীর চেষ্টায় আমার প্রায় সব ছেলেমেয়ে কম-বেশি শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়। এর মধ্যে কয়েকজন উচ্চশিক্ষায় তাদের মেধা দেখিয়ে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এটা আমার জন্য ও আমার পরিবারের জন্য খুবই আনন্দদায়ক হয়েছে। এবার একটু আমার ব্যক্তি জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার বিষয় উল্লেখ করতে চাই। কিন্তু নাম-পরিচয় উল্লেখ করে এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করার ইচ্ছে আমার নেই। আমার সঙ্গে খুলনার একজন কলেজ শিক্ষকের পরিচয় ঘটে। তিনি ছিলেন কঠোর মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক। এ ব্যাপারে তার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। কোনো একটি সাহিত্য সম্মেলনে ঘটনাক্রমে আমি খুলনায় গেলে ওই অধ্যাপক আমাকে সম্মেলন কক্ষ থেকে শহরতলিতে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী একজন সরকারি কর্মচারী। আমাকে পরম যত্নে আহার করাল। এ পরিবারের সঙ্গে আসা-যাওয়া ও পত্র বিনিময়ে আমার একটি আত্মীয়তা গড়ে উঠল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ওই মার্কসবাদী স্কুলের শিক্ষকটির সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্ক সহসা একদিন ভেঙে যায়। তালাক হয়ে যায় এবং কালবিলম্ব না করে ওই শিক্ষকটি অন্য একটি মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে তার আগের স্ত্রীর অর্থে নির্মিত বাসায় এনে তোলে। কিন্তু আমার সব সহানভূতি ছিল ওই মেয়েটির প্রতি যে কি-না একজন নাস্তিক স্বামীর ঘরে টিকতে পারলেন না এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বাকি জীবন সে একাকী কাটিয়েছে। একবার অকসমাৎ তার খোঁজ নিতে গিয়ে আমি তার পারিবারিক কর্মস্থল কুষ্টিয়ার এক গ্রামাঞ্চলে তাকে একটি চিঠি লিখি। চিঠিটার ভাষা ছিল অত্যন্ত আত্মীয়তার সুরে বাঁধা। আমি শুধু তার বর্তমান অবস্থা ও একাকী দিন কাটাবার এই সময়টিতে সহানভূতি জানাতে চিঠিটি লিখেছিলাম; কিন্তু দুই দিন পরেই চিঠিটির জবাব পাওয়া গেল। জবাবে চিঠিটিতে যে ব্যাকুলতার কথা প্রকাশিত হলো এর জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মধ্যে মানবিক দায়িত্ববোধ সব সময় থাকে। এর জন্য মাঝে মধ্যে আমাকে কিছু অসুবিধা পোহাতে হলেও আমি মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক স্নেহ-মমতা, দয়া, মায়া ইত্যাদি মানবিক অভ্যেস ত্যাগ করতে পারি না। চিঠিটা আমাকে সরাসরি ভাই বলে সম্বোধন করে অবিলম্বে কুষ্টিয়া গিয়ে তাকে দেখে আসার অনুরোধ জানানো হলো এবং মিনতি করা হলো যেন আমি যে কোনোভাবে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে যাই। কুষ্টিয়ায় গিয়ে তাকে দেখে আসি।

আমি ঘটনাটি আমার স্ত্রীর কাছে বেমালুম গোপন করে গেলাম। চিঠিটি আমার মধ্যে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তদুপরি চিঠির ভাষা ছিল একটু লোভী মানুষকে লুব্ধ করার মতো নানা উপাদানে পূর্ণ। আমি প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছলাম। পরে অবশ্য কুষ্টিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি আমার স্ত্রীকে মিথ্যে কথা বলে একদিন ঢাকা ত্যাগ করি। স্ত্রীকে বলেছিলাম আমি একটি সাহিত্যে সভায় খুলনায় যাচ্ছি। আমার স্ত্রী কিছুই ভাবলেন না। কারণ এ রকম তো আমি কতই বাইরে গিয়ে থাকি। আমি সবকিছু পেছনে ফেলে একটি লালসাকাতর মানুষের মতো এক রাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুষ্টিয়া জেলার স্টেশনে এসে নামলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। স্টেশন থেকে সরকারি কর্মচারীদের বসতি বা কোয়ার্টারগুলো ছিল অন্তত তিন কিলোমিটার দূরে। আমি একটা রিকশা নিয়ে ভুলপথে অনেক ঘোরাফিরা করে ওই মহিলা যে কলোনিতে থাকত সেখানে তার বাড়ির সামনে দরজায় এসে নামলাম। আমি আমার সুটকেসসহ রিকশাতেই বসে থাকলাম। রিকশাওয়ালাকে বললাম এটা অমুক ম্যাডামের বাড়ি কি-না তুমি জিজ্ঞেস করো। আমাদের কথাবর্তার মধ্যে সহসা দরজা খুলে গেল এবং আমার প্রতি ভাইজান বলে একটি ডাক এসে লাফিয়ে পড়ল। দেখলাম সে দ্রুত এসে আমার সুটকেস টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালাম। আমার প্রথম কথাই ছিল।

– তুমি কি বাসায় একাই থাকো?

– না আমার ছোট বোনটি আছে।

এ কথায় ছোট বোনটি এসে আমাকে কদমবুসি করল।

আমি ছোট বোনটির দিকে মুখ তুলে দেখলাম বেশ সুন্দর চেহারা এবং দু'চোখ ভর্তি কৌতূহল। তার বড় বোন বলল, আপনি কি আমার বোন না থাকলে, আমি একলা বাসায় থাকলে ফিরে যেতেন?

– আমি বললাম, তুমি বলো কী করতাম?

– আমি জানি আপনি ফিরে যেতেন!

আমি আড়চোখে তার অভিব্যক্তি দেখছিলাম। এ কলোনিতে কেউ কারো বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবার অবসর পায় না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। তবে আমি খ্যাতনামা কবি এটা জানাজানি হয়ে গেলে পাড়ার সব ছেলেমেয়েরা আমার বাসায় এসে হাজির হয়।

আমি এখানে পা দিয়ে বুঝেছি আমার জীবনের এক রকম ভুল আমি করে বসেছি। কোনো অবস্থাতেই আমার এখানে আসা উচিত হয়নি। রাতে হাত-মুখ ধুয়ে খুব সুস্বাদু ব্যঞ্জনের আহার পর্ব সমাপ্ত করা গেল। কিন্তু যেটা ঘটল সেটা হলো যার জন্য এসেছি তাকে মনে হলো কেমন যেন এক বোবা বেদনায় নিজের মধ্যে মুখ লুকাতে চাইছে। আমি তার আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, আর এ দশায় সবাই আমার ব্যাপারে হয় অতি উৎসাহী, কেউ কেউ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে। এই অবস্থায় আমাকে যখন একাই থাকতে হবে তখন একা থাকার সাহস নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে নিয়েছি। এখন আমার মধ্যে আর কোনো ভয় নেই ভাইজান। আপনাকে আসতে বলেছি এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, মানুষ মানুষের প্রতি সঙ্কটকালে সাড়া দেয় এটা প্রমাণ করার জন্য।

আমি এ কথায় হা করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি জানতাম সে গ্রাজুয়েট এবং তার কর্মক্ষেত্রে সে খুবই কর্মদক্ষ অফিসার, আমি হেসে বললাম, একা থাকাটা কি নিয়তি হিসেবে মেনে নিলে?

অনেকটা তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারারাত আমরা কথা বলে কাটালাম মুখোমুখি বসে। বোনটি কিছুক্ষণ জেগে ছিল। তারপর আমার কাছে বিদায় নিয়ে শুতে গেল। আমাকে জানাল যে, সে কলেজে পড়ে। চোখ দুটিতে আমার প্রতি সে অপার কৌতূহল। শেষ রাতের দিকে আমাকে তার বিছানাটি দেখিয়ে বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমার অন্য ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু পরের দিন ভোরবেলায় আমার মনে হয়েছিল সে ঘুমায়নি। এক কাপ বেড টি সে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, নাশতা তৈরি করতে ১৫ মিনিট সময় লাগবে। একটা সিগারেট দেব? আপনার জন্য দুই প্যাকেট ব্যানসন সিগারেট এনে রেখেছিলাম। দেখলাম সে না ঘুমালেও প্রসন্ন হাসিতে সে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আজ স্বীকার করি যে, আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আল্লাহ আমাকে রক্ষা না করলে আমি সীমা ছাড়িয়ে যেতাম। কিন্তু আমার কবি খ্যাতি আমাকে রক্ষা করেছে। পরের দিন পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেলে অনেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটে এসেছিল এবং আমার জন্য সন্ধ্যায় একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

সে অনুষ্ঠানে আমার সম্বন্ধে যেসব ভালো ভালো কথা বলা হলো সেটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। ভাবলাম এত ভালো লোক আমি নই। অথচ এত দূরের মানুষ আমাকে এত ভালো জানে কীভাবে?

আমার মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হলো। মনে হলো আমি ভালো মানুষ নই। বরং দুশ্চরিত্র। দূরপনেয় কলঙ্ক কালিমা আমার মুখে লেপে দেওয়া উচিত। আমার মনে হলো আমি কেন এতদূর এসেছি?

কেন এসেছি?

অনুষ্ঠান থেকে ফিরে ওই গৃহে আর আহার্য গ্রহণ না করে আমি সুটকেস হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। বললাম, আসি তাহলে বোন।

ছোট বোনটি আমার পেছন পেছন রিকশা স্ট্যান্ড পর্যন্ত এসেছিল। তার মুখে একটিমাত্র কথা, আমাকে মনে রাখবেন কিন্তু। ঢাকায় গেলে চিনতে পারবেন তো?

আমি হেসে বললাম, এসো একবার, পরীক্ষা করে দেখি। অকারণে আসা অকারণে ফিরে যাওয়া, মাঝখানে একটা-দুটা রাত যা অভিজ্ঞতার মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকবে।

৩৮

তবুও স্বীকার করি যে শিল্পকলায় আমার দিনগুলো ভালোভাবেই কাটিয়ে এসেছি। কিন্তু শিল্পকলায় চাকরির সময় আমার যে ক্ষতি হয়েছিল সেটা হলো আমি যে বিচরণশীল মানুষ ছিলাম তা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। যখন খুশি তখন আগের মতো আর ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ এখানে ছিল না। তবে তখন কবিতা লেখার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল। সনেট আঙ্গিকের মধ্যে আমার যে দক্ষতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টি হয়েছিল তা ওই সুখের চাকরির সময় আরও একটু বাজিয়ে দেখার প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলাম আমি। লেখার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। অফিসে ফাইল সই করা ছাড়া আর তেমন কোনো পরিশ্রমসাধ্য কাজ ছিল না। মাথার ওপর থেকে শাসন করার মতো আপদও এ সময় বিদেয় হয়ে গিয়েছিল। এ সময় অর্থাৎ মহাপরিচালক আমাকে সাহায্য করার নামে আমার কামরায় এক মহিলাকে একটি টেবিল দিয়ে বসিয়ে দিলেন। তার নাম জরিনা আখতার। তিনি কবি ছিলেন। প্রকৃতই কবি ছিলেন। যদিও মহাপরিচালক প্রথম আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই আমার ঘরেই বসিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। অল্প কিছুদিন তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। পরে সম্ভবত তিনি নিজেই এর চেয়ে উত্তম কোনো চাকরি জোগাড় করে চলে গিয়েছিলেন। তবে আমার সঙ্গে তার আন্তরিকতার সূত্র কখনও ছিন্ন হয়নি। আজও তা বজায় আছে। আমি তার কথা আরও বিস্তারিতভাবে বলতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সেটা সম্ভবত আমাদের কারোর জন্য এখন এ বয়সে এসে বর্ণনা করা সঠিক হবে না। শুধু এটুকুই বলব, কবি জরিনা আখতারের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ আছে।

কবিকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। সে ত্যাগ আমারও আছে। কিন্তু ঐসব ত্যাগের বর্ণনা দেওয়া এখন এ বয়সে অনুচিত হবে। আমি সেই সময়ের অনেক তরুণ-তরুণীর কবি হওয়ার আকুল বাসনা লক্ষ করে মুহ্যমান হয়ে থাকতাম। তাদের সাহায্য করতে আমি সব সময় ইচ্ছুক ছিলাম। করেছিও, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত সংযমবোধকে আমি কখনও কবির মতো আচরণে নষ্ট করে দিইনি। এভাবে আমি অনেক অঘটনের হাত থেকে নিজেকে সযতনে সরিয়ে রাখতে পেরেছি। আমাকে সবসময় তরুণ-তরুণী অনেক কবি প্রতিভা মফস্বল থেকে চিঠি লিখত। কিন্তু আমি এদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে চলতে গেলে আমার নিজের পারিবারিক অবস্থা বিপর্যস্ত হতো। খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে আমাকে চলতে হতো।

ষাট দশকে কবি আফজাল চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেলে মাঝে মধ্যে তার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্থানীয় অফিসে আমার আনাগোনা বৃদ্ধি পায়। সময়টা তখন আফগানিস্তানের ওপর রুশ দখলদারীর সময়। আজ আমি আর সন-তারিখ উল্লেখ করে কিছু লিখতে পারি না। কারণ স্মৃতি আমাকে আর তেমন সাহায্য করে না।

চিঠি হঠাৎ আমার মনে হলো আফজাল যখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্থানীয় অধিকর্তা অর্থাৎ পরিচালক তখন আফগানিস্তানের ওপর একটি গ্রন্থ প্রকাশ হয়তো বা সম্ভব। আমি প্রস্তাবটি আফজালকে দিতেই তিনি সম্মত হয়ে গেলেন এবং আমাকে বইটি সম্পাদনার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি শর্ত দিলেন আমার সঙ্গে তার নামটিও থাকতে হবে। আমি রাজি হয়ে গেলাম এবং এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডশনের তৎকালীন মহাপরিচালক মহোদয়কে রাজি করানো গেল।

আফজাল অত্যন্ত কর্মতৎপর ও দক্ষ সম্পাদক ছিলেন। তিনি নানা সূত্র থেকে নানা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ইতিহাস এবং কবিতা সংগ্রহ করলেন। মোট কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আফগানিস্তান আমার ভালোবাসা' নামে যে বৃহৎ বইটি আমার এবং আফজালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সব কাজ আফজালই করেছে।

আমি যৎসামান্য সাহায্য করতে পেরেছিলাম, অধিকাংশ কাজই আফজাল সম্পন্ন করেছিল আজ স্বীকার করি। ওই বইটি প্রস্তুতে আফজাল অমানুষিক পরিশ্রম না করলে আমার পক্ষে তা একা সম্ভব ছিল না। বইটি প্রকাশিত হলে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আফগানিস্তানের ওপর এত তথ্যসূত্র সম্ভবত এর আগে এক জায়গায় কেউ গ্রথিত করতে পারেনি। কাজটি করার কিছু দিন পরে আফজাল চৌধুরী সিলেটে ফিরে যান। তিনি সেখানকার সরকারি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বস্থানে ফিরে গেলে তার উসিলায় আমি ঘন ঘন সিলেট যাওয়ার সুযোগ পাই। আফজাল তখন আবার শান্ত মনে কাব্য রচনা করে চলেছন। 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' নামক কাব্যগ্রন্থটি তার রচনা।

শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক সে সময় আমাকে দিয়ে একটি দুঃসাধ্য কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। সেটা হলো বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি জরিপের কাজ। কাজটি আমার তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। দেশের পূর্বাঞ্চলের জরিপ সরেজমিন আমাকে করতে হয়েছে। অন্যান্য পরিচালকদের পাঠানো হয়েছিল উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে। এই সূত্রে আমি অনেক বিষয় জানতে পারি। আমি সিলেট থেকে জরিপ শুরু করেছিলাম এবং খুবই মূল্যবান একটি প্রতিবেদন তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলাম। ওই জরিপের সময় অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও শিল্পীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এবং আমি বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছিলাম।

শিল্পকলায় কর্মরত অবস্থায় নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে এবং ব্যাপক পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে আমি নিজেকে আমার ক্ষেত্রে অপ্রতদ্বিন্দ্বী কবি হিসেবে আমার সমসাময়িকদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাই। এই সময় আমার পাশে আমার কবি জীবনের প্রথম দিককার কোনো বন্ধুকে স্থান দিতে পারিনি। আমি খানিকটা স্বার্থপরের মতো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি এবং পরমানন্দে জীবন কাটানো যাকে বলে, তা কাটাতে প্রয়াসী হই। এই সময়টাকে আমি মনে করি কবিসুলভ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চর্চার সময়। এতে আমার লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব-নিকাশ করতে এখন আর আগ্রহী নই।

৩৯

এ সময় শিল্পকলার পরিচালক হিসেবে অনেক বৈদেশিক আমন্ত্রণ আমার ভাগ্যে জুটে যায়। দিল্লির বইমেলা, কলকাতার বইমেলা এবং বাংলাদেশের শিল্পকলার ওপর প্রকাশিত যে কোনো এক্সিবিশনে আমাকে মহাপরিচালক পাঠিয়ে দিতেন। বলতেন, তুমি যাও। তোমার এতে অনেক উপকার হবে। আমাকে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজকর্মে পাঠিয়ে তৃপ্তি পেতেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকদের মধ্যে সৈয়দ জিল্লুর রহমান। তিনি সারাজীবন রেডিও পাকিস্তানের উচ্চপদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। সদা প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যবান। যখন শিল্পকলার মহাপরিচালক হিসেবে তিনি এলেন তখন তার বয়স অনেক হয়ে গেছে। প্রায়ই আমাকে একা ডেকে কথা বলতেন। নিজের জীবনের কথা, আনন্দের কথা, অ্যাডভেঞ্চারের কথা।

তার আমলে আমি মাঝে মধ্যে আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনে চলে যেতাম। তিনি আমাকে ছুটি দিতে দ্বিধা করতেন না এবং চাইতেন আমি একটু ঘুরেফিরে বেড়াই। তার সময় অকস্মাৎ আমার একটা মহামুহূর্ত এসে হাজির হলো। আমি রাবেতা আলমে ইসলামির পক্ষ থেকে পবিত্র হজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। প্রোগ্রামটি ছিল এমন যে, কয়েকজন নতুন মুসলিমকে সৌদি সরকারের উদ্যোগে হজে পাঠানো হচ্ছে। এ সময় সৌদি অ্যাম্বাসিতে কর্মরত শাহ আবদুল হালিম এর মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। তার বিচেনায় আমিও ছিলাম নও মুসলিম। কারণ আমি একটি সমাজতান্ত্রিক দলের কাগজের সম্পাদক হিসেবে বেশ খ্যাত হয়ে পড়েছিলাম এবং জেল খেটে পাকাপোক্ত হয়ে নিজের ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আমি কি নও মুসলিম ছাড়া আর কিছু?

আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল আল্লাহর ইশারা না থাকলে কেউ তার পবিত্র গৃহের কাছে সমবেত হয়ে লাব্বায়েক ধ্বনি তুলতে পারে না।

শাহ আব্দুল হালিমের এই প্রয়াসের কথ্য আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে সবসময় স্মরণ করি। আমি তৎকালীন সৌদি আরবের মহামান্য রাষ্ট্রদূতকে চিনতাম। তিনিও আমাকে পছন্দ করতেন, আমার নাম ওই তালিকায় থাকাটা তার ইচ্ছায়ও ঘটে থাকতে পারে। আমি ঠিক জানি না। আমি, আব্দুর রহমান গোপ, আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং নও মুসলিমদের নেতা আবুল হোসেন ভট্টচার্যের সঙ্গে পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন একজন উর্দু ভাষার লেখক যিনি সারাজীবন বাংলাদেশেই কাটিয়েছেন এবং দীনের খেদমত করে সদা হাসিমুখ নিয়ে দিন যাপন করছেন। সেই মধুভাষী বদরে আলম সাহেব একটা অসাধারণ টিম গঠন করলেন আমাদের নিয়ে। আমি আনন্দে প্রায় অশ্রুসজল থাকতাম এবং আমার অতীত কৃতকর্মের জন্য সবসময় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। ১৯৭৮ সালে আমরা জেদ্দায় গিয়ে অবতরণ করেছিলাম। আমরা প্লেনে থাকতেই মিকাত এসে গেলে আমরা হজের নিয়ত করে সেলাইহীন দু'খণ্ড কাফনের কাপড়ের মতো কাপড় পরে নিলাম। আশ্চর্য যে, ওই কাপড়টি গায়ে উঠলেই মন বদলে যায়। মনে হয় শেষ বিচারের মাঠের দিকে রওনা হচ্ছি। এমন একটা মনোভাব কেন হয় কে জানে। আমরা জেদ্দায় পৌঁছে এয়ারপোর্টে একটু বিড়ম্বনায় পড়লেও প্রায় ১০-১২ ঘণ্টা এয়ারপোর্টে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের আমন্ত্রণকারীদের তালাশ করে বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে সক্ষম হই। অসুবিধার দিকটা ছিল এ রকম, যেহেতু আমাদের কোনো মুয়াল্লেম ছিল না, আমরা ছিলাম রাবেতা আলম আল ইসলামির মেহমান, সে কারণে যোগাযোগের অভাবে এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে কেউ আসেনি। পরে অবশ্য বদরে আলমের ক্রমাগত চেষ্টায় আমরা আমাদের মেজবানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। তারা দ্রুত এসে গাড়ি নিয়ে আমাদের তুলে নেয়।

এর আগে যতক্ষণ আমরা এয়ারপোর্টে ছিলাম আমাদের মতো বিপাকে পড়া অনেক হজযাত্রীকে সেখানে পেয়েছি। একেক জনের অসুবিধা সেখানে একেক রকম। কিন্তু আমাদের অসুবিধাটা ছিল একটু ভিন্ন রকমের। আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে পারছিলাম না। অথচ আমাদের খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজন ছিল। আমাদের অবস্থা আন্দাজ করতে পেরে অন্য যাত্রীরা যারা আমাদের মতো বিপদগ্রস্ত ছিল তারা তাদের বাসন-কোসন ও স্টিলের বাটিতে করে আমাদের খাবার ও পানি জুগিয়েছিল। যেন আমরা একই পরিবারের লোক। অথচ একেকজন একেক ধরনের সঙ্কটে পড়েছি। আমাদের খাইয়ে অন্যান্য সদস্যরা কি যে খুশি হয়েছিলেন! সে দৃশ্য আমি এখনও ভুলতে পারি না। আমাদের ভাষা এক নয়, তারা নিজেদের ভাষা ছাড়া ইংরেজি বোঝে না, এ অবস্থায় শুধু ইসলামিক মনোভাব নিয়ে আমরা বিপদ উৎরে গিয়েছিলাম। এ দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারব না।

যা হোক আমরা জেদ্দা ও মক্কার পথের ওপর কোথাও রাবেতার গেস্ট হাউসে গিয়ে উঠলাম। গিয়ে সেখানে সব কিছুই পাওয়া গেল। খাদ্য, পানীয়, ফলমূল কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ওই গেস্ট হাউসে আমরা একদল জাপানিজ ডাক্তার পেয়েছিলাম। এরা সবাই ছিল জাপানি নও মুসলিম। যাওয়ার সময় এক ডাক্তার আমার অনুরোধে আমাকে কিছু আমাশয়বিরোধী ক্যাপসুল দিয়েছিলেন। এতে আমার অনেক উপকার হয়েছিল। জাপানি ডাক্তারের দল চলে গেলে আমরা খাওয়া ও বিশ্রাম সেরে মিনার দিকে রওনা দিলাম। সেখানে রাবেতার অন্য আরেকটি ইমারতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আমরা জায়গা পেয়েছিলাম ওই ইমারতের ছাদে। এখানে দাঁড়ালে মিনায় খাটনো তাঁবুসমগ্র চোখে পড়ে। যতদূর চোখ যায় শুধু তাঁবুর সারি। যেন সারি সারি উটপাখির ডিম কেউ উঁচু করে সাজিয়ে রেখেছে। দেখে মনটা আনন্দে ভরে যায়। ধর্মের এ ধরনের সামষ্টিকতা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা আর কোনো ধর্মের পুণ্যপীঠে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আমার জানা নেই। হয়তো বা পৃথিবীতে নেইও।

হজের সব আনুষ্ঠানিকতা কীভাবে পালন করতে হয় তা আমি যেন বদরে আলমের কাছে থেকে এবং নও মুসলিমদের নেতা আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের কৌতূহলী জিজ্ঞাসায় আলোচনায় আয়ত্ত করে নিচ্ছিলাম। নিচ্ছিলাম অবশ্য পথ চলতে চলতে। আমরা মিনায় পৌঁছেই মক্কার দিকে রওনা হলাম। তখন সব পথঘাট পুণ্যার্থী মানুষের ভিড়ে এক অত্যুজ্জ্বল পবিত্র রূপ ধারণ করেছে। প্রতিটি নর-নারীর মুখ যেন একেকটি বাতির মতো বলে আমার ধারণা হচ্ছিল। মানুষের পুণ্যাকাঙ্ক্ষার চেয়ে পবিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসনা আর কিছু নেই। যখন ওই দীপ্তিতে মানুষ আলোকিত হয়ে ওঠে তখন মানুষের চেয়ে সুন্দর আর কিছু আমার চোখে পড়ে না। দোকান-বেসাতি, গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি সুখ-আরাম কোনো কিছুই আমার কাছে অর্থবহ করে না। কিছুটা গাড়িতে, কিছুটা হেঁটে আমরা গিয়ে মক্কা নগরীর হেরেম এলাকায় উপনীত হলাম এবং বাবে সালাম গেট অতিক্রম করে কম্পিত পদে পবিত্র কাবা গৃহের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দুই রাকাত নামাজ শেষে লাব্বায়েক বলে তাওয়াফ শুরু করলাম। আমার এই হজের বিবরণ আমার অন্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছি বলে এখানে আর বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না।

১৯৭৮ সালে আমাদের হজ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমিতে চাকরি করা অবস্থায় যেহেতু আমি হজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেহেতু বিষয়টা এখানে উল্লেখ করেছি মাত্র। হজ সম্পন্ন করতে আমাদের প্রায় বিশ দিনের বেশি সময় লেগেছিল। কিংবা প্রায় পুরো মাসই, এখন আর মনে করতে পারছি না। হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে গেলে বিমানের জন্য আমাদের আরও কিছুদিন মক্কায় থাকতে হয়েছিল। এতে আমার খুবই উপকার হয়েছিল। আমি একা একা মক্কা নগরীকে দেখার ভালো সুযোগ পেয়েছিলাম। তা চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। হজের চেয়ে পবিত্রতম আন্তর্জাতিক কোনো সম্মেলন আর হয় না। আমি মুসলমান হিসেবে এই গৌরব জন্মগতভাবে পাওয়ার অধিকারী। আমি তা পেয়েছি। আমার মহান প্রভু আল্লাহ আমার হজ কবুল করুন।

হজ থেকে ফিরে এসে শিল্পকলায় নিজের কাজে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সহকর্মীবৃন্দ ও শিল্পীরা আমাকে একটু অন্য চোখে দেখতে শুরু করল এবং প্রগতিবাদীরা আমাকে পাকাপোক্তভাবে 'মৌলবাদী' কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা শুরু করল। আমার রচনার প্রতি একটু তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব দেখাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি। কারণ উদ্ভাবনশীল লেখক হিসেবে আমার ভাবনা বহুভাবে বিস্তৃত ছিল। আমার লেখা পড়ত আমার বিরুদ্ধবাদীরাই বেশি। আমি স্বীকার করি তারাই আমার মূল্যায়ন করত বেশি। সম্ভবত এই সময় আমার 'বখতিয়ারের ঘোড়া' প্রকাশিত হয়। শিল্পী হামিদুল ইসলামের অসাধারণ প্রচ্ছদে বইটি বাজারে বের হলে কিছুদিনের মধ্যেই এর প্রথম প্রকাশ শেষ হয়। আমি কলকাতায় গেলে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'পরিচয়'-এর সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্তের হাতে বইটি দিই। তিনি আমার তরুণ বয়সের বন্ধু ও সুহৃদ ছিলেন। বইটি পেয়ে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং পরে আমাকে জানিয়েছিলেন বইটির ওপর তার কিছু লেখার ইচ্ছা আছে। তার ধারণা, বইটি একটু আধুনিক কবিতার ঐতিহ্যবাহী সংকলন। অথচ এই বইটি মৌলবাদী হিসেবে আমার নতুন সুখ্যাতিকে আরও প্রতিষ্ঠিত করল। আমার বন্ধু শহীদ কাদরী আমার কবিতা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করলেও ওই বইটির নাম সম্পর্কে দারুণ আপত্তি জানিয়েছিলেন। আমি জানতাম আমার বন্ধু শহীদ কাদরীর মধ্যে অনেক চিন্তার বৈপরীত্য আছে। আমি এতে অর্থাৎ নাম সম্বন্ধে তার মতামতকে তোয়াক্কা করিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে আমার 'মৌলবাদী' খেতাবটি আরও পাকাপোক্ত হয়ে গেল। এর মধ্যে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে একটি নতুন তরঙ্গের সূচনা হয়েছিল বলে মনে হয়। বেশকিছু মুসলিম তরুণ যাদের প্রায় সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তথাকথিত প্রগতিবাদের প্রলোভন এবং মুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করে আত্মবিশ্বাসী ঐতিহ্যবাদী সর্বোপরি ঈমানদার কবির কাতারে এসে যোগ দেয়। অন্যদিকে ঢাকায় সাহিত্যে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। ওইসব প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই আমাকে সভাপতি করে সভা-সমিতির আয়োজন হতে থাকে। এ অবস্থায় আমি বিশ্বাসী কবিদের এক অলিখিত নিঃশর্ত নেতৃত্বের আসনে এসে উপনীত হই। শুরু হয় আমার প্রবল বিরুদ্ধাচারী প্রতিঘাত। অনেক পত্রিকা আমার লেখা ছাপা বন্ধ করে দেয়। যারা আমার একটি কবিতার জন্য আমার বৈঠকখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত তারাই আমার কবিতাকে সমালোচনার মুখে ঠেলে দেয়।

এখানে একটি কথা আমি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে চাই, যারা আমার বিরুদ্ধবাদী তারাই সত্যিকার অর্থে আমার কবিতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন এবং তাদের এই বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা বা সমালোচনা তাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের কবি শামসুর রাহমানের পাশে এনে বসিয়ে দেয়। যা কোনোক্রমেই আমার পক্ষের লোকেরা করতে চায়নি। তারা আমাকে তাদের লোক বললেও আমার কবিতাকে তাদের কবিতা বলে মানতে চায় না। এক বিচিত্র অবস্থা আমার জন্য তৈরি হয়ে যায়। আমি একে আমার প্রভুর অনুগ্রহ হিসেবে উপলব্ধি করি।

৪০

আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তি আমার জীবনের পরম্পরা রক্ষা করে এগোতে পারছে না। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো একেকটা দৃশ্য স্মৃতির ওপর ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। যেখানে একটি মানুষকে সামনে দেখেও তার নাম স্মৃতির ওপর হাতড়াতে হচ্ছে, সেখানে চল্লিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এগিয়ে নেওয়া দুঃসাধ্য কাজ। কেউ কেউ আমাকে ফোন করে অভিযোগ করেছেন যে, আমি কিছু কিছু বিষয় চেপে যাচ্ছি। তারা ঠিকই ধরতে পেরেছেন। কিন্তু কোনো জীবনী লেখকই জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণনা করতে পারে না। আলো-আঁধারির খেলার মতো কয়েকটা বিষয় জানান দেওয়া যায়। কিন্তু সব বিষয় সবকালে বর্ণনা দেওয়া যায় না। ইচ্ছে করলেই কি আর হয়?

এখন আমার চোখের ওপর একটি দীর্ঘ আঁটসাঁট বেণী এক যুবতির পিঠের ওপর ঝুলছে। ওই বেণীটি এক মুহূর্তের জন্য দেখার ব্যাকুলতা আমাকে কতভাবেই না আকুল করত। আজ এসব কথা বলতে গিয়ে তনুমন থরথরিয়ে কাঁপছে। হায়রে কবির জীবন! অথচ এ জীবন ব্যাখ্যা না করে একজন কবির কবিতা আলোচনায় যাওয়া যে মূর্খতা, তা কবি জীবনানন্দ দাশ তার একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতায় বর্ণনা করে গেছেন।

যতটুকু স্মরণ করতে পারি, এ সময় আমি শিল্পকলার কাজের ফাঁকে আমার কবিতার দিকে মুখ ফেরালাম। কবিতায় ফিরে আসার মানেই হলো বিচরণবিলাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের মতো শহর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া। আমার সে সাধ্য কোথায়? আমার ছেলেমেয়েরা সম্ভবত এ সময়টায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীরূপে তাদের শিক্ষকদের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। কোনো অবস্থাতেই তাদের সৌভাগ্যে তাদের পিতার ভবঘুরে অভ্যাস বাধা হয়ে দাঁড়াক—এটা আমার স্ত্রী চাইতেন না। যদিও তিনি বলতেন, যাও না। কোথায় যাবে, ঘুরে এসো। আমি এদের ক্লাসের বিষয়-আশয় দেখব। যাও, চলে যাও। এমন অবাধ সুযোগ ঘোষণাতে আমি খুবই শরমিন্দা হয়ে পড়েছি। কবিতার জন্য আমি সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে পারিনি।

আমার জীবনে এক নারীমুখিনতা সম্পর্কে অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে। আমি এর জবাব দিতে চাই। আমার স্ত্রী আমাকে অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ দেয়। আমি অকপটে স্বীকার করি যে, আমি তাকে এ জন্য সমীহ করতাম। আমি কোথাও কোনো অবস্থাতেই এই স্বাধীনতার ব্যবহার করতে পারিনি। আমাকে যদি কেউ ঘর তালা মেরে রাখত, তাহলে আমি কোনো না কোনো উপায়ে তালা ভেঙে বেরিয়ে পড়তাম। কিন্তু আমার স্ত্রী ঘরের সব দরজা খুলে চলে যাওয়া বলে হেসে উঠতেন। সে জন্য আমি বাধা পড়ে গিয়েছিলাম, বাধা পড়ে গিয়েছিলাম অসংখ্য তালায়।

যার অদৃশ্য চাবি আমার স্ত্রী তার আঁচলে বেঁধে রেখেছিলেন। এখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমনিতেই আসতে পারে। আমি সারাজীবন বলে এসেছি যে, আমি আমার স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসি। তাকে আনন্দে ভালোবাসি। যৌনতায় ভালোবাসি। ভয়ে ভালোবাসি। ইবাদ-বন্দেগিতে পাশে সেজদারত থাকতে দেখতে পেলে বলতাম, হে আল্লাহ, এই সিজদাকারিণীকে ক্ষমা করে দাও।

আমার বোনেরা সবসময় আমার স্ত্রীকে খুবই ঈর্ষা করত। এই ঈর্ষা বিদ্বেষপ্রসূত ছিল না। এর কারণ ছিল এদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভাঙানিয়া শক্তি হিসেবে আমার স্ত্রীকে বিবেচনা করার একটা যুক্তি। আজও আমার বোনেরা, এই ঈদেও যারা আমার স্ত্রীকে দেখতে এসেছেন, তারা মুগ্ধ হয়ে তাদের দেখেছেন। আমার সামনেই তাকে বলেছেন, ভাবী তোমার মধ্যে কিছু একটা আছে। যা না থাকলে আমার ভাই ঘরের বাঁধনে বাঁধা পড়ত না। হয়তো এত বড় কবিও হতো না।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছেন, আমার মধ্যে কী আছে? আমি তোমাদের মতো অত লেখাপড়া জানা মেয়ে নই। আর অত টাকা-পয়সাওয়ালীও নই। তোমাদের কোটি কোটি টাকা আছে। তবে বোন, আমার আছে সুখ। বলেই স্বভাবসুলভ হাসিতে আমার স্ত্রী থেমে থেমে তার নারী মহিমা মনোমোহিনীরূপে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমি অবশ্য আমার সহদোরাদের কাছে পেয়েই খুশি। বছরে কালেভদ্রে এদের সঙ্গে দেখা হয়। এরা সবাই সচ্ছল পরিবারের সদস্য। আল্লাহর রহমতে অর্থবিত্তের কমতি নেই। কিন্তু নানা কারণে এদের যাকে বলে সুখ তা হয়তো নেই। এ জন্যই আমার স্ত্রী এদের মুখের ওপর যখন বলে, তোমাদের আছে ধন-দৌলত, পুত্র গৌরব আর আমার আছে সুখ। আছে ঘরের কোণে শান্তি, আছে ঘুম, স্বপ্ন মিশ্রিত নিদ্রা। তারপর মধুর হাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির জীবন হলো প্রকৃতপক্ষে অপরিকল্পিত সৃজনশীলতার জীবন। যে হারানো চাবি কোনোদিনই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে একটা গল্পের কথা মনে পড়েছে। গল্পটা বলেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। একটা লোক একটা লাইটপোস্টের নিচে অন্ধকার রাতে কী যেন খুঁজছিল। একজন পথচারী এটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, ভাই তুমি কী খুঁজছ?

পথচারীর প্রশ্নে লোকটি বলল, চাবি খুঁজছি?

পথচারী বলল, তাহলে আমিও খুঁজি?

দু'জন মিলে চাবিটি খুঁজতে লাগল। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পথচারী বলল, আচ্ছা ভাই, তুমি কি চাবিটি এখানেই হারিয়েছিলে?

তা তো জানি না।

তাহলে এখানেই খুঁজছ কেন?

এখানে খুঁজছি, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না এখানেই আলো পড়েছে। আর চতুর্দিকটা অন্ধকার।

অকাট্য যুক্তি। যেখানে আলো পড়বে সেখানেই তো হারানো চাবিটি খুঁজতে হবে। আমিও আমার সারাজীবন যেখানে আলো পড়েছে সেখানে সুখের চাবিটি অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছি। আমার বোনেরা বলতেন, সেটা নাকি আমার ঘরেই আছে। আমার স্ত্রীর দিকে আঙুল তুলে বলতেন, এই যে ভাই, আমার বাপ তোমার জন্য যোগাড় করে এনেছিলেন। আর দু'হাত তুলে এর জন্যই দোয়া করে গিয়েছিল।

দেখতে দেখতে অনেক দিন, অনেক বছর এবং কালকে অতিক্রম করে এসে এখন মন বলছে, একটা হিসাব-নিকাশ দরকার। প্রাপ্তিযোগের চেয়ে ব্যাপ্তিযোগ কে না আশা করে। আমার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অনেক মানুষ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। এতে আমি খুবই বিস্মিত হই। কিন্তু যখন ভাবি, কত কবির জীবন তো আমি জানি। সঙ্গীত-শিল্পকলার অনেক উচ্চাঙ্গ সাধকের জীবনও আমার অজানা নয়। তাদের চেয়ে আমার পার্থক্যটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ভয়ে ভয়ে থাকি আমকে এ ধরনের জীবন কে দিল? এ প্রশ্ন মনে জাগলেই আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়ি। মানুষের সব বাসনাই পূর্ণ হয় না। কারণ মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো বাসনায় ভার সইতে পারে না। যখন আমার কবি বন্ধুদের জীবনের পরিধি নিয়ে আমি পর্যালোচনা করি, তখন বুঝতে পারি যে, তারা তাদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, পাপ-পুণ্যে অনুতাপহীন। কিন্তু আমার অনেক অনুতাপ আছে। অনুশোচনা আছে। বহু নর-নারীর অকাতর অনুগ্রহ আমি গ্রহণ করে কোনো ঋণ পরিশোধ করিনি। আমার কি অনুতাপ থাকবে না? দাহ জ্বালায় আমার অনুশোচনা থাকবে না? গুনাহ করলে আল্লাহর কাছে তওবা করা যায়। কিন্তু কারো সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে সেই তওবা জানাব কার কাছে। তার চেয়ে বরং তার জন্য একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলি না কেন? এতে অন্তত ঋণ পরিশোধ না হলেও তাকে একবার অশ্রুসজল করে দিতে পারলে আমি কবিতার সার্থকতা তো দেখতে পারি। মানবসমাজ কবিতা ছাড়া কী করে চলতে পারে, সেটা আমাকে কে বলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ না করলে এ বিবরণ অপূর্ণ থেকে যাবে। লেখকের সঙ্গে অর্থাৎ আমার প্রকাশকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। হঠাৎ বেশ ক'জন বড় প্রকাশক এর মধ্যে আমার প্রতি তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। কেউ কেউ আমার বাসায় এসে আমার নতুন বই প্রকাশের প্রস্তাব দিতে থাকেন। এখানে কোনো প্রকাশকের নাম আমি দিতে চাই না। বাংলাবাজার থেকে এরা আমার বাসায় এসে পাণ্ডুলিপির জন্য ধরনা দিয়ে আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এতে আমি একটু গর্ববোধ করলেও তৎক্ষণাৎ এর মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি। এরা সবসময় চাইতেন, যে বই ভালো চলবে সেই বই নিতে এবং কেমন বই চলবে তারও একটি ইঙ্গিত দিতে থাকে। আমি মুহূর্তে বিষয়টি বুঝে গেলাম। আমাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে। আমি সাহিত্যের পথের একজন দৃঢ় মানুষ। অথচ কাটতিও আমার একান্ত দরকার। এ দুটি বিষয়কে আমি মেলাতে না পারলে আমি সস্তার বাজারে ছড়িয়ে পড়ব এবং জড়িয়ে যাব—এ ভয় আমার মনকে অধিকার করে নিল। হাত বাড়ালেই লেখকের কাছে বই পাওয়া যায়, আমি তা হতে দিতে চাইনি। এ বুদ্ধি-বিবেচনা আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে। দেশপ্রেম আমাকে সাহিত্যের মৌলিক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। রয়ালিটি আমি মন্দ পাইনি। আমি কোনো প্রকাশকেরই দুর্নাম রটাইনি। তারা তাদের সাধ্যমতো দিয়েছেন। আমি এতে খুশি থেকেছি। আমার এ খুশি ভাবটি প্রকাশকদের মুগ্ধ করেছে। এভাবে বাংলাবাজারের প্রকাশকদের সঙ্গে আমার একটা মধ্যম কিসিমের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। আমার বই লাখ লাখ কপি বিক্রি হবে—এটা আমি আশা করিনি। কেন হবে? আমি সাহিত্য করি। সাহিত্যে কিস্তিমাত হয় না। সাহিত্যের নিজস্ব একটা চাল আছে। সে রাজা-উজির মারা কাজ করে না। কাজ করে মানব-মানবীর হৃদয় বৃত্তির। ছকটা দাবার। হিসাব করে চলতে হয় এবং সব কাজেরই একটা গ্রহণযোগ্য কৈফিয়ত দিতে হয়। প্রেম নিয়ে আমি অনেক লিখেছি কবিতা, গল্প ও উপন্যাস। অথচ প্রেম আমার প্রিয় বিষয় নয়। প্রিয় বিষয় হলো মানব রহস্য, মনুষ্যত্ব ও ধর্ম। আমি যৌনতা নিয়েও লিখেছি। কারণ আমার সমাজের এ বিষয়টির পরিব্যাপ্তি আমি লক্ষ করেছি। সাহিত্য সৃষ্টিতে আমি লজ্জাবোধ করি না। কারণ আমার পরিবেশটা যেমন আমি তো সেটাই যতটা সম্ভব রাখঢাক করে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। এই বিশ্বস্ততা না থাকলে সাম্প্রতিককালের অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে আমাকে পড়বে কেন? আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি, অন্যকে বোঝানোর গুরুদায়িত্ব আমি কাঁধে নিইনি। এটাই হলো কবির কর্তব্য। আমি তো পৃথিবীর অনেক প্রযুক্তি বুঝতে পারি না। কিন্তু না বুঝেও কি এর সুফল আমি ভোগ করি না?

৪১

এ সময় শিল্পকলা একাডেমিতে একটি বৈপ্লবিক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল বলে মনে পড়ছে। সেটা হলো শিল্পী এসএম সুলতানের ছবির একটি একক প্রদর্শনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়োজন। এই মহান শিল্পীর বিভিন্ন ছবি দেশের বিভিন্ন পরিবারের কালেকশন থেকে সংগ্রহ করা শুরু হলো। তাছাড়া তিনি একাডেমির গোল বিল্ডিং চত্বরে বসে বিশাল ক্যানভাসে বিপুল উদ্যোগে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। সেখানে তাকে ডিস্টার্ব করতে যাওয়ার কোনো অনুমতি না থাকলেও তিনি ক্লান্তবোধ করলে নিজেই মাঝে মধ্যে উঠে এসে আমার ঘরে বিশ্রাম নিতে আসতেন। আমি এই সুযোগে তার সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলি। তিনি আমাকে কয়েকটি স্কেচ এঁকে দিয়েছিলেন। কথায় কথায় তিনি কাগজের ওপর আঁকিবুঁকি আঁকতেন। আমি সেই স্কেচগুলো নিজের ড্রয়ারে জমা করতে লাগলাম। এভাবে একটা স্কেচ কালেকশন আমার হয়েছিল। পরে অবশ্য কোনো এক তরুণকে ছাপতে দিয়ে আমি সেগুলো চিরতরে হারালাম। যদিও একটা লিটন ম্যাগে সেগুলো ছাপা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, সেটি আমার সৌজন্যে সংগৃহীত। এভাবেই বাংলাদেশের একজন অসাধারণ চিত্রকর্মীর সঙ্গে আমার চিরস্থায়ী আত্মীয়তা হয়েছিল। আমি তার ওপর একাধিক প্রবন্ধ লিখেছি। তার প্রদর্শনীর দিন তিনি একটি কালো আঙরাখা পরে উদ্বোধনী বক্তৃতায় হাজির হয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় একটি অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মাস্টার পেইন্টার। তার ছবিগুলো সবই পেশিবহুল এবং অন্য অভিব্যক্তিতে সমৃদ্ধ। নারীদের তিনি সুস্তনী, উদোম এবং অফুরন্ত শক্তির আধার হিসেবে উপস্থিত করেছেন। এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

– আপনার ফিগার তৈরিতে যে দক্ষতা আছে সেটা কে না স্বীকার করে। কিন্তু মানুষগুলোকে এমন দৈত্যের আকৃতি দেওয়ার যৌক্তিকতা কী?

তিনি উত্তরে বলেছলেন, আমি ভবিষ্যৎ আঁকি। আমি মানুষগুলোকে যে স্বপ্নে দেখি সে স্বপ্নে রঙ-রেখায় আঁকতে পছন্দ করি। আপনার ভালো লাগে না?

আমি অকপটে বললাম, খুব ভালো লাগে। এসএম সুলতানের ব্যাপারে সাধারণের থেকে অসাধারণে উত্তরণের কাহিনি শোনা যায়। আমি এর সারাৎসার আত্মস্থ করে নিয়েছিলাম। আমার কবিতার জন্য এর একান্ত দরকার ছিল।

চিত্রকলার ব্যাপারে আমি প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের শিল্পকলায় দেওয়া বক্তৃতামালার ক্লাসগুলোতে তার অনুমতি নিয়ে তার ছাত্র হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম এবং তিনি কীভাবে একটি মূর্ত কিংবা বিমূর্ত ছবি বুঝতে হয় তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষার গুণেই আমি প্যারিসে 'ল্যুই' মিউজিয়ামে মোনালিসার ছবির কাছে দাঁড়িয়ে অনেক বাঙালি দর্শক ও চিত্ররসিকদের সামনে একটি বক্তৃতা করতে পেরেছিলাম। আমার ভাষা অনেকে না বুঝলেও ইউরোপ থেকে আসা বিভিন্ন তরুণ-তরুণী মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। মোনালিসার ঠোঁটে ঈষৎ হাসির আভাস নিয়ে কলাশিল্পে যে বৈপ্লবিক ধুন্ধুমার শুরু হয়েছিল অর্থাৎ মুভমেন্ট, আমি তার সহজ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছিলাম। সুলতান ভাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন তার শিল্পের উদাসীনতা প্রদর্শন করে এবং বুঝিয়ে দিয়ে। তাকে দেখলে মনে হতো চারুকলা শিল্পের অসংখ্য ঈর্ষাকাতর লোকের ব্যাপারে তিনি খুবই উদাসীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সৌভাগ্য যে, শিল্পকলা একাডেমিতে দীর্ঘ উনিশ বছর আমার চাকরি চলাকালে এমন সব নর-নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, যারা অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ছিলেন দিকপাল। এ সময় একটি ঘটনা আমাকে খুবই বিব্রতকরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। ঘটনাটি হলো, হঠাৎ একটি কবিতামুগ্ধ মেয়ে এসে আমার দফতরে প্রায় প্রতিদিনই হাজির হতো। মেয়েটি দেখতে আহামরি কিছু নয়। কিন্তু তার চোখে-মুখে প্রতিভার এমন এক দীপ্তি ছিল যে, সে সামনে এলে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সে কবিতা লিখত। খাতা ভরে লিখত। আর পড়ত আমার কবিতা। সে ছন্দ বুঝত না। বিলম্বিত মিল দিয়ে লাইন ঠিক রাখত। কিন্তু তার দেহবল্লবি ছিল ছন্দ দোলায়িত। আমি স্বীকার করি যে, সে আমার সাধু সেজে থাকা অবয়বের ওপর লাগানো পর্দাটা একটানে খুলে ফেলত। এসেই বলত চা খাব।

আমি তাকে একবার বলেছিলাম, চলো আমার বাসায় যাবে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব। সে মুখের ওপর বলেছিল ওরে বাবা, এটা হবে না। আমি প্রতিদ্বন্দ্বী একদম সহ্য করতে পারি না। তাকে সামনে পেলে আমি কিন্তু আঁচড়ে-কামড়ে নাস্তানাবুদ করে দেব। আমি হেসে বললাম, থাক তোমাকে আর আমার বাসায় যেতে হবে না।

বেশ কিছুকাল আমি এই বিদ্যুৎ বিভার জ্বালাতন সহ্য করেছিলাম। তবে তার প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল অনেকটা স্নেহসিক্ত ও আব্দার সহ্য করার মনোভাবের মতো। কিন্তু আমার এই আস্কারা আমার জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারত। এই কবিতাপাগলী হঠাৎ এক লেকচারারকে তার বশে এনে ফেলতে পেরেছিল এবং তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যাকে বলে বোঝাপড়া, তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিয়েটা তার জন্য সুফল প্রসব করলেও সে কোনো সন্তান না রেখে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। একদিনের জ্বরে তার মাথার অসুস্থতা তাকে পঙ্গু করে ফেলে। সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ামাত্রই তার স্বামী তার কাছ থেকে অব্যাহতি নিয়ে তারই এক বান্ধবীকে বিয়ে করতে উদ্যোগী হলে সে তা সহ্য করতে পারেনি। সে নিঃশব্দে শুকিয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তার আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করেনি। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সে একদিন নিঃশব্দে নিজের বালিশে মুখ লুকিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

এরপর থেকে আমি কবিতা লেখে এমন তরুণীদের সংস্পর্শে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আমার কবিতা অনেকের বুকের ভেতর আমার জন্য চুম্বক সৃষ্টি করে আমার সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। আজকাল পারতপক্ষে আমি এদের চেহারার দিকে তাকাতে চাই না। এর মধ্যে ধর্মীয় কারণ যেমন আছে তেমনি আছে অলঙ্কারশাস্ত্রেরও তালভঙ্গের বিধিনিষেধ।

এ সময় আমার জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা আল্লাহ ঘটিয়ে দেন।

আল কামাল আবদুল ওহাব বলে আমার এক কবি বন্ধু আমাকে একদিন হাত ধরে বলে, চলুন, আপনাকে একটি ধর্মীয় আসরে নিয়ে যাই। সেখানে আপনার ভালো লাগতে পারে। আমি তার সঙ্গে ফার্মগেট ছাড়িয়ে বায়তুশ শরফ মসজিদ গিয়ে হাজির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলাম। সেখানে হযরত মাওলানা আলহাজ আবদুল জব্বার সাহেব পবিত্র কুরআন থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দারস দিচ্ছিলেন। আমি ভিড়ের মধ্যে পেছনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। চোখ তো নয় যেন দুটি বর্শা আমাকে গেঁথে ফেলল। আমি সামনে বসে থাকা মজলিসের শ্রোতাদের কাছ ঘেঁষে সোজা এগিয়ে যেতে লাগলাম এবং একেবারে তার সামনে গিয়ে তার হাতে হাত রাখলাম। তিনি আমার বায়াত গ্রহণ করে আমাকে কবির অহঙ্কার ত্যাগ করে আমার মহান প্রভু আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিলেন। এভাবেই শুরু হয় আমার অন্যজীবন।

আমার সব বিবেচনা, বোধশক্তি ও রচনারীতি এ ঘটনার পর থেকে বদলে যেতে লাগল। আমার পীর সাহেব হুজুর আমার জন্য দুহাত তুলে দোয়া করেছিলেন বলে আমি আমার পীর ভাইদের কাছে শুনেছিলাম।

জীবনের এই মূল পরিবর্তন যেভাবেই সাধিত হোক পীর সাহেব হুজুরের আমার প্রতি গভীর স্নেহ-মমতার বিষয় আমাকে সতেজ ও সচল রেখেছে। এ ব্যাপারে যেহেতু অন্যত্র আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সেহেতু এ লেখায় আমি তার তুলতে চাই না।

আমার কবিতায় আমি খানিকটা রহস্যবাদের অনুসারী ছিলাম। হজ ও পীরের মুরিদ হওয়ার সুবাদে আমার কবিতায় রহস্য সৃষ্টির প্রয়াসের মধ্যে তখন প্রবেশ করেছিল আধ্যাত্মিকতা। আমি চেষ্টা করতে লাগলাম, ভাষায় ইন্দ্রিয়ের অতীত স্পর্শকাতরতা সৃষ্টি করে এমন শব্দরাজি আহরণ করতে। 'সোনালী কাবিন' পর্যন্ত আমি ছিলাম আঞ্চলিক শব্দের নতুন উদ্‌গাতা। বাংলাদেশের কাব্য ভাষা কেমন হবে তা আমি কবিতায় প্রবর্তন করতে প্রয়াসী ছিলাম। এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা যুক্ত হওয়ায় আমার প্রতিটি কবিতা পাঠকের স্মৃতির ওপর নতুন অর্থবহতা তৈরি করতে পারছে বলে আমার ধারণা। আমি প্রচলিত প্রবাদগুলোকে ভেঙে উল্টেপাল্টে দিয়ে কাব্য সৃষ্টিতে মনোযোগী হয়েছি। আমার এই প্রয়াস মিথ্যাবাদী রাখাল পর্যন্ত আমি টেনে আনতে পেরেছিলাম। এ সময় আমার কেবলই মনে হতে লাগল কবিতা তো মন্ত্রের মতো আঙ্গিক রূপ দেওয়া। কিন্তু পরিবেশ এবং জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে আমি হয়তো আমার ইচ্ছামতো কবিতার আঙ্গিক বদলাতে পারিনি। কবির মনে নতুন কোনো বিষয় না থাকলে একদিন সহসা আঙ্গিক বদলে যায় না। এর জন্য পরিবেশ-প্রকৃতি, প্রেম, যৌনতা এবং আধ্যাত্মিকতার একটি শক্তির সংমিশ্রণ থাকতে হবে। হয়তো সেই শক্তি আমার ছিল না। আমি 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' পর্যন্ত নিজেকে এক শক্তিশালী কবি স্বভাবে উদ্বোধন ঘটাতে পেরেছিলাম। এরপরই কবিতায় নেমে আসে অমর পঙ্‌ক্তি রচনার এক ধরনের লোভাতুর ভঙ্গি।

এই ভূতের খেসারত আমাকে কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করতে হয়েছিল। আমি দাবি করি, আমি জেলখানায় বসে ত্রিশের কবি স্বভাবের বিপরীতমুখী বাকচাঞ্চল্য সৃষ্টিতে পারঙ্গম হয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ নিয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার মতো শক্তিধর কোনো সমালোচক বাংলাদেশে ছিল না। ফলে বাংলাদেশের আধুনিক কবিতা মূলত সমালোচনাহীন এক শিল্প তরঙ্গে নিজেকে ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে দেওয়ার আয়োজন পূর্ণ করে তোলে। আর এখন আমি নিজেই কবিতার সমালোচনায় অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আমার বিশ্বভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতা। কবিতাকে সমালোচনা করতে হলে যে কবির একটি আস্ত জীবনকে ব্যাখ্যা করার বাধ্যবাধকতা থাকে সেটা আমি সমর্থন না করে পারি না। রাজনৈতিক পক্ষপাত যদি কোনো কবিকে উচ্চাসনে বসায় তাহলে অনেক অক্ষম কবিতাও মুখে মুখে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে উচ্চারিত হতে থাকে। অথচ কবিতা হিসেবে ওই রচনাটির কোনো মূল্য নেই। এভাবে কবিতা শ্লোগানসর্বস্ব একটি জনসমর্থন আদায় করে নেয়। আমি কখনো সেই শ্লোগান রচনায় সম্মত হইনি। এতে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। তবে আমি কিছু ভুল করেছি। আমার তরুণ বয়সে যাদের আমি কবি সম্মান দিতে সম্মত হইনি পরবর্তীকালে নানা পরিস্থিতির প্ররোচনায় আমি তাদের প্রশংসা করেছি, তাদের ওপর প্রবন্ধ লিখে তাদের কবি হওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছি। এতে হয়তো অন্য কারো কাছে আমার ক্ষমা থাকলেও নিজের কাছে ক্ষমা নেই।

কবিতা হলো অমরতার স্বাদ গ্রহণ করার মতো একটা অবস্থা। সেই অবস্থা সাম্প্রতিকতার কোনো ঘূর্ণাবর্তে মাখন তুলতে পারে না। আমি বিলম্বে তা বুঝতে পারার যে দুর্ভাগ্য সেই দুর্ভাগ্যের মধ্যে বেঁচে আছি মাত্র।

AMARBOI.COM

৪২

মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে কোনো এক পরিস্থিতিতে আমি শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু ছড়া ও কবিতা লিখেছিলাম। এগুলো নিয়ে শিশু একাডেমি থেকে 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' বলে একটা চার রঙা আকর্ষণীয় বই বেরোয়। বইটির সব ছবি এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পী হাশেম খান। বইটি দারুণ ভালোবাসা অর্জন করে। এ ধরনের কবিতা পাঠকদের কাছে বেশ প্রিয় হয়ে ওঠে। আমার সাহিত্যচর্চারও একটি নতুন যাত্রা যোগ হলো। এই সুযোগে শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে আমার একটা স্থায়ী সম্বন্ধ সূত্র সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশ্য আমি আমার কালে প্রায় সব শিল্পীকেই চিনতাম। কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন্নবী এরা আমার পরিচিতদের মধ্যে সেই সময়ে আমার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, এটাকে আমি আমার সৌভাগ্য হিসেবে গণ্য করে থাকি।

তাছাড়া শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আমার প্রতি বিশেষভাবে স্নেহসিক্ত ছিলেন মাঝে মধ্যে আমাকে ডেকে নিয়ে কথা বলতেন। এই আত্মীয়তা তার সঙ্গে আমি মৃত্যুদিন পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলাম। তার মৃত্যুর ওপর আমার একটি কবিতাও আছে।

যা হোক আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়েছে। সেটা হলো 'পানকৌড়ির রক্ত' বেরোনোর পর শিল্পী কামরুল হাসান আমার খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিলেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সাহিত্যে রস সৃষ্টিতে আমি যে পারঙ্গম হয়েছিলাম সেটা সম্ভবত একবার তিনি আমাকে বলেছেন।

আমি এ কথাগুলো উল্লেখ করছি এ জন্য যে, আমি আমার কালের প্রায় সব চারুকলার শিল্পীকেই চিনতাম এবং তাদের সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তার মধ্যে বাস করতাম। এটা আমার জন্য ও আমার কবিতার জন্য সৌভাগ্যের কারণ হয়েছিল। জীবনের কোনো কিছুই বৃথা যায় না। আমি সব সম্পর্ক সূত্রগুলো এককালে নিজের মধ্যে জোড়া দিতে পেরেছি। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। শিল্পী কামরুল হাসান কী একটা প্রয়োজনে কিংবা উৎসবে বিলেত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। একদিন তিনি শিল্পকলা একাডেমিতে এসে আমার কামরায় প্রবেশ করলেন এবং বললেন,

–এই যে কবি, আমি লন্ডন যাচ্ছি।

–আমি বললাম, আমার জন্য কী আনবেন?

–বলো তোমার জন্য কী আনব?

আমি বললাম, আমার জন্য একটা খুব পাতলা গলা উঁচু সোয়েটার আনবেন।

ওই ধরনের সোয়েটারের প্রতি আমার লোভ ছিল, কারণ ইউরোপীয় লেখকদের প্রায় সবাই এ ধরনের সোয়েটার পরতে আগ্রহী ছিল। তাদের বইয়ে পেপারব্যাকের ব্যাক পেজে লেখক-লেখিকাদের যে ছবি ছাপা হতো তার প্রায় সব ছবিতেই আমি ওই ধরনের গলা ঢাকা সোয়েটার পরা ছবি দেখতাম।

সম্ভবত এই লোভেই আমি কামরুল ভাইকে আমার জন্য একটা গলাবদ্ধ উলের পাতলা সোয়েটার আনতে বলেছিলাম। কামরুল ভাই আমাকে খুব পছন্দ করতেন। তার প্রমাণ হলো তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে আমার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিয়েছিলেন এবং আকাশি রঙের একটা অসাধারণ আরামপ্রদ গলা ঢাকা একটা সোয়েটার আমার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। আমি এতই খুশি হয়েছিলাম কী আর বলব। আমার ইচ্ছা ছিল, কামরুল ভাইয়ের চিত্রকলার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তার ছবি বোঝার জন্য যে সময় ও শিল্পীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তা আমি করতে পারিনি। তবে তার স্নানরত নারীদের কয়েকটা ছবি আমার মনে গেঁথে আছে।

এভাবে আমার শিল্পকলার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। সুখেই যাচ্ছিল বলতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে আমার পেশাচ্যুত করে দীর্ঘ একটি বছর ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে আটকে রেখেছিলেন। এতে আমার এবং আমার পরিবারের অপরিসীম ক্ষতি হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও আমি স্বীকার না করে পারি না যে, তার আগ্রহে এবং নির্দেশেই আমার শিল্পকলার চাকরিটা হয়েছিল এবং একটানা উনিশ বছর সহকারী পরিচালক, উপ-পরিচালক ও পরিচালক রূপে আমি বিবর্তিত হতে পেরেছিলাম। এর জন্য যে প্রতিভা ও পরিশ্রম লাগে তা আমি উজাড় করে দিয়েছিলাম। বিনিময়ে পেয়েছিলাম এমন একটা জীবন, যা আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। সব মানুষের ভালো-মন্দ দুটি দিক থাকে। তার ওপর বিরাজ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনুষ্যত্ববোধ ও মানবীয় বিবেক। সেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমার বেলায় হৃদয়তার সঙ্গে প্রদর্শন করেছিলেন। এই রচনায় আমি কিছু বিষয় চেপে যাচ্ছি বলে অভিযোগ থাকলেও মোটামুটি কবিরা যে বিষয়কে অন্তরের সত্য বলে অনুভব করে তা গোপন করিনি। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক ঘটনা এবং অনেক মানুষ এখন আর বেঁচে নেই। আমি কবি বলেই হয়তো সব দুর্ঘটনার ফাঁকফোকর পেরিয়ে এখনও বেঁচে আছি। কারণ কবিতা মানুষের এক অনোপকারী কর্ম। তাকে নিতান্ত বাধ্য না হলে কেউ আঘাত করে না।

আমি অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। সবাই আমাকে কবি বলেই কিছু না কিছু দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু এমন মানুষও আছে, যারা আমার কাছ থেকে অর্থাৎ কবির কাছ থেকে কেড়ে নিতেও পারে। এই সম্ভাবনা আমার মধ্যে প্রতিনিয়তই আক্ষেপের সৃষ্টি করে।

যা হোক, ভবিষ্যতের কথা বা আশঙ্কা অগ্রিম আলোচনা করতে চাই না। তা ভবিতব্যের মতো ছেড়ে দিচ্ছি। রাসূল (সা.) কবিদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এমন একটা হাদিস আমি একদা পড়েছিলাম। আমাদের সমাজে ওইসব মহামূল্যবান হাদিসের চর্চা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

এ সময়ে আমার বিধবা মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। যদিও আমার সাধ্যমতো তাকে প্রতি মাসে কিছু অর্থ ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতাম। তিনি এতে সন্তুষ্ট থাকলেও মাসের পর মাস আমাকে ও আমার ছেলেমেয়েদের চেহারা দেখতে পেতেন না বলে আমার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। যে চাচির কাছে আমি মানুষ হয়েছিলাম তিনি আমাকে তার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসার সময় একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সেটা হলো, আমার নাকি কোনো পিছুটান নেই। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন। হতে পারে তার কথার মধ্যে কোনো কঠোর সত্য লুকিয়ে ছিল না, যা তিনি আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। এই চাচিও আমার কাছে আমার ঢাকার বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তখন আমি সম্ভবত ইত্তেফাকে কাজ করতাম। তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার সময় আমি খুব কেঁদেছিলাম। এর কারণ এই হতে পারে যে, আমি যে আমার সময়ের সামাজিক আচরণের এক ব্যতিক্রম ধরনের লোক, তা আমার চাচিআম্মা নির্ভুলভাবে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

এসব কথা আমি হয়তো বা 'যেভাবে বেড়ে উঠি' গ্রন্থটিতে কোথাও উল্লেখ করেছিলাম। যেটুকুর পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেটা এ জন্য যে, আমাকে শিশুকাল থেকে প্রতিপালনকারিণীরা আমার স্বতন্ত্র স্বভাবের পরিচয় ঠিকমতোই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং আমাকে নিয়ে তাদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। আমার স্ত্রীকে আমার চাচি আমার ব্যাপারে এমন কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে সে একদিনের জন্য আমাকে তার আওতার বাইরে থাকতে দেননি। এটা আমার আন্দাজ। অন্য কিছুও হতে পারে। তবে আমার মা ও চাচিকে এই বৃদ্ধ বয়সে আমার খুবই মনে পড়ে। মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় অপরিশোধ্য ঋণে তারা আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। আমি তাদের জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের মিনতি করি। কবির জীবন সবটাই উদ্‌ঘাটিত হওয়া অনুচিত। তবুও কবির জীবনও যেহেতু মানুষেরই জীবন, সে জন্য তার সৃজনরীতি ও কবিতাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে কবি এর অল্পবিস্তর আলোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি। আমি যা কিছু সুন্দর, নিখুঁত, লাবণ্যময় সেসবের প্রতি সারাজীবন আগ্রহী থেকেছি। সুন্দর কণ্ঠস্বর আমাকে বিমোহিত করে। এই সুন্দরের উৎস খুঁজতে আমি পুষ্পকে হাতে কচলে নষ্ট করে দিতে কোনোকালেও আগ্রহী ছিলাম না। আমি সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যকে ধারণ করেছি বিভিন্ন দেশ ও জাতির উৎস মূল থেকে। আমার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কোনো অবস্থাতেই কাজ করেনি। আজও করে না। সম্ভবত এ করণেই আমার কাছে যারা আসেন তারা আড়ালে-আবডালে আমাকে মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করলেও আমার কাছে এসে নিজেদের অনেক অন্তরের আক্ষেপ ব্যক্ত করতে পরাঙ্মুখ হন না। মনে হয় আমার মধ্যে তারা এক ধরনের নির্ভরতা খুঁজে পান। তারা জানেন, আমি কোনো অবস্থাতেই কারো অনিষ্ট চিন্তা করি না। এর একটা প্রমাণ হলো জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অনেক তরুণ-তরুণী আমাকে দীর্ঘক্ষণ সঙ্গদান, আমার সঙ্গে আহার্য গ্রহণ এবং আমার আনন্দতে আনন্দ প্রকাশ করে। চোখ নষ্ট হওয়াতে আমি যে পরনির্ভর হয়ে পড়েছি এটা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তারা বিবেচনা করে আমার লেখালেখি ও সৃষ্টির প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ না থাকলে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে কাটাত না। এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, সারাজীবন আমি নাগরিক ভাষা, নাগরিক সামাজিকতা ও আধুনিকতার চর্চা করলেও আমার মধ্যে একজন গ্রাম্য লোক বাস করে। এই গ্রাম্যতা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইনি। আমার পিতা-মাতা ও আমার সাবেক পরিবেশ, যা আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফেলে চলে এসেছিলাম তা ছিল পরিপূর্ণভাবে নাগরিক স্বভাবের। তৎকালীন কলকাতাইয়া চালচলন তাদের মধ্যে বেশ প্রকটিতভাবে ধরা পড়ত। আমার পিতা এবং আমার নানার ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুই ছিল কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাড়ির পরিবেশ সেভাবেই তারা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু আমি আশ্চর্যজনকভাবে ছিলাম গ্রামের লোক। এই গ্রাম্যতা মূলত এক ধরনের মানবিক সরলতারই নামান্তর মাত্র। এখানে স্বীকার করি যে, আমি বাংলার আদি গ্রাম সমাজের পরিচয় পেয়েছিলাম যখন আমি আমার চাচার সঙ্গে দাউদকান্দি এলাকার একটি গ্রামে ছিলাম। গ্রামটির নাম ছিল জগৎপুর। এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সম্ভবত বাংলাদেশে সহজলভ্য ছিল না। এই গ্রামের একটি স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে আমি সাধনা হাই স্কুলে লেখাপড়া করেছিলাম। পরে সীতাকুণ্ড গিয়ে আমি নবম শ্রেণীতে ভর্তি হই।

এর পরের জীবন সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় ফেরার কাহিনি। তবে আমার মধ্যে যে মৌলিক গ্রাম্যতা রয়েছে সেটা আমি পেয়েছি এই জগৎপুর গ্রাম থেকে। প্রকৃতিকে এমন নিবিড়ভাবে আমি আর কোথাও দেখার সুযোগ পাইনি। এখানে আমি কৃষক নর-নারীদের ফসল উৎপাদনের অদম্য স্পৃহার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। আমি তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই প্রকৃতির ব্যাপারে এমন অভিজ্ঞ হয়েছিলাম যে, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়-বাদলের ব্যাপারে আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারতাম। গৃহপালিতপশু-পাখিদের অভিব্যক্তি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারতাম। হয়তো বা পখির ভাষাও আমার খানিকটা আয়ত্তে এসে থাকবে। মোটকথা, আমার ভেতরে এক চিরস্থায়ী গোঁয়ার প্রকৃতির গ্রাম্য লোক বাস করে।

৪৩

আমার ব্যাপারে আমার চাচির ভবিষ্যদ্বাণীতে আমি অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম। আমি জানতাম, এ হলো এক অমোঘ সতর্কবাণী। কিন্তু আমি স্বভাবসুলভ কারণে হয়তো বা মেয়েদের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়তাম। তবে পর মুহূর্তেই আবার তাদের ভুলে যেতাম। এ জন্য আমার প্রতি আমার পরিচিত তরুণীদের গভীর ক্ষোভ ছিল। আমি এমনকি অত্যন্ত পরিচিত মেয়েদেরও নাম মনে রাখতে পারতাম না। অথচ তাদের সঙ্গে হয়তো বা অন্তরের যোগ সৃষ্টি হয়েছিল কোনো এক মুহূর্তে যা পরে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা হলো সহজেই কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লে তার দুকূল ছাপিয়ে যেত। পর মুহূর্তেই এক অদ্ভুত সংযম এসে আমাকে গ্রাস করে ফেলত। ক'দিন আগেও যার সঙ্গে আমার মাখামাখি হয়ে প্রায় দুর্নাম রটনার কারণ হয়ে উঠত, কয়েক দিনের মধ্যেই আমি ভাটার টানে শুকিয়ে যেতাম। হয়তো তার নাম ভুলে যেতাম। এ অবস্থা মেয়েদের নিশ্চয়ই খুব দুঃখ দেয়। তাদের হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। যে ছিল বন্ধু সে শত্রুতা শুরু করে। আমার দুর্নাম রটায়। শিল্পকলায় চাকরির শেষ দিকে এসে সেটা আমার জন্য খুব বিব্রতকর হতে থাকে।

সে সময় আমার মধ্যে কিছু একটা ঘটেছিল, যাতে আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলা, চা খাওয়া বা আড্ডা মারা সব মুলতবি করে দিলাম। কবিদের চিন্তা আমার মধ্যে কাজ করে গেলেও লেখার পরিশ্রম করতে অনেক সময় আমি আলস্য অনুভব করতাম। একটি লাইন হয়তো মনে গুঞ্জন করে চলছে কিন্তু তা না লেখার কারণে পর মুহূর্তে হারিয়ে যেত। আমি সাধারণত মনে কোনো লাইন বা পঙ্‌ক্তির উদয় হলে তা সঙ্গে সঙ্গেই হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তার ওপর লিখে রাখতাম। এমনকি সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে তার ওপর লিখে রাখতাম। কিন্তু এখন এক অদ্ভুত বিষয় এসে আমাকে লেখার পরিশ্রম করতে এক ধরনের আলস্যের সৃষ্টি করে।

পরবর্তী সময়ে আমার এর জন্য আক্ষেপের সীমা ছিল না। আগে যেমন মেয়েরা আমার প্রতি অযাচিতভাবে অনুগ্রহ দেখিয়েছে সেটা কমে আসতে লাগল। বরং তাদের এই অকাতর ভালোবাসার প্রতিদান না পেয়ে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আমার দুর্নাম রটাতে লাগল। আমার সম্বন্ধে মিথ্যা গালগল্প ছড়িয়ে পড়ল আমার পরিবেশের বাইরে। আমি অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম।

এ সময় এ পরিস্থিতিতে আমার একটি কাব্যসমগ্র প্রকাশের আয়োজন চলছিল। সব কবিতাই মোটামুটি আমি ও আমার প্রকাশক খুঁজে পেয়ে এতে মুক্ত করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছিলাম। কিন্তু একটি বিশেষ কবিতা, যা কয়েকটি মাত্র লাইন আমার স্মৃতির ওপর মাছের মতো ঘাঁই মেরে মিলিয়ে যেত। কথা প্রসঙ্গে এ কথা আমি হয়তো বা কোনো এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করে থাকব। এ প্রসঙ্গ ধরে সিলেট থেকে এক মহিলা আমাকে জানালেন, কবিতাটি তার কাছে সংরক্ষিত আছে। যদি আমি নিজে গিয়ে কবিতাটি আনি তাহলে তিনি তা আমাকে দেবেন। শর্ত হলো আমাকে নিজে তার কাছে যেতে হবে। তাহলে তিনি কবিতাটি আমাকে দেবেন। আমি এই প্রস্তাবে প্রমাদ গুনলাম। বিষয়টি আমার স্ত্রীকে উল্লেখ করলে তিনি একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন। শব্দটি হলো 'হারামজাদী'।

আমি স্থির করলাম, ওই কবিতাটি ছাড়াই আমার সমগ্র প্রকাশিত হবে। আমার এই প্রতিজ্ঞার কয়েকদিন পরেই সিলেট থেকে একটি অযাচিত চিঠি পেলাম, সঙ্গে ওই আস্ত কবিতাটি। পরে অবশ্য আমার আক্ষেপের সীমা ছিল না। কারণ এই ঘটনার পর ওই সিলেটি মহিলার আমি আর কোনো খোঁজ পাইনি। তার ঠিকানায় চিঠির পর চিঠি দিয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি। চিঠি ফিরে আসতে লাগল। এভাবে আমি, আমার এক প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে হারালাম। হয়তো সে আজও বেঁচে আছে কিংবা নেই। আমি ঠিক জানি না। তবে তার প্রতি আমার হৃদয়ের এক অকৃত্রিম ভালোবাসা আমি অনুভব করি। আমি মন্দলোক সন্দেহ নেই কিন্তু আমার পরিচিত কোনো নারীই আমাকে মন্দলোক বলে কোনো দিন গালি দেয়নি। তাদের অনেকেই আমার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিহিংসার তাপ ব্যক্ত করেছে, কিন্তু আমার মৃত্যু কামনা করেনি। আমার ধ্বংস কামনা করে বদদোয়া করেনি। এর কারণ কী, তা আমার কাছে রহস্যাবৃত।

আমার মনে আমার পীর সাহেব হুজুর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মাঝে মধ্যে আমি তার কাছে হাজির হতাম। পীর সাহেবের স্মরণোৎসব হতো কক্সবাজার থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কুমিরাঘোনা নামক জায়গায়। সেখানে একটি অসাধারণ মসজিদ তিনি গড়ে তুলেছিলেন। আমি মাঝে মধ্যে সেখানে গিয়ে হাজির হলে তিনি আমাকে দেখে খুব বিব্রতবোধ করতেন বলে মনে পড়ে। অবশ্য আমার আদর-যত্নের কোনো কমতি সেখানে ছিল না। তিনি আমার জন্য সব সময় দোয়া করতেন বলে আমি হৃদয়ে অনুভব করতাম।

তার প্রভাবেই কি-না জানি না, আমার মধ্যে অদৃশ্যকে জানার এক গভীর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো। আমি এ সময় আল্লাহর জিকির শুরু করলাম এবং মাঝে মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে অদৃশ্যকে দেখার বাসনা কিংবা আলোর কোনো ছিটেফোঁটা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। এই অবস্থা আল্লাহর রহমতে আমি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এতে অবশ্য আমার জীবনে অন্য কিছু না ঘটলেও আল্লাহ্ আমাকে অনেক লোভনীয় বিষয় থেকে সংযম দান করলেন। পার্থিব কোনো বিষয় থেকে আমার আকর্ষণ কমে এলো এবং সাহিত্যচর্চার নিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেল। ফলে একদা আমি যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলাম না সেসব ক্ষেত্রে প্রধান কবি পুরুষরা আমার অজান্তেই আমাকে তাদের প্রতিযোগী করে তুলল, এতে আমার সামান্য কোনো হাত ছিল না। আমি কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টাও করিনি। কিন্তু আমার ভাগ্য এবং আমার গভীর বিশ্বাস, যাকে আমরা ঈমান বলি, আমাকে প্রাধান্যের বিপরীতে অন্য ধরনের এক প্রাধান্য দান করল। এটা এক অলৌকিক নির্দেশ বলে আমার মনে প্রতীয়মান হতে লাগল।

এখানে একটা কথা আমি কোনো ছলচাতুরি না করেই বলতে চাই। সেটা হলো- বিশ্বাসী কবি বলে আমার একটা পক্ষ আছে বলে আমি মনে করতাম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমার কোনো পক্ষই ছিল না। ছিল না যে তার প্রমাণ তো কয়েক দিন আগেও আমাকে দারুণভাবে মর্মাহত করেছে। যা হোক এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু উল্লেখ করতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই, আমার শত্রুদের চেয়ে আমার মিত্ররা আমার অধিক অনিষ্ট সাধন করেছে। যেহেতু আমি বিশ্বাসী মানুষ, আমি বিশ্বাস করি, এর পরিণাম তারা ভোগ করে যাবে।

ইতিহাসের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়, যা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত তা আমি পাঠ করেছি এবং এ ধরনের পরিস্থিতির আক্ষেপজনক পরিণতির কথা আমার জানা আছে। মূর্খতাকে কোনো অবস্থাতেই আমি আমার জীবনে সম্মান দেখাইনি। তবে দায়িত্বজ্ঞানহীন মূর্খতা নেতৃত্বের আসনে থাকলে তাকে মুখ বুজে মেনে নেওয়া ছাড়া আমি কোনো গত্যন্তর দেখি না। আমি বিদ্রোহী হতে চাই না। আমি গোত্রের শৃঙ্খলা ভেঙে বিপথগামী হতে চাই না। এ জন্য আল্লাহর কাছে আমি প্রতিদান আশা করি।

যাই হোক, এই বর্ণনার ধারাবাহিকতা থেকে আমি একটু আগে চলে এসেছি। আবার প্রত্যাবর্তন না করলে আমি সঠিকভাবে আমার বৃত্তান্ত পূর্ণ করতে পারব না। শিল্পকলায় আমার চাকরির একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আর কিছুদিন পরই আমার অবসর জীবন শুরু হবে। এই শেষ দিকে এসে বাঙালিদের অন্য বৃহত্তম শহর কলকাতায় আমার কাব্য ও সাহিত্যচর্চার ওপর আকস্মিক আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা শুরু হয়ে গেল। ড. সুমিতা চক্রবর্তী বলে এক মহিলা আমার ওপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করলেন। প্রবন্ধটিতে আমার তীব্র সমালোচনা থাকলেও আমার কবিতার যথেষ্ট প্রশংসা ছিল। এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পরেই সুমিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ হয়েছিল। অন্নদাশংকর রায় ওই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন। আর আমি ছিলাম বিশেষ অতিথি। সুমিতা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের সম্ভবত তখন প্রধান ছিলেন। তিনি অনেক বিষয় আলোচনা করেছিলেন, যা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু সাক্ষাতে আমি তার সঙ্গে কোনো তর্কে যাইনি। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, তিনি আমার দৃষ্টিতে এক সুন্দরী যুবতি বলে প্রতিভাত হয়েছেন। আমি সুরূপা, লাবণ্যময়ী কোনো ঈভের সঙ্গে বিতর্কে জড়াই না।

শুধু সুমিতা চক্রবর্তী নয়, তখন অনেক পত্রপত্রিকায় আমার গল্প, কবিতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়, যা আমার জন্য অত্যন্ত সুফলদায়ক হয়েছিল। কলকাতায় আমার এসব প্রশংসা, আমার ঢাকার শত্রু পক্ষ যেমন সইতে পারছিল না, তেমনি আমার তথাকথিত মিত্র পক্ষ একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল। কবির ভাগ্য কে নির্ধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে? আমি জানি, বিশ্বাসী কবিদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন তার প্রভু স্বয়ং। এটা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। তা না হলে আমি এখন আমার জাতির মধ্যে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে অনেক বড় কবিও উপনীত হতে পারেন নি। অনেক হতভাগ্য কবিকে আমি আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। যাদের গৃহে পিপাসার ঠাণ্ডা পানি থাকলেও তারা তার সন্ধান পাননি। তৃষ্ণার্ত হয়ে খানাখন্দ, নোংরা ডোবার পানি পান করতে যত্রতত্র ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমাকে আল্লাহ সেই দুর্ভাগ্য থেকে সব সময় রক্ষা করেছেন। অবশ্য এ জন্য আমি আমার প্রভুর কাছে সর্বদা সংযমের জন্য আকুল মিনতি জানিয়েছি। আজও জানাই।

পৃথিবীকে দেখার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে বলে আমি উপলব্ধি করি। একটা হলো বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি। আরেকটা হলো কবির উদাসী স্বপ্ন ও কল্পনার যুক্তি, অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। যারা বাস্তবতার মধ্যে হিসাব করে বেঁচে থাকেন তারাই ভালো থাকেন—এটা মনে করা হয়। কিন্তু আমি অবাস্তব স্বপ্নদ্রষ্টা, অসহায়ের দলে পড়ি। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ কিছু হারালে হা-হুতাশ করে। কিন্তু আমার শত দিক থেকে হারানোর ভয় থাকলেও আমি হা-হুতাশ করি না। আর যদি দীর্ঘশ্বাস ধরে না রাখতে পারি তাহলে তা কবিতা হয়ে বের হতে থাকে। এটাই আমার অদৃষ্টলিপি।

এই নিবন্ধটি রচনা করার সময়েই, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাকে এক ভক্ত টেলিফোন করে জানালেন, তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কৃত করতে চান। শর্ত হলো পুরস্কারটি গ্রহণ করার জন্য আমাকে তার গ্রামের বাড়িতে যেতে হবে। আমি যখন তাকে বললাম, আমি বৃদ্ধ, অশক্ত মানুষ। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে এত যত্ন করে নিয়ে যাওয়া হবে যে, আমি ছয়-সাত ঘণ্টার ভ্রমণ টেরও পাব না। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। কবিদের জন্য এই অযাচিত অলৌকিক টেলিফোন কোথাও না কোথাও থেকে বেজে উঠতেই থাকে। তা না হলে নিজের পক্ষের লোকরা যখন ক্রমাগত দুঃখের আয়োজন করে তখন কবির জন্য অপার্থিব সুখের আয়োজন করেন তার রব। তার প্রতিপালক।

৪৪

দেখতে দেখতে আমার অবসর গ্রহণের সময় এসে গেল, আমি ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করে এলপিআরে চলে গেলাম। সাধারণত দেখা যায় যে, বিষণ্ন মন নিয়ে সরকারি কর্মচারীরা অবসর মেনে নেয়। কিন্তু আমার বিষয়টা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো, দারুণ মানসিক আনন্দের মধ্যে আমি শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে বেরিয়ে এলাম। শিল্পকলায় থাকতেই বিভিন্ন পত্রিকায় আমি লেখালেখি করতাম এবং সেটা ছিল নিয়মিত লেখালেখি। ফলে অবসরকে আমার অবসর মনে হলো না। আমি দৈনিক সংগ্রামে এসে বসার চেয়ার ও টেবিল পেয়ে গেলাম। মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী বারো হাজার টাকা মাসোহারায় আমার একটা কাজ জুটে গেছে, এতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আনন্দের সীমা ছিল না। মগবাজারের পীর পাগলার গলিতে একটি বাসা নিলাম। এখান থেকে দৈনিক সংগ্রামে আমার আসা-যাওয়া সুবিধাজনক ছিল। তবে এই বাড়িতে পানির খুবই কষ্ট ছিল। হিসাব করে পানি দেওয়া হতো। যা আমার পরিবারের জন্য ছিল অপর্যাপ্ত। আমার স্ত্রী জলকষ্ট সহ্য করতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত এই বাড়িতে আমাদের পক্ষে পানির জন্য ঝগড়াঝাঁটি করে টেকা সম্ভব ছিল না। ঠিক এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের একটি আমন্ত্রণ এসে হাজির হলো। মির্জা গালিবের ওপর একটি অনুষ্ঠানে আমাকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল 'ওল্ডহাম' সিটিতে। সেখানে এলিজাবেথ হলে অনুষ্ঠানটি হওয়ার আমন্ত্রণলিপি পেয়ে আমি দারুণ খুশি হলাম। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা সেখানে সমবেত হয়ে মির্জা গালিবের ওপর তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। সেখানে কোনো বাঙালি কমিউনিটি সম্ভবত আমার নাম প্রস্তাব করে থাকবে। ফলে আমাকে বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। সহজেই ভিসা, ইত্যাদি পেয়ে গেলাম। যতদূর মনে পড়ে আমার সঙ্গে কবি রুবি রহমানও আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি গেলেন না। আমি একাই যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমালাম।

ম্যানচেস্টার এয়ারপোর্টে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিসের জনৈক কর্মকর্তা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তার সঙ্গে সেখানকার বাঙালি কমিউনিটির একজন তরুণ যার বাড়ি ছিল সিলেটের বিশ্বনাথে তিনি আমাকে বললেন, আপনি হোটেলে না গিয়ে আমার বাসায় চলুন, সেখানে বরং হোটেলের চেয়ে আপনার জন্য উত্তম ব্যবস্থা থাকবে। যে কয়দিন যুক্তরাজ্যে থাকবেন ততো দিন, ঘরোয়া পরিবেশ আপনার জন্য সুবিধাজনক হবে। আমার পরিবারে আমার স্ত্রী ও দুটি শিশুকন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি এ ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করে ওই তরুণের সঙ্গে যেতে সম্মত হলাম এবং সেটা আমার জন্য শেষ পর্যন্ত অনেক আনন্দদায়ক হয়েছিল। ওখানে থেকেই আমি লন্ডন, গ্লাসগো, ম্যানচেস্টার ও ওল্ডহামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পেরেছিলাম। আমার এই ভ্রমণের কাহিনি আমি 'কবিতার জন্য সাতসমুদ্র' বইটিতে উল্লেখ করেছি। এই আমন্ত্রণে ভারত থেকে জাবেদ ইকবাল ও তার স্ত্রী শাবানা আজমি এসেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে আমার ভালো একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। শাবানা আজমি অভিনীত কোনো এক উর্দু কবির জীবন অবলম্বনে 'হিফাজত' নামে একটি ছবি তখন প্রদর্শিত হয়েছিল। ওই প্রদর্শনীর শোতে আমি উপস্থিত ছিলাম। কবির চতুর্থ স্ত্রী সুন্দরী ছিল। তার সাধ হয়েছিল তিনিও কবি হবেন এবং নানা মোশায়েরায় তিনিও অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। তার এই কবি হওয়ার প্রয়াসটি ছিল অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও হাস্যকর। শাবানা ওই গায়ের জোরে কবি হওয়ার চেষ্টাটি খুবই সুন্দরভাবে রূপ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভূমিকাটি ছিল অত্যন্ত ছেনালিপায় পূর্ণ নারীর ভূমিকা। ছবিটা আমার মাঝে শাবানার অভিনয় গুণে খুবই আকর্ষণীয় বোধ হয়েছিল। ম্যানচেস্টারের গ্লাসগোতে এসব সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম। এতে অবশ্য বিলাতে বসবাসকারী বিপুল বাঙালি সমাজের সঙ্গে আমার একটি সমর্থক গোষ্ঠী খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি যেখানেই কবিতা পড়তে গেছি সেখানেই হলের কোনো এক দিক থেকে প্রবল হাততালির শব্দ শুনতে পেতাম। এরা ছিলেন সবাই বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিরাও এর সঙ্গে মিশে থাকতেন এবং আমাকে সমর্থন করতেন। এভাবে আমার বিলাত ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক হয়েছিল।

লন্ডনে থাকতে আমি 'টাওয়ার হেমলেট' এলাকায় যে বিশাল মসজিদ রয়েছে এরই একজন কর্মকর্তার সঙ্গে অবস্থান করতাম। আমি ফজরের নামাজ পড়ে আবুল খায়ের নামে ওই ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নিদ্রিত লন্ডনে অবস্থান করার পর স্কটল্যান্ডের রাজধানী গ্লাসগোতে ফিরে যাই। সেখানে জসিম বলে এক ভদ্রলোক আমার ভক্ত ছিলেন। তার আমন্ত্রণে তার বাসায় কিছু দিন ছিলাম। তখন গ্লাসগোতে দারুণ শীত ও তীব্র বাতাসের ধাক্কা পোহাতে হয়েছিল। এভাবে মীর্জা গালিবের অনুষ্ঠানের আয়োজন শেষ হলে আমি ঢাকায় ফিরে আসি।

আমি ফিরে এসে দেখি আমাদের বাসা বদল হয়ে গেছে। পীর পাগলার গলি থেকে আমার ছেলেমেয়েরা চলে গেছেন মীরবাগের গভীর অভ্যন্তরে। যতদূর মনে পড়ে এ সময় এক অকাল বন্যায় ঢাকা ডুবে গিয়েছিল। আমরা যে বাসায় থাকতাম তার নিচতলায় পানি উঠে গিয়েছিল, আমরা থাকতাম চারতলায়, কোষা নৌকা করে আসা-যাওয়া করতে হতো। বাসার টেলিফোন অচল হয়ে গিয়েছিল। তবে সংগ্রামের টেলিফোনে আমাকে জানানো হয়েছিল মাদাম নোয়েল গানিয়ে বলে একজন ফরাসি ভদ্রমহিলা বাংলা একাডেমিতে আমার খোঁজখবর নিয়ে আমার বাসায় আসার জন্য চেষ্টা করে ফিরে গেছেন। আমি যেন তার সঙ্গে পরের দিন সাক্ষাৎ করি। ওই মহিলাই আমার একটি গল্প 'কালো নৌকা' ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে 'এশিয়া ওসেনিয়া' নামে একটি সঙ্কলনে প্রকাশ করেছিলেন এবং তার সম্মানীও আমাকে দিয়েছিলেন। আমি তার সঙ্গে বাংলা একাডেমিতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলাম।

সম্ভবত এই বাংলা একাডেমিতেই তার কাছে আমার বিরুদ্ধে কোনো এক প্রগতিশীল লেখিকা আমি যে মৌলবাদী তথ্য জানিয়ে দিয়ে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এতে আমার লোকসানের চেয়ে লাভই হয়েছিল বেশি। আমি মাদাম নোয়েলকে বলেছিলাম, তার সাথে আমার পরে সাক্ষাৎ হবে প্যারিসে। তিনি চমকে উঠেছিলেন। যা হোক কয়েক বছর পরই আমি প্যারিসে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। যদিও তার সঙ্গে আমার চাক্ষুস সাক্ষাৎ ঘটাতে পারিনি, কিন্তু আমার মেসেজ পেয়ে 'লা মেনে ভে' পত্রিকায় টিভি চ্যানেলে তার ঘরে-বাইরে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে তিনি আমাকে লিখিত আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি তখন ঢাকায়। আমার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত একদল লোকের ক্রমাগত বিরোধিতার মুখে স্পেন ভ্রমণের সুযোগ মুলতবি রেখে অতন্ত্য মনোকষ্টের মধ্যে প্যারিসে অবস্থান করছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমাকে ইউরোপ ভ্রমণ মুলতবি রেখে বিশেষ করে মাদ্রিদে কর্ডোভায় ভ্রমণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐকান্তিক ইচ্ছা বাতিল করে ঢাকায় ফিরে আসতে হয়। এই আক্ষেপ আমি সারা জীবনের জন্য আমার অন্তরে গোপন করে রেখেছি। আমি এর প্রতিশোধ নেওয়ার মতো সুযোগ ও উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি তা করিনি। স্বভাবসুলভ কারণেই আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারি না। বরং নিজেই নিজেকে গুটিয়ে আমার প্রভুর কাছে মামলা সোপর্দ করে দিয়ে বাঁচি।

আমি ঢাকায় ফিরে এসে গভীর আবেগের সঙ্গে কিছু ছন্দসমৃদ্ধ কবিতা রচনা করি। আমার সৌভাগ্য এই যে, কবিতাগুলো বহুল প্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশ পেয়ে বাংলা কবিতায় আন্তর্জাতিক মেজাজের জানান দিতে পেরেছিল। ভাগ্যের কথা এই যে, আমি সারা জীবন আমার ওপর আপতিত বিপর্যয়ের সময় কবিতা লিখতে পেরেছিলাম। সব সময় অবশ্য পারা যায় না। কিন্তু আমি তা কম-বেশি পেরেছি বলেই সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্যে উপস্থিতি সব সময় গ্রাহ্য হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে, আমার চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে বিনিময় সম্ভব এমন চরিত্র আমার বন্ধুদের মধ্যে একজনের ছিল না। কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার কোনো সুযোগ আমার জোটেনি। এ ধরনের মুহূর্তে দৈব এসে আমার সহায়তা করে। অতীতেও করেছে।

আমি হিসেবি মানুষদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত। কারণ আমি নিজে বেহিসেবি। মনে পড়ছে আমি যখন সংগ্রামে কাজ করি তখন দু-তিনজন প্রতিভাবান সাংবাদিকের সঙ্গে আমার গভীর আন্তরিকতার সুযোগ হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন হলেন মাসুমুর রহমান খলিলী, তিনি তার এক ব্যবসায়ী বন্ধুকে ম্যানেজ করে এবং আমাকে উপদেষ্টা করে 'পালাবদল' নামে একটি পত্রিকা বের করেছিলেন। ওই পত্রিকাটি ধীরে ধীরে যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন সেখানে একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে। আমরাই তাকে ডেকে এনেছিলাম। তিনি এসে কাগজ-কলম নিয়ে লাভ-লোকসানের হিসাব কষতে শুরু করলে আমরা ঘাবড়ে যাই। কিন্তু পত্রিকায় আমি 'ডাহুকি', 'উপমহাদেশ' ও 'কবিলের বোন' নামক তিনটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলাম। যা আমাকে বাংলাদেশের উপন্যাসের কম-বেশি খ্যাতি এনে দিয়েছিল। আজ এসব কথা ভাবলে মনে হয় সময় আমাদের কোনো সময়ই নিষ্ক্রিয় রাখেনি। কালচক্র ঘুরছে, আমরাও ঘুরছি। আমি 'কাল'কে গালমন্দ করি না।

৪৫

অল্প বয়সে কবি, শিল্পী সাহিত্যিকদের যৌন সংযম থাকে না। সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণের কারণেই সম্ভবত এই সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। তবে আমি যেহেতু অতি অল্প বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, সে কারণে এ ব্যাপারে আমার দ্বারা এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, যা লোকলজ্জায় লজ্জিত হতে হয়। আমি বারবার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে নিজের আকাঙ্ক্ষা মোটানোর উপায় আমার ঘরেই পেয়ে সুস্থ ছিলাম। ফলে আমি কাব্যচর্চায় আন্তরিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পেরেছি। লেখকের অল্প বয়সে যৌনতৃপ্তির সহায়ক হিসেবে আমি বিবাহকেই উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে সমর্থন করি। এতে অনেক উপকার হয়। আমি অনেক তরুণ কবিকে তাদের সামনেই বলে থাকি, তোমার এই বান্ধবীটিকে বিয়ে করে ফেল না কেন? এতে অবশ্য উভয়েই আঁৎকে উঠে আমাকে বলে, বলেন কী মাহমুদ ভাই! নিজেরই আহার জোটে না আপনি আবার নতুন বিড়ম্বনার উপায় বাতলে দিচ্ছেন?

আমি তাদের বলি, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে কাবিনে সই করে একজন অন্যজনকে ভালোবেসে বরণ করো। দেখবে রিজিকের ব্যবস্থা চিরকাল যিনি করেন, পোকা-মাকড় থেকে মানুষ পর্যন্ত তিনি তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করবেন। তারা আমার কথা বিশ্বাস করে না। তারপর একদিন দেখা যায় যে, সঙ্গী বা সঙ্গিনীটি হাতছাড়া হয়ে যায় পরস্পর দুর্বহ জীবন কাটায়।

জীবন হলো আমার বিবেচনায় অদৃষ্টনির্ভর ব্যাপার। কেউ এটা মানে, কেউ মানে না। আমি তা মেনে এসেছি এবং কিছু দুর্ভোগের কথা বাদ দিলে সুখে জীবন কাটিয়েছি।

আমি ইউরোপ থেকে ফিরে এসে সস্ত্রীক গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের লোভ-লালসা এবং বেদখল দেওয়ার প্রবৃত্তির কারণেই প্রতিহত হয়ে আবার যেই কি সেই অর্থাৎ চিরকালের ঢাকায় ফিরে আসি। অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি যে, আমার বেঁচে থাকার প্রকৃতপক্ষে কোনো আশ্রয় অবশিষ্ট নেই। সব বেদখল ও বেনামি হয়ে গেছে। আমি ভাড়া বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়ে বেঁচেছি।

কবি-সাহিত্যিকদের জন্মবাড়িটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাই-ব্রাদাররা নিজেদের স্বার্থের কারণে দখল করে নেয়। কবিরা সেটি ফেরত পাওয়ার জন্য আইনসঙ্গত লড়াইয়ে নামতে ব্যর্থ হলে আর কোনো দিন সেটি ফেরত পান না। আমারও হয়েছে সেউ অবস্থা। অথচ আমার স্ত্রী প্রায়ই আমাকে অভিযোগ করে বলেন, আমার বাপ আমাকে যে বাড়িতে তোমার বউ করে পাঠিয়েছেন সেই বাড়িতে যদি একটি খড়ের ঘরও বানিয়ে দিতে আমি সেই বাড়িতে সুখে থাকতাম। আমি তার এই কথা শুনে চুপ করে থাকি। ভাবি সরকারের উচিত কবির জন্মভিটা দেশের শিল্পী-সাহিত্যের স্বার্থে তা সংরক্ষণ করে কবিদের দর্শনীয় স্থানে পরিণত করা।

আমি কী ভুলতে পারি আমি কোন ঘনটিতে জন্মেছিলাম? কোন উঠোনে খেলেছিলাম? পারি না। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে তা ভুলিয়ে দিতে চায়।

'যেভাবে বেড়ে উঠি' বইটিতে আমার উদ্ভব কিছু নস্টালজিক বিবরণ দিয়েছি। কী করব, আমি তো ভুলতে পারি না। আমি যখন বিলেত ছিলাম তখন আমার ছোট দুই ছেলে চতুর্থ ও পঞ্চম, ভারতে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র ছিল। আমি বিলেতে থাকতেই তাদের প্রায় লাখ দুয়েক টাকার প্রয়োজন পড়ে গিয়েছিল। বিলেতে আমার উপার্জনের অর্থও ছিল সমপরিমাণ। আমি সেখান থেকেই তাদের নামে প্রয়োজনীয় টাকাটা পাঠিয়েছিলাম। বলা যায় ঢাকা ফিরে আসি শূন্যহাতে। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগের অবস্থা যেমন ছিলাম। ঢাকায় অভাব ও দরিদ্র লেগেই ছিল। ফলে অবিশ্রাম লেখার বাসনা জেগে উঠেছিল। বাসনা না বলে বলা উচিত প্রয়োজনের তাগাদা। এ সময় অযাচিতভাবে কুষ্টিয়া থেকে আমার এক ভক্ত মহিলা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তার নাম উল্লেখ এত দিন পর শোভন হবে না। তিনি আমাকে ভেঙে পড়তে নিষেধ করে তার কাছে খোলামেলা নিজের বিপদ-আপদের কথা লিখতে বলেছিলেন। বিনিময়ে আমি তাকে কিছুই দিইনি। তবে তার অনুমতি ছাড়াই আমার একটা খুব উল্লেখযোগ্য বই তার নামে উৎসর্গ করেছিলাম। হয়তো তিনি আজও জানেন না। কিংবা জানলেও এ ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেননি। মাঝে মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম কিংবা এতদাঞ্চলের কোনো এলাকায় চাকরি বিষয়ে ডিউটি দিতে এলে মালিবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে আমাকে টেলিফোনে সেখানে সাক্ষাৎ করতে বলতেন। সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলে বলতেন—চলুন আমাকে একটা স্কুটারে গাবতলী গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসবেন। আমি তার সঙ্গে রওনা হলে তিনি খুবই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হতেন। আমি এর কোনো অর্থ খুঁজে পেতাম না। মনে হতো অকারণ আনন্দ। আমি তাকে বাসে বসিয়ে বাস না ছাড়া পর্যন্ত তার পাশে বসে থাকতাম। এতে তিনি একেবারে বিমোহিত হয়ে যেতেন, কেন তার এই অবস্থা হতো সে রহস্য আজও উন্মোচন করতে পারিনি। বিনিময়ে আমি তার জন্য কিছুই করতে পারিনি। তবে আল্লাহর কাছে তার জন্য প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, তার শরীরে একটি দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বেঁধে আছে। কিন্তু বাইরে থেকে তাকে স্বাস্থ্যবতী ও অটুট দেহ-লাবণ্যের অধিকারী বলে মনে হতো।

কবির জীবন সামাজিক মানুষের সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকে। কিন্তু সামাজিক মানুষ কবিদের দুঃখ-বেদনা-যাতনা ও উদ্ভাবনার ব্যাপারে সব সময় উদাসীন থাকে। আর সবাই কবিকে ঠকাতে চায়। এটা আমি এত ভালোভাবে জানি যা হৃদয়বিদারক। কিন্তু জেনেও আমি বারবার ঠকতে রাজি হয়ে যাই। এটা হয়তো বা আমার বৈশিষ্ট্য। কিংবা জন্মগতভাবে অর্জিত।

আমার কথা হলো আমি স্বার্থপরের মতো জীবন কাটাতে ব্যর্থ হয়েছি। প্রেম-পিরিতের ব্যাপারে যেমন কথাটা সত্য, বৈষয়িক ব্যাপারেও সত্য। ধন-সম্পদ আগলে কোনো মানুষই তা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। মানুষের পরমায়ু আর কত দিনের। আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞ না হলেও বিজ্ঞও নই। আমি একটি কবিতা রচনা করে জীবনে যে আনন্দ পেয়েছি অন্য কোনো কিছু আমাকে তা দিতে পারেনি।

আমি বিলেত থেকে ফিরে বাড়ি গিয়েছিলাম। তখনও আমার মা জীবিত ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন।

আমাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কয়েক দিন থাক। থাকবি না?

আমি বললাম, থাকব।

তাহলে তো বউকে নিয়ে এলেই পারতি। আমি এর কোনো জবাব দিলাম না। কারণ আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, তিনি আমাকে বলেছিলেন এই সময়ে তিনি ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে নড়বেন না। আসলে আমাদের বাড়ির প্রতি নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে তার একটা বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। বলতেন গিয়ে কী করব বলো? আমারই বাড়ি আমারই ঘর সেখানে গায়ে পড়ে পর হয়ে গিয়ে বেড়াতে বলো। যাও তুমিই যাও। তোমার মোহ আছে, আমার ওসব নেই। আমি কয়েক দিন সেখানে থেকে তিতাস পার হয়ে অপর পাশের রাখাল, চামাড়, মুচি, ঋষি জাতীয় পরিবারগুলোর মধ্যে ঘোরাফেরা করে একটি উপন্যাস বা বড় গল্পের উপাদান সংগ্রহ করে ফিরে এলাম এবং লিখলাম একটি হৃদয়বিদারক কাহিনি।

গল্পটির নাম দিলাম 'নিশিন্দা নারী'।

আমার ভাই-বোনদের মধ্যে এক বোনের নাম লাইলি। যে বোনের সঙ্গে আমার সদ্ভাব এবং সহৃদয়তা সব সময় আমাকে মুগ্ধ করে। এখন বিধবা। বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হলেও আমার ধারণা সে খুবই অসুখী। পুত্ররা তার তেমন বাধ্য নয়। তবুও তার কন্যারা তার খুবই অনুগত। এদিক দিয়ে আমার বোন খুবই সুখী। এই বোনই মাঝে মাঝে আমার গুলসানের বাড়িতে এসে আমার দুঃখ-বঞ্চনায় সহানুভূতি জাগিয়ে যায়। এই সহোদরা আমার বাড়িতে এলে আমার খুবই আনন্দ লাগে। মনে পড়ে যায় আমরা অত্যন্ত দারিদ্রের সংসারে পাশাপাশি বড় হয়েছি। এ নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তবে অনুতাপ করি না। বলি আমাদের জীবনও ভালোই কেটেছে।

খ্যাতি-প্রতিপত্তি একেবারে কম জোটেনি। আমার এই সহোদরা আমাদের অনাহারক্লিষ্ট অতীতের সাক্ষী। আমরা দুঃখের দিনের কথা ফিস ফিস করে করে আলোচনা করি। যখন আমরা বিশাল খাওয়ার টেবিলে সুগন্ধি সুখাদ্য মাছ, মাংস, শাক, শুঁটকি থেকে গরম ধোঁয়া উঠছে তখন আমরা আমাদের পিতা আমাদের জন্য উপযুক্ত আহার সংগ্রহ করতে না পারার বেদনার কথা, অসহায়ত্বের কথা আলোচনা করি। অনুচ্চ কণ্ঠে যাতে ছেলেমেয়েরা শুনতে না পায়। কারণ তারা প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছে। অবিশ্বাস্য দারিদ্র্যের কথা শুনে তাদের আনন্দ যদি স্তিমিত হয়ে যায়! এই ভয়ে আমরা নিচুস্বরে কথা বলি এবং টেবিলের ওপর ছড়ানো রিজিকের জন্য রিজিকদাতা মহান আল্লাহর প্রশংসা করি। আর এই দারিদ্র্যের কথা উঠলেই আমরা আমাদের মায়ের প্রশংসা করি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধনী লোকের মেয়ে। বলা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক রাজসিক বাড়ির কন্যা। বাপের বাড়ি থেকে কড়ায়গণ্ডায় নিজের অধিকার বুঝে নিয়েছিলেন, আর সব উজাড় করে দিয়েছিলেন আমার বাপের বেকারত্ব আর রুজি-রোজগার না করতে পারার আক্ষেপকে মুছে ফেলার আশায়।

আমরা আলোচনা করি আমার পিতা ও মাতার এই দুই বিপরীতের গভীর প্রেমের অটুট সম্পর্ক নিয়ে। তারা পরস্পরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এ কথা উঠলেই আমরা ভাই-বোন অর্থাৎ আমি ও লাইলি হেসে উঠতাম। উচ্ছ্বসিত হাসি। যেন এর চেয়ে সুখের কোনো স্মৃতি থাকতে পারে না। আসলেও ছিল না। দুঃখে-দারিদ্র্যে-সচ্ছলতায় আমার পিতা-মাতার গভীর সম্পর্কের বিষয়টি আমাদের হৃদয়ে সাহস জোগায়। প্রত্যয় জন্মে আমরা প্রেমের সন্তান, মানবিক প্রেমের এক গভীর দৃষ্টান্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে আমরা খেয়ে না খেয়ে বেড়ে উঠেছি। আজকে আমার টেবিলের ওপর এই যে চোস্য, লেহ্য পেয়ে যে উষ্ণ ধোঁয়া ছড়াচ্ছে তা আমাদের জিহ্বাকে লালাসিক্ত করার বদলে বরং অনাহার দিনের স্মৃতিতে সজল হয়ে উঠেছে। প্রাচুর্য কোনো অবস্থাতেই আমাদের স্মৃতিকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আমরা ভালোবাসার সন্তান।

৪৬

এ সময় একজন ভাবুক মানুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। তার নাম ফরহাদ মজহার। অল্প-বিস্তর পরিচয় তার সঙ্গে আগেই আমার ছিল। কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। ফরহাদ মজহারের 'এবাদতনামা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেলে বইটি আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু তিনি কবিতা লেখার চেয়ে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থেকে কাজের প্রতিশ্রুতি আর পূর্ণ করতে পারেননি। দার্শনিকসুলভ তার বিষয়াদিতে নিজকে সোপর্দ করায় হয়তো বা তার কাব্যস্ফূর্তি অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। এটা আমি তার জন্য এক আক্ষেপের বিষয় হিসেবে গণ্য করে থাকি। যদিও এর মধ্যে তার লেখাজোখা দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে।

এ সময় ঢাকার বাইরে থেকে আমার আমন্ত্রণের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আমি চেষ্টা করতাম, মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে। তবে খুলনা থেকে কোনো আমন্ত্রণ এলে আমি খুশি হতাম। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, খুলনায় আমার অনুরাগীর সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং আত্মীয়তার আকর্ষণটা ছিল কবির জন্য মনোমুগ্ধকর। তদুপরি আমি যে মহিলার কথা গত পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি তার বাড়ি ছিল খুলনায়। আমি খুলনার কোনো সাহিত্য অনুষ্ঠানে গেলে তিনি তার দায়িত্বপূর্ণ কাজ-কর্ম ছেড়ে অনুষ্ঠানের দর্শকদের শেষ বেঞ্চে এসে চুপচাপ বসে থাকতেন এবং অনুষ্ঠান শেষে আমাকে না বলেই চুপচাপ চলে যেতেন। এই আগমন-নির্গমনের হেতু যে কী ছিল তা আমি একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলাম। কিন্তু আমার মনে তখন ভয় ধরে গেছে। কারণ যে কাজ আমি করতে পারব না, মহিলাটি আমাকে সে কাজ করতে ইশারা-ইঙ্গিত লোলুপতায় জানানোর প্রয়াস করছেন।

একবার মনে আছে, আমরা সারারাত পাশাপাশি শুয়েছিলাম। ওই ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল তারই এক বোন। আমি যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংযমী না হতাম তাহলে আমার জীবনে এক বড় বিপর্যয় ঘটে যেতে পারত। আমি শয়তানের অসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে চোখ বুজে শুয়েছিলাম। এভাবেই ভোর হয়ে গেল। সে উঠে নাশতা বানাতে চলে গেলে আমি তার বোনকে আড়ালে ডাকলাম এবং তাকে বললাম যে, আমি কোনো অন্যায় কাজ করিনি। বোনটি হেসে বলল, আমি তো জানি, আমি সাক্ষী। আমি সারারাত না ঘুমিয়ে আপনাদের পাহারা দিয়েছি। আপনার সংযম দেখে আমি ভাই খুবই আশ্চর্য হয়েছি। আপনি ঠিকই করেছেন। গায়ের জোরে প্রেম হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বোনটি ছিল দেখতে দুধের মতো ফর্সা। আমি বললাম, তুমি কি আমাকে এই অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারো না?

সে বলল, আপনি তো গায়ে পড়ে এই জ্বালা সহ্য করছেন। পালিয়ে চলে যান না কেন? তা না হলে এমন আচরণ করুন, যাতে আমার বড় বোন ভাবে আপনি আমার জন্য পাগল। তাতে কাজ হবে। এই কথায় আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিলাম এই মেয়েটি আমাকে ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে বলছে। আমি পালিয়ে যাব বলে মনস্থ করলাম, কিন্তু আমার সংযমে নিশ্চয়ই আমার প্রভু সন্তুষ্ট ছিলেন। আমার আর পালিয়ে যেতে হলো না। সেই দিনই ভোরবেলায় নাশতা খাওয়ার পর মহিলাটি আমাকে হেসে বলল, আপনি যেতে চান? তাহলে চলে যান। চলুন আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। বলেই সে ডিউটির পোশাক পরে নিতে লাগল আমার সামনেই। আমি মাথা নুইয়ে বসে থাকলাম। এভাবে এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলাম। কিন্তু আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমার মধ্যে লোভ জেগে উঠেছিল দুজনের প্রতি। একজনের গাত্রবর্ণ রাত্রির মতো, অন্যজন শীতের সকালের নরম রোদের মতো।

আমি ঢাকায় ফিরে এলে মহিলার এক চিঠিতে তিনি দাবি করেছেন, আমার কাছে তার লেখা সব চিঠি আমি যেন পুড়িয়ে ফেলি। একই সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার কাছে আমার লেখা সব চিঠি তিনি পুড়িয়ে ফেলবেন কিংবা মাটিতে পুঁতে সমাধিস্থ করবেন। তার চিঠিগুলো নিয়ে যেহেতু আমারও ভয় ছিল, তাই সব পুড়িয়ে ফেললাম এবং সে-ও একই কাজ করেছে বলে আমাকে জানাল। এভাবেই তার সঙ্গে আমার ইতিবৃত্ত স্তিমিত হয়ে এলো। কবি হিসেবে আমি ধারণা করি আমার জয় হয়েছে। আমি নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি। কিন্তু বুকের এক পাশে এক ধরনের চিরকালীন ব্যথা জমে রইল। বুকে হাত দিলে আমি তা টের পাই। কবির সংযম কখনও বৃথা যায় না। এর বিনিময়ে আমার প্রভু, মহান আল্লাহ আমাকে দিলেন গভীর ধর্মানুভূতির নিয়ামত। আমি আমার প্রভুর ধ্যানে মগ্ন থাকার মনস্থ করলাম। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে জিকির-আজকার শুরু করলাম। আগে সুন্দর পোশাক ও সুখাদ্যের প্রতি আমার লোভ ছিল। এখন তা অপেক্ষাকৃত কমে এলো। অন্যদিকে আমার ধারণা ছিল যে, মানুষের সব জ্ঞান পুস্তকেই বাঁধা হয়ে আছে কিন্তু পুস্তকই সব জ্ঞানের উৎস নয়, তা আমার প্রভু আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বোধ হয় আমার চোখের ওপর হালকা আবরণ টেনে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। অকস্মাৎ একদিন চোখে কোনো সোজা জিনিসকে আরও সোজা দেখতে অসুবিধা হতে লাগল। মনে হলো, জানালার শিকগুলো কেমন যেন একটু ঢেউ খেলানো। এ কথা মনে হলেই আমি দ্রুত চক্ষু চিকিৎসার ডাক্তারের কাছে হাজির হলাম। ডাক্তার আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। তিনি আমাকে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, আমার রেটিনায় ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। আমাকে ডাক্তার হারুণের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলে আমি দ্রুত হারুণের আই ফাউন্ডেশনে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি আমাকে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, এই ছিদ্র বন্ধ করতে চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেজার অপারেশনের প্রয়োজন। আমি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে লেজার করাতে রাজি হলাম। ডা. হারুন দুটি চোখে লেজার রশ্মি প্রয়োগ করে রেটিনার ছিদ্র বন্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু ফল ভালো হলো না। আমাকে লেজার করে হারুন বিলেতে এক সেমিনারে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে বক্তৃতা মঞ্চেই হার্টফেল করলেন। আমি পড়লাম অকূল পাথারে। কার কাছে যাব। দেশে তার তুল্য কোনো চক্ষুবিশেষজ্ঞ ছিল না। আমি হাত গুটিয়ে বসে রইলাম।

সৌভাগ্যক্রমে এর মধ্যে প্যারিসে আমার একটি সেমিনারে আমন্ত্রণ এলে আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে সুলতানা লবীব বলে আমার মেজ ছেলের এক শ্যালিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। এই সুলতানা অল্প বয়স থেকে ফ্রান্সেই বসবাস করছে এবং ফরাসি ভাষা এমনভাবে আয়ত্ত করেছে যে, খোদ ফরাসিরাও তার সঠিক উচ্চারণে মুগ্ধ হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকে। সুলতানা নিজের ইচ্ছায় আমাকে একজন প্রাইভেট ফরাসি চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেচোইল। আমি তার কথায় এক সকালবেলায় ওই ফরাসি চক্ষুবিশেষজ্ঞের দফতরে গিয়ে হাজির হলাম। ভদ্রলোক আমাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নানা মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করল এবং আফসোস করে সুলতানাকে জানালেন যে, রেটিনায় ক্ষয় শুরু হয়েছে। আজকাল ফ্রান্সেও পড়ুয়া মানুষের এই রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। এর কোনো চিকিৎসা নেই। তবে তিনি একটা চশমার ব্যবস্থা লিখে দিলেন, যাতে আমি ব্রডলাইটে পড়তে পারি। আর মুখে সুলতানাকে বললেন যে, ইচ্ছা করলে আমি ভারতের মাদ্রাজে গিয়ে একবার দেখাতে পারি।

বাইরে বরফ পড়ছিল গভীর হতাশা আর বেদনা নিয়ে আমি সুলতানা লবীবের হাত ধরে প্যারিসের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। এই হলো আমার চোখের করুণ কাহিনি।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বই পড়া ছাড়া জ্ঞানের অন্য উৎসগুলো আমি একে একে উন্মুক্ত করব। এখানে উল্লেখ্য, আমি গত বছর মাদ্রাজে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে রেটিনা বিল্ডিংয়ের প্রধান ডাক্তার আমাকে অত্যন্ত যত্ন করে সারাদিন পরীক্ষার মধ্যে রেখে আফসোস করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমার ডান চোখের একটি নার্ভ শুকিয়ে গেছে। তবে তা চোখ দিয়ে আরও কিছু দিন কাজ চালিয়ে যেতে পারলেও বই পড়া নাস্তি। বই পড়তে হলে অন্যের সাহায্য নিতে হবে। আমি যদি থেমে থাকতে না চাই, আমি যেন আমার স্মৃতির ওপর নির্ভর করে ক্রমাগত ডিকটেশন দিয়ে লিখে নিই। এতে অবশ্য একজন শ্রুতি লেখক আমাকে সাহায্য করতে পারে। আমি বর্তমানে এই পদ্ধতিতেই লেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তবে চোখ না থাকার কারণে আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছে। আমি একটি আস্ত উপন্যাস ক্রমাগত বলে যাওয়ার ধীশক্তি অর্জন করেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

কিন্তু আমার হৃদয়ে কবিতা লেখার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মাঝে মধ্যে আকুল হয়ে চারটি বাল্ব জ্বালানো তেড়চা টেবিলে আমি উবুড় হয়ে পড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের এই আকুলতা চক্ষুস্মানরা সম্ভবত ঠিকমতো অনুমান করতেও পারবে না। এর মধ্যে রফিক হারিরি বলে আরবি সাহিত্যের একজন ছাত্র, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি সাহিত্যে অনার্স-মাস্টার্স সমাপ্ত করে বেরিয়েছেন। তিনি আমাকে আরবি সাহিত্যের কয়েকজন অন্ধ কবির রচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে জানিয়ে উৎসাহিত করেছেন। আরবি সাহিত্যের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ড. ত্বহা হোসাইন এবং আব্বাসীয় যুগের অন্যতম একজন প্রধান কবি আবুল আলা আল মাআররির কথা এবং সাহিত্য সম্পর্কে আমাকে অবগত করিয়েছেন। তারা দুজনেই ছিলেন জন্মান্ধ। তারা জন্মান্ধ হওয়া সত্ত্বেও আরবি সাহিত্যের প্রধান উদ্ভাবনা রীতি ব্যবহার করে অমর হয়ে আছেন। আমি তো আর যাই হোক এখনও আবছা এলোমেলোভাবে সব কিছুই দেখতে পাই। এমনকি ইচ্ছা করলে হেঁটে বেড়াতে পারি। যদিও আমার পরিবার আমাকে একা বেরোতে দিতে রাজি নন। বই পড়া ছাড়া জ্ঞানের অন্য উৎস আমি হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আমি শ্রুতিধরের মতো অন্যের কথাবার্তা শ্রুতিতে গেঁথে নিতে পারছি। কথা হলো আমার যদি উদ্যম এবং পরিশ্রম করার মনোভাব থাকে তাহলে আমাকে কেউ নিষ্ক্রিয় রাখতে পারবে না। এর মধ্যে দেশের বাইরে থেকে নানা আমন্ত্রণ পাচ্ছি। মনোলুব্ধ হয়ে উঠলেও নানা শারীরিক অসুবিধার কথা চিন্তা করে ওইসব আমন্ত্রণে সায় দিতে পারছি না। অথচ ঘরে বসে থাকা আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। আমি চিরবিচরণশীল চারণের জীবন অতিবাহিত করে এখন বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ কবিত্বের যাতনায় যন্ত্রণাকাতর হয়ে আছি। মৃত্যু এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারত। কিন্তু আমার ধর্মে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করার অনুমোদন নেই। বরং বাঁচার আরও আরও যেসব অনাবিষ্কৃত দিক আছে, তা যদি আমার কাছে উন্মোচন হতো তাহলে কতই না ভালো হতো।

৪৭

এর আগে ছেচল্লিশটি পরিচ্ছেদে আমি অবলীলায় আমার কথা পাঠকদের জানিয়েছি। কিন্তু সাতচল্লিশে এসে বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছি না। এখানে শুধু একটা ঘটনার কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ছে। সেটা হলো আমরা যখন মিরবাগের অভ্যন্তরে বসবাস করছিলাম তখন হঠাৎ একদিন সকালবেলা আমর মা এসে হাজির হলেন। আমার মা আমার বাসায় ২-৩ দিন থাকার পরই তার মনে হতে লাগল তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছেন। ঘর থেকে বের হলেই পুকুরের ঘাটলা। এই ধারণায় একদিন সকালবেলা তিনি সবার অজ্ঞাতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন এবং বলা যায় তিনি হারিয়ে গেলেন। তার পরনে ছিল দামি সিল্কের সাদা শাড়ি ও ব্লাউজ। তিনি হাঁটতে হাঁটতে অর্থাৎ আমাদের বাড়ির ঘাটলা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে আবার ফিরে আসার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আমাদের বাসার গেট সম্ভবত খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেব সম্ভবত একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা রাস্তায় হেঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেঁটে কাতর হয়ে গিয়েছে দেখে এগিয়ে এলেন এবং কথা বলেই বুঝতে পারলেন তিনি অনেকটা দিশেহারা। এখানে যে মোল্লাবাড়ির ঘাট বলে কিছু নেই এটা বোঝাতে না পেরে আমার মাকে পথের পাশে একটি দোকানে টুল এনে বসিয়ে দিলেন এবং মাইকিং করে বলতে লাগলেন একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধা বাড়ির ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে অমুক জায়গায় অবস্থান করছে। মাইকিং শুনে আমার ছেলেমেয়েরা দৌড়ে গিয়ে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

আমার মায়ের যুক্তি হলো আমাদের বাসার নিচেই কোথাও ঘাটলাটা আছে। এসব কথা মনে হলে আমার ছেলেমেয়েরা আজও হেসে আকুল হয় আবার অশ্রুসজলও হয়ে ওঠে। কারণ দাদির প্রতি তাদের আকুল ভালোবাসা রয়েছে। আমি নিজেও আমার মায়ের সেবা-যত্ন করার ভালো সুযোগ পাইনি বলে তার নানা ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করতাম। অথচ আমার মা তাকে যখন ধারণা দেওয়া হলো তিনি ঢাকায় আছেন তখন তিনি বিগড়ে গেলেন। বলতে লাগলেন আমি এখানে আর থাকব না। আমাকে বাড়িতে দিয়ে আয়। তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এর কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

ঠিক এই সময়ে আমার লেখার বাসনা এত বৃদ্ধি পায় যে, অফিসে, বাড়িতে ও পথে হাঁটতে হাঁটতে আমার মাথায় আস্ত কবিতার লাইন এসে আমাকে আকুল করে তুলতে লাগল। আমি জানতাম তা মুহূর্তের মধ্যে না লিখতে পারলে আর ফিরে আসবে না। আমি সে জন্য সব সময় পকেটে কাগজ ও কলম মজুদ রাখতাম। তখন এই সময়টা আমার আধ্যাত্মিক সাহিত্য পাঠের ঝোঁক বেড়েছিল। আমি সুফিদের ইতিহাস তখন একনাগাড়ে পাঠ করে চলেছি।

আমার এক সময়ের কবিতা সম্ভবত 'এক লায়লার কাহিনি' ইত্যাদি। ওইসব কবিতায় আমি এমন সব উপমা ব্যবহার করেছি, যা আছে কখনও কল্পনা করিনি।

মানুষের পাঠের পরিশ্রম কখনও বৃথা যায় না। ব্যাপকভাবে সুফিদের কাহিনি পড়ার ফলে আমার উজ্জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং ধ্যানমগ্ন থেকে কাব্যচিন্তা করার একটা নতুন অভ্যাস সৃষ্টি হলো। আমি জানতাম আধুনিক বাংলা কবিতায় বিশেষ করে আমাদের সাম্প্রতিক কবিতায় সুফিবাদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গীত সম্ভারে এর খানিকটা ছোঁয়া লাগলেও তা খুব বেশি উল্লেখ করার মতো নয়। অথচ অস্বীকার করব না যে, এই সময় সুফিদের ধ্যান-ধারণা আমাকে বেশ প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু আমার সামাজিক পরিস্থিতি ও দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আমার কল্পনা শক্তির সহায়ক ছিল না। আমি দ্রুত দিক বদল করলাম এবং চলে এলাম সমকালীন বিশ্বের নানা সংঘাত ও বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দুর্গতি-দুর্দশা প্রতিরোধ ইত্যাকার আন্তর্জাতিক সমকালীনতার মধ্যে। এর কিছু প্রমাণ আমার কবিতায় দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করতে গেলে আমার একটি কবিতার কথা উল্লেখ করতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাটির নাম 'ঈগল থাকবে ইতিহাস থাকবে না'। কবিতাটি ছাপা হলে অনেকে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তাছাড়া এই কবিতাটির দ্বারা আমার পরবর্তী প্রজন্মের কোনো কোনো কবি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আমার স্বভাবসুলভ বিচরণ বিলাশ তখনও ক্লান্ত হয়নি। আমার শুধু ইচ্ছে হতো বাড়ি চলে যাই। গিয়ে কয়েকদিন থেকে আসি। এই ইচ্ছা পূরণে মাঝে মধ্যে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে নামতাম। কিন্তু বাড়ি পৌঁছার সাথে সাথেই আমার উপস্থিতির কথা শহরে জানাজানি হয়ে যেত এবং সাহিত্যপ্রেমিকরা ভিড় করে এসে আমার বাড়িতে জমা হয়ে যেত। ইচ্ছে মতোন আমার কৈশোরের পথ-প্রান্তর, মাঠ-ঘাট এক সময় আমার চরে বেড়ানোর জায়গাগুলোতে আমি আর পৌঁছতে পারতাম না। এমনকি ঠিক সময় আহার গ্রহণের ফুরসতও আমার থাকত না। আজও নেই। সম্ভবত এই পরিস্থিতিকে বলা হয় খ্যাতির বিড়ম্বনা। এই শহরে অনেক পরিবার আছে, যাদের সাথে আমার কিশোরকালের অটুট সম্পর্ক আছে। আমার ইচ্ছে হতো তাদের বাড়ি আমি যাই। গিয়ে কিছুক্ষণ তাদের সাথে কথা বলে আসি।

আমাদের বাড়ির পাশেই হলো খ্রিস্টান মিশন। এখানে ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা বহুকাল আগেই একটি গির্জা তৈরি করেছিলেন। গির্জার পাশে পুকুর। পুকুরের পাশে আমার পরিবারের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটি পরিবার আছে। সেটা হলো ডাক্তার শশাঙ্ক বাবুর পরিবার। তার ছেলে অমল দাশ। আমার মামাদের বন্ধু ছিল। তার ছোট ছেলে নিহাররঞ্জন দাশ। আমার চেয়ে এক মাসের বড়। আমাদের বন্ধুত্ব ছিল অটুট। আমি বাড়ি গেলে কখনও তাকে না দেখে আসতাম না। সে একটি দুর্ঘটনায় তখন শয্যাশায়ী হয়ে থাকত। আমি তাকে দেখতে গেলে খুবই আনন্দিত হতো। আমি সেখানে বাড়ি গেলেই হাজির হতাম। এদের আন্তরিকতার কথা ভোলার নয়। আজ সেই নীহাররঞ্জন দাশও নেই কোনো টানও নেই। আমি যে কথা বলতে চাই সেটা হলো আমি আমার জন্ম শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একাকী পর্যটনের সুযোগ হারিয়ে বসে আছি। অথচ আমার হৃদয়ে ব্যাকুলতা রয়ে গেছে। কিশোরকালে দুষ্টু স্বভাবের মানুষ ছিলাম আমি। সারাদিন গুলতি হাতে পাখির পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতাম। হয়তো পাখি শিকার আমার উদ্দেশ্য ছিল না প্রকৃতির প্রতি এক দুর্বোধ্য আকর্ষণে পাখি শিকারির মুখোশে গ্রামে গ্রামে প্রকৃতি দেখার বাসনায় টেনে নিয়ে যেত। খ্যাতি আমাকে আর বাকি জীবন একা থাকতে দিল না। এর চেয়ে আক্ষেপের বিষয় আর কী থাকতে পারে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হলো প্রকৃতিপ্রেম আমার মধ্যে একটা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। সে অবস্থা আমি আজও ত্যাগ করতে পারিনি। অবস্থাটা হলো আমি অতিকিশোর বয়স থেকে গাছের ভক্ত ছিলাম। গাছকে আমি একটি অনড়, অচল, প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে মেনে নিতে পারিনি। আমি সব সময় বৃক্ষকে আমার প্রতিবেশী জীবন্ত অস্তিত্বের প্রকাশরূপে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি বৃক্ষপ্রেমিক মানুষ। গাছের কাছে গেলেই আমি তার কাণ্ডে হাত রাখি। তার স্বাস্থ্যে দীপ্তি ও পল্লবের মর্মর ধ্বনি উপলব্ধি করি। গাছের সাথে কথা বলতে চাই একাকী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কেন জানি ধারণা হয় আমার এই অভিব্যক্তি আমার পরিচিত প্রতিবেশী প্রতিটি বৃক্ষই এককালে জানত। বহুকাল ধরে আমি ঢাকায় বসবাস করি। কিন্তু আমার জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অনেক গাছই আমার স্মৃতিতে ডালপালা মেলে মনে হয় আজও অক্সিজেন ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাড়ির সামনে এখন যে হাইওয়েটি আছে তার পাশে ছিল একটি তেঁতুল গাছ। এই গাছটি আমার শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতির ভেতরে এখনও আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে, যদিও বাস্তবে গাছটি নেই। এই গাছটির নিচে বসে ঈসা মিয়া বলে এক দরিদ্র ব্যক্তি আক্তার বিড়ি নামে বিড়ি বিক্রি করত। বিড়ির পাশে একটি বয়ামে থাকত লজেনচুস। আমি একটি তামার পয়সা নিয়ে তার কাছে দৌড়ে যেতাম লজেনচুসের লোভে। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম তেঁতুল গাছটিকে। সেটি কেন এখনও আমার স্মৃতিতে আছে তা এক বিস্ময়! কত মানুষের কথা আমি ভুলে গেছি। কিন্তু গাছটির কথা আমি ভুলিনি। আমাদের বাড়ির পাশে একটি পুকুর ছিল। পুকুরটির পাশে ছিল কয়েকটি মান্দার গাছ। ফুলে ফুলে লাল হয়ে থাকত, আজ পুকুরটিও নেই। ভরাট হয়ে গেছে। মান্দার গাছগুলোও নেই। এর পরেই ছিল বংশী মাস্টারের একখণ্ড জমি। এর পরে আমার মামুর বাড়ি। উঁচু করা পাকা ভিটা। বর্ষার সময় এই ভিটির ওপর দাঁড়িয়ে আমি বড়শি দিয়ে দাড়িকানা মাছ ধরার চেষ্টা করতাম। বর্ষার টলটল পানিতে এই মাছগুলো আমি চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। এখন তো কিছুই নেই। কিন্তু স্মৃতির স্পষ্টতা কিছু মানুষের মধ্যে না থাকলে মানুষের কল্পনা স্ফূর্তি পায় না। কাব্য অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

জিগা গাছের পায়ের কাছে জমে থাকা আঠার মতো এই স্মৃতি আমি ছাড়াতে পারি না কেন?

৪৮

আমি এর আগেও আমার কোনো লেখায় উল্লেখ করেছি যে, বিস্মৃতি হলো মানুষের এক অসাধারণ শক্তি। অনেক বিষয় আছে যা ভুলে না গেলে পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সমাজে বাস করা যায় না। অপরাধ ভুলে গেছি বলেই না ওমুক আমার ভাই, ওমুক আমার ভাগ্নি, কারো হিংস্র আচরণ বিস্মৃত হয়েছি বলে কেউ আমার এখনও ভাবি সাহেবা, কেউ মামণি। এই ভুলে যাওয়া শক্তি আমার মতো কবি মানুষের আরও বেশি প্রয়োজন। এই ভুলে যাওয়ার নাম উদাসীনতা নয়, সচেতন বিস্মৃতি।

এই যে এখন আমার এই বিস্ময়কর উপত্যকার মধ্যে আর্বিভূত হয়েছে এক অপরূপ, খুঁতহীন অঙ্গসৌষ্ঠবের অধিকারিণী, দীর্ঘাঙ্গিনী নারীসত্তা। তার পরিচয় দিতে গেলে আমার নিজেরই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দুলুনি থামে না। তবু যেহেতু আমি আমার জীবনের সংস্পর্শে মৌমাছির মতো ঝাঁক বেঁধে আসা বিষাক্ত হুলওয়ালা পতঙ্গের হুলের বিষের জ্বালা অনুভব করি সে কারণে কিছু কথা লিখে দিতেই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ছিল এক ঠেলাওয়ালার মেয়ে। বাপের মৃত্যুর পর দুবোন বেরিয়ে পড়েছিল কাজের ধান্ধায়। একজন নানা কৌশলে ঢুকে গেল একটা গার্মেন্টসে, আর অন্যজন এসে দাঁড়াল বাসার কাজে আমাদের পরিবারে। আমি কাত হয়ে তাকে দেখতাম, এমন দীর্ঘাঙ্গিনী সুগঠিত নারী নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আমার ইতিপূর্বে চোখেই পড়েনি। আমি যে তাকে অবাক হয়ে দেখছি এটা সে বুঝতে পেরে আরও প্রদর্শনলোভী হয়ে উঠেছিল। গায়ের রঙ ছিল ঘনকৃষ্ণ। কেশ ছিল নিতম্বের ওপর দোলায়িত। শক্তি ছিল সব কাজ মুহূর্তের মধ্যে শেষ করা। কাজে কোনো ত্রুটি কেউ ধরতে পারত না।

আমি মনে মনে ভাবতাম, আমার শৈশবে আমার পরিচর্যাকারী আলেকজান বা আলকি আবার নবরূপে নতুনভাবে কবির দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমার এই মনোভাব আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ অনুমোদন করত না। তাকে ধমকে সরিয়ে দিত। যাতে সে আমার চোখের আড়ালে থাকে। অথচ সে ছিল আমার কাছে এক নিখুঁত নারীত্ব এবং মায়াবী দেহের দৃষ্টান্ত। আমি আজ পর্যন্ত তাকে নিয়ে কিছুই লিখিনি। আমার ভয় আছে আমার পরিবারে ধরা পড়ে যাবে। একজন এ ক্ষমা করলেও অন্যরা আমাকে প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে দোষারোপ করবে।

প্রস্ফুটিত বসরাই গোলাপ যখন বাগানে গন্ধ ছড়ায়, তখন তাকে ছিঁড়তে না দিলেও সবাই অন্তত দেখতে দেয়। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমার জন্য দেখাও বারণ।

যা হোক এই নতুন আলেকজান বেশি দিন আমাদের সেবাযত্নের কাজে নিয়োজিত ছিল না। সে গাঁয়ে গিয়ে বিয়ে করে আর ফিরে এলো না। এর পরে জীবনের বিপর্যয়ে আমিও অন্যমুখী হয়ে গেলাম। সামাজিকতার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করলাম। মানিয়ে নিতে থাকলাম সব বৈধ বিষয়ের সাথে, আমি পারি না এমন তো নয়!

এর মধ্যে আমাকে চিন্তাশীলতার এক ধরনের দার্শনিকতা কিছু দিনের জন্য আবিষ্ট করে রেখেছিল। অথচ আমি দার্শনিকতায় প্রকৃতপক্ষে কোনো জবাব না পেয়ে মানুষের বাক বিস্তারের ক্ষমতার ওপর পড়াশোনা করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম। এই অবস্থা কবির জন্য খুবই খারাপ। লেখালেখি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। কারণ স্বপ্ন সৃষ্টি না হলে কাব্য হয় না, আমার কাব্যের জন্য ছন্দ, মিল, অলঙ্কারের প্রয়োজন হয়। আর আমি কি-না পড়লাম কথার ফাঁদে!

একটি বিষয় মনে পড়ছে যা অন্য কোথাও উল্লেখ করে থাকলেও এই রচনায় তার খানিকটা উল্লেখ করা যেতে পারে। অকস্মাৎ ভারতের ভুপাল থেকে একটি এশীয় কবিতা সম্মেলনে যোগদানের জন্য চিঠি পেলাম। আসা-যাওয়া ও থাকা-খাওয়া খরচ উদ্যোক্তারা বহন করবে। আমি মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে গেলাম। যথারীতি ভিসাও সংগ্রহ করে দিল্লির উদ্দেশে আকাশে উড়াল দিলাম। দিল্লিতে নেমে এক তরুণ ড্রাইভারের পাল্লায় পড়ে খানিকটা হেনস্তা হয়েছিলাম। ছেলেটি আমাকে অনেক ঘুরাতে ঘুরাতে তখন জিজ্ঞেস করল—'আপ কেয়া টিচার হায় জি'? আমি বললাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নেহি বেটা, হাম এক শায়ের হে, বাংগাল ছে আয়া।' এ কথায় ছেলেটি গলে গেল, তারপর এক গলাকাটা হোটেলে নিয়ে ঠেসে নামিয়ে দিল। আমি বেশ কিছু বাড়তি ডলার গচ্ছা দিলাম। হোটেলে থাকলেও পাশে মেহরামনগর মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে ইমাম হুজুর ও তার স্ত্রীর আতিথ্য পেয়ে গেলাম। তারা বললেন, রাতের খাবার তাদের সাথে খেতে হবে। তাতে ডলার গচ্ছা দেওয়ার জ্বালাটার খানিকটা উপশম হলো। ইমাম সাহেবের ভাতিজা ছিল ট্যাক্সি ড্রাইভার। সে আমাকে বলেছিল, 'হোটেলে উঠে গেছেন, আর কিছু করার নেই, ওরা গলাকাটা লোক, আমি সকালে আপনাকে হোটেল থেকে নিয়ে এসে প্লেনে চড়িয়ে দেব।'

ছেলেটি তার কথা রেখেছিল, আমি ভুপালে গিয়ে অশোক বাজপেয়ের সুন্দর আতিথ্যের মধ্যে একটা রাত কাটিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে পরিচিতদের মধ্যে দেখা হয়েছিল আমার পূর্বপরিচিত কলকাতার কবি নবনীতা দেব সেনের সাথে।

তিনি সেখানকার উদ্যোক্তদের মধ্যে শামিল ছিলেন। এই নবনীতা অমর্ত্য সেনের প্রথমা পত্নী। পরে অবশ্য শুনেছি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

কবি সুভাস মুখুজ্যে, সবুজ সরকার ও তার স্ত্রীর সাথেও সেখানে সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমার পারফরমেন্স খুবই আনন্দের কারণ হয়েছিল দর্শকদের। সেখানে উর্দু কবি আলি সরদার জাফরির সাথেও আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি আমার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। পরিচয় ঘটে জাপানের কবি কাজোকো শিরাইসির সাথে। এই পরিচিতি পরবর্তীকালে আমার অপরিসীম আনন্দের কারণ হয়েছিল। মোটকথা, ভুপাল থেকে সমগ্র ভারতের ভাষাগুলোর কবিরা আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে।

চীনের কবি লি হুয়াং সেমিনারে আমার বক্তব্যের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এসব স্মৃতি আমার যখন মনে পড়ে তখন আমার কবি জীবনের সার্থকতা আমার দেশের বাইরেও অনুভব করি।

আমি একটা স্মৃতি ভুলতে পারি না। অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে ভুপালে আমরা যখন মার্কেট করতে বেরিয়েছিলাম, তখন আমার পেছনে সঙ্গী হতে ছুটে এসেছিল আসামের কবি নবকান্ত বড়ুয়া ও সাইপ্রাসের (গ্রিক অধিকৃত) কবি নাসা পাদাপিউ খ্রিস্টপিদিস। এই গ্রিক রূপসীকে আমার কাছে হেলেনের মতোই সুন্দরী মনে হয়েছে। সে ভুপালের বিখ্যাত রুপার গয়না কেনার আশায় উদগ্রীব ছিল। আমি এদের ভুপালের বড় মসজিদ—যার আকার ও আয়তন বিদেশিদের তাক লাগিয়ে দেয়—এর গেটে দাঁড় করিয়ে বলেছিলাম, আমি দুরাকাত নামাজ পড়ে আসছি, একটু দাঁড়াও। সে বলল, আমাদের জন্য প্রার্থনা করবে তো? তুমি তো আবার রউফ দেন্তাসের সমর্থক নও? আমি হেসে বলেছিলাম, দেখো নাসা, আমি তোমাদের আর্চ বিশপ মেকারিওসকেও উত্তমরূপে পড়েছি। আমি শুধু কবি নই, সাংবাদিকও। এক সময় পত্রিকার কাগজ সম্পাদনা করতাম। গ্রিক সাইপ্রিয়দের প্রতি সহানুভূতি আছে, তবে সমর্থন নেই। কারণ কিছু দিন আগে তোমরা নিষ্পাপ তুর্কি শিশুদের হত্যা করেছিলে। সে সংবাদ আমি জানি।' আমার কথায় গ্রিক রূপসীর মুখও কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি পেছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না তাকিয়ে দৌড়ে মসজিদে ঢুকে গিয়েছিলাম এবং মেহরাবের পাশে দুরাকাত নফল নামাজ আদায় করলাম।

ফিরে এসে এদের সামনে দাঁড়াতেই নাসা বলল, আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছ তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তোমাদের জন্যও করেছি। নাসা বলল, আমেন!

তারপর আমরা হাঁটতে হাঁটতে ভুপালের রুপোর বাজারের দিকে চলে গেলাম।

এ ধরনের আন্তর্জাতিক কবিসভা বিশ্বের কবিদের অন্তরে সঞ্জীবনী উৎসাহ সৃষ্টি করার সাথে এক আত্মীয়তার বন্ধনও তৈরি করে দেয়। এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, আমি এক কবিসভায় মধ্যপ্রাচ্যের আবুধাবিতে কেরালা ইনস্টিটিউটের সামনে দেশ-বিদেশের বাঙালি দর্শকদের বিপুল সমাগমে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা কবিতা পড়েছিলাম। এর পুরস্কারস্বরূপ আমাকে এত উপহার দেওয়া হয়েছিল যে, তা আনাই আমার জন্য মুশকিল হয়েছিল। তা ছাড়া 'গালফ উইকলি' আমার ওপর কাভার স্টোরি করেছিল। আমার এক বিরাট ছবি কাভারে মুদ্রিত হয়েছিল। ভেতরে আমার ইন্টারভিউ। এসব স্মৃতি আমাকে স্বভাবতই আনন্দের মধ্যে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

আমাদের দেশের কবিরা বড় হওয়ার কোনো স্বপ্ন দেখে না। আন্তর্জাতিক মাত্রা অর্জন করার প্রয়াস পায় না। তাদের কাজ হলো ঈর্ষাতাড়িত হয়ে পরস্পরের দুর্নাম রটানো। এতে কী হয়?

শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না।

কবিতা কোনো চমক সৃষ্টির ব্যাপার নয়। কবিতা হলো স্বপ্নের মধ্যেই জীবনযাপনের গৃহস্থালি মাত্র।

আমি বাংলাদেশের আধুনিক কবিতাকে বহমান গতিশীল রাখতে সব সময় প্রয়াসী ছিলাম। সাহিত্য উদ্দেশ্যবিহীন কোনো দিগন্তের দিকে যাত্রা নয়। নিশ্চয় কবিকে তার উদ্দেশ্যের আনন্দবিতানে কোনো না কোনোভাবে পৌছাতে হয়। কবি সত্য কথা বলে না, কিন্তু একমাত্র কবিকেই কেউ মিথ্যাবাদী বলে না। মনে রাখতে হবে কবি শব্দটি শুধু পুরুষের ওপরেই বর্তায় না, নারীর ওপরও বর্তায়। কারণ কবিতা হলো মানবজীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ্য স্বর্গীয় অর্পণ, যা আল্লাহ আদমের সন্তানদের মধ্যে খুব হিসেব করে বণ্টন করেছেন। এ জন্যই বলা হয়—সবাই তো কবি নয়, কেউ কেউ কবি।

কবি যে শুধু মানব সমাজের খুঁটিনাটি বাজিয়ে দায়িত্ব শেষ করতে পারেন এমনও নয়, তাকে পাখি, পতঙ্গ, গাছপালা, লতাগুল্মের দিকেও তাকাতে হয়। নারীর প্রতি আগ্রহ সমতুল্য মর্যাদার উল্লেখ করতে হয়। পাখি, পতঙ্গ, গাছপালা কবিকে সাক্ষি মানতে আসে না। কিন্তু কবি নিজেই সাক্ষ্য দেয় যে, এরা তার আত্মীয়। তবে স্বীকার করতে হবে যে, নারী একাই একশ। কারণ তার দেহবল্লরীর মধ্যে প্রকৃতি নিচয়ের প্রতিরূপ বিম্বিত আছে। পৃথিবীতে যা কিছু মানুষকে আবিষ্ট করে তার সবই মানবী দেহমানবতার মতো ধরে রেখেছে। এ জন্য নারীকে বলা হয় প্রকৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রচনা তৈরি করতে গিয়ে আমার স্মৃতিবিভ্রান্তির বিষয়টিকে পাঠক সাধারণের বিবেচনায় রাখতে বলি। কারণ কোন ঘটনা আগে এসে যাচ্ছে, কোনটা পরে আসছে তা আমি নিজেই ধরতে পারছি না। তবে যা লিখেছি এ আমার জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা মাত্র। কোনোটি বিদ্যুৎ চমকের মতো স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার কোনোটি আসছে পরবর্তী বিষয় হিসেবে। এ অবস্থায় কী-ই-বা করতে পারি। ভুপাল থেকে ফিরে এসে কিছুদিন এই ভ্রমণ নিয়ে কিছু হয়তো বা লিখেছিলাম। আমি অবশ্য ভ্রমণ কাহিনি টুকিটাকি বিস্তারিতভাবে লিখতে পারি না। অনেকে অনেক মাধুর্যময় ভাষায় বৃত্তান্ত লিখতে পারে। আমিও লিখেছিলাম। তবে তা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। যেখানে ডায়েরিতে নোট রাখতে পেরেছি সেটা মোটামুটিভাবে পরবর্তী সময়ে লেখায় উতরে গেছে। কিন্তু অনেক সময় তা ঘটে ওঠেনি। যেমন আমি ইরান ভ্রমণে আমন্ত্রিত হয়ে পুরো ইরান ভ্রমণ করেছিলাম। কিন্তু ডায়েরিতে লেখার সুযোগ হয়নি বলে তা সফল বৃত্তান্ত হিসেবে লেখার সুযোগ হয়নি। অথচ ইরানের প্রায় সব শহর তেহরান, ইস্পাহান এমনকি মাশাহাদ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। আমি হযরত আলী (রা.)-এর অষ্টম পুরুষ হযরত আলী রেজার (রহ.) মাজার মাশাহাদে জিয়ারত করেছিলাম। কিন্তু এই সফর বিস্তারিতভাবে লেখা যায়নি। কারণ আমি ডায়েরিতে এর নোট নিতে পারিনি। তবে ভুপাল থেকে ফিরে কবিতার জন্য 'বহুদূর' বলে একটি ক্ষুদ্র ভ্রমণ কাহিনি আমি লিখতে সফল হয়েছিলাম, যা আমার প্রকাশিত রচনাবলির কোথাও না কোথাও আছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে আমি কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনেও ভ্রমণ করেছিলাম। আমার সঙ্গী ছিলেন কবি আল মুজাহিদী। তখন আমার একজন প্রিয় কবি অমীয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায়। তা সত্ত্বেও তিনি আমার ডায়েরিতে একটি লাইন লিখে স্বাক্ষর করেছিলেন। এর কিছুদিন পরই তার মৃত্যু হয়। আমি দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য বিভাগে তার ওপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। 'কেঁদেও পাবে না তাকে' এই শিরোনামে। প্রবন্ধটি সম্ভবত কবির স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই সূত্র ধরে হৈমন্তী দেবী আমাকে একটি পত্র লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। যতটুকু মনে পড়ে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ আমার জন্য খুব স্মরণীয় ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। সেখানকার ছাত্র-ছাত্রী ও কয়েকজন শিক্ষক আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে আমি কয়েকটি কবিতাও লিখেছিলাম, যা আমার শান্তিনিকেতনের স্মৃতি হিসেবে টিকে থাকবে।

তবে ওই ভ্রমণের যিনি উদ্যোক্তা ও আমন্ত্রণকারী ছিলেন সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আমার একটু বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। শক্তি আমাদের নিয়ে ক্যানিংয়ের দিকে যাত্রা করেছিলেন। তিনি গাড়ির মধ্যেই মদপান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন, তার হাতেই মদের বোতল ছিল। আমি অবস্থা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে, গন্তব্যে গিয়ে শক্তি মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। আমি সহসা তার হাত থেকে বোতলটি কেড়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম, বোতলটি শূন্য হয়ে গিয়েছিল প্রায়, কিন্তু শক্তিবাবু এতটা ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন যে, আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন এবং এর জের বহুদিন পর্যন্ত আমাকে ভুগতে হয়েছে।

তবে এর খেসারত আজ আমাকে মেটাতে হয়েছে। কলকাতায় গেলে কোনো অনুষ্ঠানে বক্তৃতা শুরু করতে গিয়ে আমাকে আমার লোকান্তরিত বন্ধু শক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বলতে হয়। অথচ শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমার সঙ্গে ছিলেন ঈর্ষাকাতর। আমার কবিতা সম্বন্ধে সুযোগ পেলেই অযথার্থ মন্তব্য করতেন। অথচ এই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই মুক্তিযুদ্ধের কিছুদিন আগে পূর্ব বাংলায় 'কবিতা' বলে যে সঙ্কলন বের করেছিলেন, তাতে আমার কবিতাকে এতটাই প্রাধান্য দিয়েছিলেন যে, আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কবিদের মধ্যে এই অন্তর্বিরোধ অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমি শক্তির ব্যাপারে কোনো অবস্থাতেই অসহিষ্ণু হতে পারিনি, কারণ পশ্চিমবঙ্গের কবি বলতে আমি এখনও শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তার ধারেকাছে কাউকে বিবেচনা করতে পারি না।

আনন্দবাজার পত্রিকায় তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাউকে শীর্ষে তুলতে পারে, আবার কাউকে অন্যায়ভাবে স্তিমিত করে দিতে পারে। এটা অহরহ তারা করে থাকে। কিন্তু অকবিকে কবি বানানোর কোনো চেষ্টায়ই সফল হয় না, সফল যে হয় না শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই তার প্রমাণ। শক্তির স্বেচ্ছারিতার কারণে তিনি আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অনুগ্রহ পাওয়ার মতো পরিস্থিতি কখনও সৃষ্টি করতে পারেননি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় আনুগত্যের কোনো ধার ধারতেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃত কবির মতোই স্বেচ্ছাচারী। তাছাড়া তার মধ্যে রাঢ় বাংলার উদাসীন বৈষ্ণবী চরিত্রও সম্ভবত সংগুপ্ত ছিল। যা মাঝে মধ্যে তার আধুনিক মেজাজকে বিদীর্ণ করে উছলে পড়ত। এর খেসারত তার সব সময়ই গুনতে হয়েছে। শক্তি কবিতা লিখেছেন অনেক। কিন্তু ভালো কবিতার সংখ্যা তার অপেক্ষাকৃত কম। ওই কমের মধ্যেই তার বৈদুর্যমণির মতো আলোকছটা ঠিকরে পড়ত। কবিরা যখন মাঝে মধ্যে নিষ্ফলা, উদ্ভাবনাহীন অবস্থার মুখোমুখি হন অর্থাৎ লিখতে আর মন চায় না কিংবা পারে না, তখন তাদের ভেতর সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড যৌনাকাঙ্ক্ষা। উষ্ণ প্রবাহের মতো আসঙ্গলিপ্সার তাড়নায় তারা অনেক আকাম-কুকামও করে ফেলে। এ অবস্থাটা প্রতিরোধের জন্য কবিদের কোনো প্রতিরোধ শক্তি থাকে না। তারা উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অনেকেই এর তাড়না থেকে নিজের সর্বনাশ নিজেই রচনা করেন। তবে কবির মনে যদি বিশ্বাস থাকে, পরকালের প্রতি আস্থা থাকে তাহলে এই উষ্ণ প্রবাহ তিনি উপেক্ষা করতে পারেন। আমার জীবনে এই সত্য আমি গভীরভাবেই উপলব্ধি করেছি এবং বলা যায় আমি নিজেকে সংযত রাখতে মোটামুটি সফল হয়েছি। এর জন্য আমাকে প্রতিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালাতে আমার প্রভু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাতে হয়েছে। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়েছে, আহা আমি যদি গাছ হয়ে জন্মাতাম।

আমার রচনায় পরপর গাছের কথা উত্থাপিত হওয়ার কারণ হয়তো বা এই যে, এই দেশে, এই প্রকৃতির মধ্যে তেমন কিছু বৃক্ষ আমার চেনা, যা আমার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে। এ দেশের সব গাছ তো আর আমি চিনি না তবে পরিবেশের মধ্যে আমার পরিচিত কিছু বৃক্ষ সব সময় জেগে থাকে। যাদের বয়স আমার মতোই হয়তো। আবার কেউ কেউ আমার জন্মের অনেক আগে থেকেই ডালপালা ছড়িয়ে বেঁচে আছে। কেউ ঝড়ে-বাদলে হয়তো আর টিকে নেই। কিন্তু আমার স্মৃতির ভেতর তারা চিরজাগ্রত। আমার স্মরণ রেখার ওপর প্রকৃতির এই পরিপূর্ণতা আমাকে সব সময় সাহসী করে রেখেছে। আমি গাছের সঙ্গে কথা বলতে শিখেছিলাম এক দরবেশের কাছে। তিনি গাছের সঙ্গে একাকী কথা বলতেন। আমি তার অনুকরণে একদিন একটি গাছের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল গাছটি আমার সঙ্গে নিঃশব্দে জবাব দিয়ে চলেছে। বিষয়টি হয়তো এ রচনার অন্য কোথাও উল্লেখ করেছি। এর পুনরাবৃত্তিতে আমার কোনো শরম লাগছে না। অনেক সময় প্রকৃত তথ্য পরিতৃপ্তিসহকারে উত্থাপন করতে না পারলে পুনরোক্তিতে তেমন ক্ষতি হয় না। কবিকে তার রচনাস্রোত উদ্যাম রাখতে হলে উষ্ণ কামপ্রবাহ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে প্রকৃতির সবুজ রক্ত পান করে শীতল হতে হয়। আমি এই স্নিগ্ধতা আবিষ্কার করতে গিয়ে বহু অরণ্যে ভ্রমণ করেছি। পাহাড়-পর্বতে ছোটাছুটি করেছি। বাংলাদেশের সব নদীতে সাঁতার কেটেছি। আমার তৃষ্ণা এই একাত্তর বছর বয়সে এসেও নির্বাসিত হয়নি।

আমি আগেই কোথাও বলতে চেয়েছি আমি দার্শনিকতার ধার ধারি না। কারণ কবির মনে একবার দার্শনিকতার উদ্ভব ঘটলে কবিতার রহস্য পানির মতো তরল হয়ে যায়। আমি কবি মাত্র। দার্শনিক নই। দর্শন ও কবিতা একে-অপরের প্রতিপক্ষ। যদিও অঙ্গাঅঙ্গিভাবে এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। বয়স্ক কবিরা সব সময় লক্ষ করেছি, তারুণ্যকে দূরে রাখতে চায়। তরুণ কবিকে শনাক্ত করার কাজ বয়োবৃদ্ধ কবিরা বাংলাদেশে কখনও নিতে চায়নি। আমি সব সময় এর সমালোচনা করে এসেছি। আমি তারুণ্যের স্বীকৃতি দিতে কখনও অস্বীকার করিনি। তরুণ কবিদের পদ্যের চেয়েও তাদের চেহারা আমার কাছে রহস্যময় বলে ধারণা হয়েছে। আমার কাছে সাহস করে কোনো তরুণ কবি এসে কথা বলতে চাইলে তাকে আশ্রয় দিতে দ্বিধা করি না। তবে কিছু বেয়াদব তরুণ অসঙ্গতভাবে অগ্রজ কবিদের অপমান করতে চাইলে আমি এর জবাব দিতে ছাড়ি না। বেয়াদর তো শিল্পের সব ক্ষেত্রেই আত্মগোপন করে আছে। এরা সাহিত্য শিল্পের কোনো উপকার করে না। তবে অপকার এবং অসংযত আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এরা সাহিত্যে থাকে না কিন্তু এদের দুর্ব্যবহার সাহিত্যের সমালোচকরা বেশ কৌতূহলের সঙ্গে উল্লেখ করেন, যা আমি কোনোভাবেই সঙ্গত বলে মেনে নিতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের আগেই আমার পিতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছিল। এ ঘটনাটিকে কোথাও আমি বিস্তারিত বলতে পারিনি। মনে হচ্ছে, এই রচনাটির সমাপ্তিতে এসে যদি আমার পিতার এই বিয়োগান্ত মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করি তাহলে মন্দ হয় না। যতটুকু মনে পড়ে দেশে একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল। এতে গ্রামাঞ্চলের অনেক বাড়িঘর মাটির সঙ্গে লুটিয়ে পড়েছিল। আমি তখন ইত্তেফাকের মফস্বল বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম। আমাদের বাড়িঘর কী অবস্থায় আছে তা জানার আগেই জানতে পেরেছিলাম, আমার শ্বশুরবাড়ির সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী তখন আমার শ্বশুরবাড়িতেই ছিলেন। নিজেদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আমার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে শ্বশুরের মামাবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই বাড়িতে একটি ইমারত ছিল। তারা সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলেন।

আমি এ খবর পেয়ে দ্রুত ঢাকা থেকে বাড়ির দিকে রওনা হলাম রেলপথে। আমার ইচ্ছে ছিল ভৈরববাজার স্টেশানে নেমে আগে বীরগাঁও অর্থাৎ শ্বশুরবাড়িতে যাব এবং স্ত্রীকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গিয়ে অসুস্থ পিতাকে দেখব। ভৈরবের টিকিট নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি ট্রেনে চড়েই বুঝলাম আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি উচ্চ শ্রেণির টিকিট কেটে কামরায় উঠেই ঘুমিয়ে পড়লাম। মনে হয় এক অসাধারণ নিদ্রা আমাকে পেয়ে বসেছিল। কখন যে ট্রেনটা ভৈরববাজার এসে ব্রিজ পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, তা আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি। আমি গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছে আমার ঘুম ভেঙে গেল এবং চেতনা উদয় হলো যে, আমি বাড়িতে এসে গেছি। এটা শ্বশুরবাড়ি নয়। আমার নিজের বাড়ি অথচ বিপর্যয় ঘটে গেছে আমার শ্বশুরবাড়িতে।

যা হোক আমি স্যুটকেসটা নিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই আমার মা বলল, তুই শ্বশুরবাড়িতে যাসনি?

আমি বললাম, আব্বার অসুস্থতার কারণে আগে তাকেই দেখতে এসেছি।

লজ্জায় পড়ে আমি বেমালুম মিথ্যা কথা বললাম, কারণ আমি যে কেবল দৈবনিদ্রায় আক্রান্ত হয়ে ভৈরব নামতে পারিনি এটা আমি মার কাছে কীভাবে বলি! মা আঙুল উঁচিয়ে খাটের ওপর চাদর দিয়ে ঢাকা আপদমস্তক আমার আব্বাকে দেখিয়ে বললেন, আজ তোর আব্বার শরীর একেবারেই ভালো নেই। এই মাত্র ঘুমিয়েছেন।

আমি আমার ঘুমন্ত পিতার পায়ের কাছে গিয়ে তাকে কদমবুসি করলাম।

আমার মা এগিয়ে এসে বললেন, জাগাসনে। তুই বরং এক কাজ কর, একটা রিকশা নিয়ে গোকন ঘাটে চলে যা। এখন একটা লঞ্চ আছে না? এই লঞ্চে তুই গোসাইপুর নামতে পারবি। শুনেছি তোর শ্বশুরবাড়ি একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই নেই, তুই তাড়াতাড়ি বৌমাকে এনে আমার কাছে রেখে যা। তোর কাছে টাকা-পয়সা আছে তো?

আমি বললাম, হাজার তিনেক টাকা আমার কাছে আছে। এর মধ্যে বেতনের টাকাও আছে।

–না আমাদের দিতে হবে না। এই টাকাটা নিয়ে তোর শ্বশুরবাড়ি চলে যা। তারা কী অবস্থায় আছে সেটা বিবেচনা করে তোকে চলতে হবে। যা এক্ষুণি চলে যা।

আমি ঠিক এই সময় চাদর ঢাকা আমার পিতার মাথার দিকে তাকিয়ে দেখি চাদর সরে গেলেও তার ঘুম টুটেনি। গভীর নিদ্রায় তিনি মৃদু শব্দে ঘুমিয়ে চলেছেন। সেটা ছিল মহররম মাসের নয় তারিখ। আশুরার আগের দিন।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম এবং একটা রিকশা নিয়ে রওনা হলাম গোকন ঘাটের দিকে। এসে দেখি লঞ্চ নিলা এখন যাত্রী ওঠার তক্তাটি সরিয়ে ফেলার উপক্রম করছে। লঞ্চের লোকজন আমাকে ভালো করেই চিনত। কারণ লঞ্চের মালিক আমার এক আত্মীয়। আমি ছুটে আসছি দেখে তারা তক্তাটি যুক্ত করে আমাকে সাহায্য করল।

আমি গোসাইপুর ঘাটে নেমে দ্রুত হাঁটা শুরু করলাম। আমার ভাগ্য ভালোই ছিল। সন্ধ্যায় ফেরিঘাটে এসে ফের নৌকা পেয়ে গেলাম এবং কোনোমতো উর্ধ্বশ্বাসে এসে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছলাম। ঝড়ে শ্বশুরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, তবুও গত দুদিনে আমার শ্বশুর ক্ষয়ক্ষতি সামলে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেই ঘরটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল সেটি আবার যথাস্থানে খাড়া করেছেন। আমাকে দেখে তারা খুবই খুশি হয়েছে যে, আমি বিপদের সময় তাদের দেখতে এসেছি। আমার স্ত্রীকে আমি দুই হাজার টাকা দিয়ে বললাম, যে করেই হোক শ্বশুরকে এটা গছাতে হবে। কারণ আমি ও আমার স্ত্রী উভয়ে জানতাম আমার দেওয়া টাকা তিনি নিতে চাইবেন না। আমার স্ত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমরা উভয়ে জানতাম আমার শ্বশুর সব সময় আমাকে বিপদে-আপদে আর্থিক সাহায্য অকাতরে দিয়ে এসেছেন। এই টাকা কি তিনি নেবেন?

আমার স্ত্রীর প্রশ্নবোধক মুখের ওপর আমি তাকিয়ে রইলাম। আমি বললাম, টাকটা আব্বা তো নেবেন না। তুমি বরং আম্মাকে গছিয়ে দাও।

যা হোক শত কষ্টের মধ্যে থাকলেও আমার শাশুড়ি জামাই এসেছে এ কথা ভেবে পাশের বাড়ির দুটি ছেলেমেয়েকে ডেকে মোরগ জবাই করালেন। রাত আটটার দিকে আমি সবে খেতে বেসেছি এ সময় উঠোনে দাঁড়িয়ে একজন আগন্তুক আমার নাম বলে শ্বশুরকে ডাক দিল। আমার শ্বশুর দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন যে, আমার এক খালাতো ভাই উর্ধ্বশ্বাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দৌড়ে এখানে চলে এসেছেন।

কী ব্যাপার? আমার খালাতো ভাই! তার নাম শাহজাহান। কেন হাজির হয়েছে? এই অসময়ে। কৌতূহলী হয়ে আমি বাইরে এলাম। বললাম, কী হয়েছে শাহজাহান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহজাহান কতক্ষণ চুপ থেকে বলল, পিয়ারু ভাই (আমার ডাকনাম) আপনার চলে আসার পরই আপনার আব্বা ইন্তেকাল করেছেন। আপনাকে খালাম্মা খুব ভোরে রওনা হওয়ার কথা বলেছেন। আমি বললাম, তাছাড়া এখন আর উপায় কী?

সে রাতে কেউ ঘুমাতে পারিনি। খুব সকালে পাশের গ্রামে আমার বোনের বাড়ি থাকায় সেখান থেকে বোন-ভগ্নিপতিসহ বাইশ মৌজার বাজার থেকে আমরা ভৈরব এসে ট্রেনে চাপলাম এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হাজির হলাম। আব্বার লাশ তখন ঘরের বাইরে এনে রাখা হয়েছে। দিনটা ছিল ১০ মহররম। আমাদের গাঁয়ের অন্য প্রান্ত থেকে ঢোলের শব্দ শুনছিলাম। কারণ মহররমের ১০ তারিখ লাঠিখেলার একটা প্রদর্শনী হতো সম্ভবত সেই আয়োজন চলছে।

গাঁয়ের গোরস্থানে আমার পিতাকে দাফন করা হলো। কবরস্থান থেকে ফেরার সময় আমি আমার চাচাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আব্বার বয়স কত হয়েছিল?

আমার চাচা বললেন, আটষট্টি হবে।

আমার সহসা মনে হলো আব্বার তেমন বয়স হয়নি।

মনে হয় সম্পূর্ণ কর্মক্ষম অবস্থায় তার মৃত্যু না হলেও বয়সটা কমই ছিল।

আমরা কয়েক দিন বাড়িতে থেকে আব্বার চল্লিশার আয়োজন করে আত্মীয়-স্বজনকে সামান্য জিয়াফতের খাদ্য পরিবেশন করতে পেরেছিলাম। কিংবা হয়তো সেটাও ঠিকমতো পারিনি। আমার ঠিক মনে নেই।

আমি আমার স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম। আমার শৈশবের অনেক স্মৃতি এবং স্বপ্নের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। যদিও আমার আম্মা যতদিন ছিলেন ততদিন আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার একটা টান অনুভব করতাম। এখন সেই টানও চলে গেছে মায়ের মৃত্যুর পর।

কবিকেও মানবিকত ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু আমার আক্ষেপ আমার পিতার অতি অল্প সময়ে জীবন অবসান হয়েছিল।

তিনি ছিলেন নিগূঢ় আধ্যাত্মে অটল মানুষ। তিনি সুফি ছিলেন বটে। একই সঙ্গে ছিলেন ঘোর শরিয়তপন্থী। নামাজি। এবাদত গোজার মানুষ। তার চেহারাটি আমাকে সারাজীবন সাহস জুগিয়েছে। তবে সংসার সম্বন্ধে উদাসীনতা তাকে চিরদরিদ্র করে রেখেছিল। এ কথা যখন ভাবি তখন একাকী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি। কাঁদি কারণ পিতাকে যে সাহায্য তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে করার কথা, তা করতে পারিনি। আমার খ্যাতি, অখ্যাতি পর্যায়ক্রমে এসে বাংলাদেশে আমাকে পরিচিত করে তুলেছে তা আমি কী করে ভুলি? তিনি আমাকে পঠিত কুরআনের কিছু অংশ হেফজ করিয়েছিলেন বলেই না আমি সালাত কায়েম রাখতে পেরেছি। তার কাছেই শিখেছি যে, মানুষ অপার রহস্যের আধার। তিনি সুফি ছিলেন। এটা যেমন সত্য তেমনি শরীয়তের একটা নিষেধও তিনি অমান্য করেননি। তিনি আমার মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ভালোবাসার প্রভাব তাঁর প্রতিটি ছেলেমেয়ের ওপর গভীরভাবে ছায়া ফেলত এবং এর প্রভাব আমাদের নিজেদের সংসারেও বজায় রাখার চেষ্টা করেছি আমরা।

'বিচূর্ণ আয়নার কবির মুখ' এই শিরোনামে যা কিছু লিখেছি তা একজন কবির জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র মাত্র । কিন্তু এটা জীবনের কোনো সামগ্রিক চিত্র নয়। যদি কেউ আমার সমগ্র সাহিত্য এবং জীবনের কেচ্ছা নিয়ে আমাকে জানতে চান তাহলে সেটা পাঠকের পরিশ্রমের ব্যাপার হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে চর্চা করতে গিয়ে সেখানে আমাকেই পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে এই ধারণা যে, আমি কবি ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না। কিছুই না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির সৃজনবেদনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

নাজমুন নেসা পিয়ারী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

আমার এ সময়কার সাহিত্য চিন্তা যে সব সাম্প্রতিক রচনায় প্রকাশিত এবং প্রকোটিত হয়েছে এর সবগুলোই ছাপা হয়েছে সমসাময়িক দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীগুলোতে। এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংকলন করে একটি বই প্রকাশের ইচ্ছা আমার মধ্যে কাজ করছিল। এ সময় বিদ্যাপ্রকাশের জনাব মজিবর রহমান খোকা ভাই একদিন আমার বাসায় এসে আমার একটি বই প্রকাশের প্রস্তাব দিলে আমি 'কবির সৃজনবেদনা' রচনাগুলো সংগ্রহ করে তাকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিই।

আমি খুব একটা গুছানো মানুষ নই। পত্রিকার কাটিং সংগ্রহ করে যত্নে রাখা আমার দ্বারা কোনোদিনই হয়নি। কিন্তু এই লেখাগুলোর প্রতি আমার এতটাই আকর্ষণ ছিল যে, আমি এর কিছু কিছু কপির কাটিং আমার ভক্ত পাঠকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি। বিচিত্র বিষয় এই প্রবন্ধগুলোতে সম্পৃক্ত আছে। সাহিত্য, নাটক, কাব্য ভাবনা এবং সমসাময়িক কাল নিয়ে আমার নানা চিন্তা এতে ঠাঁই পেয়েছে। ঠাঁই পেয়েছে আমার কবি জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অনেক অভিজ্ঞতা। এই বইয়ে আমি আমাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছি। আমার সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা অপবাদ তরুণ লেখদের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষাত্মকভাবে ছড়ানো হয়েছে। আমি কোনোদিনই এ সবের জওয়াব দিতে চাইনি। আমি জানি আমার বিশ্বাস ও সাহিত্য কৃতী একদিন পাঠকের কাছে সত্যিকার বিচার পাবে। এখনো পাচ্ছে। তবে আমার প্রতি অনেকের অকারণ বিদ্বেষের কথাও আমি জানি।

আমি সারাজীবন কবিতা লিখে, গল্প-উপন্যাস লিখে কাটিয়ে দিতে পারব তা কখনো ভাবিনি। কিন্তু আমার সৌভাগ্য এই যে, আমি সারাজীবন লিখেই কাটিয়ে দিয়েছি। 'কবির সৃজনবেদনা' শুধু একটি প্রবন্ধের বই নয়। এতে একজন কবির মর্মবেদনাও আছে। কিন্তু বিদ্বেষ নেই। আমি এ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি সব কিছুকেই একজন কবির কাজ হিসেবে গণ্য করা হলে আমার খুব ভালো লাগবে। এ যুগের কোনো কবি তো আর শুধু কবিতা লিখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারেনি! আমিও পারিনি!!

ভ্রমণ, বিচরণ ও নানা অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার লেখায় তার কিছু উল্লেখ থাকতেই পারে। এই বইটি যারা আমার সাহিত্য চর্চাকে এতদিন উৎসাহিত করেছেন তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতেও পারে।

আল মাহমুদ
০৭. ০২. ০৫
কেয়ারি শান
রোড-২৩/বি, হাউজ-৬
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

কবির সৃজনবেদনা

একবার আমি 'কবির অভাবে দেশ' বলে একটা কবিতা লিখেছিলাম অবশ্য দ্বিধান্বিত চিত্তে। ভয়ে ভয়ে। কারণ আমি তো জানতাম আমাদের দেশের দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পৃষ্ঠায় নিয়মিত যে কবিতা ছাপা হয় তা আকাশের নিষ্প্রভ তারাদের চেয়েও বেশি এবং গুণে দেখতে গেলে এক ধরনের দুঃসাধ্য গণনা। যে তারার নিজস্ব কোনো আলো নেই তা বেশি টিপ টিপ করে। পরে অবশ্য আমার এ জন্য অনুতাপ হয়েছে। কারণ আমি নিজেও তো কবি। আর লেখালেখির ব্যাপারে আমারও তো কোনো ক্লান্তি নেই। প্রায়ান্ধ চোখ নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে পরনির্ভরশীল হয়ে কবিতাই লিখতে চাইছি। চাইছি বাজারে আমার নামটি উপস্থিত থাকুক। এ নামের প্রয়োজন আছে কি নেই যেন সে বিবেচনা আমার নয়। এ বিবেচনা তবে কার? কে এসে আমার মুখের উপর বলবে তোমার দুর্গন্ধময় পঙ্‌ক্তি বস্তায় বন্ধ করো। এদেশের সব কাজই বিরক্তিকর হলে কেউ বাধা দেয়। কিন্তু পদ্যকারদের কেউ তো থামতে বলতে পারে না।

এই স্বাধীনতাই আধুনিক বাংলা কবিতার সমস্ত রহস্যকে পানসে করে দিয়েছে। একটা জাতির সমস্ত স্বপ্নই যখন একই স্বপ্নে পর্যবসিত হয় তখন বুঝতে হবে এদের আর উদ্ভাবনা শক্তি নেই। আমি বলব না আমাদের সাহিত্যে এখন নৈরাজ্যের যুগ চলছে। কিন্তু কবিতার যখন রক্ত-মাংস থাকে না তখন আমার নিজের মন বিরাম প্রার্থনা করে। মনে হয় যেখানে বা যে গ্রামে আমার জন্য খানিকটা বিশ্রাম জুটবে সেই বিরামপুরে চলে যাই। কবির প্রধান কাজ হলো তার স্বজাতি ও স্বভাষার নর-নারীকে কল্পনায় সাঁতার দিতে শেখানো। দেশপ্রেমে, আত্মপ্রেমে, আত্মলিপ্সায় এবং প্রকৃতির মাধুর্যকে উপলব্ধিতে আচ্ছন্ন করে রাখা। শুধু কবির আত্মবিবৃতি গত শতাব্দীতে আধুনিক কবিতার প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দী ছিল পুঁজিবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের যুগ। আর বিশ্ব কবিতা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে সমাজতন্ত্রেরই পক্ষ নিয়েছিল। যেন মার্কসবাদী না হলে কারও পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব নয়। যারা এই ছকের বাইরে দাঁড়িয়ে কবিতার কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রধান। তিনি জন্মেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে যেটা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাকেও দিকভ্রান্ত করে ফেলেছিল প্রায়। কিন্তু তার আধ্যাত্মশক্তি তাকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। তিনি নোবেল বিজয়ী ছিলেন এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একজন প্রাচ্যদেশীয় কবি ফ্যাসিবাদকে পাশ কাটিয়ে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর বিপরীতে বিশ্বাসের জয়গান গেয়ে উঠেছিলেন। আর সেই জয়গান প্রতিধ্বনিত হয়েছিল পশ্চিমা পুঁজিবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহরগুলোতেই। কিন্তু এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হলো আধুনিক সাহিত্যের প্রবক্তা পৃথিবীর সব কবি সাহিত্যিকেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় নিজেদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। একবিংশ শতাব্দী শুরু হবার আগেই সমাজতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন এবং বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে পচন ধরে যায়। শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বের পক্ষে সৃজনশীল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বর্তমানে পুঁজিবাদ এমন এক অপরাজিত দৈত্য হিসেবে আকাশের দিকে মাথা তুলেছে যা পৃথিবীর সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দার্শনিক ও বিপ্লবীদের চিন্তার ত্রিসীমার মধ্যে ছিল না। এর মানে এ নয় যে এই দৈত্য অমর। কিন্তু তার মৃত্যুর প্রাণ ভোমরাটি কোথায় লুকায়িত তা কেউ জানে না। অন্তত দার্শনিক ও বিপ্লবীরা তো জানেন না বলেই মনে হচ্ছে। কেবল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী সৃজনশীল কবি-সাহিত্যিকরাই তাদের রচনায় ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এই অপরাজিত দানবের পরাজয় ঘটবে নির্যাতিত মানুষের হাতেই। মানবতার হাতেই। ধর্মের হাতে এবং ইতিহাসের নিয়মে।

ইতিহাস ইতিহাসকেই রক্ষা করতে চায় এবং ইতিহাস শব্দের দ্রুততম অর্থ হলো সভ্যতার বিবরণ। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে তবে কি সৃজনশীল মানুষ অর্থাৎ পৃথিবীর কবিরাই ওই দৈত্যের প্রাণ ভোমরা কোথায় লুকায়িত, কোন্ সমুদ্রের নিচে, কোন্ সিন্দুকের ভেতর তা জানেন? দার্শনিকরা যদি হঠাৎ বলেন, দর্শনের কাজ হলো জগতের ব্যাখ্যা নয় জগতটাকে বদলানো। তবে কবিরা কেন বলতে পারবেন না জগতটা বদলে যায় কোনো দার্শনিক নিয়মে নয়। কোনো ডায়ালেক্টিক পদ্ধতিতে নয়। কোনো শ্রেণি সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় নয়। জগতটা বদলে যায় মানুষের স্বপ্নে। মানুষের আশায়, মানুষের বিশ্বাসে ও মানবতার ধর্মে। সর্বোপরি মানুষের বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধু গবেষণায় আয়ত্ত হয়নি। ল্যাবরেটরিতে কিংবা মানুষের মস্তকে অকস্মাৎ তা স্ফুলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়। মানুষ হঠাৎ পেয়ে যায়। যেমন একজন কবি ছন্দ, মিল ও উপমা অলৌকিকভাবে একদিন পেয়ে গিয়ে এক অসাধারণ কাব্য সৃষ্টি করেন।

আমাদের দেশে যে কোনো কারণেই হোক কাব্যই হয়ে উঠেছে আধুনিক ও মননশীল সাহিত্যের প্রতিভূ। অথচ কে না জানে সারা পৃথিবীতেই আধুনিক মননশীল সাহিত্য হিসেবে এ সময়ের পাঠকের কাছে কবিতা সে সম্মান পাচ্ছে না। বরং গল্প-উপন্যাস অর্থাৎ সাম্প্রতিক ফিকশন ন্যায়সঙ্গতভাবেই পাঠকের কাছে আধুনিক পাঠ্য বিষয় হিসেবে মর্যাদায় সমাসীন। কবিতা আমাদের দেশে কেন এতটা অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছে তা দুর্বোধ্য নয়। কারণ এদেশে সব সময় প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে নিয়ম ভাঙা সৃজনশীল হিসেবে কবির একটা স্পষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু অতি সম্প্রতি গদ্য বা কথাশিল্প তার নিজের ভূমিকা ও মর্যাদা আদায় করে নিতে আগুয়ান হয়েছে। এতে অবশ্য কবিদের ভয় পাবার কিছু নেই। কারণটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। কাজের কাজ হলো সমকালীনতার সাক্ষ্য দেয়া নয়। বরং সমকালীনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে যে রহস্য আছে সেই রহস্যের নিগূঢ় অন্তরালকে উন্মোচন করা। অর্থাৎ মানুষের মনে আশা-ভরসা ও স্বপ্ন সৃষ্টি করা। এখানে কোন কবি প্রধান ভূমিকা পালন করবেন বা করছেন এটা ধর্তব্যের বিষয় নয়। কারণ দেখা গেছে যে, সমকালের অনেক প্রধান কবি আয়ু ফুরিয়ে গেলে নিঃশেষিত হয়ে যান। এমনকি পাঠক নিজের অজান্তেই সেই কবির নাম উচ্চারণ করতে ভুলে যায়। যেহেতু কবরের মাটি ফাটিয়ে ওই কবির প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তার নামটি মুদ্রিত করার জন্য প্রত্যাবর্তনে আর পারঙ্গম হন না সম্ভবত সে কারণেই বিস্মৃতির অন্ধকারে এক ধাপ মাটির নিচেই তাকে পরকালের অপেক্ষা করতে হয়। তিনি পরকাল মানুন আর না মানুন অপেক্ষার জগতে তাকে থাকতেই হবে সুবিচারের আশায়।

আমাদের সাম্প্রতিক কবিতা মূলত একবিংশ শতাব্দীর কবিতা হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এ সময়ের কবিতার সমস্ত উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও বিবরণ অত্যন্ত গতানুগতিক এবং গত শতাব্দীর অনুসঙ্গে ঠাসা। প্রেম যে কবিতার একটি মহার্ঘ বিষয় সেটাও যৌনতাড়িত তরুণ কবির পঙ্ক্তি রচনায় হাস্যকর হয়ে উঠেছে। তাদের কবিতা পড়ে মনে হয় তারা তাদের সমস্ত প্রেমের আর্তি মূলত তাদের চেনা কয়েকটি নারীকে ছলেবলে করায়ত্ত করার মরিয়া প্রয়াস মাত্র। প্রেমের কৌশল কখনো প্রেম নয়। প্রকৃতির ভেতর পাখি ধরার শিকারীর ফাঁদের মতো চতুর চেষ্টা। এতে এই যুগের যুবতীদের যেহেতু কোনো আস্থা সৃষ্টি হয় না সে কারণে তারা কবিতা নয় গদ্যে ঘটনার বর্ণনা চায়। চায় হুমায়ূন আহমেদ কিংবা ইমদাদুল হক মিলনকে চেখে দেখতে। প্রেমের কবিতা মাঠে মারা পড়ে। আমি কিছুদিন আগে নব্বই দশকের কবিতার ওপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এতে সাম্প্রতিক কবিতার প্রতি আমার যে গভীর আস্থা ও সন্দেহ ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে তা বলতে চেয়েছি। এই জট ছাড়াতে পারে একমাত্র একালের প্রতিভাবান কবিত্ব শক্তি। তেমন কবি আমাদের নেই এটা সত্য নয়। আমি কিছু কিছু লক্ষণে তাদের চিনতে পারলেও দৃঢ়মূল সনাক্ত করার মতো শক্তি আমার কোথায়। আমি আগামীকালকে ঈর্ষা করি না। তবে আগামীকালের সূর্যালোক আমার বয়সের জন্য যদি আমার কাছে স্পষ্ট না হয় তাহলে হলফ করে একথা কি বলা যায় আমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা?

জীবনানন্দ দাশ কি জানতেন যে তার মৃত্যুর পর শামসুর রাহমান বা আল মাহমুদ বলে কোনো কবি এসে বাংলা ভাষার মৌচাকে মধু সংযোগ করবে? না, জীবনানন্দ তা জানতেন না। তার রচনায় এমন কোনো আশাও ব্যক্ত করে যাননি। নতুনত্বের স্ফুরণ অন্তত কাব্যে চিরকালই অভাবিতপূর্ব-আকস্মিক। প্রতিভাবান কবিত্ব শক্তি তার কালকে জিজ্ঞাসা করে আবির্ভূত হন না এবং কোনো হিসাব দিয়ে কোনো জবাবদিহি করে অস্তমিতও হন না। প্রকৃত কবি তার কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত থাকেন এমন কথা আমি সাহিত্যের ইতিহাসে খুঁজে পাইনি। আমি নিজেও নিঃশঙ্কচিত্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আয়ুষ্কাল অতিক্রম করে যাচ্ছি। আমি আমার শাকান্ন আহার করে পরিতৃপ্ত। আমি যিশু খ্রিস্টের মতো কখনো বলব না যে সিজারের মুখ আঁকা মুদ্রা সিজারকে দাও। আর ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও। আমি বরং কবি হিসেবেই চিরকাল একথা বলে যাব যে, সিজারের মুখ আঁকা মুদ্রাও আমার প্রভুকে দাও। আমার বিশ্বাসের বেদীতে তর্পণ করো। কোরবানি করে দাও নিজেকে আমার প্রভুর বেদীতে।

শেষ পর্যন্ত দার্শনিকতা কাব্যরস সৃষ্টিতে কবিকে নানা ধরনের দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতায় নিমজ্জিত করে। বচন সৃষ্টির প্রাথমিক শর্ত হলো আনন্দ। কবির মনে আনন্দের আকাঙ্ক্ষা জমে উঠলে তিনি উপযুক্ত ভাষায় সে আনন্দ ব্যক্ত করার আয়োজন করবেনই। ছন্দ, মিল মাত্রাও কবির সহজাত দক্ষতার বিষয়। এসব কবিকে কখনো ব্যাকুলতায় ভোগায় না। এ নিয়ে তার বিশেষ বিবেচনা থাকতে পারে। কিন্তু আনন্দটাই প্রকাশযোগ্য বেদনা হয়ে তার সত্তাকে আকুল করে।

আমাদের দেশে কবির প্রধান বিপদ হলো রাজনীতি, রাজনীতিবিদদের দ্বারা কবিকে দলীয় পক্ষপুটে টেনে আনা। রাষ্ট্র কবির পৃষ্ঠপোষকতা করুক এটা কবি মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু দলীয় রাজনীতি কবিকে বৃত্তবদ্ধ রাখুক এটা কবিতার জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। রাজনৈতিক বৃত্তে আবদ্ধ কবিমাত্রই আক্ষেপের রোগে আক্রান্ত থাকেন। এ রোগ যক্ষ্মার চেয়েও ক্ষয়কারী এবং কর্কটের চেয়ে উৎকট। এদেশের সর্বাধুনিক চিন্তার উদগাতা সব সময় কবিরাই হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, নির্বোধ রাজনীতি সব সময়ই কবিকে আশ্রয়দাতা ছদ্মবেশে নিরাশ্রয় এবং জনগণ ও সমাজ থেকে অনিকেত রাখতে চেয়েছে। কবিকে দিয়ে এমন কথা বলাতে চেয়েছে যা কোনো অবস্থাতেই কবির জিহ্বা থেকে নিঃসৃত হতে চায় না। অথচ শাসক ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীরা নির্বোধ বলে তা সর্বপ্রথম যিনি উপলব্ধি করেন তিনি কবি। রাজার নৈকট্যপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীরা নির্বুদ্ধিতার প্রশংসাকারী। এটাই তাদের জীবিকা। কবি চিরকালই জীবিকা বিষয়ে উদাসীন প্রাণি।

তবুও আমাদের দেশে কাব্য সৃষ্টি হয়। এর কারণ এদেশের প্রকৃতি এবং ঘন সবুজ পল্লবে আচ্ছাদিত রসালো মাটি। প্রকৃতি কিছু মানুষকে জাগতিক বাস্তবতা বিষয়ে উদাসীন করে জন্ম দেয়। এ জন্যই 'সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' আমি তরুণ কবিদের সর্ব প্রকার কাব্য প্রয়াসকেই সমর্থন করতে চাই। তবে কবি হিসেবে আমার ঈর্ষা ও সমালোচনার কথাও আমি অস্বীকার করি না। প্রচলিত কথা হলো যে কবিতা তারুণ্যের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি কবিতা তথা সৃজনশীল সাহিত্য বহু বিচরণশীল অভিজ্ঞতা ও বার্ধক্যেরও মুখাপেক্ষী। ব্যাপক পাঠ ও পর্যবেক্ষণের কাতরতায় কম্পমান। কবি অধ্যাপনাবৃত্তি গ্রহণ না করুক এটাই আমার পছন্দ। তবে কবিকে বলতে হবে। বক্তৃতায় এবং বিবরণদানে কবির মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা একান্ত কাম্য। মনে রাখতে হবে তরুণ শব্দটির অর্থ হলো কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়সী, কম অভিজ্ঞতা ও অল্পবোধসম্পন্ন চঞ্চল প্রাণ। এমন একটা তারুণ্য জগতের সব কবিকেই অতিক্রম করে আসতে হয়। কিন্তু বার্ধক্য ও পূর্ণতা কবিকে প্রবীণ করে তোলে। একথা ভুলে গেলে কবির চলে না।

সাম্প্রতিককালের কবিতায় যে কোনো নতুন উপমা বা উৎপেক্ষা নেই এমন নয়। নব্বই দশকের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে আমি তাদের উদ্ভাবনা শক্তির প্রশংসা না করে পারিনি। আমরা ওই ধরনের উদ্ভাবনার পরিচয় আমাদের কালে দিতে পারিনি। কারণ আমরা জন্মেছিলাম আমাদের সময়ের গর্ভে। আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা এর কাব্যময় বর্ণনাও দিয়েছি এবং তা আমাদের পাঠকদের খানিকটা পরিতৃপ্তিও করতে পেরেছে।

আমার সময়ের কবিবন্ধুরা আমাকে এই বলে ঠাট্টা করতেন যে আমি ঢাকা এসেছিলাম গায়ে খদ্দরের পিরহান এবং পরনে খদ্দরের পাজামা ও রবারের স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে। আমার বগলের নিচে নিয়ে এসেছিলাম একটা ভাঙা টিনের সুটকেস। যার গায়ে গোলাপফুল আঁকা। তারা একবিন্দুও মিথ্যে বলেননি। প্রকৃতপক্ষে আমি এভাবেই ঢাকায় এসে হাজির হয়েছিলাম। এসেছিলাম অবশ্য কবি হতে। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল আমি এই শহরে আছি। আমার ভাঙা সুটকেসের ভেতর আমি নিয়ে এসেছিলাম বাংলাদেশের সবগুলো নদী, পাখি, পতঙ্গ, নৌকা, নর-নারী অর্থাৎ বহমান আস্ত একটি বাংলাদেশ। যা আমি নিয়ে এসেছিলাম আমার ভাঙা সুটকেসের ভেতর তা তো একটি একটি করে আমার জাতিকে আমি দেখিয়েছি। যেমন জাদুকরেরা তাদের দ্রষ্টব্য তাদের মুগ্ধ দর্শককে দেখায়। আমিও কি আমার লওয়াজিমা একটি একটি করে দেখাইনি? বহমান জীবনের সমস্ত বাস্তবতা আমার ওই গোলাপফুল আঁকা ভাঙা সুটকেসে ছিল। তা আমি আমার জাতিকে দেখিয়েছি। আমার দ্রষ্টব্য দেখে তারা কখনো হাততালি দিয়েছে, কখনো অশ্রুসিক্ত হয়েছে। আমি এখনো এই শহরেই আছি। আমি যখন এসেছিলাম তখন আমার বন্ধুদের বগলের নিচে থাকত সিলেকটেড পয়েমস জাতীয় ইউরোপের নানা ভাষার নানা বাছাই করা কাব্যগ্রন্থ। আমি যেমন আমার ভাঙা সুটকেস থেকে আমার জিনিস বের করে দেখিয়েছি তারাও তাদের বগলের নিচের পুঁজি থেকে নানা ভেলকি দেখিয়েছেন। আমি তো এখনো এই শহরেই আছি। আমার সেইসব বন্ধুদের অনেকেরই এই সৌভাগ্য হয়নি। তারা এখন আর দেখাবার মতো কোনো কিছু তাদের বগলের নিচ থেকে বের করতে পারছেন না। তাদের আয়োজন ও উদ্যম ফুরিয়ে গেছে। তারাও আমার মতো বয়সের ভারে জর্জর। রোগ-শোকে ক্লান্ত। তাদের প্রতি আমার সহানুভূতির কোনো সীমা নেই। কিন্তু তাদের অনেকেরই নাম এই মহানগরীর তারুণ্য আর উচ্চারণও করে না। হয়তো তারা নিজেরাও এই সংবাদ অন্যের মুখে শুনতে পান। কাব্য কোনো সময়ই কোনো প্রতিযোগিতার ব্যাপার ছিল না। ঈর্ষার ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। ছিল আনন্দের বিষয়। ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। প্রকৃত কবিরা রবারের স্যান্ডেল পরে। খদ্দরের জামা গায়ে দিয়ে ভাঙা সুটকেস নিয়ে চিরকালই শহরের দিকে যাত্রা করেন। আর ফিরে যান না।

এক পদাতিকের অন্তিম বিশ্রাম

কোনো কোনো কবি-প্রাণের সহসা অন্তর্হিত হওয়াটা তার অনেক পরবর্তী কবিকেও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। সহসা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ আমাকে একটু স্থবির এবং স্তম্ভিত করে দিয়েছে। যেন এক ধরনের ধীরে চলার নির্দেশের মতো। এ সংবাদ যেন বলতে চাইছে ধীরে পা ফেল। বলতে চাইছে সামনে এগোতে গেলে পেছনের দিকে মাঝে মাঝে ফিরে তাকাতে হয়। যে অবস্থাকে কবি কালিদাস চকিত হরিণ প্রেক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আমি প্রথম দেখেছিলাম ঢাকার এক সাহিত্য সম্মেলনে। সম্ভবত ৫০ দশকের গোড়ার দিকে কিংবা শেষের দিকেও হতে পারে। এখন ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। সম্মেলনটি হয়েছিল কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে ক'জন কবি-সাহিত্যিক এসেছিলেন, তার মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন আদর্শগত আকর্ষণের জন্য আমার কাছে প্রধানতম কবি ব্যক্তিত্ব। তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছরের তরুণ কবি হিসেবে। আমি ও কবি ওমর আলী মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখছিলাম। তিনি এমন সুন্দরভাবে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে দর্শকদের মোহগ্রস্ত করে রাখলেন। কবি হিসেবে আমরাও খুশিতে আটখানা হয়ে গেলাম।

তার আবৃত্তির ঢংটি ছিল আধুনিক বাংলা কবিতার নাদ শিল্পের সর্বশেষ উচ্চারণ ভঙ্গি বা স্বরক্ষেপণের, দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমরা কম্পিত হয়েছিলাম, অভিভূত হয়েছিলাম এবং একই সাথে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাদের পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ ভঙ্গির ধরন-ধারণ বদলাতে হবে।

পরবর্তীকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাথে আমার নিজের বিশ্বাসের বৈপরিত্যের সৃষ্টি হলেও আমি এ মহান কবির কবিতা পাঠ করে উপকৃত হয়েছি। শব্দ কি করে মুহূর্তের মধ্যে চিত্তকল্পে রূপায়িত হয়ে যায় তা মূলত বাংলা ভাষার পাঠকরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্টাইল থেকে সহজেই উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। তিনি শব্দকে গড়িয়ে নিয়ে যেতে অতিশয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি পঙ্‌ক্তিকে কোথায় ভাঙতে হবে তা উত্তম রূপে জানতেন। তার সাথে মিশ্রিত হয়েছিল তার রাজনৈতিক বিশ্বাস। তিনি মার্কসবাদী ছিলেন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ছিল অগাধ আস্থা। তিনি স্ট্যালিনের ওপর মনোমুগ্ধকর কাব্য রচনা করেছিলেন। যদিও জোসেফ স্ট্যালিন সেই সময়ই সোভিয়েত রাশিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কবি-শিল্পী-সাহিত্যিককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ডে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। তা বলে বাংলা ভাষার চল্লিশ দশকের অন্যতম প্রধান কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা অর্থ হারিয়ে ফেলেনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সোভিয়েত শাসনকে সমর্থন করেছিলেন মানব জাতির পক্ষাবলম্বনকারী প্রথম অগ্রবর্তী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে। এ সমর্থন যুক্তিযুক্ত ছিল। রুশ কমিউনিস্টরা এবং তাদের নেতৃবৃন্দ বিশ্ববাসীকে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেননি বলে একজন সমাজবাদী, মানবদরদি ও বিবেকবান কবির রচনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। কমিউনিস্ট হিসেবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের পক্ষাবলম্বন করে যেসব কবিতা রচনা করেছেন তা মানুষের কবিত্ব শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার হিসেবে চিরকাল আমাদের প্রেরণা যোগাবে। এমনকি আমার মতো একজন ধর্মপ্রবণ কবি মানুষকেও।

তার মৃত্যুতে আমি হতচকিত হয়ে পড়েছি। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে বেড়াচ্ছি। সুভাষদা কবি ছিলেন, তিনি মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কমিউনিজমের প্রতি তার অটুট আস্থা পরবর্তী জীবনে ভেঙে পড়েছিল বলে আমরা তো তার রচনাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি না। কবি মানুষ মাত্রই সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে জ্ঞানী হয়ে ওঠে, অন্য মানুষের ভরসাস্থল হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে কালে সর্বশেষ অক্ষর লেখার উপযোগী। আমরা তার হৃদয় থেকে নিঃসৃত শব্দরাজিকে মানব হৃদয়ের অমৃত রসায়ন হিসেবে অনবরত পান করতে থাকি। এই পান আমাদের মধ্যে নেশার বদলে স্বপ্ন সৃষ্টি করে, প্রেম সৃষ্টি করে। আমাদের মধ্যে দয়া ও ভ্রাতৃত্বের জন্ম দেয়। আমরা সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতা অতিক্রম করে বেঁচে থাকতে পারি এবং অন্যকেও বাঁচার জন্য সাহসী করে তুলি।

আমাদের কৈশোরকালে তুর্কি বিশ্বকবি নাজিম হিকমতের নাম প্রথম শুনতে পাই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি নাজিম হিকমতের কবিতার এমন একটি অনুবাদ করেন, যা পাঠ করে আমরা প্রথম তুর্কি সাহিত্য সম্বন্ধে সচকিত হয়ে ওঠি। তুর্কি সাহিত্যে নাজিম হিকমত যে এক মহাকবি তা যদিও ওই রচনা থেকে আন্দাজ করা যায়নি কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম আমাদের আধুনিক তুর্কি সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের দিকে একটা জানালা খুলে দেন। নাজিম হিকমতের সেই দীপ্ত উচ্চারণ, মাতৃভূমির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা 'ও আঙ্কারা আমি তোমাকে এক মার্কিন খালাসির কবল থেকে রক্ষা করেছি।'

নাজিম ছিলেন তার কালে সবচেয়ে বড় সমাজবাদী কবি—একথা আমরা জানলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে।

দ্বিতীয়বার সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গীতা মুখোপাধ্যায়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল এশীয় কবি সম্মেলনে, ভূপালে। সেখানে তাকে 'কবির সম্মান' পুরস্কারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূষিত করা হয়। আমি ছাড়াও কলকাতার কবি সবুজ সরকার এবং মল্লিকা সেন গুপ্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সম্মাননা গ্রহণ করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল অসাধারণ। সারা উপমহাদেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল বেশ পরিপূর্ণ। এই অধিবেশনের আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পর্বে আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমার কবিতা পাঠ করে মঞ্চ থেকে নেমে এলে যে দু'জন বড় কবি প্রতিভা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অন্যজন উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি আলী সরদার জাফরী। দুপুরের দিকে আমি যখন সম্মেলন ক্ষেত্র থেকে লাঞ্চের জন্য হোটেলের দিকে পা বাড়িয়েছি, তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং কবি নবনীতা দেবসেন আমার সামনে এসে বললেন, চলো ভূপালে প্রবাসী বাঙালিরা আজ আমাদের নিমন্ত্রণ করেছে। এসো গিয়ে মাছ-ভাত খেয়ে আসি।

সেখানে আমি প্রথম সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে খুব কাছ থেকে দেখে এবং কথা শুনে অভিভূত হয়েছিলাম। তিনি অকপটে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আমার কবিতা বেশ মুগ্ধতার সাথে পড়েছেন এবং কোথাও কোথাও আমার কবিতার বিষয়ে দু'এক কথা বলেছেন।

এবার সুভাষদার কবিতার বিষয়ে আমি দুটি কথা বলতে চাই। আহা, কতই না ভালো হতো যদি আমি এ কথাগুলো সামনাসামনি বলতে পারতাম। এখানে বলে রাখা ভালো, তিনি যতবার ঢাকায় এসেছেন, আমার কথা কখনও ভুলেননি, আমার খোঁজখবর নিয়েছেন। যেমন তিনি তার এককালের বন্ধু ফররুখ আহমদের খোঁজখবর নিতেন। কবি ফররুখ আহমদের কুশল জানতে তিনি খুবই আগ্রহ দেখাতেন। যতবার ঢাকায় এসেছেন ততবারই কবি ফররুখ আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন। কিন্তু আমাদের এ মহানগরী ঢাকায় প্রগতিবাদী সাহিত্যিকবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীদের সংগঠনগুলো মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সেখানে পৌঁছতে কোনো সাহায্য করতে রাজি ছিলেন না। কারণ তারা মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার চেয়েও মানবজাতির কবিত্ব শক্তিতে অধিক শঙ্কা বোধ করে থাকেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান শক্তি হলো তার ব্যবহৃত শব্দের বিদ্যুৎ থেকে একটি দৃশ্যকল্প তাৎক্ষণিকভাবে পাঠকের মনে চিত্রিত করে দেয়া। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'—মুহূর্তের মধ্যেই একটি চিত্রকল্প, একটি আত্মবিশ্বাস এবং পাঠকের মনে একটি নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তিনি দেখিয়ে দিতেন। তিনি গতানুগতিক পয়ার বা মাত্রাবৃত্তকে বড় একটা ব্যবহার করেননি। প্রথম জীবনে পদাতিক কাব্যগ্রন্থে তিনি যে প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করেন, তা নিঃসন্দেহে ছিল ছন্দময়। আমরা কিশোর বয়সে ধরতে পেরেছিলাম আমাদের কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তে সিদ্ধহস্ত এক রাজা এসেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহসা আমাদের জানিয়ে দিলেন, 'প্রিয় ফুল ফেলবার দিন নয় অদ্য'— আশ্বর্যজনকভাবে একথা বলেই তিনি আঙ্গিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলের এক আকর্ষণীয় গদ্যভঙ্গি অবলম্বন করে কাব্য নির্মাণ করতে শুরু করলেন এবং চল্লিশের শেষের দিকে কলকাতা ও ঢাকায় কবিকুলকে সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সাহিত্যের ধারণার দিকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলেন। এ ঋণ আমাদের স্বীকার করতে হবে বৈকি! সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজের স্বাতন্ত্র্য নিজে তৈরি করেছেন। এমনকি তার কাব্য ভাষা একান্তই তার নিজস্ব। তার পূর্ববর্তীদের মধ্যেও দু'একজন মার্কসবাদী কবি এবং তার সমসাময়িককালেও বেশ ক'জন মার্কসবাদী কবি ছিলেন। অথচ তার মতো বস্তুনিষ্ঠ দৃশ্যকল্প কেউ নির্মাণ করতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। তিরিশের বিষ্ণু দে এবং সমর সেন উভয়ই মার্কসবাদী কবি ছিলেন। তারা কেউ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো বাঙালি সংগ্রামী গণরুচিকে স্পর্শ করতে পারেননি। পরবর্তী জীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের বদল হয়েছে। পার্টির বদল হয়েছে। কিন্তু প্রতিভার বদল হয়নি। তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে মানবতাবাদী চৈতন্যে সমৃদ্ধ করে গেছেন। চল্লিশ দশকে তার তুল্য কবি ছিলেন আর দু'জন—ফররুখ আহমদ এবং মঙ্গলাচরণ। এদের মধ্যে ফররুখ আহমদ দিকবদল করে ইসলামী বিশ্বচেতনার অংশীদার হয়ে ওঠেন। মঙ্গলাচরণ স্থান ত্যাগ না করলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে যান আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় সরে আসেন অন্যতর আদর্শের দিকে। যার পরিণতি হলো তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। তার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হলো। এ ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার মতো কোনো উত্তরাধিকারী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রেখে যাননি। এটাই আমার আক্ষেপ।

বেহুলার ভাসান

শত চেষ্টা করেও যেখানে গৃহবন্দী এক কবির স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে পারছি না তখন দৈবভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীগণের আমন্ত্রণে একটু হকচকিয়ে যাই। আমন্ত্রণ সেটাও আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সতেজ বিভাগ থেকে। দ্বিধা এবং আশংকা এমনিতেই আমাকে ছাড়তে চায় না। আর তা যদি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাহলে তো খানিকটা স্তম্ভিত হওয়ারই কথা।

শাহমান মৈশান আমার স্নেহসিক্ত একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও বিশ্লেষক। একই সাথে তরুণ বন্ধুও বটে। যার নামে আমি আমার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'বিরামপুরের যাত্রী' উৎসর্গ করেছি। আমন্ত্রণটি এরকম, মৈশান জানালো, নাট্যকলা বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ তাদের একটি নতুন উদ্ভাবন 'বেহুলার ভাসান' লোকনাট্যটি যার নির্দেশনা দিয়েছেন খ্যাতনামা নাট্যকলাবিদ প্রফেসর সৈয়দ জামিল আহমেদ—আমাকে দেখাতে চান। আমাকে এতে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকার সম্মতি দিতে হবে। আমি প্রফেসর জামিল আহমেদের সুখ্যাতি এবং আন্তর্জাতিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাট্যক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠার কথা অবগত থাকায় আমন্ত্রণটিতে সাড়া দিতে বাধ্য হই। মৈশান আমাকে আরো জানায়, আমাকে এই অনুষ্ঠানে ডাকার পেছনে রয়েছে আমার কবিতার এই লোকনাট্যের মূল চরিত্র বেহুলাকে বারবার উত্থাপন করার বিষয়।

আমি সব সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে থাকতে চেয়েছি। এমনকি বিরূপ মন্তব্যও করেছি। যখন করেছি তখন এর যৌক্তিকতার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ থেকেই আমাকে তাদের অসাধারণ একটি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার দর্শক হতে ডাকা হয়েছে। সন্দেহ নেই আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু দেশের প্রকৃত বিদ্বান ও বিদূষীগণ যখন কোনো সামান্য কবিকে তাদের কোনো পরিশ্রমসাধ্য, লাবণ্যময় সুকৃতির প্রদর্শন দেখতে আদেশ করেন তখন মন স্বভাবতই নির্ভীক হয়ে যায়। এলাকাটা আমার জন্য কতটা সহনীয় হবে তা আর বিবেচনায় থাকে না। আমি ভালো করে খোঁজখবর না নিয়েই নাট্যকলা বিভাগের ছাত্র শাহমান মৈশানের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই।

২৯ জুলাই সন্ধ্যায় আমি শাহমান মৈশানের হাত ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট-মণ্ডলের গেটে গিয়ে হাজির হই। সেখানে নাট্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন আমাকে সদাশয় চিত্তে গ্রহণ করেন এবং একটি আসনে নিয়ে বসান।

আমি ওখানেই বসে জানতে পারি প্রফেসর জামিল নাট-মণ্ডলের অভ্যন্তরে নাট্যনির্দেশনার পূর্ব মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। একটু পরেই দর্শকরা ভেতরে প্রবেশ করল। আমার একটা সিগ্রেট খাওয়ার খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু আমি আমার ইচ্ছাকে সম্বরণ করলাম। কারণ নাট-মণ্ডলের গেটে যেসব ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক ঘোরাফেরা করছিলেন তাদের প্রত্যেকের মুখে এক ধরনের গাম্ভীর্য এবং কোনো একটা ঘটনার জন্য অপেক্ষমানতার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দু'য়েকজন আমাকে আড়চোখে লক্ষ্য করছে বলেই মনে হলো। ঠিক এ সময়েই ড. শাহীন আমাকে ভেতরে যাওয়ার জন্য হাত ধরলেন। আমি এখানে এই মঞ্চে যে পরিবেশ আশাই করিনি অথচ যে পরিবেশ আমার কাছে একেবারে অচেনাও নয়। শৈশবের স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া পবিত্র ধূপের গন্ধের মতো কিংবা বলা যায় লোকজ স্মৃতির হালকা সৌরভের মতো হৃদয়ের কোথাও জমা হয়ে আছে তা উদঘাটিত হলো। ধূপধুনোর একটা অবছা আবহাওয়াকে এখানে সম্ভবত নাট্যনির্দেশক আমাদের জন্য দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আমি আসনে বসার আগে হাত তুলে এই নাটকের নটনটীদের সালাম জানালাম। বুঝতে পারলাম আমার উপস্থিতি এখানে অনেকেরই কৌতূহলের কারণ হয়েছে। আমি এক এক করে আমার অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যতটা মালুম করা যায় বাদ্যকর ও দোহারদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। সবাইকে প্রথম দৃষ্টিতে আমার সুন্দর এবং সাবলীল মনে হলো। যেন সকলেই একটি অভাবিতপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টির আবেগকে সংযত রেখে অপেক্ষা করছে। শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো একমুখী এক ধরনের ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম ইত্যাদির ঐকতান। ঐকতান কিন্তু প্রতিটি যন্ত্র থেকে নিঃসৃত হচ্ছে জাদুমিশ্রিত শব্দতরঙ্গ। হঠাৎ আমার ইরানের ইস্পাহান শহরের একটি বিশাল থিয়েটার হলের প্রবেশের পূর্বমুহূর্তের কথা মনে হলো। নাট্যকর্মীদের আমন্ত্রিত আমাকে হলে প্রবেশ করার মুহূর্তে এক ধরনের গীতবাদ্যের দ্বারা আবাহন করে নিয়ে যাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ল। এই মুহূর্তে এই বিবরণ আর দিতে চাই না। 'বেহুলার ভাসান' নাট্যকল্পটি এদেশে আমাদের মতো গ্রামসমাজ থেকে আসা কারোরই অজানা নয়। বেহুলা শব্দটি সামগ্রিকভাবেই বাংলাদেশের নারীর মহিমাকীর্তনের এক রহস্যময় উদ্ভাবন। এই একটি চরিত্রের মধ্যে ধরা পড়েছে বাংলার আবহমানকালের নারীচরিত্রের এক দুঃসাহসী জীবনগাথা। কোনো গৃহস্থবাড়ির চিত্র নয়। এ হলো মৃত্যুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত এক দ্রুত ধাবমান তরঙ্গে তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত নারী বিদ্রোহিনীর অকুতোভয় অভিযান। এক পাশে মৃত্যু এক পাশে জীবনের দৃশ্যাবলি আর নিচে প্রবাহিত নদী। এই হলো প্রকৃতপক্ষে বেহুলা চরিত্রটির ভেসে থাকার অতি প্রাচীন বিবরণ।

এইবার এই মঞ্চের ঘটনা বিন্যাস উন্মোচনকারিণী যুবতীটি তার বন্দনাগীত গেয়ে উঠল। বন্দনাগীতের প্রথাবদ্ধ উচ্চারণ সরস্বতী থেকে মা ফাতেমা পর্যন্ত সবার কাছেই স্তুতিগীতি গেয়ে গায়েন যুবতীটি তার পদক্ষেপ এবং দেহসুষমা প্রদর্শন করে আঁট হয়ে দাঁড়াল। আমরা বুঝলাম পরিবেশ নড়ে উঠেছে। দ্রুততালে ধূম্রকুণ্ডলীময় যে মঞ্চ নির্দেশিত ছিল তা যেন মুহূর্তের মধ্যে এক ধরনের শিহরণ সৃষ্টি করল। বাদ্যতরঙ্গ সহসা উচ্চকিত হয়ে দর্শকের শ্রবণেন্দ্রিয়কে মোহিত করে গল্পের গ্রহণযোগ্যতাকে সামনে নিয়ে এলো। প্রবেশ করলেন মরণের বিষাদময় এক আবহাওয়ার মধ্যে জীবনের উত্তাল দেহতরঙ্গ নিয়ে চিরকালের বিদ্রোহিনী যুবতী বেহুলা বাঙালিনী। আমি তার পদক্ষেপের কৌশলটি লক্ষ্য করলাম। যেন অতি প্রাচীনকালের কোনো উর্বশী বা রম্ভা দেবসভায় ইন্দ্রের মনস্তুষ্টির জন্য কম্পিত পদে নাচের মুদ্রা তুলে ধরতে এগিয়ে এসেছে। আমার অবশ্য একটা জিনিসে খটকা লেগেছে। সেটা হলো বেহুলার শাড়ির রঙ কমলা হবে কেন? হয়তো পোশাক নির্দেশক বেহুলাকে আগুনের রঙে সাজাতে চেয়েছেন। কিন্তু বাংলা কবিতার ভাষার মহিমা যেহেতু অকপটভাবে বেহুলাতেই পূর্ণতা পেয়েছিল সে কারণেও লোকসমাজে বেহুলা তো রক্তবর্ণা লোহিতে রঞ্জিত এক দংশিত যুবতী রূপকল্প। আমার ধারণা বেহুলার শাড়িটি হওয়া উচিত ছিল তীব্র লোহিত বর্ণের। বেহুলার সৌন্দর্য বর্ণনার যে পৌনঃপুনিক ধুয়া আমরা ভাসানগুলোতে পাই তাতে ভাটি অঞ্চলের নারীরই অসাধারণ এক সৌন্দর্য উচ্ছ্বকিত হয়ে ওঠে। এছাড়া এমনিতে আমাদের লোকসমাজে বেহুলাকে বলা হয় বেউলী সুন্দরী। বেউলী শব্দের সাথেই সুন্দরী শব্দটি অনায়াসে যুক্ত হয়। এমতাবস্থায় এই নাটকের নায়িকা শ্রীমতী তানিয়া সুলতানা মোটামুটি মানিয়ে গেছে। তার উচ্চতা, দেহ সুষমা, পদপাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও মুখাবয়ব আশ্চর্যভাবে এই নাটকে খাপ খেয়ে গেছে। মনে হয় বেহুলাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য রূপকথার সুন্দরীকে ধরে আনতে হয়নি। এও বিশ্বাস করি প্রফেসর জামিল আহমেদের নায়িকা নির্বাচন ক্ষমতা তৃপ্তিকর। এখানে আমি গায়েন ফরিদা আকতারের কথাও উল্লেখ করতে চাই। গল্প বলার ঢঙটি ওই মুহূর্তে তার সারা শরীরে তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। তার মুভমেন্টে বিশেষ করে মাঝে মাঝে বসে পড়ার চাতুর্যটি লক্ষ্য করার মতো। অবশ্য সবই নাট্যনির্দেশনার ফলে নিয়মমাফিক ঘটেছে। কিন্তু আমরা যাকে লাবণ্য বলি সেটা অভিনেত্রীরা নিজেরাই সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে ফরিদার নিপুণতা সকলেরই চোখে পড়েছে। অন্যদিকে ঘাটে ঘাটে বেহুলার চৈতন্যোদয়ের অভিযানে আমরা যে মেয়েটির স্বস্তিকর বা অস্বস্তিকর অভিনয়ের সম্মুখীন হয়েছি তার নাম নাহিদা সুলতানা। মাঝে মাঝে তিনি তার ভয় সৃষ্টিকারী আবির্ভাবকে আয়ত্তে রাখতে পারেননি। তার ভূমিকার চেয়েও ত'র কৌতূহল আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। তবে অভিনয়ে নাহিদা উৎরে গেছেন। সাতটি বিচিত্র অভিব্যক্তি ওই বিশেষ মঞ্চে, যা আমাদের সমকালীন নাট্যমঞ্চগুলোতে দেখি না এবং একটু দুরুহও বটে, তা তিনি তার সাধ্যমতো অভিনয় করে দেখিয়েছেন।

আমি জানি এরা তিনজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের ছাত্রী এই তিনজনকে সম্ভবত প্রফেসর জামিল আহমেদ সমকালীন লোকনাট্য আবহ'ওয়ায় উপস্থাপন করতে সৃষ্টি করেছেন। আমি প্রফেসর জামিলের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করি। আমাদের দেশের এই তিন বিদূষী লোকনাট্যের অগ্রবর্তিনী ছাত্রীকে আমি অভিনন্দিতও করি। সব মিলিয়ে জামিল আহমেদের নাট্য পরিকল্পনাটি আমার মতো অসচেতন দর্শককেও শিহরিত করেছে। এখানে তার পরিশ্রম ও অভিনিবেশের কথা বলাই বাহুল্য। শুধু একটি ক্ষুদ্র মঞ্চকে মুহূর্তের মধ্যে জাদুমন্ত্র বলে লোক কাহিনিতে পর্যবসিত করা কঠিন কাজ। জামিল আহমেদ তা পেরেছেন। এই নাটকের কোনো সমালোচনার দিক নিয়ে আমি এ কথা বলছি না। তবে সৃজনশীল উদ্ভাবনার ত্রুটি যারা ধরতে যায় তাদের নাট্যবুদ্ধি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অনেক বেশি। আমি সৃজনশীল কবিমাত্র। অত বুদ্ধিমান নই। আমি যেমন ভাবি কবিতার কোনো সমালোচনা সম্ভব না। তেমনি প্রফেসর জামিল আহমেদ, ইসরাফিল শাহীন, ওয়াহীদা মল্লিক, রহমত আলী, বিপ্লব বালা, কামাল উদ্দিন কবির এদের প্রকৃতপক্ষে ত্রুটি নির্দেশ করা আমার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

আমি অকপটে স্বীকার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগ বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে এক অন্তঃসলিলা লোকজ উপাদানে রঞ্জিত অভিনয়কলা ও নবনাট্যনির্দেশনার তরঙ্গকে ডেকে আনছে। এই তরঙ্গ আন্তরিকতা নির্ভর ও গণসমর্থিত। একবার তার বিস্তার ঘটাতে পারলে, বাংলাদেশে নতুন নাট্যতরঙ্গের ধারা বইতে থাকবে। সন্দেহ নাই প্রফেসর জামিল আহমেদের জ্ঞান ও শিক্ষা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তর্জাতিক খ্যাতি বাংলাদেশের নতুন নাট্যলাবণ্য সৃষ্টির জন্য সহায়ক হবে। বেহুলার ভাসানের সমস্ত অভিনেতা, দোহার, বাদ্যযন্ত্রী, কলাকুশলীকে আমি সাধুবাদ জানাই। তাঁরা অসাধ্য সাধন করেছেন।

এই তো কলকাতা

হঠাৎ কলকাতা থেকে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটি সমান্তরাল বলে একটি আবৃত্তি সংগঠনের পক্ষ থেকে আমার উদ্দেশে লেখা। এতে বলা হয়েছে, কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় আবৃত্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে আমাকে ওই সম্মেলনের উদ্বোধক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আমি সম্মত থাকলে তারা আমাকে আসা-যাওয়ার বিমানের টিকিট ও প্রয়োজনীয় আমন্ত্রণাদি পাঠাবে। তারা আমার থাকার ব্যবস্থা করবে হোটেলে। চারদিন এই অনুষ্ঠান হবে। রোটারি সদন, বাংলা একাডেমি, রবীন্দ্র সদন, গোর্কি সদন ইত্যাদি সুপরিচিত অনুষ্ঠান হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

আমি সম্মতি জানিয়ে চিঠির জবাব দেওয়ার আগেই কলকাতা থেকে ভাস্কর দেব আমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। আমি তাকে আমার সম্মতি জানিয়ে দিই এবং এ-কথাও বলি আমার দৃষ্টিশক্তির অপরিচ্ছন্নতার জন্য আমি আমার সঙ্গে এদেশের একজন খ্যাতমানা ট্রান্সলেটার মাহবুবুল আলম আখন্দকে সঙ্গে নিয়ে আসব। তার ব্যয়ভার আমিই বহন করব। তবে লোকাল হসপিটালিটি তাকে পরিপূর্ণভাবে দিতে হবে। প্রথম কথাতেই ভাস্কর আমার এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন এবং জানালেন প্রয়োজনবোধে তিনি ঢাকায় এসে আমার যাওয়ার ব্যাপারে আরও নিশ্চিত ধারণা দেবেন। তিনি একথাও বললেন আসলে তারা আমাকে তাদের সাধ্যানুযায়ী সম্মানিত করতে চান।

কয়েকদিন পরে সহসা ভাস্কর দেব আমার বাসায় এসে হাজির হলেন। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় বিমানের টিকিট এবং অন্যান্য কাগজপত্র দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি তাকে আমার একটা আশংকার কথা জানালাম। আমি বললাম, যতদূর জানি তসলিমা নাসরীন এখন কলকাতায়। আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আমি যে ক'দিন কলকাতায় থাকব সে ক'দিন ওই মেয়েটিকে আমার কাছে ভিড়তে দেয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনিচ্ছুক। এ কথায় ভাস্কর হাসলেন। বললেন, ঠিক আছে আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তবে আপনাকেও একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সেটা হলো আপনি চারদিনের বেশি কলকাতায় থাকবেন না। যে চারদিন থাকবেন ওই পিরিয়ডের মধ্যে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না এবং টেলিফোন রিসিভ করবেন না। আমাদের অনুমতি ছাড়া নিরাপত্তার খাতিরেই আপনি বাইরে বেরুতে পারবেন না। শর্তগুলো আপনাকে লিখিতভাবে আমাকে দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা শুধু আপনার নিরাপত্তার জন্য। আমি সম্মত হয়ে একটা সাদা কাগজে কথাগুলো লিখে দিলাম।

যা হোক, ভিসা পেতে একটু বিলম্ব হলেও শেষ পর্যন্ত ভিসা হাতে এসে গেল এবং দু'একদিনের মধ্যে প্লেনের টিকিটও পেয়ে গেলাম। প্লেনে বাংলাদেশ বিমানের ঢাকা-কলকাতা ফ্লাইটের নিজের সিটে বসে আছি। এ সময় পেছন থেকে ঢাকার একজন থিয়েটার কর্মী লিয়াকত আলী লাকী উঠে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন মাহমুদ ভাই। আমি লিয়াকত আলী লাকী, চিনতে পারছেন?

আমি হাসলাম, আমি ভালো দেখতে পাই না। তবু আপনাকে একজন নাট্যকর্মী হিসেবেই জানি।

আমি তাকে চিনতে পারায়, লাকী খুব খুশি। হেসে বললেন, কোথায় যাচ্ছেন আপনি।

কলকাতার একটা আবৃত্তি সম্মেলনের উদ্বোধন করতে। তোমরা?

আমরা নাটকের দল নিয়ে যাচ্ছি। অনেকেই তো যাচ্ছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এয়ারপোর্টে নেমে যথারীতি ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস পেরিয়ে বাইরে এসে দেখি, ভাস্কর ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, রাস্তার ওপাশে আমাদের গাড়ি, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এলে আমাদের লটবহর গাড়িতে তুলে নিলাম। ঠিক এ সময় দেখলাম, অনেক লটবহরসহ একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ড. আনিসুজ্জামান আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাস্করকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সাহিত্য একাডেমি থেকে এসেছেন।

ভাস্কর আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, না আমরা কবি আল মাহমুদকে নিতে এসেছি।

ড. আনিস বিব্রত মুখে তাকে কেউ নিতে এসেছেন কিনা খুঁজছিলেন। আমি বললাম, স্যার আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের গাড়িতে আসতে পারেন। আমরা আপনাকে সাহিত্য একাডেমিতে নামিয়ে দিয়ে যাব।

তিনি আমাদের গাড়িতে এলেন না। মনে হয় কেউ তাকে নিতে আসবে এবং এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে থাকলেন। অগত্যা আমরা রওনা হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের জন্য নির্ধারিত হোটেলে এসে হাজির হলাম। পাসপোর্ট ইত্যাদি জমা দেয়ার পর আমাদের নির্ধারিত কামরার চাবি পেয়ে গেলাম। উপরে এসে দেখি ব্যবস্থাদি আশানুরূপ। বুঝলাম আমরা যে ক'দিন থাকব আরামেই থাকব। আগামীকাল রোটারি সদনে আমি সম্মেলন উদ্বোধন করব। ভেবেছিলাম আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্রাম। কিন্তু ভাস্কর ও তার স্ত্রী শ্যামলী ব্যানার্জী এসে হোটেলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন, বিকেলে একটি পেইন্টিং একজিবিশন উদ্বোধন করবেন তাদের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী মুহাম্মদ সেলিম। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তার পাশে আমাকেও থাকতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী জনাব সেলিম আমার অপরিচিত নন। এর আগেও কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি আমার প্রতি তার গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। সমান্তরাল কর্তৃপক্ষের আসল চালিকাশক্তি সম্ভবত ভাস্কর দেবের স্ত্রী এই শ্যামলী ব্যানার্জী। শ্যামলী আমাকে জানালেন ওই পেইন্টিং একজিবিশনের সব আর্টিস্ট আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এমতাবস্থায় আজ থেকে আমার কর্মসূচি শুরু হলো। যা হোক আমি ও আমার সঙ্গী মাহবুবুল আলম আখন্দ দ্রুত স্নানাহার সেরে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম। খাওয়াটা মোটামুটি ভালো হয়েছে। আমি এমনিতে মাছ-মাংস অপেক্ষাকৃত কম খাই। যদিও বিশুদ্ধ নিরামিষভোজী নই।

কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি দেয়ার পর তৈরি হওয়ার জন্য টেলিফোন বেজে উঠল। আমরা তৈরি হয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

আমার সেখানে পৌঁছামাত্র আমাকে ওয়াসিম কাপুর, মধুসূদন কুশারি, পাপিয়া ঘোষাল সম্মিলিতভাবে স্বাগত জানালেন। এর মধ্যে কলকাতার বেশ কয়েকজন পেইন্টারের ছবির সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। এর মধ্যে একজনকে আমার বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি প্রকাশ কর্মকার। পরে অবশ্য অন্য একটি রেস্টুরেন্টে প্রকাশ কর্মকারের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তিনি দেখলাম আমাদের কবিতা সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। আমার প্রদর্শনী হলে ঢোকার অল্পক্ষণ পরেই মন্ত্রী মুহম্মদ সেলিম এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কলকাতায় আমার সুবিধা-অসুবিধার কথাও জিজ্ঞেস করলেন।

অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো। মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে শিল্পীদের ওপর বেশ মনোজ্ঞ কয়েকটি কথা বললে আমি চারুকলা সম্পর্কে আমার সামান্য জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে দু'চার কথা বললাম এবং আমাদের দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের কয়েকজনের নামও উল্লেখ করলাম। এতক্ষণ বলা যায় যে, ভারতের বেশ খ্যাতনামা কয়েকজন পেইন্টার আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা আমাকে কবি বলেই জানেন। কিন্তু আমি যখন চারুকলার ওপর দু'চার কথা বলতে পারলাম তখন দেখলাম তারা দারুণ খুশি। ঠিক এ সময় দিল্লির খ্যাতনামা শিল্পী মধুসূদন কুশারি আমার কানের কাছে মুখ এনে জানালেন, তিনি সম্ভব হলে আগামীকাল সকালে একটি স্কেচ অংকন করে দেবেন। আমি তো এ প্রস্তাবে একেবারে হতভম্ভ। বোকার মতো হাসলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে মন্ত্রী যখন ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী প্রদক্ষিণ করছেন এবং তার পেছনে দলবেঁধে সবাই এগিয়ে চলেছে তখন অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটল। আমি একটা সোফায় সবে বসেছি। কোত্থেকে একজন যুবক এসে আমার সামনে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি কবি আল মাহমুদ কিনা। আমি সম্মতিসূচক মুখ তুলে তার দিকে তাকাতেই সে মৃদু হাসল। আমি এ পাড়ারই ছেলে, এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক।

আমি তার দিকে হাত বাড়ালাম। আমার হাতে খুব নিবিড়ভাবে চেপে ধরে বলল, মাহমুদ ভাই আপনি এখানে হিসেব করে কথা বলবেন। কলকাতার লেখক-শিল্পীরা আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। এরা আপনাকে সম্মান দিতে ডেকেছে। সে সম্মান আপনার প্রাপ্য। কিন্তু আমরাও আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। শুধু এটুকু বলার জন্যই আমি এখানে ঢুকে পড়েছি।

আমি হাসলাম। আমি বললাম, তুমি নিশ্চিত মনে থাকতে পার। আমি এমন কথা বলব না যা পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে কোনো ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

ছেলেটি আর একমুহূর্তও দাঁড়াল না। যেভাবে এসেছিল, সেভাবে চলে গেল। আমি গম্ভীর হয়ে আলোকোজ্জ্বল প্রদর্শনী হলে বসে থাকলাম।

পরের দিন রোটারি সদনে বিপুল আয়োজনের মধ্যে আমি আবৃত্তি সম্মেলন উদ্বোধন করলাম। সেখানে দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়সহ বেশ ক'জন খ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি অকপটে বাংলাদেশের কবিতা, কথাশিল্প ও নাট্যকলার নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বোঝাতে চাইলাম, ঢাকাই আধুনিক বাংলা ভাষার রাজধানী এবং প্রসঙ্গক্রমে এ দাবিও তুললাম, ঢাকাইয়া আবৃত্তিরও একটা স্বতন্ত্র ঢঙ আছে। প্রসঙ্গত, আমাদের আবৃত্তি চর্চার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম এবং একথাও বললাম যে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ঢঙটি একেবারে খড়খড়ে পশ্চিমবঙ্গীয় ছিল না। তাতে পূর্ববঙ্গীয় টান ধরা পড়ে যায়। আমি বললাম ঢাকা হলো এখন আন্তর্জাতিক শব্দরাজি বাংলা ভাষার দ্রুত প্রবেশের মেলটিং পথ। বাংলাদেশের ছেলেরা আজ পৃথিবীর সর্বত্র উপার্জনের ধান্ধায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা শুধু ডলারই দেশে পাঠায় না, যখন আসে তখন এমন সব শব্দরাজি নিয়ে আসে যা বিশ্বের শ্রম জগতে অত্যন্ত পরিচিত। আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের ভূমিকার প্রশংসা করলাম এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী বক্তা হিসেবে আমার বক্তব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং স্বীকার করলেন যে, ঢাকাই আধুনিক বাংলা ভাষার রাজধানী।

রাতে হোটেলে ফিরলে সহসা সেখানে ভাস্কর এসে আমাকে জানালেন, সমান্তরাল আমাকে একটি সম্মাননা পদক প্রদান করে রবীন্দ্র সদনে সংবর্ধিত করবেন। আমি তো অবাক। ভাস্কর জানালেন, ভানুসিংহ পদক সাধারণত সমান্তরালের পক্ষ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়া হয় কিন্তু অনুষ্ঠানটি হয় শান্তি নিকেতনে। এবার যেহেতু তারা আমাকে মনোনীত করেছে কিন্তু আমার শান্তি নিকেতনে যাওয়ার মতো সময় নেই। সে কারণে তা কলকাতাতেই উৎসব করে দেয়া হবে এবং স্থান রবীন্দ্র সদন। সন্দেহ নেই, এতে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। কারণ আমি জানতাম আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একবার এলবার্ট হলে নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। এরপর আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান কবিকে পশ্চিম বাংলার লেখক-বুদ্ধিজীবীগণ প্রকাশ্যে কোনো সম্মান প্রদর্শন করেননি। যদিও আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বহু সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছি এবং গ্রহণ করেছি।

এর মধ্যে শ্যামলী ও তার কন্যা রাত্রিলেখার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা হলো। শ্যামলীর এই মেয়েটি আমার নাতনি প্রথমার বয়সী। খুবই চটপটে বলে তার ডাকনাম দেয়া হয়েছে ঝুঁকি। আমি ছড়া কেটে তাকে বলেছি : ঝুঁকি নামের খুকিটি/মারে উঁকি জুকিটি/এসেছিল হোটেলে ইত্যাদি।

এক সন্ধ্যাবেলা আমি ও মাহবুব নামাজ শেষ করে নামাজের বিছানায় বসেই মোনাজাত শেষ করলাম। এ সময় অবাক বিস্ময়ে শ্যামলী আমাদের দেখছিল। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলে জিজ্ঞেস করল, কি প্রার্থনা করলেন।

আমি হেসে বললাম, প্রার্থনা করলাম, আমি যাতে আমার দেশ ও আমার জাতির কোনো ক্ষতি না করি। প্রার্থনা করলাম, আজ সারাদিন যেন কারও অনিষ্ট না করি। প্রার্থনা করলাম তোমার কল্যাণের জন্য। কারণ তোমার মতো আমার একটি মেয়ে আছে। দেখতে তোমারই মতো।

শ্যামলী হাসল, আমিও আপনার কন্যা। ভাববেন কলকাতায় আপনার একটি হিন্দু কন্যা আছে।

পরের দিন ছিল ছুটির দিন এবং আমার ভানুসিংহ পদক প্রাপ্তির অনুষ্ঠানও। আমি মোটামুটি সেজেগুজে অনুষ্ঠানে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে গেল। আমার পরিচিতি ও মুক্তিযুদ্ধকালীন কলকাতার জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বক্তৃতা করলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু কথাশিল্পী সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমার সোনালী কাবিনের চৌদ্দটি সনেট নিয়ে একটি মিনিবুক বের করেছিলেন। তিনি সেসব কথা বললেন এবং আমার হাতে পদক তুলে দিলেন দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়। আমি খুব অভিভূত অবস্থায় পদকটি গ্রহণ করে দু'চার কথা বললাম। কিন্তু আমার বাক্য স্ফূর্তি হচ্ছিল না, চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। এ সময় আমাকে জানানো হলো যে আমার সম্মানার্থে পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্ত তার দলবল নিয়ে নৃত্য প্রদর্শন করবেন। আমি এ অবস্থায় মঞ্চ ছেড়ে দর্শকদের মধ্যে গিয়ে আসন গ্রহণ করলাম এবং দেখলাম সেখানে আমাদের বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মনসুর মুসা বসে আছে। তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার বিজয় উৎসব দেখতে এসেছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিলে তারা নাচ শুরু করার আগে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালককে মঞ্চে আহ্বান করলেন এবং তাকে দু'চার কথা বলার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। মনসুর মুসা আমার ওপর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী একটি ভাষণ দিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম এতে সবাই অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। জনাব মুসা নিচে নেমে এলে তার হাত ধরে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তিনি যে আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে কেবল আমাদের দেশের সাহিত্যের গৌরব ঘোষণা করতেই রবীন্দ্র সদনে উপস্থিত হয়েছেন এটা একটা দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা হিসেবে আমি চিরকাল মনে রাখব।

শুরু হলো অমিতা দত্তের অসাধারণ উপস্থাপনা। তিনি তাদের কথা অনুযায়ী বন্দে মাতরাম দিয়ে শুরু করলেও কাজী নজরুল ইসলামের অসাধারণ কিছু গীতকে নাচের মুদ্রায় অত্যন্ত লাবণ্যময় ভঙ্গিতে পরিবেশন করলেন। আমার হৃদয়-মন সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সেদিন রাতে কবি দেবরঞ্জন চক্রবর্তীর বাসায় আমি ও আমার সঙ্গীর খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি ভারত সরকারের এখানকার একজন খুব প্রভাবশালী সরকারি কর্মচারী। তার কবিতা আমার ভালো লাগে। প্রকৃতপক্ষে তাকে আমি পশ্চিমবঙ্গের একজন উল্লেখযোগ্য তরুণ কবি মনে করি। তার স্ত্রী বরিশালের মেয়ে। দেবরঞ্জনের ধারণা, আমি হোটেলে মোটেলে পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে পারছি না। এজন্য বাসায় পাবদা মাছসহ আমার পছন্দের কিছু তরিতরকারি, বিশেষ করে বেগুন ভাজা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা যথাসময়ে তার বাসায় গিয়ে হাজির হলাম এবং তার শ্বশুরের সঙ্গে আলোচনা করে দারুণ ভালো লাগল। ভদ্রলোক বরিশালকে এখনও এতটুকু ভুলতে পারেননি। কথায় কথায় বাংলাদেশের অবস্থা জানতে চাইলেন। দেবরঞ্জনের স্ত্রী আমাকে তার খাদ্য তালিকা দেখার জন্য খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন এবং জানতে চাইলেন, আর কিছু চাই কিনা।

আমি বললাম, আপনি বরিশালের মেয়ে? কিছু আচার-অম্বর না থাকলে কি করে চলে।

তিনি উচ্চহাস্যে বললেন, সব আছে, এখনই দিচ্ছি।

বহুদিন পর কলকাতায় বড় তৃপ্তি সহকারে আমি ভাত খেলাম। এ খাদ্য বাংলাদেশের মেয়ে ছাড়া কারও পক্ষে রাঁধার সাধ্য নেই।

পরের দিন কলকাতার কবিদের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বাংলা একাডেমিতে। সেখানে আমন্ত্রণ উন্মুক্ত থাকায় অনুষ্ঠান শুরুর আগেই হল ভর্তি হয়ে গেল এবং সংখ্যালঘু সমাজের কবি সম্পাদক ইমদাদুল হক নূর, তার স্ত্রী ও কন্যাকেও সেখানে দেখতে পেলাম। এ অনুষ্ঠানে আমাকে কবিতার নির্মাণ কৌশল বলে একটি অসম্ভব বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গদ্যচর্চার বিষয়েও কিছু কথা বলার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হয়ে এসেছি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর শংকরলাল চক্রবর্তী।

যথাসময়ে আমাকেও আহ্বান করা হলো। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, দেখুন নিশ্চয় আপনাদের মধ্যে এই অপরিসীম কৌতূহল জাগছে যে কবি আল মাহমুদ কি করে কবিতার নির্মাণশৈলী সম্পর্কে বলতে রাজি হলেন। এ কি কোনো দিন কোনো কবি বলতে রাজি হয়? আসল কথা কী, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। যারা আমাকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন, তারা এতটাই সহৃদয়তা ও আতিথ্য দিয়েছেন এবং তাদের যত্নে মোহিত করে রেখেছেন যে এদের কোনো প্রস্তাবেই আমার না করা সম্ভব ছিল না। আমি তাই হে হে করেছি। এখন আমার সামনে এবং আমার পাশে যারা বসে আছেন, তারা জানেন এ বিষয়ে কোনো কথা বলা যে কোনো কবির পক্ষেই অসম্ভব। আমি আমার প্রয়াত বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে বললাম, আজ যদি সে বেঁচে থাকত এবং এখানে থাকত তাহলে কতই না ভালো হত। সে ছিল আমার এক ঈর্ষাকাতর বন্ধু এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কবি প্রতিভা। একথা বলামাত্র হল হাততালিতে ফেটে পড়ল। আমি বুঝলাম, শক্তি এখনও কলকাতার বুক জুড়ে আছে। আমি ৪০ মিনিট একটানা আমার কবিতার বিষয় ইত্যাদি নিয়ে আমার সাধ্যমতো বলে গেলাম। পরে অবশ্য শংকরলাল চক্রবর্তী আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে একটি সুন্দর ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, আল মাহমুদের আজকের বক্তৃতাটি আধুনিক বাংলা কবিতার ওপর যুক্তিসঙ্গত আলোচনা। এ বক্তব্যকে অতিক্রম না করে বাংলা কবিতার ওপর নতুন করে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। এ কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম এবং আমি ভাবতে পারিনি যে শংকরলাল একথা বলবেন।

এই ছিল আমার এবারকার কলকাতা সফরের কিছু ইতস্তত বিবরণ। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে আমি অনেক কথাই হাতড়ে পাইনি। স্মৃতি দুর্বল হয়ে এসেছে। আমাকে এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এসেছিল শ্যামলী ব্যানার্জী দেব। একেবারে বিদায়ের মুহূর্তে শ্যামলী প্রশ্ন করল—আপনার কয় মেয়ে?

আমি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আঙুল তুলে বলল, চার। তিনটি ঢাকায়, একটি কলকাতায়। বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে দ্রুত চলে গেল।

কবির ভ্রান্তি ও মাশুল

কবি যখন ভুলের মাশুল দেন তখন তা আর অর্থ বা সোনাদানায় পরিশোধ করার উপায় থাকে না। কবি ভুলের মাশুল দেন নিজের রক্তক্ষরণের মাধ্যমে। সেই রক্ত এতটাই গাঢ় লাল বর্ণের হয় যে, কবিকে তা মুহ্যমান করে রাখে বছরের পর বছর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কিছু দিন তিনি সৃজন প্রতিভা মুলতবি রেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। তার সুহৃদরা ভাবেন তিনি বোধহয় আর লিখবেন না। প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে, লোকটা ফুরিয়ে গেছে। পথ চলতে চলতে বইয়ের বাজারের আশপাশে কিংবা কোনো সামাজিক আয়োজনে কবি আমন্ত্রিত থাকলে তিনি শুনতে পান গুঞ্জন। ওই তো অমুক কবি যাচ্ছে। কিন্তু তিনি লিখছেন না কেন?

কেউ কেউ কবির বিস্মৃতপ্রায় কোনো কবিতার বইয়ের নাম উচ্চারণ করেন। এতে হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণের জ্বালার খানিকটা উপশম ঘটে, আবার ঘটেও না। তিনি মহানগরীর মহাকলরব মাথা থেকে বুকের ভেতর নামিয়ে এনে ভাবেন। যাই, ঘরে ফিরে যাই। দেখা যাক, আজ হয়তো কিছু লেখা হলেও হতে পারে। সত্যিই যখন তিনি তার টেবিল ল্যাম্পের নিচে কাগজ বিছিয়ে বসে পড়েন, তখন দেখতে পান তার কল্পনার মানসী জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। আগের মতোই সহজ গলায় তাকে বলছে, বড় অবেলায় ডেকেছ। আমি কি আগের মতো ডাকলেই আসতে পারি? তুমি কি জানো না আমাকে কত কাল, কত যুগ, কত পর্বত, কত প্রান্তর পেরিয়ে এখানে আসতে হয়? পথে পথে দাঁড়াতে হয় কত পদ-রচয়িতার পান্থপাদবের নিচে? কত কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের দল আমাকে বিলম্ব ঘটিয়ে দেয়? আঁচল টেনে ধরে কত চারণ? একতারায় আঙুল ঠুকে ঠুকে আটকে রাখে কত লালন? কার কী ধর্ম কিংবা কার কী পাপাচারণ তা বিচার করলে তো আমার চলে না। কারণ সবারই তো মৃত্যু আছে। কবিরা জন্মায় তারুণ্যে, যৌবনে, বার্ধক্যে—আমাকে তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যেতে হয়। কারণ কবিদের এবং কবিত্বের আয়ু ক্ষণস্থায়ী। কত কবির মৃত্যু আমি দেখেছি। তাদের জন্ম যেমন সুন্দর তেমনি তাদের অস্তগমনও অশ্রুসজল।

কিন্তু তুমি এ যুগের কবি। তোমার সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো শুধু বন্ধুত্বের কারণে আত্মপ্রকাশের স্বার্থপরতায় অ-কবিকে কবি বলেছ। যাদের দুয়ারে কোনো দিন কোনো আমার মতো নারী আহ্বান পায়নি, যাদের কোনো মানসী নেই, আছে যৌন মত্ততা। যারা নারীকে একটা রন্ধ্র পথ ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। অথচ সাহিত্য প্রকাশের ঠিকাদারি তাদের হাতে। এদের বন্ধু বলতে চাও বলো কিন্তু কবি আর বলো না। তুমি কি জানো না কবির জন্ম হয় সহস্র বর্ষের প্রকাশের বেদনা যখন জাতির মধ্যে অব্যক্ত ভাষায় গোঙায়, তখন আকাশে একজন কবির জন্মের অনুমোদন হয়। কোনো একজন সামান্য নারীর উদর কেঁপে ওঠে তারই জাতির ভাষার একজন স্রষ্টাকে জন্ম দিতে। এরই তো নাম কবি। আর তুমি সাহিত্যের ঠিকাদারদের কবি বলে আখ্যায়িত করে যে পাপ করেছিলে, এখন তা নিজের রক্তে পরিশোধ করবে না! তোমার রক্ত যত লালই হোক তা মিথ্যার ক্ষতিপূরণের জন্য, অসংখ্য প্রকৃত কবি মুক্তির জন্য, উদ্ভবের জন্য, উগমের জন্য একান্ত দরকার। ঠিকাদারদের কবি বলে তুমি যে মানুষের ভাষা-শিল্পের অপমান করেছ, আজ তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে দেখেই তো আমি এসেছি। অ-কবিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে মুখ ফেরাও। সাহিত্য-সন্ত্রাস থেকে তোমার জাতিকে রক্ষা করতে হলে অস্বীকার করো। এই হলো আমার প্রতি তোমার দরদের স্বীকৃতি।

আজ তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না বাতাসের হাহাকারের মতো বেজে উঠেছে কবিদের আহ্বান, ভাষাশিল্পীদের আকাঙ্ক্ষার আওয়াজ? তোমার কাছে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কি চলে? তোমরা তো মরে গিয়ে অমরতা লাভ করো। কিন্তু আমি হতভাগিনী কবিদের প্রিয়তমা, আমার যে মৃত্যু নেই।

এ ঢাকা মহানগরীতে ঘুরে বেড়াই। মানুষের বাজারে মানুষ কত উদ্দেশ্য নিয়েই না ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আমি উদ্দেশ্যবিহীন। এমনকি একজন বন্ধুও নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় বই-ই বন্ধু। কিন্তু বইয়ের ফাঁক দিয়ে প্রকৃতির যে দৃশ্য চোখে পড়ে, সেখানে তো শুধু নিসর্গের নির্মমতাই নেই, আছে নিয়ম, নৈশব্দ ও নিগম। বই ছেড়ে সেখানে যেতে ইচ্ছে করে যেখানে একটা মৌমাছি পুষ্পের মধু লুণ্ঠন করতে এসে ফুলের পুরুষ রেণুর সঙ্গে স্ত্রী রেণুকে মিশিয়ে দিয়ে পুষ্পকে গর্ভবতী করে রেখে যায়— ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। ভাবি, এ কার খেলা। মৌমাছিটি কি জানে না জানে ওই পুষ্পের পরাগ রেণু? এ খেলা যিনি খেলছেন আমি তার উপাসনার জন্য বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। আর কী আশ্চর্য, পাখির কাকলির মধ্যে শুনতে পাই কবি কবি কবি... কী অদ্ভুত কিচিরমিচির! আমাকে দেখে মানুষ পালায়। এড়িয়ে চলেন বুদ্ধিমানেরা। কিন্তু পাখি, প্রজাপতি, নিসর্গ ও নিয়তির নিয়ম তো পালায় না। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ বন্ধ হলে আমি আবার নগরে ফিরে আসি। কারণ এ লক্ষ প্রকোষ্ঠের কোনো একটিতে বাস করে এক দুঃখী নারী। আমি তার কাছে ফিরে আসি। কত দেশ কত মহাদেশ বিচরণ করে যখন ঢাকা মহানগরীর আকাশে জেট বিমান নামার উদ্যোগ নেয়, তখন আনন্দে এ মহানগরীকে মনে হয় আমার প্রিয়তমা নারীর মুখ। আমি ফিরে আসি তার জন্য। তার কথা অনুচ্চারিত থাকে বলেই তো আমি উচ্চারণ করি শব্দ। আমি ভাষাকে ছন্দ করে তুলি এবং আশাকে ভাষায় পরিণত করি। এই তো আমার কাজ।

আমি ও আমার সময়

তোমরা কালকে গালমন্দ করো না কারণ আল্লাহ্-ই হলেন মহাকাল। – আল হাদিস

অতীতের দিকে তাকালে মনে হয়, একটু বেহিসেবী ভাবে খরচ করে ফেললেও আমার উত্থানকালটা আমি তেমন মন্দ কাটাইনি। আমার স্ফুটনোন্মুখ কৈশোর কালটা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার উত্তেজনার মধ্যেই কেটেছে। যদিও আমার বয়স আমাকে তখনও প্রায় নাবালক পর্যায়ে বন্দী করে রেখেছিল। তবুও কবিতার প্রতি আগ্রহের কারণে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গগনবিদারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারণ আমাদের রক্ষণশীল পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যেও প্রবেশ করে আমাকে খানিকটা উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমি ভেবেছিলাম, কবিতাই হবে আমার নিত্যপাঠ্য বিষয়। শেষপর্যন্ত আনন্দ ও আশার ক্ষেত্র হিসেবে আমি ধীরে ধীরে সাহিত্যকে নির্বাচন করতে শুরু করলাম। খেলাধুলা পরিত্যক্ত হলো। কৃশকায় স্বাস্থ্যের জন্য প্রচলিত খেলাধুলায় আমার জন্য তেমন আনন্দও ছিল না।

আমার আব্বা ছিলেন এক উদাসীন ব্যবসায়ী। যিনি সংগীত ও ধর্মের মতো দুই বিপরীত বিষয়ের প্রতি আসক্ত ছিলেন। আম্মা ছিলেন এক উপচেপড়া সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। আমার পিতার বৈষয়িক ব্যর্থতাকে ঢেকে রেখেছিল তার ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিকতা। আমার মার অসচ্ছলতার প্রতি অভিযোগ থাকলেও স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসা নিচে তা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। উভয়ের ব্যর্থতার যাতনার উপশম ছিলাম আমি। যদিও কোনো প্রত্যাশাকে পূরণের সামান্য লক্ষণও আমার মধ্যে ছিল না। যে বালক বারো বছর বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করে তার ওপর ভরসা রাখা যে স্নেহের কতটা অপচয় তা তখন বুঝতে না পারলেও, আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।

আমি অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখতে শুরু করি। আর কবিতা লিখতে হলে পাঠ্য বিষয় ও বিদ্যালয়ের গুরুত্ব খানিকটা নাকচ করেই এগোতে হয়। যে বালক স্কুলে পাঠ্য বইয়ের বাইরের বইপত্র ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে একবার অভিভূত হয়ে যায় স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণের প্রভাব তার ওপর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো গভীরভাবে চিহ্নিত হয় না। আমি আমার কিশোরকালের ওপর একটি আত্মউপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেছিলাম। কেউ-কেউ রচনাটিতে মাত্র পঞ্চাশ ভাগ সত্য আছে বলে মন্তব্য করলে, আমার সাহস বেড়ে যায়। কবির যে পুস্তকে মাত্র পঞ্চাশ পারসেন্ট কল্পনা মিশ্রিত থাকে সেটা যে উঁচুদরের সাহিত্য তাতে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। আমারও নেই। এ ধরনের সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি 'যেভাবে বেড়ে উঠি'– এই শিরোনামে বইটা প্রকাশ করি। সত্য হোক অথবা মিথ্যাই হোক, কিংবা হোক অধিকাংশটা কল্পনামিশ্রিত গালগল্প, এ ধরনের একটি বই যখন আমার বাজারে কাটতি হচ্ছে তখন ঐ সময়কার ঘটনা দিয়ে এই নিবন্ধটিকে আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। আমি মনে করি দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশে যেসব মুসলিম পরিবারের উঠতি তরুণেরা আধুনিক কবিতা রচনা করতে এসেছিলেন তাদের সবার জীবন ও সামাজিক অবস্থান ছিল একই রকম। 'যেভাবে বেড়ে উঠি' তাদেরই একজনের জীবনের একটি কল্পনামিশ্রিত উপন্যাস মাত্র। আর উপন্যাসকে কে আর অসত্য ঘটনা বলে উপহাস করে?

আমি ঢাকায় আসি ১৯৫৪ সালে।

একজন লেখক হবার বাসনা নিয়েই আমি মোগলদের এই অতি প্রাচীন রাজধানী নগরীতে প্রবেশ করেছিলাম। আমি ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসার আগেও কয়েকবার ঢাকায় এসেছি। তখন ঢাকাকে আমার কাছে একটি রহস্যনগরী বলেই মনে হয়েছিল। গোধূলি বেলায় রান্নার ধোঁয়া, মাংস ও মশলার গন্ধ, ঘোড়ার গাড়ির দীপ্ত চলাফেরা, গাড়োয়ানদের অদ্ভুত ঢাকাইয়া ভাষার খোশ মেজাজের হাঁকডাক, গ্যাসের বাতির নিচে নবাবী চালের মশলাদার পান বিক্রেতা, অস্পষ্ট বৈদ্যুতিক আলোয় ডকের হোটেলওয়ালাদের বেসাতি, লায়ন সিনেমায় মেটিনি শো দেখার জন্য লাইন বাঁধা রংবাজ ছেলের দল, চকচকে কালো বোরখাপরা মেয়েদের চলাফেরা, সালোয়ার কামিজ পরা কিশোরীদের কিচির-মিচির, সব মিলিয়ে ঢাকা ছিল আমার কাছে এক রহস্যনগরী।

কিন্তু আমি যখন স্থায়ীভাবে থাকার জন্য ফুলবাড়িয়া স্টেশনে এসে নামি। তখন থেকেই কায়রোর মতো এই প্রাচীন নগরী তার অচলায়তন, মোগলাই আদব-কায়দা, অভ্যেস, জীর্ণ স্বপ্ন ও পোশাক-পরিচ্ছেদ ছেড়ে একটু হালকা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। দু'শ বছরের বৃটিশ শাসন যে শহরকে এর মোগলাই ঐতিহ্য থেকে একচুল নাড়াতে পারেনি। দেশভাগের পর কলকাতাকেন্দ্রিক ইংরেজি শিক্ষিত মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের বৃটিশ কেতাদুরস্ত আমলা, চাকরিজীবী নিম্নমধ্যবিত্তের দল, রাজনীতিক, পেশাজীবী, ছাপোষা মানুষ, বিহারী, পাকিস্তানী রাষ্ট্রের স্বপ্নে বিভোর বিজয়ী কবির দল, পশ্চিমবঙ্গের বিত্ত বদলের সুযোগভোগী হামবড়া বাঙালি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত উচ্চবর্ণের মুসলিম খানদানী মোহাজির পরিবার, ইস্পাহানী, বাওয়ানী, দাদা ও দাউদের মতো পুঁজিপতিদের সপরিবারে বিপুল দখলদারী নিয়ে ঢাকায় প্রবেশের ফলে তা আমূল কেঁপে উঠল। প্রাচীন ঢাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে পয়সাঅলা নবাগতদের বিত্তের সংঘাতের সময় সেটা। পুরনো ঢাকার মহিমা পতনের শুরু। ঢাকার আশেপাশের ঝোপ-জঙ্গল, কচুক্ষেত ইত্যাদি সাফ করে গড়ে উঠছে আধুনিক স্থাপত্যরীতির নতুন ইমারতের সারি।

তখনও ভিস্তিওয়ালারা চামড়ার মশকে পানি বয়ে শহরের রাজপথ ভিজিয়ে দেয়ার বৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করেনি। ঘোড়ার গাড়িকে তখনও টেনে নিয়ে যাচ্ছে হাড্ডিসার জোড়াবাঁধা ঘোড়ারা। পতনোন্মুখ অস্তিত্ব নিয়ে এখনও এসব আছে। মুখে মৃত্যুর ছাপ। ইতিহাসের গতির দিকে স্তব্ধ দৃষ্টি। ঠিক এ সময়কালেই এক অবিশ্বাস্য বাসনা নিয়ে আমি ঢাকায় প্রবেশ করি। আমি হবো এক কবি। জীবনের গূঢ় রহস্যের যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করব তা ছন্দময় ভাষায় বর্ণনা করব আমি।

এ শহর, আর সব প্রাচীন শহরের মতোই আমাকে ঠাঁই দিলো। ঠাঁই দিলো তার উচ্ছিষ্ট, নষ্ট মানুষ, পাপ ও পঙ্কিলতার মধ্যে। এ শহরে প্রবেশ করার আগেই আমার কয়েকটি লেখা কলকাতা ও ঢাকার কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। আমার উদ্দেশ্যের দিকে রওনা দেয়ার ছাড়পত্র ছিল সেই কয়েকটি প্রকাশিত রচনা। আমি এসে উঠলাম নবাবপুরের একটি দিনমজুরদের হোটেলে, যার পাশেই ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ্যাপল্লি। লুৎফর রহমান নামক একজন অল্পখ্যাত লেখকের সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে আমার পরিচয় থাকায়, এই হোটেলের মালিক এক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন। আমি তখন একুশ বছরের কৃশকায় অপূর্ণ যুবক। চেহারায় ছবিসুরতে কিশোরই বলা চলে। লুৎফর রহমান তখন এই হোটেলেরই দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বস্ত বাসিন্দা। উদারতা ও নিয়মানুবর্তিতা যা আজকাল কোনো গুণ বলেই বিবেচিত হয় না, লুৎফর রহমানের ছিল সে সব মানবিক গুণ। আমার দুর্দম ইচ্ছা শক্তিকে তিনি সহজেই সনাক্ত করতে পারলেন। শহরে বেঁচে থাকার জন্য তার যে উপায় ছিল, আমি নাছোড় বান্দার মতো সেই ধরনের রুজি-রোজগার আমার জন্য জোগাড় করে দিতে তাকে ধরলাম। নিরুপায় হয়ে কিংবা মমতাবশত তিনি আমাকে তার কর্মক্ষেত্র দৈনিক মিল্লাতের প্রুফ সেকশনে নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন পাকা প্রুফরিডার। তার অনুরোধে আমাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটা শিক্ষানবিসির কাজ দেয়া হলো।

সংবাদপত্র অফিসে কাগজের একটা গন্ধ থাকে যা একবার কারো রক্তের মধ্যে মিশে গেলে সে আর কাগজের কাজ ছাড়া অন্য কাজে আনন্দ পায় না। আমি যে পরিবেশ থেকে সংবাদপত্রে প্রবেশ করেছিলাম সেখানে সংবাদপত্রের সম্মান ছিল অনেক উঁচুতে। আমি সংবাদপত্রের কি কাজ করি সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো আমি ঢাকার একটা সংবাদপত্রের অফিসে, সাংবাদিকদের সোহবতে আছি, এটাই আমার অভিভাবকদের সান্ত্বনা। আমার পিতা জানতেন আমি লেখক হওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছি, আর ফিরব না।

একদিন যে সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার 'জীবন' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে গেলাম। সাপ্তাহিক পত্রিকা, নাম কাফেলা। সম্পাদক, নজমুল হক। সহযোগী সম্পাদক, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী।

আমার প্রকাশিত রচনার গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার বয়েস ও শারীরিক ক্ষীণ আয়তনের বৈসাদৃশ্য দেখে উভয়েই চমকে গেলেন। একজন তো বলেই ফেললেন, 'এ গল্প আপনি লিখেছেন?'

আমি হাসলাম। বললাম, আমি আসলে কবিতাই লিখি। আপনারা যে আমার এ গল্পটি ছাপবেন তা ভাবতে পারিনি। আজ কয়েকটি কবিতা নিয়ে এসেছি। মনোনীত হলে ছাপবেন। আমি পকেট থেকে তিন শীট কাগজ বের করে সহযোগী সম্পাদক আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরীকে দিলাম। তিনি পরম কৌতূহল নিয়ে তখনি কবিতা তিনটি উচ্চারণ করে পড়লেন। তারপর আমার সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে কম্পোজিটারকে ডেকে কবিতা তিনটি চলতি সংখ্যায় কম্পোজ করতে দিলেন। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ মোটামুটি উৎসাহব্যঞ্জকই হলো। আমি নিয়মিত কাফেলায় আসা-যাওয়া, ওয়াসেকপুরীকে সহযোগিতার মধ্যদিয়ে লেখালেখি, তরুণ লেখকদের সঙ্গে পরিচয়, নিজের লেখা ছাপাবার দুর্ভাবনাহীন এক পরিবেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈবভাবে পেয়ে গেলাম। সারারাত দৈনিক মিল্লাতে প্রুফ দেখার কাজ। বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুম। তারপর নাওয়া খাওয়া দ্রুত সেরে কাফেলায় বেগার খাটতে যাওয়া। সেখান থেকে বেরিয়ে কিছু সময় উদীয়মান কবি সাহিত্যিকদের আড্ডা কখন, কোথায় বসেছে সেই খোঁজে বেরিয়ে পড়া, এই দৈনিক রুটিন। এর মধ্যে ওমর আলী নামে এক কবির সঙ্গে পরিচয়। এই পরিচয়ের সুবাদে ঢাকার প্রাচীন পবিত্র কোরআন ব্যবসায়ী পরিবারের বৈঠকখানায় প্রবেশের অবাধ অধিকার। ওমর ছিল পরিবারটির গৃহশিক্ষক। সেখানে আসা-যাওয়ার মধ্যদিয়েই আমার জানা হলো ঢাকাইয়া জনগোষ্ঠীর গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ঐতিহ্যগত অনেক দিক। প্রকৃতপক্ষে শত-শত বছর ধরে বংশানুক্রমে সামন্তবাদী নগর জীবনের ঐতিহ্যবাহী ধারাটি কেমন ছিল তা উপলব্ধির সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। আমি এসেছিলাম একটি মফস্বল শহর থেকে। কয়েকটি অফিস-আদালত, মহকুমা শাসক-প্রশাসকদের ঘরবাড়ি ও ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার তৈরি কয়েকটি হাইস্কুল ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরটিকে একটি বড় গ্রাম ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। তবে সে গ্রাম ছিল বৃটিশ শাসনের ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্মিত। ঢাকার মতো মোগলাই শাসনের বিলীয়মান স্বপ্নের শতচ্ছিন্ন সতরঞ্জি বিছানো নয়।

বন্ধু ওমর আলীর কাছে প্রথম জানতে পারি ঢাকার প্রগতিশীল সাহিত্যগোষ্ঠী সে সময় কোথায়, কোন পত্রিকা ও সংগঠনের মধ্যে সমবেত হয়েছেন। ওমর বলল, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নামে একটি সংগঠন সওগাত পত্রিকা অফিসে সপ্তাহের কোনো একটি দিনে তাদের আসর বসায়। সওগাত সাহিত্য মাসিককে ঘিরে তাদের তৎপরতা চলে। আমরা স্থির করি তাদের সাহিত্য আসরে একদিন গিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনে আসতে হবে। সেখানে গেলে তখনকার সবচেয়ে প্রখ্যাত উদীয়মান লেখক সম্প্রদায়ের হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ও খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হবে।

এদের কয়েকজনের নাম মফস্বলে থাকতেই আমি জানতাম। হাসান হাফিজুর রহমানের 'যে কোন সর্বহারার প্রার্থনা' নামক একটি দীর্ঘ কবিতা তখন কলকাতার পূর্বাশা পত্রিকায় পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকাটি তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাহিত্য পিপাসুদের হাতে দেখেছিলাম। তাছাড়া ভাষা বিদ্রোহের ওপর লেখা গল্প, কবিতা প্রবন্ধাদি নিয়ে সংকলিত একটা বই সম্পাদনা করে তখন হাসান বেশ খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া 'অগত্যা' বলে তরুণতুর্কীদের একটা সাহিত্য মাসিক ফজলে লোহানীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে তৎকালীন সাহিত্য প্রয়াসীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও পত্রিকাটির প্রতিটি আক্রমণই ছিল অসাহিত্যিক। 'অগত্যা'য় আজাদের গল্প ও বোরহানের একটি কবিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে ধারণা করেছিলাম এরাই আমার অগ্রবর্তী আধুনিক লেখক। তখনও কবি শামসুর রাহমানের নামের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি। কারণ শামসুর রাহমান এদের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও, ছিলেন একান্ত প্রগতিবিরোধী ক্ষুদ্র একটি গ্রুপের সর্দার। সে গ্রুপের সদস্য ছিল মাত্র তিনজন। শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দীন ও শামসুর রাহমান নিজে। এই গ্রুপটির সঙ্গেই আমার হৃদ্যতা পরে অত্যন্ত প্রগাঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সে কথা পরে আসছে।

একদিন অকস্মাৎ এক সন্ধ্যায় পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাহিত্য আসরে গিয়ে হাজির হলাম। বেশি লোকজন না থাকলেও বেশ জমজমাট আসর। আলাউদ্দিন আল আজাদের একটি গল্পের ওপর নির্মমতম ভাষায় সমালোচনা করে খালেদ চৌধুরী তার বক্তব্য রাখলেন। আমি ও ওমর উভয়েই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। লেখকদের এ খেলার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয়ই ছিল না। মুহূর্তের মধ্যেই আমি ভেবে নিলাম এখানে কোনো কবির ঠাঁই হতে পারে না। যদিও সেই আসরে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের মতো ধীমান কবি ও বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের মতো সহৃদয় লেখক আমাদের দু'জনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল লেখকদের সাহিত্যবিচারের মার্কসবাদী নিরিখ দেখে হৃদয় কেঁপে উঠল। আমি নিজেও তখন মার্কসীয় তত্ত্বকথায় বশীভূত হয়েই শহরে এসেছিলাম। এখানে এই গোষ্ঠীর লেখার ধরন ও সাহিত্যালোচনায় একদম ঘাবড়ে গিয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

আসর শেষ হলে বেরুবার পথে শহীদ কাদরী যেচে পরিচয় করলেন ও শামসুর রাহমানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। পথ চলতে চলতে শহীদ আলোচনা সভাটিকে নিয়ে এমন বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনী কাটতে লাগল যে, মুহূর্তের মধ্যে আমার মফস্বলের প্রকৃতিপুষ্ট গ্রাম্য হৃদয় খানিকটা নির্ভার হলো। 'আমি বুঝলাম' এরা ভিন্ন মতের প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী রোমান্টিক গ্রুপের লোক। এরাই নিজেদের আড্ডা, কাফে ও রেস্তোরাঁ ছাড়া অন্য কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারে না। এরা সংঘ গড়ে তুলতে পারে না। পারে না এমনকি একটি সাহিত্য পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করতে। কিন্তু এদের রচনা ছাড়া কোনো সাহিত্যান্দোলই কোনোকালে এগোয়নি। এরাই শেষ পর্যন্ত কবিতায় নতুন আঙ্গিকের উদ্ভাবক হয়। আর কবিতার ইতিহাস যে এর আঙ্গিকেরই ইতিহাস একথা জোর গলায় বলার সাহস এদেরই আছে।

আমি অনায়াসে এদের দলে ভিড়ে গেলাম। এদের নিয়মিত আড্ডার ক্ষেত্রটি ছিল বাংলাবাজারের বিউটি বোর্ডিং। সাহিত্য পত্রিকা ও বিদেশি ম্যাগাজিন ঘাঁটার দোকান তখন ছিল মজলিস ভাইয়ের উন্মুক্ত বইয়ের দোকান। এদের বুক স্টলটি বহুকাল আগেই নিউমার্কেটে উঠে এসে নলেজ হোম হয়েছে। বাংলাবাজার ও ইসলামপুর এলাকাটিই তখন আধুনিক লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকদের বিচরণক্ষেত্র। তখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউমার্কেট ও স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি। গড়ে ওঠেনি ডিআইটির ইমারত কিংবা মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া। তখনও এসব জায়গা ছিল ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ পরিত্যক্ত জমিন। এখন ভাবতেও অবাক লাগে এক মধ্যযুগীয় সামন্ত শহরের মহানগরীতে রূপান্তরের প্রারম্ভকালের লেখক ও কবি আমরা। উদ্যমহীন এক লোকালয় যেন অকস্মাৎ যাদুর স্পর্শে জেগে উঠল আমাদের চোখের সামনে, নিজের অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের ধারণ করেই। অকস্মাৎ আমার জন্য জীবিকার এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হলো। আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী কাফেলার চাকরি ছেড়ে দিলে আমার ডাক পড়ল। আমি সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রটির সম্পাদনার ভার পেলাম। এই সুযোগে আমি অচিরেই স্বাধীনচেতা আমার মতো তরুণতর লেখকদের ভাগ করে দিতে চেষ্টার কোনো কসুর করিনি। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও ফজল শাহাবুদ্দীন তখন বহু পত্রিকার নিয়মিত লেখক থাকলেও তারা কাফেলাতেও লিখতে আগ্রহ দেখালেন। আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জিয়া হায়দার, ওমর আলী ও শহীদ কাদরীর লেখা চেয়ে নিয়ে প্রকাশ করতে লাগলাম। শামসুর রাহমান তখন কলকাতার বড়-বড় সাহিত্য পত্রিকা যেমন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকা, দেশ ও পূর্বাশায় নিয়মিত লিখছেন। তিনি তখন বন্ধুদের ঈর্ষা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। আমরাও বিশেষ করে আমি, শহীদ ও ফজলও তখন কলকাতার স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা চরিত্র শুরু করেছি। আজ অবশ্য সেই সময়ের বালসুলভ বেহায়াপনার জন্য খুবই অনুতপ্তবোধ করি। এখনও আমাদের বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ এবং আমি নিজেও কলকাতার কাগজে লিখি, কিন্তু গায়ে পড়ে লেখা পাঠাই না। কেউ চাইলেই পাঠাই। তখনকার অবস্থাটা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্য প্রাধান্যকে অবলীলায় মেনে নেয়ার মতো। আজ সকলেরই সে তাগিদ কমে এসেছে। আজ কম-বেশি সকলেই জানেন ঢাকার সাহিত্যই বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য। কলকাতার সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার যোগ চিরকালের জন্য ন্যায়সঙ্গত কারণেই ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কলকাতার সাহিত্য আমাদের কাছে পাঠ্য হলেও তা বিদেশি সাহিত্য। তাদের সমাজ চেতনা ও বাংলাদেশের সমাজ চেতনা এক ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও যোজন-যোজন ব্যবধান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া আমরা কি সত্যি এক ভাষাভাষী থাকব? ঢাকার আধুনিক সাহিত্যের ভাষা ও কলকাতার সমকালীন সাহিত্যের ভাষা কি ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে না? এই বদলে যাওয়াটা সম্ভবত কোনো বাঙালিরই কাম্য নয়। কারণ বাঙালির ভাষার চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু নেই। কিন্তু উপমহাদেশের বিভক্তির ইতিহাস বাঙালির আবেগ দ্বারা পরিচিত না হওয়াটাই বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছে। একটা সার্বভৌম বাঙালি জাতির উত্থান এই উপমহাদেশের জন্য একান্ত দরকার ছিল।

আমি যখন কবিতা পত্রিকার জন্য বুদ্ধদেব বসুকে লেখা পাঠাই সেই সময়কার একটি ঘটনার কথা আমার এখনও মনে পড়ছে। আমি হঠাৎ একদিন স্থির করি কবিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠাব। আমার সিদ্ধান্তের কথা আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শহীদ কাদরী ও ওমর আলীকে জানালে এরা উভয়েই কবিতা তিনটি দেখতে চায়। আমি ডায়রী খুলে কবিতা তিনটি দেখাই। এরা ভালোমন্দ কিছুই না বলে চুপচাপ বসে থাকে। আমি শহীদকে একটা খাম এগিয়ে দিই রাসবিহারী এভেন্যুর ঠিকানাটা লিখে দিতে। ঠিকানা লিখতে গিয়ে শহীদ কবিতাগুলো ছাপার সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করল। আমি অনুরোধ করলাম আমার উভয় বন্ধুকেই লেখা পাঠিয়ে লেখার মান সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে। কারণ বুদ্ধদেবই ছিলেন সেকালে সাহিত্যের সবচেয়ে নিরপেক্ষ সম্পাদক। একবার তার পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হলে উভয় বাংলার লেখকরাই নিজেদের কবি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। যা একদা শামসুর রাহমানের মতো তরুণ কবিকে আত্মবলে বলীয়ান করে তুলেছিল।

আমি লেখা পাঠিয়ে কেন জানি নিশ্চিত ছিলাম যে, ছাপা না হলেও বুদ্ধদেবের একটা জবাব পাওয়া যাবে। তাছাড়া তখন কলকাতার অন্যান্য উঠতি পত্রিকায় আমি নিয়মিত লিখতে শুরু করেছি। অমনোনীত হওয়ার দুর্ভাগ্যও দু'একবার সইতে হয়েছে। যেমন উত্তরসুরী থেকে আমার একটি কবিতা অমনোনীত হয়ে ফেরত এসেছিল। কিন্তু নতুন সাহিত্য, চতুরঙ্গ, ময়ুখ ও কৃত্তিবাসে আমার লেখা যত্নের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল।

আমি কবিতা পত্রিকা থেকে যে উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম অকস্মাৎ তা একদিন এসে হাজির হলো। দুপুর বেলায় কুয়োর পাড়ে গোসল করছিলাম। সারা শরীর পানিতে ভেজা। এমন সময় পিয়ন এসে জানালো আমার একটা পোস্টকার্ড আছে। আমি সিক্ত, কম্পিত হাতেই চিঠিটা নিলাম। প্রীতিভাজনেষু, তোমার একটি বা দুটি কবিতা ছাপা যাবে মনে হচ্ছে। বুদ্ধদেব বসু। সাদা কার্ডটার ওপর রাসবিহারী এভেন্যুর ঠিকানা ও কবিতা পত্রিকার প্রতীকচিহ্ন।

আমি আনন্দটা চেপে রাখলাম। কেউ জানল না বাংলাদেশের এক অখ্যাত তরুণতম কবির কবিতা বুদ্ধদেব তার ঐতিহাসিক কাব্যান্দোলনের মুখপাত্র কবিতা পত্রিকার জন্য মনোনয়নের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অকস্মাৎ আমার চালচলনই বদলে গেল। তখন কি জানতাম, একই আনন্দ অপেক্ষা করছে আমার দুই বন্ধু কাদরী ও ওমরের জন্য? এরা যে বুদ্ধদেবকে আমার লেখা পাঠানো দেখে নিজেরাও সাহসী হয়ে গোপনে কবিতা পাঠিয়ে বসে আছে তা কি করে জানব?

পরবর্তী সংখ্যা বেরুবার সম্ভাব্য সময়টা অসহ্য অপেক্ষার মধ্যে পার হয়ে যেতে লাগল। আমি মাঝে মধ্যে বুদ্ধদেবের চিঠিটা বইয়ের ভেতর থেকে খুলে দেখি। শেষ পর্যন্ত কবিতায় ছাপা হবে তো আমার রচনা? নাকি বুদ্ধদেবের ছাপা যাবে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত ছাপা যায়নি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন বিউটি বোর্ডিং-এ গিয়ে দেখি শহীদ ও জাহাঙ্গীর নামে তার এক বন্ধু মুখ গোমড়া করে টেবিলে বসে আছে। তাদের সামনে সদ্য প্রকাশিত আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত চৈত্র সংখ্যা কবিতা পত্রিকা। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখেই শহীদ বলল, 'দোস্ত তোমার কবিতা তিনটি ছাপা হয়েছে।'

আমি শহীদের কথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও পত্রিকাটির দিকে হাত না বাড়িয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে বললাম, 'এক কাপ চা খাওয়াও।'

শহীদ চায়ের জন্য বেয়ারাকে ইশারা করল। আমার দিকে পত্রিকাটি ঠেলে দিয়ে বলল, 'নিতে পার। নিশ্চয়ই তুমি এখনো কাগজ পাওনি। লেখাগুলো দেখো।'

আমি শহীদের কথায় কাগজটি টেনে নিলাম। পত্রিকাটি খুলবার আগেই শহীদ উঠে দাঁড়াল, 'আমি এবার আসি।'

বিউটি বোর্ডিং-এর পেছনেই ছিল শহীদের বাসা। হঠাৎ উঠে শহীদের চলে যাওয়াটা আমার কাছে কেমন যেন লাগল। ভাবলাম কবিতা পত্রিকায় আমার কবিতা ছাপা দেখে শহীদ কি তবে জেলাস হয়ে উঠে গেল? পাতা উল্টিয়ে কিছু দেখার আগেই শহীদের বন্ধু জাহাঙ্গীর বলল, 'আপনি বোধহয় জানেন না শহীদের আম্মা গতরাতে ইন্তেকাল করেছেন।'

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে জাহাঙ্গীরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জাহাঙ্গীর বলল, 'শহীদ নিজের দুঃসংবাদটি লুকিয়ে আপনার জন্য সু-সংবাদটি দিয়ে গেল। এতে অবশ্য আপনার সঙ্গে শহীদেরও একটি কবিতা আছে। ছাপা হয়েছে ওমর আলীর কবিতাও।'

আমি জানতাম বেশ কিছুদিন যাবৎ শহীদের আম্মা শয্যাগত ছিলেন। শহীদই বলেছিল। আজ শহীদের ব্যবহারে একেবারে হতচকিত হয়ে গেলাম। কবিতায় আমার তিনটি কবিতা দেখে আমি বন্ধুর শোকে সহানুভূতি ও নিজের সাফল্যের আনন্দে জাহাঙ্গীরের সামনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললাম। সেই চৈত্র সংখ্যা কবিতায় শামসুর রাহমান ও সৈয়দ শামসুল হকের কবিতাও ছাপা হয়েছিল। ছাপা হয়েছিল শক্তির 'যম' কবিতাটি। মূলত পঞ্চাশ দশকের কবিদের জন্য এক প্রকাশ্য স্বীকৃতির সংখ্যা। এই স্বীকৃতি মূলত তিরিশের কাব্যান্দোলনের প্রধান স্থপতি কবি বুদ্ধদের বসুর কাছ থেকে পাওয়া মানে এদের সকলের কাছ থেকেই পাওয়া। তিরিশের জীবিত এবং মৃতপ্রায় সবার রচনাই ঐ বিশেষ চৈত্র সংখ্যাটিতে প্রকাশ এবং পুনঃপ্রকাশ পেয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী আর বুদ্ধদেব তো আছেনই। তার বোদলেয়র অনুবাদ তখন কবিতার শেষের দিকের প্রায় বিশ পৃষ্ঠাই দখল করে রাখত। আমাদের জন্য বুদ্ধদেবের অসাধারণ অনুবাদের মাধ্যমে ঐ ফরাসী বিশ্বকবিকে আস্বাদন করা কি যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তা ভাবতে এখনও হৃদয়ে পুলক জেগে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ দশকীয় শক্তিমান কবির দল আমাদের কলকাতা প্রীতিতে চমকে উঠলেন। এতদিন তারা আমাদের অবজ্ঞা করতেন। ফিরেও তাকাতেন না আমাদের মুখের দিকে। যেসব প্রভাবশালী সাহিত্য পত্রিকা এদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো সেখানে লেখা ছাপা দূরে থাক আমাদের প্রবেশাধিকারই ছিল না। আবদুল কাদির বা কবি জসীমউদ্‌দীনের লেখা তখন অলঙ্কার হিসেবে এরা এদের পত্রিকা মাহে নও, পাকিস্তানী খবর ইত্যাদি সরকার ঘোষিত কাগজে ছাপলেও, নব্যকাব্যভাবনার রোমাঞ্চ জাগাবার মতো সারবস্তু এসব প্রবীণেরা অনেক আগেই খরচ করে ফেলেছিলেন। ফলে ফররুখ আহমদকে সামনে রেখে যে রোমান্টিক কাব্যান্দোলন এখানে দানা বেঁধে উঠেছিল। যারা ছিলেন মার্কসীয় আদর্শবাদের ঘোর বিরোধী, তারা তখন তমুদ্দুন মজলিসের ছত্রচ্ছায়ায় সমবেত হলেন। মনে রাখতে হবে এই তমুদ্দুন মজলিসই ছিল ভাষাবিদ্রোহের উগাতা ও পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তির ঘোর বিরোধী। যদিও ইসলামী আদর্শের পুনরুত্থানের স্বপ্নে বিভোর ছিল এদের হৃদয়। তবুও পাকিস্তানী আদর্শবাদের পতনের সমালোচনা করেই শেষ পর্যন্ত এদের রক্তাক্ত দুঃসাহস ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি এই মোহিকানদের পতনকালে তাদের সঙ্গে মেশার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। সান্নিধ্য পেয়ে জেনেছিলাম ফররুখ আহমদকে তার ভক্তরা যতবড় কবি ভাবেন, তার চেয়েও তিনি অনেক বড় এক মৌলিক কবি প্রতিভা। ভয়ে ভয়ে তার কাছে যেতাম। কারণ তরুণ মহলে আমার অখ্যাতি তখন ফররুখ বিরোধী গ্রুপের কবি বলে। কি করে যে ঐ ডাহা মিথ্যা অপবাদটা চালু হয়েছিল তা আজও আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। ফররুখ ভাইয়ের কাছে গেলে একটা অপরাধবোধ আমার নির্দোষ অন্তরকে মাছের টুকরোর মতো অনুতাপের কড়াইয়ে দগ্ধ করতে থাকত। আমি কবি ফররুখ আহমদকে ভালোবাসতাম, একথা কিভাবে যেন তিনি জেনে ফেলেছিলেন। আমাকে ডাকতেন, মিস্‌গাইডেড জিনিয়াস বলে। কাছে গেলে আদর করে চা খাইয়ে দিতেন। বলতেন, 'নাইওর' শব্দটি আমার কবিতায় আমি ব্যবহার করতে পারব কি না। পরে কিভাবে যেন শব্দটা আমি আমার একটি কবিতায় প্রয়োগ করে এই নিঃসঙ্গ কবির প্রীতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলাম।

হ্যাঁ, চমকে উঠেছিলেন তারা! অনেক দুঃখ পেয়ে, উপমহাদেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে তারা কষ্টার্জিত সম্পদ ও সুখ্যাতি ফেলে কলকাতা ছেড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঢাকায় এসেছিলেন। প্রথম থেকে তাদের আবার আরম্ভ করতে হয়েছিল জীবনের সব কিছুই। এক দশক পরেই তাদেরই মানস সন্তানরা যখন সাহিত্যখ্যাতির ভিখিরি হয়ে কলকাতার দিকেই হাত পাতল তখন তারুণ্যের বিরোধী হওয়া ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তর ছিল না। তবু বলতে পারি আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই আমি কবি ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান ও তালিম হোসেনের মতো কবিদের দুর্লভ নৈকট্য আদায় করে নিয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাট দশকের গোড়ার দিকে আমি দৈনিক ইত্তেফাকে চাকরি নিলাম। নিরিবিলি কাব্যচর্চার জন্য আমার তখন একটা নিরাপদ চাকুরির একান্ত দরকার ছিল। ইত্তেফাকে প্রবেশের কিছুদিন পরেই আমার সাংবাদিক সহকর্মীরা আমার একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের তাগিদ দিতে থাকলেন। ঢাকায় তখন প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সাহিত্য প্রকাশের কোনো প্রকাশকই ছিল না। মুহম্মদ আখতার নামে আমার এক সাহিত্য প্রেমিক বন্ধু আমার পাণ্ডুলিপি প্রকাশের এক পথ বাৎলালেন। তিনি তখনকার লেখক, সাংবাদিক, চারু কলাশিল্পী ও কবিদের কাছ থেকে একশ' টাকা করে চাঁদা আদায় করে 'কপোতাক্ষ' নামে একটা যৌথ প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুললেন। এর অংশীদার ছিলেন তিনি নিজে, কবি রফিক আজাদ, কবি আসাদ চৌধুরী, শিল্পী রফিকুন্নবী, শিল্পী হাসেম খান, সাংবাদিক সৈয়দ শাজাহান আরও কয়েকজন উদারচেতা সাহিত্যপ্রেমিক।

আমার প্রথম বই 'লোক-লোকান্তর' প্রকাশ পেলো। কাইয়ুম চৌধুরীর চমৎকার ডিজাইন প্রচ্ছদের ওপর এক রঙয়ে ছাপা হলেও রুচিবান পাঠক মাত্রই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রকাশনা উৎসব হলো বাংলা একাডেমিতে। সৈয়দ আলী আহসান সভাপতি। প্রধান বক্তা আমার বন্ধু সেবাব্রত চৌধুরী ও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বক্তারা আমার কবিতার শব্দবিষয়ক মূল্যবান কয়েকটি দিক নিয়ে প্রীতিপূর্ণ আলোচনা করলেন। শ্রোতাদের সারিতে ছিলেন হাসান হাফিজুর রাহমান, শামসুর রাহমান সহ আমার সব বন্ধুরা। এটাই বোধহয় ঢাকায় বিভাগোত্তর মৌলিক সাহিত্য প্রকাশের প্রথম প্রকাশনা উৎসব।

'লোক-লোকান্তর' বেরুবার আগেই কবি সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় 'সমকাল' সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রগতিশীল লেখক সম্প্রদায়। এরা সবাই ছিলেন ছাত্র। ফজলুল হক হলের যে কামরায় এরা জল্পনায় বসেছিলেন দৈবক্রমে সেদিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কামরাটির বাসিন্দা ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান ও সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী মূর্তজা বশীর, রফিকুল ইসলাম এবং আরো কেউ কেউ। পরিকল্পনাকারীরা শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছে মতো সমকাল প্রকাশ করতে পারেননি। তাদের নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কানাকড়িও তাদের পকেটে ছিল না। থাকার কথাও নয়। শেষে প্রগতিশীল লেখকরা যাদের সমালোচনায় সর্বদা পঞ্চমুখ থাকতেন তাদেরই এক দুঃসাহসিক কবিকে যিনি ফররুখ আহমদেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু, সেই সিকান্দার আবু জাফরকে সমকাল সম্পাদনা ও প্রকাশের জন্য ধরে পড়লেন। জাফর ভাই বের করলেন সমকাল।

আজ মনে হয় ছাত্রাবস্থার সেই সব অতি প্রগতিশীল লেখকদের হাতে সমকাল সম্পাদিত না হওয়াতে সাহিত্যের জন্য বিষয়টা হয়েছিল অত্যন্ত মঙ্গলজনক। একই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে কয়েকজন প্রতিভাবান কবি, গল্পকার, প্রবন্ধকার ও একজন অসাধারণ প্রতিভাধর সম্পাদকের আবির্ভাব হয়েছিল আমাদের এই চরিত্রহননকারী মহানগরীতে। সিকান্দার আবু জাফর আজ শুধু কোনো এক সংগ্রামী কবি-সম্পাদকেরই নাম নয়, বরং বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের আধুনিক সাহিত্য রুচিরই প্রতীকী উচ্চারণ মাত্র।

প্রথম দিকে আমরা সমকালে ভিড়তে পারিনি। তৎকালীন তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখকদের দৌরাত্ম্যে আমাদের অনেক নতুন উপমা-উদ্ভাবিত কবিতা ফাইলের নিচে জমা হয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু এ পরিস্থিতিটা ছিল সিকান্দার আবু জাফরের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। শেষে পত্রিকাটি আদ্যোপান্ত সম্পাদনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিলেন তিনি। শুরু হলো সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ও শওকত আলীর গল্প এবং আমার ও শহীদ কাদরীর কবিতা প্রকাশ। পরবর্তীকালে এই নির্বাচনধারাটা ষাট দশকের কবিকুল ও গদ্যশিল্পীদের অশেষ উপকার সাধন করেছিল। আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহার কবিতা স্রোতের মতো ছাপা হলো। গল্প লিখলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও হাসান আজিজুল হকের মতো বিশ্লেষণী গদ্যধারার নিসংকোচ কথাশিল্পীরা। আজ সম্ভবত গবেষকরা এদেরই বলছেন সমকাল গোষ্ঠী।

এভাবেই কাটছে আমার সময় ও সামান্য কবিকৃতি। বারুদ ও গন্ধকের নদী সাঁতরে আমরা কয়েকজন লেখক ডাঙায় উঠে দাঁড়িয়েছি। এ ডাঙা সার্থকতার কোনো উপকূল কি-না জানি না তবে আমাদের জন্য বিশ্রামের। একটা সামাজিক আশ্রয় কবি মাত্রেরই একদিন দরকার হয়। আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতেই তা নির্মাণ করেছি। সাহিত্যকে এখনও যারা জীবনের বিবরণের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মারও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ বলে মনে করেন আমি তাদের দলেই থাকতে চেয়েছিলাম, এখন তাদের দলেই আছি। পরোয়া করি না কে আমাকে কি চোখে দেখে। আমি তো আমার দেশবাসীকে ভালোবেসেই সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছি।

আমি, আমার সময় এবং আমার কবিতা

প্রকৃতপক্ষে কবিতা বিষয়ে আমি খুব বেশি বলতে চাই না। কারণ, আমি আজীবন যা বলে এসেছি তা তো কবিতার ওপরই বলে এসেছি। এখন কবিতা নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম বলতে চেষ্টা করি। আমি নিজেও কবিতার ব্যাপারে আমার যে ভাবনা তা স্থির রাখতে পারছি না। নানা সময়ে আমি কবিতা বিষয়ে যা চিন্তা করেছি তা ক্রমাগত বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। একই রকম ভাবনা থেকে সব সময় কবিতা লিখতে পারিনি আমি। নানা মতের নানা কবির দ্বারা মতামত পরিবর্তিত হয়ে গেছে আমার। আর এখন আমি চিন্তা করি যে আমার বয়েসও হয়ে গেছে। কবিতার ওপর উৎফুল্ল হয়ে কিছু বলার যে বয়েস সেটা আমি অতিক্রম করে এসেছি। এখন আমি যা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই সেটা হলো আমার নিজের কবিতাকে আমি এমন এক পর্যায়ে আনতে চাই, যা সঠিক কবিতা হবে। কবিতার ভাষাটা হবে খুবই বোধগম্য। খুবই সহজ সরল প্রার্থনার মতো। কবিতার ভাষাকে আমি প্রার্থনার ভাষায় পরিবর্তন করবার চিন্তা-ভাবনা করি। সবসময় যে ঠিক ওরকমই থাকবে এমন নয়। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—আপনার তো নারী সম্বন্ধে আকুল আগ্রহ ছিল এক সময়ে এখন কি নেই? আমি মনে করি যে, আমি নারী বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলিনি। এখনো আমি প্রেমের কবিতা লেখার পক্ষপাতি, যদি সেই কবিতাটি হয় আমার আগের কবিতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তেমন লেখা যদি লিখতে পারি তাহলে আমি প্রেমের কবিতা এখনো লিখতে চাই। কিন্তু মূলত আমি গূঢ় রহস্যময় কবিতাই লিখতে চাই। এমন রহস্যময় কবিতা যে, এখনো মানুষকে ভাবাবে, একবার পড়লেই বা শুধু ছন্দের দোলাতেই কবিতাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে এমন নয়, এর গূঢ় রহস্যের জন্য কবিতাটি বার বার পড়বে একজন পাঠক।

কবি যা দেখে তাতে দ্রষ্টব্যের বহিরঙ্গের সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ থাকে। এই দৃষ্টি আমি ত্যাগ করেছি এখন। আমি সুন্দর কিছু দেখলেই এটাকে সুন্দর বলে স্বীকার করি। কিন্তু আমি এর ভেতরটাও দেখতে চাই। এক সময় প্রকৃতির ভিতরে মিলেমিশে থাকতে আমার খুব পছন্দ হতো। গাছ-পালা, পাখি, নাও, নদী, মানুষ এগুলোর মধ্যে থাকতে আমার ভালো লাগত। এর মধ্যে থেকে শব্দ চয়ন করে আমি কবিতা নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি। নৈঃশব্দেরও একটা শব্দ আছে, একটা বিষয় আছে। এখন সেখানে পৌঁছুতে চাই যেখানে আর কোনো শব্দ নেই। হ্যাঁ, শব্দহীনতার মধ্যে সৌন্দর্য বিকাশের দৃশ্য রয়েছে। এরকম একটা জায়গায় পৌঁছুতে চাই, সেই প্রান্তরে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকি সেখানে। হয়তো গেলাম সেখানে বসলাম দেখলাম, সূর্যাস্তের পর সব নীরব হয়ে গেল। সবাই চলে যাচ্ছে যার যার ঘরে। আমি কিন্তু আর যাই না। সেখানে অনেকক্ষণ বসে থাকি। বসে থেকে সবাই চলে যাওয়ার পর যে নৈঃশব্দ, যে নিস্তবদ্ধতা, সেটা উপলব্ধি করতে চাই এবং কবিতায় আনতে চাই।

এ ধরনের কবিতা যারা লেখে এদের কবিতা আর পছন্দনীয় থাকবে কিনা তা আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। তবু মনে করি আমার যে বয়েস, ষাটের বেশি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তারুণ্যের আনন্দ নিয়ে শুধু কবিতা লেখার স্ফূর্তি আমার থাকার কথা নয়। ষাট বছরেরও একটা কবিতা আছে, ষাট বছরের একটা বাণী আছে। ষাট বছরেও একটা পছন্দনীয় কিছু দেখলে তার ভিতরটা দেখার যে ইচ্ছা সেটা আছে, সেটা এখন একটু ব্যক্ত করতে চাই। আসলে আমি একটু প্রস্তুতি নিতে চাই। আমি যে থাকব না এ বিশ্বাস তো আমার মধ্যে দৃঢ়মূল। কতদিন মানুষ বেঁচে থাকে? ধরে নিলাম আরো দশ। আরো বিশ বছরই না হয় বাঁচলাম। এর বেশি তো আশা করি না। এই যে চেতনায় আমি আমাকে 'আমি' বলি, আমি মনে করি এই চেতনা থেকে আমি কখনো লুপ্ত হবো না। এটা থাকবে আমার ভেতর। তার আধার পরিবর্তিত হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এ ব্যাপারে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যাকে ঈমান বলা হয়, যে আমার একটা পরকাল আছে। সে কালের মধ্যে আমি প্রবেশ করব। সে কাল সম্পর্কে ধর্ম গ্রন্থাদিতে নবীগণ ও রসুল (সাঃ) বলেছেন। তার উপর দৃঢ় আস্থা রেখেই আমি এতোদিন চলে এসেছি। আমি মনে করি যে সেদিকেই এখন আমার যাত্রা। যাওয়ার আগে কিছু প্রস্তুতি আছে, যাওয়ার আগেও কিছু কবিতা থাকে। আমি সে কবিতা এখন লেখার চেষ্টা করছি। আর মন থেকে বিদ্বেষ দূর করে দিয়েছি। এক সময় নানা বিষয়ে তর্ক করেছি, সব সময় জিতে থাকার জন্য চেষ্টা করেছি। ভিন্ন মতকে পরাস্ত করার জন্য নিজেকে সজ্জিত রেখেছি। এখন আমি অবশ্য সে রকম আর চেষ্টা করি না। কারণ আমার মত দৃঢ় হয়েছে। আমার বিশ্বাস আমার ঈমান সব মিলে আমাকে এমন দৃঢ় করে দিয়েছে যে আমি কারো সাথে কোনো তর্কের প্রয়োজন বোধ করি না। আমার যারা বিরুদ্ধমতাবলম্বী, আমি লক্ষ্য করেছি, তাদের বিদ্বেষভাব অনেক কমে গেছে। কেন কমে গেছে সেটা অবশ্য একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। কালের পরিবর্তনে অনেক কিছুই বদলে যায়, তাদের হয়তো তেজ কমে গেছে, আদর্শের তেজ কমে গেছে। তারা স্থির জায়গায় থাকতে পারেননি। আমি তো পরিবর্তিত হয়ে হয়েই এসেছি। কিন্তু আমি যেখানে এসেছি সেটা একটি চিরন্তন অবস্থান। অনেকেই সেই অবস্থান নিয়েছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরা, যাবার সময় এই অবস্থানে অনেকেই দৃঢ় ছিলেন। আমি এই অবস্থানে এসে পৌঁছুতে পারব তা কখনো কল্পনা করিনি। আমি মনে করি আমি সেই অবস্থানে এসে পৌঁছে গেছি যে অবস্থানে আর কিছুই এসে যায় না। এ অবস্থার মধ্যে এখন কিন্তু পরিবেশের যে তারুণ্য রয়েছে, নতুন তরুণ কবিরা অসংখ্য এসেছেন, তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমাকে উত্যক্ত করেন, ঘরে ফুল নিয়ে উপস্থিত হন, বিভিন্ন সভাসমিতিতে ডেকে সম্মান দিতে চেষ্টা করেন। সবাই যে আমার বন্ধু তেমন নয়, আমার শত্রু পক্ষও এটা করেন। আজকাল অনেক তরুণকে দেখি, যারা এক সময় বিদ্বেষ ভাবে জর্জরিত ছিল আমার বিরুদ্ধে, তারা আমার সামনে এসে কোনো কথাই বলতে পারে না, মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বসে থাকে, অনেকক্ষণ বসে থাকে, প্রশ্ন করে না। তখন আমি বুঝি যে বিদ্বেষ বা শত্রুতা যাই হোক, তারাও যেহেতু কবি, সেজন্য ওদের মধ্যে একটা কবিপ্রাণ রয়েছে। কবিতা সব সময় বিদ্বেষের উর্ধ্বে মানুষকে নিয়ে যায়। ঐ অবস্থানে থেকে তারা হয়তো এখন আমাকে আর শত্রু ভাবে না। আমি যে কারো একেবারে শত্রু বা বিদ্বেষ প্রচারেরই মধ্যে অবস্থান করেছি সেটা না, আমি সবার সাথে ভালোবাসার মধ্যে বসবাস করতে চেয়েছি। করতে পারিনি সেটা হলো একটা পরিস্থিতি, কিন্তু চেয়েছি যে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি যে, আমাদের কবিতার একটা বিকাশধারা তৈরি হোক, একমতের তো আর কবিতা হয় না। জীবনানন্দ বলেছেন যে কবিতা নানা রকম হয়। আমিও বলি যে কবিতা বিভিন্ন রকম হয়। আরেকটা কথা হলো আমরা আদর্শের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলি যে, কবি এই আদর্শে বিশ্বাসী। এটা এখন আমি মানি না। কারণ কবিরা তো যে কোনো কারণেই একটা বিষয় দেখেই কবিতা লিখতে পারে। তিনি তখন চিন্তা করেন না যে কি আদর্শে তিনি বিশ্বাস করেন। এই চিন্তা করে তো আর কাব্য সম্ভব নয়। ঘরের বন্ধ দরজার উপরেও একটা কবিতা লেখা যায়, ঘরের ভিতর কেউ রাঁধছে, ধোঁয়া উড়ছে, খাবারের গন্ধের উপরও একটা কবিতা লেখা যায়। এটা কোনো আদর্শ থেকে লেখা হয়? এটা কোনো আদর্শ নয়, এটা হলো কবিমন চঞ্চল হয় একটা বিষয় নিয়ে, কিছু শব্দ নিয়ে, একটা সত্য তিনি বলতে চান মুহূর্তের জন্য, সেটা বলেন, সেটা পূর্ব কোনো ধারণা থেকে বলেন, তা আমি মনে করি না।

আমাদের আধুনিক কবিতা লেখার যে সংগ্রামটা ছিল, যখন আমরা শুরু করি, তখন আমরা তিরিশের কবিদের কবিতার দ্বারা আপ্লুত হয়েছিলাম খুব বেশি। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এদের কবিতা আমাদের সামনে তখন ছিল। পরবর্তী সময়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজে উপলব্ধি করি যে, তিরিশের যাদের দ্বারা আমি আপ্লুত হয়েছি, কবিতার আঙ্গিক গঠনরীতি শিক্ষা করেছি, এই শিক্ষাগুলো যাদের কাছ থেকে লাভ করেছি এরা সবাই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের খুবই উল্লেখযোগ্য ছাত্র এবং তাদের কবিতার সমস্ত আবহটা এভাবে নির্মিত হয়েছিল যে তারা কবিতা লিখেছেন বাংলা ভাষায় ঠিকই কিন্তু তাদের বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে এতে মনে হয় তারা বাংলা ভাষার ইংরেজ কবি। এটা আমি উপলব্ধি করি। আমি তখন সোজাসুজি কবিতার বিষয়কে দেশীয় বলতে পারেন আঞ্চলিকও বলতে পারেন, আমি এটা ভাবি যে, আমাদের কবিতার আঙ্গিক গঠন যেটা তিরিশের কাছে শিখেছি এই শিক্ষা আমাদের থাকুক কিন্তু আমরা বিষয় নির্বাচন করব আমাদের দেশীয়, আমাদের সমস্যার ওপর, তখন আমি ঐ ভাবে কবিতা লিখতে চেষ্টা করি। তাতে দেশীয় শব্দাদি যেটাকে বলে আঞ্চলিক শব্দ, আমি এই নিয়ে কাজ করি। আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছিলাম তখন। তিরিশের কবিদের দেশপ্রেম আমি ঠিক উল্লেখযোগ্যভাবে অনুভব করিনি। তারা কবিতার জন্য সারা পৃথিবীকে বেছে নিয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্যের যেটাকে আধুনিকতা বলা হতো, সেটারই একটা অংশ একটা দায়িত্ব পালন করেছেন তারা। কিন্তু কবিরও তো একটা দেশ দরকার, কবির একটা জাতি দরকার, এমন একটা ভাষা দরকার যে ভাষার সাথে একটা বিরাট জাতি সংশ্লিষ্ট থাকে। এটা আমি আগেও আমার বিভিন্ন বক্তব্যে বলেছি। আমি এটা বিলিনি যে তিরিশের কবিদের মধ্যে কোনো দেশপ্রেম নেই। কিন্তু তিরিশের কবিরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তাতে দেশ খুব একটা পাত্তা পায়নি তাদের কবিতায়। অনেকে বলেন যে, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় দেশের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু ভালো করে যদি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে যে ইংরেজি কবিতার দ্বারাই জীবনানন্দ উদ্বুদ্ধ ছিলেন। আমি আমার কথা বলতে পারি যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সোজাসুজি আমাদের গ্রাম জনপদে ফিরে এসেছি। এবং পরীক্ষা করেছি যারা আমার আগে গ্রাম জনপদ, আমাদের দেশকে, আমাদের নদী নালা, আমাদের ফোক, এগুলোকে যারা কাব্যে ব্যবহার করেছেন তাদের কবিতা কেমন। এটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি জসীমউদ্‌দীনের কবিতা, যতিন্দ্রমোহন বাগচি, রবীন্দ্রনাথও পড়েছি। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় দেশের যে চিত্রগুলো এসেছে গাঁথা কাব্য থেকে। বেদে বেদেনীর জীবন থেকে প্রেম কাহিনি আহরণের চেষ্টা তিনি করেছেন। কিন্তু তার কবিতায়ও দেখেছি, কবিতার যিনি নায়ক হয়ে উঠেছেন তাকে মনে হয় যেন শ্রী কৃষ্ণ এবং নায়িকাকে রাধা মনে হয়েছে আমার। জসীমউদ্‌দীন যে একেবারেই মুসলমানদের জীবন ধারা থেকে কবিতার বিষয় আনেননি তা না। তার ঐ 'রাত থম থম স্তব্ধ নিঝুম ঘন ঘোর আধিয়ার' 'নিঃশ্বাস ফেলি তাও শোনা যায় নাইকো সাড়া কার'। এই যে পরিবেশ বর্ণনা করেছেন, একটি মুসলিম চাষী পরিবারের জীবন কাহিনি থেকেই নিয়েছেন। তিনিই সম্ভবত প্রথম বাঙালি কবি যিনি বাঙালি নিম্নবিত্ত চাষী পরিবারের জীবনের কাহিনি কবিতায় নিয়ে এসেছেন এবং কাহিনি কবিতা হিসাবেই নিয়ে এসেছেন। ঠিক জসীমউদ্‌দীনের কবিতাকে সে অর্থে আমি আধুনিক কবিতা বলতে চাই না। আধুনিক আঙ্গিকে গ্রামকে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়তোবা আমিই সর্বপ্রথম করেছি। হয়তোবা কেন, আমিই করেছি। একটি আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে গ্রামকে, বাঙালি মুসলমান চাষীদেরকে, তাদের লেনদেন তাদের যে আত্মীয়তার সূত্র– দেশের প্রতি সংস্কৃতির প্রতি তাদের যে বন্ধন, তাদের যে দুঃখ বেদনা, সেটা আমি আমার কবিতায় আনার প্রথম চেষ্টা করেছি। আমি অবশ্য বলছি না যে আমিই সার্থকভাবে এনেছি। তবে আমি আনার চেষ্টা করেছি। সেটা আমার কবিতায় আছে বলে আমি দাবি করি। আমি যখন এসব কবিতা লিখতে শুরু করি, তখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে দাঙ্গা হাঙ্গামা উদ্বাস্তুর স্রোত ইত্যাদি তখন দেখেছি। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন আমার কবিতায় এরই কিছু কিছু বর্ণনা আছে। অন্তত আমি যেভাবে দেশকে উপলব্ধি করেছি অর্থাৎ আমার একটা দেশ ছিল সেই দেশের বিষয় নিয়ে আমি কাজ করেছি, সেই দেশের যে একটা বিপুল জনগোষ্ঠী নির্বাক জনগোষ্ঠী তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেম কাম যা কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে তাকে আমি চেষ্টা করেছি আমার কবিতায় ব্যবহার করতে।

এভাবে একদিন 'সোনালি কাবিন' পর্যন্ত আমি এসেছি। সেখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 'সোনালি কাবিন' আধুনিক কাব্য ধারায় একটি স্বতন্ত্র বই। তিরিশের কাব্যধারার পরবর্তী কবিদের হাত দিয়ে এসেছে। মৌলিকতার কথা আমি বলি না কারণ, কবিদের মৌলিকতা নির্ধারিত হয় পাঠকের ভালোবাসার মধ্যে। পাঠকের ভালোবাসা ভাসা ভাসা কোনো কবিতায় থাকে না, গভীরতর শেকড় আছে যে কবিতায়, পাঠকের ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত সেখানে এসে দাঁড়ায়। সমকালীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তর্কযুদ্ধ, কবির পারস্পরিক যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে লাগে না। যে কবিতা মাটির শিকড়ের সাথে টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই কবিতার কাছে কবিরা এসে দাঁড়ায়, পাঠকরা এসে দাঁড়ায়, মানুষের সমস্ত ভালোবাসা সেখানে এসে দাঁড়ায়, কবিকে জিতিয়ে দেয়। আমারও মনে হয় যে সোনালি কাবিন পর্যন্ত আমার যে কাজ সেটা ঐ সমস্ত লড়াই, কবিদের ঝগড়া-ঝাটি, অধ্যাপকদের কাব্যবিচার সব ছাড়িয়ে সোনালি কাবিনে এসে আমাকে জিতিয়ে দিয়েছে। এটাই আমি মনে করি। এরপরে আমি আমাদের দেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও কবিতা লিখেছি। আমার একটা বই আছে 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো', এখানে এসে আমার আগের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হওয়ার চেষ্টা করেছে। মায়াবী পর্দায় এসে আমি গভীরভাবে ইসলামের প্রতি আমার বিশ্বাস ব্যক্ত করেছি। আমি যখন এই বইটা লিখি, তখনো অচিন্তনীয় ছিল যে সোভিয়েত রাশিয়া তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে যাবে। আমি মনে করি যে, আগামী পৃথিবী যেদিকে যাচ্ছে তাতে মুসলমানদের আলাদা একটা পৃথিবী তৈরি হতে যাচ্ছে। একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা। আগেও যেমন ছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র সভ্যতা কিন্তু এখন একটা আন্ত র্জাতিক রূপ নিয়ে।

মুসলমানরা পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা একটা জীবন বিধান নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে। যতই মৌলবাদী বলে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়াটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করা হউক, এটা সম্ভবপর হবে না। খ্রীষ্টীয় জগত বা ইহুদিদের জগত কিংবা আধুনিক নাস্তি কতায় অনুপ্রাণিত যে জগত তার থেকে স্বতন্ত্র একটি জগত রচনা করবে ইসলাম। পৃথিবীর একশ' বিশ কোটি মানুষ যদি মনে করে যে তারা একটি জাতি, তারা এটা হতে যাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। স্বতন্ত্র থাকবে ইসলাম। তবে তারাই বিশ্ব জয় করে নেবে এটা আমি বলতে চাই না, কিন্তু মুসলমান মুসলমানদের মতো থাকার জন্য পৃথিবীটাকে আলাদা করে ফেলেছে। যেমন ধরুন মুসলমান মেয়েদের কথা বলছি। মুসলমান মেয়েরা কেমন? পাশ্চাত্য চিন্তাধারা নারীর স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করছে। কিন্তু একটা কথা কেন ভাবে না মুসলমানরা যে একশ' বিশ কোটি রয়েছে তাদের মেয়েরা একটু অন্যরকম, তারা তাদের জীবন ধারণ প্রণালী তাদের স্বাধীনতা, তাদের চলাফেরার ভঙ্গি, তাদের নিজকে আচ্ছাদিত করার পদ্ধতি এগুলো এসেছে বিশ্বাস থেকে। স্বতন্ত্র সভ্যতার একটি বিষয়রূপে। কেউ কাউকে জোর জবরদস্তির কিছু নেই এখানে, একটি গ্রন্থের দ্বারা তারা পরিচালিত হয়, পবিত্র কোরআনের দ্বারা। রাসুল (সাঃ) এর হাদীস, নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির মাধ্যমে এরা জীবন প্রণালী গঠন করে। পৃথিবীর একশ' কোটি মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে কোরআন বা রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশের প্রভাব রয়ে গেছে। প্রত্যেকদিন বা প্রতি মুহূর্তে তারা তা মেনে চলে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। এই যে স্বতন্ত্র জগত তারা রচনা করবে এটা অনেকেই বলছেন। পাশ্চাত্যের এক পণ্ডিতের গবেষণায় পড়েছি যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিউনিজমের পরে ইসলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছে বা সাংঘর্ষিক। আমি এটা মনে করি না, পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সংঘর্ষে ইসলাম কোনো রকমেই যেতে চায় না, কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সে তো প্রথম থেকেই মানেনি। এ জীবন ধারাকেই মুসলিমরা স্বীকার করেনি কখনো। সংঘর্ষ বেঁধেছে যদি বেঁধে থাকে সেটা অনেক আগেই। এটার আর প্রকাশ্য রূপের কোনো প্রয়োজন নেই। আর পৃথিবীটা আজ সেদিকেও না। আমার মনে হয় যে মৌলবাদী বলে মুসলমানদের ঠেকানোর চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ না। মুসলমানরা একটা স্বতন্ত্র পৃথিবী রচনা করতে যাচ্ছে। একজন মুসলমান তিনি যদি ইউরোপেও থাকেন তবুও তিনি স্বতন্ত্র পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত থাকবেন মানসিকভাবে। এই যে আলাদা একটা পৃথিবী তৈরি করতে যাচ্ছে মুসলমানরা এর জন্য তো সাংস্কৃতিক Background তৈরি হতে যাচ্ছে, তাদের কবিতা তাদের Modernity এগুলো আমি মনে করি যে সেই স্বতন্ত্র পৃথিবীর প্রস্তুতি পর্বের কবিরা মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। আমি হয়তো তাদের দলভুক্ত হবো। যারা বিচার করবেন তারা হয়তো সেভাবে অন্তর্ভুক্ত করবেন। এটিই আমার আদর্শ এটিই আমার বিশ্বাস যে, আলাদা পৃথিবী গড়ে নেবে মুসলমানরা, এটাকে বলা হবে ইসলামিক ওয়ার্ল্ড। সারা পৃথিবীতে মানসিকভাবে এটা তৈরি হবে, অর্থনৈতিকভাবে এটা তৈরি হবে, সামাজিকভাবেও এটা তৈরি হতে যাচ্ছে। যতই চেষ্টা করুক না কোন, পাশ্চাত্যের সমস্ত শক্তি দিয়েও ইরানী বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। ইরানে কিছু স্বতন্ত্র জীবন ধারার সাধ তারা পেয়েছে। আমি তেহরান গিয়েছি, ইরানের বড় বড় শহরগুলো ঘুরে দেখেছি। মানুষ সন্তুষ্ট। মানুষের মধ্যে একটা সন্তুষ্টি, একটা প্রসন্নতার ছাপ পড়েছে। এটা যখন মুসলমানরা জানতে পারবে সারা পৃথিবীতে তখন তারা এই সন্তুষ্টি এবং স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইবে এবং আলাদা একটা দুনিয়া তৈরি করবে তারা। একটি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, এটা আমার বিশ্বাস।

কবিতার সমালোচনা নিয়ে বলতে চাই যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে সারাজীবনই কবিতার একাডেমিক সমালোচনার ঘোর বিরোধী। আমি দেখেছি সব সময় অবিচার করা হয় কবির প্রতি কিংবা দলের বা মতের পূর্বের ধারণার দ্বারা সেই সব কাব্যের আলোচনা করা হয়। ধরা যাক, এখন আমার একটি কবিতার আলোচনা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক করেন তখন তিনি করবেন পূর্ব ধারণা থেকে। তিনি যে আদর্শ বিশ্বাস করেন সেই আদর্শ প্রতিফলিত করবার জন্যই আমার কবিতার বিচার করবেন। আমি তো এই বিচার মানতে পারি না। কারণ তিনি যা বলবেন আমি হয়তো সেই ধারণা থেকে কবিতাটি রচনা করিনি। সব সময় আমি মনে করি কবিতাকে একাডেমির বাইরে নিয়ে আসার একটা চেষ্টা কবিদের থাকা উচিত। একাডেমিক বিচারই শেষ বিচার এটা যেন কবিরা মনে না করেন। কবিতার বিচার করবেন কবিরা। আমি হঠাৎ করে উৎফুল্ল হয়ে হাজার বছরের একটি পুরনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা সহসা পড়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে যাই। কোন জিনিস এই কবিতাটিতে আমার কাছে মূল্যায়িত করে দিতে পারবে। যখন কেউ আমাদের প্রাচীন কবিতা পড়েন তখন কিভাবে পড়েন কিংবা একজন তরুণ কবি। একটা কবিতা আজকের পত্রিকায় ছাপা হলো, পড়ে ভালো লেগে গেল কারো। এই ভালো লাগাটাই হলো বড় কথা। কবিতার সমর্থক থাকবে, কবিতায় সৌন্দর্যের বর্ণনা থাকবে, কিন্তু কবিতার সমালোচনা করা আমি পছন্দ করি না। এটা খুবই একাডেমিক ব্যাপার, ছাত্রদের সুবিধা হয় হয়তো, কিন্তু কবিতা যারা ভালোবাসে তাদের জন্য কোনো সুবিধা হয় না।

আমি একটু আগে তিরিশের দশকের কবিদের সম্পর্কে বলেছি। তিরিশের দশকের অব্যবহিত পরের কবিরা অধিকাংশ মার্ক্সিস্ট ছিলেন। কিন্তু তিরিশ দশকের কবিদের মধ্যে মার্ক্সবাদী একমাত্র বিষ্ণু দে দাবি করতেন নিজেকে। কিন্তু মার্ক্সিস্টরা তাকে মার্ক্সবাদী বলে স্বীকার করতেন না। মোটামুটি তিরিশ দশকের কবিরা ছিলেন অমার্ক্সবাদী কবি। এটা ইংরেজি সাহিত্যের গুণেই তাদের মধ্যে বর্তে ছিল। তাদের অব্যবহিত পরের তিনজন কবি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। এরা হলেন চল্লিশ দশকের সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ আর ফররুখ আহমদ। এই তিনজন কবির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কবিসত্তা আমরা দেখতে পাই। মঙ্গলাচরণ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বঘোষিত মার্ক্সবাদী ছিলেন। তাদের সম্পর্কে আমি বলতে চাই না। যিনি প্রকৃত স্বতন্ত্র কবিতার জন্য আলাদা জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেটাকে আমি একটু আগেই বলেছি আলাদা ইসলামী জগত তৈরি, এ রকম একটি ধারণা আমাদের কবিদের মধ্যে প্রথমে যার মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে তিনি ফররুখ আহমদ। তার 'সাত সাগরের মাঝি' এক অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। এ রকম মৌলিক কাব্যগ্রন্থ বাংলা ভাষায় আর নেই। এ ধরনের কবিতাও বাংলা ভাষায় আর নেই। আমার মনে হয় যে, যদি রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় পর্যন্ত থাকতেন, ফররুখ-এর কবিতাগুলো পাঠ করতেন তাহলে তিনি মুসলমানরা কি ধরনের কবিতা লিখবে, কি ধরনের সাহিত্য রচনা করতে যাচ্ছে সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন যে, মুসলমানদের মধ্য থেকেই মুসলমানদের কবিরা আসবে। এটা রবীন্দ্রনাথ ঠিক বলেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে থেকেই মুসলমান কবিরা জন্ম নেবে। নজরুলের কবিতায় ইসলামের বিষয় অনেক আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র ইসলামী জগত যেটাকে আমরা বলি, ইসলামী জগতের জন্য ইসলামী জীবন ধারার জন্যে স্বতন্ত্র সভ্যতার জন্য যে স্বপ্ন, এটা ফররুখের কবিতাতেই আমরা দেখতে পাই। ঐ স্বপ্ন ফররুখের কবিতায় এসে হাজির হয়েছে। এই জগত যে তৈরি হবে তার সম্পর্কে ফররুখের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল কিনা তা তার কবিতা দেখে বুঝতে পারি না। যদিও তার সাথে পরিচয় আমার ছিল তবে এই ব্যাপারে মত বিনিময় করার মতো বয়েস তখন আমার নয়। আমি ছিলাম বয়েসে ছোটো কোনো দার্শনিক বিষয়ে আলোচনা শুরু করার বয়েস তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হয়নি। বিনিময় আমাদের হয়নি ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু ফররুখ ভাইয়ের স্বাতন্ত্র্যটা উপলব্দি করতে পেরেছিলাম আমি। সবাই তাকে একজন স্বতন্ত্র কবি হিসেবে গণ্য করত। এখন তার কবিতা পাঠ করে দেখি যে এই স্বাতন্ত্র্যটা কোথায় যেন লুকিয়ে আছে। সেই স্বাতন্ত্র্যটা লুকিয়ে আছে আমি আগেই বলেছি যে পৃথিবী ভাগ হয়ে যাচ্ছে দু'ভাগে, একটি হলো ইসলামী জগত, আরেকটি হলো অন্য মানুষ ধর্ম সভ্যতা সব মিলিয়ে পাশ্চাত্য জগত তৈরি হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইসলামী সভ্যতা। ফররুখ আহমদ আমাদের কবিতায় জেনেই হউক বা না জেনেই হউক চেতনভাবেই হউক বা অবচেতন ভাবেই হউক সে রকম একটা জগতের কল্পনা করেছেন। এখন আমার বক্তব্য হলো যে, আমাদের দেশে যারা কবিতা লিখছেন, তরুণরা, তাদের বিষয়টা কি? আমি খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছি যে, তাদের কবিতার বিষয় খুবই সংকীর্ণ কোনো পাত্রের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা পাত্রের আধুনিক আধেয়ের বিরোধিতা করতে গিয়ে আধুনিক কবিতাই রচনা করছেন। আর খুবই পরিচিত শব্দ যা বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। আমার মনে হয় তারা যদি এটা থেকে বেরিয়ে যেতে চান তাহলে তাদের স্ব-ধর্ম স্ব-সংস্কৃতির অনেক অনাবিষ্কৃত বিষয়ে ফিরে আসতে হবে। অনেক অনাবিস্কৃত বিষয় আছে যার উপর মহাকাব্য রচনা করা যায়। বিষয়ের কোনো অভাব নাই। তাছাড়া আমাদের একটা প্রাচীন সাহিত্য রয়েছে, যেটা আধ্যাত্মিক সাহিত্য।

মাওলানা রুমী, হাফিজ, জামি ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে সাহিত্যে। কেউ যদি ঐতিহ্যের শিকড় খুঁজতে যায় তাহলে এসব কবিতা থেকে তারা অনেক কিছুই সংগ্রহ করতে পারে। তাছাড়া আমাদের যে বীরত্বগাথা রয়েছে সেটা থেকে অসাধারণ কাব্য স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আসতে পারে। এটা আমি মনে করি। এখন নিজে কতটা পারব জানি না আমি শেষ দিকে এসে চেষ্টা করেছি এমন কিছু ছোট ছোট কবিতা লিখতে। এটা ঠিক আদর্শগত বাণীর মতো না, কিছু রহস্যময় কথা, যা মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করে যে আমি কে? তিন বা চার লাইনের কবিতা আছে সব জায়গায়। কিন্তু দেখা যায় না এ রকম প্রশ্ন দিয়ে ছোট ছোট কবিতা আমি সাজাতে চাই। এটাকে বলতে পারেন যে এটা মন্ত্রের মতো কবিতা। এ রকম কবিতা লিখতে হলে ভাষাকে নমনীয় প্রার্থনার ভাষায় নিয়ে আসতে হবে। লেখার চেষ্টা করছি।

আমি এখন ফররুখ ভাইয়ের কবিতা সম্পর্কে বলি। ফররুখ ভাইয়ের কবিতা প্রথমেই একটা প্রচণ্ড প্রবলতা এবং প্রবাহমানতার মধ্যে নিয়ে যায়। কোনো সংকীর্ণ স্থিতি বা কোনো সংকীর্ণ ভালোবাসা এর মধ্যে আসেনি, এক ধাক্কায় একটা অন্য জগতে নিয়ে যায়। তার সাত সাগরের মাঝির দৃষ্টিভঙ্গিটি মনে হবে এরাবিয়ান নাইট্স থেকে এসেছে। কিন্তু একটু পড়লেই মনে হবে যে না, কালচক্রকে বিচার করে তিনি হৃদয় খুলে দিয়েছেন, একজন স্বতন্ত্র আধুনিক কবির হৃদয়। এর মধ্যে তিনি যে জগত দেখতে পাচ্ছেন, তিনি এমন জগতটা দেখছেন কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সমুদ্রমথিত এক বিরাট আদর্শের মধ্যে একটা কিস্তি ভেসে যাচ্ছে, আশার কিস্তি। এ জগতটা তিনি দেখেছেন কেন? আমার মনে হয়, কবিরা সবসময় অগ্রিম চিন্তা করে। এই যে এখন সংঘাতটা সৃষ্টি হয়েছে আদর্শের, ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের, শুধু পাশ্চাত্যের সাথে নয়, শত ধর্ম এর আগে পৃথিবীতে এসেছে। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, ইহুদি ধর্ম। এর মধ্যে এক নিঃসঙ্গ সত্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইসলাম। সব জায়গায় যে সম্মিলিতভাবে বা পরিকল্পিতভাবে আন্দোলন হচ্ছে তা তো না, কিন্তু সবাই একটা প্রচণ্ড শক্তি মনে করে ইসলামকে। মৌলবাদী বলে গালি দিচ্ছে, মারছে, নির্যাতন করছে, উচ্ছেদ করছে, বসনিয়াতে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই যে ঘটনাগুলো ঘটবে ফররুখ আহমদ তা জানতেন না। কিন্তু ফররুখ আহমদ বলেছেন যে সমস্ত বৈরিতার মধ্যে তার কিস্তি, সিন্দাবাদের কিস্তি এগিয়ে যাচ্ছে। এটা হলো কবির কল্পনা। ইসলামী সভ্যতা মানে কোরআনের সভ্যতা। ইসলামী সভ্যতা আমরা এজন্য বলি যে, আমরা এই নামেই একে অবহিত করি। প্রকৃতপক্ষে একটি গ্রন্থ এই নির্দেশগুলো দিয়েছে জীবন ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য। এটা ফররুখ আহমদ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর কবিতায় এ কথাটা তিনি বলতে চেয়েছিলেন। এ কথাটা যদিও খুব স্পষ্টভাবে রূপায়িত হয়নি, আমি মনে করি না যে ফররুখ ভাই খুব স্পষ্টভাবে তা রূপায়িত করতে পেরেছেন। কিন্তু কথা বলার ঢং এতই স্বতন্ত্র যে আমাদের কবিতার ধারার সাথে মেলে না। আমরা তার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হই কিন্তু তার মতো লিখি না। তার মতো করে লিখতে চেষ্টা করি না। কিন্তু তার মতো চিন্তা করতে আমরা চেষ্টা করি, করতে পারি। ক্ষুদ্র বিষয় ছেড়ে বৃহৎ বিষয় নিয়ে লিখতে পারি। এটা ফররুখ আহমদের সবচেয়ে বড় বোধ। ফররুখ আহমদকে বাদ দিয়ে বাংলা কবিতা কোনোদিনই আলোচনা করা যাবে না, এই কারণেই যে ফররুখ আহমদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শক্তি আমাদের কাব্যে। অকল্পনীয়। যা আমরা ভাবিনি। আর একটা কথা হচ্ছে এই যে মুসলমানরা স্বতন্ত্রভাবে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছে, তার আধুনিক রূপ আমরা দেখতে পাই একমাত্র ফররুখ আহমদ এর মধ্যে। ফররুখ আহমদ এর মধ্যে দেখা যায় কবিতার আঙ্গিক কি হবে, আধুনিক কবিতার চাঞ্চল্যটা কি হবে, তার দৃষ্টান্ত কি ধরনের হবে, আঙ্গিক গঠন-রীতি কি ধরনের হবে, এ জিনিসগুলো ফররুখ আহমদ প্রথম আমাদের দেখিয়েছেন। এটা স্বীকার করতে হবে। এটার জন্য ফররুখ আহমদ তাঁর কালে কোনো শ্রদ্ধা পাননি। আমাদের কালে আমরা কয়েকজন, আমি কিংবা আবদুল মান্নান সৈয়দ বা আরো দু'একজন কবি, কিন্তু তার বন্ধুরাই তাকে সম্মান করেননি। তাকে বড় কবি বলেছেন কিন্তু তাকে ব্যাখ্যা করেননি। আমার মনে হয় যে ফররুখ আহমদের কবিতার একটা ব্যাখ্যারও অপেক্ষা আছে। সেটা আমাদের হাতেও হতে পারে, যেমন মান্নান সৈয়দ কিছু কাজ করেছেন ফররুখ ভাইয়ের উপর। কিংবা তার পরবর্তী সময়ে আরো তরুণতম কবিরা বিশ্বাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারার কবিরা এসে ফররুখ আহমদের ব্যাখ্যা করছেন। আরেকটা কথা হলো ফররুখ আহমদকে বড় কবি বলা হয়, মার্ক্সিস্টরাও বলেছে। আমি ফররুখ আহমদ এর বন্ধুদের মুখে শুনেছি যারা কলকাতায় আছেন, তারাও ফররুখ আহমদকে বড় কবি বলছেন, তাকে গ্রন্থভুক্ত করছেন। অতি সম্প্রতিও দেখতে পাচ্ছি তারা ফররুখ আহমদকে নিয়ে আলোচনা করতে চান, খোঁজ খবর নিচ্ছেন, অনেকে বলেছেন যে ফররুখকে পড়তে চাই তার বই পত্র পাই না ইত্যাদি। এটা একটা আশার কথা। ফররুখ আহমদের ভক্ত আমি তো একটু বাড়িয়ে বলবই। কিন্তু ফররুখ আহমদের ভক্ত নয় এমন একজন লোক ফররুখ আহমদ এর ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন একজন লোক যদি ফররুখ আহমদ এর ওপরে একটি আলোচনা করেন এবং সে আলোচনা যদি সত্য আবিষ্কারের জন্য হয় তাহলে সেটা অনেক কাছাকাছি যাবে। ফররুখ আহমদ এর আসল চেহারাটা কি, আসল রূপটা কি, পরিমাপটা, বিস্তারটা বের করে আনতে তিনি পারবেন। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ফররুখ আহমদ এর উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমার মনে হয়েছে ফররুখ ভাইয়ের উপর আলোচনার সূত্রপাত এখন আরো হতে পারে। ফররুখ ভাইয়ের মতো পরিধির কবিদের নিয়ে পৃথিবীতে যে ধরনের আলোচনা হয়েছে তা শুনে তাজ্জব বনে যেতে হয়। আর আমাদের ভাষার একজন সবচেয়ে মৌলিক স্বতন্ত্র ধারার কবির ওপর খুব বেশি আলোচনা হলো না। আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আদর্শ দ্বারা আক্রান্ত শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তা হয়নি। ফররুখ আহমদকে ব্যাপক আকারে উপলব্ধি না করে বা খুবই গভীরে না গিয়ে তার কবিতা সম্বন্ধে ভাসা ভাসা কিছু বলা।

এখন যদি আমি আমার সময় সম্বন্ধে বলি সেটা একটা মহত্তর সময়। আমার জন্ম হয়েছে ১৯৩৬-এ, আমার কৈশোর কালটা কেটেছে বৃটিশ আমলে, একটা অংশ বৃটিশ আমলে কেটেছে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান আন্দোলন, দেশ ভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ থেকে বাংলাদেশের উদ্ভব পর্যন্ত যে সময়টা আমি কাটিয়েছি সেটা একটা দুর্বহ জীবন। আমাদের ওপর দিয়ে গেছে বিশেষ করে পঞ্চাশ দশকের যারা কবি তাদের ওপর দিয়ে একটা দুর্বহ সময় বয়ে গেছে। তারা দেখেছে দাঙ্গা, ভ্রাতৃহত্যা, দেশভাগ, একটা স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই যে কতগুলো ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা এসেছে, এতে তাদের মধ্যে একটা জিনিস তৈরি হয়েছে, সেটা কি? পঞ্চাশ দশকের কবিতার মধ্যে যাকে বলে স্বপ্ন, স্বপ্ন কম। রূঢ় বাস্তবতার কবিতা। পঞ্চাশের কবিরা, আসলে এক রূঢ় বাস্তবতা পার হয়ে আমরা এসেছি। আল মাহমুদও বাস্তবতারই এক কাহিনি। এই হলো আমাদের সময়। আমাদের সময়ের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলার কোনো সুযোগ নেই। যেটুকু কাজ আমরা করেছি এক অসহনীয় সময় আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এটা ছিল আমার সময়। আমাদের একটা আশা ছিল। আমাদের কবিতায় একটা আশা আমরা ব্যক্ত করেছিলাম। একটা সুখী সমৃদ্ধশালী জীবন, দেশ আমরা কল্পনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতাম। খুবই কল্পনা সেটা, কিন্তু করতাম। সে জায়গায় এখনো পৌঁছাতে পারিনি, আমাদের কবিতাকে নিয়ে যেতে পারিনি। আমাদের পূর্ববর্তী ফররুখ আহমদের কবিতার মধ্যে ছিল dream, পুরোটাই dream পুরোটাই স্বপ্নচারিতা। দূরে একটা হেরার রাজতোরণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এখন এই বয়েসে ষাট পার হয়ে যাওয়ার পর আমি চিন্তা করছি সে কথা। আগে বলেছি যে একটা ইসলামী জগত আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের একটা জগত আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ইসলামী জগত পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে এটাই হলো এখনকার trend. যদি কোনো তরুণ মুসলিম কবি লিখতে চান তাহলে এদিকেই তাকে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। এটার যে আধুনিক পশ্চাৎপট পাশ্চাত্য সৃষ্টি করে দিয়েছে সেটা তো আর থাকবে না। আবার যাকে Post modernism বলে সেটার যে গূঢ়ার্থ এখন ব্যক্ত হচ্ছে। সেখানেও এই ভবিষ্যত থামবে না। আমরা মনে করি Post modernism যা আধুনিকতার বহমানতার বাইরে চলে এসে আরেক ধরনের জীবন ব্যবস্থার কথা বলা, আরেক ধরনের ধর্মের কথা বলা, প্রত্যক্ষভাবে একটি ধর্মের কথা বলা যে ধর্মে পরকালীন ইংগিতসমূহ রয়েছে। পরকালীন শাস্তি বা সফলতা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের একটা ধারণা এগিয়ে আসছে। এখানে গিয়ে পৌঁছাতে গেলে আমি মনে করি এখনকার কবিদের ব্যাপকভাবে ইসলামের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। কারণ তারা মুসলমানদের ঘরে জন্মেছে এবং মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত জীবন। পাশ্চাত্য জীবনধারা তারা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারবে না। এই যে Post modernism-এর কথা বলা হচ্ছে এটা হলো আধুনিকতার বিরুদ্ধে আধুনিক দর্শনের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে, মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, একটা প্রতিশোধার্থক আওয়াজ। আমরা প্রতিশোধমূলক হয়ে থাকতে চাই না। আমরা আমাদের একটা জগতের, একটা দর্শনের, একটা বিশ্বাসের ভিত্তিমূল খুঁজে পেয়েছি। সেখানে আমরা পৌঁছাতে চাই। এটাও Post modernism এবং এটাও আবার নতুন করে চিন্তা করলে একটা নতুন সভ্যতার নতুন দর্শনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমি মনে করি সেদিকে আমাদের কবিতা অগ্রসর হচ্ছে এবং আমাদের যে সময় অতিবাহিত হয়েছে সে সময়ের একটা বিকশিত সত্য তরুণদের মধ্যে এসে হয়তো ঠাঁই করে নেবে। যেমন খুব দ্রুত বদলে গেছে এখানকার পটভূমিও। কিছুদিন আগেও জগতের অধিকাংশ তরুণ কবি ছিল মার্ক্সবাদী। মার্ক্সবাদী না হলে যেন একজন মানুষ কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পী হতে পারে না এরকম একটা ধারণা ছিল। এখন এই ধারণা নেই কেন? এই ধারণা এখন বদলে গেছে। তাহলে এরকম হঠাৎ একদিন বদলে যাবে, আমি মনে করি যে এখনকার কবিরা তখন নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি, নিজের ধর্মের প্রতি, নিজের ঐতিহ্য, পুরান, গাথা ইত্যাদির প্রতি সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস ফিরে পাবে। তরুণ কবিদের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদা কোরআনকে তারা আঁকড়ে ধরবে বাঁচার জন্য এবং কোরআনকেই তারা প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে।

পৃথিবীর সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি চর্চা একটি সৌন্দর্য শাসনের মধ্যে চলে। কয়েকটা ভাগে এই সৌন্দর্য শাসন হয় যেমন ল্যাটিন সৌন্দর্য চর্চা, পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য চর্চা, যেটা ইউরোপীয় সমস্ত কালচারের গোড়ার সৌন্দর্য তত্ত্ব সেটা ঐ গ্রিক সৌন্দর্য ধারণা থেকে এসেছে, ল্যাটিন সৌন্দর্য ধারণা থেকে বিস্তার লাভ করেছে। তেমনি সেমেটিকদের একটা সৌন্দর্য তত্ত্ব আছে আরবদের, ইহুদিদের। আরব মুসলমান বা আরব ইহুদিরা একটি সৌন্দর্য ধারণার মধ্যে বসবাস করে, তাদের একটা সৌন্দর্য ধারণা আছে। যা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে এসেছে যার আলোকে তারা কোনো জিনিসকে সুন্দর বলে কিংবা অপাপবিদ্ধ বলে। আবার এই যে ভারতীয় সৌন্দর্য ধারণা, আমরা যেটাকে বলি হিন্দু সৌন্দর্য তত্ত্ব, আমরা এর মধ্যে বাস করি, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে বাস করি। আবার যেহেতু আমরা মুসলমান, আমাদের নিজস্ব ধর্মগত সৌন্দর্য ধারণা আমাদের আছে, এটাকেও আমরা কাজে লাগাই। আবার রক্তগতভাবে আমরা আদি বাঙালিদের উত্তরাধিকারী হওয়ায় তাদেরও একটি সৌন্দর্য তত্ত্ব ছিল হিন্দু সৌন্দর্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে। যেমন মাছ, প্রকৃতি, নৌকা, নদী এগুলোর মধ্যে তারা একটা সৌন্দর্যের ধারণা দেখতে পেত যা হিন্দুরা পেত না যেমন হাজার বছরের কবিতায় বাংলা বা সংস্কৃত বা হিন্দি কবিতায় দেখা যাবে চাঁদের সাথে নারী মুখের উপমা দেয়া হয়েছে। আমার প্রেয়সীর মুখটা কেমন? কবিরা বলছেন, চাঁদের মতো। একজন আরব কবি যখন বলত, আমার প্রেয়সীর মুখটা কেমন? তিনি বলেন, মরুভূমিতে লুকায়িত উট পাখির ডিমের মতো। কত পার্থক্য! আবার আদি বাঙালিরা নদীর পাড়ে বসবাস করত; নদী ভেঙে যাচ্ছে, চর পড়ছে, তারা বলত, আমার প্রেয়সী চরের মতো। জসিমউদ্‌দীন লিখেছেন, চাষার ছেলে কল্পনা করছে তার ঘরে বৌ আসবে, বউটা দেখতে কেমন হবে 'যে আসিবে কাল মুখখানি তার নতুন চরের মতো'। এই যে হাজার বছরের হিন্দুদের উপমার শৃংখলা, সেটা একটা বাঙালি অনুভূতিতে ভেঙে গেল।

তারপরে সুকান্তরা লিখতে সাহসী হলো—'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' গ্রিকরা নারীর সৌন্দর্যের কল্পনা করেছে এরকম যে, সমুদ্রের পাড়ের যে উপকূল ভূমি, উপকূলের ঝাউ গাছগুলো দুলছে, ঝাউ গাছের পাতাকে নারীর কেশ হিসাবে তুলনা করছে কিংবা কোনো পর্বতের সাথে তুলনা দিয়েছে স্তনের। এই যে সৌন্দর্য শাসন, সৌন্দর্য তত্ত্ব, এখানে একটার সাথে অন্যটার বিরোধ রয়েছে। আমরা হিন্দু সৌন্দর্য তত্ত্ব অনুসরণ করি। ধর্ম পরিবর্তন করলেও সৌন্দর্যের ঐ ধারণাগুলো আমরা বদলায়নি। এতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই বরং অনেক উপকার হয়েছে। কারণ আমরা আরো দুটো সৌন্দর্য ধারণ করে আছি। সবগুলো মিশ্রিত করে আমাদের সৌন্দর্য ধারণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলতে চাই যে এসব বিষয় জানা না থাকলে কবিতা সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হবে না। এজন্য ইসথেটিক সেন্স বা সৌন্দর্য জ্ঞানবোধ সাহিত্যিকদের একটা বড় বিষয়। এটা কিন্তু বই পড়ে অর্জন করা যায় না, এটা কবির মধ্যে জন্ম থেকেই থাকে। যেমন জসিমউদ্‌দীন কি করে লিখলেন, 'যে আসিবে কাল মুখখানি তার নতুন চরের মতো' মনে হয় যেন চর থেকে চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এটা তার মধ্যে ছিল কারণ তিনি এর মধ্যে বসবাস করতেন। এটা মনে রাখতে হবে এবং এটা আমি সব সময় মনে রেখেছি আমার কাজে। কবিতার উপমা কিভাবে দিতে হবে এটার একটা ধারণা আমার মধ্যে ছিল। যার জন্য যখন কোনো উপমা দিয়েছি এসব ধারণাগুলো এসেছে, যেমন কোরআনের একটা আয়াতে আছে তুর পর্বতের দোহাই, সিনাই পর্বতের দোহাই, তেমনি আমরা যখন দোহাই দিই যেমন আমার কবিতায় আছে 'তিল বর্ণ ধানের দোহান' এটা আমি খুব জোর করে এনেছি তা নয় কিন্তু, স্বভাবতই এসেছে। লিখতে শুরু করেছি, মনে করলাম এরকম লিখি, অমনি লেখা হয়ে গেল। এটা এসে একটা সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে আমরা সেমেটিক ধারণাগুলোর উত্তরাধিকারীও বটে।

বাংলাদেশের কবি-লেখকদের আত্মবিরোধ

এটা ঠিক যে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংকট একটা দেশ ও জাতির সবকিছুর ওপরই অস্বস্তির ছায়া ফেলে। ব্যক্তি মানুষের চেহারার মধ্যে প্রতিফলিত হয় অস্থিরতা ও অস্বস্তির ছায়া। তরুণেরা উদ্যম হারিয়ে ফেলে। সংস্কৃতির সর্বপ্রকার প্রকাশ, বিকাশ, বিচার ও প্রচারণায় ছড়িয়ে পড়ে পক্ষপাত। যেখানে বারো কোটি মানুষের একটি একভাষী দেশে আপনা থেকেই গড়ে উঠার কথা সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে আবেগময় দেশপ্রেম। সেখানে সকল প্রতিভাবান লেখক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্মপ্রেম ও ব্যক্তিস্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়াস। প্রতিভাবানদের মধ্যে আত্মিক বন্ধন যখন ছিন্ন হয়ে যায় তখন সকলকে স্বার্থপরতার ভাসমান দ্বীপ বলে মনে হয়। সামষ্টিক উদ্যোগে সাহিত্য-শিল্প নির্মিত হয় না এটা যেমন সত্য তেমনি সাহিত্যিক শিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক মুখ দেখাদেখি যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন কেবল স্বার্থপর ব্যক্তি উদ্যোগও জনগণের কাছে তেমন মূল্য পায় না। বাংলাদেশে প্রতিবছর বইমেলা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে কম বই প্রকাশিত হয় না। কিন্তু লেখক কবিদের আত্মবিরোধ ও স্বার্থপরতার জন্য এর সঠিক সাহিত্যমূল্য নির্ধারিত হয় না। কে কি লিখছে, লেখকেরা কেউ পরস্পরের রচনা পড়েও দেখে না। নাম শুনেই একে অন্যকে বাতিল করে দেয়। এ অবস্থায় সৃজনশীল সাহিত্যের বিকাশ সম্ভবপর হয় না। শত গ্রন্থমেলা করেও এই অভ্যন্তরীণ বিরোধের বেড়া ডিঙিয়ে কারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি উপন্যাস বা কাব্য সৃজনশীল মৌলিক রচনার কদর পায় না। আমাদের সাহিত্যে এই বিরোধ জিইয়ে রাখার জন্য মাত্র কয়েকজন কম প্রতিভাবান সাধারণ পর্যায়ের লেখকই দায়ী। তারাই গোষ্ঠীবাদকে উস্কে রাখে। বাংলা একাডেমির বইমেলায় যে কোনো একটা ছুতো তুলে বইয়ের স্টল ভাঙে এবং প্রকৃত কবি-সাহিত্যিকদের সেখানে অপমানের চেষ্টা করে। এরা এখনও বস্তাপচা প্রগতিবাদের ধুয়ো ধরে রেখেছে। অথচ এদের সকল প্রকার উদ্যোগ-আয়োজনই প্রতিক্রিয়াশীল। এরা এদেশে ইসলামের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক উত্থান সম্ভাবনায় অতিশয় ভীতত্রস্ত। এরা গণতান্ত্রিক ইসলামী আন্দোলনকে 'মৌলবাদ' নামে আখ্যায়িত করতে চায়। আর এদেশের মুসলিম জনতার স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের যে কোনো উদ্যমকেই আঘাত করার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করে থাকে। সেই কৌশলটির নাম হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। যেন এদেশের মুসলমানরা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। করেছে হিন্দুরা আর ভারতীয় সেনাবাহিনি। কাজে অকাজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে বলে এরা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যাতে মানুষ আর এই বিষয়ে কোনো উত্তেজনা খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে আমাদের যেসব অত্যুৎসাহী বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশি বাগাড়ম্বর করে তাদের কেউই মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো সমর্থন তো দূরে থাক বরং শত্রুতা সাধনেই তৎপর ছিল।

এখন এরা সাহিত্যে, শিল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রবক্তা সেজেছে। এদের দৌরাত্ম্যে বিটিভির কোনো নাট্য কাহিনিই মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিষয়কে অঙ্গীভূত না করে প্রচারের সুযোগ পায় না। অথচ বাংলাদেশের টিভি দর্শকরা সমকালীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংগ্রামের সামাজিক কাহিনি, ঐতিহ্য ও মুসলিম পারিবারিক মূল্যবোধ বজায় রেখে আধুনিক সমাজগঠনের যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এরই প্রতিফলন নাটকে দেখতে আগ্রহী। যেমন ভারতের স্যাটেলাইট টিভিতে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বন্দ্বের কাহিনি কুরুক্ষেত্র নামক একটি নাট্যকাহিনিতে দেখতে পেলাম। বাংলাদেশ টিভি কোনো কিছু পারে না! আমাদের আশপাশের দেশগুলো, বিশেষ করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রত্যেকের একটা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে। পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, এমনকি মালদ্বীপেরও পরিচ্ছন্ন স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র আছে। বাংলাদেশের নাই কেন? কেন আমরা এখনও কলকাতার সাহিত্যিক আধিপত্যকে মেনে নিতে গর্দান বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, নাকি অতীতের হিন্দু জমিদারী দাসত্বের অভ্যেস আমাদের পিছু ছাড়তে চায় না?

এদেশের জনগণের ধর্মীয় স্বাতন্ত্রই তাদের সর্বপ্রকার আধিপত্যের জুলুম থেকে আলাদা থাকার প্রেরণা যোগাচ্ছে। যেভাবেই দেখা হোক ইসলাম হলো এদেশের সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি। এদেশে যেসব লেখক ইসলামী আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য নানা আক্রমণাত্মক কারসাজিতে মত্ত তাদের একটা কথা উপলব্ধি করতে বলি। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চালের নিচে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করার মতো ইসলাম ছাড়া সম্প্রতিকালে আর কোনো মানবিক আদর্শ আছে কি? যখন অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো নিজেদের জনগণের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা মোচনের জন্য খোলাখুলিভাবেই পুঁজিবাদের খোলা বাজারনীতি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া এ লক্ষণ এখন স্পষ্ট যে, যেসব দেশের সংখ্যাগুরু অংশই মুসলমান এবং ইসলামী সামাজিক ও পারিবারিক আবহাওয়ায় লালিত সেসব দেশে আগামী শতাব্দীতেই ইসলামী রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা গোড়াপত্তন হবে।

বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার কথা আমরা অস্বীকার করি না। সবগুলো প্রতিবন্ধকতাই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক। সামাজিক বাধা একেবারে নেই একথা হয়তো সত্য নয় তবে খুবই কম। সাধারণ মানুষ তাদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রেরই স্বপ্ন দেখে। যদিও তারা ভাবে এটা এক দূরতম স্বপ্ন। কিন্তু গত এক দশকের ইসলামী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় না সময়টা অতি দীর্ঘ হবে। ত্যাগ তিতিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে বাংলাদেশের আন্দোলন এর গণতান্ত্রিক পর্যায়গুলো অতিক্রম করছে তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। কেবল একটা দিকেই ইসলামী আন্দোলন জনগণের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথভাবে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। আর সেটা হলো সাংস্কৃতিক অঙ্গন এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের নব তরঙ্গ সৃষ্টি।

কয়েকদিন আগে আধুনিক তুর্কী কবিতার একটি ইংরেজি সংকলন আমার এক বিলেত প্রবাসী ভক্ত আমাকে উপহার দেবার জন্য বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আমি বইটি উল্টে পাল্টে দেখতে গিয়ে এর ভূমিকাটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। সম্পাদকের ভূমিকা থেকেই বোঝা যায় তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা। তবে দলমত নির্বিশেষে নবীণ প্রবীন সকল তুর্কী কবি প্রতিভার উপযুক্ত ও সমমর্যাদার প্রতিফলন যাতে বইটিতে ঘটে এ ব্যাপারে তিনি খুবই সজাগ এবং নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কম্যুনিস্ট কবি নাজিম হিকমতের গুণগানে তিনি পঞ্চমুখ হলেও ইলহান বার্কের মতো প্রেম ও প্রকৃতির কবিদের প্রতিও তিনি সমান উদার। প্রবন্ধের শেষে এসে তিনি যেন কেমন বিস্মিত। শেষাংশে তিনি তুরস্কের অতি আধুনিক তরুণ কবিদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকজন তরুণতম কবির পরিচয়, কাব্যগুণ, তাদের গোত্র ও আদর্শের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, এরা ইসলামপন্থী তথা ফান্ডামেন্টালিস্ট অর্থাৎ মৌলবাদী বলে অভিহিত হলেও সমকালীন তুর্কী ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় তরুণ কবি। মজার ব্যাপার হলো এদের বয়েস খুবই কম। ইসলামী আদর্শের আলোকে এরা আবার তুর্কী কবিতাকে নতুন মাত্রা দিতে চাইছে।

সম্পাদক মহোদয় এদের বর্তমান সাহিত্য-সংগ্রাম ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করলেও তাদের সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার কথা অস্বীকার করেননি। বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের এই মুহূর্তের প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে কার্পণ্য করেননি। বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে এ ধরনের একটি সংকলন বর্তমানে এক অসম্ভব ব্যাপার। কারণ আধুনিক তুর্কী কবিতার ঐ সংকলনটির সম্পাদকের মতো নিরপেক্ষ সাহিত্যদৃষ্টি সম্পন্ন কোনো নিরপেক্ষ বিদ্বান ব্যক্তিই বাংলাদেশে নেই। রাজনৈতিক শাখা ও দলীয় পক্ষপাতিত্বই বাংলাদেশের সাহিত্যকে পরমুখাপেক্ষী করে রেখেছে। করে রেখেছে আধিপত্যবাদীদের গোলাম। প্রগতিবাদের ধুয়া যতদিন সাহিত্য শিল্পে থাকবে ততদিন কলকাতার দাসত্বও থাকবে।

বইমেলাগুলো এই দাসত্ব মুক্তিরই এক ধরনের চেষ্টা মাত্র। এদেশের প্রকাশনা শিল্পের চাপেই সরকার এই বইমেলাগুলোর আয়োজন করছেন। অচিরেই এর একটা সুফল আমাদের পাঠক সমাজের ওপর পড়বে বলে আমাদের ধারণা। যদিও প্রকাশনা শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক বিকাশের জন্য কোনো বস্তুগত সুবিধাই এদের দিচ্ছে না। কাগজ, বোর্ড, কালি ও মুদ্রণ সামগ্রির আকাশ ছোঁয়া উচ্চমূল্যের ঘানি টেনেই আমাদের প্রকাশকগণ বই প্রকাশ করে চলেছেন। বর্তমান সরকার সেটি বোঝেন কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্য জাতিকে কোন ধরনের প্রেরণা ও শক্তি যোগায় সেটা বোঝেন বলে মনে হয় না। যদি সেটা বোঝার ক্ষমতা থাকত তাহলে তাদের রাজনৈতিক চরিত্রই হতো আলাদা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বই সম্বন্ধে অনেক উচ্চাঙ্গের বক্তব্য রেখেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি সৃজনশীল গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশনায় কি কি কাঠখড় পোড়াতে হয় তা কি তিনি জানেন? জানার কথাও নয়। তবে তাকে জানাবার মতো উপযুক্ত উপদেষ্টা থাকলেই তিনি জানতেন প্রকৃতপক্ষে একটা পরিশ্রমী জাতির মননশীল স্বপ্নের আকার। তারা কোথায় গিয়ে পৌঁছুতে চায় সৃজনশীল সাহিত্যেই সেই ঠিকানা স্বপ্নের অক্ষরে লেখা থাকে।

উন্নয়ন করে উন্মত্ত প্রায় এই সরকারকে আমরা বহুবার বলেছি সৃজনশীল সাহিত্যশিল্পে পৃষ্ঠপোষকতা করুন। প্রধানমন্ত্রীর বইয়ের ওপর ভাষণ শুনে মনে হয় তিনি তা চানও। কিন্তু জানেন না কিভাবে তা করতে হবে। কি করলে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো বই প্রকাশের প্রতিযোগিতায় নামবে। বই হবে পাঠকদের কাছে সবচেয়ে সস্তা কিন্তু মহার্ঘ বস্তু। প্রথমেই দরকার বই প্রকাশের কাগজের সহজলভ্য সস্তাদাম। তারপর সর্বপ্রকার প্রকাশনা সামগ্রির সস্তা যোগান। বই প্রকাশের কাগজের ওপর থেকে সর্বপ্রকার কর প্রত্যাহার এবং দেশে উৎপাদিত হোয়াইট প্রিন্টের সহজলভ্যতা ও দাম কমানো। মুদ্রণ ব্যয় আকাশচুম্বী রেখে কি করে ব্যাপকহারে নতুন বই প্রকাশ সম্ভব? প্রকাশকদের দাবির প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল হতে হবে, তাদের কথা ধৈর্যসহকারে শোনার মতো উপযুক্ত ধৈর্যশীল সরকারি কর্তৃপক্ষ দরকার। নইলে ভারত থেকে ছাপা হয়ে বই বাংলাদেশে এসে বাঁধাই হবে। বাজারে যাবে। কে ঠেকাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য-প্রয়াসের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দিক হলো এদেশের আধুনিক কবিতা। আধুনিক কবিতাই এ জাতির মননশীল চিন্তাভাবনার প্রধান ফসল। এ শস্য গোলায় তুলতে হলে যে মাড়াই বাছাই দরকার তা যদিও ঠিকমতো হয়নি তবুও উঠোনে এর স্তূপীকৃত চূড়া দেখে আমরা অভিভূত। শুধু আমরা নই, আমরা ছাড়াও অর্থাৎ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরেও যারা বাংলা ভাষাভাষী কিংবা বাংলাতেই সাহিত্য রচনা করে থাকেন, যেমন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং আসামের কাছাড় নামক নিম্নাঞ্চলের কবিরা, বাংলাদেশের কবিতার সৌরভ তারাও কমবেশি পেয়ে থাকেন। এই অর্থে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিস্তারের পরিধি বিরাট এবং বিপুল। তবে এর বিনিময় ব্যাপক নয়। কারণ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে কলকাতার সাহিত্য সম্ভারের একটা আধিপত্যবাদী বাজার ঢাকার বই বিক্রেতারা এদেশে শুরু করতে পারলেও বাংলাদেশের সাহিত্য সম্ভারের পাল্টা বিনিময় কলকাতার পুস্তক ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের ফলে আরম্ভ করা যায়নি। আসামের বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যও আমরা পাই না আর এ অবস্থায় বাংলাদেশে রচিত আধুনিক সাহিত্যের চাহিদা থাকলেও ঢাকার বইপত্র সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না।

সাতচল্লিশের দেশভাগের আগে থেকেই শুরু হয় বাঙালি মুসলমানের আধুনিকতাকে আলিঙ্গন। কলকাতায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানরা কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিরিশ দশকের গোড়ার দিকে কিংবা এরও কিছু আগে থেকেই বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এভাবেই শুরু হয় বাঙালি মুসলমান ও বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্য প্রয়াস। কাব্য ক্ষেত্রে এই প্রয়াসেরই ফসল কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, জসিমউদ্‌দীন, বেনজীর আহমদ, আহ্সান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, তালিম হোসেন ও আবুল হোসেনের মতো আধুনিক কবিরা। ঔপনিবেশিক শাসন শৃঙ্খল কম্পনকারী বাঙালি মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রভূমির রাজনৈতিক দাবির প্রতি একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া উপরোক্ত আর সকলেরই সমর্থন ছিল দ্বিধাহীন। চল্লিশের দশকে এই সব আধুনিক মুসলিম কবির প্রায় সকলেই ছিলেন বিভক্তির পক্ষে। পাকিস্তান ছিল তাদের কাছে স্বপ্নের আবাসভূমি। তাদের কারো কারো সমগ্র কাব্য দর্শনই গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানের স্বপ্নকে সামনে রেখে। সবচেয়ে প্রগতিশীল সমাধান হিসেবেই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য তারা স্বতন্ত্র স্বাধীন গণতান্ত্রিক একটি আবাসভূমির কথা চিন্তা করেছিলেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নির্মম শোষণ শাসন ও নিপীড়নের প্রত্যক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা নিয়েই এরা অবিভক্ত ভারতে জন্মেছিলেন। প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু জমিদার শ্রেণি এবং পুঁজিপতিদের ইংরেজ তোষণের ইতিহাস জানা থাকায় অখণ্ড অবস্থায় ভারত স্বাধীন হওয়ার পরিণাম সম্বন্ধে অতিশয় দুঃস্বপ্নময় ভবিষ্যৎ চিন্তার ভীতি ছিল। তবে ঐ সব আধুনিক কবিদের একজনও সম্ভবত ভাবতেন না যে পাকিস্তান মুসলমানদের জন্য একটা স্বর্গরাজ্য হবে কিংবা সেখানে ইসলামী শাসনই শেষ পর্যন্ত কায়েম হবে। কারণ রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্গাতা মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের শ্রেণি চরিত্রও তাদের অজানা ছিল না। তবে হিন্দু পৌত্তলিক জালেমের চেয়ে তারা মুসলিম নামধারী তৌহিদবাদী জালেমকে উত্তম ভেবেছিলেন। উত্তম ভাবার কারণ ছিল একটিই আর তা হলো মুসলিম নামধারী এই ধনিকশ্রেণিও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও তাদের সযত্ন প্রয়াসে সৃষ্ট হিন্দু জমিদার এবং পুঁজিপতিদের দ্বারা দারুণভাবে শোষিত, লাঞ্ছিত এবং সুযোগ সুবিধাহীনভাবে কোনঠাসা হয়ে সাধারণ মুসলিম জনতার সমর্থন ভিক্ষা করত।

বিভাগ পূর্বকালের বাঙালি মুসলিম আধুনিক কবিকুল জানতেন পাকিস্তান হবে এদেরই শোষণের অবাধ লীলাভূমি। তবে উপমহাদেশ একবার বিভক্ত হলে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এরা রুখতে পারবে না। শিক্ষা দীক্ষায় বহু পশ্চাতে পড়ে থাকা মুসলিম সম্প্রদায়, বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম কৃষককুল এবং ছোট ব্যবসায়ী শ্রেণির সন্তানদের সামনে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস এবং জীবনযাপনের জন্য কেবলই ভূমি নির্ভরতার পরিবর্তে অন্যতর উপায় উদ্ভাবিত হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে অন্তরনিহিত ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িক চেতনাই পাকিস্তান সৃষ্টিতে বাঙালি মুসলিম আধুনিক কবিকুলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাদের এই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল সমগ্র পাকিস্তান আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক চালিকা শক্তি এবং অত্যন্ত নির্ভুল চালিকা শক্তি। আজ পাকিস্তান ভেঙে গিয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব হলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির নির্ভুলতা ও নিরিখ এখনও ঘড়ির কাঁটার মতোই টিক টিক করে বাজছে। মনে রাখতে হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যেসব বাঙালি মুসলিম তরুণ আওয়ামী লীগের অপেক্ষা ও আপোসের নীতি উপেক্ষা করেই স্বাধীনতার পতাকা এবং সশস্ত্র লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল তাদের প্রায় সকলেই এসেছে ভূমি নির্ভর কিষাণ পরিবার এবং ছোটখাটো অনিশ্চিত সামান্য পুঁজির ব্যবসায়ী পরিবার থেকে। মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণি ও গোত্রগত কুষ্ঠিবিচার করলেই আমার কথার সারবত্তা সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। এমনকি, এই যুদ্ধে যারা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল তারাও এসেছে একই শ্রেণি অর্থাৎ নিম্নবিত্ত কিষাণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবার থেকে। প্রথমোক্তরা পাকিস্তানের ছদ্মাবরণে পাঞ্জাবী ঔপনিবেশিক শোষণের নির্বিচার হানাদারী প্রতিরোধে মরিয়া হয়ে অস্ত্র ধরেছিল। অন্যদল মুক্তিযুদ্ধের সুযোগে আধিপত্যবাদী ভারতীয় আগ্রাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে আতঙ্কিত চিত্তে পাশবিকতাকে সমর্থন করার অন্যায় দায় বহন করার মতো দুর্ভাগ্যে জড়িয়ে পড়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যায় দায় বললাম, কারণ মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই তার গণতান্ত্রিক লেবাসটি একটানে খুলে এর অন্তরনিহিত স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য বাকশাল গঠন করে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের সর্বপ্রকার ধারণার মূল উৎপাটন করে একদল ও এক ব্যক্তির শাসন কায়েম করে। স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। দেশের বীর সামরিক বাহিনি, মুক্তিযোদ্ধা ও ইসলামিক সংঘশক্তিকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং ভারতীয় সামরিক প্ররোচনায় রক্ষী বাহিনি নামক এক সশস্ত্র ফ্যাসিস্ট বাহিনি সৃষ্টি করে। দেশব্যাপী শুরু হয় একই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা নিধন এবং ভারতীয় আগ্রাসন বিরোধী ইসলামী তারুণ্যকে নিকেশের পালা। গুপ্ত হত্যার তাণ্ডবে বাংলাদেশের মফস্বল শহরগুলোতে সাধারণ গৃহস্থরা শান্তিতে নিদ্রা যাওয়ার পরিবেশ থেকেও বঞ্চিত থাকে। দেশব্যাপী ব্যাপক লুটপাট, পরস্বাপহরণ, চোরাচালান, পাটের গুদাম ভস্মীভূতকরণ এবং আইনের শাসনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে এক অরাজকের অদ্ভুত রাজত্ব চলতে থাকে। দেশে ১৯৭৪-এ শুরু হয় ভয়াবহ খাদ্যাভাব এবং সরকার কর্তৃক অপ্রতিরোধ্য ও অস্বীকৃত দুর্ভিক্ষ। যার পরিণামে লক্ষ-লক্ষ নরনারী গ্রাম ছেড়ে খাদ্যের আশায় শহরের দিকে ধাবমান হয়। মানুষের মৃতদেহে রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ভরে যেতে থাকে। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কবি ও প্রতিপক্ষ সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জেলখানায় আটক করা হয়। এক অসহনীয় আহাজারিতে দেশের প্রতিটি শহর ও গ্রাম জনপদগুলো আল্লার কাছে নাজাত ভিক্ষা করতে থাকে।

১৯৭৫-এর ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থানের ফলে ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নেমে আসে। বাকশালী জগদ্দল জনগণের বুক থেকে অপসারিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্ব এভাবেই সমাপ্ত হয় বলে আমার ধারণা। দ্বিতীয় পর্বের প্রারম্ভকাল আমার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বলে অর্থাৎ সাম্প্রতিককালের আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় আমার নিজের কাছে প্রাসঙ্গিক নয় বলে ইতিহাস থেকে কবিতাকেই ছেঁকে নিয়ে আলোচনা শুরু করা কর্তব্য বলে মনে করি।

আমি মনে করি বিভাগপূর্ব কালের আধুনিক মুসলিম কবিরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে যে কাব্যশৈলী ও ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন এটাই বাংলাদেশের কবিতাকে কলকাতাকেন্দ্রিক আধুনিক ত্রিশ দশকীয় কাব্যান্দোলনের দুর্দমনীয় মোহ থেকে খানিকটা উদাসীন ও স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসী করে তোলে। এই স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসী কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম যার নাম উচ্চারিত হওয়া উচিত তিনি কবি আশরাফ সিদ্দিকী। আশরাফ সিদ্দিকী 'তালেব মাস্টার' নামক একটি গদ্যকাব্য রচনা করে নতুন অভিনিবেশের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই সময়ের অন্য প্রধান কবিদের মধ্যে আবদুর রশীদ খান, মোহাম্মদ মামুন ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমান্টিক স্বচ্ছ কাব্যভাষা ও উপমার শিহরণ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এদের পরবর্তী পূর্ণতা পঞ্চাশ দশকে এসে সমাপ্ত হলেও এদেরকে পঞ্চাশ দশকের কাব্যান্দোলন যা ১৯৫২ এর ভাষা বিদ্রোহের পর ব্যাপকতা পায় এর সাথে যুক্ত করে বিচার করা যায় না। যেমন সমকাল সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর এবং আবদুল গণি হাজারীর কাব্য প্রয়াস দেশ বিভাগের পূর্ব থেকে শুরু হলেও পঞ্চাশে পূর্ণতা পেয়েছে বলেই তাদের পঞ্চাশের কবি কেউ বলে না। তেমনি 'নতুন কবিতা' নামক কাব্য সংকলনটি পঞ্চাশ দশকে প্রকাশিত হলেও একে কেউ পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাশের কবিতা বলে সনাক্ত করতে দ্বিধান্বিত বোধ করে। এই দ্বিধা আমারও আছে।

পঞ্চাশ দশক শুরু হয় শামসুর রাহমান ও হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্যকৃতির পরিচয় দিয়ে। এর সাথে এসে মধ্য পঞ্চাশের কবিগণ যুক্ত হন। যেমন আবদুস সাত্তার, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবুহেনা মোস্তফা কামাল, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জিয়া হায়দার, আল মাহমুদ ও শহীদ কাদরী। যদিও উপরোক্ত নামগুলোই সমকালীন বাংলাদেশের আধুনিক কাব্য ভাষার ভিত্তিভূমি নির্মাণের সবগুলো লক্ষণ ও পরিণামের জন্য দায়ী তবুও এরা পলি সংগ্রহ করেছেন পূর্ব পাকিস্তান নামক বিভাগোত্তর এক ধরনের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আবহাওয়া এবং অল্পবিস্তর সাহিত্যিক সুযোগ সুবিধার মধ্যে। এই সুযোগ সুবিধাগুলো পর্যায়ক্রমে ষাটের ভাগ্যেও জুটেছে। যেমন সমকাল নামক প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণার উদ্বোধক পত্রিকাটিতে পঞ্চাশের কবিদের পাশাপাশি আবদুল মান্নান সৈয়দ ও নির্মলেন্দু গুণের মতো ষাটের বিপরীতধর্মী এবং পরস্পরের আদর্শ বিদ্বেষী কবিরাও তাদের কবিতা প্রকাশের সুযোগ পান। এর একটু পরে আসেন মুহম্মদ নূরুল হুদা, মোহাম্মদ রফিক, আসাদ চৌধুরী, হায়াৎ সাইফ, সানাউল হক খান ও আল মুজাহিদী। মূলত উপরোক্ত কবিগণই বাংলাদেশে আধুনিক কাব্যভাষা ও কবিতার ধারণা সৃষ্টিকারী তিরিশ দশকীয় আঙ্গিক গঠনশৈলীগুলোর সর্বপ্রকার বৈচিত্রের উত্তরাধিকারী। কিন্তু সম্প্রতিকালের কাব্যভাষা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এসে পঞ্চাশ ও ষাটের কবিতার প্রধান গুণ ও লক্ষণগুলোকে আর ধরে রাখতে পারছে না। ছন্দবদ্ধ বাক্য রচনা, সনেটপ্রতীম সমমাত্রার একঘেয়েমী এবং লিরিকের ধ্বনি এখন আর কবিতার সাধারণ শর্ত হিসেবে ভিত্তিভূমি খুঁজে পাচ্ছে বলে মনে হয় না।

সত্তর দশকে আবির্ভূত হন আবিদ আজাদ ও শিহাব সরকার। এদের কবিতায় বহমান পয়ার এবং গদ্য ছন্দ খুব বেশি প্রভাব বিস্তার না করলেও তাদের গঠন রীতি গদ্যময় চলতি কথার ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। এতে খানিকটা নতুনত্বও আছে। এদের একটু পরেই আসেন হেলাল হাফিজ, ত্রিদিব দস্তিদার, মুশাররাফ করিম, শাহাদাৎ বুলবুল, নাসির আহমদ ও আসাদ মান্নান।

এই হলো বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ধারাবাহিকতা ও অগ্রগতির নিশানবাহীদের একটি তাৎক্ষণিক তালিকা। এখানে স্পষ্টভাবে বলে রাখা উত্তম, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই তা অতি সম্প্রতিকালের কবিতার আঙ্গিক পরিবর্তনের স্বতস্ফূর্ততা এবং তরুণতম কবির হাতে অনায়ত্ত কাব্যভাষার যথেচ্ছ দিগবিদিক ব্যবহারকেই কবিতা হিসেবে বিবেচনার আত্মতৃপ্তিকে নিয়ে। আমি সাম্প্রতিক কবিতার আলোচনায় ব্যক্তির চেয়ে অর্থাৎ কবির নাম উচ্চারণের চেয়ে কাব্য রচনার অতি সাম্প্রতিক পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করতে বেশি আগ্রহী।

কবিতা যেখানে তার আধার বা খোলস ফেলে দিয়ে মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে কারা কিংবা কোন বিশেষ কবির দ্বারা ঘটনাটা ঘটেছে তা আমাদের অনুসন্ধানের আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তাছাড়া প্রচলিত পয়ারবদ্ধ থেকে ভাষা যখনই গদ্যে ফিরে আসে তখনই বুঝতে হবে সাম্প্রতিক আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, প্রেম ও প্রবৃত্তির ভার সইবার মতো ক্ষমতা আর ব্যবহৃত পয়ারছন্দ সামাল দিতে পারছে না।

আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না গদ্যছন্দের স্বাভাবিক সুযোগ কিংবা বহমান গদ্যরীতির বহমানতা অ-কবিকেও কবি খেতাব জুটিয়ে দিতে পারে। আমি বরং মনে করি ভাষা রচনার কোনোরূপ পারদর্শিতাই অ-কবিকে কবি করে না। এমনকি কবিত্ব শক্তিহীন ছন্দবদ্ধ বাক্য বা পঙ্‌ক্তি রচনাকারীকেও শুধু দক্ষতার জন্য কেউ কবি বলে না। কবিতা হলো কবির এমন এক অনুভূতি যা রচয়িতার নিজস্ব গন্ধময় শব্দ নির্বাচন ব্যতিরেকে অভিব্যক্ত হয় না। সেই শব্দ সমষ্টি যদি একটি ব্যাকরণসম্মত পূর্ণাঙ্গ বা বাক্যও রচনা করতে অদক্ষতার পরিচয় দেয় তবুও আমরা সহসা সেই ত্রুটিপূর্ণ স্তবককেই কবিতা বলে সনাক্ত করতে কার্পণ্য করি না।

আমাদের অধিকাংশ তরুণতম কবি ছন্দে সিদ্ধহস্ত এমন বলা যাবে না। অথচ ছন্দ না জেনে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কবির অন্তত থাকে না। যাদের থাকে তারা মূলত নিজেদেরকে শেষ পর্যন্ত কথাশিল্পের গালভরা উপাধিতেই তৃপ্ত করে রাখেন। আমি আগেই বলেছি সমিল পঙ্‌ক্তি রচনার দক্ষতা যেমন অ-কবিকে কবি করে না তেমনি গদ্যরীতির পারদর্শিতাও শব্দ সনাক্তকরণে অক্ষম ব্যক্তিকে কবি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে না। তবে সাম্প্রতিকতা ও দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ কাককেও কিছুকালের জন্য কোকিল বা ময়ূরে রূপান্তর করতে পারে।

সম্প্রতিকালের কবিদের আঙ্গিক চিন্তায় অক্ষরবৃত্তের প্রাধান্য ও পুনর্পৌনিকতা অকস্মাৎ প্রতিরুদ্ধ হয়ে গদ্যপঙ্‌ক্তির অর্থবহ তীর্যকতা শুধু মাত্র চিত্রকল্প সৃষ্টিকেই কবিতার স্বাদে পর্যবসিত করতে চাইছে। এটা এমন কোনো নতুন পদ্ধতি না হলেও আমাদের কবিতার জন্য এই মুহূর্তে একান্ত দরকার। কারণ অক্ষর বৃত্তের পরিবর্তে কবিদের অন্যতর যে ছন্দ দক্ষতাকে সার্বজনীন করে তোলা প্রয়োজন ছিল মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের পরিচ্ছন্ন জ্ঞান না থাকায় সাম্প্রতিক কালের কবিদের শূন্যহাতে গদ্যের রুক্ষ জমিকেই কাব্যভাবনায় ভিজিয়ে ফসল বুনতে হচ্ছে। অথচ গদ্যভাষা কোনোকালেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির চিরকালের ভাষা নয়। কবির ভাষা শেষ বিচারে মাত্রা ও যতিচিহ্নের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছন্দভাষা বা অন্তমিলে লুটিয়ে পড়ার আনন্দ গুঞ্জনই বটে। বহমান গদ্যরীতিকে আমি কবির জন্য বিশ্রামকাল বলেই ধারণা করি। তার চিরকালের ভাষা নয়।

কিন্তু কেন জানি মনে হয় আমাদের সম্প্রতিকালের তরুণতম কবিগণ এমনকি কোনো কোনো প্রবীণও গদ্যভাষার পঙ্‌ক্তিবয়নের চাতুর্যকেই নিজেদের সমকালীন সর্বপ্রকার কাব্যচিন্তার বাহন করে তুলে পরিতৃপ্ত। এই আত্মতৃপ্তি সাম্প্রতিক কবিতাকে অচিরেই একঘেয়ে দুর্বোধ্য বিষয়ে পরিণত করবে বলে আমার আশঙ্কা। তবে এটাও স্বীকার্য যে, কোনো কোনো তরুণ কবির মধ্যে ছন্দ ও মিলে ফিরে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতাও কদাচিত টের পাওয়া যায়। যদিও তাদের প্রত্যাবর্তনের সলজ্জ পদপাতকে বহন করার মতো উপযুক্ত মাত্রার চাল কোনো কোনো বাংলা ছন্দে অবশিষ্ট আছে তা তাদের অজানা। তারা ভাবেন বাংলা ছন্দের কোনো কোনো প্রাচীন বিষয়ে অভ্যস্ত হতে পারলেই বুঝি তারা কাব্যরসিকদের জন্য অক্ষরবৃত্তের মতো একটা ভারবাহী সার্বজনীন আধার বা আঙ্গিক উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

আমি মনে করি সাম্প্রতিককালের কবির বিষয়বস্তুকে স্থিতাবস্থায় ভাষাশৈলীর আধারে স্থাপন করতে হলে এ ধারণাকে খানিকটা পরীক্ষা করার সুযোগ দিতে হবে।

ভাষার অন্তরনিহিত সম্পদ যতই কাব্যগন্ধী ভাব ও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধই হোক না কেন গদ্যে উৎসারিত হলে তাকে গদ্য বলেই আখ্যায়িত করতে হবে। এমনকি তা কবির রচনা বা কবির দ্বারা প্ররোচিত হলেও। আমরা বড় জোর বলতে পারি কবির চিত্ররূপময় কবিভাষা। কবিভাষা কিন্তু কবিতা নয়। সম্প্রতিকালের কবিরা এ যুক্তি সম্ভবত এই মুহূর্তে মানতে প্রস্তুত হবেন না, কারণ তাদের সম্প্রতিকালের কবিভাষা পয়ারের গণ্ডি অতিক্রম করতে গিয়ে বহমান গদ্যেই স্ফূর্তি লাভ করছে। তবে ব্যতিক্রম যে নেই এমন নয়। কেউ কেউ দোটানার মধ্যেও উভয় তরঙ্গে সাঁতার কাটছেন।

তবুও একথা বলতেই হবে যে সাম্প্রতিক কবিরা বিষয় হিসেবে এখনও 'প্রেম'কেই কিশোরসুলভ আবেগের অভিঘাতে কিংবা বলা যায় অনভিজ্ঞ হস্তার্পণে নিংড়ে রসকষহীন বিষয়ে পরিণত করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। সম্প্রতিকালের কবিরা যদিও প্রেম নিয়েই সবচেয়ে অধিক পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন তবুও তাদের সমস্ত পঙ্‌ক্তি মিলিয়েও তারা একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতার আস্বাদন আমাদের দিতে পারেননি। আমরা জানি না আশির দশকের কবিদের প্রেয়সীরা প্রকৃতপক্ষে দেখতে কেমন? তারা আধুনিক তো বটেই, কিন্ত তারা মানবী না দানবী তা সনাক্ত করা বড়ই মুস্কিল। প্রেমিকার নির্মমতাই এদের বিষয় এটা আমি বলি না, তবে দয়া মায়া, মমতা ও আত্মসমর্পণের দায়িত্বসুলভ কোনো অভিব্যক্তির ঘটনাও এই সব কবিরা কদাচ উল্লেখ করেন। তারা কি তবে ভালোবাসাও যে কবির জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় তা জানেন না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে সম্প্রতিকালে কবিদের কবিতার একটি বিষয় খুবই দীপ্ত এবং অন্তরঙ্গ সরলতায় উঠে এসেছে। সে বিষয়টির নাম আশা। আশির দশকের সম্প্রতিকালের কবিদের সামনে এবং তিরিশের সযত্ন সাধিত আঙ্গিক রীতিগুলো ভেঙে পড়লেও কবিতার জন্যে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় যে প্রেরণা বা আশা তা সমষ্টিগত প্রতিজ্ঞায় পর্যবসিত হওয়ায় আমরা একথা বলতে পারি না যে এই সব কবিরা শেষপর্যন্ত একটা উপস্থাপনার আধার খুঁজে পাবেন না। মনে রাখতে হবে, আশা বা উদ্দীপনাই কবিকে নতুন উপযোগী আঙ্গিক উদ্ভাবনে প্ররোচিত করে। তখন সব কবিরাই চায় একটা মারাত্মক কিছু ঘটে যাক,

'একটা মারাত্মক কিছু ঘটুক এইবার।
প্রতিদিন আত্মহত্যা এসে টোকা দেবে দরোজায় এমন হয় না।
প্রতিদিন প্রাচীন মুখোশ, পরচুলা আর বেলফুল নিয়ে
কেটে যাবে গন্ধময় বিকেল
...এমন হয় না
প্রতিদিন নষ্ট সহবাসে ব্যর্থ জীবন এমন হয় না।

কিছু ক্রোধ হোক এইবার, ভয়ঙ্কর ঈর্ষায় কাঁপুক ঘরবাড়ি
তারপর ঠিক জ্যোস্নাপ্লাবিত মাঠে বুনো জন্তুর মতো
নেমে আসবে দলে দলে
মানুষের পাল
হিংস্র নখরে তারা ছিঁড়ে ফেলবে ব্যর্থতা বিষয়ক
শব্দগুলি
এইভাবে তাদের বুকের কাছে ধীরে ধীরে জেগে উঠবে
সোনামুখী ধান
পৌষ-নবান্ন ইলিশ মাছের কামরাঙা মুখ
জেগে উঠবে শীতল পাটিতে বসে জুঁইফুলের মতো সুগন্ধী
অন্নের মুঠি।"

(নাসিমা সুলতানা কিছু ক্রোধ হোক বাংলাদেশের নির্বাচিত কবিতা, পৃষ্ঠা ২৬২, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত)

এই 'ক্রোধ' মূলত এদের প্রেরণাশক্তিরই ছদ্মবেশী নামকরণ মাত্র। আমি মনে করি এই হলো আমাদের অতি সাম্প্রতিক কবিতার একটা তাৎক্ষণিক বলয় যা আমার মতো একজন অমনোযোগী কবিকেও সতর্ক থাকতে সহায়তা করে।

আমাদের সাম্প্রতিক কবি ও কবিতার মধ্যে লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক আধুনিক বাংলা ভাষা এবং আধুনিক মননশীল সাহিত্যের ধারা। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারাটি কলকাতা বা বাংলাদেশ বহির্ভূত অন্য কোনো কেন্দ্রভূমির প্রাধান্যকে স্বীকার না করেই নিজেদের প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে রস আহরণ করে বৈচিত্রে পূর্ণ হয়ে ওঠার দুঃসাহসে বলীয়ান বলে আমাদের আশাকে জাগিয়ে তুলেছে।

সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য

আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের যে অংশটি গদ্যের দ্বারা বাহিত হচ্ছে বিশেষ করে গল্প ও উপন্যাস, তা সন্দেহ নেই যে, হঠাৎ ঝলমলিয়ে ওঠা হাসির মতো। হাসির কথা বললাম, কারণ হাসি যে আনন্দ ব্যক্ত করে, যে আশায় ভরিয়ে দেয় তা কি আর অন্য কিছু পারে!

সাম্প্রতিক সাহিত্যে জীবনবোধের কথা বলতে হলে এই ঝলমলিয়ে ওঠার কথাটি আগে বলতে হবে। আনন্দে লাফিয়ে ওঠাকেই আমরা ঠিক জীবনবোধ বলতে পারি না। গদ্য ভাষার একটি সহজতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। জীবনবোধ অনেক বড় ব্যাপার। এর জন্য গল্প ও উপন্যাস রচয়িতাদের জীবনের বহু তরঙ্গভঙ্গে আচাড়িপিছাড়ি খেতে হয়। বহু উত্থানপতনে সাঁতার কাটতে হয়। আর জীবনের গভীরতর অর্থকে আবিষ্কার করতে কোনো না কোনো আদর্শের কাছে বশীভূত হতে হয়।

আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে এই আদর্শমুখিনতা অপেক্ষাকৃত কম। আর যাদের তা আছে বলে মনে হয় তাদের রচনা বিষয় বাহুল্যে এমন কন্টকাকীর্ণ যে, জীবন বর্ণনার একটি ছক থাকলেও শিল্প হয়ে ওঠার সদগুণ সেখানে অনুপস্থিত।

তবুও যাদের রচনায় জীবনবোধের গভীরতা ইতিমধ্যে আমাদের স্পর্শ করার সাহস রাখে, তারা যে অধিকাংশ বয়সে তরুণ এটাই হলো আশার কথা। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের যারা ছোটগল্প রচনায় আশ্চর্য জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাদের মধ্যে হাসান আজিজুল হক, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মাহমুদুল হক, সিরাজুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও রাবেয়া খাতুনের নাম বলা যায়।

পরবর্তীকালে এঁদের সাথে যুক্ত হয়েছেন যাঁরা তাঁদের কারো বয়সই পঁচিশ পেরোয়নি। তাঁদের মধ্যে আবু সাঈদ জুবেরী, ইমদাদুল হক মিলন ও বারেক আবদুল্লাহর নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। আসলে এই নামসমূহ বা নামোল্লেখ বড় কথা নয়, আসল কথা হলো জীবনবোধসম্পন্ন সাহিত্য রচনার গভীর চেষ্টা রয়েছে এদের মধ্যে।

এক সময় আমাদের দেশে গদ্য রচনায় যাঁরা গভীর জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন যেমন শাহেদ আলী, নাজমুল আলম, মীর্জা আবদুল হাই এঁরা এখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের সক্রিয়তা ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। যদিও শাহেদ আলীর রচনা আজকাল আর দেখা যাচ্ছে না। নাজমুল আলম গত দুই দশক ধরে সমান সক্রিয়ভাবে ছোটগল্পে তাঁর অবদান রেখে গেছেন। তাঁর রচনায় প্রধান বিষয় হলো দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত অবদমিত কাম। মীর্জা আবদুল হাই গ্রাম্য জীবনের আবর্তে ভেঙে-পড়া মূল্যবোধগুলোর জন্য হা-হুতাশ করছেন। তাঁদের আমরা জীবনের সমালোচক বলতে পারি।

মুক্তিযুদ্ধকে যারা বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি নির্ণায়ক ঘটনা বলে মনে করে কিছু সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক তাঁদের অন্যতম। তবে বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর সামাজিক দিকনির্ণয়ক এই যুদ্ধের গভীর অভিজ্ঞতা নিজের মধ্যে উপলব্ধি না করে শুধু ঘটনা সজ্জিত করলে তা ক্ষণকালীন রচনায় পর্যবসিত হবে বলে আমার ভয়।

হাসান আজিজুল হক একজন গভীর জীবনবাদী শিল্পী। তাঁর আদর্শমুখিনতা তিনি গোপন করেন না। তবে তাঁর গদ্য-ভঙ্গী জীবন বর্ণনার উপযোগী কিনা, সে প্রশ্ন না জেগে পারে না। তবু তাঁর কিছু গল্প আমাদের জীবনবোধ সম্পন্ন গদ্যের সম্পদ।

আবদুল মান্নান সৈয়দ মূলত কবি। তাঁর ছোটগল্পে কাব্যের উপমা জীবনযাপনকে ব্যাখ্যা করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। একমাত্র মান্নানের গল্পেই আছে সাহসের সাথে আধুনিক জীবনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জীবনবাদী শিল্পী না হলেও জীবনের একটা বিমূর্ততা তাঁর উপজীব্য বিষয়। মাহমুদুল হক রোমান্টিক। তিনি গদ্যে কবিতার কাজ করতে চান। এটি কবিদের গদ্য রচনায় সম্ভবপর হলেও ট্রাডিশনাল গদ্য লেখকদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার।

এই হলো সাম্প্রতিক সাহিত্যে জীবন শিল্পীদের একটি তাৎক্ষণিক বর্ণনা।

জসীমউদ্‌দীনের একটি কবিতা

তার গ্রামের নদীর ধারে আলাপরত দু'জন ভদ্রলোকের কথাবার্তা থেকে তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাম শুনতে পান। তখন জসীমউদ্‌দীন কবিতা লেখার প্রয়াসী এক পল্লীবালক। রবীন্দ্রনাথের সাথে মনের পরিচয় ঘটে অবশেষে প্রবাসীতে, কবির জীবনস্মৃতি পাঠের পর। এ সময়ের কথা উল্লেখ করে জসীমউদ্‌দীন তার ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায় বলেছেন, 'অল্প বয়সের সেই কিশোর বেলায় আর একজন কিশোর কবির প্রথম জীবনের কাহিনির ভিতর দিয়া যে মিলন লতাটি রচিত হইল, তাহাতে ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইয়া আমার সমস্ত জীবন আমোদিত করিয়াছে।'

এভাবেই জসীমউদ্‌দীনের আরম্ভ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তখন রবীন্দ্রনাথের তীব্র আলো নিঃসরণে বাংলাদেশ উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ১৯০৩ সালে জসীমউদ্‌দীনের জন্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্লোল ও কালি-কলমের যুগেই জসীমউদ্‌দীন তার সবুজ সহজ সরলতা নিয়ে দাঁড়ালেন যা সেই মুহূর্তেই আধুনিক বাংলা কাব্যকে স্বক্ষেত্রে, স্বভাবে অন্যরকম মহিমা দিলো। প্রথম যখন তিনি বাংলাদেশ ও গ্রাম্য বিষয়বস্তু নিয়ে আরম্ভ করেন, তখন অতি আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির উল্লাসমত্ততা, ছিমছাম নাগরিক জীবন, এলিয়ট ও এজরা পাউন্ডের মতো লিখতে চায় এমন নতুন কবির দল—এসব কিছুই তার মনে তার নিজের সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ এনে দেয়। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলা থেকে রবীন্দ্রনাথ তাকে আশ্বস্ত করেন। এ সময় প্রকাশিত তার রাখালী ও নক্‌শী কাঁথার মাঠ গ্রন্থ দু'খানি তিনি অতিশয় দ্বিধাকম্পিত হাতে রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দেন। বই দু'খানি পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ তাকে কলকাতা ছেড়ে শান্তি নিকেতনে গিয়ে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান। শুধু তাই নয়, বই দুইটি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র ও মোহনলালকে—যিনি জসীমউদ্‌দীনেরও বন্ধু ছিলেন, এক পত্রে জানান, 'জসীমউদ্‌দীনের কবিতার ভাব, ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লেখবার শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা বাক্যে জসীমউদ্‌দীন তার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেও শান্তি নিকেতন গেলেন না। তিনি কলকাতাতেই থাকতে মনস্থ করলেন এবং কল্লোলের সমস্ত বন্ধুর সাথে থেকে তাদের পাশে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেন।

জসীমউদ্‌দীনই প্রথম বাংলা কাব্যে ছোটখাটো, ভাঙা ও বিক্ষিপ্ত কাহিনির স্বাদ নিয়ে আসেন, যা বাংলাদেশেরই ঘটনা। বাংলার পরিবেশ প্রথম শান্ত পরিতৃপ্তির মতো তার কবিতার অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।

অবশ্য এ কথা ঠিক, মাইকেলের পর রবীন্দ্রনাথই প্রথম সার্থক কাহিনি কবিতার রচয়িতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ই কাহিনি চয়ন করেছিলেন রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য ও বৌদ্ধদের নানারূপ গাথা-কাহিনি-উপকথা থেকে। তাদের কৃতিত্ব হলো তারা উপরিউক্ত কাব্য এবং কাহিনি থেকে কোনো কোনো অতি পরিচিত চরিত্রকে আধুনিক বাংলা ভাষায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা দান করেছেন। আর জসীমউদ্‌দীনের কাহিনি কবিতার চরিত্রগুলো গ্রামবাংলার মুসলমান চাষী পরিবারের প্রবহমান জীবন এবং জীবন ধারণের উপর ভিত্তি করে রচিত। সেখানে চরিত্রগুলোর পাশে যে পরিবেশের বর্ণনা আর নৈসর্গিক উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে তা এর আগে এত সহজভাবে বাঙলা ভাষায় আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

জসীমউদ্‌দীনের প্রত্যেকটি কবিতার আরম্ভ গ্রাম্য গল্প বর্ণনার ঢঙে। 'এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে—চুলগুলি তার কালো' কিংবা 'এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে'—এ ভাবেই জসীমউদ্‌দীন তার রচনা আরম্ভ করেন। যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরুতেই কোনো কাহিনির ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে পারতপক্ষে তিনি কোনো প্রকার চতুর কৌশল করেন না। আর করার সুযোগও আমার মনে হয় অত্যন্ত কম। কারণ এর পরেই শুরু হয় জসীমউদ্‌দীনের স্বভাব-সুলভ উপমার জাল বোনা। যাতে তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে মনে হতে পারে। কথার পরতে পরতে তিনি রঙিন আবির ঢোকাতে থাকেন। আমাদের চোখের সামনে কাঁপতে থাকে নদী, ঢেউয়ের ওপর ভেসে যায় সুন্দর কলস, কলমি ফুলের দামের মধ্যে সাদা বকটি তার পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে, ভরা কলসীর ভারে বাঁকা হয়ে হেঁটে যায় গ্রামের মেয়েরা, উতল বাতাস কৃষাণীর বুকের কাপড় উড়িয়ে নেয়। এই সবই জসীমউদ্‌দীনের কবিতার অতি পরিচিত ও বহু ব্যবহৃত পটভূমি। বাংলার মুসলমান চাষী পরিবারের কারুময় ঝুলন্ত শিঁকা থেকে আরম্ভ করে এক অপরূপ নক্‌শী কাঁথা তিনিই প্রথম আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন। প্রেমের কথা বলতে গিয়ে আবার অতি পুরাতন পরিত্যক্ত বাঁশির কথা বললেন। আবার বহু যুগ পর বহুদূরাগত বংশীধ্বনি শুনতে পেলাম আমরা। যা রাধা বলে বিলাপ না করলেও তেমনি অর্থবহ অন্য এক রোদনে আমাদের আপ্লুত করল। এভাবেই জসীমউদ্‌দীন কল্লোলকালীন আধুনিকতার গণ্ডির বাইরে যথাসম্ভব নিজকে প্রসারিত করলেন।

এখানে জসীমউদ্‌দীনের একটি কবিতা—যে কবিতাটি আমার প্রিয় কবিতা বলতে পারি, যা আমি আমার কৈশোরে অভিভূত হয়ে পড়তাম আর যে আবেশ ও দুঃখবোধ এখনও মনকে জড়িয়ে রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করলেই এই কবির মানসিকতা কিছু পরিমাণ ব্যক্ত করা যাবে বলে আমার ধারণা। তার বেদনাবোধ, উপমা প্রয়োগ, আঙ্গিক নিষ্ঠা, চিত্ররূপময়তা ও বাস্তববোধ একসঙ্গে পাঠককে আলোড়িত না করে পারে না।

আমি আগেই বলেছি যে, জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রাম্য কাহিনি বর্ণনার ঢঙ আছে। কোনো কোনো জায়গায় তা পল্লির পটভূমিতে অপূর্ব এক একটি ছোটগল্পের আকার ও আভাস নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি কোনো কোনো কবিতার মিল, অলংকার ও ছন্দ বর্জন করলে নিঃসন্দেহে গল্পেরই আকার নেবে।

কিন্তু এ মুহূর্তে আমার সামনে তার এমন একটি কবিতা খোলা রয়েছে, যার কথা পূর্বে উল্লেখ করতে চেয়েছি—যাতে কাহিনির গন্ধ নেই, যা আছে তার মর্মে শুধু কবিতা। আরম্ভ ও অন্ত অদৃশ্যভাবে আন্তরিক কবিতার দ্বারা সঞ্চরিত ও সঞ্চলিত। যে ছেদ কিংবা ফাঁক রাখা হয়েছে তাতেও জসীমউদ্‌দীন তার সোনালী কলম ঢুকিয়ে কাহিনির সূত্র হাল্কা করে দিয়েছেন। অবশেষে আমরা যা উপলব্ধি করি তা পয়ারের সঙ্গীতময় ধ্বনিতরঙ্গ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি তার সবচেয়ে রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থ—'বালুচর' এ এই রচনাটি সংযোজিত করেছেন। কবিতাটির নামকরণ 'কাল সে আসিবে'। কাল সে আসিবে নামকরণ থেকেই জসীমউদ্‌দীনের অন্যান্য কবিতার নামের সাথে এর পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যেখানে তিনি পল্লী জননী, রাখাল ছেলে, তরুণ কিশোর, মুসাফির অথবা জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায় এভাবে কবিতার নামকরণ করেন, সেখানে কাল সে আসিবে আলাদা তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয় তাতে সন্দেহ নেই।

কাল সে আসিবে মোদের ওপারের বালুচরে
এপারের ঢেউ ওপারে লাগিছে বুঝি তাই মনে করে।

এভাবেই জসীমউদ্‌দীন তার ইঙ্গিতময় প্রস্তাবনা শুরু করেছেন। দুটি লাইন যেন কোনো গ্রাম্যবধূর কারুময় হাতপাখার সাদাসিধে এবং সমান্তরাল সঞ্চালন, যা অতি সহজেই আমাদের অবয়বে ফুটে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছিয়ে দিয়ে এক স্নিগ্ধতার আরাম বুলিয়ে দেয়।

তারপরই শুরু হয়েছে জসীমউদ্‌দীনের সবুজাভ উপমা বয়ন, যা বাংলা সাহিত্যে সে সময় একমাত্র জসীমউদ্‌দীন ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না; কারণ তার কল্লোলকালীন বন্ধুরা আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিপুষ্ট অঞ্চলগুলো থেকে। ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে নির্দ্বিধায় তারা ঐতিহ্য আহরণ করলেও তারা যে সব অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, যে গ্রাম এবং সুদূর শহর থেকে কলকাতায় জুটেছিলেন, সে এলাকার লোকজন (এমনকি শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও) তাদের ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। নিরন্তর সাধুবাদ তারা আদায় করেছিলেন শুধু পরস্পরের কাছ থেকেই। আর এ সংখ্যাও আট-দশ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সেই স্বল্প সংখ্যকদের বাইরে থেকে ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ কৌতূহল মিশ্রিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকানোর ফলে অবস্থাটা অন্যরকমভাবে উত্থাপিত হলো বাংলাদেশে।

কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের মানসিকতা এর থেকে সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র। তিনি বাংলাদেশকে বুঝতে পারতেন। যা কিছু বাংলার এবং বঙ্গ দেশের অন্তরালে সম্পৃক্ত তাতেই জসীমউদ্‌দীনের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। অসংখ্য গ্রাম্য গান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সে সময়ে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গাঁথা ও কাহিনি সংগ্রহ করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার খরচ যোগাতেন।

আবহমানকাল যে জীবনের সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন তার নিহিত সৌন্দর্যকে তিনি অবলোকন করলেন। সবকিছুর মধ্যে দেখতে পেলেন এক প্রেমময় ও আধ্যাত্মিক গরিমা। যার সাথে আধুনিকতার তুলনা করা তার কাছে অসম্ভব ঠেকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল সে আসিবে মুখখানি তার নতুন চরের মত
চখা আর চখী নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।
চরের চাষীর ধানের খেতের মতই ত হার গা
কোথা বা হলুদ, আবছা হলুদ কোথা বা হলুদ না,

এখানে জসীমউদ্‌দীন তার হৃদয়বিধৃত রাখাল যুবকের যে মায়ামতো রূপ বর্ণনা করেছেন বাংলা কাব্যে তার তুলনা বিরল। 'মুখখানি তার নতুন চরের মত'—কবি জসীমউদ্‌দীনের এ লাইন লেখার সাথে সাথে চাঁদের সঙ্গে মুখের বর্ণনার অতি পুরাতন অবস্থার আকস্মিক পতন ঘটল। এই প্রথম আমরা মাটি থেকে চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত হতে দেখলাম।

'চরের চাষীর ধানের খেতের মতই তাহার গা'—এ কথা বলার পর সে অঙ্গের বর্ণ কেমন হবে তা আর বলে দিতে হয় না। কিন্তু সব রহস্য ভেদ করে শব্দ উচ্চারণ যেন জসীমউদ্‌দীনের স্বাভাবিক অভ্যাস। যার জন্য তিনি 'কোথা বা হলুদ, আবছা হলুদ কোথা বা হলুদ না' পর্যন্ত বলে দিয়ে তার উদ্দেশ্যের আন্তরিক পরিসমাপ্তি ঘটান।

সাধারণত জসীমউদ্‌দীনের সমগ্র রচনায় তার অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা মাটির প্রদীপের মতন জ্বলে উঠেছে। তার প্রিয় শব্দগুলো সবই আমাদের জানা, তবু এসবের ওপর তিনি যে কারুময় হস্ত অর্পণ করেছেন তাতে সে সমস্ত শব্দ কিছু পরিমাণ সাবেক অর্থ ও আনন্দ পরিত্যাগ করে অন্য এক মায়াবী আভায় আভাসিত হয়ে নতুন সম্পদ ও অর্থের বিদ্যুৎ গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। নদী, ঘাট, বালুর চর, নৌকা, কলস, বাঁশি, কবর এবং কুঁড়ে ঘর—এসব কিছুই তার কবিতায় নতুন অর্থের তড়িতে আলোকিত না হয়ে পারেনি।

কোথাও আবার উপমা-উৎপ্রেক্ষা ছাড়াই শুধু তার উদার ও উদাসীনতার মোহনীয়তায় এবং মিল ব্যবহারের মার্জিত চেতনায় অতি সাধারণ পঙ্‌ক্তিসমূহও কবিতার কলেবরে মুখর হয়ে উঠেছে। কৌশলের পরিবর্তে কানই কবির সাহায্যকারীর ভূমিকা পালনে অগ্রসর হয়েছে। যেমন—

কাল সে আসিবে, নোঙর ছিঁড়িল, দুলিছে নায়ের পাল
কারে হারায়েছি কারে যেন আমি দেখি নাই কতকাল।
ওপারেতে চর বালু লয়ে খেলে, উড়ায়ে বালুর রথ
ওখানে সে কাল দুটি রাঙা পায়ে ভাঙিয়া যাইবে পথ।
কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, আমি কি আবার হায়
আসমান-তারা শাড়িখানি আজ উড়াব সারাটি গায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি জসীমউদ্‌দীন এ কবিতাটিতে যেন এক প্রতিহত প্রতীক্ষার দেনা শোধ করেছেন। অবশ্য তার সব কবিতাতেই এ লক্ষণ বিদ্যমান থাকলেও আলোচ্য রচনায় এ আক্ষেপ সংগীতের ধ্বনিময়তায় আলোড়িত হয়ে উঠেছে। শুধু যেন অপেক্ষা করে থাকা আর কান পেতে দূরাগত বংশীধ্বনি শোনার মর্মভেদী যাতনাভোগ যে আওয়াজের উৎস কোনো কালে কাছে আসে না। উৎকর্ণ হলে বরং দূরের স্পন্দন আরও সুদূর বিলীন হয়, তাই যেন জসীমউদ্‌দীন অনুভব করেন তার কবিতায়। বুঝি সে জন্যেই সর্বদা নিশ্চেষ্টভাবে পাওয়ার আশাকে তিনি জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন। শুধু এ আশাকে নিয়ে বসে থাকো—

সে আসিবে কাল গলায় পরিয়া কুসুম ফুলের হারদু'খানি নূপুর মুখর
হইবে চরণে জড়ায়ে তার।
মাথায় বাঁধিবে দুধালীর লতা কচি সীমপাতা কানে
বেণুর অধর চুমিয়া চুমিয়া মুখর হইবে গানে।
কাল সে আসিবে, রাই সরিষার হলদী কোটার শাড়ি,
মটর কনেরে সাথে করে যেন খুলে দেখে নাড়ি নাড়ি।
অথবা,
গলায় কি আজ পরিতে হইবে পদ্মরাগের মালা
কানাড়া ছান্দে বাঁধিব কি বেণী কপালে সিঁদুর-জ্বালা?
কাল সে আসিবে, মিছাই ছিঁড়িছি আঁধারের কালো কেশ,
আজকের রাত পথ ভুলে বুঝি হারালো উষার দেশ।

এভাবেই জসীমউদ্‌দীন অতিশয় সরলভাবে এক দারুণ দুঃখবোধ সৃষ্টি করেছেন। যা তার অন্তর ও অন্তরালবর্তী কামনা থেকে উদ্‌গত হয়েছে। এখানে পরিবেশ ও প্রতিভাই তাকে আধুনিকতার নানাবিধ জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। আর কবিতার শরীর হয়ে উঠেছে সরল ও সাহসী। অকুতোভয়ে তিনি মিল ব্যবহার করেছেন। পয়ারের প্রসারের মধ্যে যতটুকু আনন্দ ধরানো যায় জসীমউদ্‌দীন সাধ্যমতো তার প্রয়োগে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছেন। কোথাও দ্বিধা তাকে স্পর্শ করেনি।

আমরা জানি তার সমকালীন অনেকে সে সময় ছন্দ নিয়ে কি বিচিত্র কারিগরির কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কেউ অভাবনীয় উপমায় কবিতার অবয়ব ভরিয়ে দিচ্ছেন। আর পয়ারের পূর্বতন কাঠামো উলটে ফেলে নতুন ওজন বিশিষ্টমূর্তি গড়ার কাজে অনেকদূর এগিয়ে গেলেন কেউ কেউ। ইতিমধ্যে গদ্য কবিতার সূচনা হলো কারো কারো হাতে, যাতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অভিভূত। কিন্তু সেই প্রবল চাঞ্চল্যের যুগে, যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগ পরে 'কল্লোল যুগ' বলে অভিহিত হয়েছে, সে সময় জসীমউদ্‌দীনের অবস্থাটা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগায়।

জসীমউদ্‌দীন তার পুরাতন ও ব্যবহার্য বিষয়গুলি নিয়ে আলাদা হয়ে থাকলেন। বৈচিত্র্যের চেয়ে বিষয়বস্তুর উপর জোর দিলেন বেশি। রাখালী ও নক্‌শী কাঁথার মাঠ থেকে আরম্ভ করে বালুচর, ধানক্ষেত, রঙিলা নায়ের মাঝি, এমনকি সোজন বাদিয়ার ঘাট পর্যন্ত তার পুরনো বাঁশিটি ধরে রাখলেন। যার সুরস্পন্দন বা নিনাদে ক্রমান্বয়ে নতুনত্বের চমক না থাকলেও তার আন্তরিকতা আগের মতোই থেকে গেল। যার ফলে আমরা একঘেঁয়েমির হাত থেকে মোটামুটি মুক্ত থাকলাম। মনে হয় এখানেই জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্ব ও কবিত্বের উৎস গোপন হয়ে আছে।

এই আলোচনায় আমি জসীমউদ্‌দীনের একটি মাত্র কবিতার উপর নির্ভর করে তার কবিসত্তার আলোকোজ্জ্বল বিস্তৃতির কথা বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি। এমন একটি কবিতাকে আমি বেছে নিয়েছি যা অন্যান্য রচনা থেকে আমাকে অধিক অথবা সমপরিমাণ আনন্দ দান করে। হতে পারে এটি তার শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়। কিন্তু যেহেতু এটি বারবার আমার কাছে প্রথম এসে উপস্থিত হয়, অনেকটা সে কারণেই একে আমার আলোচনার জন্য বেছে নিলাম। লিখতে গিয়ে কতবার যে তার রাখালী, পল্লীবর্ষা, পল্লীজননী, উড়ানীর চর, কবর প্রভৃতি থেকে দৃষ্টান্ত দেয়ার লোভ আমাকে সম্বরণ করতে হয়েছে রসজ্ঞ পাঠক তা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন।

পার হই দিন আর পার হওয়া দীর্ঘ আয়ুষ্কাল

প্রতিটি বছর অত্যন্ত ধীর গতিতে হলেও আমার জন্য জুলাইয়ে এসে একটা দিন থমকে দাঁড়ায়। আগে তো জন্মদিন বা জন্মমাসের ঠিকানাও কোনো কালে হদিস করিনি। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কবিতার রাজত্বে বসবাসকারী ঘোরলাগা কিছু তরুণ-তরুণী এই জুলাইয়ের ১১ তারিখ এলেই আমাকে অত্যন্ত অনানুষ্ঠানিকভাবে কিছু ফুল দিয়ে যায়। আমি স্তম্ভিত, বিব্রত ও অভিভূত হয়ে ফুলের মাঝে দাঁড়িয়ে, তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করি। তারা আমাকে বোঝাতে চায়, কবি হিসেবে আমার জীবন, যা আমি যাপন করে এসেছি—তা সামান্য হলেও অর্থবহ। তারা অনেক কথা বাড়িয়ে বলে। বলা বাহুল্য, তাদের বক্তব্যে অতিরঞ্জন থাকে। কিন্তু এটাও আমি বিশ্বাস করি, কই কেউ তো আমাকে এর আগে এমনভাবে জীবনের সার্থকতার কথা উল্লেখ করেনি। তাহলে কি সত্যিই আমার কাব্যপ্রয়াস এদেশের স্বপ্নপিয়াসী মানুষের কাছে অল্পবিস্তর গ্রাহ্য হয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নিবন্ধ যখন লিখছি তখন বাসি ফুলের তোড়ার মধ্যে বসে স্বাভাবিক ভাবছি, সত্যিই কি আমার দেশ ও জাতির কাছে কবি হিসেবে উত্থাপন করার মতো সামান্য কিছু কৃতিত্ব আমার আছে? যারা গতকাল আমাকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে গেছেন, তারা সবাই জানেন, ফুলের জীবন তাৎক্ষণিক, একদিন মাত্র তার আয়ু; পরের দিনই তা আবর্জনা। তাহলেও মানুষের কাছে ক্ষণস্থায়ী পুষ্পমালার অসাধারণ একটা মুল্য আছে। এই মূল্য আমি কি বাকি জীবনে পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখি?

জন্মদিন এলেই সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে আমার প্রিয়জনদের কথা। যাদের অনেকেরই এখন আর পার্থিব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তাদের স্মৃতি আমার মধ্যে নানা কবিতা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমি লিখেছি তাদের জন্য। তারা কেউই কবি ছিলেন না। তাদের জীবন বিকশিত হওয়ার কোনো অবলম্বন না থাকায় কবরের মধ্যেই তাদের স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেছে। তবে আশার কথা তারা সবাই ছিলেন পরকালে বিশ্বাসী। নিশ্চয় সেখানে তারা তাদের স্বপ্নের একটা অর্থবহ তৃপ্তি খুঁজে পেতেও পারেন। আমি অবশ্য তাদের মতোই অন্য একটা অদৃশ্য পৃথিবীতে বিশ্বাসী। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে পৃথিবীতে, যে দেশে এবং যে পরিবেশে নিঃশ্বাস টানছি, আমি তার কিছু চিহ্ন, কিছু বেদনা, কিছু আনন্দ এবং কিছু বিনিময়ের একটা কাব্যময় বর্ণনা দিয়েই বেঁচে আছি। বলা বাহুল্য, আমার জীবন কষ্টের জীবন। একটি অতিশয় দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার মা ছিলেন অপেক্ষাকৃত ধনী ও সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। কিন্তু আমার পিতা এসেছিলেন একটি দরিদ্র পরিবারের ভেতর থেকে। আমার মা সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছিলেন বলে তিনি ছিলেন বিলাসিনী, সুসজ্জিতা এবং সুন্দরী। আর আমার পিতা দারিদ্র্যের মধ্যেই ছিলেন শিল্পের প্রতি আগ্রহী। কোনো এক সময়ে তিনি সংগীতচর্চায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন। তিনিও শৌখিন মানুষ ছিলেন। পড়াশোনায় তারও আগ্রহ ছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কাছে তিনি ছিলেন নিরুপায়। আমি আমার পিতা-মাতা দু'জনেরই সদগুণ অল্পাতিক পেয়েছি বলে ধারণা করি। আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমি কষ্টের মধ্যে, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত কবি হওয়ার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে চেয়েছি। আমার সব অভাব ও দীনতা আমি বিরামহীন পাঠে এবং অক্লান্ত ভ্রমণ বিচরণে পূর্ণ করতে চেয়েছি। আমার যা কাজ তাতে কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় না। তবে সহানুভূতি না থাকলে জীবন দুর্বহ মনে হয়। আমার সৌভাগ্য যে, আমার যিনি সঙ্গিনী, তিনি ধনী লোকের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তার নর্ম ও মর্ম সঙ্গী হিসেবে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করে ফেলে যেতে রাজি হননি। আমি এটাকে সবসময় সৃষ্টিকর্তার বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে জ্ঞান করেছি। মানুষ পাঠে ও বিচরণে তার সব অভাব পূর্ণ করতে পারে না। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিনি। তবে উনসত্তর বছরে পা দিয়েও আমার মনে হচ্ছে আমি মোটামুটিভাবে তৃপ্তিকর জীবনযাপন করেছি। আমার স্বভাবই হলো কাউকে আঘাত না দিয়ে নিজের কাজ করে যাওয়া। সবসময় যে তা পেরেছি এমন অবশ্য দাবি করতে পারি না। তবে চেষ্টা করেছি। আমি কবিতায় আমার দেশ ও পারিপার্শ্বকে প্রাধান্য দিয়েছি। বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি নারী ও প্রকৃতিকে। এখন বয়স বেড়ে যাওয়ায় এর সঙ্গে যোগ করতে চাই আমার ইবাদত ও প্রার্থনাকে। আমি তো নিশ্চিতভাবেই জানি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এর মানে এ নয় যে, আমার কবিতা ও উদ্ভবনার ঝুলি এতটুকু হালকা হয়েছে। আমি প্রায় প্রত্যহই আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে নতুন উদ্ভাবনা শক্তির জন্য দু'হাত তুলে রাখি। আমি বাংলাদেশের কবিতায় একটা কাজ নিশ্চিতভাবেই যোগ করতে সক্ষম হয়েছি, সেটা হলো নিজে যা বিশ্বাস করি তা অকপটে বলতে পারা। আমার চারপাশে আমার উদ্ভবকালে আমি কোনো অদৃশ্যের প্রতি আত্মসমর্পিত কবিকে পাইনি। যদিও আমার পূর্ববর্তীদের মধ্যে তেমন মানুষ বেশ কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু সমবয়সী, বলা যায় একজনও ছিলেন না। তার জন্য আমাকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। আমাকে নানাভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী এবং পশ্চাৎপদ চিন্তার উপাসনাকারী রূপে চিত্রিত করার সংঘবদ্ধ প্রয়াস আমি দেখেছি। আমি এতে ঘাবড়ে যাইনি। বরং আমার সমালোচনাকারীরা আমার প্রতি সব সময় প্রতিবন্ধক খাড়া করার চেষ্টা করেছে। আমাকে ড্রেনের নোংরা পানিতে ঠেলে ফেলে দেয়ার চেষ্টাও কম হয়নি। কিন্তু আমি কিভাবে যেন টিকে গেছি। পড়ে যাইনি। যেসব আদর্শের কারণে আমাকে ধ্বংস করতে কিছু কবি-সাহিত্যিক প্রয়াসী ছিলেন, তারা এখন আমার ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ। আমি বলছি না তারা হেরে গেছেন। তবে তারা যে জিতে যাননি, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। আমি কখনও কারও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না। পাশাপাশিও থাকতে চাইনি। কারণ আমি মনে করি আধুনিক কবির প্রকৃতপক্ষে কোনো সুহৃদ জোটে না। তাকে একা থাকতে হয়। একাকিত্বই তার নিয়তি।

কবি হিসেবে আমার উপভোগ্য বিষয় মাত্র দুটি। এক নারী, দ্বিতীয়ত প্রকৃতির ভেতর বিচরণ। এই দুটি আস্বাদন করতে গিয়েই আমি আমার বর্তমান বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি। যার ধর্মীয় নাম হলো, ঈমান।

সাহিত্য করতে এসে আমাকে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছনা পোহাতে হয়েছে আমার একাডেমিক ক্যারিয়ারের ঘাটতির জন্য। আমি অবশ্য যখন স্কুলের উঁচুশ্রেণীর ছাত্র ছিলাম তখন আমার ওপর রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে। আমি স্কুল থেকে ফেরারি হয়ে যাই। আর আমার কবি-স্বভাবের জন্যই সম্ভবত আর বাঁধাধরা একাডেমিক জীবনে ফিরতে পারিনি। আমার এই অভাব কেউ সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে চান না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও আমার কবিতা তখন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় উপনীত হতে পেরেছিল। জীবিকার তাগিদে স্বাধীন সংবাদপত্র চর্চা এবং সম্পাদনা করতে গিয়ে আমি জেলও খেটেছি। আমি যে একদা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম একথা আমি কখনও ভুলতে পারি না। আর এটাও ভুলতে পারি না যে, আমি যে রাজনৈতিক নেতার জন্য, যার ডাকে সর্বস্ব হারিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশত্যাগ করেছিলাম, অবস্থার বিপাকে পড়ে আমি তার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তিনি আমাকে আমার একাডেমিক ক্যারিয়ার না থাকলেও তার সরকারের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কলাকেন্দ্রে সম্মানজনক উচ্চ সরকারি পদে নিয়োগ করেছিলেন। আমার নিয়োগ নির্দেশের ফাইলে তার স্বাক্ষর ছিল। সে স্বাক্ষরটি এখনও আমার চোখে জ্বলজ্বল করে– শেখ মুজিবুর রহমান।

একথাগুলো এজন্যই বললাম, যাতে আমাদের দেশের সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেন যে, কবিরা, শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা অকৃতজ্ঞ হয় না।

আমি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানেরও ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলাম এবং তার ইচ্ছাতে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও সার্থকভাবে গড়ে তুলেছিলাম। আমি তার ওপর গল্প ও কবিতা রচনা করেছি এবং একথাও জানি তা আমাদের সাহিত্যে অগ্রাহ্য হয়নি। আমি অনেক রাষ্ট্রীয় নাটক, উত্থান ও পতন অবলোকন করেছি এবং এখন রাজনীতি সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়েছি। এর কারণ অন্য কিছু নয়, কবির তথা সৃজনশীল শিল্পীর ঔদাসীন্য। কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষ থেকে আমি সাধারণত কিছু বলি না। তবে আমার জীবনে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যদি আমি সান্নিধ্যে পেয়ে থাকি—তাহলে তার কথা বলব না কেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কবি হিসেবে আমি কোনো কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের আনুকূল্য পেয়েছি। আমি পবিত্র হাদিসে পড়েছি, আল্লাহর রাসূল কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে ধর্মীয় ব্যক্তিদের আহ্বান করেছেন। কিন্তু তেমন কোনো পৃষ্ঠপোষকতা আমার ভাগ্যে জোটেনি—যা আমার মতো বিশ্বাসী কবিকে অকাতর চিত্তে, বিনা বিনিময়ে দেয়া হয়েছে। তবু আমি স্বীকার করি সবদিক থেকেই আমি কিছু না কিছু পেয়েছি। এটাই সম্ভবত আমার সৌভাগ্য। যদিও মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকেছি।

আমাদের দেশের একজন রিক্তহস্ত কবিকে হাঙরের ঢেউয়ে লুটেপুটে খেয়ে বাঁচতে হয়—একথা বলেছেন জীবনানন্দ দাশ। আমার ব্যাপারে তা আমি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছি। এদেশের অনেক খ্যাতনামা ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে। এতে আমি কবি হিসেবে উপকৃতই হয়েছি। আমার মনে হয় মানুষকে যারা নেতৃত্ব দেন, তাদের ব্যাপারে কবিরা খুব সহজেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেন। আমিও পারি। কারণ আমি শুধু কবি নই, একজন সাংবাদিকও বটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আমি তা করতে চাই না। এতে কবিতার কোনো সহায়তা হয় না। অযথা ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা বিদ্বেষে সমাপ্ত হয়।

আমি কবি ছাড়া আর কিছু হতে চাইনি। এবার ৬৯তম জন্মদিনে আমাকে যে আমার ভক্তবৃন্দ অভিনন্দন জানিয়েছেন এজন্য আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আসলে আমি কবি ছাড়া আর কিছু নই। এবারের জন্মদিনে এ সত্যই আমার কাছে পুষ্পমাল্য হয়ে উপস্থিত হয়েছে।

কবি হিসেবে সারাজীবন আমি সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করে এসেছি। যখন যে রাজনৈতিক বিশ্বাসে আবর্তিত হয়েছি এবং আপ্লুত হয়েছি, সব অবস্থানে দাঁড়িয়েই আমি নিপীড়ক, শোষক এবং ঔপনিবেশিক আচরণের প্রতিবাদ করেছি। এখন আমার অবস্থান ইসলামের পক্ষে। আমার ধারণা ইসলাম আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শক্তির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কোনো প্রস্তুতি না থাকলেও পুঁজিবাদ নিরস্ত্র ইসলামের ওপর তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এর পরিণাম যাই হোক না কেন, বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী পরাশক্তির সামনে দাঁড়ানোর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা থাকলেও তা অপ্রকাশ্য। ইসলামকে আক্রমণ করার এই লড়াই আক্রমণকারীরা আর গুটিয়ে নিতে পারবে না। দিন দিন তা নানা আকার ও আকৃতি নিয়ে চলতেই থাকবে। কবি হিসেবে দ্রষ্টা হিসেবে আমার কাজ শুধু দেখে যাওয়া নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জগৎবাসীর সামনে সাক্ষ্য দেয়া।

প্রকৃতপক্ষে আমি আল্লাহর অহির সংকলন, পবিত্র কোরআনের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। এতে আমি কোনো প্রকার দ্বিধান্বিত নই। এটাই হলো আমার এবারের জন্মদিনের উপলব্ধি।

চোখের জলকে অতিক্রম করে আমি কবি হয়েছি

এ মাসে আমি আমার ৬৭তম জন্মবর্ষে প্রবেশ করে বেশ স্তম্ভিত। কবি যে এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে তা আমার ধারণার মধ্যেই ছিল না। এখন মনে হয় কবি না হয়ে আমি আর কি হতে পারতাম? না, কিছুই হতে পারতাম না। কারণ আর কোনো কাজেই আমি আমার কোনো দক্ষতা দেখাতে পারিনি। আমি অলস ছিলাম বলে যে পারিনি, তা না। বরং বর্ণ, গন্ধ, প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা অনেক মানুষেরই থাকে। কিন্তু তা বর্ণনা করার মতো ভাষা বা লেখার ক্ষমতা না থাকার দরুন তারা কবি হয়েও নির্বাক দ্রষ্টা হিসেবে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং পৃথিবীর নৈসর্গিক বিবরণ দেখতে দেখতে অন্তর্হিত হয়ে যান। এ বিস্ময় কাউকে ধার্মিক করে, কাউকে কিছুই করে না। আমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। আমি ভাষাটা আয়ত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলাম আমার কৈশোরেই। বর্ণমালা শেখার সাথে সাথেই আমার মধ্যে পড়ার ঝোঁক চেপে বসে। আর লেখার ক্ষমতা আমি অর্জন করি আমার নিজের চেষ্টায়। সে চেষ্টা এখনও পরিত্যাগ করিনি।

আমি ১৯৫৪/৫৫'র দিকে ঢাকায় এসে হাজির হই। এর আগেই কলকাতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকায় আমি লিখতে শুরু করেছিলাম। নতুন সাহিত্য, চতুরঙ্গ, ময়ূখ ও কৃত্তিবাস পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হলে সম্ভবত ঢাকার তরুণতম কবিদের মধ্যে আমার নামটি কমবেশি জানা হয়ে গিয়েছিল। এটুকু সুখ্যাতি নিয়েই আমি ঢাকায় আসি। কি আমার জীবিকা হবে তা আমি আগেই ধারণা করে নিয়েছিলাম। ভেবে নিয়েছিলাম যে সংবাদপত্র ছাড়া কে আমাকে ঠাঁই দেবে। শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। সংবাদপত্রে আমার কাজটা কি তা আমি কখনও বড় করে দেখিনি। বরং আমি নিজে কি, কি করতে ঢাকায় এসেছি, সেটাই আমাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে।

আমার কষ্টকর জীবনের বিবরণ দিতে আমার একদম ভালো লাগে না। বরং এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের মধ্যে কিছু মুখ, কিছু স্মৃতি, এমনকি কারোর আসঙ্গলিপ্সা আমাকে এখনও কাব্য নির্মাণে, নির্মাণ না বলে একে কাব্য সৃষ্টিতে বলাই ভালো মনে করি, উৎসাহ দিয়েছিল। আমাকে নিরুৎসাহিত করেছে, আমার চেয়ে কম প্রতিভাবান লোকেরা। তারা ছিল আমার চেয়ে বিদ্যা-বুদ্ধিতে এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অনেক সুখকর অবস্থায়। আমি দেখেছি কম প্রতিভাবান লেখকেরা তাদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত একগুঁয়েমী আমাকে পেরে ফেলতে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছে। তারা সর্বত্রই আমাকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে তাদের ধারণা ও বিজয় উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সেটা হলো, আমার কবিতা বিষয়ে উদ্ভাবনা শক্তি। ছন্দ, উপমা ও পরিমিত জ্ঞান—সর্বোপরি একেবারেই নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার।

আমি যখন অনেক বড় কবিকেও ধৈর্য্য ও সম্ভ্রম দেখাব বলে প্রায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম ঠিক তখনই আমার মনে কৌতূহল ও পাঠের অভ্যেস আমাকে তাদের সমগ্র রচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার তাগাদা সৃষ্টি করে। এমনকি তাদের প্রাত্যহিক রচনাও আমি অপার মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকি।

এখন আক্ষেপ হয়, কেন আমার মনে এই দুর্বুদ্ধির উদয় হয়েছিল। আমার জানা মতে, এ দেশের কবিরা, তাদের সহযাত্রীদের রচনা প্রায় উপেক্ষা করেই একটা কবি জীবন কাটিয়ে দেন। ব্যতিক্রম যে নেই সেকথা আমি বলছি না। কিন্তু অধিকাংশ কবিই সহযাত্রীদের রচনা, উদ্ভাবনা ও প্রতিভা সম্বন্ধে অজ্ঞ বা অমনোযোগী থেকেই বার্ধক্যে উপনীত হন। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সেটা পারিনি। আমি আমার সহযাত্রীদের রচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে পড়ার চেষ্টা করে এসেছি। তারা যে প্রতিভাবান এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হয়েছে, আমি আমার বন্ধুদের মতো নই। আমার নিজস্ব কিছু উদ্ভাবনা ও অভিজ্ঞতা আমি আমার রচনায় ব্যক্ত করতে পেরেছি। আমি যে আগে পরাজয়ের কথা বললাম, তা দীর্ঘস্থায়ীভাবে কোনোকালেই আমার মনে স্থায়ী হয়নি। কারণ অযাচিত ক্ষেত্র থেকে আমার কবিতা ও গদ্যের প্রশংসা আমি শুনতে পেতাম এবং নিঃশব্দে এই প্রশংসা ধ্বনি আমাকে উজ্জীবিত করে রাখত।

কারও খ্যাতি বা প্রতিপত্তিতে আমি কখনোই ঈর্ষাকাতর ছিলাম না। এটাই আমাকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে প্রেরণা যুগিয়ে গেছে। আমি লিখতে এসেছিলাম। লিখেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। লেখা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না। জীবিকার জন্য এ পর্যন্ত যেসব পেশা গ্রহণ করেছি, এ সব কিছুকেই আমি গৌণ মনে করতাম।

লেখালেখিটা যে কোনো পার্টটাইম জব নয়, তা আমি গোড়াতেই বুঝে নিয়েছিলাম। সাহিত্য একটা গোটা জীবন দাবি করে। আমি এই দাবি মিটিয়েছি এবং এই বিশ্বাস আমার সব সময় দৃঢ় ছিল যে, সাহিত্যচর্চা কোনো চর্চাকারীকেই একেবারে খালি হাতে বিদায় করে না।

আমার বিয়ে হয় অতি অল্প বয়সে, মাত্র ২২ বছর বয়সে এক স্কুল মাস্টারের কন্যার সাথে। আমার শ্বশুর আখাউড়ার কাছেই মনতলা বলে একটি স্টেশনের স্টেশন মাস্টার হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। ঐ চাকরি তার পোষায়নি, তিনি গ্রামের শিক্ষকতায় ফিরে আসেন।

আমার স্ত্রী তার একেবারে কনিষ্ঠা কন্যা। তার সাথে আমার জীবন বেশ পরিতৃপ্তভাবেই কেটে গেছে। একে ঠিক সুখ বলা যায় কিনা, তা আমি ভেবে দেখিনি। তবে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব বড় নালিশ নেই। শিক্ষকের কন্যা হওয়াতেই সম্ভবত আমার স্ত্রীর লেখাপড়ার প্রতি একটা প্রবল ঝোঁক ছিল তিনি তা তার সন্তানদের মধ্যে সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। আমি যে কবি এ কথা সারাজীবন আমার স্ত্রী অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করেছেন। এক সপ্তাহের জন্যও কোথাও গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাননি। এটা যখন ভাবি তখন অত্যন্ত বিস্ময় হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তাকিয়ে থাকি, কারণ আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। কে জানে, কার যাওয়ার ঘণ্টা আগে বাজে।

আমি অতীতে কোনো একটি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে বলেছিলাম—'পরাজিত হয় না কবিরা'। এখন ভাবি পরাজয়টা বোধহয় সব সময় তেমন মন্দ বিষয় নয়। মৃত্যুও তো এক ধরনের পরাজয়। তবে আমি যেহেতু মৃত্যুর পরেও আমার একটা অনন্ত জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখি সে কারণে এ ব্যাপারে আমার কোনো শংকার সৃষ্টি হয় না। শুধু ভাবি পৃথিবীতে যারা আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সেখানে তাদের আবার ফিরে পাব তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরুতেই আমি বলেছি কবি না হলে আমি কিছুই হতাম না। পৃথিবীতে অনেক মানুষই কল্পনাপ্রবণ হয়। কিন্তু তাদেরকে কেউ কবি বলে না। অনেক দৈব ঘটনার সহযোগে কেউ কেউ কবি হয়ে ওঠেন। আমি যখন শুরু করি তখন অনেক প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীকেই আমি আমার সহযাত্রী পেয়েছিলাম। তাদের কারও কারও লেখা আমার কাছে আমার চেয়েও প্রতিভাদীপ্ত এবং সতেজ মনে হতো। পরবর্তীকালে সময়ের সংঘাতের মধ্যে তারা হারিয়ে গেছেন। আজ তাদের সবার নামও আমি ভুলে গেছি। এখন মনে প্রশ্ন জাগে, তারা কেন থাকলেন না। তারা তো অনেকেই আমার চেয়ে প্রতিভাবান ছিলেন। তবে কি কে থাকবেন, কে থাকবেন না, সে ব্যাপারে কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলী সংকেত আছে? আছে কোনো অদৃশ্য নির্বাচন? একথা ভাবলে আমার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি তখন সিজদায় পড়ে থাকি।

এসব কথা বললাম, কারণ এই ৬৭তম জন্মবর্ষে আমার বিশ্বাস, আমি জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমার কোনো আক্ষেপ নেই, এ কথা আমি বলব না। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নেই। আমি এখনও লিখতে চাই। অনেক বিষয়ে আমার লেখার বাসনা ছিল। কিন্তু কে না জানে, আয়ু এবং স্বাস্থ্য একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। তার ওপর দৃষ্টিশক্তি আমার ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে আসছে। অদম্য লেখার ইচ্ছা নিয়েই আমি সারাদিন একাকী বসে থাকি। কিন্তু একটি সিরিয়াস রচনায় উপুড় হয়ে পড়লেই স্মৃতি ঠিকমতো কাজ করে না, বিস্মৃতিও না। কি যে একটা অবস্থা, শুধু চিন্তা করতে থাকি। চিন্তা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই আমার। আমি অনেক কাজের মানুষ ও ঘটনাকে ভুলে যাই। কিন্তু অতি শৈশবে আমার মামু বাড়ির পুকুরের পাড়ে সজনে গাছের গোড়ায় একটি আমার বয়সী ছোট মেয়ের সাথে খেলেছিলাম, এ-দৃশ্য মনের আয়নায় এতই স্পষ্ট যে, আমি এ থেকেও অনুপ্রাণিত বোধ করি।

আমি যেসব প্রিয় মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি, তাদের মুখগুলো খুব মনে পড়ে। ইচ্ছা হয়, তাদের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু তারা লেখালেখির জগতের মানুষ নয় বলে তাদের ঠিকানা জানি না। কে, কোথায় থাকেন, আদৌ আছেন কিনা তাও জানি না। অনেক মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ করে, অনেকের চোখের জলকে অতিক্রম করে আমি কবি হয়েছি। তাদের দয়া ও ক্ষমা না থাকলে আমি একজন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীই হতাম, কবি হতাম না। এটুকুই সান্ত্বনা যে, তাদের জন্য আমি অনেক অক্ষয় পঙ্‌ক্তি রচনা করে গিয়েছি। তারা যদি সেসব রচনা পাঠ করেন, তবে নিশ্চয় একথা মনে মনে স্বীকার করবেন যে, আমি অকৃতজ্ঞ নই। অন্তত ঋণ শোধ করার একটা প্রয়াস কিংবা ব্যর্থ চেষ্টা আমার মতো পাষণ্ডেরও ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জল পড়ে পাতা নড়ে

বাংলাদেশের ঋতুর বিভাজন আধুনিককালের কোনো লেখকই সঠিক বলে মেনে নেননি। ষড়ঋতুর কথা আমরা বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ছয়টি ঋতুর রেখাঙ্কন বা ছাপ বাংলাদেশের মানুষের ওপর পড়ে না। শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত আমার নিজের কাছেও একই ঋতু বলে মনে হয়। যে ঋতুর ছাপ আমার কবি মনকে স্পর্শ করে, তা হলো বর্ষা ঋতু। গ্রীষ্মের খরতাপও আমি অনুভব করি। কিন্তু বৃষ্টির ঋতু এমনভাবে আমার ঘরে প্রবেশ করে যা আমাকে একই সঙ্গে অলস ও সংগীতময় মেজাজে আপ্লুত করে রাখে। শহরে থাকি বলে কথা নয়। যখন গ্রামে ছিলাম, তখন বর্ষণকেই আমার বাংলাদেশের প্রধান সৃজনশীল আলস্যের মাস বলেই মনে হতো। প্রকৃতিই বলতে গেলে বৃষ্টিই আমাদের এই উপমহাদেশের মানচিত্র থেকে আলাদা করে দিয়েছে। বলা যায়, বৃষ্টিই বাংলাদেশের নির্মাতা। এর মানে এ নয় যে, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও বৃষ্টির কোনো জয়গাথা নেই। কিন্তু বাংলাদেশের পলিমাটি এর উদ্ভবকাল থেকেই বৃষ্টিরই অবদান। নদী বেঁধে দিয়ে ফারাক্কার মতো বাঁধ সৃষ্টি করে পানি সরিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু হিমালয়ের ওপর ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা বাংলাদেশের আকাশের মেঘকে কোনো প্রবল প্রতিবেশী সীমা-শরহত দিয়ে বাঁধতে পারেন না। বৃষ্টি প্রতিরোধ করার কোনো প্রযুক্তি সম্ভবত এখনও অনাবিষ্কৃত। অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রবল বর্ষণজনিত বাধাই এ দেশকে বারবার বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। বৃষ্টি আমাদের বাঁচায়। বৃষ্টি আমাদের নাচায় এবং বৃষ্টি এ দেশের প্রকৃতিতে অঙ্কুরোদগমের অনুপ্রেরণা দেয়। এ দেশের রচিত প্রাচীন চর্যা থেকে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত সবকিছুকেই বর্ষণ ভিজিয়ে রেখেছে।

বৃষ্টির মাসগুলো এ দেশের শুধু নর-নারীর হৃদয়ে আসঙ্গ লিপ্সা সৃষ্টি করে এমন নয়। এ দেশের গভীর সবুজের মধ্যে বিচরণশীল পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ সবকিছুই বর্ষণের ঋতুতেই অতি সন্তর্পণে পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। মাছেরা উজায়, নতুন পানিতে গৃহীত বীজ ডিমের আকারে ছড়িয়ে দিতে চায়। পরিত্যক্ত ফলের শক্ত আঁটি ভেঙে অঙ্কুরিত হয় বৃক্ষশিশু। মোটকথা, যারা পৃথিবীতে ছিল না, যে প্রাণ বীজের মধ্যে সুপ্ত ছিল তা বৃষ্টিতে প্রাণিত হয়ে বেরিয়ে আসে বৃষ্টির নমনীয়তা ভেদ করে। প্রাচীন বাংলা কাব্যে বৃষ্টির মহিমা যেভাবে কীর্তিত হয়েছে, তা মূলত যৌনতার সাথে জড়িত। উদ্‌গম ও উদ্ভবের সাথে জড়িত। মধ্যযুগের কাব্যেও বৃষ্টির বর্ণনা আছে, সেখানে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও বৈরাগ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টি কবিকে শূন্যতার বোধ জাগালেও একেবারে বিরাগ করে ফেলতে পারে না। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষণ রহস্যময়ভাবে কবিকে উদাসীন করে, এমনকি কামতৃষ্ণা মেটাবার সঙ্গিনী পোশাক শিথিল করে বর্ষণের মাসে কবিকে তৃপ্ত করতে চাইলেও কবি বর্ষণের দিকে কান পেতে থেকে কোথায় যেন অন্যমনস্ক হয়ে সৃজনশীলতার বেদনায় ফুপিয়ে কাঁদতে থাকেন। এই কান্না নিশ্চয় কবিতার জন্য নয়। তাহলে কিসের জন্য দুর্বোধ্য এই রোদনধ্বনি?

সব প্রাণিরই কাম-তৃষ্ণা মেটে তার সমধর্মী বিপরীত লিঙ্গের সাথে সম্মিলনে। কিন্তু মানুষের মেটে না। মানুষ যে সবচেয়ে রহস্যময় প্রাণি তা বর্ষা ঋতু এসে মানব-মানবীকে বুঝিয়ে দিয়ে যায়। বৃষ্টির শব্দ প্রকৃতির আচরণকেই শুধু বদলে দেয় না তাকে গর্ভ সঞ্চারের দিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে। শুধু মানুষই বৃষ্টির শব্দে নিঃশব্দ হাহাকার বুকে চেপে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকে। পাতা চোঁয়ানো পানিতে, মাটির ভেতর লুকিয়ে থাকা শক্ত আঁটিওয়ালা বীজও ফেটে যায়। কিন্তু মানব-মানবীর হাহাকার বুকের ভেতরই গুঞ্জরিত হয়ে এমনিতে প্রবাহিত হতে থাকে, ফেটে বেরিয়ে আসতে পারে না। নদীর মোহনায় ইলিশের ঝাঁক প্রবল বেগে স্রোতের বিপরীতে ধাবমান হয়। তখন নদীর তরঙ্গে মৃদু মৃদু যে বৃষ্টি পড়ে, আমরা তার নাম দিয়েছি ইলশেগুড়ি। উজানো মাছের পেট ভরে যায় প্রাণের আকুলতায়। ডিম উঁচু হয়ে ওঠে গর্ভস্থলী। নদী আর নদী থাকে না। সে ভরপেট এক বিশাল গর্ভসঞ্চারিণী অতিকায় মাতা।

তবু মানসী যেহেতু কবির, এই সৃজনরঙ্গ কবির মতো আর কেউ উপলব্ধি করেন না। কবি তার নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে তোলেন বৃষ্টির শব্দের মতো ভাষার সুরভিযুক্ত নমনীয় শব্দের সম্ভারে। কালীদাস থেকে বিদ্যাপতি পর্যন্ত মেঘ ও বৃষ্টির কাছে ঋণী। বর্ষণের জয়গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথও। শুধু কবিদের নিয়ে বৃষ্টির রহস্য রচনা করলে পক্ষপাতের দোষে আমি অভিযুক্ত হবো। প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টি ঘোর ঘনঘটা নিয়ে বাংলাদেশের গ্রাম জনপদগুলোকে অলস ও অবসন্ন করে রাখে। পেশীবহুল কর্মঠ কৃষক দাওয়ায় বসে পাটের শিকা টেনে স্বপ্নের রহস্য বুনতে শুরু করে। সে ভাবে না তার কাজ নেই। কিন্তু দড়ি পাকানো থেকে শুরু করে যতরকম মেয়েলী বিনুনি সে রচনা করতে থাকে। মাঠ পানির ভেতর হারিয়ে যায়। বর্ষা হলো কৃষাণ-কৃষাণীর জন্য অফুরন্ত অপেক্ষার ঋতু।

ঘুরে ফিরে আবার কবির কাছেই ফিরে আসতে হয়। কারণ কবিতা ছাড়া বৃষ্টির বর্ণনা করার জন্য ভাষা তো আর কারও নেই। বৃষ্টি রহস্যময়ভাবে পাখিদের নীরব হয়ে যাওয়ার মন্ত্র দান করে। সিক্ত পালক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা প্রকৃতির অশ্রুগুলোর মতো নিচের দিকে নামতে থাকে। বর্ষণ ঋতুর আগে যে পাখির কলরবে প্রকৃতি মুখরিত থাকে, বৃষ্টি তার খানিকটা নিঃশব্দ করে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নৈঃশব্দ হলো মিলনের। বীজ গ্রহণ করার। শরৎ না আসা পর্যন্ত প্রকৃতির ভেতর প্রাণির শরীরে বাংলাদেশের যে আলস্য নেমে আসে তা পৃথিবীতে আর কোথাও নেমে আসে কিনা কে জানে।

উদাসীনতা না থাকলে প্রাণিচিত্তে কোনো উদ্ভাবনার বিদ্যুৎও খেলে না। ফলে বৃষ্টির একঘেয়ে বর্ষণ টিনের চালায় শব্দ করে ওঠা মাত্রই মানুষ থেকে পিপীলিকা পর্যন্ত প্রথম নজর দেয় খাদ্যের দিকে, সঞ্চয়ের দিকে। আর এই সঞ্চয় যথেষ্ট হোক বা না হোক এর পরের ধাপই হলো শারীরিক নিঃসরণের চেষ্টা। বৃষ্টির যেন একটাই ভাষা- মিলিত হও, সঞ্চারিত হও, প্রকৃতির গর্ভকে ভরিয়ে দাও বংশবিস্তারের দিকে।

নিঃসঙ্গ কবি বৃষ্টিতে শুধু যে জলের শব্দ শোনেন এমন নয়। তার উদাসীনতার মধ্যে সঞ্চারিত হয় এক কল্পনা। মনে হয় কেউ যেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আসবে বলে। উঠোন ভর্তি বৃষ্টির পানির মধ্যে সে অদৃশ্য প্রতিশ্রুতি যেন কোনো যক্ষিনীর মতো ঠাণ্ডা পায়ে চলাফেরা শুরু করে। মনে হয় দুয়ার ঠেলে এখনই সে এসে পড়বে। কিন্তু কবির দীর্ঘশ্বাসের মতো এক ঝলক বাতাস ছাড়া আর কিছুই ঘরে প্রবেশ করে না। পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া পাতা উড়তে থাকে, ছড়িয়ে যায় মেঝেয় কিন্তু প্রতিশ্রুত বেদনা নৌকায় পাটাতনের মতো শক্ত হয়ে শূন্যতায় ভাসতে থাকে।

চর্যাপদের কবিরা বৃষ্টির ঋতুতে নিজেদের সাংসারিক ঋদ্ধতা ও নিঃশেষ দারিদ্র্যের বর্ণনা করতে চেয়েছেন। এতে অবশ্য সময়ের একটি সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কামনাকে পাথরচাপা দিয়ে রাখলে, তার সময় রোধিত পঙ্‌ক্তিই যে ব্যাঙের ডাকের মতো শোনায় এটা আধহাজার পরে আমরা বুঝতে পারলেও কাহ্নপা বা শবরীপা কি উপলব্ধি করেছিলেন? শবরীপার অবশ্য একটা সুবিধা ছিল। তিনি উঁচু উঁচু পর্বতে তার বন্য সঙ্গিনীর তরঙ্গায়িত লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকতে পেরেছিলেন। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে চর্যাপদের কবিরা ছিলেন মানুষের নিগূঢ় শূন্যতাবোধের নির্মাতা মাত্র। ধর্মই তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তবু একটা কাজ তারা করেছিলেন অতিবর্ষণ ও দারিদ্র্যের মধ্যেও তারা নারীর ছলাকলার কথা বলতে ছাড়েননি। বলেছেন, যে বউ দিনের বেলা কাকের ডাকে ভয় পায়, রাতে সে নির্ভীক নিঃসংশয় অভিসারিনী। বৃষ্টিসিক্ত পথে বেরিয়ে যেতে দ্বিধা করে না।

এই চিত্রটিকে আমরা প্রাচীন বাংলার বর্ষণ ঋতুর একটি অক্ষয় চিত্রকল্প বলে মানতে পারি।

আমাদের সাম্প্রতিক কবিতায় ঋতুবৈচিত্র্যের কোনো লক্ষণ প্রকটিত নয়। তারা শুধু সঙ্গিনীর মধ্যেই ছয়ঋতু দেখে অভ্যস্ত। বিষয়টা মন্দ নয়। কিন্তু নারী প্রকৃতির প্রতিরূপ হলেও সে পুরুষেরই সঙ্গিনী। প্রকৃতির মধ্যে যেমন আলো-হাওয়ার খেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, প্রতিক্রিয়া আছে, বৃষ্টি-বর্ষণ আছে, আছে খর-রৌদ্র, কবির শরীরী প্রেমিকার মধ্যে তা নেই। সাম্প্রতিক কবিরা বৃষ্টিতে আকুল হন না। আর হলেও তা তাদের রচিত পঙ্‌ক্তিতে উৎকীর্ণ হতে আমি বড় একটা দেখি না। তারা যা চান তা হলো আবেগ নিঃসরণের একটা রন্ধ্র মাত্র। কামের পরিতৃপ্তির পর স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপক্ষের কাছে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আমরা ভালোবাসা বলি, সাম্প্রতিক কবিরা সেটারও ধার ধারেন না, বর্ষণের ঋতু পার হয়ে যায় কিন্তু মুখ মেঘলা করে থাকলেও তরুণ কবির দল খালিগায়ে প্রবল বর্ষণের মধ্যে প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করতে চান না। বৃষ্টি দেখলে তারা এমনভাবে শহরের রেস্তোরাঁগুলোতে বসে থাকেন, মনে হয় যেন অনভ্যস্ত কাকের দল এই গ্রীষ্মমণ্ডলে হঠাৎ তুষারপাত দেখে ভয় পেয়েছে। তারা কাপের পর কাপ চা ও কফি উদরসাৎ করলেও বৃষ্টির জন্য একটি প্রাণ মাতানো লাইন রচনা করেন না। আমি অবশ্য বর্ষণ ঋতুর গুণগান গাইতে গিয়ে কাব্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাইছি না। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো বৃষ্টিতে ভাবুকগণের উদাসীনতা ও কাব্যের স্বাভাবিক সম্পৃক্ততা এবং সর্বোপরি বৃষ্টির ঋতুতে প্রকৃতির গর্ভসঞ্চারের বেদনাকে ব্যক্ত করা। এখানে গাছ, মাছ, পাখি, পতঙ্গ বলে কোনো কথা নেই। বৃষ্টি সবার মধ্যেই সঞ্চার করে বৃষ্টির বেদনা। মানুষ তা প্রকাশ করতে পারে বলেই আমি কবির উদাসীনতাকে উদ্ভাবনা বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছি মাত্র।

চিন্তাশীল মানুষের সৃজন বেদনা অত্যন্ত রহস্যময় বিষয়। আমাদের দেশে বৃষ্টি আছে বলে আমরা বৃষ্টিতে সিক্ত হওয়ার আনন্দ-বেদনা অনুভব করি। কিন্তু এমন দেশও তো আমি অহরহ ভ্রমণ করি, যেখানে কোনো বৃষ্টির ঋতু নেই। কদাপি দু'এক ফোঁটা বৃষ্টির অনুগ্রহ মরুময় প্রান্তরে ঝরলেই তা এক উৎসবে পরিণত হয়। এটা কোনো সৃজনশীল বেদনা হতে পারে না। যদিও আমি লিখছি বর্ষণের ঋতু নিয়ে আলাদা করে। কিন্তু বাংলাদেশ হলো সমবৎসর বর্ষণের শব্দের নিচে বিছানো একটি ব-দ্বীপ মাত্র। যেন সিক্ত হওয়ার এবং শুয়ে পড়ার জন্য সদা প্রস্তুত। এর ওপর দিয়ে বইছে মৌসুমী বায়ুর দাপট। যার কোনো দিকনির্দেশ নেই। সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে সমুদ্রে বিলীয়মান।

অলসতাই হলো শিল্পের আতুরঘর। বৃষ্টি আমাদের দিয়েছে সেই সৃজনশীল আলস্য। আমাদের দেশের মেয়েরা একটা কথা বলে, নেই কাজ তো খৈ ভাজ। এই খৈ ভাজাটাই হলো আলস্যের শস্য। বৃষ্টি আমাদের মাঠে যেতে দেয় না বটে। কিন্তু ফলিয়ে তোলার জন্য দু'টি হাতকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলে। হাত গুটিয়ে তো আর আমরা কেউ বসে থাকিনি। কেউ লিখি, কেউ খৈ ভাজি, কেউ খিচুড়ির গন্ধে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। কিন্তু কবির কাছে আমাদের দাবি হলো রোদনভরা পঙ্‌ক্তি বয়নের দাবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি হলো প্রতিরুদ্ধ। বিলাপের মাস। আমরা কাঁদি, কিন্তু চোখে পানি নিঃসৃত হয় না। যেন এক মহা অলৌকিক মন্ত্রবলে আমাদের কান্না বর্ষণ হয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রকে কাদা বানিয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিমের দেশগুলোতে নারীর যৌন রহস্য এবং দেহের আবরণ প্রায় উন্মোচিত হয়ে পড়ায় প্রেমের কবিতার এক ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দু'একজন এ চেষ্টা করতে গিয়ে হাস্যাস্পদও হয়েছেন। তারা অনেকেই নিসর্গ নিয়ে মেতেছেন। নারী আর কোনো কাব্যের বিষয় নয় পশ্চিমের কবি সমাজের কাছে। তারা গাছ, মাছ, পাখি, পতঙ্গ অধ্যয়ন করছেন। কদাচিৎ মানবিক কথা উল্লেখ করলেও তা প্রেমিকা হিসেবে নয়, মেয়ে মানুষ হিসেবে। নারী কবিরাও তথৈবচ। সন্দেহ নেই সমকালীন পশ্চিমী কবিতার জন্য অবস্থাটা অসহনীয়, আমাদের কাছে তো একেবারেই দুর্বহ। তারাও ঋতুবৈচিত্র্যে কম্পিত হন না এমন নয়। তবে তারা বাংলাদেশের বর্ষণ ঋতুর মতো কুয়াশাচ্ছনতা এবং বৃষ্টির ছাটে গা কাঁটা দিয়ে ওঠার মতো এমন পরিস্থিতি একেবারেই উপলব্ধি করতে পারবে না। এর জন্য এই কাদামাটির দেশে জন্মগ্রহণ করার শর্ত পূরণ করতে হবে। এজন্যই কি রবীন্দ্রনাথ আবার গাছ হয়ে জন্মাবেন বলে বলেছিলেন। জীবনানন্দ রোগা শালিকের বেশে ফিরে আসতে চান। তাহলে তো আমার জন্মভূমি হলো জগতের সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব-দ্বীপ। কবিরা কী এজন্যই বলেছেন, এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা।

আমি অবশ্য আমার নিজের কবিতায় বর্ষণ ঋতুর যে বর্ণনা দিয়েছি, তা কেবল সিক্ততা ও গর্ভসঞ্চারের বিবরণ নয়। আমি নম্রতা, বিনয়, প্রেম ও মিলনের এই রহস্যময় ঋতুতে নিষ্ঠুরতারও ভয়াবহ চিত্র কম অবলোকন করিনি। এই ঋতুতে এক প্রাণি অন্য প্রাণিকে খেয়ে বাঁচতে দেখেছি। বৃষ্টির ভেতর এই লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত দাঁতের আক্রমণও আমি কম দেখিনি। বৃষ্টি যেমন সৃজনের ঋতু তেমনি এর ভেতরে রয়েছে পরস্পরকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকার হিংস্র ইতিহাস। আমি দেখেছি ক্ষুদে ক্ষুদে মাছের ঝাঁকের পেছনে জলডোবা সাপের চলন, পাখা গজানো পিঁপড়ের ঝাঁকের মৃত্যু উল্লাস। মানুষের মধ্যেও এই ঋতুতে অলস মস্তিষ্কের ভেতর শয়তানের শিং আমি কম দেখিনি। ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তরঙ্গে নিমজ্জিত হওয়ার কাহিনিও এই বর্ষণ ঋতুর একটি বৈশিষ্ট্য। বলা যায় যে, বৃষ্টির রাতে ডাকাত পড়ার ঘটনাও কবির মনে রেখাপাত করে। বৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে এমন একটি আয়োজন, যা জন্ম ও মৃত্যু দ্বারা তরঙ্গায়িত। এজন্যই কবিরা এই ঋতুকে সৃজনশীল আত্মার নৈঃশব্দের ভেতর জলপড়ার শব্দে উচ্ছ্বসিত হন। বলা হয়, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। মনে হয় এ শুধু রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি নয়, চিরকালের কবির উচ্চারণ। মনে হয় যে, পৃথিবীর প্রথম শাব্দিক মিলের অন্তিম প্রয়াস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিল কোনো কবিরই মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। এমনকি ছন্দও নয়। তাহলে কবির কাজ হলো কেবল চিত্রকল্প নির্মাণ করা আর তা এ যুগের গদ্য ভাষায় সম্ভবপর হয়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি। এর মানে এ নয় যে, ভাষার ছন্দতরঙ্গ আমাকে আর শিহরিত করে না, অন্তমিল আমাকে রোমাঞ্চিত করে না। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা আমাকে দিয়েছে অন্য এক অনুভবশক্তি—সেটা হলো গদ্যের অনুভব। সোজা কথায় বুদ্ধির আয়নায় নিজের চিন্তার চিত্রকল্প প্রতিফলিত করা। শব্দই যে কবিতা এটা গত শতাব্দীতেই ফরাসি কবিরা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু জাতিগতভাবে ফরাসিরা রঙ ও রেখার অনুগত হওয়ায় তা তাদের শিল্পীর তুলিতেই অধিক স্থায়িত্ব পেয়েছে।

আমি ভাবি শব্দই কবিতা। কিন্তু শব্দের তো সীমাবদ্ধতা আছে। একটা ভাষার একজন কবি কি পরিমাণ মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারে। শব্দই কবিতা। কিন্তু ভাষার রাজত্বে সব শব্দ অর্থসহ কবির অধিগত থাকে না। মাঝে মাঝে বুদ্ধিও কবিতার সহায়ক হয়। কিন্তু বুদ্ধি চিত্রকল্প নির্মাণে খুব একটা সহায়ক নয়। আর কবির মধ্যে অবশিষ্ট থাকে হৃদয়। সম্ভবত হৃদয়ই আধুনিক কবিতার সর্বশেষ উদ্ভাবনভূমি। কারণ যে শব্দ আর একটি চিত্র নির্মাণে সক্ষম নয়, সেখানে হৃদয়ের গোঙানি ফুটিয়ে তোলে এক অদ্ভুদ অসূর্যস্পশ্যা, চিরস্থায়ী অমোচনীয় চিত্রকল্প আমি আমার কবিতাকে এখন এতদূর নিয়ে এসেছি। যদি ভুল হয়ে থাকে তবে তা অসংশোধনীয়। এত যে বৃষ্টি, তাকে সিক্ত করে চলেছে। তাতে এই অমোচনীয় চিত্রকল্পের সামান্য একটা ফোঁটাও বিচলিত বা বিধৌত হয়ে যাচ্ছে না। আমি কোনোদিন কোনো শুদ্ধতম কবির দলভুক্ত হতে চাইনি। এই বৃষ্টিতে এসে বারবার পা পিছলে গেলেও আমি কাদায় শুয়ে পড়ব না। কিন্তু এই কাদাই যে এই মাটিই যে সমস্ত অঙ্কুরোদগমের আদি মাতা তা বিস্মৃত হয় না।

বৃষ্টি একটা খোলস মাত্র। আসল কথা হলো খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসা অঙ্কুরের মুখই হলো কাব্যের প্রেরণা। কোনো আধার বা আধেয় নয় উদ্ভব ও উদ্ভেদই হলো বৃষ্টির সৃজনশীলতার প্রকৃত রহস্য। এই রহস্যের স্রষ্টা হলেন মহান আল্লাহ। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি কাব্য রচনা করি এবং এ কথা জানি প্রতিটি প্রাকৃতিক রহস্যের ভেতরেই আমাকে প্রবেশ করতে হবে এবং পার্থিব প্রতিটি স্তর অতিক্রম করে পৌঁছতে হবে ভাসমান মেঘের ভেতরে।

তাওরাত, ইঞ্জিল ও পবিত্র কুরআনে যেখানেই বর্ষণ ও বৃষ্টির কথা আছে, সেখানেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে পুনরুজ্জীবনের কথা। বলা হয়েছে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করি। এতে বোঝা যায় বৃষ্টির সাথে মৃতের আবার ফিরে আসার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই বোধ কবিদের স্থির থাকতে দেয় না, বৃষ্টির শব্দ শোনামাত্রই চিন্তাশীল প্রাণিদের মধ্যে একটা নীরব সাড়া পড়ে যায়। এর মধ্যে কবিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে বেশি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। চিন্তাটা শুধু স্বপ্নের মধ্যে ভেসে বেড়ানো নয়। অভিজ্ঞতার আধারে একের পর এক চিত্রকল্প নির্মিত হতে থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি ছন্দ বা মিল নয়, আমার কালের কাব্যের প্রধান শক্তিই হলো চিত্রকল্প নির্মাণ।

বৃষ্টির আকাশ যেহেতু কবিকে অলস এবং অদ ম্য কল্পনার মধ্যে চিন্তা করতে বাধ্য করে সে কারণে বৃষ্টির একটা অসাধারণ ভূমিকা কবিমাত্রই অনুভব করেন।

ঝরে পড়ার ঋতু

সম্ভবত শীত শব্দটি আরবি শব্দ। পবিত্র কোরআনে সূরা কোরাইশে এ শব্দটি ব্যবহার দেখা যায়। 'রিহলাতাশ শিতায়ী ওয়াস সাঈফ'। শীত ঋতু মূলত প্রকৃতিকে অনাবৃত করে। প্রকৃতির সবুজ আবরণ খসে পড়ে। হলুদ হয়ে পাতা ঝরে যায়, বৃক্ষরাজী নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রকৃতির অনাবরণ তখন এমন বিমর্ষতা নিয়ে শিল্পী মানুষের কাছে, বিশেষ করে কবিদের কাছে ধরা পড়ে, কবি ভাবেন শীত সবকিছু ঝরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমি কেবল আবৃত থাকার জন্য পশমের পোশাকে নিজকে ঢেকে নিতে তৎপর। সবই যখন নগ্ন তখন কেবল মানুষই শীত ঋতুতে নিজেকে আবৃত করতে ব্যস্ত। উত্তরের সূচ ফোটানো হাওয়া থেকে কেবল মানুষই বাঁচতে চায়। প্রকৃতি শীতের মহিমা বুঝতে পারে। কারণ প্রকৃতি জানে শীত ঋতু হলো আসলে ছদ্মবেশী বসন্ত। কিছুদিন পরেই হাওয়া, গতি এলোমেলো হয়ে গেলে গাছগুলো নতুন পত্র-পল্লবের কুঁড়ি মেলে দেবে। শীত মৃত্যুর ঋতু—সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃতির তো মৃত্যু হয় না। সে আবার বসন্তে ডালপালা মেলে দেয়। কিন্তু মানুষ অর্থাৎ কবি জানে যে তার মৃত্যু হলে সে আর আসবে না। মানুষের প্রকৃতপক্ষে কোনো পুনর্জন্ম নেই, মানুষ বলতে সামগ্রিক অর্থে আমি প্রাণি জগতকেও বোঝাতে চেয়েছি। কবির আর ফিরে আসা নেই।

সম্ভবত এ কারণেই মানুষ জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব হিসেবে অন্যপ্রাণিদের এবং প্রকৃতির থেকে ছেঁকে নেওয়া পোশাকে ও পশমে নিজেকে আবৃত করে বাঁচে।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে জার্মান ভাষার কবি রাইনের মারিয়া রিলকের শীতে ঝরে পড়া পরিবেশের ওপর রচিত একটি কবিতা স্বভাবতই মনে পড়ে। যেখানে কবি বলেছেন, 'পাতা ঝরে পাতা ঝরে, ঝরে যায় যেন দূর থেকে দূরতম প্রান্তের কানন।'

তারার শৃঙ্খল ছিঁড়ে পৃথিবীর ভার ঝরে যায় নিঃসঙ্গ আঁধারে। এই নিরন্তর ঝরে পড়ার ঋতুতে শুধু মানুষই স্বার্থপর। সেই শুধু ধরে রাখতে চায়। সে বোঝে না যে, ঝরে যাওয়া ফুল আর বোঁটায় ফেরে না। প্রেমেরও শীত আছে। সেও ঝরে পড়ে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋতু শুধু মৃত্যুকে উন্মোচন করে—মৃত্যুও যে স্রষ্টার অনুগ্রহ, মৃত্যুও যে সুন্দর, মৃত্যুও যে কারও না কারও জন্যে জায়গা খালি করে দেয়া, এটা যে বুঝতে পারে না, সেই স্বার্থপর মানুষের নাম হলো কবি। শুধু কবিই মৃত্যু চায় না। সে শুধু আবরণ চায়, পশমে, চামড়ায় কার্পাসে। ঢেকে রাখা। কার মুখ ঢেকে রাখা? নগ্নতা কি? মূলত সত্য।

শীত হলো আসলে তো ছদ্মবেশী বসন্ত।

কোকিল ডাকছে, কিন্তু বসন্তের প্রথম কোকিল গলাটা ঠিকমতো খুলছে না, ভাঙাগলা। সদ্যতরুণ কবির মতো, কুহু উচ্চারণ করতে গিয়ে নানা বিকৃত শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে তরুণ কোকিলের বসন্তের আবহ। কুহু শব্দটা হয়ে যাচ্ছে, কি, কি, কি, না কিছু না। কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে যাক। কুয়াশায় আবৃত থাকলে প্রকৃতির অনাবরণকে এমনকি স্বার্থপর কবিও দেখতে পায় না।

যতদূর মনে করতে পারি, আমার সব বয়োবৃদ্ধ পূর্বপুরুষগণের মৃত্যু ঘটেছিল শীত ঋতুতেই। এখনও কারও কারও মুখের আদল আমি স্মরণ করতে পারি। ভাঙা চোয়াল, রেখাঙ্কিত মুখ, পেকে যাওয়া ভ্রূ, সাদা চুল কিংবা বিশাল টাক আমার স্মৃতির ওপর ছায়া ফেলে। তারা যৌবনে ছিলেন গ্রীষ্মের উপাসক। তাদের যৌবন ছিল ঘর্মাক্ত। কিন্তু শীত এলেই তারা শুধু আবৃত হওয়ার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর চাইতেন সতেজ খাদ্য। মাছ, তরিতরকারি, লাউ, কুমড়ো—এসবের অফুরন্ত ভাণ্ডার দেখে তাদের মুখে প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে পড়ত। আসলে শীতে তারা একটু মুহ্যমান হলেও নিজেদের যৌবনকে সতেজ ও আরামদায়ক অবস্থায় রাখারই চেষ্টা করতেন। বসন্তের আগমনে তাদের সব ছদ্মবেশ খুলে পড়ত। তারা যেহেতু গ্রীষ্ম মণ্ডলে জন্মেছিলেন, সে কারণে কড়া রৌদ্র ও দেশীয় তামাকের গুণগানে পঞ্চমুখ থাকতেন। শীত তাদের কাছে বেদনা এবং মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসত না। শীতে তাদের মধ্যে সহজে কোনো সৃজনশীলতার উদ্বোধন আমি দেখতে পাইনি। শীতে তারা গুটিয়ে যেতেন। হয়তো আজকের মতো শীত থেকে আত্মরক্ষার উপায়-উপকরণ তাদের মধ্যে তেমন ছিল না।

আমার দাদা একজন কবি ছিলেন। তিনি জারি গান লিখতেন এবং তৎকালীন বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর বংশ লতিকা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতেন। তার তৈরি কুরশিনামার ওপর অনেকেরই আস্থা ছিল। তার মৃত্যু অত্যন্ত করুণভাবে হয়েছিল। তিনি পঙ্গু ও অচল হয়ে একটা চেয়ারে সারা দিনমান বসে থাকতেন। কোনো এক শীতের সকালে তিনি এ চেয়ার থেকে ঘরের চৌকাঠের ওপর পড়ে আহত হয়ে মারা যান। তার করুণ মৃত্যু আমাকে খুব ব্যথিত করেছিল। যেহেতু এই বেদনা তীব্র শীত ঋতুতেই আমার হৃদয়ে বিধাতা অংকন করে দিয়েছিলেন, সে কারণে আমি শীতকে সব সময় মৃত্যুর ঋতু হিসেবে বিবেচনা করে এসেছি। আমার নিজের জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সুখস্মৃতি নেই। আমি দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলাম এবং সারা জীবন কষ্টের মধ্যেই কাটিয়েছি। তবু সুখের কথা ভাবতে গেলে শুধু একটা কথাই মনে পড়ে, সেটা হলো—সারা জীবন আমি যখনই সামান্যতম অবকাশ বা অবসর পেয়েছি সেটা বই পড়ে কাটিয়েছি। পড়াটাই ছিল আমার আনন্দানুভূতির উজ্জ্বল উদাহরণ। যখনই সুখের কথা ভাবি তখনই দেখতে পাই শীতকালে গায়ে লেপ বা কম্বল জড়িয়ে কোনো বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে আছি। আমার স্ত্রী পাশে মৃদু শব্দ তুলে ঘুমাতেন। তিনিও বুঝতেন যে আমার সবচেয়ে আনন্দ হলো এই শীতের রাতে নিঃশব্দে কোনো গ্রন্থের ভেতর ডুবে থাকা। পড়াটা যে শুধু শীতকালেই হতো এমন নয়। কিন্তু পড়ার কথা ভাবলে অর্থাৎ অধ্যয়ন শব্দটি উচ্চারণ করলেই শীতের রাত এসে আমার সুখস্মৃতিকে জড়িয়ে রাখে।

হয়তো খুঁজলে দেখা যাবে আমার শ্রেষ্ঠ রচনা আমি শীতকালেই লিখেছিলাম। আমি অবশ্য এসব খুঁজে দেখতে চাই না। আমি নিজেই যেহেতু মনে করি শীত হলো স্থবির ও স্থানু থাকার ঋতু, সে কারণে পাশাপাশি কবির সৃষ্টিশীলতার কথা, উদ্যম, উৎসাহ ও উদ্‌গমের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে। কবির কাজ হলো শীতের বিছানায় বসে তার নিজের ভাষার সম্ভবপর সবগুলো মিল বাজিয়ে দেখা। অনেকটা জলতরঙ্গের মতো।

শীত এলেই আমার স্ত্রী তার অতীত গ্রাম্য স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালোবাসেন। তার কথা ও আক্ষেপগুলো আমি ধৈর্যসহকারে শুনে যাই। কারণ তার বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষী আমি ছাড়া এ জগতে আর কেউ বেঁচে নেই। তিনি তার গ্রামের সামনের এক বিশাল বিল বা জলাভূমিকে আমার কাছে মেলে ধরেন। বলতে থাকেন, বিশাল বিশাল কালি বোয়ালের কথা। লাল বুকওয়ালা টক মাছ ও হাতের পাতার মতো বড় ভেদা মাছ অর্থাৎ মেনি মাছের কথা। শেষে এসব আজকাল আর বাংলাদেশের সুলভ না হওয়ার কথা। আমি তাকে সান্ত্বনা না দিয়ে বরং উসকিয়ে দিই। ভাবি, বলুক না, এসব সুখাদ্য তো আর ফিরে আসবে না। শুধু আক্ষেপে যদি আলজিভ পানি সিক্ত হয়ে থাকে তবে মন্দ কি! এভাবেই এখন আমাদের এই মৃত্যুর ঋতু অতিক্রম করে যেতে হবে।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে, শীত রুচি বর্ধক ঋতু বটে। এ সময় খেতে ইচ্ছে করে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত আহারও শেষ পর্যন্ত সয়ে যায়। প্রকৃতি শীতের সবজিতে গৃহস্থকে ভরিয়ে দেয়। শীত তাকে বিনাশ করতে পারে না তাকে সারা বছরের জন্য তাজা ঝলমলে প্রাণ প্রাচুর্যে টগবগে করে দিয়ে যায়। শীত শুধু বার্ধক্যকে নিরুৎসাহিত করে। বৃদ্ধেরা এই ঋতুর আগমনে শংকিত থাকে। আমার মতো বৃদ্ধ কবি হলে তো কথাই নেই। হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। উদ্যমহীন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোড়নহীন, উপমাহীন অথর্বের মতো।

আবার রিলকের সেই কবিতা–

এই হাত তাও ঝরে পড়ে
আরও থাকে এক হাত–
তার ফাঁকে কিছুই ঝরে না।

শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন : কিছু স্মৃতি কিছু কথা

এমন একটা সময় ছিল, যখন দৈনিক ইত্তেফাকে সাংবাদিক জীবন শুরু করা ছিল কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করার মতো। ইত্তেফাক ছিল সবকিছুর ওপর অন্ততঃ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। দেশ ভাগের আগে যেমন ছিল বাঙালি মুসলমানদের জন্য দৈনিক আজাদ, তেমনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্পকাল থেকেই ইত্তেফাক ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বস্ত এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠান। একটা কথা প্রায় প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল যে ইত্তেফাক মিথ্যে বলে না, ইত্তেফাকে কিছু ছাপা হলে বলা হতো এ কথা ইত্তেফাক বলেছে। আমি আমার সাংবাদিক জীবনে দৈনিক ইত্তেফাকে যখন ঠাঁই করে নিই সে সময়টা প্রকৃতপক্ষে ইত্তেফাকের সবচেয়ে গৌরবজনক সময়। অন্যদিকে দুর্ভাগ্যেরও সময়। কারণ ইত্তেফাককে তখন পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছিল। হুমকি ছিল পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার।

ইত্তেফাককে এই পর্যায়ে যিনি উপনীত করেছিলেন তিনি পত্রিকার নিউজ এডিটর শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন। সংবাদপত্রের জগতে তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন। তিনি ইত্তেফাককে সংবাদ পরিবেশনের দিক দিয়ে এমন এক জায়গায় উপনীত করতে পেরেছিলেন, যা বিশ্বের যে কোনো আধুনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে তুলনীয়। বাংলাদেশের সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে ইত্তেফাককে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা হতো। সংবাদপত্রের ন্যায়নিষ্ঠতা ইত্তেফাক বেশ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক নিবন্ধের ক্ষেত্রে তখন ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, বলা যায় তাঁর হাতে উপ-সম্পাদকীয়, লেখার একটা স্টাইল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি সংবাদপত্রের উপ-সম্পাদকীয় লেখার একটি নতুন ভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যা একান্তই তাঁর নিজস্ব। তেমনি সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রেও তাঁর মতো কাজ করেছিলেন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন। যেন আধুনিক বাংলা ভাষার সংবাদপত্রে একটি বিশেষ আঙ্গিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি। আমি তখন প্রুফ সেকশন থেকে সদ্য প্রমোশন পেয়ে জুনিয়র সাব এডিটর হিসেবে মফস্বল বিভাগে যোগদান করি। মাথার ওপর ছিলেন মোহাম্মদ তোহা খান। তিনি হাতে-কলমে আমাকে সম্পাদনা কীভাবে করতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তবে তিনি বেশি দিন ইত্তেফাকে ছিলেন না, বার্তা সম্পাদক সিরাজ ভাই যার জন্য ওই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

আমি তখন কৈশোর অতিক্রান্ত সদ্য যুবক। কবিতা, গল্প লেখার দিকে আমার ঝোঁক বেশি। আমি ওই বিভাগের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করলেও ইত্তেফাকে মফস্বল বিভাগের গুরুত্ব কতখানি তা ঠিকমতো বুঝতে শিখিনি। কী ভেবে যে সিরাজ ভাই আমাকেই ওই বিভাগের কাজ-কর্ম করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা ভাবলে আজও বিস্মিত হই। এখন মনে হয় আমার কাব্য প্রতিভার চেয়ে আমার গদ্যশক্তি তাকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। আমি মফস্বল সংবাদ সম্পাদনা করে সরাসরি তার কাছে পেশ করতে সাহসী ছিলাম না। সবার মতো আমিও সিরাজুদ্দীন হোসেনকে সমীহ করার চেয়ে ভয় পেতাম বেশি। তিনি ক্রুটিপূর্ণ রিপোর্টিং ও অনুবাদ একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। সে যাই হোক, সিনিয়র বা জুনিয়রের তিনি ত্বরিত একটি সংবাদের ভুলভ্রান্তি নির্দেশ করতে পারতেন। প্রায়ই দেখেছি রিপোর্টটি তার মনমতো না হলে তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। মুখের দিকে তাকাতেন না। সিনিয়র কেউ হলে সংবাদটি সংশোধন করে আবার আনতে বলতেন বা নিজেই নতুন করে লিখে দিতেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি যে কঠোর ও অনমনীয় ছিলেন তাও নয়। তাঁর স্বহৃদয়তার অনন্য দৃষ্টান্ত আমি চোখের সামনে অনেক দেখেছি। তার সময়ে ইত্তেফাক, ইত্তেফাকের বিভাগগুলো অত্যন্ত সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও নির্ভরতার মধ্যে কাজ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তখনকার সময় ইত্তেফাকের বার্তা বিভাগে ঢুকলে মনে হতো এটা শুধু নিঃশব্দে কাজ করার জায়গা। ভিড় লেগেই থাকত, তবু ইত্তেফাক থেকে কেউ একেবারে খালি হাতে ফিরত না। ইত্তেফাক সব সময় ব্যক্তিবিশেষের অভিযোগ এবং বেদনাকে আলাদাভাবে বিবেচনা করার শক্তি অর্জন করেছিল। মোট কথা ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠানটিতে ইনসাফ ছিল। সহানুভূতির দৃষ্টি ছিল। আর এ ভালো দিকগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। তাঁর দৃষ্টিতে একটা তন্ময়তা থাকলেও প্রতিটি বিষয় তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন। এটা ছিল সাংবাদিক হিসেবে তাঁর একটা সহজাত গুণ। তাঁর সহযোগী যাঁরা ছিলেন, যেমন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, আসফ-উদ-দৌলা রেজা, খন্দকার আবু তালেব, তোহা খান, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, বজলুর রহমান প্রমুখ। এরা সবাই সংবাদপত্রের জগতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে ও পরে নানাভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কেউ কেউ অন্য পত্রিকায় সম্পাদকও হয়েছেন। এমনকি আমার মতো সামান্য মানুষ ইত্তেফাকের সংবাদ চর্চার যোগ্যতা নিয়েই গণকণ্ঠের সম্পাদনায় হাত দিতে পেরেছিলাম। যা কিছু শিখেছি আজ অকপটে স্বীকার করি, তার সবটুকুই সিরাজুদ্দীন হোসেনের কাছে পাওয়া। এখনো মনে আছে, তিনি বানানের ব্যাপারে কতটা সচেতন ছিলেন। হেসে বলতেন, কী এত গল্প কবিতা লিখিস, এক সময় প্রুফ সেকশনেও ছিলি কিন্তু বানানটা এখনো হজম করতে পারছিস না। মৃদু হাসতেন।

একবার একটা ঘটনা আমি কোনোদিন ভুলব না। আমি সারাদিন খেটে একটা কৌতূহলোদ্দীপক মফস্বল সংবাদের সূত্রে একটি স্টোরি তৈরি করি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল, এই খবরটা প্রথম পাতায় সিঙ্গেল কলামে যেতে পারে। যে ভাবা সে মতো কাজ। আমি প্রথম পৃষ্ঠায় রিপোর্টটা দেওয়ার জন্য একটা সাজেশন দিয়ে পেইজ মার্ক করে বার্তা বিভাগে পাঠিয়ে দিই। আমি মহা খুশিতে কাজ শেষ করে একটা সিগারেটও ধরিয়ে টানতে লাগলাম। মনে মনে খুশির ভাব। তখনো নিউজ এডিটর সিরাজ ভাই অফিসে এসে পৌঁছাননি। কিছুক্ষণ পরই সারা অফিসে একটা সতর্ক বা সচেতনতা সৃষ্টি হতে থাকে, যা কেবল সিরাজ ভাই বা মানিক ভাই অফিসে প্রবেশ করলে সচরাচর সৃষ্টি হতো। বুঝলাম সিরাজ ভাই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন। আমি দ্রুত সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললাম। দেখলাম বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন তাঁর আসনে গিয়ে বসেছেন। আমার মধ্যে স্বভাবতই একটা খুশি ভাব। কারণ সারা দিন খেটে আমি একটা দুর্দান্ত স্টোরি তৈরি করেছি! আমার ওই আত্মতৃপ্তির ভাবটা বেশিক্ষণ উপভোগ করা গেল না। সিরাজ ভাইয়ের পিয়ন এসে বলল, যান আপনাকে স্যার ডেকেছেন। আমি মোটামুটি আমার উৎফুল্ল ভাবটা চেপে নিউজ এডিটরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি একবার মাত্র চোখ তুলে আমাকে দেখলেন। তারপর আমার রিপোর্টটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, এসব কী লিখেছিস, আবার ঠিক করে আন। এটা কিচ্ছু হয়নি। এ কথায় আমি একেবারে পাথর হয়ে যাই। স্টোরিটা হাতে নিয়ে হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। সিরাজ ভাই আবার আমার দিকে তাকালেন—দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ডেস্কে গিয়ে দেখ। বললাম তো এটা কিছু হয়নি।

আমি এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেলাম। এতটা স্তম্ভিতই হয়েছি যে, আমার পা আর চলছে না। আমি ডেস্কে গিয়ে উপুড় হয়ে বসে পড়লাম। আমার স্টোরিটা বারবার পড়লাম। বিষয়টা ছিল উত্তরবঙ্গে বাঙালি মেয়েরা অভাবের তাড়নায় তাদের চুল বিক্রি করে দিচ্ছে—এর ওপর। আমি স্টোরিটা সাজিয়েছিলাম বাঙালি নারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেশে যত প্রশংসা যেখানে আছে তা উল্লেখ করে। এমনকি প্রাচীনকালে কাশ্মীরি কবি ক্ষেমেন্দ্রনাথের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থের যেখানে বাঙালি নারীর কেশে অকপট প্রশংসা আছে তাও উল্লেখ করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল, সিরাজ ভাই আমার স্টোরিতে অভিভূত হবেন। কিন্তু এখন আমি একেবারে হতাশ হয়ে টেবিলে বসলাম। এভাবে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। সহসা দেখি সিরাজ ভাইয়ের পিয়ন আমার দরজায় দাঁড়ানো। যান, স্যার আবার ডেকেছেন। রিপোর্টটা নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি রিপোর্টটা নিয়ে ত্রস্ত পদে তার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়েই বললেন, আমার পাশে আয়। আমি ভয়ে ভয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভয় হচ্ছিল গায়ে হাত তুলবেন না তো! কিন্তু তিনি মৃদু হেসে আমার হাত থেকে রিপোর্টটা নিলেন। নিয়ে মৃদু হেসে রিপোর্টটার সামনের দিকের ডেটলাইনটা কেটে দিলেন এবং রিপোর্টের শেষ দু'টি পৃষ্ঠা পেছন থেকে ছিঁড়ে সামনে এনে পিন লাগিয়ে দিলেন এবং প্যারায় ডেটলাইন বসালেন। বসিয়ে দিয়ে আমার হাতে তুলে দিলেন এবং নির্দেশ করলেন তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে। আমি সেখানে বসামাত্র তিনি বললেন, রিপোর্টটা এখন পড়ে দেখ। আমি পড়তে শুরু করলাম। নিঃশব্দে পুরো রিপোর্টটা আবার পড়ে গেলাম। মনে হলো আমার স্টোরিটার চরিত্রই বদলে গেছে। মনে হলো আমি এক অসাধারণ জাদু-মন্ত্র বলে তৈরি একটি রিপোর্ট লিখে সাজিয়েছি। আমি অবাক বিস্ময়ে সিরাজ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, সত্যি তিনি অসাধারণ। আমাদের শিক্ষক। বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে প্রকৃত প্রতিষ্ঠান। পরের দিন আমার সংবাদটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডবল কলামে ছাপা হয় এবং বিশ্বের সংবাদ মিডিয়াগুলো ইত্তেফাককে কোট করে আমার এই ক্ষুদ্র রিপোর্টটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। এই ছিলেন আমাদের শিক্ষক সিরাজুদ্দীন হোসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে গুটিকয় সাংবাদিকের কলমের দ্বারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন তাদের অন্যতম পুরোধা। এ জন্য তাঁকে হানাদারদের হাতেই জীবন দিতে হয়েছে। এ মহান ব্যক্তির কথা বিস্মৃত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

জার্মান কবি ও ঔপন্যাসিক গুনটার গ্রাসের ঢাকা সফর

প্রখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক ও কবি গুনটার গ্রাস সম্প্রতি ঢাকায় এসেছেন। তিনি মূলত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বেশ কিছুকাল যাবত কলকাতায় বসবাস করছেন। সম্প্রতি কলকাতায়ও তাঁর ভালো লাগছে না কিম্বা সেখানে যা জানার ছিল তা সম্ভবত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানা হয়ে যাওয়ায় প্রবাসযাপন সংক্ষেপ করে তিনি অস্ট্রেলিয়া হয়ে ইউরোপ ফিরবেন। এর আগে কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এসেছেন। ঢাকা আসা মানে বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিক এবং এদেশের জনসমাজকেও একটু ছুঁয়ে যাওয়া।

গুনটার গ্রাসের ঢাকা আগমনের সংবাদে এখানকার কবির দলে সাড়া পড়ে গেছে। তারা আগ বাড়িয়ে এই মহান লেখককে স্বাগত জানাতে ব্যাকুল। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ আগাম তাঁর কবিতা অনুবাদ করে নিজেদের সবজান্তা ভাবটি জাহির করেছেন। কেউ তাঁর সাথে একটু মোলাকাতের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক কেন্দ্রে অবলীলায় ডাকাডাকির তোয়াক্কা না করেই হাজির হয়েছেন। সন্দেহ নেই এতে আমাদের হত দরিদ্র দেশের প্রাণচাঞ্চল্যটা বোঝা যায়। লেখক বুদ্ধিজীবীদের এই উদ্দীপন দেখে আমরাও উৎসাহ বোধ না করে পারছি না। আমরাও এই প্রতিবাদী জার্মান লেখক—যিনি যে কোনো অবস্থাতেই গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, স্বাগত জানাই।

যদিও আমরা মি. গ্রাসের বিশ্বজোড়া খ্যাতির কারণ যে প্রতিবাদী সাহিত্য সে সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবহিত নই, তবুও ছিটেফোটা যেটুকু অনুবাদ আমাদের ভাগ্যে জুটেছে এতেই তাঁর প্রতিভার এবং সাহসের প্রশংসা করি। আজ থেকে এক দশক আগে তার নির্বাচিত কবিতার একটি চটি বই ইংরেজি অনুবাদ আমাদের হস্তগত হয়েছিল। অনুবাদ যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে মানতেই হবে তাঁর রচনা শুধু চমক সৃষ্টি করেই শেষ হয়ে যাবার বিষয় নয়। যদিও আহার্য ও যৌনতার প্রতি অন্যান্য ইউরোপীয় কবির মতোই তাঁর উৎসাহ প্রবল। তবুও যে সব বিষয়বস্তু মানবিক আবেগকে আপ্লুত করে কবি গুনটার গ্রাসের কবিতায় তা এক ধরনের অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়েই উপস্থিত। কবিতায় অবশ্যই তিনি প্রতিবাদের চেয়ে খাদ্য ও যৌনতারই মূল্য দিয়েছেন একটু অধিক পরিমাণে। তবে তাঁর টিন ড্রাম বা অন্যান্য আত্মকথনমূলক উপন্যাসে যে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে তার ধরন-ধারণ ও সমস্যা-সংঘাত সবটাই ইউরোপীয় মানসের আর্তি। এশিয়া বা আফ্রিকার মানুষ এর সাথে পরিচিত থাকলেও একাত্ম নয়। তাঁর সাহিত্যিক সমস্যা মূলত দ্বিধাবিভক্ত জার্মানিরই সমস্যা। আমরা এসব বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন না হলেও, সবটা বুঝতে অক্ষম। আমাদের সমস্যা হলো এশিয়ার অতি দরিদ্র দেশের সমস্যা। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ ও কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ আমাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। এই সাঁড়াশী আক্রমণে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা, বাক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় শান্তিকে ইতিমধ্যেই হারিয়েছি। ভূমির যে সার্বভৌমত্বটুকু আছে, সেটা বজায় আছে শুধু জনসংখ্যার বিপুলতা ও অসহনীয় দারিদ্র্যের কারণে। বাংলাদেশ যদি কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পদশালী দেশ হতো—সম্ভবত সে তার এই স্বাধীনতাটুকুও বজায় রাখতে পারত না। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে দারিদ্র্যও একটা জাতির আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ হয়। আমাদের দারিদ্র্যই আমাদের শত্রুদের ঠেকিয়ে রেখেছে। যেমন উভয় জার্মানিই অত্যন্ত সম্পদশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও জাতিগত সার্বভৌমত্বকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। কোনো না কোনো অছিলায় উভয় জার্মানিতেই বিদেশি সৈন্য ও ঘাঁটি আছে এবং আরেকটি মহাযুদ্ধ উদযাপন না করে অবস্থার কোনো হেরফের করা সম্ভবপর নয়।

অখণ্ড জার্মানি যদি বাংলাদেশের মতো কোনো দরিদ্র দেশ হতো, আর তার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ যুদ্ধও সংঘটিত হতো এবং উত্থান পতন ঘটতো হিটলার, নাৎসিবাদ ইত্যাদির তা সে তার স্বাধীনতা হারাতো বলে মনে হয় না। দারিদ্র্যই জার্মানি গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হতো। তার মানে এ নয় যে আমরা বাংলাদেশের জন্য একটা জগদ্দল দারিদ্র্যই কামনা করছি। আমরাও সম্পদশালী হতে চাই। তার আগে চাই পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের হুমকি থেকে দেশের সার্বিক মুক্তি। আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকেই এই পারমাণবিক যুগে একমাত্র জীবনাদর্শ হিসেবে ঘোষণা করতে চাই। আমরা মনে করি, ইসলাম ছাড়া বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য আধুনিকতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আর কোনো দলিল নেই। এতদিন পাশ্চাত্য জগত যে ধরনের গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিধান দিয়ে এসেছে সবই বাতিল। মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি হিসেবে যা কিছু মানবরচিত সবই পচা এবং দুর্গন্ধময়।

বাংলা একাডেমির বক্তৃতায় মি. গ্রাস তাঁর জীবনদর্শনের মূলকথাগুলো উচ্চারণ করেছেন। যদিও মাত্র আধঘণ্টার বক্তৃতায় তাঁর মতো বিশ্বখ্যাত লেখকের সব অভিজ্ঞতার বয়ান দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও লেখকের স্বাধীনতার কথা বলতে তিনি দ্বিধান্বিত হননি। কি ধরনের গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রকৃত শিল্পীরা কাজ করতে পারেন, তা তিনি খোলাখুলি বলেছেন। সম্ভবত বাংলাদেশে যে সে পরিস্থিতি নেই, এটা আন্দাজ করেই বিজ্ঞ লেখক সব ধরনের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার বক্তব্য রেখেছেন। আমরা গুনটার গ্রাসের সাথে এ ব্যাপারে একমত। তবে লেখকরা যাজকতার মতো কোনো বিশ্বাস নির্মাণ বা প্রত্যাশার স্বপ্ন রচনা করবেন না, এ তত্ত্বটি বুঝতে পারলাম না।

অবশ্য ইউরোপীয় মানসে যাজকরা সব সময়ই একটা ভয়াবহ রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। মধ্যযুগে ইউরোপীয় যাজকগণ চার্চের অবৈজ্ঞানিক বাড়াবাড়িতে জনগণের জীবনকে এমন অতিষ্ঠ করে ফেলেছিলেন, বাধ্য হয়ে আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপীয় মানস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বাড়াবাড়ির বিরোধিতা করতে গিয়ে ধর্মকেই জীবনযাপনের স্বাভাবিক ক্ষেত্র থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে প্রথমে যুক্তিবাদ পরে নাস্তিকতাকে ব্যক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করে আনে। মি. গ্রাসের বক্তব্য শুনে মনে হয়, এই জের এখনও কাটেনি। এর একটা ক্ষোভ আধুনিক ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে যেমন আছে, তেমনি ছিল তাঁদের প্রাচীন লেখকদের মনেও।

কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকার ন্যায়ানুগ, সাম্য ও সুবিচারপূর্ণ জীবন দর্শনের উদ্যেক্তা হলেন মুসলমানরা। তারাই প্রথম বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করে শিল্প-সংস্কৃতির একটা নব্য দর্শন প্রচার করেন। ফলে আরবের বিপুল জীবনবাদী সাহিত্যকীর্তি ছাড়াও অনারব লেখকগণ যেমন মওলানা রুমী, সাদী, হাফিজ ও খৈয়ামের মতো বিশ্বকবিগণের আবির্ভাব সম্ভব হয়। এরা যে শুধু কবিই ছিলেন এমন নয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ যাজকদেরতুল্য জীবনযাপন, আবার কেউ বিজ্ঞানের সেবা করতে অধিক উৎসাহী ছিলেন।

আমরা অবশ্য বলি না, একজন কবি ধর্ম প্রচারকেই কবিতার বাহন করে তুলুন। তবে একজন কবি ধর্মকে পরিহার করে শুধু মানুষের মঙ্গল কামনা ও স্বাধীনতার সপক্ষে দাঁড়ালে শয়তানই তার সাহায্যকারীর ভূমিকা নিতে পারে বলে আমাদের আশঙ্কা। কারণ যেখানে অত্যাচারিত ও অত্যাচারীর মাথার ওপর কোনো আল্লাহ্ নেই, সেখানে একজন কবি বেচারার কি আর করণীয় থাকে? তার পাইপে আগুন দেয়ার জন্য তখন শয়তানই হয় উত্তম সঙ্গী।

আসলে নাস্তিক্যবাদের মধ্যেই ইউরোপীয় লেখকগণ মানবমঙ্গল একটি ধ্যানধারণা গড়ে তুলতে বহুকাল যাবত প্রয়াসী। কিন্তু এ ধারণা প্রকৃতপক্ষে কোনো শান্তির সপক্ষচারী নয়। যদি হতো তবে তা গুনটার গ্রাসের প্রজন্মের লেখকগণই গড়ে তুলতে সক্ষম হতেন। আমরা স্বীকার করি, ঐ প্রজন্মের লেখক-কবিগণ অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন এবং আমাদের সম্মানিত অতিথি মি. গ্রাসও অসাধারণ প্রতিভা ও সাহসের অধিকারী।

বেশ কিছুকাল যাবতই মি. গ্রাস ভ্রাম্যমাণ লেখকের অস্বস্তিকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাঁর দেশ পশ্চিম জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের বর্তমান সরকারের সাথেও তাঁর ঠিকমত বনিবনা হচ্ছে বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় তিনি বেরিয়ে পড়েছেন বিশ্বের পথে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য।

আমাদের মনে হয়, কলকাতাতেও তাঁর প্রবাসযাপন তাঁকে আকাঙ্ক্ষিত স্বস্তি দেয়নি। মানুষের দুর্দশার চরম অবস্থা তিনি নিশ্চয়ই সেখানেও দেখতে পেয়েছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছুকাল যাবত একটি মার্কসিস্ট সরকার প্রশাসন পরিচালনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। গণতন্ত্রের কথা কিংবা বাক-স্বাধীনতার কথা বললে তা ভারতের বাইরে এশিয়া আফ্রিকায় আর কোথায় পাওয়া যাবে?

আসলে একজন প্রকৃত কবির জন্য মানসিক শান্তির কোনো ক্ষেত্র বা দ্বীপদেশ পৃথিবীর কোথাও আর অবশিষ্ট নেই। একজন লেখক শুধু প্রতিবাদই জানাতে পারেন। অরণ্যে কেউ রোদন করলে সে কান্না শ্রবণকারী নেই বলেই সম্ভবত রোদনকারীর নিজের কানেই নিজের বিলাপকে অত্যন্ত কারণ মনে হয়।

মি. গুনটার গ্রাস পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। ভবিষ্যতে আরও বহুদেশ ভ্রমণ করবেন। আমরা মনে করি, তার প্রতিবাদের কণ্ঠ সকল মানুষের জন্যই উদ্বেলিত ও অকুণ্ঠ হওয়া উচিত। কারণ প্রকৃতই তিনি একজন মানবদরদী বলে আমরা মনে করি। বর্তমানে মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার যেখানে প্রবল যেমন ইসরাইল দ্বারা নিষ্পিষ্ট মধ্যপ্রাচ্য, হানাদার রুশদের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আফগানিস্তান ও লেবাননের উদ্বাস্তু শিবিরে উদ্বিগ্ন ফিলিস্তিনীরা কি আর কবিমনকে আকুল করে না?

তাঁর বাংলাদেশ ভ্রমণ কিভাবে পরিকল্পিত হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। সম্ভবত একদল তরুণ কবির উৎসাহ দেখে তিনি পুলকিত হয়েছেন। এই পুলক যে কোনো ইউরোপীয় লেখক ঢাকায় পা রাখলেই এদের বুকে সঞ্চারিত হয়। এরা ইউরোপীয় লেখকদেরই মানস সন্তান। এদের মধ্যে আপনি যা খোঁজেন, এশীয় আনন্দ বেদনার উপলব্ধি তা পাবেন না। এরা এমনকি প্রতিবেশী বার্মিজ লেখকদের সম্পর্কেও কিছু জানে না। জানে না, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষার লেখকদের নাম পর্যন্ত। শুধু ভাষার ঐক্যের জন্যেই এরা পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখা পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা যদি ওড়িয়া হতো তবে এরা এদের লেখাও ছুঁয়ে দেখত না। আর আপনার সম্বন্ধে উৎসাহ আপনি ইউরোপীয় বলে, বড় মানবতাবাদী লেখক বলে নয়। আপনি নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গেও এই মানসিকতা দেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ আবার আমাদের লেখাও পড়ে না। তাদের পাঠ্য বিষয় হলো ইউরোপ।

যা হোক আমরা বাংলাদেশে মি. গুনটার গ্রাসকে স্বাগত জানাই, এদেশের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক বন্ধনসমূহ একটু লক্ষ্য করার জন্যে। মানুষের কর্মের উৎসাহের সাথে ধর্ম কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা তাঁর মতো অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখকের নিশ্চয়ই নজর এড়াবে না। এখানেও প্রতিবাদ ও অন্যায় প্রতিরোধের নিজস্ব ধরন রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরো ইতিহাসটাই গড়ে উঠেছে মানুষের এই বিপুল আধ্যাত্মিক উদ্যম বাদ দিয়ে। যা প্রকৃতপক্ষে মাঝে মধ্যে সামাজিক উত্তেজনার সময় এক একটি শূন্য প্রসব করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানকার লেখক কবিরাও এই প্রগতিপন্থিদেরই খপ্পরে পড়েছে। জনগণের অভ্যেসগুলোর কোনো চিহ্ন নেই আমাদের লেখকদের রচনায়। ধর্মের উল্লেখ মাত্রই এখানে প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম বলে অগ্রাহ্য হয়। অথচ জনগণ ধর্ম ছাড়া জীবনের অন্যবিধ প্রগতিকে সামান্যতম মূল্যও দেয় না। এই পরিস্থিতিতে একথা কি বলা যায় যাজকবৃত্তি লেখকের কাজ নয়? আমাদের তো মনে হয় এশিয়ার যে কোনো দেশে একজন প্রকৃত লেখকের প্রধান দায়িত্ব হলো তার সমস্ত প্রতিবাদকে ধর্মের দ্বারা ধারালো করে তোলা। মিঃ গ্রাস নাকি মনে করে থাকেন পৃথিবীতে খাদ্য ও যৌনতাই অনবদ্য। আমরা মুসলমানরা এর সাথে আর একটা বিষয় শুধু যুক্ত করতে চাই। বিষয়টা হলো আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা খাদ্য, প্রেম ও প্রার্থনা।

তমিজ উদ্‌দীন লোদীর গল্প

আমাদের দেশে সম্প্রতিকালের বিভিন্ন সাময়িকী ও পত্রপত্রিকার সাহিত্য পাতায় আমি আমাদের তরুণ কথাশিল্পীদের ছোটগল্পের মধ্যে নতুন স্ফুলিঙ্গ অনুসন্ধান করে বেড়াই। কবিতা যখন আর পড়তে ইচ্ছে করে না তখন কেন জানি মনে হয় গল্পে আগুন জ্বলে উঠবে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের খড়কুটো ও দাহ্য বিষয় আমাকে অবাক করে, ভাবি জ্বলে উঠবে আগুন। কিন্তু সবটা পড়ে ফেলেও অতৃপ্তি বা অস্বস্তি থেকেই যায়। তবু আশা ছেড়ে দেয়া আমার অভ্যেস নয়, আর নয় বলেই সম্প্রতি তমিজ উদ্‌দীন লোদীর বেশ কিছু গল্প আমি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা শুক্রবারের সাময়িকীগুলো থেকে খুঁজে বের করে পড়েছি। পড়েছি অবশ্য একদিনে নয়, মাঝে মধ্যে, অপেক্ষা করে। এই যখন অবস্থা ঠিক সে সময়ই কবি তমিজ উদ্‌দীন লোদীর ছোটগল্পের বই, 'হ্রেষাধ্বনির বাঁকবদল' আমার হাতে এসে পৌছায়। বইটির কয়েকটি গল্প সম্ভবত আমার আগেই পড়া ছিল। এখন আরও কয়েকটি পড়ে আমি একটা শিহরণ অনুভব করছি। তুচ্ছ বিষয়কে তমিজ উদ্‌দীন লোদী গল্প করে তুলেননি। বেশ নির্বাচিত, সুচিন্তিত বিষয় নিয়ে তিনি 'হ্রেষাধ্বনির বাঁকবদল' বইটির গল্পগুলো লিখেছেন। এমনিতে তার কবিতা আমাকে বেশ কিছুকাল আগে থেকেই আকর্ষণ করার ক্ষমতা দেখিয়েছে। তারপর গল্পগুলো পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, তার হাতে ভবিষ্যতে আমাদের ছোটগল্পের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে।

আমাদের এ সময়ের লেখকদের প্রবণতা মূলত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে কেবল ভাষা নির্মাণ করা এবং বক্তব্যকে অর্থাৎ গল্পকে অস্পষ্ট রাখা। এর ব্যতিক্রম যে নেই একথা আমি বলছি না। ব্যতিক্রম তো আমার হাতেই ধরা আছে—লোদীর 'হ্রেষাধ্বনির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁকবদল'। ভাষার মাধুর্য ও কাব্যময়তা এই গল্পকারেরও একটি বড় গুণ কিন্তু তার প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ লেখকের গল্প বলার প্রবণতা আমাকে কমবেশি মুগ্ধ করেছে। কবিরা যদি গল্প বলার ইচ্ছা করেন তবে তা শেষ পর্যন্ত একটা বিষয়কে নিয়েই দানা বেঁধে ওঠে। এই বইটিতে একটি বৃদ্ধ, ক্লান্ত অশ্বের প্রতীকের মাধ্যমে বিশাল ইঙ্গিতময় কাহিনির আভাস তমিজ উদ্‌দীন লোদী আমাদের দিতে চেয়েছেন। পাঠক হিসেবে আমি তাতে পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হলেও 'হ্রেষাধ্বনির বাঁকবদল' গল্পটি চমৎকার। 'অশ্বের নিঃশ্বাস ফেলার দৃশ্যটির বাস্তবতা নিখুঁত এবং মর্মস্পর্শী। মরকুটে ঘোড়াটি যখন গলায় ঢেলে দেয়া মদ্যপানে উত্তেজিত হয়ে দৌড়চ্ছে তখন লেখকের উদ্দেশ্যটি বেশ সার্থকভাবেই আমাদের কাছে প্রতিফলিত হয়েছে। লোদীর ভাষা সহজ ও সরল হলেও মূলত অলংকৃত। আমি মনে করি এটাই এখানকার ছোটগল্পের ভাষা হওয়া যুক্তিযুক্ত। তমিজ উদ্‌দীন লোদী, তিনি যে কবি এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক। গল্প বলতে যেয়ে ভাষার মেদ রাখেননি। শাণিত তরবারির মতো তার গদ্য ভাষা। এই বইটি তার প্রথম বই কিনা জানি না। এটি প্রথম বই হলে বলতে হবে অতিশয় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

গল্প লিখতে হলে কি কি টেকনিক ব্যবহার করতে হবে তা কবিকে ভাবতে হয় না। কবি বলেই তা তিনি জন্ম থেকেই জানেন। কোথায় স্পেস বা প্যারা হবে তা যেমন তার জানা তেমনি গল্পে ইঙ্গিতময় বুনন কৌশলটিও এই লেখক আয়ত্ত করেছেন। এই বইয়ের একটি অসাধারণ গল্পের নাম হলো, 'নির্লিপ্ত অথবা অনুভূতিহীনতার অনুভূতি'। এই গল্পে আমার মনে হয়েছে একটি বিশাল উপন্যাসের পটভূমি লুকিয়ে আছে। লেখক তা সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে একটি ধর্ষণের দৃশ্যকে মর্মান্তিক বাস্তবতার সাথে চলচ্চিত্রের মতো মেলে ধরেছেন। মেয়েটি নিম্নাঙ্গ প্রতিবন্ধী বলে ধর্ষণের কোনো অনুভূতি তাকে স্পর্শ করছিল না। কিন্তু ধর্ষণকারী পুরুষটির সমস্ত পশুত্বের মধ্যে এমন একটা আচরণ ফুটে বেরুচ্ছিল যা ধর্ষিতা মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে দেখছিল। এই জায়গায় পৌঁছে গল্পকার যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা আমার মনে হয়েছে কবিতাময়। যা গল্পটিকে পাশবিক বর্ণনার হাত থেকে মানবিক গল্পে উৎরিয়ে দিয়েছে।

আমাদের দেশের কথাসাহিত্যে প্রকৃত ধারাবাহিকতা এবং লেখকের মানসিকতায় নানা অভিজ্ঞতার বিবর্তন আমরা প্রায় দেখতেই পাই না। অনেক সময় মনে হয় বুঝি একই গল্প বা উপন্যাস এই লেখকের হাতে ফিরে ফিরে আসছে। আবার এমন লেখকও আছে যিনি বিষয়ান্তরে গেলেও ভাষার কোন বাঁকবদল ঘটে না। এক সময় ভাবতাম মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাদি আমাদের লেখকদের মধ্যে দারুণ পরিবর্তন এনে দেবে। এখানেও দেখা গেল আমাদের এতবড় একটি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেও কথাশিল্পীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনারীতিতে তেমন কোনো বিস্ময়কর ধাক্কা লাগল না। আমি এমন উপন্যাসের কথাও জানি যে বইটি পুরোটাই মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা কিন্তু পাঠ করে বিশ্বাসই হতে চায় না এই লেখক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ কারণে সম্ভবত আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প উপন্যাস আমাদের পাঠকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। কেবল টেকনিক বা গদ্যরীতিই সাহিত্য নয়। ঘটনার সম্ববপরতাও বিশ্বাসযোগ্য হতে হয়। এদিকে আকস্মিকভাবে তমিজ উদ্দীন লোদীর 'দহন কিংবা স্মৃতির সূক্ষ্ম সূঁচ'-এর প্রথম অংশটি আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। কারণ এর বিশ্বাসযোগ্যতা আমার নিজেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে। দ্বিতীয় অংশটি কুশলী কথাশিল্পী লোদী না লিখলেও পারতেন। অবশিষ্ট অংশটি প্রবচন মাত্র। আমরা সবাই এসব শুনেছি, পত্রিকায় পড়েছি। এতে ছোটগল্পের কোনো অভিঘাত সৃষ্টি হয় না পাঠকের মনে। এখানে একটা কথা বলে দেয়া ভালো ছোটগল্প সর্বদা কবিতার বিরোধী তাৎপর্যে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তমিজ উদ্দীন লোদী যেহেতু কবি সে কারণেই তার মনে যখন কাব্যবিরোধী উপাদান কবিতার ছদ্মবেশ ধারণ করতে চায় তখন তাকে সর্তক হতে হয়। অন্তত এই গল্পের শেষাংশে আমার তাই মনে হলো। গদ্যের কাজ যে অনাবৃত করা তা কবিকে বুঝতে হবে যদি তিনি প্রতিজ্ঞা করে থাকেন তিনি কথাশিল্পীও হবেন।

তার গল্পগুলোর মধ্যে কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনার যে দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমি বিস্ময়বোধ করেছি। লেখকের সবগুলো গল্পেই নিসর্গচিত্র পরিস্ফুটনের দক্ষতা প্লটকে জীবন্ত করে তুলেছে। বিশেষ করে 'কানকো গাঁথা' গল্পটির অভিজ্ঞতা আমি গ্রামের লোক বলেই আমাকে ক্ষণকালের জন্য হলেও শিহরিত করতে পেরেছে। সন্দেহ নেই কথাশিল্পী তমিজ উদ্দীন লোদীর গল্প বয়নে অনেকটাই সিদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অনেকে ক্রমাগত চর্চাতেও যা আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হন লোদী তা অবলীলায় অর্জন করেছেন। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের চৌহদ্দিতে যেখানে ছোটগল্পের ভাষা নির্মাণই একটি সমস্যা সেখানে আমাদের আলোচ্য লেখক তার গদ্যের জন্যে একটি হৃদয়গ্রাহী গদ্যভাষা আয়ত্তে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের ছোটগল্পের কারিগর বলে খ্যাত অনেক লেখক তার রচনায় বিশেষ করে গল্পে এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা আমাদের আধুনিক গল্প-কবিতার সাধারণ পাঠকরা মেনে নিতে পারেননি। ওইসব প্রগতিশীল কথাশিল্পীরা কেবল তাদের প্রগতিশীল মতবাদের জোরে অনেক অপাঠ্য বিষয় আমাদের পাঠকদের গেলানোর চেষ্টা করে এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তারা প্রগতি, রাজনীতি আর দর্শন আর খেতে চায় না, বরং তমিজ উদ্দীন লোদীদের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'একজন কথাকারের ভাণ্ডার থেকে রস ও বেদনামিশ্রিত গল্প পেতে চায়। গত শতাব্দীর শেষের দিকের গল্প লেখকদের ধারণা ছিল যে ভাষার কালোয়াতিটাই মূলত গল্প, কিন্তু সম্প্রতি লাতিন আমেরিকার কিচ্ছাপ্রিয় তরুণ লেখকরা রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শন বাদ দিয়ে এমন সব গালগল্পকে ছোটগল্পের বিষয় করে তুলেছেন যা রূপকথাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে মানবিক কল্পকথায় কবিতার স্বগোত্রীয় হয়ে উঠতে চাইছে। আক্ষেপের বিষয় আমাদের দেশের ছোটগল্পকাররা ওই দিকে এখনো ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করেননি। এই লেখকের আরো যে কয়টি গল্প আমার মধ্যে পুলক সঞ্চার করেছে সেগুলো হলো অনাবৃত অগস্ত্যের যাত্রা, বিবর, হত্যা অথবা হ্যালুসিনেশন, বিবর্তন কিংবা সময়হীনতার গল্প, নীলা ও তার পরিদর্শন ও দুই পর্ব কিংবা পর্বহীনতার গল্প।

তমিজ উদ্‌দীন লোদীর এই প্রথম গল্পের বইটি 'হ্রেষাধ্বনির বাঁকবদল' আমাদের পাঠকদের আশান্বিত করে তুলবে বলে আমি ধারণা করি। লেখককে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, তিনি তার ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যা আমাদের কাছে গল্প হিসেবে বর্ণনা করতে চান সেটাই মূলত গল্প। অন্যরা তাকে দিয়ে যা বলাতে চায় সেটা সদা সর্বদা গল্প নাও হতে পারে। আমি এই লেখকের সাফল্য কামনা করি।

AMARBOI.COM

কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা এবং তারুণ্যের প্রতি পক্ষপাত

কবিতা যে তারুণ্যের মুখাপেক্ষি তা আমি মাঝে-মধ্যে বলে থাকি। সম্প্রতি কাজী জহিরুল ইসলামের 'পুরুষ পৃথিবী' ও 'দ্বিতীয় ঘাসফড়িং' শীর্ষক দুটি কাব্যগ্রন্থ হাতে পেয়ে আমার এ প্রত্যয় আরো দৃঢ় হলো। কবিতার জন্যে প্রাজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা দরকার এটা তো স্বতসিদ্ধ কিন্তু তারুণ্যও কবিতা সৃজনে এক অপরিহার্য ভূমিকা রাখে। কবিতাকে একটি বহমান মাত্রায়, এলোমেলো উত্তেজনায় এবং অপ্রাসঙ্গিক উপমায় সজ্জিত করতে পারে তরুণতম কবি। কাজী জহিরুল ইসলাম ওই অর্থে একেবারে তরুণতম নয় তবে তার কাব্যগ্রন্থ দুটিতে তিনি যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং অপ্রচলিত বাঁক-ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন এতে আমার আন্দাজ হয়েছে তারুণ্যের উত্তেজনা ও উদ্দীপনা তার মধ্যে সব সময়, সর্বাবস্থায়ই কাজ করে চলেছে। আমি এ ধরনের কবিদের ভালোবাসি। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি এবং আশা করি যে তার হাত থেকে এমন পঙ্‌ক্তি সহসা বেরিয়ে আসবে যা খোলা তরবারির মতো।

কাজী জহিরুল ইসলামকে স্থিতধি হতে উপদেশ দিয়ে কোনো লাভ নেই। এর প্রধানতম কারণ হলো প্রকৃত কবিরা কারো উপদেশ গ্রহণ করেন না। অনেক সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্রজদের প্রকৃতি উপদেশকেও তারা সন্দেহের চোখে দেখেন। এ কারণে আমি কবি কাজী জহিরুল ইসলামকে কবিতার ব্যাপারে কোনো পরামর্শ দিতে চাই না। আমি তার কবিতাকে এই মুহূর্তে আমার জন্য উপভোগ্য বলে ধারণা করি। আমি তার যে কয়টি কবিতা পড়েছি তাতে করে তার আরো কবিতা পড়ার উৎসাহ আমার দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। এ কথা ঠিক যে কবি কাজী জহিরুল ইসলামের মতো আরো অনেক কবির কবিতার সাথে আমার পরিচয় আছে। নিত্য এ পরিচয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আমি অবলীলায় স্বীকার করি এতে আমি উপকৃতি হচ্ছি। সম্প্রতি আমার ধারণা হয়েছিল এ বয়সে আমার প্রেমের কবিতা থেকে একটু সরে আসা উচিত কিন্তু আমার এ ধারণা যে সঠিক নয় তা আমি কবি কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা পড়ে একটু একটু করে বুঝতে পারছি। অর্থাৎ প্রেম বিষয়ে এখনো লোভে কম্পমান আমি। আবার এমনও হতে পারে আমার সিদ্ধান্তই সঠিক। কিন্তু লোভ আমাকে ছাড়তে চাচ্ছে না। এই যে দোদুল্যমানতা দু'একজন কবি আমার মধ্যে সৃষ্টি করতে পারছেন এটা নিঃসন্দেহে অভিনব ব্যাপার। আমি কাজী জহিরুল ইসলামের এই শক্তিতে খানিকটা অভিভূত।

এখানে আমার নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলি। আমি প্রেমের কবিতা থেকে সরে যেতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম কিংবা এখনো আছি তার কারণ হলো আমার বিশ্বাস প্রেম কি তা আমি বহু চর্চায়, লিপ্ততায় এবং হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে আমার অল্প বয়সেই শিখতে চেয়েছিলাম। প্রেমের কাছে সত্তর পেরিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে কিন্তু আমার সময় কই। আমার সময় যে ফুরিয়ে গেছে। প্রেমকে একটি পাথরের ওপর বসিয়ে রেখে আমাকে এখন বাড়ি ফিরতে হবে। এমতাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পরিণাম ও পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করাই কি উত্তম নয়? কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা আমাকে এসব কথা ভাবিয়েছে। এখানেই একজন তরুণ কবির সার্থকতা আমি উপলব্ধি করি।

কাজী জহিরুল ইসলামের আচরণীয় বিষয় বলা বাহুল্য প্রেমেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতি, প্রাসঙ্গিক জীবন-যাপন, আধুনিকতা, দেশপ্রেম যা সময়ের সাক্ষ্য হিসাবে উত্থাপিত হতে পারে এর প্রতিটি অঙ্গেই জহির স্পর্শ রাখতে চাইছেন। আমি আগেও উল্লেখ করেছি তার বাঁক-ভঙ্গি কখনো বা আমার কাছে অপ্রচলিত মনে হয়েছে। স্বভাবতই তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কথা বলা যে এক ধরনের শুদ্ধতার দাবি মিটিয়ে নাগরিক হয়ে উঠতে চায় এটা এ কবি কখনো কখনো মানতে চান নি। একদা এ অভ্যেস আমারও ছিল। এতে আমার ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি হয়েছে অর্থাৎ আমি যেমন, আমার পাঠক আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। যেমন আমি এই তরুণ কবির কবিতার স্বাদ অত্যন্ত সরলভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপভোগ করেছি। বলা যেতে পারে কবি কাজী জহিরের কবিতা আমার বেশ ভালো লেগেছে। আমি উদ্দীপিত বোধ করছি।

এ পর্যন্ত যা বললাম তাতে এ কবি যে একজন বিশ্ববিচরণশীল তরুণ তা বোঝার কোনো উপায় নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে তিনি কার্যব্যপদেশে ইউরোপের সঙ্কটময় কয়েকটি অঞ্চলে কয়েক বছর দিনাতিপাত করে এসেছেন। এ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাকে শুনিয়েছেন। যেখানে তার এসব অভিজ্ঞতা কবিতা হয়ে উঠেছে তা আমাদের সাহিত্যে নতুন এবং আন্তর্জাতিক বিচারে সংবেদনশীল।

আমি জহিরের এই বয়সকে খুব বিবেচনার মধ্যে রেখেছি এটা তার প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাত। আমি বিশ্বাস করি কোনো কবির প্রতি পক্ষপাত এমনিতে সৃষ্টি হয় না। কবি কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতায় আকর্ষণীয় গুণ বর্তেছে বলেই আমি তার কবিতার খানিকটা প্রশংসা করে অগ্রজের দায়িত্ব পালন করলাম। তবে কবি যতোই আত্মীয় হোক ন্যায্য সতর্কবাণী তাকে সময়মতো শোনাতে না পারলে তার ক্ষতিই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমি কবি কাজী জহিরুল ইসলামকে কাব্যচর্চাকালে যে কথা বলতে চাই তা হলো আজকাল ছন্দে লিখতে একজন আধুনিক কবিকে কেউ মাথার দিব্যি দেয় না কিন্তু বাংলা ভাষার কয়েকটি আদি উৎক্ষেপণ যেহেতু সমমাত্রার ও তৃপ্তিকর অন্তমিলেই রচিত হয়েছে সে কারণে আমি জহিরকে পয়ার, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের চর্চা কোনো সময়ই ত্যাগ না করতে অনুরোধ করি। সম্ভবপর মিল পাঠককে দীর্ঘদিন কবিতা পড়তে আগ্রহী রাখে। এসব বিবেচনা করে জহির যদি তার কবিতা চর্চা চালিয়ে যায় তবে এ কবি আমাদের সাহিত্যে সত্যিকার কিছু নতুনত্ব যোগ করতে সক্ষম হবে।

নব্বইয়ের কবিতা : 'গোধূলীসন্ধির নৃত্য'

আমি বেশ কিছুকাল যাবৎ বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে পারতপক্ষে কোনো মন্তব্য করতে চাইনি। এর মানে এ নয় যে আমার পরবর্তী দশকগুলোর কবিদের ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমি তো সব সময়-ই কবিতার মঞ্চগুলোতে সমকালীন কবিতার উপর কিছু না কিছু বলে থাকি। তবে আমার মতো বয়স্ক কবির পক্ষে লিখিতভাবে কবিতার উপর কোনো বিবেচনাকে স্থানীয় করতে চাইনি। কারণ পঞ্চাশ দশকের পরবর্তী ষাট-সত্তর পর্যন্ত আমি নিজেই সক্রিয়ভাবে কবিতা লিখে গেছি। এই সময়ের মধ্যে আমার দশকের কবিরা নিজেদের নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছেন। আমি নিজে এখনো কবিতা লিখে চলেছি। আমার মতো লোকেরা যারা নিজের দশকের কবিদের সম্বন্ধেই বিচার বিবেচনা করে কিছু লেখার সাহস পায়নি তারা একবিংশ শতাব্দীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে এখন আর কী বলবে? তাদের হাত কাঁপছে। বয়সের ভারে চিন্তা সুস্থির থাকছে না। তবু এ অবস্থায় পড়লেও বইটি উল্টে পাল্টে দেখতে হয়। সম্প্রতি তরুণ কবি ও লিটলম্যাগ সম্পাদক সাজ্জাদ বিপ্লব তার সম্পাদিত নব্বই দশকের একটি ক্ষীণকায় সঙ্কলন আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি আমার চিরকালের অভ্যেসের বশে এ বইটিতে সঙ্কলিত কবিদের কবিতা পড়ার চেষ্টা করেছি। এ কথা আমার বলতে দ্বিধা নেই যারা এই বইয়ে সঙ্কলিত হয়েছেন তাদের মধ্যেও কেই কেউ কিছু উত্তেজক লাইনের সাথে তাদের অন্তরস্থ প্রবল কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

পৃথিবীর প্রকৃতি নিচয়ের নিসর্গরাজির মধ্যে দৃশ্যমান সবকিছুরই পরিচয় আমরা পাই কিছু কিছু লক্ষণ দ্বারা। আমার চোখ যেহেতু এখন আর সেই অবস্থাতেই নেই যাতে ফুল বা ফল দেখে গাছটিকে চিনব। তবু বিনয়ের সাথে জানাই যে, অন্ধেরও স্পর্শ ইন্দ্রিয় কখনো কখনো চোখের কাজ করে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শ শক্তি এখনো কোনো কিছুকে সনাক্তকরণে আমাকে আগের মতোই সহায়তা দিচ্ছে।

আমি নব্বই দশকের এই ক্ষুদ্র সঙ্কলনটি স্পর্শে, ঘ্রাণে ও অস্পষ্ট দৃষ্টি শক্তি নিয়েই পাঠ করার চেষ্টা করেছি। এবং অকপটে এ কথা স্বীকার করি যে, নব্বই দশকের এই সঙ্কলনটিতে এমন সব কবি রয়েছেন যাদের উপেক্ষা করা যায় না। এখানে একটি কথা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বলে রাখাই ভালো, নব্বই দশকের এটি-ই প্রথম সঙ্কলন নয়। এর আগে মাহবুব কবিরের সম্পাদনায় নব্বই দশকের নব্বই জন কবির একটি সঙ্কলন আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন আমার চোখের দৃষ্টি এতোটা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পৌঁছেনি। সেখানেও শক্তিমান কবিদের আবির্ভাব আভাসে ইঙ্গিতে নিজেদের প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ততায় জানান দিয়েছিল। প্রথম সঙ্কলনটির নাম 'নব্বইয়ের কবিতা', দ্বিতীয়টি 'নব্বইয়ের কবিতা অন্য আকাশ'। দুটি বই পড়েই আমার ধারণা হয়েছে আকাশটা খুব একটা বদলায়নি। আকাশ আগের মতোই রহস্যময় নীলিমা নিয়ে ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু বদলে গেছে পৃথিবীর প্রাণ ধারণের বেদনা। যারা আগে পৃথিবীতে কবি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন তারা তাদের সময়কার পরিবেশ ও প্রকৃতির কথা, তাদের প্রেম ও পরিণয়ের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাদের মধ্যে যারা সত্যিই ছিলেন প্রতিভাবান তাদের কিছু পঙ্ক্তি আমরা আমাদের সমাজে আমাদের পরিবেশে নিজেদের কবি প্রতিভাকে মহিমান্বিত করতে শোষণ করে নিয়েছি। নব্বইয়ের কবিতা আমাকে বিস্মিত করে—একথা বলার আগে আমি বলতে চাই নব্বই দশকে এতো কবির আবির্ভাব বাংলা ভাষার জন্যে সত্যিই বিস্ময়কর।

নব্বই দশকের প্রায় সোয়াশত কবি বাংলা ভাষার সর্বশেষ স্টাইল বা আঙ্গিকরীতি আয়ত্ত করতে চাইছেন। এখন পর্যন্ত ধরে নিতে হবে এরা সবাই কবি। যেহেতু নব্বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশকের কোনো কবিরই বয়স পঞ্চাশ পেরোয়নি কিন্তু প্রায় সকলের নামাঙ্কিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বাজারে শোভা পাচ্ছে সে কারণে একটু আগে হলেও তাদের উপর বিশেষ করে তাদের কবিতার উপর আলোচনার আওতায় আনা যায় না। কিন্তু নব্বই দশকের ব্যাপারে এ অজুহাত খাটবে না। তারা প্রকাশিত এবং প্রকটিত হয়ে উঠেছেন। এখন তাদের উপর সাহিত্যিক অর্থে বিশ্লেষণী মন্তব্য একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। এই শতাধিক কবির সবাই যে কবি একথা বলার দুঃসাহস আমার নেই। তবে তারা যদি সত্যিই সকলই কবি হয়ে থাকেন তাহলে তাদের অস্বীকার করার যুক্তিও আমি খুঁজে পাই না। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচনা করি। সেটা হলো, নিষ্ফলা বাংলা একাডেমি 'তরুণ লেখক প্রকল্প' বলে আকস্মিক একটি সৃজনশীল পরিকল্পনা একদা গ্রহণ করেছিল। এতে দেশের তরুণতম কবি ও কথাশিল্পী যাদের প্রায় অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য এবং আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সদিচ্ছায় লেখালেখির ব্যাপারে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল। লেখকদের প্রশিক্ষণ কথাটা যদিও শুনতে হাস্যকর লাগে তবু বিষয়টির বাস্তবরূপ দেখে কেউ যে খুব হাসাহাসি করেছিল তেমন মনে পড়ে না। তখন মনে হয়েছিল লেখকদের প্রশিক্ষণ ব্যাপারটা অতটা অবাস্তব নয়। ঐসব ক্লাসে অগ্রজ কবি কথাসাহিত্যিক যারা নিজেদের সাহিত্য জীবনের প্রবক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমিও তাদের দলভুক্ত ছিলাম। দেখা গেল এই ক্লাসগুলো বেশ জমে উঠেছে। আমার মনে আছে আমি যে কয়েকটি ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছিলাম তাতে উপস্থিতি বেশ ঘন ছিল। এবং বক্তৃতার পর ক্লাসগুলো বেশ কলরব মুখর হয়ে উঠত। পরে অবশ্য তরুণ লেখকদের দ্বারা বাংলা একাডেমি বেশ সরব হয়ে উঠেছে দেখে বিষয়টি কারো কারো অপছন্দ হয়। তারা তখন রাজনৈতিক পক্ষপাতের সুযোগে বাংলা একাডেমির ঘাড়ে চড়ে বসে আছে। বারো হাত কাকুড়ে তেরো হাত বিচি দেখে তারা ভয় পেয়ে যান। বাংলা একাডেমির তৎকালীন সভাপতি প্রকল্পটি যাতে আর চালু না থাকে সে ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তরুণ কবি এবং লেখক কথাশিল্পীদের প্রথম বইয়ের পাণ্ডুলিপি তখন প্রেসে চলে গেছে। এ দোটানা অবস্থায় শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বই বেরিয়েও আসে। যাতে নব্বই দশকের কবিতা ও কথাশিল্পের ভিত্তিভূমিটি সবার অজান্তে পাকাপোক্ত হয়ে যায়। এখান থেকেই নব্বই দশকের শুরু। প্রকল্প প্রকাশিত যেসব বই এ ভিত্তিভূমিটি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল তাদের মধ্যে গদ্য পদ্য মিলিয়ে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তারা হলেন মুজিব ইরম, শোয়াইব জিবরান, ইশারফ হোসেন, জেনিস মাহমুন, চঞ্চল আশরাফ, মুহম্মদ আবদুল বাতেন, মতিন রায়হান, শান্তা মারিয়া, খুরশীদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলম বাবু, তপন বাগচী, অনু হোসেন, ফকরুল চৌধুরী, রফিক মুহাম্মদ, আরিফ বিল্লাহ মিঠু, আতিক হেলাল, মাসুদার রহমান প্রমুখ।

নব্বইয়ের কবিতা সম্বন্ধে দুটি সঙ্কলনের দুজন সম্পাদক দুটি অনাড়ম্বর ভূমিকা ফেঁদেছেন। তাদের কবিতা কেন তাদের ধারণা অনুযায়ী আমাদের পাঠযোগ্য তার একটা ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। সম্পাদকদ্বয়ের ইঙ্গিত অনুযায়ী নব্বই দশকের কবিদের কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে গেলে বেশ একটু অসুবিধায় পড়তে হবে বলে আমার ধারণা। প্রথম সঙ্কলনটি সম্পাদক মাহবুব কবির এবং দ্বিতীয় সঙ্কলনটির সম্পাদক সাজ্জাদ বিপ্লব এই সঙ্কলন দুটি প্রকাশের ব্যাপারে যত তাগাদা অনুভব করেছেন ততোটা বিচার বিশ্লেষণ ও বাছাই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেননি। কারো কারো মনে হতে পারে সম্পাদকদ্বয় নব্বই দশকের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। নব্বই দশকে লেখা আরম্ভ করলেই তিনি সে দশকের কবি বা কথাশিল্পী এটা তো মানা যায় না। কথাশিল্পের কথা আপাতত থাক। যেহেতু এরা দুজন কবিদেরই সঙ্কলনে মনোনীত করতে চেয়েছেন সে জন্য আমি কবিতা নিয়েই অগ্রসর হতে চাই।

আমি অকপটে স্বীকার করি নব্বই দশকে প্রকৃত কবির সংখ্যা আমাকে বেশ কার্যকরভাবে আলোড়িত করেছে। কবিতার যে ধারাবাহিকতার জন্য এককালে চল্লিশ দশক থেকে শুরু ষাট-সত্তর দশক পর্যন্ত এক ধরনের ব্যাকুলতা আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে স্তিমিত করে রাখত সম্ভবত নব্বই দশকে এসে তার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে নব্বই দশকে আমাদেরই কবিতা প্রয়াসের উজ্জ্বল শস্য। এর মানে এ নয় যে নব্বই দশকের কবিরা পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশকের মতোই কবিতা লিখেছেন। এদের কারো কারো রচনায় নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত কাব্যরুচি এবং স্বতন্ত্র অধ্যয়ন ও বিচরণের চিহ্নাদি উজ্জ্বল আনন্দ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। সন্দেহ নেই নব্বই দশকের কবিতা বাংলাসাহিত্যের—বিশেষ করে কবিতার—স্বতন্ত্র নদীর মতো। এই নদীতে তরঙ্গ আছে, উষ্ণ অন্তস্রোত আছে এবং পাড় ভাঙার মতো প্রবল আঘাত করারও ক্ষমতা আছে। সবই আছে আপাতদৃষ্টিতে সমন্বিতভাবে। স্বভাবতই আশা করা যায় এ সমন্বয় প্রস্তুতি পর্বের। এই প্রস্তুতিপর্বের অবসানে কবির যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র নিজেকে আলাদা আত্মপরিচয়ের মহিমা দেয় তা বিকশিত হয়ে উঠবে। এখন পর্যন্ত এর নাম নব্বই দশক মাত্র। সংখ্যার দিক দিয়ে এদের উপস্থিতির আধিক্য এই মুহূর্তে আমাদের জন্যে আনন্দের হলেও এরা কবি ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজের স্বাতন্ত্র চিহ্নিত না করা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি। আমরা অপেক্ষা করব আনন্দে, উত্তেজনায়, আশায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নব্বই দশকের কবিতার প্রতি আমার মতো বৃদ্ধ প্রায়ান্ধ লোকের উৎসাহ সৃষ্টির প্রথম কারণ হলো ঐ দশকের শতাধিক কবির প্রায় সকলেরই রচনায় এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে যে কবিতা কোনো এলেবেলে শিল্প নয়। ছেলেখেলার বিষয়ও নয়। এদের প্রায় সকলই কবিতাকে মানব হৃদয়ের নিগূঢ় রসায়ন হিসেবে ভাষারূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এই অভিজ্ঞতা তারা পেয়েছেন—আমার বিশ্বাস—পঞ্চাশ দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত প্রতিভাবান অভিজ্ঞ কবিদের কাছ থেকে। কবিদের যে হতে হয় তার নিজের জাতির সবচেয়ে অভিজ্ঞ, অপরাজিত ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। যা তারা সম্ভবত সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। ছন্দ পাগল পদ্য রচয়িতা হিসেবে নব্বই দশকের কবিরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চান না। তবে এরাও ছন্দ জানেন। ছন্দ যে কবির বক্তব্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে এই বোধ তাদের আছে। এখন পর্যন্ত প্রেম ও প্রকৃতিই নব্বই দশকের প্রধান বিষয় এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে লোকজবিশ্বাস। মূলত এ নিয়েই এরা এখন পর্যন্ত কাব্য রচনা করে চলেছেন। সেখানে যদি বয়সের অভিজ্ঞতা তাদের বর্তমান আন্তর্জাতিক কাব্যসূত্রগুলো অনুসন্ধানের প্রেরণা দেয় তাহলে পঞ্চাশ দশকের একজন কবি হিসেবে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। কবিতার ব্যাপারে একথা ঠিক নয় যে, যার হয় না পঁচিশ বছরে তার হবে না পঞ্চাশ বছরেও। কবি সত্তরে পৌঁছেও কবিতার জগতে কেবল নিজের প্রতিভার দ্বারা ভূমিকম্প সৃষ্টি করে দিতে পারেন। আমি তো আগেই বলেছি, আমরা অপেক্ষা করব আশা এবং আস্থায়। নব্বই দশকের কবিতা আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা কবিতার আঙ্গিকরীতির মোড় ফেরার কবিতা।

আর আঙ্গিক বদল হয় তখনি যখন কবিতায় নতুন বক্তব্য আসতে থাকে। উপমার ঢঙ বদলে যায় এবং ছন্দের আস্তরণ বাক্যকে মহিমা দেয়। এখানে আমি নব্বই দশকের কয়েকজন কবির কবিতা থেকে কিছু পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করে আমাদের পাঠকদের সচকিত করতে চাই যে, নতুন ভাবনার উদয় হয়েছে এদের মধ্যে। উদয় হয়েছে পুরনো বিষয়কে ঘিরেই। দেশের মাটি-পানি-মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদের রক্ত-মাংস অভ্যেস-আচরণ তাৎক্ষণিকভাবে ভাষা পেয়েছে এদের কবিতায়। বোঝা যাচ্ছে এটা আঙ্গিক বদলের সময়। সেই অর্থে এমনও হতে পারে যে নব্বই দশকের কবিরা একবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধির কবি। তাদের গায়ে গায়ে বিংশ শতাব্দীর পোষাক কিন্তু—তাদের মগজে কাজ করছে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে কর্মক্ষম জটিল কম্পিউটার। তারা তাদের কম্পিউটারের মেমোরিতে খোলনলচেসহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন আস্ত একটি বাংলাদেশকে। সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে তাদের কবিতায় তাদের উপমা-উৎপ্রেক্ষায় নারীর প্রতি আসঙ্গলিপ্সা। যেন নারী রহস্যের এই কবিদের কাছে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুলকিনারা নেই। লেহনে-পেষণে এবং উপভোগে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাচ্ছেন না তারা। আবার নারী রহস্যকে ত্যাগও করতে পারছেন না। এ এক জটিল মর্মজ্বালা সন্দেহ নেই।

এখানে আমি এই দুটি সঙ্কলন থেকে আপাতত তিনজন কবির তিনটি কবিতা উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্যকে বিশদ করতে চাই। এই তিনজন হলেন নয়ন আহমেদ, সরকার আমিন ও মুজিব ইরম।

আজ হাটবার। বাবা হাটে যাবেন। নুন দেয়া আনন্দ কিনবেন
তিনি। আর কিনবেন এক কেজি সাধ। এই ব্যাগ নিন বাবা। আজ
পরিপূর্ণ করে আনবেন সহ্য ও সাধনা। বহুদিন খাওয়া হয়নি
মধ্যবিত্ত আগুন, ফুরফুরে বাতাসের ডগা। বেদনা খেয়ে খেয়ে পেট
খারাপ করেছে। নৈরাশ্য দিয়ে উদরপূর্তি আর করব না। বাবা,
সূর্যের উত্তাপে মোড়া এককেজি প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসবেন।
সকালের নাশতায় রুগ্ন ওম ক্যানো খাবো? লাল মোরগের
পাখনার মতো ভোর আনবেন। কিছু বিনীত বিকেল আনবেন,
আর আনবেন সেলাই করা রাত। দেখবেন—দর্জি বোতাম লাগিয়ে
দিয়েছে কিনা। শেষে, কামনা যখন কিনবেন—নিশ্চয়ই পরখ
করে দেখবেন পুষ্টিকর কিনা।
আজ হাটবার। বাবা কিনবেন জৈবনিক তাপ।

[**আজ হাটবার,** নয়ন আহমেদ; 'নব্বইয়ের কবিতা: অন্য আকাশ' পৃ: ৩৫]

শিশুদের বেঁধে রেখে মা রান্না করছেন পাথর
শিশুদের ছেড়ে দিন গোধূলিতে সূর্যাস্তের লালরক্ত আকাশে
তারা মেঘের ভিতর থেকে কেড়ে নিক আহার
দিগন্তের স্তন থেকে চুষে নিক শিশুকাল
সূর্যের লাল থেকে খুঁজে নিক লবণ
মা শিশুদের বাঁধন খুলে দিন
তারা তারাদের সাথে খেলা করুক
দু'হাতে ধরে চাঁদ লটকে পড়ুক মহাশূন্যে
ভাসুক সমুদ্রের মস্তিষ্কে রেখে আশ্চর্য পা

মা শিশুদের অপেক্ষায় বসিয়ে রেখে
ভাজছেন পাথরের মাছ
পাথরের আনাজ, পাথরের সালুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাগো, শিশুরা যদি বা খায় সেদ্ধ পাথর
অসীম রান্নার খবর কিভাবে থাকবে গোপন?

[**গোপন রান্না**, সরকার আমিন; 'নব্বইয়ের কবিতা' পৃ: ১২৯]

পাশের বাড়ির মেয়ে চোখ দিলো জন্মের পর। সেই থেকে প্রতিভোরে মা খাওয়াতেন নজরের পানি। অসংখ্য সুরায় ভরে দিতেন গলায় ঝোলানো কালো সুতোর তাগা। লাল মোরগটা নিয়ে যেতো বৃদ্ধ ফকির। তার সাথে বদচোখের বিষ।

এখনও নজর এড়াতে মা আমার পাঠ করেন সমস্ত বিশ্বাস। নিয়ে আসেন-নুনপড়া, পানিপড়া, কুমারের ঘর।

আমি কি শিশু মাগো- নজরে দেইনি মুখ স্তনের বোঁটায়? ক্যানো তবে এই ভয়? আমাকে দিয়েছে সেতো অন্য নজর, যে নজরে হরদম হৃদয় পোড়ায়।

[**নজর**, মুজিব ইরম; 'নব্বইয়ের কবিতা' পৃ: ৯৫]

এই তিনটি কবিতায় কবি তিনজনের অন্তরের তিনঝলক দৃশ্যের প্রক্ষেপ আমরা মুহূর্তের জন্যে দেখে ফেলি। কোনো কবিতাতেই কবি মনের ইঙ্গিতগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবে পাঠকের মনে কৌতূহল জাগাবার ক্ষমতা এদের আছে। নয়ন আহমেদ হাট থেকে তার বাবা যেসব জিনিস কিনে আনার ফর্দ তৈরি করেছেন তা এ যুগের কোনো কবিরই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা মাত্র। এখানে নয়ন হাটের কথাটি উল্লেখ করলেন কেন? তিনি তার বাবাকে মহানগরীর কোনো মার্কেটিং প্লেসে পাঠাননি। ব্যাগ তুলে দিচ্ছেন গ্রাম্য হাটে যাওয়ার জন্য। হাট-ই কবির অভাবপূরণের ফর্দটি সুলভ জিনিসে ভরে দিতে পারে। এই গ্রাম প্রবণতা আধুনিকতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গিয়ে একটা চিত্রকল্পের ধারণা দিচ্ছে। এই ধারণাই হলো সমগ্র নব্বই দশকের বৈশিষ্ট্য। তারা প্রকৃত গ্রামের দিকে সরে গিয়ে তাদের মানসের আধুনিকতম চিত্রকল্প বিন্যস্ত করতে চাইছে। নয়ন আহমেদ তার কবিতাটিতে যেসব বেদনার কথা উল্লেখ করেছেন কিম্বা বাবা আনবেন বলে যেসব বাজারদ্রব্য নির্দিষ্ট করেছেন আমরা সেসব মালমসলাকে একালে কবি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। হাট থেকে এমনকি কামনা বাসনাও বাবা কিনে আনবেন বলে ফর্দ তৈরি করেছেন। এই ফর্দটি উত্তর আধুনিকতার ফর্দ।

এরপর যে কবির কথা আমি উল্লেখ করব তিনি বেশ কিছুকাল আগেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সরকার আমিনের উপরোল্লিখিত কবিতাটিতে যে হৃদয়গ্রাহী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে সেখানেও দেখা যায় তিনি নয়ন আহমেদের মতোই দাবি উত্থাপন করছেন এমন একজনের কাছে যিনি সবকিছু দিতে পারেন। তিনি সম্বোধন করছেন তাকে 'মা' বলে। নয়ন আহমেদ যেমন বাবাকে হাটে পাঠাবার চিত্রকল্প আনতে চেয়েছেন তেমনি সরকার আমিনও এক মাকে বেছে নিয়েছে। যিনি তার সমস্ত শিশুদের বেঁধে রেখে পাথর রান্না করছেন। কাঠিন্যকে চুলায় বসিয়ে দিয়ে তাকে সিদ্ধ করার এই উপমাটি অভিনব। নব্বই দশকের নতুনত্ব এই কবিতাটিতে এর সমস্ত জটিলতা নিয়ে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করছে। একদিকে পাথর সিদ্ধ হচ্ছে খাদ্যে রূপ নেওয়ার জন্য অন্যদিকে গোধূলিবেলায় কবি অনুরোধ করছেন তার মাকে ক্ষুধার্ত শিশুদের মুক্ত করে দিতে। যাতে তারা পাথরের বদলে পৃথিবীর দিগন্ত থেকে সূর্য থেকে সমস্ত দৃশ্যপট থেকে খাদ্য আহরণ করতে পারে। কি কি খেতে হবে তারও একটি ফর্দ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা খাবে মেঘের ভিতর থেকে তাদের আহার্য রাশি। দিগন্তের স্তন থেকে শিশুকাল চুষে নিতে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। সূর্যের লাল থেকে তাদের নুন চেখে নিতে বলা হচ্ছে। এই চিত্রকল্পগুলো অভাবনীয়। ক্ষুধার্ত বাংলাদেশের ক্ষুধা অনুভব করছেন এই কবি অত্যন্ত আন্তরিক স্বপ্ন সৃষ্টি করে। একে আমরা আমাদের কবিতায় নতুন ধারণা বলতে পারি। এই ধারণা মূলত পরাবাস্তব বিষয় হিসেবে আসেনি। এসেছে স্বপ্ন রঞ্জিত এক ধরনের বাস্তবতা। আমরা একে বাংলা ভাষার আধুনিকত্তোর নতুন উপমার ইঙ্গিত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। যে ধারণা আমরা পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর এবং আশি পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাইনি।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা যার কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি তিনি মুজিব ইরম। যদিও তার চিত্রকল্পগুলো বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না এবং মূলত অত্যন্ত সরল। তবু এর মধ্যে উপরোক্ত দুজনের মতোই শক্তিশালী কবিত্ব ধারণার ইঙ্গিত রয়েছে। মুজিব ইরমের কবিতায় গ্রাম্য নজর লাগার বিশ্বাসটি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, তার মা পাশের বাড়ির মেয়েটির 'নজর' লাগবে বলে তাকে 'নজরের পানি' নিত্য পান করাতেন। এখানেও মা-ই হলেন অভিভাবক। এই মা-বাপরা আমাদের কবিতায় এতোদিন কোথায় ছিলেন?

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী যে রোমান্টিকতা বাংলা কবিতাকে গ্রাস করে ফেলেছিল নয়ন আহমেদ, সরকার আমিন এবং মুজিব ইরম তার থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম আঘাতটি বেশ আড়ম্বরের সাথেই শুরু করেছেন বলে মনে হয়। নব্বই দশকের অন্যান্য কবিরা একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেও আমি কেবল তিনটি স্বরচিত দৃশ্যকল্প দিয়ে তাদের প্রয়াসের অর্থাৎ বেরিয়ে আসার চেষ্টার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলাম। পাঠকের এ ব্যাপারে এ ধারণা যেন না হয় যে নব্বই দশকের শতাধিক কবির মধ্যে এই তিনজন-ই উল্লেখযোগ্য। বরং এদের সকলের কবিতাতেই এ ধরনের কোনো না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো বৈশিষ্ট্য লুকায়িত আছে। আমি মাত্র তিনজন থেকে এই বৈশিষ্ট্যের দিকটি উল্লেখ করতে প্রয়াসী হয়েছি। তবে অন্তত আরো কয়েকজনের কবিতায় নব্বই দশকের যে কবি লক্ষণ আমাকে চৈতন্যদয়ে সাহায্য করেছে তাদের কথাও উল্লেখ করতে চাই। সবার কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া এ প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক হবে না। অন্তত আরো যে বেশ কয়েকজন কবি নব্বই দশকে নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন— বায়তুল্লাহ কাদেরী, খৈয়াম কাদের, মিহির মুসাকী, কামরুজ্জামান কামু, চঞ্চল আশরাফ, সায়ীদ আবুবকর, টোকন ঠাকুর, ব্রাত্য রাইসু, ইশারফ হোসেন, রহমান হেনরী, শাকিল রিয়াজ, মুজিব মেহদী, মহিবুর রহিম, রওশন ঝুনু, শান্তা মারিয়া, কবির হুমায়ুন, আল হাফিজ, জাফর আহমদ রাশেদ, কামাল আহসান, আলফ্রেড খোকন, সাজ্জাদ বিপ্লব, মাতিয়ার রাফায়েল, ওমর বিশ্বাস, মৃধা আলাউদ্দিন প্রমুখ তাদের মধ্যে অন্যতম। নব্বই দশকের মতো বিশাল একটি কবি সম্প্রদায়ের সকলের নাম উল্লেখ করা আমার জন্য একটু দুরূহ কাজ। তবে একথাও সত্য যে উল্লেখিত কবিরা ছাড়াও নানারকম ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য এবং বিচিত্রকর্ম তৎপরতায় আমাদের কবিতাকে অলঙ্কৃত করে চলেছেন এই দশকের শতাধিক কবি। ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের কথা এ জন্য বললাম এদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। বিচিত্র তাদের সাজ পোশাক। বিচিত্র তাদের পেশা। যেমন নব্বই দশকের কবি সায়ীদ আবুবকরের সাথে আমার পরিচয়ের পর্বটি আমি কখনো ভুলিনি। ফর্সা ছিপছিপে ধরনের একজন তরুণ মাথায় পাগড়ি ও লম্বা আলখেল্লা পরে আমার সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। যখন জানলাম তিনি ইংরেজি সাহিত্যের একজন সফলকাম ছাত্র এবং শিক্ষকতা করেন ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজে। তখন বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম। তাকে দেখে আমার একটি তুর্কি কবিতার ইংরেজি সঙ্কলনের কথা মনে হলো। সেখানে সঙ্কলনের সম্পাদক আক্ষেপ করে লিখেছিলেন যে, তুরস্কের তরুণতম কবিদের একটা বড় অংশ মৌলবাদী। যাদের বয়স বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। তারা যে খুব জনপ্রিয় একথাও সম্পাদক উল্লেখ করেছিলেন। পাগড়ি ও আলখেল্লা পরা সায়ীদ আবুবকরকে দেখে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মৌলানা? একথায় তার ফর্সা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ্ঞে না। আমি কবিতা লিখি ও ইংরেজি পড়াই।

তেমনি আজিজ মার্কেটে একদিন নব্বই দশকের এক কবির সাথে পরিচিত হয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। তার নাম রওশন ঝুনু। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে আমার নারীবাদী বলে সন্দেহ হয়েছিল। সার্ট প্যান্ট পরা ববকাট চুল সিগ্রেট ফুকতে ফুকতে আমার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বলল, নারীবাদী নই—আমি কবি। এই নিন আমার বই। বইটা উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখলাম সময় সম্বন্ধে কান খাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রাখা হরিণির মতো তার পঙ্‌ক্তি বয়নের কৌশল। মুহূর্তে আমার কাছে বিজ্ঞপিত হলো এ পুরুষের ছদ্মবেশের আড়ালে দুর্দম কৌতূহলে উচ্চকিত এক কিশোরী কবি। যার চোখের সামনে প্রতিবাদ। চোখের পেছনেও প্রতিবাদ। মনে হলো তার ছদ্মবেশটি কবি হয়ে ওঠার জন্যে। অন্য দৃষ্টান্তটি আমার বিচরণশীল কৌতূহলের সাথে সম্পৃক্ত। আমি একস্থানে স্থানু হয়ে থাকতে পারি না। সারা বছরই বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও সফর করে বেড়াই। একবার বগুড়ায় গিয়ে এক তরুণ কবির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমার জানা ছিল না যে তিনি নব্বই দশকের কবি। কিন্তু তার সম্পাদিত একটি পত্রিকা হাতে তুলে দিলে আমি চমকে যাই। দেখি এখানে সাহিত্যের এক কেন্দ্রচ্যুত প্রতিবাদের আগুন। দেখতে ছোটখাটো এই তরুণটি ঘুম ঘুম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে যখন বেশ দীপ্ত কণ্ঠে জানালো যে, শুধু ঢাকাতেই সাহিত্য হবে এটা তিনি মানেন না। সাহিত্যকে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যারা নিয়ে বিভিন্ন মফস্বল শহরে কাজ করছেন তিনি তাদের একজন। তখন পত্রিকাটি উল্টে প্রথমে তার কবিতা পড়তে চেষ্টা করলাম—

> প্রতিদিন। প্রত্যুষে। মা'কে দেখি
> ঘর পরিষ্কার করতে
>
> মা আপনি কি ঝাড়ু দেন ?
>
> বিগত দুঃখ, যাবতীয় রোগ-শোক-ব্যর্থতা
> অনাগত দুঃস্বপ্ন...

[**মস্তাজ-১**, সাজ্জাদ বিপ্লব, 'নব্বইয়ের কবিতা: অন্য আকাশ' পৃ: ৭৩]

এতে আমার চৈতন্যে সহসাই যেন একটা কলিংবেলের শব্দ বেজে উঠল। যে সহজতা উত্তর আধুনিক কবিকুলের গন্তব্য এ কবি যেন মায়ের পেট থেকেই তা আয়ত্ত করে এসেছে। এখানেও কেন মায়ের-ই চিত্রকল্প—তা আমি এখনো ভাবি!

সায়ীদ আবুবকর, রওশন ঝুনু বা সাজ্জাদ বিপ্লব মনে হয় যেন একই মাতৃউদর থেকে বাংলাদেশের শহরে-গ্রামে-বন্দরে নোঙর ফেলে বসে আছে। এই সব ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আমি হলফ করে বলতে পারি পঞ্চাশ দশকে ছিল না। তখনকার কবিরা গ্রাম থেকে যাত্রা করে ঢাকায় আসতে চেয়েছিলেন। আর এদের অর্থাৎ উপরোক্ত তিনজনের কোনো কেন্দ্র বা রাজধানী নেই। এরা কেন্দ্রিকতার উল্টো স্রোত বলে আমার মনে হয়েছে। তবে এরাও ভাটি থেকে উজানে যেতে চায়। এদের শরীর বাইম মাছের মতো পিচ্ছিল। গতি দুর্দমনীয়। ভাষা সহজ এবং আচরণ সহজিয়া। মনে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ এদের মধ্যেই বা এদের মাধ্যমে আবার নিজের লোকজ স্বরূপে আবির্ভূতা হবেন।

কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করলাম এ জন্য যে আজকাল পশ্চিমে যারা কাব্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তাদের প্রায় সকলেই কবিতার সাথে কবিকেও আলোচনা করছেন। কবির জীবন, বিচরণ, বাসস্থান, এমনকি যৌন জীবনও। আমি অবশ্য অতোটা গভীরে যাওয়ার শক্তি রাখি না। কিন্তু একজন কবির সাথে ব্যক্তি পরিচয় এবং তার কবিতা পাশাপাশি রেখে সৃজনশীলতার পেছনের দৃশ্যপট যতটা দেখা যায় তা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি। হয়তো এতে কবিতা সম্বন্ধে বিমুখ পাঠকেরও মনযোগ আকৃষ্ট হতে পারে। যেমন এখন পশ্চিমে শুরু হয়েছে একই সাথে কবি ও কবিতাকে পাঠ করার উদ্যোম। এ ধরনের পাঠে পাঠক মাত্রই উজ্জীবিত বোধ করছেন। এটা সারাবিশ্বের কবিতার জন্যই আশার কথা।

পাগড়ি পরা ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক সায়ীদ আবুবকরের একটি কবিতায় স্বামী ঘাতিনি এক নারীর আর্তি ব্যক্ত হয় এভাবে—

'কোথায় সে নারী আছে, সইতে পারে এ-ও—
ক্ষিপ্ত তার ভাতারের পুরুষাঙ্গ নিয়ে
তারই গৃহে কামক্রীড়া খেলতেছে কেউ
তারই খাটে শুয়ে শুয়ে, পা ছড়িয়ে দিয়ে?

যে পারে সে পারুকগে, কঠিন সে পারা—
আমি হীনা, তা পারি না; চলে না কখনও,
শুধু জানি, প্রেমক্ষেত্রে ভাগবাটোয়ারা,
বেচাকেনা, ধারকর্জ, কুটুম্বিতা কোনো।'

[**ঘাতিকা বধূর প্রেমকথা**, সায়ীদ আবুবকর; 'নব্বইয়ের কবিতাঃ অন্য আকাশ' পৃঃ ৭৭]

ব্যক্তিসত্তা বৈচিত্র কবিদের সাজসজ্জা এবং কবিতা এমন বৈপরীত্যে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে যা বাংলা কবিতার বাঁক ফেরার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

আমি আগেই বলেছি নব্বই দশকের সব প্রতিভাবান কবিদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের প্রতিভাকে সনাক্ত করা আমার মতো অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টির সমালোচকের কাজ হতে পারে না। তবু এদের অগ্রবর্তী কবি হিসেবে এই বাঁক ফেরার বিষয়টি আমি যে উপলব্ধি করতে পেরেছি তা অকপটে স্বীকার করার জন্য এই প্রবন্ধটির আয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাত্য রাইসু 'নব্বইয়ের কবিতা'য় 'স্তন' শীর্ষক একটি কবিতা লিখেছেন। লেখাটি বারবার পড়েও এর থেকে গভীরে গ্রাহ্য করার মতো চিত্রকল্প আমি নিজের কাছে স্পষ্ট করতে পারিনি। অথচ 'স্তন' শব্দের অর্থ আমি জানি। 'স্তন' হলো কোনো কিছুর শব্দ করে ওঠা। জানান দেওয়া। কিন্তু ব্রাত্য রাইসু এই অসাধারণ নারী অঙ্গকে একটি দুরূহ দার্শনিক বলয়ে পরিণত করতে চান।

> 'ঐ স্তন ঘিরে ঘুরে আসছে মারাত্মক ভাবুক প্রজাতি। ভয়ে ও বিনয়ে নুয়ে পড়ছেন অধ্যাপক-বিশুদ্ধ জ্যামিতি। ঐ স্তন ঘিরে গড়ে উঠেছে সংক্রামক নগর সভ্যতা; ফেটে পড়ছে ত্রিকোণ গোলক—'

[**স্তন**, ব্রাত্য রাইসু; 'নব্বইয়ের কবিতা' পৃ: ৭৩]

আমার মনে হয় দার্শনিকতা কবির উদ্ভাবন ও মূলচিত্রকল্পকে দুর্বোধ্য করে দেয়। নব্বই দশকের সবগুলো লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও রাইসু দুরুহতার দিকে পা বাড়িয়েছে। তাকে উপদেশ দিয়ে ফেরানো যাবে না।

এখানে আরও কয়েকজনের পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করতে চাই—

'আমার পায়ের নিচে কত মৃত পা
মৃত পায়ে কত কত শিড়দাঁড়া, তবু

কোথাও দাঁড়াতে পারি না।'

[**পা**, আলফ্রেড খোকন; 'নব্বইয়ের কবিতা' পৃ: ৩২]

'একদিন পৃথিবীবাসীর কাছে
আত্মজিজ্ঞাসার লোভে ছুটে আসি
আর এতো আলো বিচ্ছুরণ দেখে
আমরা ভয়ে ও বিস্ময়ে মরে গেলাম।'

[**ধাত্রী**, কামরুজ্জামান কামু; ঐ, পৃ: ৪৭]

'এসে তো গেলাম, অনন্তের ঝাপসা লাল
দিগন্ত রেখায়;
ঘূর্ণিত জলের তোড়ে ভুলে গেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় পাতাল বলো, কোথায় মোহনা।

[**প্লাবন**, চঞ্চল আশরাফ, ঐ, পৃ: ৫৩]

'যতদূর যাওয়া যায়
যেন তার অধিক গিয়েছি আমি—'

[**সংশয়**, টোকন ঠাকুর, ঐ, পৃ: ৬১]

'আমার আনন্দবৃক্ষ অকাতর হেঁটে যায়
হাজার বছর—
গায়ে তার চিরন্তর ছন্দের নূপুর
এই তার ব্রজবুলি,
এই তার যোগ্য প্রতিবেশী।'

[**আনন্দবৃক্ষ**, তপন বাগচী, ঐ, পৃ: ৬৫]

আমি নব্বই দশকের কবিদের কবিতা থেকে উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো উদ্ধৃত করলাম শুধু আমার বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য। আমি আমার সুবিধে মতো এই পঙ্‌ক্তিগুলো চয়ন করেছি। অথচ একথা আমার জানা আছে যে, আমার মতো পাঠকের মুখ চেয়ে নব্বই দশকের বিশাল কবিগোষ্ঠী কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হননি। আমি স্বীকার করি যে এদের মেধা অসাধারণ। ধীশক্তি সুতীক্ষ্ণ। এবং অন্তর্দৃষ্টি কবিত্বময়। কিন্তু দূরদৃষ্টি একরকম নেই বললেই চলে। তারা আমার জন্যে লেখেননি কিন্তু কারো না কারো জন্য তো নিশ্চয় লিখেছেন। তাদের কবিতা তো আর হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর দুষ্পাঠ্য লিপিকৌশল নয়। নিশ্চয় এই কবিগোষ্ঠীর কাব্যসুধা পান করার মতো পাঠক তাদের নিজেদের মধ্যেই রয়ে গেছে। তারা কি পরিতৃপ্ত? তারা যদি তাদের নিজেদের কবিগোষ্ঠীর রচনা পাঠ করে অপরিতৃপ্ত থেকে থাকেন তবে আমার মতো বৃদ্ধ প্রায়ান্ধ কবি এই পঙ্‌ক্তি নিচয় হাতড়ে কি আর খুঁজে পাবে? আমি অসাধারণ পাঠক নই একথা মেনে নিলেও সাধারণ পাঠক হিসেবে নিশ্চয় তারা আমাকে গণ্য করবেন। যেটুকু অন্তত কম্যুনিকেটযোগ্য আমি সে পঙ্‌ক্তিগুলোই উদ্ধৃত করেছি। চিত্রকল্প না হোক এদের কবিতায় আমি দৃশ্যকল্প হাতড়ে বেড়িয়েছি। না তেমন ফটোগ্রাফিও তারা আমাদের সামনে হাজির করতে পারেননি। এদের কথার ধার আছে কিন্তু কোনো দিক নির্দেশনা নেই। তারা বলতে পারেন যে দিকনির্দেশনা দেওয়া কবির কাজ নয়। আমি বলব পাঠককে দিকভ্রান্ত করাও কবির কাজ নয়। চল্লিশ দশকের শেষের দিকে মার্কসবাদী কবিরা এই গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। তারা মৃগাঙ্ক রায়কে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলক ধাঁধার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তা স্বীকার করেননি। ফলে চল্লিশ দশকের শেষের দিকে গদ্য কবিতার ঝড়ের মধ্যে কিছু অকবি এসে ঢুকে পড়ার উপক্রম করেছিল। কিন্তু কাল ও কবিতার নিয়মে তারা বাংলা সাহিত্য থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন। আমি একথা বলছি না যে গদ্যে রচিত হলেই তা কবিতা হবে না। তাহলে তো সমর সেন কল্কে পেতেন না। এবং রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিতা—যা নিরাভরণ গদ্যে রচিত—সেগুলোও মহাকবির অন্তর্লোক আমাদের কাছে উদ্ভাসিত করত না। আমি নিজেও প্রচুর গদ্য কবিতা লিখে থাকি। আমি এগুলোকে গদ্য কবিতা হিসেবে বিবেচনা করে লিখিনি। আমি ভাবি আমি ঐ সব রচনায় সমিল পঙ্‌ক্তি বয়নের প্রয়োজন বোধ করিনি। নব্বই দশকের কবিদের একটি গুণকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে বিবেচনা করি। সেটা হলো তারা গদ্য কবিতার প্রয়াসী নন। তারা একটি গদ্য—পদ্য মিশ্রিত আঙ্গিক খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। এদের বিষয় অত্যন্ত নতুন। নতুন জিনিস সব সময় অর্থবহ হয় না। তবে প্রচলিত আঙ্গিক বদলে যায়। আমার মনে হয় সবার অজ্ঞাতে নব্বই দশকের শতাধিক কবি একযোগে বাংলা কবিতার বাঁধুনী ভেঙে দিচ্ছেন। তাদের ভাষা গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। সব অর্থই গ্রহণ করা যাবে এটা আমিও মনে করি না। তবে তারা যদি অনুগ্রহ করে পাঠকদের জন্য কম্যুনিকেট করার মতো কিছু অর্থ রেখে দেন তাহলে কবিতা তাদের মতো শুধু মেধাবীদের পাঠ্য বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হবে না। সাধারণ পাঠক—যারা কবিতা নিজেদের শিক্ষিত করতে সচরাচর পড়ে থাকেন—তাদের রুচিবোধ তৈরিতে সহায়ক হবে। আমি নব্বই দশকের দুটি সঙ্কলনকে আলাদাভাবে আলোচনা করতে চাইনি। কিন্তু যেহেতু এদের মধ্যেও ঐকমত্য সৃষ্টি হয়নি সে কারণে সম্ভবত অপর সঙ্কলনটি 'নব্বইয়ের কবিতা অন্য আকাশ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মতদ্বৈততা কি—তা স্বভাবতই আমার জানা আছে। প্রথম সঙ্কলনটির সম্পাদক মাহবুব কবির কি কারণে তাদের সঙ্কলনে 'অন্য আকাশ' এর কবিদের গ্রহণ করতে পারেননি তা একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

'কবিতা বা মহৎ শিল্প রাষ্ট্র-রাজনীতির সীমানায় অনুরুদ্ধ নয়, সর্বকালের চিরন্তন উত্তরাধিকার'—এ কথা ভূমিকায় সম্পাদক মাহবুব কবির উল্লেখ করলেও এদের চিন্তা-চেতনা এবং কাব্যবিশ্বাস ধর্মের ব্যাপারে অবরুদ্ধ এবং অনুদার। যদিও ভূমিকায় ধর্মের উল্লেখও তিনি করেছেন।

নব্বই দশকের পরবর্তী সঙ্কলনটি যা সাজ্জাদ বিপ্লব সম্পাদনা করেছেন তাদের কাছে ধর্ম একটি বড় বিশ্বাস জাগানিয়া অফুরন্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এখানে বিশেষ কোনো ধর্মের কথা উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। অদৃশ্যে বিশ্বাস যে পরবর্তী সঙ্কলনটির কবিদের উপজীব্য—তাতে দুর্ভাবনার কিছু আছে বলে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয়নি। কালচক্রের বিশেষ মন্থনে সাজ্জাদ বিপ্লব এবং মাহবুব কবির—কে কোথায় আশ্রয় নেবেন সম্ভবত তা তারা নিজেরাও জানেন না। আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি যে, কবিতা নির্বাচনে এদের বাছ-বিচার বর্তমান সময়ে অগ্রাহ্য করলেও চলে। আমি এদের সদিচ্ছাটুকুই সাহিত্যের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। দুজন সম্পাদককেই আমি স্মরণ করে দিতে চাই যে, কাজী নজরুল ইসলাম ভারত বিভাগে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু এ বিভক্তি বাঙালি মুসলমানদের জন্য অপরিসীম সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করেছে। এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্যও। কারণ দেশবিভাগের পর আরো একটি ঘটনা ঘটেছে—তা হলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এখানে কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে আজকাল কেউ আর তার নামও উচ্চারণ করেন না। অথচ তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত। তার আবির্ভাব না ঘটলে 'কল্লোল' কালের নাক উঁচু কবির দল এবং তিরিশের কেতাদুরস্ত কবিদের বাকস্ফূর্তি সহজ হতো না। বলাবাহুল্য, নজরুল অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন বলেই তাকে সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক ঘৃণা হজম করতে হয়েছিল।

আমি নব্বইয়ের কবিতার আলোচনায় এসব কথা উত্থাপন করলাম এ জন্য যে, সাহিত্যে যারা অযথা বিভক্তি তৈরি করেন সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের নাম লেখা থাকে না। তিনি যদি নিজে কবি হন তবে তার উল্লেখযোগ্য লাইনগুলোই পরবর্তীকালে উৎসাহ যোগাতে পারে মাত্র। আমি এ সতর্কবাণী উভয় সম্পাদকের জন্যই একান্ত জরুরি বলে মনে করি। এবার আসা যাক 'নব্বইয়ের কবিতা অন্য আকাশ'-এ। এই সঙ্কলনটি অপেক্ষাকৃত ছোট কবিদের মতোই দুটি রঙে রঞ্জিত। এই রঙ দুটির নাম হলো: সহজতা ও কাঠিন্য। কবিতা যে পাঠকের মনে দ্রুত সঞ্চারিত হতে হবে এইসব কবিরা তা কেউ কেউ বিশ্বাস করলেও এদের প্রায় সব কবিই মনে করেন তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান। বুদ্ধি ও বিদ্যা কবিতা লেখার আজকাল একটি শর্ত হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু বুদ্ধি-বিদ্যা-মেধা ইত্যাদি কবিতা লেখার আনুসঙ্গিক গুণ মাত্র। কবিতা লিখতে হয় যে জিনিস দিয়ে তার নাম হলো হৃদয়। হৃদয়ানুভূতির অন্য নাম আবেগ। এই আবেগেরও একটা পরিমিতি বোধ থাকতে হয়। সেটাও কবির মস্তিষ্ক নির্ধারণ করে না। করে মন। যা হৃদয়েরই জুরিগাড়ি। দ্বিতীয় সঙ্কলনটির কবিদের কবিতাতেও সোনার ডিমের মতো একটি পূর্ণ কবিতা লেখার প্রয়াস আছে বলে আমার মনে হয়। হয়তো আছে কিন্তু তা বিমূর্তভাবে। যা মূর্ত হয়ে উঠেছে তা হলো হীরের ধারের মতো কয়েকটি পঙ্ক্তি ও উপমা। তবে আগের সঙ্কলনটির চেয়ে এদের গন্তব্য আমার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এদের সাথে হয়তোবা খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো করে পরীক্ষা করলে আদি বাংলা কবিতার একটা মিলও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এরাও প্রতীকী ভাষ্য ব্যবহারে পারদর্শী। এরা ভাবেন এই ভাষা পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন। কারণ এরা পাঠক বলতে তাদের সমধর্মী কবিদেরই বোঝেন। কিন্তু সমধর্মী এ সহমর্মী কবিরা ছাড়াও কবিতা যে কোনো কোনো সময় সাধারণ মানুষ পাঠ করেন একথা এরা হয়তো ঠিকমতো বুঝতে পারেন না। এরা কবিতা লিখেছেন তাদের মতো কবিদের জন্য। অথচ তাদের মতো কবিরা নিজেদের গণ্ডির বাইরে অন্য একটি ঐতিহ্যগত জগৎ আছে তা সাদা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। এখানে পঞ্চাশ দশকের কবিদের একটি তথ্য এদের জন্য বর্ণনা করতে চাই। পঞ্চাশ দশকে ধরে নেওয়া হতো যে অমুক অমুক কবি খুবই বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান। সেইজন্য তাদের কবিতা পাঠক সমাজের কাছে সুবোধ্য ছিল না। কিন্তু আজ তাদের সেসব কবিতা পরীক্ষা করে বোঝা যাচ্ছে যে তারা তাদের জগৎ সম্বন্ধেই ছিলেন একই সাথে মূর্খ ও উদাসীন। অন্তত তাদের কবিতা থেকে তারা যে অনেক লেখাপড়া করেছিলেন এমন কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করা যাচ্ছে না। এমনকি তাদের সময়কার বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধেও তাদের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় ছিল একমুখি। তারা মার্কসবাদ বুঝতেন (বুঝতেন কি?) এবং শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব কায়েমের জন্য নিজের দেশে সাহিত্যিক লড়াই জারি রেখেছিলেন। আজ তারা গৌণ কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এটা নব্বই দশকের উভয় সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত কবিদের জন্য আমার মতো একজন অন্ধ ও জরাজীর্ণ ভবিষ্যতদ্রষ্টার একটি সতর্কবাণী। আমি আগেই উল্লেখ করেছি নব্বই দশকের শতাধিক কবি পুরুষই কবিত্ব শক্তি নিয়ে জন্মেছেন। এই কবিত্বশক্তির আরো একটি নাম আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে ঘন ঘন উচ্চারিত হয়। আমি ঐসব সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করি বলেই একথা জানি। সে নামটি হলো মনুষ্যত্ব। কবিতা যে মনুষ্য স্বভাবেরই বিবরণ তা সাম্প্রতিককালের ভাবুকগণ বিচার করে দেখেছেন। আমার দৃঢ় ধারণা তারা মানবজাতির কবিত্বশক্তি যে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্বেরই একটি সৃজনক্রিয়া তা মেনে নেবেন। নব্বই দশকের নীলিমার দিকে এবার একটু দৃকপাত করা যাক—

'যে শহরে আমি নেই, তুমি তাকে বোলো না শহর।

[**যে শহরে আমি নেই,** আল হাফিজ; 'নব্বইয়ের কবিতা: অন্য আকাশ' পৃ: ১৩]

'ঘড়িটা হারিয়ে গেলে তোমাকে খুঁজে পাই না
তুমি হারিয়ে গেলে, ঘড়িটা–'

[**ইতিহাসের শরীর,** ইশারফ হোসেন; ঐ, পৃ: ১৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নিপুণ বয়নশিল্পী এক
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেলাই করে

আসলে কি সেলাই করে লোকটি
মানুষের সুখ না দুঃখ

[**ড্রাই ক্লিনার্স**, কামরুজ্জামান; ঐ, পৃঃ ২৪]

'রঙ করা প্রভাষণ ছেড়ে মায়ের চিঠিতে আমি
সুরারোপ করি,
বৃক্ষের বাকলে
লিখি শষ্য কবিদের নাম ।'

[**লাঙ্গলের খেয়া ভাঙ্গে জীবনের গতি**, খৈয়াম কাদের; ঐ. পৃঃ ২৯]

'নিজের জমিন ফেলে ভূমিহীন স্বপ্নের রাতে
দুঃখের দানা খায় আত্মার কবুতরগুলো ।'

[**পরস্পর**, মহিবুর রহিম; ঐ, পৃঃ ৫২]

'কৃষ্ণপক্ষে ডেকে আনি চাঁদ
স্বপ্নকে শুকোতে বিছিয়ে দিলাম মেঘে

ঘাসও পেরেক হয়ে বিঁধে যায় পায়ে ।'

[**ফসিল ও জলতমা**, মুহম্মদ আবদুল বাতেন; ঐ, পৃঃ ৫৯]

'এখন হাঁসটার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে' সে ভাজা ডিম পাড়ে
অথচ পৃথিবীর ভয়ে সে তার ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারছে না'

[**কষ্টের হাঁসগুলি**, মৃধা আলাউদ্দিন; ঐ, পৃঃ ৬২]

'শৃঙ্গার শেখাবে বলে পুরো সন্ধ্যা আমাকে শাসালে
বললে গভীর হোক রাত... ।
জানালায় চুম্বনের দাগ নড়ে ওঠে
সেদিকে তাকিয়ে তুমি নিরিবিলি খুলে দিলে গিঁট
সেইতো আমার যতিচিহ্ন চেনা ।...'

[**প্রণয়ের সম্ভাবনা**, শাকিল রিয়াজ; ঐ, পৃঃ ৬৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই হলো নব্বই দশকের অন্য আকাশ। দূর থেকে অসংখ্য তারার টিপটিপ আয় আয় শব্দ কাছে গেলে উল্কার মতো নিজের পুচ্ছ পুড়িয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

কবিতা অক্ষরে লিখিত হলেও তা মৌমাছির মতো অক্ষরের মৌচাক ছেড়ে পাঠকের মনে গুঞ্জরিত হয়। আমরা আমাদের প্রিয় কবিদের নাম যখনই কোথাও উচ্চারণ করি তখন শুধু ঐ নামটিতেই তিনি অবস্থান করেন না। আমাদের সত্তায় গ্রোথিত তারই রচিত কয়েকটি কবিতায় বিবর্তিত হয়ে যান। আমরা কবিকে ও তার কবিতাকে একসাথে মনের মধ্যে মিশ্রিতভাবে অনুভব করতে থাকি। তখন কবি জীবনানন্দ দাশ আর 'বনলতা সেন' কবিতাটি রচনা আর রচয়িতা হিসেবে পৃথক থাকেন না। আমরা আর আলাদা করতে পারি না। কবির চেহারা আমরা ভুলে যাই। পাঠকের মানসমণ্ডলে তখন একটি বা দুটি কবিতাই কবির প্রতিকৃতি হয়ে যায়। শুধু একটি বা দুটি কবিতা নয় একাধিক কবিতাও হতে পারে কিম্বা একটি আস্ত বই আমার মনে হয় নব্বই দশকের দ্বিতীয় সঙ্কলনের কবিদের এই বাছাই করা সঙ্কলনটিতে তাদের সম্পূর্ণ চেহারা পাঠকের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠার অপেক্ষায় আছে। বলাবাহুল্য যে, এরা সবাই বয়সে তরুণ। তাদের জন্য ভবিষ্যৎ আছে। আমি সমালোচক হিসেবে শুধু এটুকু বলতে পারি এদের প্রত্যেকেই সেই ভবিষ্যতে প্রবেশের জন্য যে প্রয়োজনীয় কাব্যগুণ নিজের কবিতায় সঞ্চারিত করা একান্ত দরকার তা সঞ্চয় করেছেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতের ছাড়পত্র এখন তাদের পোশাকের গুপ্ত পকেটে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে। তাদের চোখে ও দৃষ্টিতে স্বপ্নের মায়াকাজল।

নব্বইয়ের কবিদের আরম্ভ কোনো প্রতিষ্ঠিত বহুল প্রচারিত দৈনিকের সাময়িকীতে নয়। এরা ক্ষুদ্রপত্রিকা তথা লিটল ম্যাগাজিনের স্পর্শকাতর পৃষ্ঠার সচকিত কবির দল। বড় পত্রিকায় তরুণতম কবিদের আত্মসমর্পনের যে অভ্যেস গড়ে ওঠে তাতে আরম্ভেই কবিকে নানারূপ হুকুম তামিল করে চলতে হয়। কারণ অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পৃষ্ঠা সম্পাদনা করেন এমনসব ব্যক্তি যারা সবই বোঝেন কিন্তু প্রকৃত কবিতা তাদের মাথায় ঢোকে না। এরা কবিকে দিয়ে নিজের স্বার্থ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান। নিজের প্রশংসা-গীত গাওয়াতে চান। রাজনীতি ও দলীয় পক্ষপাত গলধকরণ করাতে চান। অর্থাৎ তরুণতম কবির আত্মবিশ্বাস দুমড়ে মুচড়ে অকেজো করে রাখতে চান। বড় পত্রিকার সাহিত্য পৃষ্ঠাগুলো সৃজনশীল সাহিত্যের মুক্তাঙ্গন নয় পীর মুরীদির ব্যবসার মতো। কিছু হাদিয়া দিয়ে সেখানে ঢুকতে হয়। এবং খড়ের গম্বুজকে সালাম করে কবিখ্যাতির ভাগীদার হতে হয়। সে তুলনায় লিটলম্যাগ একালের সৃজনপ্রতিভার শস্যক্ষেত্র। বাছাইয়ের কাজটি সব সাহিত্যেরই কাল নির্ধারণ করে। নব্বই দশকের ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজটিও সকলের অজ্ঞাতে সময়ই নির্ধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে। একথাও সত্য যে লিটলম্যাগের জগতেও গোষ্ঠী প্রীতি গোত্র প্রীতি আছে তবু সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে এদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত, অনুসন্ধিৎসা, সমালোচনা এবং শ্রদ্ধাবোধ। কালের অক্ষর যারা রচনা করেন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবেই। তবে গুপ্ত হত্যা ও নিম খুন না থাকুক এটাই আমাদের কাম্য।

নব্বই দশকের প্রথম সঙ্কলনটির সম্পাদক মাহবুব কবির দশকওয়ারী সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার পূর্বসুরী আশির দশকের কতগুলো গুণপনার কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। সম্পাদক বলেছেন, "আশির দশক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ঝঞ্ঝামুখর ঘূর্ণাবর্তে চঞ্চল। এ্যানার্কিজমের বিরুদ্ধে, জান্তার সামরিক শাসন উৎখাত, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাক-শিল্প স্বাধীনতার উদ্ধারব্রতী বিলোড়ন। স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের হাজারো টানাপোড়েন, ক্যু দেতা, সেনানিবাসে পাইকারি খুন, গুপ্ত হত্যা, প্রহসনের বিচার, পাকিস্তানপন্থী সাম্প্রদায়িকতা রাজাকার পুনর্বাসন, অন্তর্ঘাত ও অরাজকতায় বিপন্ন বিধ্বস্ত দেশ-জাতি-তখনই রচিত হয় গণজাগরণের শ্রেষ্ঠপঙ্ক্তি—'গণতন্ত্র মুক্তিপাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক'।" মাহবুব কবির উল্লেখিত এই বিবরণ অসত্য এবং অতিরঞ্জিত। আশির দশকের প্রতিনিধিত্বশীল কোনো কবির হাতেই এমন কবিতা আমি দেখতে পাইনি যাতে তাদের সময়ের উপরোক্ত আক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে অন্তত একটি পূর্ণ পঙ্ক্তি রচনা করেছেন। আশির দশকের খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আবদুল হাই শিকদার, রেজাউদ্দিন স্টালিন, সাজ্জাদ শরিফ, সরকার মাসুদ, বুলবুল সরওয়ার, তমিজ উদ্‌দীন লোদী, রিফাত চৌধুরী, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, মাসুদ খান, মজিদ মাহমুদ প্রমুখ নিঃসন্দেহে কবি। তাদের কালের বাংলা ভাষার অন্যান্য কবিদের মধ্যে এরাই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার কালের ঘূর্ণাবর্তে এতসব ঘটনা ঘটে গেল কত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানচিত্রকে উলোট-পালট করল অথচ এরা প্রগতিবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীলই হোন—তাদের কলমে নারীস্তুতি ছাড়া কিছুই বেরিয়ে এলো না। আমি একথা বলছি না যে মানবীঅর্চনা তাদের কবিতাকে কোনো মহিমা দেয়নি। আমি শুধু বলতে চাইছি—না এরা প্রগতিবাদী না মৌলবাদী। এমনকি তাদের দুর্বোধ্য প্রিয়তমাদের থেকে তারা প্রকৃতির দিকেও মুখ ফেরাতে পারেননি। হতে পারে এটা আশির দশকের কবিদের লক্ষণ বিচারের একটি মৌল উপাদান। কিন্তু স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তারা কোথাও কিছু লিখেছিলেন অন্তত—'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক'—এ ধরনের শ্লোগানও লিখেছেন তাদের বই থেকে এর কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করা যাবে না। তারা তাদের দশকে নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান কবিত্বশক্তি। তবে ঐ শক্তি তারা উপুড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন তাদের নারী অর্চনায়। আমি মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি তারা ঠিকই করেছিলেন। তারা এতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই নব্বই দশকের কবিতায় প্রেমকে বিশুদ্ধ ও বিবরণমুখর করার প্রতিশ্রুতি নতুন মাত্রায় ব্যক্ত হয়েছে। আমি যেহেতু আশির দশকের কবিদের নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনায় উৎসাহী নই সে কারণে তাদের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো—তারা কবি, প্রগতিবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল কিছুই নন।

বরং মাহবুব কবির সম্পাদিত নব্বই দশকের কবির তালিকায় এমন কয়েকজন কবি আছেন যাদের রচনায় তাদের অন্তরস্থ রাজনৈতিক দীপ্তি অর্থাৎ প্রগতিশীলতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতার চিহ্নসমূহ আবিষ্কার করা যাবে। আমি অবশ্য আমার আলোচনায় তাদের রাজনীতিকে গুরুত্ব দিইনি। বরং রাজনীতি সমাজনীতি এবং সমসাময়িক কালের গর্জনের ভেতরেও তাদের মৌলিক কবিত্বশক্তির যেটুকু পরিচয় যাওয়া গেছে তা বলতে চেষ্টা করেছি। একথা অবশ্য সাজ্জাদ বিপ্লবের সঙ্কলনটি সম্বন্ধেও বলা যায়। তবে তাদের গন্তব্যটি আমি যে স্পষ্ট বলে উল্লেখ করেছি এবার তার পক্ষে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সঙ্গত মনে করি।

নয়ন আহমেদ, সায়ীদ আবুবকর, খৈয়াম কাদেরের কবিতায় দৃশ্যের চালচিত্রের ফুটো দিয়ে একটি অদৃশ্য জগতের আভাস আমরা পাই। সেই অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে যে প্রত্যয়বোধ এইসব কবিরা উত্থাপন করতে চেয়েছেন তা তাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্যেরই দিক নির্দেশনা। কেউ এতে বিশ্বাস করতে পারেন, নাও করতে পারেন। আমি একথা বলি না যে, দ্বিতীয় সঙ্কলনটির কবিকুল অদৃশ্যে আস্থা রেখেছেন বলেই আমি খুশিতে আটখানা হয়ে গেছি। বরং আমার কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশে যেখানে প্রগতিশীলতাই হলো কবি হিসেবে গ্রাহ্য হওয়ার শর্ত সেখানে সাজ্জাদ বিপ্লব সঙ্কলিত প্রায় সব কবিই ঐ শর্ত ভঙ্গ করে অনিশ্চয়তার দিকে পা বাড়াতে সাহসী হয়েছেন। এটাও সমকালীন আন্তর্জাতিক কবি দৃষ্টিভঙ্গির একটি লক্ষণ বলে গণ্য হতে পারে। শুধু পারে বললে ঠিকমতো বলা হয় না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচরণ করে এবং শত কবির সান্নিধ্যে এসে আমার এ ধারণা হয়েছে যে এটাই উত্তর আধুনিক কবিত্ব শক্তির প্রাথমিক লক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~